দশম বর্ষের

সূচীপত্র

(মাঘ, ১৩৪৩—পৌষ, ১৩৪৪)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

রামধনু

(মাঘ, ১৩৪৩—পৌষ, ১৩৪৪)

বিষয়-সূচী

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক	পৃষ্ঠা
অয়েল-পেণ্টিং (নাটিকা)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	৬০৪
অলক্ষুণে (গল্প)	...	শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ ...	৪৯৮
অষ্ট্রেলিয়া (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ ...	৪৩০
অষ্ট্রেলিয়ান্ টেষ্ট্ ম্যাচের ভিড়	...	... ...	২৯
আকাশের ভয়ঙ্কর (গল্প)	...	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ...	৬৮৩
আচার্য্য জগদীশ (জীবনী)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	৭১৯
আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ	...	... ...	৭১৬
আবিষ্কার (কবিতা)	...	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ, বি-টি ...	২৬
আলুর স্বপক্ষে (খাদ্য-বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক	শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি	৭৩২
আংটি-বিভ্রাট (কবিতা)	...	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ...	৫২৯
ইচ্ছা (কবিতা)	...	শ্রীঅমলেন্দু গাঙ্গুলী ...	৭৪৭
ইতালির মুসোলিনী (জীবনী)	...	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ ...	৪৬১
একটি গানের আসর (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি ...	২৮৮
একদা এক কুকুরের পা ভাঙ্গিয়াছিল ([illegible])		শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	৫১০
এক দুর্য্যোগের রাতে (গল্প)	...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	২৯
এক মিনিট (গল্প)	...	শ্রীমল্লিকা দেবী ...	১১২
ওদেশের কাণ্ড (কবিতা)	...	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু ...	৫৩৯
কঙ্কালের সাথে কোলাকুলি (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি ...	৯৩
কুঙ্গো হীরার পলায়ন (গল্প)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	৮৫
কি ও কেন	...	... ...	৪৯১
কিশোর (কবিতা)	...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ ...	২২০
কেদার (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	১১৭
কেম্ব্রিজের কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক	ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এস্-সি (ক্যাল্), পি-এইচ্-ডি (ক্যান্টাব্) ...	৬৯০
...			
কোনও গ্রীষ্মের ছুটীর একমাস (ভ্রমণ)		শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ...	৫৪০
কোহিনূরের ইতিকথা (সচিত্র প্রবন্ধ)		শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্-এ	৩০৭
খেলাধূলা	...	...	১৪৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক	পৃষ্ঠা
গন্ধ গোকুল (কবিতা)	...	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ ...	৬১
গরীবের ধন (গল্প)	...	শ্রীমাধব্য ...	৪৯৫
গাছের যাদুকর (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক	শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্ সি	৪৭৬
গাঁজাখুরী (কবিতা)	...	শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ...	১১২
গুপ্ত ভ্রাতৃদ্বয়	...	... ...	৭০
গুরু-শিষ্য-সংবাদ (রঙ্গ)	...	শ্রীশকুন্তলা দেবী ...	২৪০
ঘোড়ায় চড়ার ব্যায়াম (গল্প)	...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	২২৬
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি (গল্প)	...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	১২৪
চকোলেটের জীবন-চরিত (সচিত্র প্রবন্ধ)		শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	২৩৫
চশমার মায়া (গল্প)	...	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ...	১৪৯
চিঠিপত্র	...		৫৭, ১১৩, ১৫৯, ২২০, ৩৩১, ৩৮৮, ৪৪৮, ৫০৫, ৬২২, ৬৭৩, ৭৪৪
চিনির বিপক্ষে (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক	শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি	৬৪০
ছাত্রাবাস (গল্প)	...	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ ...	২৫২
ছিঁটে-ফোঁটা	...	শ্রীদেবব্রত সেন ...	৩৮৭
ছুটীর পড়া (কবিতা)	...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৬৯
ছোটদের চিত্রশালা	...		১০৮, ১৪৯, ২৭২, ৩২৬, ৪৪৬, ৪৯৪, ৭৪৯
ছোটনাগপুরের জঙ্গলে একরাত্রি (গল্প)		শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ...	৫২২
জাপানী গল্প (গল্প)	...	শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর ...	৬৪৯
জীবাণুর জন্মকথা (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক	শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি	৬১০
জেনে রাখ	...	... ...	৬৩৯
জেনে রাখা দরকার	...	শ্রীমতী শান্তি দত্ত ...	৪৯৮
টকি জিনিষটা কি (বিজ্ঞানের কথা)		শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	৩৩৯
টুমুর স্বর্গ থেকে পতন (গল্প)	...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	৩৯৪
ডাইনোসরসের বংশধর (সচিত্র প্রবন্ধ)		শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	১৫৫
ডাকটিকেটের গল্প	...	শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত ...	[illegible]
ডুয়েল (কবিতা)	...	শ্রীবিকাশ দত্ত ...	৩১৪
ঢেং-মো-চি (গল্প)	...	শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী ...	৩৬২
[illegible] (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৬২৫
তের নং বাড়ীর রহস্য (গল্প)	... অধ্যাপক	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ ...	৩৭৪
তেলো/তালিষ্ট্ (গল্প)	...	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ...	৪২৪
দস্তুরমত নাটক (গল্প)	...	শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্ ...	[illegible]
দস্যুর দ[illegible] ভোমরা (উপন্যাস)	...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু ...	[illegible] ১১৮, ১৭১, ২৪৫, ৩০১, ৩৪৭, ৪৩৮, ৪৯৯, ৬৬৫,

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
দিন হয়ে যায় রাত (গল্প) ...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি ...	৫৩১
দোল (কবিতা) ...	শ্রীরমা দেবী ...	১৪৮
ধাঁধার উত্তর ...		৫৯, ১১৪, ১৬৭, ২২২, ২৭৭, ৩৩৪, ৩৯০, ৪৫১, ৫০৮, ৬২৪, ৬৭৮, ৭৫১
...	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ ..	৬৮১
নন্তু বাবুর জল্পনা (কবিতা) ...	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ...	৩১১
নাদুরাম বাবুর মহানুভবতা (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	১৭৯, ৪৮৯
নানা কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	... ...	৭৩১
নানা প্রসঙ্গ ...	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ ...	৬৪৪
নামবিভ্রাট (গল্প) ...	শ্রীবিনয়কুমার গোস্বামী ...	২৪১
নিশির ডাক (ঐ) ...		
নূতন ধাঁধা ...		৬০, ১১৫, ১৬৮, ২২৪, ২৮০, ৩৩৫, ৩৯২, ৪৫২, ৫০৮, ৬২৪, ৬৮০, ৭৫৩
পঙ্গপাল (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	৪৪
পদ্ম (কবিতা) ...	শ্রীসুনীলকান্তি সেনগুপ্ত ...	১৬২
পরলোকে অধ্যাপক মোলিশ ...	... ...	৭৪৩
পরোপকার (ঐ) ...	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু ...	২২৫
পল্লীরাণী (কবিতা) ...	শ্রীঅপর্ণা দেবী ...	৬৯৭
পশুর বাজার (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী ...	১৯৮
পাখীর ডিম (ঐ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	২৮২
পাহাড়ী মাকড়সার ছানা (গল্প) ...	শ্রীসুকুমাররঞ্জন ঘোষ ...	২১৭
পিতৃহারা (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৪৫৩
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ...	...	[illegible] ৭৫০
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল ...	...	৫৬, ৬৮০
পুস্তক-পরিচয় ...	...	৪৪৭
পূজায় (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৫০৯
প্রত্যহ কিছু পরিমাণ কাঁচা খাদ্য খাইবে (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এস্-সি ...	৭১
প্রাথমিক সাহায্য বা ফার্ষ্ট্ এড্ (ঐ)	... ঐ ...	২৬৮
প্রিভেন্‌সন্ ইজ্ বেটার দ্যান্ কিওর (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	৩৫[illegible]
প্রেম ও হেম (গল্প) ...	শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর ...	৫৪৬
কে[illegible]র পাল্লায় (ঐ) ...	শ্রীবিমল দত্ত, এম্-এ ...	৪০৮
কোহিনূর[illegible] স্বপ্ন (কবিতা) ...	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ ...	৪২৩
খেলাধূলা[illegible] মিনার ...	... ...	৬৭৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
ফুলের মূল্য (উপন্যাস) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি ...	৩৬৭, ৪১৫, ৪৮২, ৬৫৩, ৭০৬
বর্ষায় (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	৩৯৩
বর্ষা সন্ধ্যায় (ঐ) ...	শ্রীহরেকৃষ্ণ শী ...	৩৩০
বশিষ্ঠাশ্রম (ভ্রমণ) ...	শ্রীআশালতা নন্দী ...	৩২৯
বংশীধরের বড়দিন (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	৬৯৮
বাঙ্গালী জাহাজ ও বাংলার সমুদ্র-বাণিজ্য (ইতিহাসের কথা) ...	শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ ...	৩৫২
বাঙ্গালী বীর কেদার রায় (ঐ) ...	(ঐ) ...	১৩২
বাদল দিনে (কবিতা) ...	কুমারী সুজাতা গুপ্ত ...	৪৪৭
বাদল-সন্ধ্যা (ঐ) ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ ...	৪৯৭
বাদলা হাওয়া (ঐ) ...	কুমারী সুজাতা গুপ্ত ...	৩২৮
বাদশাহ ও বিদূষক (গল্প) ..	শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত ...	৩৮৭
বাসনা (কবিতা) ...	কুমারী মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৭৬
বাড়ি চাই বাড়ি (গল্প) ...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু ...	৫৫৪
বাংলার অতিথি ...	... ...	৬৪৩
বিজ্ঞানের খেলা (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি-এ ...	৭৪১
বিদ্যাবাগীশ বনাম নিতাই (গল্প) ...	শ্রীমাধব্য ...	৬৩৮
বিদ্যার মান (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	১
বিন্তুর মাষ্টারী (গল্প) ...	শ্রীবিনোদগো[illegible]ড়ী ...	৩১৫
বীর সৈনিক (গল্প) ...	শ্রীহিরণ[illegible] সান্যাল ...	৫৫
বৃদ্ধার [illegible] (ঐ) ...	শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র ...	১৬০
বেচারী (ঐ) ...	শ্রীসুকুমার দে সরকার ...	৭৫
ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ...	... ...	২৭৪
ভগ্নদূত (গল্প) ...	... ...	৪৯৩
ভবিষ্যতে (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী ...	৫১৫
ভয়ানক প্রতিবেশী (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্-এস্-সি ...	২
ভাদর (কবিতা) ...	শ্রীনরেশচন্দ্র গুহ বক্সী ...	৪৯৯
ভাদরের গান (কবিতা) ...	শ্রীঅজয়কুমার মিত্র ...	৫০৪
ভৌতিক কাহিনী (গল্প) ...	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ...	৪৬৯
মণি-মঞ্জুষা ...	...	১০৯, ১৯২, ৩২০, ৪[illegible]
মাটি-মা (কবিতা) ...	শ্রীদেবব্রত সেনগুপ্ত	[illegible]
মাদ্রাজে দুর্গা পূজা ...	কুমারী যুথিকা চন্দ্র ...	[illegible]

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
মায়ের দেশ (কবিতা) ...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৮৮
মুষ্টিযোগ ...	... ...	৩৬৬
মুষ্টিযোগ (কবিতা) ...	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ, বি-টি ...	৬৩৬
মেট্রোতে বুড়ি (গল্প) ...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু ...	৫১৭
রহস্যের জের (গল্প) ...	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী ...	২০
রাজগৃহ (ইতিহাসের কথা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, ... এম্-আর-এ-এস্ ...	৬৭০
রামধনুর জন্মদিনে (কবিতা) ...	শ্রীঅজয়কুমার মিত্র ...	৫৪
লোহার কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীজয়ন্তকুমার বসু, বি-এস্-সি ...	৪০৩
শিকার (গল্প) ...	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ ...	৬২৭
শিশির-পরী (কবিতা) ...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৩৭
শিশু-সাহিত্য সংবাদ ...		১৬৬, ২২২, ৩৩১, ৫০৫, ৬২২, ৬৭৪, ৭৪৯
শেষ টেষ্ট্ ম্যাচ্ ...	... ...	১৬৩
সন্দেশ ...		৫৭, ১১৩. ১৬৬, ২২১, ২৭৫, ৩৩২, ৩৮৮, ৪১৪, ৪৪৯, ৫০৬, ৬২২, ৬৭৬, ৭৫০
সম্রাটের রাজ্যাভিষেক ...	... ...	২৭৩
সহজ টোটকা ...	শ্রীমতী শান্তি দত্ত ...	৫২৮
সহস্রজীবের উপাখ্যান (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ ...	২০৯
সংশয় (কবিতা) ...	শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ...	২১৯
সাক্ষিগোপাল (সচিত্র) ...	শ্রীজগৎমোহন সেন, বি-এস্-সি, বি-এড্ ...	৬৫৯
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা ...	...	৮৪, ২১৯, ২৫০, ৩০০, ৪১৪
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর ...	...	১১৬, ২২৪, ২৮০, ৩৩৬, ৪[illegible], ৫০৬, ৭৪৬
সাপের স্বভাব (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী ...	৮০
সেকালের ছেলেদের লিখিতে শেখা (ঐ) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি ...	১৫
সোনার হরিণ (উপন্যাস)	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ ...	৪৯, ১০৩, ১৪০, ২০৩, ২৬৩
স্পেনের কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্-সি ...	৫৯৯
স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ...	সম্পাদক ...	১৮[illegible]
স্মৃতি-কণা (কবিতা) ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত ...	২৮১
[illegible] (কবিতা) ...	শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	৬৪৪
কোহিনু[illegible] (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্	৫৮৪
খেলা[illegible]		৬

রামধনু—

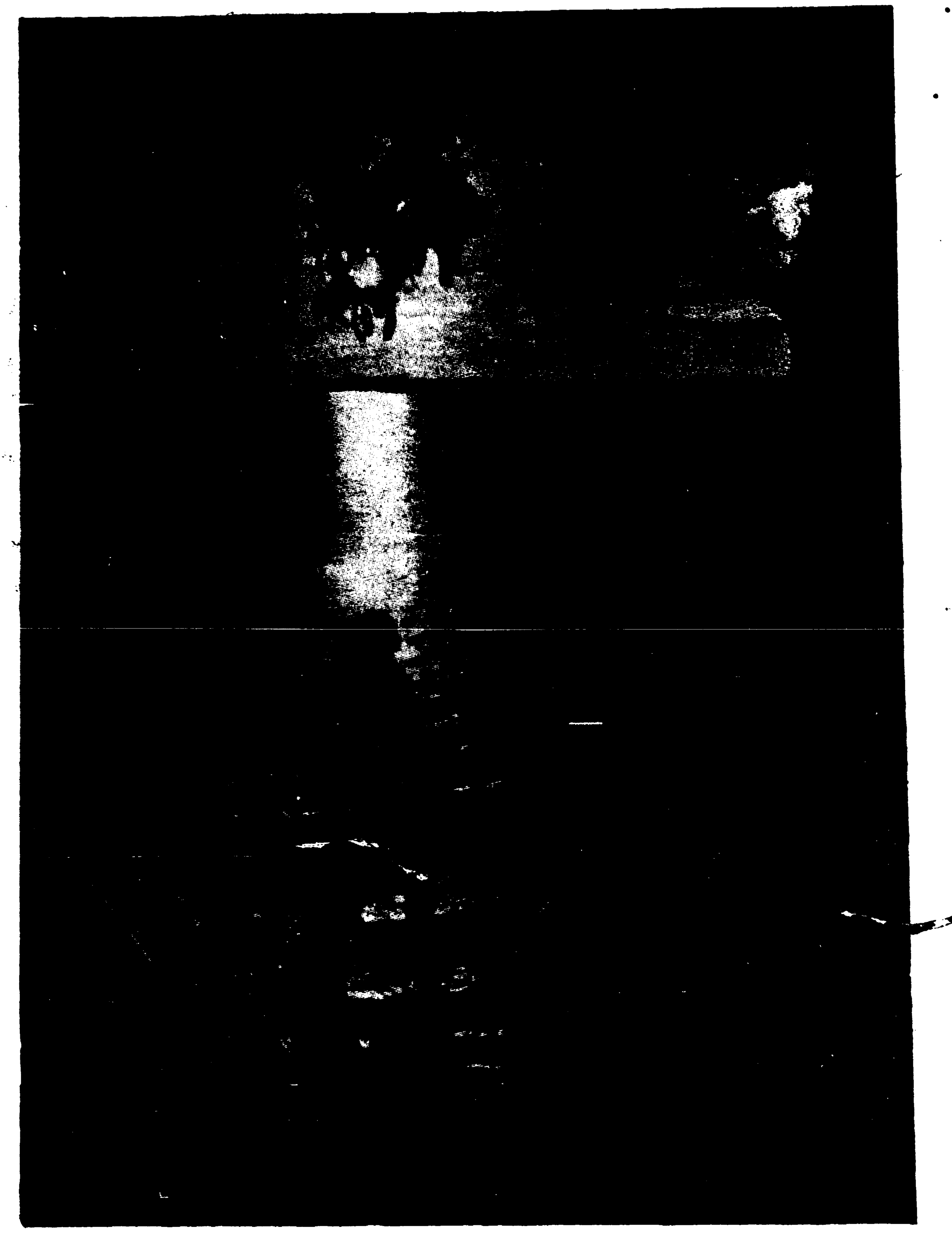

নতুন বছর

আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১০ম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৩ | ১ম সংখ্যা

বিদ্যার মান

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

দু' কুড়ি বছর আগেকার কথা—
কম দিন নয় আর,
মঙ্গলকোট থানায় থাকিত
শিউ সিং জমাদার।
যেমন আকার, তেমন প্রতাপ,
লোকে বলে ঘাটে-পথে,
দুই বার নাকি কাবুল-যুদ্ধ
সে-ই করেছিল ফতে।

লাঙুল সনাথ দল টাট্টু তার
দৈর্ঘ্যেতে হাত তিন,
অসীম ধৈর্য্যে বহিত কষ্টে
সেই গুরুভার দিন।
মাটী হতে ঠিক আধ হাত দূরে
রেকাব ঝুলিত তার,
তাতেই চড়িয়া ছাড়ত্‌কে যেত
শিউ সিং জমাদার।
গোঁফ ছিল তার ঝোঁপের মতন,
কথার ছিল কি চোট্,
মনে সে ভাবিত সেই বুঝি নিজে
আধেক পীনাল কোড্!
আমাদের কাছে বিশাল ভয়াল
দেহখানি তার মোটা,
আছিল বৃটিশ-রাজের প্রতীক্
শাসন-বিভাগ গোটা।
নিত্য তাহার হাবভাব দেখি
ভাবিতাম মোরা তাই,
সবার উপর সেই বুঝি আছে,
তাহার উপর নাই।

একদিন বড় ঘোড়ায় চড়িয়া
আসিল মোদের গ্রামে,
রোগা বলে বুঝি দারোগা বলিত
গোবিন্দ সেন নামে।
ছিপ ছিপে দেহ, উজ্জ্বল আঁখি,
ব্যবহার বড় সৎ,
শুনিলাম নাকি শিউ সিং চেয়ে
তাহার উচ্চ পদ।
শিউ সিং যারে সম্ভ্রমে নমে,
সবিনয়ে কথা কয়,
কত সে উচ্চ বুঝায়ে দিলেন
পণ্ডিত মহাশয়।
দেখায়ে দিলেন তুলনা করিয়া
বিদ্যার কত মান,
সরকার তাঁরে গৌরবে ডাকি
করেছে এ পদ দান।
বিদ্যার কাছে এইখানে দেখ
শক্তি মেনেছে হার,
কৃষ যুবকের ইঙ্গিতে ছোটে
শিউ সিং জমাদার।

ভয়ানক প্রতিবাসী

(শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্-এস্-সি)

ঘরের পাশে গোঁয়ারগোবিন্দ প্রতিবাসী লইয়া বাস করিতে কেহই চায় না। তোমার পাশের বাড়ির পড়শীটি যদি তোমাকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টাতেই থাকে, তবে তোমাকেই তল্পিতল্পা গুটাইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িবার

বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, হাওয়াই প্রভৃতি জায়গার লোকদের এই রকম সব সাংঘাতিক প্রতিবাসী লইয়া বাস করিতে হয়। তাদের ঘরের আশেপাশে যত আগ্নেয়গিরি! সেগুলির না আছে মেজাজের ঠিক, না আছে দয়ামায়া। তাঁরা হঠাৎ একদিন হয়তো গা নাড়া দিয়া উঠিলেন; অমনি চারি পাশ কাঁপাইয়া ভূমিকম্প সুরু হইল; তার পর ছাই, পাথর-গলা সব ছড়াইয়া আশ-পাশের মানুষ, জানোয়ার, গাছপালাগুলিকে ঝলসাইয়া আধসিদ্ধ করিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া দিল। ও সব দেশের লোকের যেমন কপাল! নিজের দেশ ছাড়িয়া পালাইবারও ত' উপায় নাই। আমাদের দেশে এখন ও সব উপদ্রব নাই, তাই রক্ষা, কিন্তু তোমরা আজ না জন্মিয়া যদি অন্ততঃ ন'-দশ কোটি বছর আগে জন্মাইতে তাহা হইলে তোমাদেরও ঐ রকম আগ্নেয়গিরির পাড়াতেই বাস করিতে হইত।

এই ত' মোটে বিশ কোটি বছর আগেকার কথা। এখন যেখানে লোকে হাউস্‌বোটে ঝিলামের হাওয়া খাইয়া বেড়ায়, যে দেশের আশেপাশে মাথায় তুষারের পাগড়ী-পরা পাহাড়ের চূড়াগুলা দিনরাত উঁকি মারে, যে দেশের টুকটুকে ছেলে-মেয়েরা তাজা তাজা ফল খাইয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়, বর্ত্তমানের সেই কাশ্মীর রাজ্যে (তখন অবশ্য না ছিল রাজ্য, না ছিল তার রাজাপ্রজা, মানুষ তখনও পৃথিবীতে জন্মায় নাই) হঠাৎ একদিন দৈত্যের মত দেখা দিল এক বিরাট্ আগ্নেয়গিরি। এক ফুঁয়ে যেন পৃথিবীর মাটির খানিকটা চৌচির করিয়া ফাটাইয়া দিয়া সে চারিদিকে ছড়াইয়া দিল মাটি-পাথরের গুঁড়া আর টুক্‌রা। ছাইয়ের মত সেগুলি আকাশ ছাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আগ্নেয়গিরির ভস্মে কাশ্মীরের সারা বুক ঢাকা পড়িয়া গেল। তার পর সুরু হইল তার তরল পাথর ঢালা। মাটির ভিতরকার কোথা হইতে যেন আসিয়া গরম কালো বেসল্ট পাথর গল্‌গল্ করিয়া পাহাড়ের মুখ দিয়া চারিদিকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আশ-পাশের মাটি কাঁপাইয়া, আকাশ, বাতাস ভয়ঙ্কর করিয়া আগ্নেয়গিরির তাণ্ডবলীলা চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এম্‌নি করিয়া থাকিয়া থাকিয়া কাশ্মীরের এই আগ্নেয়গিরি ভস্ম-বেসল্ট বমি করিতে লাগিল। তার পর একদিন আবার সে

যেন হাঁপাইয়া পড়িল। ক্রমে নিস্তেজ হইতে হইতে শেষে একেবারে সে নিষ্প্রাণ হইয়া গেল। তার অগ্ন্যুৎপাত শান্ত হইল। কিন্তু সে সারা কাশ্মীরের উপর রাখিয়া গেল বেসল্ট-ভস্মের এক গালিচা—সেই তার কীর্ত্তির চিহ্ন। আজও কাশ্মীর-স্বর্গোদ্যানে পির পঞ্জলের বুকে, জানস্কার গিরিশ্রেণীতে, এখানে ওখানে কালো কালো বেসল্ট পাথর আর ভস্ম-পাথর কাশ্মীরের সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে করাইয়া দেয়।

পৃথিবীর ভিতরের দুরন্ত দৈত্যটা বুঝি শান্ত থাকিতেই জানে না। কাশ্মীরের এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড শেষ হইতে না হইতে, এখনকার বাংলার পাশে পৃথিবীর গায়ে আবার এক ফাটল ধরিল; বেসল্টের স্রোতও যেন ফাঁক পাইয়া পৃথিবীর নীচে হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। এখন বিহারের ধারে যেখানে দক্ষিণ দিকে এক মোচড় খাইয়া গঙ্গা আসিয়া বাংলায় পড়িয়াছে সেখানে একদিন—প্রায় পনের কোটি বছর আগে—দেখিতে না দেখিতে আগ্নেয়গিরির আড্ডা হইয়া উঠিল। কাশ্মীরের অগ্নিকাণ্ডের পালা যেন নূতন করিয়া আবার এখানে সুরু হইল। সেই বেসল্ট-গলা ঢালা আর ভস্ম ছড়ান। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়া ফের স্রোতের পর পাথরের স্রোত চলিতে লাগিল। কিন্তু পৃথিবীর ভিতরের দৈত্যটা এবার যেন একটু দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে। কাশ্মীরের বেলা আগ্নেয়গিরির যে ভীষণ দুরন্ত মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল এবারকার আগ্নেয়গিরি যেন তার চেয়ে শান্ত, জোর কম তার। কিন্তু জোর কমই হোক কি বেশীই হোক, আগ্নেয়গিরি যে সে চিরকালই তাই—বাংলা-বিহারের মাঝখানটা যেন সুমাত্রা যবদ্বীপের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। থাকিয়া থাকিয়া আগ্নেয়গিরি সজাগ হইয়া উঠে—মাটি কাঁপাইয়া গলগল করিয়া কালো কালো বেসল্ট বমি করিতে থাকে; গাছপালা জীবজন্তু সব ভয়ে, বেসল্টের চাপে ছাইমাটির তলে পড়িয়া মরিতে থাকে, তার পর আবার কিছুদিন আগ্নেয়গিরিগুলি ঘুমাইয়া পড়ে। পৃথিবীর গাছপালা, জীবজন্তু তখন আবার চারিদিকে তাদের আস্তানা গাড়ে। তার পর আবার হঠাৎ কোন একটা আগ্নেয়গিরি সামান্য একটু সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিয়া দৌরাত্ম্য সুরু করে। বেসল্ট-ভস্মের তলে আবার আশ-পাশের জীবজন্তুর, উদ্ভিদের সব চিহ্ন মুছিয়া যায়। এমনি করিয়া বছরের পর বছর কাটিতে লাগিল।

ক্রমে দিনে দিনে আগ্নেয়গিরিটা যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে শেষে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সেই যে ঘুমাইয়াছে, আজও সে ঘুমাইয়াই আছে, তার আর কোন সাড়া নাই। এখন ত' আর তার কাছে যাইতে ভয় নাই? যদি ইচ্ছা কর ত' রাজমহল

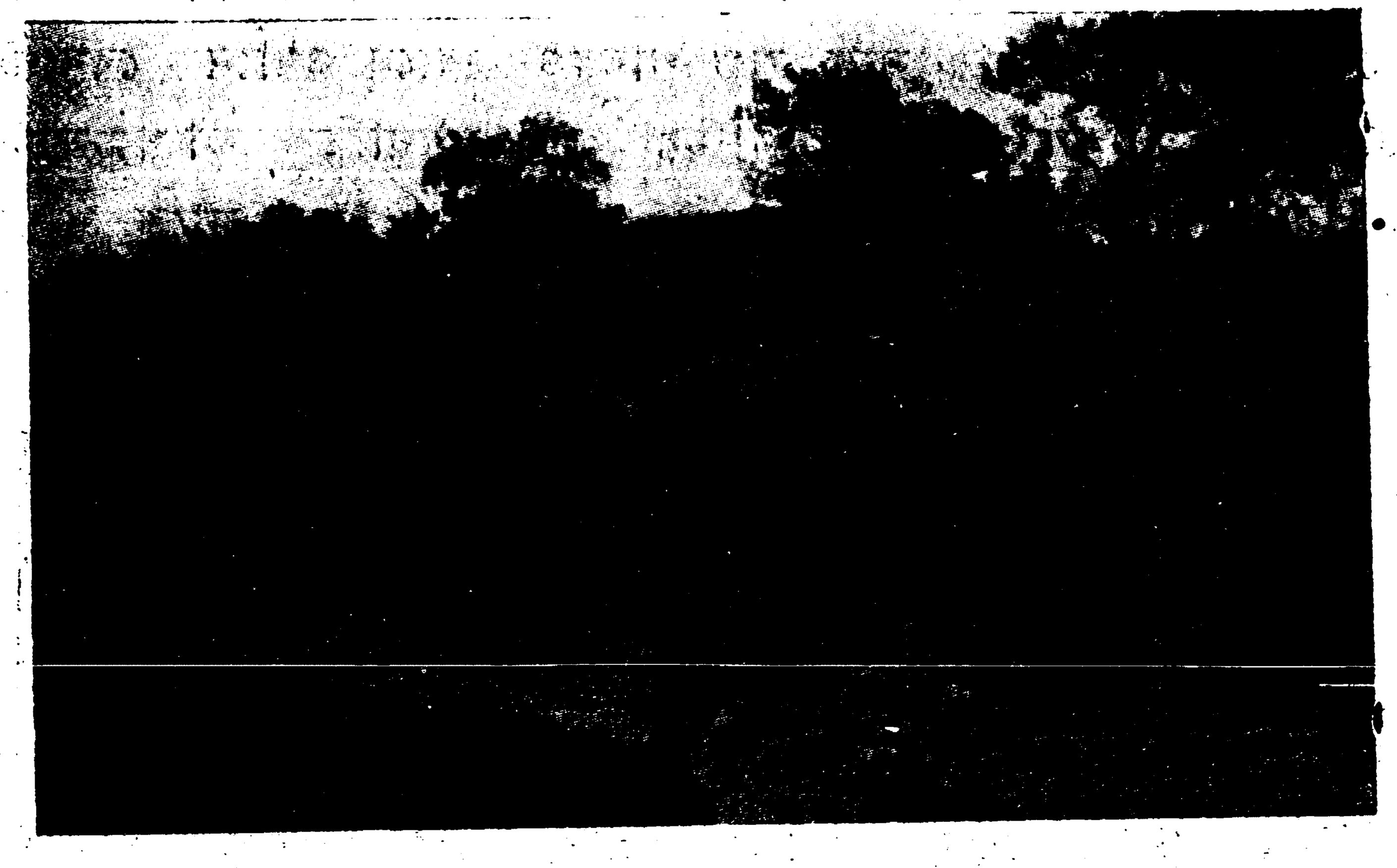

রাজমহলে বেসল্টের পাহাড়—জমাট বাঁধিবার সময় ঐ রকম চমৎকার পাঁচ ছ'-কোণা থামের আকারে ফাটিয়া গিয়াছে।

পাহাড়ে বেড়াইয়া এস, সেখানকার ভস্ম আর বেসল্ট পাথরের পুরানো একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিকে দেখিতে পাইবে।

কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনের সব চেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি এদের চেয়ে অনেক অল্প বয়সের। বেশী নয়, ন'-দশ কোটি বছরের কথা। এবার আর কাশ্মীরেও নয় বা বাংলার ধারেও নয়, একেবারে বোম্বাইয়ের পাশে, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম গায়ে। এ যেন মানুষের গায়ে ফোঁড়ার মত। কপালেরটা শুকাইতে না শুকাইতে বুকে, আবার বুকেরটা শুকাইতে না শুকাইতে কোমরে।

এবারকার ব্যাপারটা কিন্তু একটু নূতন রকম। এবার আর কোন একটা পাহাড়ের মুখ দিয়া পাথর ঢালা নয়, এবার লম্বালম্বি ফাটলের ভিতর হইতে

বেসল্টের স্রোত বাহির হইতে লাগিল, আজকাল আইস্‌ল্যাণ্ডে নাকি যেমন হয়। তবে আইস্‌ল্যাণ্ডের ফাটল, অগ্ন্যুৎপাত দাক্ষিণাত্যের এ পুরানো দৌরাত্ম্যের কাছে নেহাৎই সামান্য।

এবারকার অগ্ন্যুৎপাতে ছাইয়ের উপদ্রব আর তত ছিল না। কেবল বেসল্ট আর বেসল্ট। অবশ্য তার সঙ্গে অন্য পাথরও এখানে ওখানে বেসল্টের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। থামিয়া থামিয়া সেই সাংঘাতিক আগ্নেয় ফাটলগুলির মধ্য হইতে পাথরের স্রোত নামিতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে তারই ফাঁকে

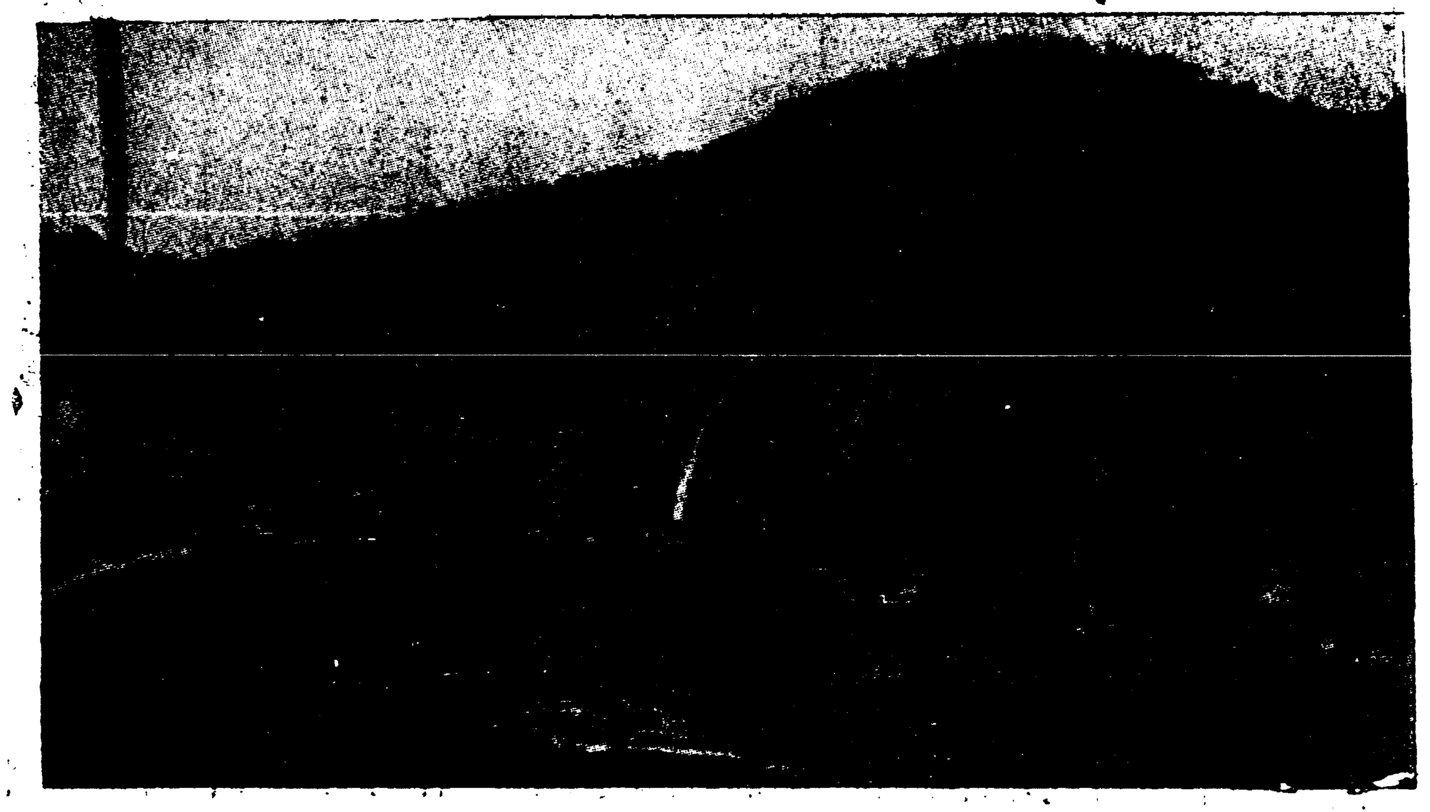

দাক্ষিণাত্যে বেসল্টের পাহাড়—পাহাড়-গায়ে যে গর্ত্তগুলি দেখা যাইতেছে ওগুলি অজন্তা-গুহার প্রবেশপথ। এই বেসল্ট পাথর কুরিয়াই পৃথিবীর ঐ অপূর্ব্ব গুহাগুলি খোদাই করা হইয়াছে।

জীবজন্তু, গাছপালা আসিয়া আশেপাশে বসবাস করিতে লাগিল। এই সব পাথর, আর এই সব গাছপালা জীবজন্তুর চিহ্ন আজও দাক্ষিণাত্যের বহু জায়গায় দেখা যায়। কত ব্যাঙ, ফড়িং জাতের জীব, শেঁড়িগুগ্‌লি প্রভৃতি প্রাণী এবং আরও কত কি যে এই সব বেসল্টের স্রোতে পড়িয়া মারা গিয়াছে তার আর ইয়ত্তা নাই। এই বেসল্টের দৌরাত্ম্য যে কত দিন চলিয়াছিল আর কত দূরদূরান্তর পর্য্যন্ত যে

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তার কতকটা ধারণা তোমরা করিতে পারিবে এই হইতে যে বোম্বাই উপকূলের এক জায়গায় এই বেসল্ট পাথরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে অন্ততঃ সে জায়গায় দশ হাজার ফুট গলা-বেসল্ট জমিয়া পাথর হইয়া আছে। এক এক ঝলকে আগ্নেয় ফাটল হইতে গড়ে প্রায় ৫০ ফুট করিয়া বেসল্ট আসিয়া জমিয়াছে, আর ২ লক্ষ বর্গ মাইল জুড়িয়া কচ্ছ দেশ, কাথিয়াওয়াড়, গুজরাট্, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি দেশে—এমন কি গোদাবরী নদীর ধারে রাজমহেন্দ্রীতে, ছোট নাগপুরে পর্য্যন্ত এই বেসল্টের পাহাড় দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভীষণ ও বিরাট্ অগ্ন্যুৎপাত আর কখনও কোথাও হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

দাক্ষিণাত্যের এই যে আগ্নেয়গিরির দৌরাত্ম্য, এই-ই ভারতবর্ষে আগ্নেয়গিরির এক রকম শেষ উৎপাত। তার পর হইতে ভারতবর্ষে আর এ সব ভয়ঙ্কর জিনিষের দেখা পাওয়া যায় নাই। এদের কত পরে ভারতবর্ষে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তাদের বংশধর আমরা আজ স্বচ্ছন্দে, আর এক রকম নিশ্চিন্তে এখানে দিন কাটাইতেছি। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ যে যদি এই সব প্রতিবাসী নিয়া আমাদের আজ ঘর করিতে হইত তাহা হইলে কেমনটি হইত!

দস্যুর দলে ভোমরা

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

১

কালো রঙের মোটর

সেদিন, সেই চৈত্র মাসের বিকেলবেলায়, ভোমরা বই-খাতা হাতে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে এমন সময় হঠাৎ অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘ'টে গেলো।

ভবানীপুরের ইস্কুলে থর্ড কেলাসে পড়ে ভোমরা। বয়েস বারো, দেখতে

আরো ছোট দেখায়। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল যখন-তখন কপালে এসে পড়ছে; আর যখন-তখন কাকাবাবু হাঁক দিয়ে বলছেন: 'ওরে ভীমরুল, তোর মাথাটা যে আস্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত হ'য়ে উঠলো, চুল ছাঁটবি না?' সত্যি কথা, প্রায়ই ভোমরার চুল ছাঁটা হয় না। নাপিতের কাঁচির কথা ভাবলেই সমস্ত শরীর তার শিউরে ওঠে। রবিবার সকালে বাড়িতে নাপিত আসে, রবিবারের সারা সকাল বাড়ির কেউ তাকে চোখে দেখে না। কোথায় লুকিয়ে থাকে কে জানে! হয়তো ঝিরিঝিঁদের বাড়ি গিয়ে পিং পং খেলে, হয়তো ছাতের চিলকোঠার আড়ালে লুকিয়ে রোমাঞ্চকর য্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়ে। পড়ে আর ভাবে—আহা, আমার জীবনে এ রকম কিছু হয় না! খবরের কাগজে সে ছবি দেখেছে হিমালয়ের চূড়ায়-চড়া সায়েবদের—লম্বা-লম্বা চুলে দাড়িতে মুখ প্রায় দেখাই যায় না—আহা, কী সুখী ওরা, চুল ছাঁটবার হাঙ্গামা নেই।

এদিকে ভোমরার কাকাবাবুর ধারণা যে মাসে অন্ততঃ দু'বার চুল না ছাঁটলে মাথার বুদ্ধি-সুদ্ধি সব নষ্ট হ'য়ে যায়। কী হয় জানো? চুল বড় হ'তে হ'তে মগজের রস সব শুষে নেয়; মগজটা শুকিয়ে অনেকটা ঘুঁটের মত হয় যখন, তখনই তো ছেলেরা পরীক্ষায় ফেল করে আর তুরস্কের রাজধানী কোথায় জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় 'কোটোপাক্সি।' মেয়েদের কিছু হয় না, কারণ তাদের চুল নীচের দিকে বাড়ে। ভোমরা অবশ্য পরীক্ষায় এখন পর্য্যন্ত ফেল করে নি, তবে তার কাকাবাবু ব'লে দিয়েছেন যে আরো ঘন ঘন নাপিতের কাঁচির নীচে মাথা পেতে না দিলে সামনের বারে ফেল করা তার অনিবার্য্য। কথাটা ভোমরার ঠিক বিশ্বাস হয় না, তবু মনে মনে তার একটু ভয় হয়। ভয় ফেল করবে ব'লে নয়, ভয় কাকাবাবুকে। কাকাবাবু ভারি কড়া লোক; সমস্ত বিষয়ে নিখুঁৎ নিয়ম মেনে চলেন, এবং নিয়ম মানে অবশ্য তাঁর নিজের ইচ্ছা। আইনের পেশায় তিনি নাকি একজন ওস্তাদ; এবং নিজের বাড়িতে আইন জাহির করতেও তাঁর ওস্তাদি কম নয়। ছ'টার সময় উঠবে, দশটার সময় খাবে, সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা পড়াশুনা করবে—ঘড়ির মুখের দিকে তাকাতে তাকাতেই দিনটা কেটে যায়। ভোমরার দুই খুড়তুতো ভাই আছে, নন্দ আর বসন্ত, তারা পড়ার টেবিল সাজিয়ে গুছিয়ে

ঝকঝকে ক'রে রাখে, দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে লাল-কালো কালিতে বিচিত্র ছক-কাটা রুটিন—বাপ দেখে ভারী খুসি। এদিকে টেবিলের উপর মাথা গুঁজে তাস পেটাপেটি চলে, বাইরে পায়ের শব্দ হ'লেই য়্যাটলাস খানা টেনে তাসের উপর চাপা। সঙ্গে সঙ্গে উঁচু গলার আওয়াজ শোনা যায়: 'Two sides of a triangle are together greater than the third side.' বসন্ত ফেল করতে করতে ক্যাঁ-কোঁ ক'রে এবার ম্যাট্রিকুলেশন কেলাসে উঠেছে; সে বলে—ম্যাট্রিক পাশ ক'রে হবে ছাই, সে হবে ছবি-আঁকিয়ে। নন্দ পড়ে ভোম্‌রার এক কেলাস নীচে, সে অতি নিরীহ গোছের ভালোমানুষ, খেটে-খুটে মেজে-ঘ'ষে পরীক্ষা পাশ করবে, এর চেয়ে উঁচু কোন আশা নেই তার মনে।

ভোমরার বাবা ছিলেন খোলা মেজাজের মানুষ। বেড়াও, গল্প করো, চিৎ হ'য়ে শুয়ে বই পড়ো—অনেকটা এই রকম ছিলো তাঁর মনের ভাব। শচীকান্ত (অর্থাৎ ভোমরার কাকাবাবু) তো তার মাকে প্রায়ই বলেন: 'বৌঠান, অতিরিক্ত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে তোমরা নষ্ট করেছো।'

ভোমরার মা হেসে জবাব দেন: ছোট ছিলো—আদর দেবার তো সেটাই সময়।'

শচীকান্ত চোখ কপালে তুলে বলেন: 'বলো কী! ছেলেবেলা থেকে শাসন না করলে—' এর পরে এক গম্ভীর বক্তৃতা।

ভোমরার বাবা মারা গিয়েছিলেন হঠাৎ। পাটনায় প্রোফেসার ছিলেন তিনি। পাটনা ছেড়ে তারা কলকাতায় যাচ্ছে কাকাবাবুর বাড়িতে থাকতে এ খবর প্রথম শুনে ভোমরা খুব খুসিই হয়েছিলো। পাটনার জন্যে তার একটু একটু মন খারাপ লাগছিলো তা ঠিক, কিন্তু কলকাতার কাছে কি পাটনা! আর প্রথম এসে সে তো প্রায় পাগলই হ'য়ে গেলো। উঃ, ট্র্যামে চড়ার মত মজা নাকি আর কিছু! তাদের বাড়ি থেকে ট্র্যাম দেখা যায় না, একা তার বেরুনোও বারণ—কবে কে দয়া ক'রে নিয়ে যাবে সেই আশায় ধন্না দিয়ে প'ড়ে থাকা। সত্যি, ছোটো ছেলেদের মত কষ্টের জীবন আর কারো নয়। কিন্তু অন্য লোকগুলোই বা কী—ইচ্ছে করলেই তারা ট্র্যামে চড়তে পারে, কেউ বারণ করবে না, কারো কাছে পয়সা

চাইতে হবে না—তবু কিনা তারা চুপচাপ বাড়িতে ব'সে থাকে। সত্যি, এমন অদ্ভুত !

ভোমরার কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হ'তে বেশী দেরি হ'লো না। সে পথ-ঘাট চিনলো, রবিবারে অল্‌ডে টিকিট কিনে সমস্ত সহর ঘুরে ঘুরে দেখলো, তার পর ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'লো. তার পর এখন তাকে মেটিয়াবুরুজ থেকে বরানগর পর্য্যন্ত যেখানে হোক্ একবার যেতে বলো না ! তা কাকাবাবুর বাড়িতে তার এমন মন্দ লাগছিলো কী ! ইস্কুলে তার ভালোই লাগে, বন্ধু জুটেছে বিরিঞ্চি, তার সঙ্গে খুব ভাব। কাকাবাবু রোজ রোজ নতুন নতুন আইন জারি করেন বটে, তা তিনি তো আর সব সময় বাড়ি ব'সে থাকেন না, আর তা ছাড়া, দিনটা তো ইস্কুলেই কাটে। সবই এক রকম ভালো, শুধু মা যখন পিছন পিছন ঘুরে ঘুরে বলেন, 'শোন্, কাকাবাবুর অবাধ্য হোস্‌নে কিন্তু, কাকাবাবু যা বলেন তা-ই করবি', তখন এত বিরক্ত লাগে যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েই পড়তে ইচ্ছে করে।

এখন শোনো। সেদিন, সেই চৈত্র মাসের বিকেলবেলায় ভোমরা তো ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে। রোজ যেমন হয়, তেমনি সব ঠিক ঠিক হ'য়ে যাচ্ছে: রাস্তায় জল দেয়া হচ্ছে, চানাচুর, সাড়ে-বত্রিশ ভাজা ফিরি হচ্ছে চড়া গলায়, খুব ছোট ছেলেমেয়েরা এরই মধ্যে পার্কে আসতে আরম্ভ করেছে, ফুরফুর ক'রে হাওয়া বইছে। বিরিঞ্চি আর সে রোজই প্রায় একসঙ্গে ফেরে, আজও ফিরছিলো। দু'জনের বাড়ি কাছাকাছি। বিরিঞ্চির বাপ মস্ত জমিদার, এতদিন সে বাড়ির গাড়িতেই যাওয়া-আসা করেছে—তবে এখন বড় হয়েছে কিনা, তাই লজ্জা করে; আর তা ছাড়া, প্রকাণ্ড গাড়ির মধ্যে চ্যাপ্টা হ'য়ে ব'সে যেতে-আসতে ভালোও লাগে না আর। দিব্যি হাওয়া খেতে-খেতে গল্প করতে-করতে হাঁটতেই তো মজা।

কাল শনিবার। ম্যাটিনিঁতে যাবে পাড়ার সিনেমায় আফ্রিকার জংলি ছবি দেখতে, তারই গল্প করতে করতে আসছে দু'জনে। বড় রাস্তা পার হ'য়ে বিরিঞ্চিদের বাড়ি আগে, তার পর একটু দূর গিয়েই ডান দিকে যে রাস্তা তার মোড়ের বাড়িটাতেই ভোমরার এম্-এ বি-এল্ কাকাবাবুর নাম শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা।

কাল বাড়ি থেকেই পয়সা নিয়ে বেরোবে, এবং ইস্কুল থেকে সোজা চ'লে যাবে সিনেমায়, এই রকম ব্যবস্থা ঠিক ক'রে বিরিঞ্চি তো ঢুকলো গিয়ে তার বাড়িতে। খুব ফূর্ত্তিসে হাত দোলাতে দোলাতে ভোমরা চলেছে, হঠাৎ তার চোখে পড়লো কালো রঙের প্রকাণ্ড এক মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথ ঘেঁষে। বাপ্‌স্, কী জমকালো গাড়িখানা। বিরিঞ্চিদের বাড়িতেই কেউ এসেছে বোধ হয়। কী গাড়ি এটা? হিলম্যান-মিঙ্কস্? মরিস? শেভ্রোলে। ভোমরার একটা নতুন সখ চেপেছে মোটরগাড়ি; কোন্‌টা কি গাড়ি জানতে হবে, চেহারা দেখে ব'লে দিতে হবে। তাই সে করলে কী, গাড়ির গায়ে সামনের দিকে যে নাম লেখা থাকে তা-ই পড়বার জন্যে যেতে যেতে একটু গলা বাড়িয়ে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে গেলো, একজন লোক ভেতর থেকে বললে: 'এ রাস্তার সাতাশ নম্বর বাড়ি কোনটা জানেন?'

'আপনি' শুনে অত্যন্ত খুসি হ'য়ে গেলো ভোমরা। তাড়াতাড়ি জবাব দিলে: 'ঐ তো সোজা গিয়ে বাঁ হাতি।' হুঁঃ—এ পাড়ার কোন্ বাড়ি সে না চেনে! জমকালো মোটরে-চড়া সব লোক তার কাছে রাস্তা জিজ্ঞেস করে, তাও 'আপনি' বলে দস্তুর মত। আছো কোথায়!

'আমরা তো অনেক ঘুরে ঘুরেও খুঁজে পেলাম না।'

গাড়ির ভিতর থেকে আর একজন বল্‌লে: 'আপনি একটু কষ্ট ক'রে আমাদের সঙ্গে—'

এ আর বেশী কথা কী! নিশ্চয়ই। জমকালো গাড়িখানা চড়াও হবে একটু। ভোমরা খুব গম্ভীর ভাবে বললে: 'চলুন আপনাদের বাড়িটা দেখিয়ে দিই।' ব'লে উঠে বসলো গাড়িতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথা ঘুরে উঠলো।

কোন মোটর গাড়ি এত জোরে ছুটতে পারে তার ধারণা ছিলো না। দেখতে-না-দেখতে গাড়ির সব দিক্ পুরু কালো পরদায় ঢেকে গেলো, আর তার দুদিকে দু'জন প্রচণ্ড শক্ত মুঠিতে তার হাত চেপে ধ'রে বলছে: 'একটু নড়েছো কী মরেছো।' সেই আবছা অন্ধকারে দু' জনের মুখই অতি ভয়ানক দেখালো। এদিকে সেই অল্প দু' চার মিনিটেই গাড়ি কোথায় কতদূর চ'লে গেলো কে জানে!

আর উপায় নেই। ভোমরা প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠলো, কিন্তু তার মুখ দিয়ে বিকৃত অদ্ভুত একটা আওয়াজ ছাড়া কিছু বেরুলো না। একজন শক্ত ক'রে তার মুখ চেপে ধরেছে—বাস্ রে, লোকটার গায়ে কী জোর! আর একজন দ্রুত নিপুণ হাতে মোটা একটা কাপড় তিনবার ঘুরিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেললো। প্রথম লোকটি বললে : 'হাত-পাগুলোও বেঁধে ফেল্।'

আর একজন বললে : 'না, থাক্, লাগবে না। কী বলিস্ রামকানাই?'

শেষের কথাটা যে তারই উদ্দেশে বলা তা বুঝতে ভোমরার সময় লাগলো। দ্বিতীয় লোকটি তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে টেনে বললে : 'কী রে, হাত-পা ছুঁড়বি? না কি বেঁধে ফেলবো?'

মুখ তিনমোড়া বেঁধে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাটা ভোমরার কাছে চুল ধ'রে টানার চেয়েও অন্যায় মনে হ'লো। হোঃ, মুখ খোলা থাকলে অমন দু' একটা রসিকতা আমিই যেন না করতে পারি!

দ্বিতীয় লোকটি তাকে একটু টিপে-টুপে বললে : 'নাঃ, ঠিক আছে। নড়বে চড়বে না। হাত ধ'রে থাক্ শক্ত ক'রে।'

'ইস্, আমি যেন একটা পাঁঠা, ওঁরা টিপে-টুপে দেখছেন ঠিক কেনবার মত কি না।' মনে মনে বললে ভোমরা। মনে মনে অত্যন্ত চটে গেলো সে।

লোক দুটোর মুঠোর চাপে তার হাত রীতিমত ব্যথা হ'য়ে গেলো, কিন্তু কিছু তো বলবার উপায় নেই! ভালোভাবে বললেই হ'তো, না হয় আর চেঁচাতুম না। এ সব জবরদস্তি কেন? ভাবতে ভাবতে ভোমরার মনে হ'লো লোক দুটো বোধ হয় গুণ্ডা। কথাটা মনে হওয়া মাত্র ভারী অবাক্ লাগলো তার। গুণ্ডা! সত্যিকারের গুণ্ডা। গল্প নয়, ফিল্ম্ নয়, তার দু'দিকে আস্ত দুই গুণ্ডা ব'সে। ভারী মজা তো! ভালো ক'রে সে দু'জনের মুখের দিকে তাকালো—চোখ দুটো তার খোলা আছে ভাগ্যিস। ততক্ষণে গাড়ির আবছা অন্ধকার তার স'য়ে এসেছে, এবারে সে লোক দুটোকে ভালো ক'রে দেখতে পেলো। যতটা ভেবেছিলো, ততটা ভয়ানক নয় তো। একজনের দাড়িগোঁফ কামানো, ভাতের থালার মত প্রকাণ্ড মুখ, শরীরটাও বেশ জোয়ানের মত। আর একজনের খোঁচা-খোঁচা গোঁফ,

নাকটা থ্যাবড়া, মাথার সামনের দিকে টাক পড়েছে—সবসুদ্ধ মুখখানা এমন যে একটু তাকিয়ে থাকলে হাসিই পায়।

গদিতে ঠেস দিয়ে (গাড়িখানা আরামের, যা-ই বলো) ভোমরা অনুমান করবার চেষ্টা করলো গাড়িখানা কোন্‌দিকে যাচ্ছে। অসম্ভব। এতই মসৃণ ভাবে চলেছে গাড়ি যে গতিটাও আর ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো তাকে নিয়ে চলেছে বাগবাজার, হয়তো তিলজালা, হয়তো বাজে শিবপুর। বাইরেটা কিছু দেখা তো যাচ্ছেই না, এমন কি, গাড়ি যে চালাচ্ছে সে-ও রয়েছে পরদার ওপিঠে। ঠিক যেন ঘোরতর পরদানশীন মহিলা চলেছেন, এমনি ভাব গাড়িখানার। তবে ট্র্যাম-বাস্-এর শব্দ শোনা যাচ্ছে থেকে-থেকেই। যাক্, কোথায় আর নেবে, কলকাতার মধ্যেই তো!

ভোমরার মনে হ'তে লাগলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে চলেছে এই গাড়িতে। বাপ্‌স্, পথ কি আর ফুরোতে নেই! তার পর তার মনে হ'লো ট্র্যাম-বাস্-এর আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। মনে হ'লো, গাড়ি বার বার মোড় ফিরছে। গলিঘুঁজি তো হবেই—গুণ্ডার আড্ডা। গাড়ি এবার আস্তে আস্তে চলেছে, এলো বুঝি। গুণ্ডাদের আড্ডা সত্যি সত্যি চোখে দেখতে পাবে ভাবতে ভোমরার মন ভয়ানক চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

বললে গোঁফওয়ালা : যা'ক্, খুব একটা বাজিমাৎ হ'লো।'

দাড়িগোঁফকামানো বললে : 'পাণ্ডাজী এখন বখশিষটা ভালো দিলেই হয়।'

গোঁফওয়ালা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে : 'আমাদের কি আর তেমন বরাত ভাই। যত খাটি যত হাঁটি বরাদ্দ ঐ শুকনো আঁটি।'

দাড়িগোঁফকামানো গম্ভীর ভাবে বললে : 'পাণ্ডাজী, সামলে চলো। নয়তো দেবে একদিন সব ফাঁস ক'রে। এই হরেকেষ্ট, তুই হাঁ ক'রে কী গিলছিস রে?'

তাদেরই ব্যবস্থায় তার পক্ষে যে বর্ত্তমানে হাঁ করা সম্ভব নয়, এবং তার নাম যে না রামকানাই না হরেকেষ্ট, এই দুটো কথা ভোমরা মনে মনে খুব তীব্রভাবেই কয়েকবার বললে। একটু পরেই গাড়ি থামলো।

দুই গুণ্ডা তাকে দু' হাতে ধ'রে নামালো গাড়ি থেকে। আরে, এ কোথায়

এলো। একটা বাড়ির সান-বাঁধানো উঠোনেই গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে। সেকেলে চকমিলান বাড়ির মত যে! মাঝখানে উঠোন আর চারদিকেই... কিন্তু ভালো ক'রে সে কিছু দেখতে পেলো না, ওরা দু'জন তাকে জোর ক'রে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলো আঁকাবাঁকা সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। পলকের জন্য শুধু একবার চোখে পড়েছিলো চওড়া ফটক মত—তার পরেই রাস্তা, কিন্তু এ যে কোন্ রাস্তা, এবং এ রাস্তা যে কলকাতার কোন্ পাড়ায় সে বিষয়ে ভোমরা ঠিক ততখানিই ধারণা করতে পারলো, যতটা সে ধারণা করতে পারে মঙ্গলগ্রহের কোন্ খাল কোন্ কোন্ জেলার ধার দিয়ে কোন্ নদীতে গিয়ে পড়েছে।

দোতলায় উঠেই একটা ছোট খুপরিতে তাকে ঢোকানো হ'লো। সে ঘরে একটি মাত্র জান্‌লা, তা দিয়ে যে অল্প আলো আসছে, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে বাইরে এখনো দিনের আলো। গোঁফওয়ালা বললে—'আমি থাকি এখানে, তুই যা পাণ্ডাজীকে ডেকে আন্।'

দাড়িগোঁফকামানো গেলো চ'লে। হঠাৎ মা-র কথা মনে প'ড়ে ভোমরার এমন মন খারাপ হ'য়ে গেলো যে চোখে প্রায় জল এসে পড়ে আর কি। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে, পাছে গুঁফোটা দেখে ফেলে!

একটু পরে বাইরে চটিজুতোর ফটফট শব্দ হ'লো। পাগুলা ফর্সা, একটি লোক ঘরে ঢুকলো, পায়ে তাঁর হরিণের চামড়ার চটি, পরনে সবুজ সিল্কের লুঙ্গি, দিব্যি বাবুটির মত দেখতে। তার পিছনে সেই দাড়িগোঁফকামানো ভীমচন্দ্র।

বাবুগোছের লোকটি ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো—'এ কী, এ কাকে ধ'রে এনেছিস্?'

কী গলা লোকটার! মোটে চেঁচায় না, তবু যেন গুমগুম করে।

(ক্রমশঃ)

সেকালের ছেলেদের লিখিতে শেখা

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এস্‌-সি, বি-ই-এস)

তোমার হাতে-খড়ির দিনটি মনে পড়ে কি? দোকান হইতে শ্লেট আসিল, পেন্সিল আসিল—কত ঘটা করিয়া তুমি লিখিতে বসিলে। তার পর দু'দিন যাইতে না যাইতেই দরকার পড়িল রুল-টানা খাতার, ব্ল্যাক্ কালির আর ষ্টিলপেনের। ষ্টিলপেন দিয়া লিখিতে লিখিতে বার-বারই কিন্তু তুমি আড়চোখে তাকাইয়াছ বাবার হাতের, অথবা দাদার হাতের ফাউণ্টেন পেনটির পানে—বাস্তবিক, অমন একটি কলম না হইলে কি চলে? আফশোস্ও বেশী দিন করিতে হয় নাই, শীগ্‌গিরই ফাউণ্টেন পেনও জুটিয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সেকালে, অর্থাৎ বছর পঞ্চাশেক আগে, পড়ুয়ারা প্রথম কি ভাবে লিখিতে শিখিত তা শুনিতে কিন্তু তোমাদের ভারী মজা লাগিবে। আজকাল ইস্কুলে লেখা সুরু হয় বোর্ড এবং খড়ির সাহায্যে; সেকালে পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায় এ সব সামগ্রী বড় কেউ চোখে দেখে নাই। পড়ুয়ার প্রথম লেখনী ছিল রামখড়ি আর কাগজ মা মেদিনী। "রাম"খড়ি বুঝিতে ইয়া নধর আকারের একখানি চক্ বা সাদা খড়ি ঠাওরাইওনা যেন। ও বস্তুটা খড়িই নয়—ডাংগুলি খেলার গুলি তো দেখিয়াছ, এক টুকরা নরম পাথরকে ঘষিয়া ঘষিয়া ঠিক সেই রকম একটি গুলির আকারে আনা হইত। তার পর গুরুমশাই ঘরের মেঝের উপর বড় বড় অক্ষরে অ আ ক খ ইত্যাদি লিখিয়া শিষ্যের হাতে "রামখড়ি"টি দিতেন, শিষ্য সেই অক্ষরের উপর যথাযথ ভাবে

দাগ বুলাইয়া মক্স করিতে থাকিত। অবশ্য গুরুমশাইকেও সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দাগ বুলাইবার কায়দাটুকু শিখাইয়া দিতে হইত। এই গেল প্রথম পর্য্যায়।

তার পর দ্বিতীয় পর্ব্ব। পড়ুয়ার হাত খানিকটা রপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এইবার তাকে আর একটু উঁচু স্তরে অধিকার দিতে হইবে, অর্থাৎ সে "রামখড়ি" হইতে "পাত্ত-তাড়ি"তে প্রোমোশন পাইবে। চার-চারটি জিনিষের এবার প্রয়োজন; প্রথমতঃ, লেখার কাগজখানা মা ধরিত্রীর চেয়ে কিছু ছোটখাটো হওয়া চাই, যাতে পড়ুয়া সেটি বগলদাবা করিয়া ইচ্ছামত এখানে-ওখানে যাওয়া-আসা করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ লেখনীটিকেও একটু 'ভদ্রস্থ' করা চাই। বাকী জিনিষ ছুইটি সম্পূর্ণ নূতন, "রামখড়ি"র ক্লাশে পড়ুয়ার হাতে সেগুলি দেওয়া হয় না। কালি আর দোয়াতের কথা বলিতেছি।

পড়ুয়ার জন্য নূতন ধরণের কাগজ তৈরী হইবে—সে এক মহা উৎসাহের ব্যাপার। গ্রামের সব চেয়ে বড় পাতা-ওয়ালা তালগাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে পুকুরের জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। কিছু দিন জলে পচাইলে পাতাগুলি হইবে দিব্যি টেঁকসই। তার পর জল হইতে তুলিয়া আনিয়া পরিষ্কার ভাবে সেগুলি কাটা হইল; এক একখানি পাতার টুকরাকে লম্বায় রাখা হইল দু'হাত আড়াই হাত, চওড়ায় দু'তিন ইঞ্চি। এই পাত-তাড়িই সে আমোলের কাগজ।

এইবার কলমের ব্যবস্থা। সব চেয়ে যেটি সহজলভ্য সেটি হইতেছে কঞ্চির কলম। কিন্তু তা'তে অসুবিধা আছে; কঞ্চির মুখকে কলমের মত করিয়া কাটিতে হাঙ্গামা বিস্তর, ছুরীতে বিলক্ষণ ধার থাকা চাই। কাজেই পড়ুয়ারা বেশী পছন্দ করিত শর গাছের পাব কাটিয়া যে কলম হয় সেগুলিই। সেগুলি কাটাও বেশী শক্ত নয়, আর কঞ্চির কলমের চেয়ে 'আর্টিষ্টিক' বেশী তো বটেই। যারা আরও বেশী ভাগ্যবান্ তারা পাইত পালকের কলম (রাজ হাঁস, ময়ূর প্রভৃতির পাখা হইতে যে কলম হয় তাই)। বলা বাহুল্য, কিছু দিন লেখার পর তিন রকমের কলমই ভোঁতা হইয়া আসিত, আবার তাদের ছুরী দিয়া ছুঁচাল করিয়া লওয়া হইত।

আজকাল কালি পাইতে তোমাদের এতটুকু হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না;

এক-দোয়াত জলের মধ্যে একটা বড়ি (pill) ছাড়িয়া দিলেই হইল। তা ছাড়া তৈরী কালি তো আছেই। কিন্তু সেকালে পড়ুয়াদের কালি তৈরী করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। প্রথমে সংগ্রহ করিতে হইত ভুষা; গৃহস্থ-বাড়ীতে হাঁড়িতে করিয়া ধান সিদ্ধ করার রেওয়াজ ছিল—সেই সব হাঁড়ির তলায় খানিকটা ভুষা (soot) লাগিয়াই থাকিত। সেগুলি চাঁছিয়া আমাদের পড়ুয়া প্রথমে তো খানিকটা ভুষার জোগাড় করিল; তার পর উনানের উপর চাপাইল একটা কড়া বা খোলা, আর সেই কড়াইয়ে ছাড়িল মুঠো খানেক চাল। চাল আধপোড়া হইয়া আসিয়াছে—ব্যস্ চাল এইবার এক ঘটি জল। সেই জলের মধ্যে আধপোড়া চাল খানিকক্ষণ ফুটাইতেই দেখা গেল কেমন একটা কালো আঠাল জিনিষ তৈরী হইতেছে। আমাদের পড়ুয়া এইবার বড় একটা পাথরের বাটীতে খানিকটা ভুষা আর কিছু পরিমাণ আঠাল জল রাখিয়া হাতের সাহায্যে মাড়িতে আরম্ভ করিল। ভুষা আঠাল দ্রব্যগুলির সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গেল না, উপরে উপরে ভাসিতে লাগিল। এতক্ষণে কালি তৈরী হইয়াছে, এবার কলসীতে বা বোতলে সেগুলি তুলিয়া রাখিতে হইবে।

কালি ম্যানুফ্যাক্‌চারের অপূর্ব্ব উপায় তো শুনিলে। দু'তিন জন পড়ুয়া একত্র হইয়া এই ভাবে যখন কালি ম্যানুফ্যাক্‌চারপর্ব্ব সমাধা করিত তখন তাদের হাত পা চোখ মুখের অবস্থা দেখিলে আজকালকার কোন ক্যামেরাম্যানই বোধ হয় একখানা ফটো তোলার লোভ সামলাইতে পারিত কি না সন্দেহ। আরও এক মুস্কিল। সে বেচারারা তো আর 'রামধনু'র পাঠকদের মত সভ্যভব্য ছিল না—সাবানের কথা তারা বইয়েই পড়িয়াছে, গায়ে মাখার সৌভাগ্য প্রায়ই হয় নাই। কাজেই কালিঝুলি মাখিয়া মায়ের সামনে গিয়া দাঁড়াইলে তিনি বাড়াইয়া দিতেন একখানা ভিজা গামছা। তাই দিয়াই মুখ হাত মুছিয়া আবার তারা ভদ্রলোক সাজিত।

এবার মস্যাধার বা দোয়াতের কথা। গ্রামের কুমারই ছেলেমেয়েদের জন্য মাটীর দোয়াত গড়িয়া দিত; তবে সে সব দোয়াতের পিপাসাটা ছিল বড় বেশী। কালি ঢালিলেই চোঁ করিয়া অত-কষ্টে-তৈরী কালির অনেকখানিই শুষিয়া নিত

বেয়াড়া দোয়াত গুলা। পাঠশালায় যাইবার সময় সঙ্গে দোয়াত লইতে হইবে, তা সে বন্দোবস্তও করিয়া দিত গ্রামের কুমারই—দোয়াতের কানায় একটি খাঁজ কাটিয়া দিয়া। সেই খাঁজের গায়ে দড়ি বাঁধিয়া নিলেই হইল। গোল কিন্তু এখনও মেটে নাই; পড়ুয়া চলিতে সুরু করিলেই দোয়াত যে প্রতিমুহূর্ত্তে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া কালি উগ্ড়াইতে থাকে তার কি উপায়? সে উপায়ও ঠাওরান ছিল—দোয়াতের ভিতরে অনেকখানি ন্যাকড়া গুঁজিয়া দেওয়া।

সর্ব্বশেষে পাঠশালাগামী পড়ুয়ার মূর্ত্তিটি একটু ভাষায় আঁকিয়া দিই, শোন।

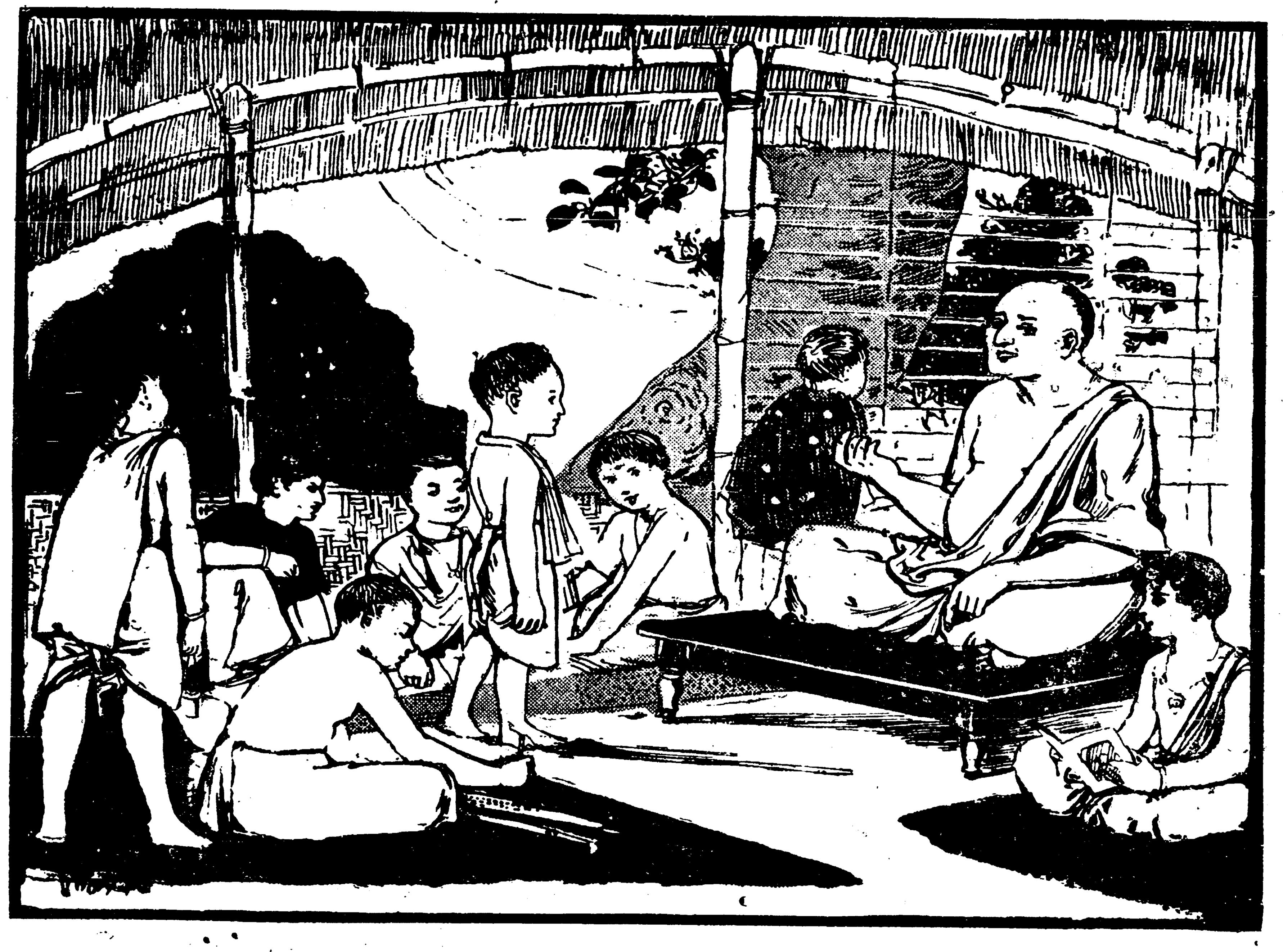

সেকালকার পাঠশালা

কোমর বাঁধিয়া কাপড় পরা; কাপড়ের একটি খুঁটকে থলির আকার দেওয়া হইয়াছে, তাতে আছে এক কোঁচড় মুড়ি; বাঁ বগলে মাদুর দিয়া জড়ান পাততাড়ি আর বাঁ হাতে দোদুল্যমান দড়ি দিয়া ঝুলান দোয়াত। ডান হাতটি কোঁচড় হইতে মুড়ি আনিয়া মুখে পৌঁছাইয়া দিতে ব্যস্ত—পড়ুয়া পাঠশালার দিকে চলিয়াছে।

তোমরা হয়তো মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ রকম ব্যবস্থায় লেখাপড়াটা হইত কেমন? তা, বিদ্যাসাগর, বাচস্পতির মত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও হইত, আবার আকাটমূর্খও হইত। আসল কথা হইতেছে জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহ—তা চেয়ারে বসিয়াই পড়, আর মাদুর বিছাইয়াই বস। তবে হাতের লেখাটা মোটের উপর আজকালই বোধ হয় ভাল হয়। সেকেলে হাতের লেখা পড়া অনেক সময়েই একটু কষ্টসাধ্য, বিশেষতঃ যুক্তাক্ষর গুলির বেলায় তো আর কথাই নাই। সেকেলে হাতের লেখা সম্বন্ধে অনেক মজাদার গল্প আছে; দু'একটার নমুনা দিই :—

পাড়াগেঁয়ে তালুকদার জপে বসিয়াছেন, গোমস্তা কাছে আসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই হে?"

"আজ্ঞে, মা ঠাক্রুণ ষষ্ঠীপূজোর বাজার কর্তে বলেছেন, ফর্দ্দ লিখেছি শশা, কলা, আখ……"

"তা বেশ, আর কি?"

"মা ঠাক্রুণ বল্লেন সন্দেশ আন্তে।"

"তা, লেখ—সন্দেশ আধ সের!"

গোমস্তা "এজ্ঞে এজ্ঞে" করিয়া মাথা চুল্কাইতে লাগিল, তার পর ভরসা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে সন্দেশের 'ন্দ'টা লিখ্তে চেষ্টা কর্ছি, কিন্তু আস্ছে না, ভুলে গেছি।"

কর্ত্তা তখন নিজেই 'ন্দ' লিখিতে বসিলেন, কিন্তু তাঁরও 'আসিল না', দেখিলেন তিনিও ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি গোমস্তাকে বলিলেন, "দেখ, ঐ সন্দেশের জায়গায় বাতাসা লিখে দাও।"

আর একটা গল্প শোন :—হাটের সরকার হাটে ভাড়া তুলিতেছে; একজন

পশারীর কাছে গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম ?" পশারী জবাব দিল "এজ্ঞে বাঞ্ছারাম।" সরকারের টনক নড়িল, মুখ বিকৃতি করিয়া কোন মতে হিজিবিজি একটা "ঞ্ছ" লিখিয়া সে আবার প্রশ্ন করিল, "কি. বেচ ?" উত্তর আসিল "এজ্ঞে উচ্ছে।"

সরকার এবার চটিল, দারুণ চটিল, কহিল, "ব্যাটা এদিকেও বাঞ্ছা আবার ওদিকেও উচ্ছে ? যা, তোর ভাড়া এক আনা ঠিক হল।" সে বেচারা মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "এজ্ঞে আমি উচ্ছের ব্যাপারী, আমি অত দিতে পার্‌ব ক্যাম্‌নে ?" কিন্তু সরকার সে কথায় কানও দিল না।

এর পরের পশারীটি বুদ্ধিমান্, সে সরকারের বিপদ্ এবং বিদ্যা দুই-ই বুঝিয়াছিল, সুবোধের মত সে নিজের নাম বলিল "অটল", আর জিনিষের নাম দিল "পটল"। সরকার "বেশ, বেশ" বলিয়া তার ভাড়া ধার্য্য করিল দুই পয়সা।

রহস্যের জের

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

প্রফেসার আত্মম্ভরী ঘোষের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে প্রধান সাক্ষী ছিলেন তাঁর সহযোগী বা সহকর্ম্মী শমনদমন সিংহ মহাশয়, এ কথা তোমরা অনেকেই জান। যা'রা না জান, তা'রা এইটুকু জেনে রাখ যে, একদিন প্রফেসার ঘোষ নিজের ল্যাবরেটরী বা পরীক্ষাগারে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান্। সেখানে একটি যুবককে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সন্দেহে তাঁকেই গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশ সাক্ষীসাবুদ খুঁজ্‌তে আরম্ভ করে। সেই সময়ে শমনদমন সিংহের সাক্ষ্যে আসামীর প্রতি সন্দেহ আরো ঘনিয়ে উঠে। কিন্তু, শেষটায় প্রমাণিত হ'লো প্রফেসার ঘোষই সেই যুবক—অথবা, সেই যুবকই প্রফেসার ঘোষ ;—নবযৌবন লাভের ওষুধ পরীক্ষা কর্‌তে গিয়ে তাঁর ঐ অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। ভাগ্যক্রমে, ওষুধের ফল স্থায়ী না হওয়ায় রহস্য আপনা হ'তে ভেদ হ'য়ে গেল।

এই ঘটনার পর শমনদমন বাবু লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে কোথায় জানি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বাড়ীর লোকেরা জানে তিনি হঠাৎ বিদেশে গেছেন ; কবে ফির্‌বেন ঠিক নাই ; প্রফেসার ঘোষ জানেন—অর্থাৎ, অনুমান কর্‌ছেন—তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন।

সাত দিন যায়, দশ দিন যায়, শমনদমন বাবুর খোঁজ নাই ; বাড়ীর লোকেও কোন খবর পায় নি। প্রফেসার ঘোষ তো একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়েছেন ;—চারিদিকে খোঁজপাত কর্‌ছেন, কিন্তু, কেউই কোনও খবর আন্‌তে পার্‌ছে না।

হঠাৎ একদিন বাড়ীর লোকেরা একটা পোষ্টকার্ড পেল, তা'তে লেখা আছে "বেঁচে আছি ;—শমনদমন"। ঠিকানা কিছুই দেওয়া নাই ; চিঠিটা রেলের গাড়ীতে পোষ্ট করা হয়েছে।

তা'র পরের দিনই সব খবরের কাগজে প্রফেসার ঘোষ বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন ; "শমনদমন, ফিরে এস ভাই, লজ্জার কথা কিছু নাই ; সদা পথ চেয়ে আছি ; তুমি ফিরে এলে বাঁচি।"

পরের দিন সকালে প্রফেসার ঘোষ বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দেখ্‌লেন একটা বড় খাম মাটিতে প'ড়ে ; শিশিরে ভিজে তা'র উপরের লেখাটা ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে। খামের সঙ্গে একটা সূতো বাঁধা ; তার সঙ্গে একটা সীসার গুলি আট্‌কান।

তাড়াতাড়ি খামখানা তুলে নিয়ে দেখ্‌লেন, উপরের লেখাটা অবিকল শমনদমন বাবুর লেখার মত। খুলে দেখেন, শমনদমন বাবুরই হাতের লেখা ; "পাইনু ভরসা নব, সংবাদ পড়ি'তব। দ্বিধা লাজ পরিহরি, দেখা দিব ত্বরা করি। —শমনদমন"।

প্রফেসার ঘোষ আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে খামখানা নিয়ে ছুটে ঘরে গেলেন। তার পর, ভাল ক'রে সেটাকে দেখ্‌লেন—কোত্থেকে এসেছে, বা কেমন ক'রে সেটাকে পাঠান হয়েছে কিছু ধর্‌তে পারেন কিনা। কোথাও ডাকের ছাপ নাই, চিঠির উপরে ঠিকানা নাই, তারিখ নাই। বিজ্ঞাপন তো তা'র আগের দিন মাত্র বেরিয়েছে অথচ, চিঠিটা অন্ততঃ রাত্রে এসেছে ; নইলে শিশিরে ভেজে কেমন ক'রে ?

হয়তো বা শমনদমন বাবু বাইরে কোথাও যান্ নি ; সহরের মধ্যেই গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছেন ; চিঠিটা ছুঁড়ে বাগানে ফেলে তিনি হয়তো পালিয়ে গেছেন ;—আরো কত কথা ভাব্‌ছেন ব'সে,—এমন সময় পিয়ন একটা চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিখানা খুলে প'ড়ে দেখেন প্রফেসার টাকাহাসির লেখা। তিনি লিখ্‌ছেন, "শমনদমন সান্ * এখানে আমার অতিথি। বেচারা লজ্জায় দেশে ফিরে যেতে পার্‌ছেন না……।" চিঠিখানা জাপানের 'নাগাসাকি' সহর থেকে লেখা ; 'এয়ার মেল'এ এসেছে !

একটু হতভম্ব-গোছের হ'য়ে ভাব্‌ছেন, এমন সময় একটা তার এল। খুলে পড়ে দেখেন এও প্রফেসার টাকাহাসির। লিখ্‌ছেন : "চিন্তার কারণ কিছু নাই ; শমনদমন ভালই ; চিঠি পাবেন।"

এ যে আরো অবাক্-কাণ্ড ! তার আসার আগেই চিঠিখানা এসে গেল কেমন ক'রে ?—নাকি, প্রফেসার টাকাহাসির সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে এ সব হচ্ছে। তাই বা কেমন ক'রে হ'তে পারে ? ষড়্‌যন্ত্র করার সময়ও তো হয় নি একটুও।

ব'সে ভাব্‌ছেন, এমন সময়ে তাঁর পুরানো বন্ধু শিবশঙ্কর শর্ম্মা একখানা কাগজ নিয়ে হাজির। কাগজটা হ'লো "ডেলি হেরাল্ড্"। তা'র সংবাদদাতা লিখ্‌ছেন (বাংলা তরজমা) : "সিঙ্গাপুর থেকে মার্কারি পত্রের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সম্প্রতি জাপানগামী "টাটারা" জাহাজে স্বনামধন্য প্রফেসার ঘোষের সহকর্ম্মী শমনদমন সিংহ মহাশয়কে দেখা যায়। তাঁর গন্তব্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি কিছু বল্‌তে নারাজ। খবর নিয়ে জানা গেল তিনি জাপান যাচ্ছেন।"

ব্যাপারটা তা' হ'লে হেঁয়ালিই বটে। শমনদমন বাবু রইলেন জাপানে ; অথচ, চিঠি আস্‌ছে একদিনের মধ্যেই ; কারণ, কাগজে বিজ্ঞাপন বের হবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চিঠি এল ; তা'তে লেখা : "সংবাদ পড়ি'তব" ! এ কেমন ব্যাপার ? কাগজ পৌঁছালই বা কেমন ক'রে, উত্তরটাই বা পৌঁছা'ল কেমন ক'রে ? রহস্য যেন ক্রমশঃই ঘনিয়ে আস্‌ছে।

* জাপানীরা 'মহাশয়' অর্থে 'সান্' কথা ব্যবহার করে।

যাক্ ; রহস্য যা'ই হোক্, "দেখা দিব ত্বরা করি" কথাগুলিই আনন্দের সংবাদ। এখন বেশী মাথা ঘামাবার আর দরকার কি ? এলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। কিন্তু, কবে আস্‌বেন তা' কিছু লেখেন নি। "ত্বরা করি" বল্‌লে, জাহাজে আসার হিসাবে ৭।৮ দিন ; এরোপ্লেনে তিন দিন। দেখাই যাক্ কিসে আসেন।

সারাটা দিন প্রফেসার ঘোষ কেবল পায়চারি কর্‌ছেন আর নানা কথা ভাব্‌ছেন—কেমন ক'রে চিঠিটা এল, কি ক'রে সংবাদ গেল জাপানে, প্রথম চিঠিটাই বা রেলের ডাকে দেওয়া হ'লো কেমন ক'রে ?—ইত্যাদি নানা কথা। রাত্রেও তাঁ'র ভাল ক'রে ঘুম হ'লো না।

ভোর বেলা উঠে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে, চা খাচ্ছেন আর কাগজ পড়্‌ছেন। হঠাৎ চোখ পড়্‌ল একটা খবরের দিকে : "Disastrous Fire in Japan. Famous Professor's House Completely Destroyed." অর্থাৎ : "জাপানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ; বিখ্যাত অধ্যাপকের বাড়ী ভস্মীভূত।" খবরে লেখা আছে (বাংলা তর্জ্জমা) : "অদ্য প্রাতে ৪॥০ ঘটিকার সময় নাগাসাকি সহরের দক্ষিণ প্রান্তে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া বহু গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। অধ্যাপক টাকাহাসির গৃহে আগুন লাগিয়া তাঁহার প্রশস্ত পরীক্ষাগার, 'নীরব এরোপ্লেন', বাসগৃহ—সমস্তই ধ্বংস হইয়াছে। টাকাহাসি ও তাঁহার ভারতীয় অতিথি সিংহ মহাশয় গৃহের মধ্যে ছিলেন ; অগ্নির হাত হইতে তাঁহারাও রক্ষা পাইতে পারেন নাই।"

প্রফেসার ঘোষের হাত থেকে কাগজখানা ধপ্ ক'রে প'ড়ে গেল ; চায়ের পেয়ালাটাও মাটিতে প'ড়ে চূরমার হয়ে গেল। মাথাটা টেবিলের উপর রেখে অনেকক্ষণ তিনি নিঝুম হ'য়ে প'ড়ে রইলেন। ঘণ্টা দু'এক পর মাথা তুলে দেখেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার দু'তিন জন এসে হাজির হয়েছেন ;—শমনদমন বাবুর জীবনের বিষয় কিছু জান্‌তে চান্ এবং তাঁ'র ফটো চান্ !

মাথাটা তখনও ঘুর্‌ছে ; মনটা যেন একেবারে দমে গেছে। সংবাদদাতাদের একটু বস্‌তে ব'লে তিনি মুখ-হাত ধুয়ে, দু'চারটা খাতাপত্র আন্‌তে গেলেন। ফিরে এসে তিনি খাতাপত্র ঘেঁটে শমনদমন বাবুর জীবনের কথা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু, তারিখ বিশেষ কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না। রিপোর্টার ভদ্রলোকেরা

বার বার প্রশ্ন ক'রে, তা'র উত্তর থেকে গুছিয়ে নিয়ে লিখ্‌বার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। অনেক চেষ্টায়ও অতি সামান্য খবরই পাওয়া গেল; খুব ভাল ছবি পাওয়া গেল না।

রিপোর্টারেরা অনেকটা নিরাশ হয়ে খাতাপত্র নিয়ে উঠ্‌তে যাবেন এমন সময় হঠাৎ একটা কাগজ উড়ে এসে সেখানে পড়্‌ল। তা'তে শমনদমন বাবুর জীবনের ঘটনার তারিখগুলি সবই লেখা! কাগজখানি উপরের 'স্কাই-লাইট' দিয়ে যেন উড়ে এসে পড়্‌ল!

প্রফেসার ঘোষ কাগজখানা নিয়ে, দেখে বল্‌লেন, "লেখাটা তো অনেকটা শমনদমন বাবুর হাতের লেখার মত! ব্যাপারটা কি?"

বাইরে গিয়ে সকলে দেখ্‌লেন, কোথাও কিছু নাই। শুধু কতগুলো কাক গাছের উপর থেকে উড়ে 'কা-কা' ক'রে চারিদিকে ঘুর্‌ছে—যেন তা'রা চমকে গিয়েছে বা ভয় পেয়েছে।

যাক্‌, এখন ভেবে সময় নষ্ট না ক'রে শোকসভা ইত্যাদির আয়োজন করা উচিত। রিপোর্টারদের আবার ঘ'রে ব'সিয়ে সে বিষয়ে পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল। স্থান সময় ঠিক হ'লো, সভাপতি ঠিক হ'লো, বক্তা দু'তিন জনের নাম ঠিক হ'লো, আর একজনের নাম দরকার।

প্রফেসার ঘোষ বল্‌লেন, "তিন জনের নাম ঠিক হ'লো, আর এক জনের নাম হ'লেই হয়। চতুর্থ বক্তা তা' হ'লে——।"

"শমনদমন সিংহ"—হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল।

চমকে উঠে সকলেই উপরের দিকে চাইলেন। আওয়াজখানা উপরের দিক্‌ থেকে আস্‌ছিল। চেয়ে দেখেন, স্কাই লাইটের ভিতর দিয়ে ঠিক শমনদমন বাবুর মুখ যেন দেখা যাচ্ছে।

তখন পরিষ্কার দিনের বেলা; ঝক্‌ঝকে রোদ। নইলে অনেকেই ভূত ব'লে ভয় পেতেন। কিন্তু, তা'র পরের মুহূর্ত্তেই সব সন্দেহ ভঞ্জন হ'য়ে গেল! সেই মুখের মালিক—স্বয়ং শমনদমন সিংহ ঘট্‌ ঘট্‌ ক'রে সশরীরে সিঁড়ি দিয়ে ছাত থেকে নেমে এলেন!

অনেকক্ষণ কারো মুখে আর কথা নাই;—প্রকাণ্ড বড় হাঁ ক'রে সকলে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

নিস্তব্ধতা ভাঙ্গ্‌লেন স্বয়ং সিংহমশাই। বল্‌লেন: "কোনও ভয় নাই; আমি সশরীরেই এসেছি:—ভূত নই। প্যারাসুট আর ডানা দুটি ছাতে আছে। ছাতে ব'সে স্কাই-লাইট দিয়ে সব শুন্‌ছিলাম আর নোট লিখ্‌ছিলাম। আপনারা যখন জীবনী সম্বন্ধে হতাশ হ'লেন তখন আমার নোটের কাগজখানা টুপ্‌ ক'রে ফেলে দিলাম। শেষটায় যখন দেখি চতুর্থ বক্তা আর মেলে না, তখন আমি নিজেই বক্তা হ'তে রাজী হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্‌লাম। এবার বুঝেছেন তো?"

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন

সকলেই তখন এক জোট হ'য়ে আগেকার সব রহস্য ভেঙ্গে দেবার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন। শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "রহস্য কিছুই নয়। আমার ছেলেবেলার বন্ধু বারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সব খবর রেডিওফোন আর টেলিভিষণ যন্ত্রে আমাকে জাপানে পাঠিয়ে দিতেন। জাপান যাবার আগে তা'কেই আমার প্রথম চিঠিটা দিয়ে যাই; বম্বে মেলে সেটা ডাকে দেওয়া হয়। প্রফেসার ঘোষের বিজ্ঞাপন সেই দিন সকালেই টেলিভিষণে নাগাসাকিতে ব'সে দেখি। তখনই একটা উত্তর আমি নিজের হাতে লিখে টেলিভিষণ যন্ত্রে বারিদবরণ বাবুকে দেখাই।

তিনি সেটার ছবি তুলে, হাতে অবিকল নকল ক'রে লেখেন এবং তিনিই সেই চিঠিটা এই বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দেন্। চিঠি পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে তারওপাঠান হয়। তা'র পর, আমরা ঠিক করি যে প্রফেসার টাকাহাসির অতি-দ্রুত এরোপ্লেনে রওয়ানা হ'য়ে সাত ঘণ্টায় সোজা এই বাগানে এসে নাম্‌ব। পথে ঠিক করি, আমি প্যারাসুট নিয়ে নেমে পড়্‌ব; প্রফেসার ফিরে চ'লে যাবেন। প্যারাসুট আর ডানা নিয়ে আমি ঠিক ছাতটির উপর চুপিচাপি নেমে পড়েছি; নীরব এরোপ্লেনের শব্দ কিছুই শোনা যায় নি। এখন শুন্‌ছি প্রফেসার টাকাহাসির বাড়ী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। আমরা রাত থাক্‌তে চুপিচাপি রওয়ানা হ'য়ে পড়েছি; তাই কেউ জানে না আমাদের কথা। সকলেই মনে কর্‌ছে আমরা পুড়ে মরেছি। এতক্ষণে প্রফেসার টাকাহাসি বর্ম্মায় ফিরে গিয়ে, নাগাসাকিতে খবর দিয়ে থাক্‌বেন। যাক্—সবই ভাল, যা'র শেষ ভাল—All's well that ends well!"

পরের দিন "সরস সমাচার" লিখ্‌ল! "শোকসভা সুব্যবস্থিতকরণে সচেষ্ট সহানুভূতিকারকের সমক্ষে সহসা সমাগত সুরসিক শমনদমন সিংহের সময়োচিত সমুচিত সাহায্যে সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান। সংবাদদাতা সকলেই সুখী; সর্ব্বসাধারণও সুখী; সর্ব্বোপরি সহকর্ম্মীও সম্পূর্ণরূপে সুখী। শুভ শেষের সবই শুভ।"

আবিষ্কার

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক)

চন্দ্রকান্ত কেউ-কেটা নয়, মস্ত একটা বৈজ্ঞানিক,
ছারপোকা-মারা কল সে করেছে আবিষ্কার।
হাতিয়ার নিয়ে করে হাতাহাতি, কিংবা পড়ে সে বই খানিক,
লোহালক্কড়ে ইটে-কাঠে ভরে আপিস তার।

যদিও অঙ্কে শূন্য পেয়েছে বাল্যে চন্দ্র পাঠশালায়,
যদিও দাদারা কর্ণ ধরেছে খপ্ ক'রে।
তথাপি ঘড়িতে অথবা দড়িতে যেমনি চাকুর বাঁট চালায়,
অমনি মগজে বিদ্যুৎ জ্বলে দপ্ ক'রে।
তাই চলে রোজ ঠোকাঠুকি আর লেখালেখি পাতা দিস্তা নয়,
কাগজে কলমে কত যে নক্সা আঁকলো সে।
লাল নীল শাদা পাউডার যত গাদা হ'লো ঘরে, বিষ তা' নয়,
চাখে আর শোঁকে, দেখে আর ঝোঁকে তাগ্ ক'ষে।

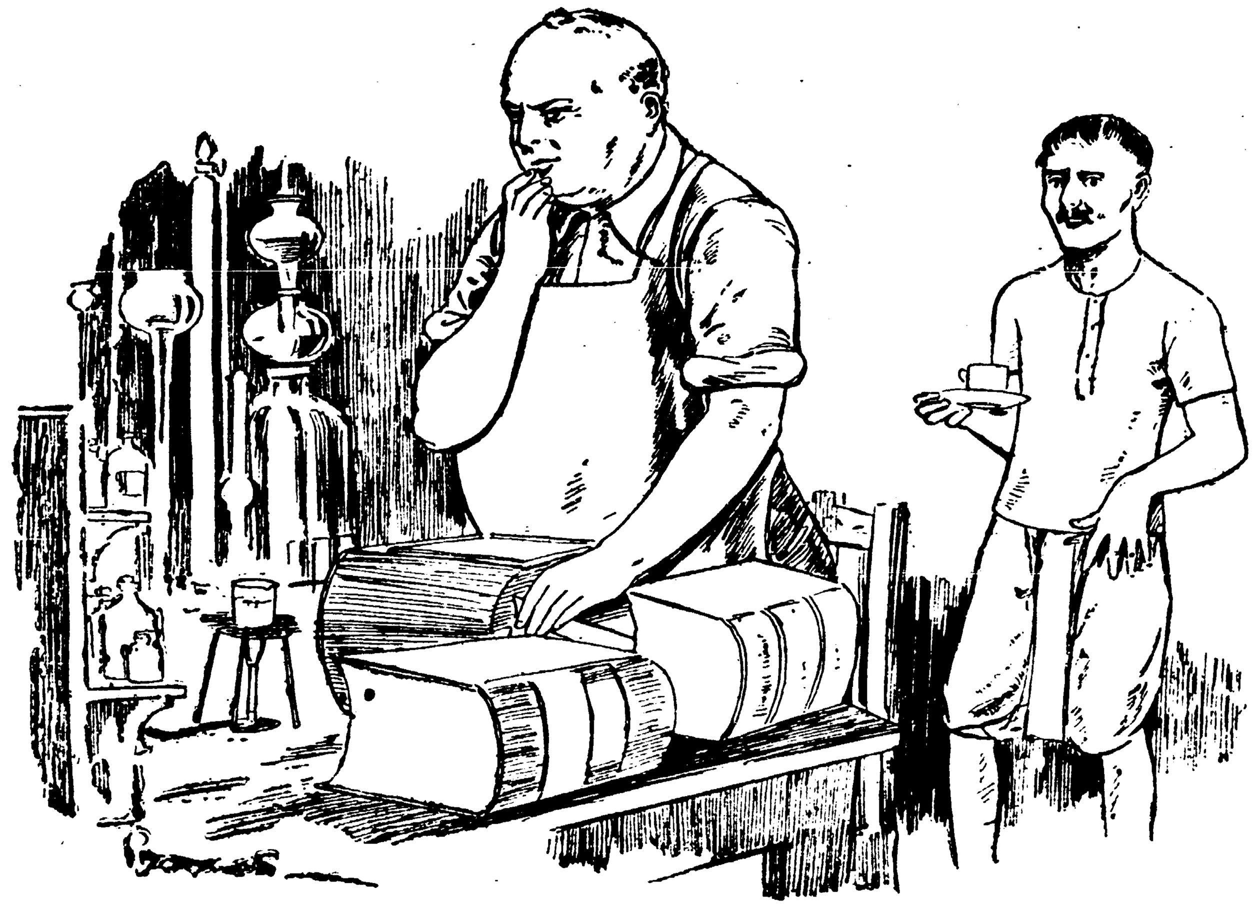

ঢালাঢালি খালি শিশিতে বোতলে, কিংবা প্যাকিং কৌটাতে,
টেবিলে চেয়ারে আলমারি কড়ি বর্গা তক্
এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্ চলছে নিত্য ঘরে ও বাহিরে পইঠাতে,
যেখানে যা ছিল ছারপোকা হবে সব আটক।
পেটেণ্ট্ নিয়েছে কলের মালিক চন্দ্রকান্ত যন্ত্রটার,
জাল-জুয়াচুরি চলবে না এতে আর কোনো।

বানিয়ে ফেলেছে লাখ তিন চার সাফ ক'রে কত বন-বাদাড়,
দেশটা কি রাখে সংবাদ আজি তার কোনো ?
কত যে দেহের রক্ত গিয়েছে, কত যন্ত্রের যন্ত্রণা,
অঢেল টাকায় কত যে মডেল্ তৈরী হয়।
প্রতিবেশী যত কাঁদে আর হাঁচে, কানে কানে করে মন্ত্রণা,
পশুপাখীদের হৃদয়ে হাঁপানি, বৈরি-ভয় !
বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং আসিয়া কিনিতে চাহেন একটি কল—
ছারের দংশে দেবতাবংশ সশঙ্ক !
চন্দ্র দিলো সে একটি সাঁড়াশি, একটি হাতুড়ি, এক শিকল,
আর দিলো লিখে ব্যবহার-বিধি অসংখ্য।—
"সাঁড়াশিতে ধ'রি ছারপোকা-কুলে শিকলে বাঁধিয়া প্যাঁচ্ কষো,
হাতুড়িতে তার মাথা ছাতু কর দশ ঘায়ে।
এ কল বিকল হয় যদি তবে হস্তে ধরিয়া ল্যাজ ঘষো।
দৃষ্টি ঝাপ্‌সা থাকে যদি নাও, চশ্‌মা এ ;
দেখো আর মারো যত ছারপোকা বালিশে তোষকে শয্যাতে,
কলে ফেলো আর গলা টিপে ধরো খুব জোরে।
পিষিয়া ঘষিয়া কিংবা চুষিয়া নাশ করো ঐ বদ্‌জাতে,
মারো আর শোঁকো গন্ধ তাহার বুক ভ'রে।"

অষ্ট্রেলিয়ান্ টেষ্ট্ ম্যাচের ভীড়

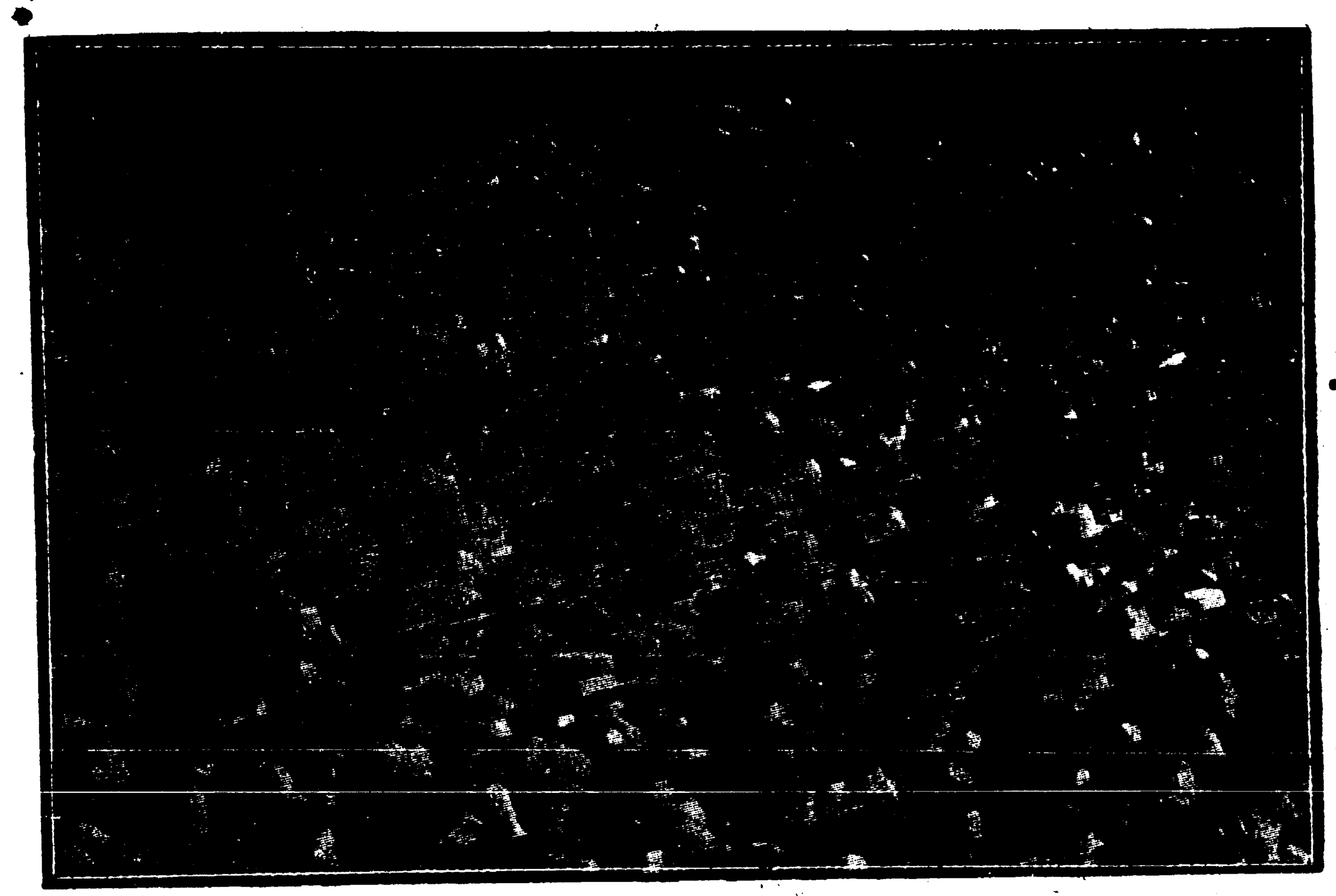

অষ্ট্রেলিয়া একটা বিরাট্ দেশ হলেও, লোকসংখ্যা সেখানকার খুবই কম—আমাদের ময়মনসিংহ জেলার কাছাকাছি হবে। অথচ ওই কয়টি লোকের ভেতরই কত বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে! ওখানকার লোকেদের ক্রিকেটে অসাধারণ উৎসাহ। টেষ্ট্ ম্যাচ্ উপলক্ষে কি রকম ভীড় হয়, ওপরের ছবিখানায় দেখ।

এবার মেলবোর্ণের টেষ্ট্ ম্যাচে, তৃতীয় দিনে এমন ভীড় হয়েছিল যে আজ পর্য্যন্ত তেমনটি পৃথিবীর আর কোনও ম্যাচে দেখা যায় নি। খেলার মাঠে ঐ দিন লোক ঢুকেছিল ৮৭,৭৯৮ ; টাকা উঠেছিল ৭৪০৫ পাউণ্ড্।

এক দুর্য্যোগের রাতে—

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বিদ্যুৎ চমকানোতে ভারী ভয় খায় মেয়েরা। বিশেষ ক'রে পিসীজাতীয় মেয়েরা। যদি পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতায়, কিংবা ইস্কুলের টেক্‌স্‌ট্ বুক্ প'ড়েও এ-কথাটা আমার জানা থাক্‌ত

তা হ'লে গরমের ছুটিতে মুকুন্দপুরে কখনই আমি মর্‌তে যেতাম না। অজ্ পাড়া-গাঁ মুকুন্দপুর—সাধারণতঃ পিসীদেরই সেখানে বসবাস।

বাবা বল্লেন—"যাঃ, অনেক দিন ধ'রে লেখালেখি কর্‌ছে তরু। তোকে কবে সেই ছোটবেলায় দেখেছে, দেখ্‌তে চায় একবার। তারিণীও খুব খুসী হবে। গরমের ছুটিটা সেইখানেই কাটিয়ে আয় না কেন? গান্ধীজীও বল্‌ছেন—ব্যাক্ টু ভিলেজ, তার মানে আবার গ্রামে যাও।"

বাবা দারুণ ভক্ত গান্ধীজীর। আমি প্রতিবাদ কর্‌তে চাই—"উঁহু। তা কি ক'রে হয় বাবা? ব্যাক্ টু ভিলেজ মানে হবে গ্রামের দিকে পিঠ ফেরাও। অর্থাৎ কিনা, সহরেই থাক।"

"তাই নাকি?" বাবা মাথা চুল্‌কাতে থাকেন—"তা হ'লে ও-দুইই হয়! গ্রামেও থাক, সহরেও থাক।"

মা ঘাড় নাড়েন—"তা কেন হবে! ব্যাক্ টু ভিলেজ মানে হ'ল তোমার পিঠ দাও গ্রামকে, অর্থাৎ কিনা গ্রামকেই তোমার পীঠস্থান কর। তার মানে, গ্রামেই পিঠ দিয়ে পড়ে থাক চিৎ হয়ে।"

মার বাক্যে বাবার উৎসাহ হয়—"তবে তো গান্ধীজীর ব্যাখ্যাই ঠিক তা হ'লে! হুম্!" আমার বাবা নিদারুণ ভক্ত গান্ধীজীর! "গান্ধীর কথা তবে শুন্‌তেই হবে তোকে। তা ছা'ড়া, এখন আমের সময়, পাড়াগাঁয় আম প্রচুর। কিনে খেতে হয় না, আমবাগানে গিয়ে হাত বাড়িয়ে গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেই হ'ল; হাতেই এসে পড়্‌বে। মাথাতেও পড়্‌তে পারে। টুপ্‌টাপ্ পড়ছেই। সেই যে রবিঠাকুরের কবিতাটা—সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধূম্—"

হাত ঝেড়ে মাথা নেড়ে বেশ আবৃত্তি স্থরু করেছিলেন বাবা। কিন্তু ধূমেই এসে ধুম্ ক'রে তাঁকে থেমে পড়্‌তে হয়। তার পর আর মনে পড়ে না। না-বাবার, না-আমার। আর মা? কবিতার ধার দিয়েই মা যান্ না। ও-জিনিস তাঁর দু-কর্ণের বিষ।

যাক্, অবশেষে রাজীই হলাম। গান্ধীজীর কথায় নয়, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসে।

আমের আশায় (আমাশায় নয়!) আমার মুকুন্দপুর আসা। এসেই দেখ্‌লাম পিসীরা খুব ভ্রাতুষ্পুত্রবৎসল হয়, বিশেষ ক'রে পিস্তুত ভাই-বোন যদি না গজিয়ে থাকে। আমার আদর-যত্নের আর অবধি থাক্‌ল না। মার কাছেও কখনো এত ভালোবাসা পাই নি। মনে মনেই আমি

এর একটা ব্যাকরণ-সঙ্গত সূত্র রচনা ক'রে নিই। মা? মা হচ্ছেন শুধুই মা, সীমার মধ্যে তিনি। কিন্তু পিসীমা? তাঁর পরিসীমা কোথায়?

হ্যাঁ, যে কথা বল্‌ছিলাম। বিদ্যুতের সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ত আছে, কিংবা কিছু বৈদ্যুতিক অংশও তাঁদের মধ্যে থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়—তা না হ'লে বিদ্যুৎ-চমক স্থরু হলে মেয়েরাও চম্‌কাতে থাকে কেন? আমার মাকেও চম্‌কাতে দেখেছি। বিনিকেও দেখেছি। কিন্তু পিসীমার মত কাউকে নয়। একটা নেংটি ইঁদুরের সাম্‌নেও তিনি অকুতোভয়ে অটল থাক্‌বেন হয় তো,—কিন্তু বিদ্যুৎ চম্‌কালে পিসীমা? তক্ষুণি খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়েছেন।

সেই দুর্য্যোগের রাতের কথা চিরদিন আমার মনে থাক্‌বে। ভাব্‌লে এখনো হৃৎকম্প হয়। ক্যালামিটি কখনো একা আসে না, খাঁটিই এ কথা। সে রাত্রে তারিণী বাবুও বাড়ী নেই (সম্পর্কে তিনিই আমার পিসেমশাই), পাশের গ্রামে গেছেন: জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন, তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাত্রে ফিরবেন কিনা কে জানে!

বাড়ীতে কেবল পিসীমা আর আমি। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গাম্ চুক্‌তে বেশী দেরী হ'ল না। রাত দশটার মধ্যেই সব খতম্। দরজা জান্‌লা ছিট্‌কিনি সমস্ত ভালো ক'রে বন্ধ করবার পিসীমার হুকুম হয়ে গেল। আপত্তির স্থরে আমি বলি—"দরজায় তো খিল্ এঁটেছি, কিন্তু যা গরম পিসীমা! জান্‌লাগুলো বন্ধ কর্‌লে তো মারা যেতে হবে।"

"গরমে লোক মারা যায় না;" পিসীমা বলেন, "চোরের হাতেই মারা যায়, ডাকাতের হাতেই মারা যায়। জান্‌লা খোলা রাখ্‌লে চোর-ডাকাত লাফিয়ে আস্‌তে পারে। তা জানিস্? তার ওপরে উনি আবার বাড়ী নেই—সাম্‌লাবে কে?"

যেন উনি বাড়ী থাক্‌লেই সাম্‌লাতে পারতেন! পিসে হতে পারেন কিন্তু চোর-ডাকাতকে ধ'রে পিসে ফেল্‌বেন এত ক্ষমতা নেই ওঁর! আমার মন্তব্য কিন্তু মনেমনেই আমি উচ্চারণ করি। ততক্ষণে পিসীমা কোন জানালার একটা খড়্‌খড়িও ফাঁক্ রাখেন না।

অন্ধকার ঘরে দারুণ গুমোটের মধ্যে ছট্‌ফট্ কর্‌তে কর্‌তে কখন একটু তন্দ্রার মত এসেছে, এমন সময়ে—

ক্কড়্—ক্কড়্—ক্কড়্—ক্কড়াৎ—

আচম্‌কা জেগে উঠি। তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্য কোণ থেকে পিসীমার আর্ত্তনাদ শোনা যায়। "মন্‌টু! ও মন্‌টু!"

"পিসীমা? কি পিসীমা?"

"চৌকির তলায় সেঁধো। তাড়াতাড়ি সেঁধিয়ে যা। দেরী করিস্ নে।"

আমি উঠে বসি। চৌকির তলায় সেঁধুব কেন? চোরটোর লাফিয়ে এল নাকি?

কিন্তু দোর-জান্‌লা তো বন্ধ, ঘর তেম্‌নি অন্ধকার—আস্‌বেই বা কি ক'রে? কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে ভাব্‌তে থাকি।

"ঢুকেছিস্?"

"উহুঁ।"

"ঢুকিস্ নি এখনো? সর্ব্বনাশ কর্‌লি তুই। ঢুকে পড়্ চট্ ক'রে।"

"কেন, কি হয়েছে পিসীমা!"

"এখনো কথা বলে! কি হয়েছে! আকাশে বিদ্যুৎ হান্‌ছে যে! বাজ পড়্‌ল শুন্‌লি না?—" পিসীমা ক্ষেপে ওঠেন, "এখন কি তর্ক করার সময়! বল্‌ছি না ঢুকে পড়্‌তে—"

পিসীমার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। কড়্—কড়্—কড়্—কড়াৎ—দুম্ দুম্! সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক্ জান্‌লার ফাঁকে ফাঁকে ঝল্‌সে ওঠে।

"মর্‌ল ছেলেটা। আমাকে বেঘোরে মার্‌ল!" চাপা কান্নারও শব্দ আসে।

কি করি? হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধোতে হয় চৌকির তলায়। "ঢুকেছি পিসীমা।" করুণ স্বরে বলি।

"ঢুকেছিস্! আঃ! বাঁচালি! ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময় কি বিছানায় থাকতে আছে? শুয়ে পড়িস্ নি তো চৌকির তলায়?"

"নাঃ। হামাগুড়ি দিয়ে আছি।"

"হামাগুড়ি দিয়ে? কি সর্ব্বনাশ! বিদ্যুৎ চম্‌কানোর সময়ে কি কেউ হামাগুড়ি দেয়? হাত পা গুটিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বোস্।"

উদ্যমের সূত্রপাতেই কিন্তু সংঘর্ষ বাধে। "কি ক'রে বস্‌ব? চৌকি লাগ্‌ছে যে মাথায়!"

"ভারী বিপদ্ কর্‌লে! এই সময়ে আবার চৌকি লাগ্‌ছে মাথায়!" পিসীমা চেঁচাতে থাকেন। "এই কি মাথায় চৌকি লাগ্‌বার সময়? চৌকি মাথায় ক'রে সোজা হয়ে বোস্।"

"উহুঁ। মাথায় করা যায় না, বেজায় ভারী যে।" পিসীমাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি। "পিসেমশাই আর আমি দু'জনে হ'লে পারা যেত।"

সত্যি, আমার একার পক্ষে অত বড় চৌকি মাথায় করা অসম্ভব—দস্তুর মত অসম্ভব। আর, কেবল মাথায় করা নয়, মাথায় ক'রে বসে থাকা।

"কি কর্‌ছিস, মন্টু—" পিসীমা হাঁক্ ছাড়েন।

"চৌকির তলাতেই আছি। হাত পা গুটিয়েই বসেছি। ঘাড় হেঁট্ ক'রে।"

"ঘাড় হেঁট্ ক'রে? তবেই মারা গেলি! এই সময়ে মাথা সোজা ক'রে রাখার নিয়ম যে! চৌকির তলাতেই থাকতে হবে কিন্তু মাথা উঁচু ক'রে থাকা চাই। তোকে নিয়ে

কি করি বল্ ত? একে এই দুর্য্যোগ—চৌকি কাঁধে করার জন্যে এখন পিসেমশাইকে আমি পাই কোথায়?—

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চমকে পিসীমার বাক্য বাধা পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ কড়াক্কড়্ আওয়াজ এবং পিসীমার আর্ত্তনাদ।

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চমকে···

"হায় মা কালী! হায় মা দুর্গা! কি বিপদই না ডেকে আন্‌ছে ছেলেটা! কি করি এখন, হায় মা—"

আমিও মনে মনে বলি, "হায় মা!" দাঁতে ঠোঁট কামড়াই, কি করি এখন? ওদিকে পিসীমার চীৎকার, এদিকে দশমণি চৌকি! ঐতিহাসিক ব্যক্তি নই যে অসাধ্য-সাধন কর্‌তে পারব। অসম্ভব কাজ কেবল ওরাই পারে। আমার কান্না আসে।

আবার বিদ্যুতের ঝল্‌কানি আর বজ্রপাতের শব্দ।

"দেখ্‌লি, দেখ্‌লি ত! তোর ঘাড় হেঁট্ ক'রে থাকার জন্য কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে! নিজেও মর্‌বি—আমাকেও মার্‌বি তুই—" পুনরায় পিসীমার ফোঁসফোঁসানি সুরু হয়।

"উঠোনে ঘটিবাটি পড়ে নেই ত? তা হ'লেই অক্কা পেয়েছি! পেতল-কাঁসার বাসনে ভারী বিদ্যুৎ টানে—"

"গিয়ে দেখে আস্‌ব পিসীমা ?"

এই তটস্থ দুরবস্থা থেকে যে কোনও পথে পরিত্রাণের সুযোগ পেতে চাই।

পিসীমা কিন্তু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন—"বাইরে যাবি তুই ? এই বিপদের মুখে ? কি আক্কেল তোর বল্‌ দেখি ? তোর চেয়ে ঘটিবাটির দামটাই বেশি হ'ল ? একটু থেমেই আবার সেই প্রশ্নাঘাত—"ঘাড় সোজা কর্‌লি ?"

চৌকির তলায় থাকা এবং মাথা উঁচু ক'রে থাকা যখন একাধারে সম্ভব নয়, তখন অগত্যা ওর আওতা পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে আসি। এসে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচি, এবং মাথা উঁচু ক'রে। উঃ, ঘাড়টা কি টন্‌টন্‌ই না করছে! দারুণ গরমে চৌকির তলায় প্রাণ একেবারে গলায়-গলায় এসেছিল।

"ঘাড় উঁচু করেই আছি পিসীমা।" অকপটেই বলি।

"আহা, বাঁচিয়েছিস্‌।" পিসীমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে, "লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, যাদু ছেলে! যা বলি শোন্‌। আজকের ভয়ানক রাতটা কেটে যাক্‌, মা দুর্গা করুন্‌, কাল তোকে সক্কালেই পিঠে ক'রে খাওয়াব। এ কি, কি কর্‌ছিস্‌ আবার ?—"

"দেশলাই জ্বাল্‌ছি, লণ্ঠন ধরাব। যা অন্ধকার—"

"কি সর্ব্বনাশ! এই সময়ে কেউ আলো জ্বালে ?" পিসীমা শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন—"আলোয় যে রকম বিদ্যুৎ টেনে আনে এমন আর কিছুতে না। নিভিয়ে ফ্যাল্‌—এক্ষুণি। [ক্কড়্‌—ক্কড়্‌—ক্কড়াৎ—বাম্‌ বাম্‌] দেখ্‌লি ত, কি কর্‌লি তুই!"

"আমি কি করব ? ও তো আপনি হচ্ছে। দেশলায়ে বিদ্যুৎ টেনে আনে কিনা তা তুমিই জান কিন্তু সৃষ্টি কর্‌তে পারে না তো ?" আমি একটু বিরক্ত হয়েই বলি।

"এই কি বক্তৃতা কর্‌বার সময় ? তুই কি মর্‌তে চাস্‌ ? আমাকেও মার্‌তে চাস্‌ সেই সঙ্গে ?"

আমি চুপ ক'রে থাকি। কি কর্‌ব ?

"সেই সপ্তবজ্র-নিবারণের মন্ত্রটা মনে আছে তোর ? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌। বজ্রাঘাত থেকে বাঁচ্‌তে হলে—ওঃ, কি বিচ্ছিরি রাত! কাল্‌কের সকাল দেখ্‌তে পাব কি না মা কালীই জানেন! কই, পড়্‌ছিস্‌ না ?"

"জানিই না তো, পড়্‌ব কি ?"

"কি মুখ্যু ছেলেটা! এও জানিস্‌ না ? ইস্কুলে কি ছাই শেখায় তোদের ? অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমন্ত বিভীষণ। কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য সপ্তবজ্রনিবারণ॥ ঘন ঘন আওড়া।"

আওড়াতে থাকি। কি আর কর্‌ব ?

শ্লোকপাঠের মধ্যিখানে আর এক দুর্ঘটনা! পিসীমার পোষা বেড়ালটা কখন আমার পায়ের তলায় এসে হাজির হয়েছে। বেড়ালে আমার ভারী ভয়। লাফিয়ে উঠি আমি। বেড়ালের হাত থেকে বাঁচ্‌বার চেষ্টায় বেড়ালের গায়েই পা চাপিয়ে দিই।

"ম্যাও—" মণ্টু-চাপা প'ড়ে বেড়ালটাও ত্রাহি ত্রাহি করে।—"মিউ—মিয়াও!"

ধুত্তোর! অন্ধকারে যে ধারে পা বাড়াই সেখানেই বেড়াল! ও-যেন একাই একশ'! সর্ব্বদা পায়ের সঙ্গে লেগেই আছে। পদে পদে এ রকম বেড়ালের উৎপাতের চেয়ে বজ্রপাতও আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

"মন্টু!" পিসীমার শাসনের কণ্ঠ শুনি, "এই কি আমোদের সময় ? আবার বেড়াল-ডাকা হচ্ছে ?"

"আমি ডাকি নি পিসীমা।"

"তবে কে ডাক্‌তে গেল ? তোমার পিসেমশাই ? এমন মিথ্যেবাদী হয়েছ তুমি ? ছি! লিখে দেব দাদাকে চিঠিতে, যে, তোমার ছেলে যতই বড় হচ্ছেন ততই—"

"সত্যি বল্‌ছি পিসীমা, আমি ডাকি নি। আমি কেন ডাক্‌ব ? বেড়াল—"

আমার কথা শেষ হতে পায় না—"বল কে বেড়াল ডাক্‌ল তবে ? কার এত সখ ? ভতে ডাক্‌তে গেল ?" পিসীমার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়।

"উঁহু। বেড়াল নিজেই।"

"য়্যা ?" আবার পিসীমার আর্ত্তনাদ! তিনি যে বেশ বিচলিত হয়েছেন, অন্ধকারের মধ্যেই আমি তা টের পাই। "বেড়াল! তবেই হয়েছে। আর আমাদের রক্ষা নেই! বেড়াল ভয়ানক বিদ্যুৎবাহী! বেড়ালের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিদ্যুৎ, বইয়েতেই লিখে দিয়েছে। কি সর্ব্বনাশ! হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে বাবা অশ্বত্থামা বলি, ব্যাস—"

"বাবা নয়, বাবারা।" আমি ওঁকে সংশোধন ক'রে দিই—"বহুবচন বল্‌ছ যে পিসীমা!"

"এই সময়ে আবার ইয়াকি ?" পিসীমা ধমক্‌ দেন, "হে বাবা হনুমন্ত, হে বাবা বিভীষণ, ছোঁড়াটাকে বাঁচাও। অবোধ ছেলের অপরাধ নিয়ো না বাবা। [ক্কড়্‌—ক্কড়্‌—ক্কড়াৎ—বম্‌বম্‌—ববম্‌বম্‌!—পিসীমা যান ক্ষেপে] এখনো বুঝি ধ'রে আছিস্‌ বেড়ালটাকে ? ছুঁড়ে ফেলে দে—ছুঁড়ে ফ্যাল্‌—এই দণ্ডে।"

ছুঁড়ে ফেলা শক্ত হয়, কেননা বেড়ালকে ধারণ করি নি তো। কিন্তু পিসীমার অদেশ রাখ্‌তেই হবে—যে ক'রেই হোক্‌। অন্ধকারেই আন্দাজ ক'রে বেড়ালের উদ্দেশে এক শূট্‌ ঝাড়ি। শূট্‌ গিয়ে লাগ্‌বি তো লাগ্‌ লাগে এক তেপায়া টেবিলে; তাতে ছিল পিসেমশাইয়ের ওষুধপত্তর

শিশিরা (যত রাজ্যের সৌখীন ব্যারাম সব পিসেমশায়ের একচেটে)—সেই এক ধাক্কাতেই টেবিল চিৎপাৎ এবং শিশি-বোতল সব চুর্‌মার্!

পিসীমা গোঁ গোঁ কর্‌তে থাকেন; অজ্ঞান হয়ে গেলেন কি না, এই ঘুট্‌ঘুট্টির মধ্যে তো বোঝ্‌বার যো নেই! কিন্তু যখন জানেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত নয়, নিতান্তই টেবিলপাত—তখন তাঁর গোঙানি থামে; আপনিই সাম্‌লে ওঠেন।

"যাক্, ভগবান খুব বাঁচিয়েছেন এবার। ওটাকে ঝেড়ে ফেলেছিস্ তো? বেশ করেছিস্! (অন্য সময় হ'লে তাঁর আদরের মেনির গায়ে কাউকে হাত ঠেকাতেও দেন না, কিন্তু এখন বিদ্যুতের সাম্‌নে, বেড়ালের ওপরেও পিসীমার চিত্ত নেই।) তুই এক কাজ কর্ মণ্টু। ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। কাঠের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচলাচল করে না। চেয়ার কিংবা টেবিলের ওপরে দাঁড়ানোই এখন সব চেয়ে নিরাপদ। দাঁড়িয়েছিস্?"

"উঁহুঁ—"

[ফ্যাশ্—কড়্—কড়াৎ—কড়াকড়্—ববম্ বম্—বম্ বম্!]

"কি দস্যি ছেলে বাবা! দাঁড়াস্ নি? এখনও? তুই কি আমাকে পাগল কর্‌বি? হে মা দুর্গা—"

"দাঁড়িয়েছি পিসীমা।"

[বিদ্যুতের ঝলক্—দুম্‌দাম্ দমাদ্দম্—কড়্—কড়্—কড়াৎ!]

"এমন দুর্যোগের রাত কাটলে হয়! দোহাই মা দুর্গা! তোর পিসেমশাই কাল এসে আমাদের জ্যান্ত দেখ্‌বে কি না কে জানে! পরের ছেলেকে এনে কি বিপদেই পড়্‌লুম্। দাদাকে আমি কৈফিয়ৎ দেব কি?—"

অতি সন্তর্পণে এবং সসঙ্কোচে ক্ষীণকায় তেপায়ার ওপর সসেমিরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। নীরবে পিসীমার কাতরোক্তি শুনি।

"মণ্টু, ভূমিকম্পের সময় কি করে রে? শাঁখ, ঘণ্টা বাজায় না? ওতেই ভূমিকম্প থেমে যায়—নয় কি? ঝড়-বৃষ্টি কি ভূমিকম্পের চেয়ে কম মারাত্মক? আয় আমরা শাঁখ ঘণ্টা বাজাই—তা হ'লে ঝড়-বৃষ্টিও থাম্‌বে। শাঁখ এই কুলুঙ্গিতেই আছে, আমি নিচ্ছি। ওধারের তাক্ থেকে ঘণ্টাটা তুই পেড়ে আন্। অন্ধকারে পার্‌বি তো?"

অন্ধকারেই আমি ঘাড় নাড়ি।

"এনেছিস্?—বড্ড দেরী কর্‌ছিস্ তুই। বাঁচ্‌তে আর দিলি না আমাদের?"

তাকের এবং শাঁখের অন্বেষণে তিনটে চেয়ার ওল্‌টাই, গোটাকত গেলাস্ ফেলি, জলের কুঁজোকে নিপাত করি। "এনেছি পিসীমা।"

"বেশ, এবার ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। খুব জোরে জোরে পেট্—যেন আকাশে দেবতারা শুন্‌তে পান্। আমি শাঁখ বাজাচ্ছি।"

পিসীমা শাঁখ বাজান্, আমি ঘণ্টা পিটি। প্রাণপণেই পিটি। কানের সমস্ত পোকা বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা জান্‌লা খুলে যায়, একজন ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। চোর নাকি? পিসীমা ভয়ে কাঠ হয়ে যান। আমিও ঘণ্টাবাদ্য থামাই।

"ডাকাত পড়েছে নাকি?" ছায়ামূর্ত্তি বলে, "তোরা কি লাগিয়েছিস্ মন্‌টে? এ সব কি কাণ্ড?"

"বিদ্যুৎ তাড়াচ্ছি পিসেমশাই!" করুণ কণ্ঠে আমি বলি।

"বিদ্যুৎ! আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, বিনা মেঘেই বিদ্যুৎ? এমন খাসা চাঁদ্‌নী রাত—! আর তোদের কাছে বজ্রাঘাত? বাইরে চেয়ে দেখ্ দেখি।"

তাই তো! বাইরে তাকিয়ে দেখি পরিষ্কার ধব্‌ধবে জোৎস্না। আমি ও পিসীমা দু'জনেই দেখি। পিসীমা বলেন—"তা হ'লে এত দুম্‌দাম্, ধুম্‌ধাম্, বজ্রপাতের শব্দ, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি—এ সব কিছুই না?"

"ওঃ! ওই আওয়াজ!" পিসেমশায়ের উচ্চহাস্য আরম্ভ হয়—"জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন কিনা! কলকাতা থেকে যত রাজ্যের বাজির অর্ডার দিয়েছেন! রাত এগারোটার ট্রেনে সে সব এসে পৌঁছল—বোমা, পট্‌কা, তুব্‌ড়ি, উড়ন্-তুব্‌ড়ি, হাউই—আরো কত কি! এতক্ষণ তো বাজি পোড়ানোই হচ্ছিল—তারই ঝলক্ দেখেছ, তারই আওয়াজ শুনেছ তোমরা।"

পিসেমশায়ের হাসি আর থাম্‌তে চায় না।

দস্তুরমত নাটক

(শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্)

সম্পাদক মশাই ধরেছেন, একটা গল্প দিতে হবে; সময় দিয়েছেন মাত্র তিন দিন। তার ওপর তাঁর উপদেশগুলোও আবার অত্যুগ্র—কাগজের ছ' পৃষ্ঠার বেশী তিনি আমায় দিতে পারবেন না; এই ছ' পৃষ্ঠার ভেতর জমিয়ে দিতে হবে গল্পটি এম্‌নি যে পাঠক-পাঠিকারা এক

নিঃশ্বাসে সেটি পড়ে যেন বল্‌তে পারে—"আঃ ষ্টানিং ! সিন্টিলেটিং !" তিনি তো বলে খালাস, কিন্তু আমি লিখি কি ?

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম একটা য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্পই লিখ্‌তে হবে কেননা অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করে আস্‌ছি বাঙ্গালী ছেলেরা সব চেয়ে পছন্দ করে য়্যাডেভেঞ্চারের গল্পই। পড়তে পড়তে মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠবে, সমস্ত শরীরময় রোমাঞ্চ আর শিহরণ নৃত্য করতে থাক্‌বে, তবে না গল্প ! খুব ষ্ট্রং করে গরমাগরম এক কাপ্‌ চা খেয়ে নিয়ে খাতাপত্তর পেড়ে বসা গেল। ' অল্প খানিকক্ষণের চেষ্টাতেই কলমের মুখে বেরিয়ে এল এক গল্প—রোমহর্ষক, হৃদয়মন্থক এক গল্প। কল্‌কাতার সেরা সড়ক চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে নায়ক ছুটিয়ে চলেছে তার বেবি অষ্টিন গাড়ী, পেছনে তেড়ে আস্‌ছে এক দল রক্তলোলুপ দুস্যু। রাত দুপুর, ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, পাঁচ হাত দূরের লোকটিকেও চেনা যায় না : মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুৎ চমক্‌ হান্‌ছে, রক্তপিপাসুদের হাতের হিমশীতল ধারাল ইস্পাতখানাই কেবল তাতে ঝক্‌মকিয়ে উঠ্‌ছে। বায়ুবেগে নায়ক চলেছে ছুটে ; হ্যারিংটন রোডের মোড়ে পৌঁছতেই তার মনে হ'ল বিপরীত দিক্‌ থেকে চলন্ত একটা পাহাড় এগিয়ে আস্‌ছে তারই দিকে। ঠিক সেই সময় আকাশে আবার বিদ্যুচ্চমক খেলে গেল—কী সর্ব্বনাশ ! নায়ক দেখলে একটা হিংস্র গণ্ডার মাথা নীচু করে তারই পানে এগিয়ে আস্‌ছে। ব্রেক কষে চট্‌ করে অম্‌নি নায়ক তার গাড়ীর আলো নিভিয়ে ফেল্ল, তার পর সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে এগিয়ে চল্ল ময়দানের পাশে পুকুরটির দিকে। পুকুরের শীতল জলে গলা অবধি ডুবিয়ে দেবার পর এইবার সে প্রথম অবকাশ পেলে চৌরঙ্গীর দিকে ফিরে তাকাবার। ঠিক সেই সময় আবার বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ল, নায়ক চেয়ে দেখে তার অনুসরণকারী রক্তপিপাসুদের প্রকাণ্ড বুইক্‌খানা উল্টে পড়েছে দুরন্ত গণ্ডারটার প্রচণ্ড সংঘর্ষে। দু'হাত ওপরে তুলে ভগবানের উদ্দেশ্যে সে ধন্যবাদ জানাতে যাবে হঠাৎ থল্‌থলে পিছল অথচ লোহার সাঁড়াশির চেয়েও শক্ত কতগুলো বাহু এক সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধর্‌ল—পা থেকে কণ্ঠ অবধি বজ্রবেষ্টনীতে। এবার নায়কের মুখ একেবারেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কেননা সে বুঝ্‌তে পেরেছিল জলরাজ্যের বিভীষিকা অষ্টবাহু অক্টোপাসের কবলে পড়ে আছে। ভাগ্যিস, কলম-কাটা ছুরিটা সঙ্গে ছিল।

আর্টিষ্টিক ফিনিস্‌টা দিয়েই ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিলাম। এবার বাংলা শিশু-সাহিত্যে আলোড়ন না পড়ে যায় কোথা ? বেচারা সম্পাদক, তোমার দেখ্‌ছি জুতোর খরচটা বেড়ে গেল—কতবার ধর্ণা দিতে এই দুয়ারেই আস্‌তে হবে তা এখনও জান না। দৃশ্যটার কল্পনাতেই আরামে চোখ বুঁজে এল।

চোখ যখন চাইলাম, দেখি আমাদের সরকারি কেষ্ট মামা (তিনি পাড়ার ছেলে-বুড়ো

সকলেরই কেষ্ট মামা) টেবিলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পটা পড়্‌ছেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌লেন, "গাঁজার সের আজকাল কত করে রে ?"

"তা তো জানি না ! কেন ?"

"ওঃ এমনিই পাস্‌ বুঝি ! তাই চৌরঙ্গীর রাস্তায় গণ্ডার আর ময়দানের পুকুরে অক্টোপাস্‌ দেখ্‌িস্‌ !"

"আহা, এ তো আর সত্যি নয়, গল্প ! ছেলেরা ছুটীর দিনে পড়বে, মনে মনে আনন্দ পাবে, তাদের এটুকু উপকারও আমায় তুমি করতে দেবে না ?"

"আর তার চাইতেও তাদের যদি বড় উপকার করা সম্ভব হয় আমায় তা কর্‌তে দিবি তো ?"

"নিশ্চয়।"

কেষ্ট মামা বিনা বাক্যব্যয়ে গল্পটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দিলেন। সাহিত্যের সমঝদার বলে কেষ্ট মামার সুনাম ছিল, তাই আমি আর প্রতিবাদ করবার ভরসা পেলাম না।

কিন্তু এদিকে সম্পাদক মশাই সময় দিয়েছেন মাত্র তিন দিন, তার দু'দিনই গেছে কেটে—য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্পটির পরিকল্পনাতে, হাতে আর সবে এক দিন। এক দিনে তাঁর ষ্টানিং সিন্টিলেটিং গল্প লিখি কি করে ! শেষে আর কূলকিনারা না পেয়ে অবিনাশ ভায়ার শরণ নেওয়া গেল। অবিনাশ আমার বল-ভরসা, বুদ্ধিসুদ্ধি, একাধারে সমস্তই, বিপদের সময় তার কথাই সবার আগে মনে আসে। সব কথা শুনে সে আমার পিঠ চাপড়ে একগাল হেসে বল্লে—"এই ব্যাপার ? তুইও য্যামোন, চুটিয়ে ভূতের গল্প লেখ না গিয়ে ? বলি ভগবান্‌ ভূত সৃষ্টি করেছেন কেন জানিস না বুঝি—তোদের মত লিখিয়েদেরই পরিত্রাণের জন্য। প্লটের জন্যে মাথা খুঁড়ে মরতে হয় না, সম্ভব অসম্ভবের বালাই নেই, মাথার একটা স্নায়ুকেও চিন্তার চাপ সইতে হয় না, অথচ গল্প বেরোয় এম্‌নি যে সবারই চোখ হয়ে যায় ছানাবড়া। লেখ তুই ভূতের গল্প, দেখি ইণ্টারেষ্টিং না হয়ে যায় কোথা ?

বন্ধুবরের উপদেশ মত ফেল্লাম লিখে এক ভূতের গল্প, সেদিন সকাল বেলাতেই। পড়ে আমারই বুক শিউরে উঠতে লাগ্‌ল। কেষ্ট মামাকে এবারে ঠাণ্ডা করে দেব ! দুপুরে কেষ্ট মামা আড্ডা দিতে আস্‌তেই তাঁর হাতে গল্পটি তুলে দিলাম। পড়েই তো তিনি থৈইথৈই করে উঠলেন, বল্লেন, "তোর আগের লেখা ছিঁড়েছি, এ লেখায় দস্তুর মত আগুন ধরিয়ে দেব। আরে আমার ভাইপোটা চোদ্দ বছরের ঢেঁকি—যে বয়সে সাহেবের ছেলেরা বাপ-মা ছেড়ে দুনিয়াময় জাহাজে জাহাজে কাছি টেনে বেড়ায় সেই বয়সের ছেলে—সেদিন সন্ধ্যার সময় তাকে বল্লাম, "দেখ চোড়ো,

ওপর থেকে আমার চশমার খাপটা নিয়ে আয় তো!" ছোঁড়া বল্লে কিনা, 'রামভজনকে পাঠাও ছোটকা, আমার বড্ড ভয় করে।' তখনই আমার সন্দেহ হ'ল, গিয়ে দেখি কিনা ছেলেটার ডেস্ক-ভরা বই—শুধু ভূতের গল্পের!"

এবার আমারও মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল, বল্লাম, "আমি যা লিখ্‌ব, তাইতেই যদি তুমি নাক সিঁটকাবে, তবে গল্পের প্লট্ আমি পাই কোথা বল! হাতে শুধু সময় আছে আজকের দুপুর আর রাত্তিরটা, কাল ভোরেই সম্পাদকের লোক আস্‌বে তাগাদায়—সে খবর রাখ কি?"

কেষ্ট মামা মুরুব্বিয়ানা চালে একটু হেসে নিয়ে বল্‌লেন, "গল্পের প্লটের অভাব কি রে? দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে বাস করছিস, তোর ডাইনে বাঁয়ে, সাম্‌নে পেছনে যে অফুরন্ত জীবন-নাটক চল্‌ছে, তা থেকে প্লট্ বেছে নিলেই তো হ'ল! তবে বেছে নেওয়ার মত দেখ্‌বার ক্ষমতা আর উপযুক্ত রসবোধ চাই!"

আমার রাগ তখনও পড়ে নি, উদ্ধত ভাবে জবাব দিলাম, "সে ক্ষমতা আমার নেই তা কি কর্‌ব?"

কেষ্টমামাও ছেড়ে কথা কইলেন না, "তা হ'লে বাপু তুমি গল্প লিখ্‌তে এস না, কাঠ চেলাও গে।"

বোধ হয় তিনি বুঝলেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট কাজটী আমার মনঃপূত হয় নি, তাই একটু পরে আবার বল্লেন, "কথা যখন দিয়েছিস তখন গল্পও একটা দিতে হবে বৈকি! আমারই প্রত্যক্ষ করা একটা ছোটখাটো নাটক ঘটেছিল অনেক দিন আগে। আমি বলে যাই, তার পর তুই সমস্ত গুছিয়ে লিখে পত্রিকার অফিসে পাঠিয়ে দিস্"।

কেষ্ট মামা তাঁর কাহিনী স্থরু কর্‌লেন—

বছর কুড়ি আগের কথা আমরা তখন কলেজের ছাত্র। বড়দিনের ছুটীতে রেল কোম্পানী কন্‌সেসন ঘোষণা করেছে, আমরা পাড়ার সমবয়সী দল ঠিক কর্‌লাম এই সুযোগে একবার পশ্চিম ঘুরে আস্‌ব। শুধু ঘুরে আসা নয়, বড় বড় সহরগুলিতে ক্রিকেট্ ম্যাচও খেলে আসা যাবে। 'বেঙ্গল ষ্টল্‌ওয়ার্ট্‌স্' নাম নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়্‌লাম।

যাত্রার দিনে বোধ করি মঘা, অশ্লেষা, দিক্‌শূল, মাসদগ্ধা বা ওই রকমের একটা কিছু ছিল, কিন্তু আমরা কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করি নি, কেননা পঞ্জিকাতে যাত্রা 'নাস্তি' ছাড়া যাত্রা 'অস্তি' বড় দেখা যায় না—সারা ভেকেশনটাতে একদিনও 'অস্তি' লেখা ছিল না এ কথা বেশ মনে আছে।

কিন্তু 'দিক্‌শূলের' চক্ষুশূল হয়েছিলাম বলেই কিনা জানি না, যাত্রাটা সেবার আমাদের বড় সুবিধার হয় নি। দিল্লীর মাঠে ক্রিকেট খেল্‌তে নেমেই সেটা বেশ টের পেলাম। 'বেঙ্গল ষ্টল্‌ওয়ার্ট্‌স্' নাম শুনে ওখানকার লোকেরা নিশ্চয়ই ভেবেছিল এটা একটা বঙ্গ-বাছাই দল,

খেলার মাঠে ঝেঁকে লোক এল আমাদের খেলা দেখ্‌তে। চারদিকের জনসমুদ্র দেখে আমাদের মাথা মাত্র বসুন্ধরার মতই অনবরত ঘুরছিল; তার পর যখন দিল্লীর বিখ্যাত ফাষ্ট বোলাররা বল্ দিতে সুরু কর্‌ল তখন ক্রিকেটের বল আর আমরা চোখে দেখ্‌তে পাই নি, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের কোমরে, পাঁজরায়, পিঠে আর ঘাড়ে যে সব মাংসময় ছোট ছোট বল্ গজাতে লাগ্‌ল কেবল সেগুলোই অনুভব কর্‌ছিলাম। খেলার মাঠে দর্শকদের টিট্‌কারি তবু বা সহ্য হয়েছিল, কিন্তু খবরের কাগজগুলো যখন "বেঙ্গল ক্রিকেটের উওফুল ষ্ট্যাণ্ডার্ড্" বড় বড় হেড্ লাইন দিয়ে সহরময় প্রচার করে দিল তখন বাস্তবিকই মনটা মুষড়ে পড়্‌ল। এখানেই ব্যাপারটার ইতি হল না, দু'দিন বাদে আমাদের হোটেলের বাঙ্গালী ম্যানেজার কল্‌কাতার একখানা বিখ্যাত দৈনিক এনে হাজির কর্‌লেন; তাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করে শেষের দিকে লেখা হয়েছে, যে সব চুণোপুঁটি এই ধরণের গাল-ভরা নাম নিয়ে লোকের মনে ধারণা জন্মাতে চেষ্টা করে যে তারা বাংলা দেশের মুখপাত্র খেলোয়াড় তারা যে সমস্ত বাংলাদেশের, সমস্ত বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক তাতে সন্দেহ নাই।

অন্য কোন সহরে ক্রিকেট খেলার সাধ তখন আমাদের সম্পূর্ণ উবে গিয়েছিল, পশ্চিম ভ্রমণ শেষ করতেই আমরা বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দলটা দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেল; দলের বেশী ভাগই রওনা হয়ে পড়্‌ল লাহোর-পেশোয়ার-খাইবারের অভিমুখে, কেবল আমি ব্রজেন আর হিমাদ্রি এদিক্ চলে আসা স্থির করলাম, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস হয়ে।

সন্ধ্যার কিছু আগে দিল্লীর ষ্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে উঠে বসলাম; রেলে দীর্ঘ পথ চলার ফন্দি-ফিকির সবই ব্রজেনের জানা ছিল, বেডিং আর সুট্‌কেসে বেঞ্চির অর্দ্ধেকটা জায়গা জুড়ে সে জানলার পাশটিতে গিয়ে বস্‌ল। গাড়ী চল্‌তে সুরু কর্‌লেই সুট্‌কেস যাবে বেঞ্চির তলায় আর সেই শূন্য জায়গায় লম্বমান হবে স্বয়ং ব্রজেন। গাড়ীতে যাত্রীর ভীড় হয়েছে বেশ, তবে তারা সকলেই প্রায় নিম্নশ্রেণীর লোক, ব্রজেনের সাহেবী পোষাক আর ঘন ঘন পাইপ টানা দেখে কেউ সেদিকে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না, মালপত্রের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ী ছাড়ার আর মাত্র মিনিট দশেক বাকী, দেখি একদল পাঞ্জাবী যুবক হৈ হৈ কর্‌তে কর্‌তে ট্রেণের দিকে আস্‌ছে। আমাদের কামরার সাম্‌নাসাম্‌নি এসেই তারা থেমে পড়ল, পেছনের কুলীদের উদ্দেশে হাঁক দিল, "এ কুলী লোগ, এহি-বগিপর চঢ়াঁও"। নিজেদের ভেতর তাদের কথা হচ্ছিল এম্‌নি চোস্ত উর্দ্দূ বা গুরুমুখীতে (কোন্‌টা জানি না) যে সাধ্য কি আমাদের মত বঙ্গবাসী তার ভেতর দন্তস্ফুট করে। তবে মাঝে মাঝে তারই ভেতর উচ্চ হাসি আর 'বেঙ্গল ষ্টল্‌ওয়ার্ট্‌স্ কথাটা কানে এসে আমাদের শিরদাঁড়াকে প্রায় খাড়া করে তুল্‌ছিল। আমরাই যে তাদের উপহাসের

পাত্র তা বুঝতে পেরে ব্রজেন গুম্ হয়ে গেল—সে-ই আমাদের ক্রিকেট্ টিমের ক্যাপ্টেন কিনা!

যুবক কয়টি যে অতি-তৎপর তা তারা জানিয়ে দিলে গাড়ীতে ওঠা মাত্রই; তাদের মধ্যে অতিকায়তমটি বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রজেনের স্যুট্‌কেস্ বাঙ্কের উপর তুলে রেখে ব্রজেনের পাশেই বসে পড়ল। আর একজন আবার পরোপকারধর্ম্মী, তিনি বেডিংটিও নীচে নামিয়ে রেখে অনেকের বস্‌বার স্থান সঙ্কুলান করে দিলেন। ব্রজেন একেবারে সচীৎকারে লাফিয়ে উঠ্‌ল, তার চোখ-মুখ রাগে রাঙ্গা হয়ে গেছে। কিন্তু বাহাদুর সে ছোক্‌রা ক'টি; পালটে মেজাজ তো দেখালই না, বরং একজন আবার মিষ্টি মিহি সুরে বল্লে, "দিল্ খুস্ কীজিয়ে বাবুজি! কাঁহা যাতে হেঁ? ক্রিকেট্ খেল্‌নেকি লিয়ে?" সঙ্গে সঙ্গে সব ক'জনারই আবার সেই উচ্চহাস্য।

এই প্রকাশ্য বিদ্রূপ নীরবে হজম করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। ঠিক এই সময়ে গার্ড সাহেব সিটি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন যে গাড়ী ছাড়বার আর দেরী নেই। অতিকায়তমটির সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে অপর যুবক কয়টি তখন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ওপর নেমে পড়ল। তারা যাবে না, শুধু বন্ধুকে তুলে দিতে এসেছিল। কিন্তু ক্ষতি যা করবার ইতিমধ্যেই তারা তা করেছে—স্যুট আর পাইপের ভয় ভেঙ্গে দেওয়ায় ব্রজেনের বেঞ্চিখানা প্যাসেঞ্জারে ভরে গেছে, এখন সেখান থেকে আস্‌ছে শুধু বিড়ির ধোঁয়া।

ট্রেন মোশান্ দিল, আমাদের অতিকায় সঙ্গীটি একখানা খবরের কাগজ বার করে বস্‌ল। ব্রজেন ইঙ্গিতে তাকে দেখিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বল্লে, "এই হতভাগাটাই সব নষ্টের গোড়া। ঘাড় ধরে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, তবে রাগ যায়।"

বিড়ির গন্ধে আমারও নাক জ্বলে যাচ্ছিল, ব্রজেনের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি দেখিয়ে বল্লাম, "বাস্তবিকই মনে মনে ইচ্ছে হচ্ছে জান্‌লা দিয়ে দিই ব্যাটাকে ফেলে। তবে ও দেহ জানলা দিয়ে গল্‌বে না, এই যা মুস্কিল!"

হিমাদ্রি কিন্তু এতটুকু উষ্মা দেখাল না, বরং ভদ্র মোলায়েম স্বরে ইংরাজিতে লোকটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল "ওয়েল স্যর, আপনি কত দূর ট্র্যাভ্‌ল্ করবেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"মৌলিনপুর" বলে লোকটা আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ কর্‌ল। ব্রজেন ভারী বিরক্ত হয়ে বল্লে, "ব্যাপার কি রে হিমাদ্রি, তুই যে বেজায় ভক্তিমান্ হয়ে উঠ্‌লি, গুরুঠাকুর করবি নাকি মর্কটটাকে?"

"আহা ধৈর্য্য ধরে দেখ্‌ই না শেষ পর্য্যন্ত কি করি! হতভাগা পদে পদে আমাদের উপহাস করেছে, রাত্তিরের ঘুমটা মেরে দিয়েছে, ওকেও সহজে ছাড়ছি না; এই পশ্চিমের শীতে রাত দুপুরে গাড়ী-ছাড়া করে তবে ছাড়া! তবে গায়ের জোরে কিছু হবে না। একে ওর দেহটা

আমাদের তিনটের সমান, তার উপর আবার গাড়ীশুদ্ধ সবাই মনে মনে ওর পক্ষে। কৌশল খাটাতে হবে।...তোরা এক কাজ করবি—এর পরেই যে বড় ষ্টেশনটা আসবে সেখানে কোন ছুতোয় দু'জনেই প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নেমে পড়বি। আমি ব্রজেনের যায়গায় গিয়ে বসে ওর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেল্‌ব। আমি তো আর খেলায় নামি নি, কাজেই আমায় যে ও এর আগে দেখে নি তা নিশ্চিত। কথাপ্রসঙ্গে বল্‌ব, আমি থাকি সেলোনের স্যানিটেরিয়ামে, বন্ধুরা এ অঞ্চলে খেল্‌তে এসেছে তাই দিল্লী এসেছিলাম তাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে। অনেক দিন দেশে যাওয়া হয় নি, ওদের পাল্লায় পড়ে তাই দেশে চলেছি। কথাটা শুনেই বাছাধনের মুখ আম্‌সী হয়ে যাবে, কেননা সিমলার কাছে সেলোনের স্যানিটেরিয়াম্ যে যক্ষ্মা-রোগীদেরই আস্তানা তা এ অঞ্চলে কারো অজানা নেই। আর আমার এ চেহারার সঙ্গে বর্ণনাটা মিল্‌বেও ভাল। তার পর তোরা ফিরে এলে তোদের সঙ্গেও ওর আলাপ করিয়ে দেব—অবশ্য ইতিমধ্যেই যদি ও না পালায়। তোরাও কথা কইবি খুব ভদ্র ভাবে, কোন রকম বিরুদ্ধ ভাব না দেখিয়ে! তার পর ক্ষাণিকক্ষণ পরেই আমি ভীষণ জোরে কেসে উঠ্‌ব; তোরা ভারী ভয় পেয়ে যাবি, ওকে জানিয়ে দিবি ফুস্‌ফুস্ থেকে রক্ত ওঠ্‌বার এই পূর্ব্বাভাস। ব্যস্, আর কিছুই করতে হবে না!"

মৎলবটা মোটের ওপর মন্দ লাগ্‌ল না, অন্ততঃ পরীক্ষা কর্‌বার মত বটে। পরের প্রথম জংসন ষ্টেশনেই আমরা নেমে গেলাম। ফিরে এসে দেখি অতিকায়ের সঙ্গে ক্ষুদ্রকায় হিমাদ্রির দিব্যি বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। হিমাদ্রি চিরকালই ইংরাজীটা বলে ভাল, লোকটা ভারী ভক্তিমান্ হয়ে উঠেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের সঙ্গেও আলাপ জমে উঠ্‌ল।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে হঠাৎ হিমাদ্রি একবার খক্‌খকিয়ে কেসে উঠ্‌ল—তার পরই দু'হাতে বুক চেপে ধরে তার সে কী যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী, সে কী কাসির ধমক! ও যে এত বড় অভিনেতা সে কে জান্‌ত! কিন্তু অবাক্ হয়ে চেয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, এবার অভিনয়ের পালা আমার। মুখখানাকে যথাশক্তি কালো করে লোকটাকে বুঝিয়ে দিলাম যে অবস্থা কি সাংঘাতিক রকমের গুরুতর। এর পরেই ফুস্‌ফুস্ ভেদ করে পো-টাক খানেক রক্ত বার হবে, রোগী নিঃসাড় নিঝুম হয়ে ঢলে পড়্‌বে এই বেঞ্চিরই ওপরে। এই বিদেশ-বিভূঁয়ে আমরা এখন—ইত্যাদি।

নাঃ, যার যা প্রাপ্য প্রশংসা তা দিতেই হবে—অসাধারণ লোকটার পরোপকার-প্রবৃত্তি। নিজে তো সে ঘাবড়ালই না, আমাদেরও ঘাবড়াতে দিল না, বল্লে, "আমার একটু একটু সাধারণ ডাক্তারি জানা আছে, রোগীর অবস্থা খুবই গুরুতর বটে, তবে একটু চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি। বিশেষ এখানে যখন অন্য কোন ডাক্তার পাবারই সম্ভাবনা নেই।" বলেই ক্ষিপ্রহস্তে সে হিমাদ্রির সবগুলো জামার বোতাম খুলে ফেলে গা একেবারে খালি করে দিল; তার পর আঙ্গুল দিয়ে ফুস্‌ফুসের মাংসপেশী অনুভব করে করে দু'হাতে চাপ দিতে লাগল। একে

ডিসেম্বরের শীত, তাতে দেশটা পশ্চিম, তাতে খালি গা। তার পর সেই মর্ত্তমান কলার মত মোটা মোটা আঙ্গুলগুলোর টিপুনি তো রয়েইছে! বেচারা হিমাদ্রি! এক নিমেষে তার কাসি থেমে গেল, ফুস্‌ফুস আশাতীত রকম সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল, তড়াক করে খাড়া হয়ে উঠে জামা গায়ে আঁটতে আঁটতে সে বল্লে, "হোয়াণ্ডার—হোয়াণ্ডার—হোয়াণ্ডারফুল ট্রিট্‌মেণ্ট্।"

হিমাদ্রির কাসির ধমক সুরু হতেই ব্রজেন্দ্র উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ ধপ্ করে বেঞ্চির ওপর বসে পড়তে পড়তে সে বল্ল, "দূর ছাই, মৎলবটা একেবারেই মাঠে মারা গেল!"

ঘণ্টা দুই বাদে মাঝারি গোছের একটা ষ্টেশন এল—মৌলিনপুর; আমাদের অতিকায় সহযাত্রী এখানে নেমে যাবে। গাড়ী থাম্‌তেই সে তার সুট্‌কেস্‌টি হাতে করে উঠে দাঁড়াল, তার পর আমাদের দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বল্লে, "মশাইরা, এবার তা হ'লে আসি; আপনাদের প্ল্যানটা মাঠে মারা যাওয়ায় আমিও খুব দুঃখিত। কিন্তু আপনারাই যে গোড়ায় গলদ্ করে বসেছেন, আমার বন্ধুদের মত আমাকেও পাঞ্জাবী ঠাউরে, আমার সাম্‌নেই আমার মাতৃভাষায় সমস্ত প্ল্যানটা খুলে বলে। আমি পাঞ্জাবী নই, প্রবাসী বাঙ্গালী। আচ্ছা নমস্কার। বেটার লাক্ নেক্‌স্‌ট্ টাইম্!"

পঙ্গপাল

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

ভয়ঙ্কর প্রাণী বলিতে সাধারণতঃ বাঘ-সিংহের কথাই আমাদের মনে পড়ে। ভালুক, গণ্ডার, গরিলা, বুনোহাতী—এরাও নেহাৎ অগ্রাহ্য করিবার মত নয়; কিন্তু আমি যদি সেই সঙ্গে দু'-তিন ইঞ্চি লম্বা এক জাতের পোকার নামও করি তবে বোধ হয় অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তবিক, আমি যে পোকার কথা বলিতেছি সেই পঙ্গপালের মত ভয়ঙ্কর প্রাণী পৃথিবীতে খুব বেশী নাই। আজ পর্য্যন্ত কত হাজার হাজার গ্রাম যে এদের হাতে একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে, কত লক্ষ লক্ষ লোক যে এদের অত্যাচারের ফলে দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে প্রাণ হারাইয়াছে কে তার হিসাব দিবে? পৃথিবীর বুকে এরা যেন ভগবানের এক দারুণ অভিশাপ।

পঙ্গপাল ফড়িং জাতের জীব—দেখিতেও অনেকটা আমাদের গঙ্গাফড়িং-এরই মত। কিন্তু স্বভাবটি এদের গঙ্গাফড়িংএর মত শান্ত মোটেই নয়। ঝাঁক বাঁধিয়া এরা উড়িয়া বেড়ায়। সে ঝাঁক এক-একটা কত বড় হয় জান? দশ-বিশটা নয়, দু'-চার শ' বা হাজারও নয়, এক সঙ্গে কোটি কোটি—না তার চেয়েও বেশী—অগণিত পঙ্গপাল এক-একটা ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায়। দুপুর বেলার প্রচণ্ড সূর্য্যও পঙ্গপালের পাখার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়—মনে হয় দুপুর বেলাই বুঝি সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাদের পাখার শব্দ সমুদ্রের গর্জ্জনকেও হার মানাইয়া দেয়। লোকে ভাবে সত্যই বুঝি প্রলয় আসিল—সৃষ্টি শেষ হইতে চলিল! সামান্য এক জাতের পোকার কি কাণ্ড বল দেখি!

ঝাঁক বাঁধিয়া পঙ্গপাল চলিয়াছে।

পঙ্গপাল যেখান দিয়া যায় সেখানকার অবস্থা তুমি কল্পনাও করিতে পারিবে না। এই হয়তো দেখিলে শস্যপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্ষেত, গাছপালায় ঢাকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন পড়িয়া আছে, হঠাৎ সেখান দিয়া একটা পঙ্গপালের ঝাঁক চলিয়া গেল; পর মুহূর্ত্তেই দেখিবে কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কোথায় গেল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, কোথায় বা গেল ঘন বনভূমি! একটি ঘাস বা পাতাও আর তোমার চোখে পড়িবে না—বিরাট্ বন মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতেছে। পঙ্গপাল প্রত্যেকটি শস্যকণা, প্রত্যেকটি গাছের প্রত্যেকটি পাতা, শিকড় পর্য্যন্ত খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, এমনই সর্ব্বগ্রাসী এদের ক্ষুধা! এর একটি কথাও কিন্তু আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। "আফ্রিকা স্পীক্‌স্" নামে একখানি বায়স্কোপের বইএ

এই রকম পঙ্গপালের আক্রমণের একটা ছবি তোলা হইয়াছিল। অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে বাঁচাইয়া ক্যামেরাম্যান্ সে ছবি তুলিয়াছিলেন। তোমরা যদি সে ছবিখানা দেখিয়া থাক তবে আমার কথা সত্য কিনা বুঝিবে।

পঙ্গপালের উপদ্রব সম্বন্ধে অনেক ভ্রমণকারী এবং প্রাণিতত্ত্ববিদ্ নানা রকম বর্ণনা দিয়াছেন। সে সব বর্ণনা শুনিলে বিস্ময়ে হাঁ হইয়া যাইতে হয়। বাইবেলে পঙ্গপালের উপদ্রবের কথা আছে—রামায়ণ-মহাভারতেও আছে। একবার এক ভ্রমণকারী একটি পঙ্গপালের ঝাঁক দেখিয়াছিলেন—ঝাঁকটি তাঁর চোখের সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতে পুরা একটি দিন লাগিয়াছিল। শ' দেড়েক বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা পঙ্গপালের ঝাঁক দেখা গিয়াছিল। এই একটি ঝাঁক ২০০০ বর্গ মাইল জায়গা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া এই ঝাঁকটিকে উড়াইয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলে। সমুদ্রের ঢেউ যখন পঙ্গপালগুলির মৃতদেহ বেলাভূমিতে আনিয়া ফেলিল তখন দেখা গেল মৃত পঙ্গপালের শরীরে ৪০ মাইল লম্বা, ৪ফুট উঁচু এবং বেশ খানিকটা চওড়া একটা বাঁধ তৈরী হইয়া গিয়াছে। আর একবার আমেরিকার সমুদ্র-কিনারায়ও ঠিক্ এই রকম এক দল পঙ্গপালের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। চওড়ায় ১২০ ফিট্ জায়গা, আর লম্বায় ১৩৪ মাইল জায়গা যুড়িয়া তারা পড়িয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় পঙ্গপালের উপদ্রব খুব বেশী। মাইলের পর মাইল যুড়িয়া রেল-লাইনের উপর জমাট বঁধিয়া পঙ্গপাল পড়িয়া আছে, হাজার হাজার মজুর খাটাইয়া তাদের কাটিয়া সরাইয়া না দিলে ট্রেন্ চলাচল বন্ধ হইয়া থাকে—এমন ব্যাপার সেখানে অনেকবার দেখা গিয়াছে।

এমন যে ভয়ঙ্কর প্রাণী পঙ্গপাল—গাছপালা জমির ফসল নিঃশেষ করিয়া দিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ডাকিয়া আনিতে যাদের যুড়ি মেলা ভার, এই মহাশত্রুকে নির্ম্মূল করিবার জন্য যে মানুষ ব্যস্ত হইবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু নির্ম্মূল করা কি সহজ কথা? একটাকে মারিলে হাজারটা আসিয়া দেখা দিবে! শব্দ করিয়া, আগুন জ্বালাইয়া, ধোঁয়া দিয়া, বিষাক্ত ওষুধ ছড়াইয়া—কত উপায়ে না মানুষ পঙ্গপাল তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। শুধু একবার

সাইপ্রাস্ দ্বীপের দু'টি ভদ্রলোক এক অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়া কতকগুলি পঙ্গপাল ধ্বংস করিয়াছিলেন। পঙ্গপাল সাধারণতঃ বালি কিংবা মাটীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তার মধ্যে লম্বা লম্বা চোঙ্গার মত ডিম পাড়ে। এক-একটা চোঙ্গা হইতে ৬।৭শ' বাচ্চা বাহির হয়। বাহির হইয়াই তারা উড়িতে পারে না বটে, কিন্তু খাইতে পারে প্রচুর। সম্মুখে যে গাছ-পাতা পায় খাইতে খাইতে তারা দল বাঁধিয়া রওনা হয়। তার পর পাখা গজাইলে উড়িতে আরম্ভ করে। পাখা গজাইবার আগে কোন মসৃণ পদার্থের উপর দিয়া তারা হাঁটিতে পারে না। উপরে যে দু'টি ভদ্রলোকের কথা বলিলাম তাঁরা করিয়াছিলেন কি, বাচ্চা পঙ্গপালের পথের উপর এক রাশ ক্যান্ভাসের বেড়া খাটাইয়া দিয়াছিলেন আর বেড়ার উপরটায় পাতিয়া দিয়াছিলেন অয়েল-ক্লথ্। বেড়ার নীচে ছিল বড় বড় খাদ। পঙ্গপাল বেড়া বাহিয়া উপরে উঠিত কিন্তু অয়েল-ক্লথে পৌঁছিয়াই পিছলাইয়া পড়িত খাদে। এমনি করিয়া এক বছরে তাঁরা দু'লক্ষ কোটিরও উপর পঙ্গপাল ধরিয়াছিলেন। অবশ্য এজন্য তাঁদের খরচও নিতান্ত সামান্য হয় নাই। কিন্তু তাঁরা বলেন তাতে তাঁদের লাভ ছাড়া লোকসান হয় নাই।

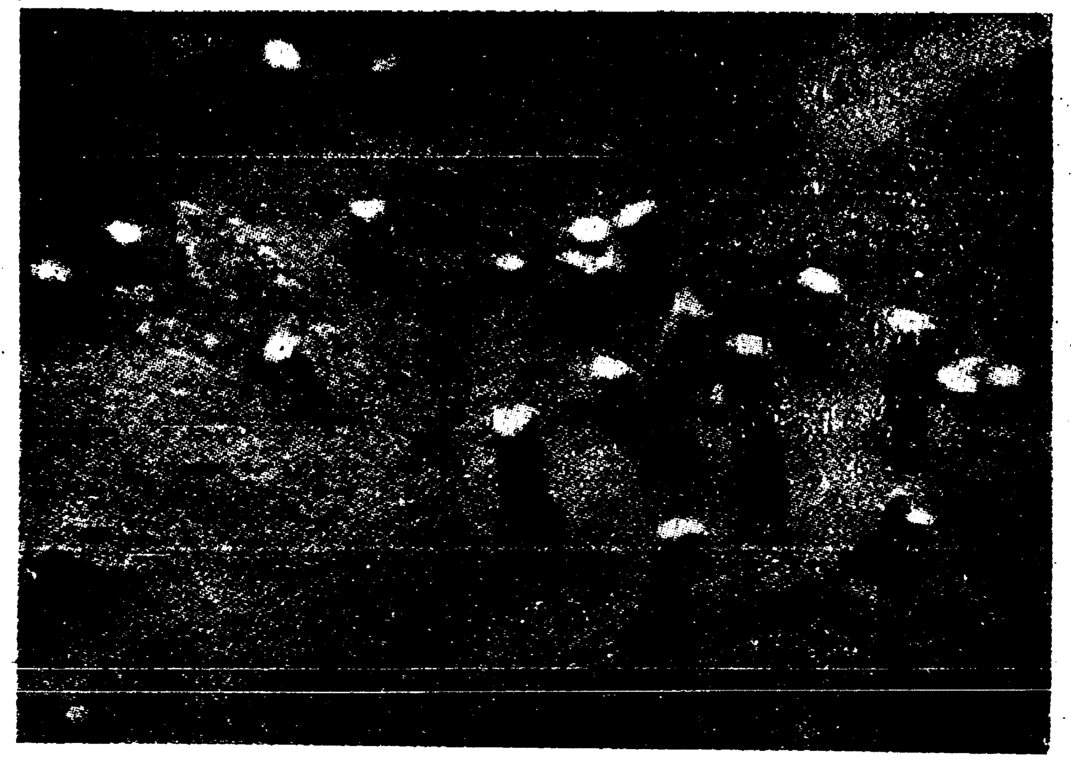

বালির মধ্যে চোঙ্গার আকারে পঙ্গপালের ডিম

এ উপায়ে পঙ্গপাল ধরা সম্ভব হইলেও ব্যাপারটি খুব সুবিধাজনক নয় এ কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও পঙ্গপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে না পারিলে সেটা বড়ই পরিতাপের কথা। তাই কিছু দিন হইল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী এই তিন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা মিলিয়া একটা "পঙ্গপাল-গবেষণা সমিতি" খুলিয়াছেন। পঙ্গপালের চালচলন পরীক্ষা করা, কি করিয়া

তাদের উচ্ছেদ করা যায় তার উপায় বাহির করা—এই সবই হইল এই সমিতির কাজ। পঙ্গপাল নানা জাতের আছে, এই সমিতির কাছ হইতে তাদের সম্বন্ধে অনেক মজার মজার খবর জানা গিয়াছে।

পঙ্গপাল ধ্বংস করিবার কিন্তু একটা সহজ উপায় আছে, তোমরা চেষ্টা করিতে রাজী আছ কি? আর কিছু না, পঙ্গপাল ধর, মার, রাঁধ আর খাও। হাসিও না, বাস্তবিক পঙ্গপাল নাকি অতি সুখাদ্য জিনিষ। পৃথিবীর নানা জাতের মধ্যে পঙ্গপাল খাইবার রেওয়াজ আছে। ইহুদীরা পঙ্গপাল খাইতে খুব ভালবাসে। আরবে, আফ্রিকায়, রাশিয়ায়, আমেরিকায়, এমন কি ব্রহ্মদেশেও পঙ্গপাল নানা ভাবে খাওয়ার চলন আছে।

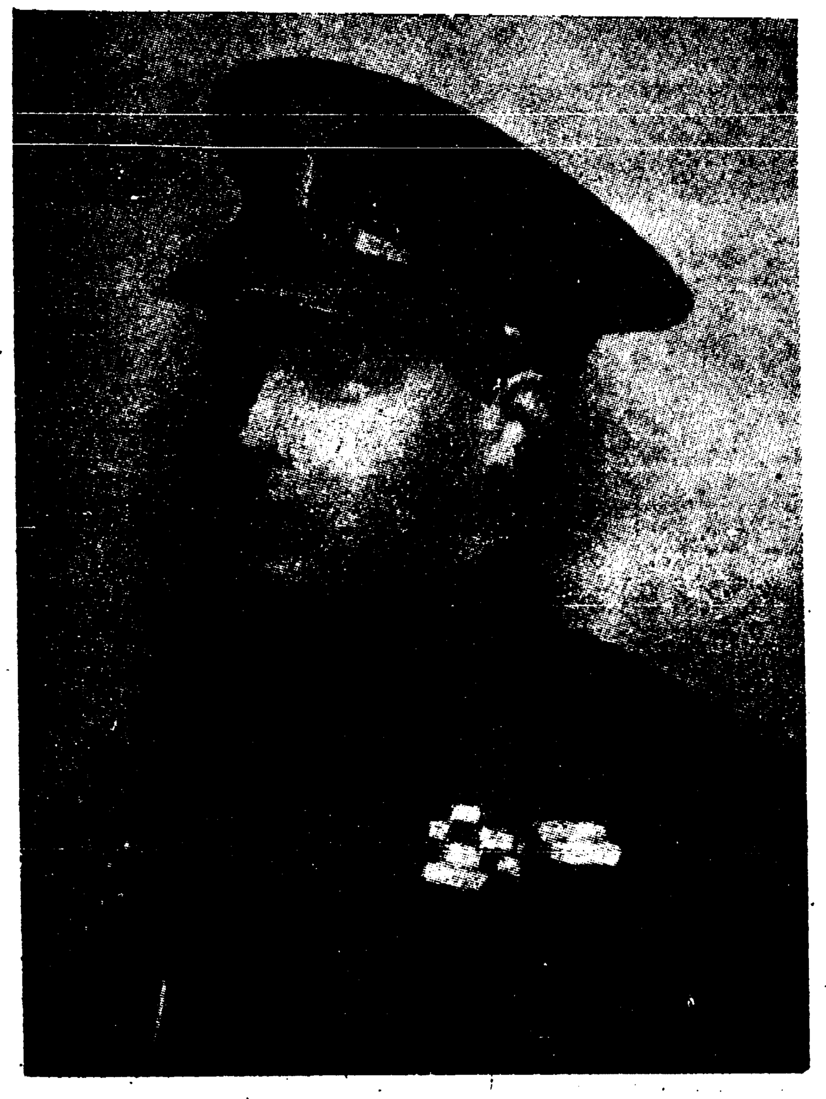

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্
অষ্টম এড্ওয়ার্ড্

বর্ত্তমান সম্রাট্
ষষ্ঠ জর্জ্

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(২৭)

এক গ্রামের লোক

পরদিন ভোর বেলায় সকলে হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

নৌকার ভিতর হুকা-কাশি তাঁর গল্প শেষ করেন নাই, ইচ্ছা করিয়াই যেন অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াছিলেন। ট্রেনে ওঠার পরও সেখানে এমনই অসম্ভব ভীড় দেখা গেল যে সকলে জটলা পাকাইয়া এক জায়গায় বসিবে এমন সম্ভাবনাই ছিল না। হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া সলিল। পরে জানা গেল, হুকা-কাশিই টেলিগ্রাম করিয়া তাহাকে আনাইয়াছেন।

গাড়ী হইতে জিনিষপত্র নামাইতে নামাইতে হুকা-কাশি বলিলেন, "এখন আর কোন কথা নয়, সটান বাড়ী গিয়ে সকলেরই বিশ্রাম। কথাবার্ত্তা যা বলবার সে ফের কাল সকালে হবে। শরীরের ওপর দিয়ে ঝড়টা তো আর মন্দ যায় নি! অমৃত, তুমি এগিয়ে গিয়ে একখানা ট্যাক্‌সি দেখ তো! রণজিৎ বাবু আর সলিল বাবু, আপনারা কিন্তু আমারই সঙ্গে যাবেন।"

পরদিন সকালেই সন্তোষ আসিয়া হুকা-কাশির বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল; দেখা গেল তারকেশ্বরের কৌতূহলও বড় কম নয়, সে সন্তোষেরও আগে আসিয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছে। আর সলিল আর রণজিৎ তো কাল হইতে হুকা-কাশিরই বাড়ীতে অতিথি। উপস্থিত সকলের জন্যই চা এবং জলখাবার তৈরীর হুকুম দিয়া হুকা-কাশি আবার তাঁর গল্প বলিতে বসিলেন :—

"সোনার হরিণ করায়ত্ত করে মিষ্টার বাসু আবার তাঁর স্বাভাবিক বেশে নিজের 'বন্ধুদলে' ভিড়ে পড়্‌লেন, অর্থাৎ অশনিকান্তদের দলে। ডায়মণ্ড্-করপোরেশনটিকে জাঁকিয়ে তুলে একটা বড় রকমের ফিল্ম্ কোম্পানী এবার গড়ে তুল্‌তে হবে, আদত যে জিনিষটির দরকার সেই টাকার সমস্যাই যখন চুকে গেছে। কিন্তু কখন কি ভাবে টাকাটা খরচ করা হবে সেই সব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে হয়তো তাঁর সঙ্গে অশনিকান্তের মতের অমিল হয়ে থাক্‌বে, অথবা হয়তো অশনিকান্ত ব্যবসা ট্যবসা ছেড়েছুড়ে একটা মোটা রকমের নগদ টাকা ট্যাকস্থ কর্‌বার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাক্‌বে—ঠিক কি কারণে এখনও বলতে পার্‌ছি না, অশনিকান্ত কিন্তু মনে মনে

আগেকার সমস্ত মৎলবই পাল্‌টে ফেল্লে। রামদয়াল নামে তাদের গাঁয়ের একজন লোক বহুদিন ধরে কাশীবাসী হয়ে, প্রকাশ্যে বাবার মন্দিরের পাণ্ডা অথচ আসলে কাশীধামের গুণ্ডাগিরি করে দিন গুজরাণ কর্‌ছিল। এসব তথ্য অশনিকান্তের অজানা ছিল না। এবার সে তারই শরণ নিলে। রামদয়ালের কাছে চিঠি গেল—'তুমি ধারণায়ও আন্‌তে পার না এমনি দামী একখানা রত্ন আমার শুধু খোঁজে নয়, একেবারে হাতের মুঠোর ভেতর রয়েছে। আমায় যদি ন্যায্য বখ্‌রা দিতে রাজী থাক, পত্রপাঠ মাত্র তৈরী হয়ে কল্‌কাতায় চলে এস।' দলবলশুদ্ধ রামদয়াল চলে এল কল্‌কাতায়; দেনা-পাওনার কথা পাকাপাকি হয়ে যেতেই একদিন রাত্তির বেলায় অশনিকান্ত কোন ফিকিরে তাদের বেলেঘাটা বাসা-বাড়ীর অধিকাংশ লোককেই বাইরে নিয়ে গেল, যাতে করে রামদয়াল নির্ব্বিবাদে সোনার হরিণটি লুটে আন্‌তে পারে।

"রামদয়াল সোনার হরিণ লুটে আন্‌ল বটে, কিন্তু কাজটা সে যে একদম্ নির্ব্বিবাদেই সার্‌তে পার্‌লে এ কথা বলা চলে না; তার কাণ্ডকারখানা একজনের চোখে পড়ে গেল—আমাদের সলিল বাবুর।

"অহিভূষণ চৌধুরী সরে পড়বার দিন কয়েক আগে থেকেই কয়েকটা ব্যাপারে সলিল বাবুর মনে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে—বোধ হয় দ্বারিক বাবুর এই নতুন সেক্রেটারী এবং তাঁর মেজ ভাই একই ব্যক্তি—দ্বারিক বাবুর ভয়ে নিজের আসল পরিচয় দিতে তাঁর সাহসে কুলোচ্ছে না, এই ভাবেই নিজের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌ছেন। ভগবান্ 'দিন' দিলে,—দ্বারিক বাবুকে নিজের কাজে খুসী কর্‌তে পার্‌লে—তখন ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে আপনা থেকেই পরিচয় দেবেন। কিন্তু দু'দিন বাদেই যখন সোনার হরিণ উধাও হয়ে গেল এবং প্রকাশ পেল যে সেই সঙ্গে সঙ্গে অহিভূষণ চৌধুরীও নিখোঁজ হয়ে পড়েছেন তখন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে এল। জঘন্য একটা মৎলব নিয়ে ইচ্ছে করেই যে ছদ্মবেশে মিষ্টার বাসু এ বাড়ীতে ঢুকেছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁর আর কোন সন্দেহই রইল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে সলিল বাবু নিজের কর্ত্তব্যও ঠিক করে ফেল্লেন—বড়দার এত সাধের ধন সোনার হরিণ যে করেই হোক, উদ্ধারের ব্যবস্থা তিনি করবেনই। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মেজদাকেও বাঁচাতে হবে; দুনিয়ার কাছে শেষ পর্য্যন্ত তিনি যে একটা ইতরশ্রেণীর বাটপার বলে প্রমাণিত হবেন, তাই বা তিনি সহ্য করেন কোন্ প্রাণে? তাঁর কথায় বার্ত্তায়, ভাবেভঙ্গীতে ঘুণাক্ষরেও এমন কোন ইঙ্গিত প্রকাশ পেলে চল্‌বে না যাতে করে কারুর মনে একবারও সন্দেহ জাগ্‌তে পারে যে মিষ্টার বাসুই অহিভূষণ চৌধুরী।

"বেলেঘাটার দিকে কোন বাড়ীতে মিষ্টার বাসুর দল আড্ডা গেড়েছে, এই রকম সন্দেহ করবার একটা কারণ ঘটায় সহরের ওই অঞ্চলটাতে সলিল বাবুকে দিন কতক খুব ঘন ঘন ঘোরাফেরা কর্‌তে হল। শেষে এক দিন সন্ধ্যার পর বাড়ীটাও তিনি এঁচে ফেল্লেন; কারো

সাড়াশব্দ নেই বাড়ীতে, চারদিক্ অন্ধকার, শুধু ওপরের একটা ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। হাতে টর্চ্চ ছিল, সদর দরজায় উঁকি মারতেই তো তাঁর চক্ষুস্থির! সাম্‌নের ঘরটাতেই একটা চারপেয়ের ওপর চাদর-চাপা-দেওয়া এক নেপালী দরওয়ান চোখ বুঁজে পড়ে আছে, তার সারা শরীর খাটিয়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। গুরুতর রকমের একটা কিছু ঘটেছে আন্দাজ করে চট্ করে ওপরে উঠে যাওয়াটা তিনি ভাল মনে কর্‌লেন না, নীচে থেকেই টর্চ্চের আলোতে আর কিছু আঁচা সম্ভব কিনা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ ওপরের কথাবার্ত্তা কানে এসে যেতেই প্রকৃত ব্যাপারটা তিনি বুঝে ফেল্লেন—চোরের ওপর বাটপারির বন্দোবস্ত হচ্ছে, সোনার হরিণের হাত-বদ্‌লী হচ্ছে। এক দৌড়ে অম্‌নি তিনি বাইরে চলে এলেন, যদি কোথাও কোন সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু ও পাড়াটা যে একেবারেই নিরিবিলি! প্রায় পরের মুহূর্ত্তেই গুটিকতক লোক ওই বাড়ীটা থেকেই বাইরে বেরিয়ে এল; রাস্তার ধারে একটা মোটার দাঁড়িয়ে ছিল সবাই তাতে চেপে বস্‌ল। একজনের হাতে সলিল বাবু দেখ্‌তে পেলেন একটা বড় পুলিন্দা। বাড়ীর ভেতর থেকে মিষ্টার বাসুর গলার আওয়াজ তখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—যাক্ প্রাণে মারে নি তা' হলে! গুণ্ডাদের গাড়ীটায় ষ্টার্ট্ দেওয়ার উপক্রম হতেই সলিল বাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পেছনের ক্যারিয়ারটার ওপর চড়ে বস্‌লেন—গাড়ী শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে থামে সেইটে তিনি দেখ্‌বেন। হঠাৎ ক্যারিয়ারের ওপর চাপ পড়তেই গাড়ীটা বেশ যেন একটু দুলে উঠ্‌ল। গুণ্ডারা প্রথমটায় যেন একটু ভয় পেলে, সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে শেষে গাড়ীর চারপাশটা বেশ ঘুরে ফিরে তারা একবার দেখে নিল। ততক্ষণে সলিল বাবুও গাড়ীর তলায় গিয়ে ঢুকেছেন। এটা আমি বরাবরই দেখে আস্‌ছি, উদ্দেশ্যটা যদি আমাদের ভাল হয় তা হলে সে সৎকাজে শতকরা নব্বুই ভাগ সম্ভাবনাই হচ্ছে ভগবানের সহায়তা পাওয়া। ও ব্যাটাদের যদি গাড়ীর নীচেটা অবধি দেখ্‌বার ধৈর্য্য হত তবে সেদিন সলিল বাবুর আর রক্ষা ছিল না। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে তারা গেল না, মোটামুটি গাড়ীর চারপাশটা একবার দেখে নিল মাত্র। ড্রাইভার ফের ষ্টার্ট্ দিতে যাবে, সলিল বাবু তলা থেকে বেরিয়ে এসে আবার ক্যারিয়ারের ওপর উঠে বস্‌লেন—তবে এবার এত আস্তে আস্তে, এত সন্তর্পণে যে গাড়ীতে ঝাঁকুনি অথবা নড়াচড়া কোন কিছুরই বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না। চাদর মুড়ি দিয়ে গোলাকার একটা বস্তার মত ক্যারিয়ারের ওপর তিনি পড়ে রইলেন। তার পর গাড়ী ছুট্‌ল সোঁ সোঁ করে ঝড়ের মতন। এখানেও সলিল বাবুর বুদ্ধির বিশেষ তারিফ কর্‌তে হবে যে চেঁচাবার চেষ্টা পান নি তিনি একবারও। হাজার চেঁচালেও, যে গাড়ী রাত্তির বেলাতে অতখানি স্পীডে ছুটে চলেছে, কেউ তাকে থামাতে পার্‌ত কিনা সে কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি না, তবে মুখ থেকে 'টু' শব্দটি বার কর্‌লেই সলিল বাবুর যে তৎক্ষণাৎই অপঘাত-মৃত্যু ঘট্‌ত সেটা নিশ্চিত বল্‌তে পারি।

“গাড়ীর স্পীড্ কমে আসতেই টুক্ করে সলিল বাবু নেমে পড়লেন। তিনি দেখ্লেন সুরযমল নগরচাঁদ লেনের একটা বাড়ীর সাম্নে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। সকলে নেমে পড়্ল, শুধু একজন গাড়ীতেই রয়ে গেল; তাকে নিয়ে গাড়ী ফের কোথায় রওনা হয়ে পড়ল: বোধ হয় সোনার হরিণটাকে আরও নিরাপদ্ জায়গায় রেখে আস্তে। আরও একটু দাঁড়িয়ে থাকৃতে সলিল বাবু দেখ্লেন, ওপরের ঘরে ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বলে উঠেছে আর সেই আলোতে স্পষ্ট টের পেলেন যে ওই ঘরটাই ডাকত-দলেব সাময়িক আড্ডা।

“এইবার সলিল বাবু বাস্তবিকই পড়ে গেলেন দারুণ দ্বিধায়। সোনার হরিণ ফিরে পেতে হলে আমায় এই ডাকাত-দলের সন্ধান দেওয়া নিতান্তই দরকার, অথচ নিজে তিনি এ বিষয়ে কোনই উচ্চবাচ্য করতে পারেন না; কেননা তা হলে এমন সব জবাবদিহির ভেতর পড়ে যাবেন যাতে মিষ্টার বাসুর রহস্য আর কোন রকমেই চেপে রাখা সম্ভব হবে না। ঠিক সেই কারণেই পুলিশে খবর দেওয়াও অসম্ভব। আপনারা হয়তো বল্‌বেন, কেন, আমার নামে একটা বেনামী চিঠি লিখে সেই চিঠিতে এবাড়ীর নম্বরটা দিয়ে দিলেই তো হ’ত! হয়তো হত, কিন্তু সলিল বাবু মনে মনে বিবেচনা কর্‌লেন, সে চিঠি পেয়ে আমি এদিকে আস্‌বার আগেই হয়তো ব্যাটারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে আর কোথাও চম্পট্ দেবে। তাই শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঠিক কর্‌লেন এমন একটা সূত্র আমার হাতে গুঁজে দেবেন, যাতে করে ডাকাতগুলো ভেগে পড়্লেও ফের তাদের টেনে বার কর্‌তে আমায় বেগ না পেতে হয়। তাঁর ছোট ক্যামেরাটা নিয়ে বাড়ীটার আশপাশে পরদিন সমস্তক্ষণ তিনি ঘুরে বেড়াবেন, যখনই ডাকাতদলের কেউ কোন প্রয়োজনে একবার বাড়ীর বার হবে, অম্‌নি লোকটার সম্পূর্ণ অজ্ঞানাতে তার চেহারা ক্যামেরায় তুলে ফেল্‌বেন। মৎলবটা মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনই কাজে এলনা; ও ব্যাটারা আসল ঘুঘু, লোকের চোখে ধূলো দেওয়াই হ’ল ওদের ব্যবসা। সামান্য কারণে রাস্তায় বেরোবার দরকার হলেও চেহারা এম্‌নি বদ্‌লে আসে যে আসল চেহারা যা আগের দিনে উনি দেখেছিলেন তার সঙ্গে নকলের আর এতটুকু মিল থাকে না। আসল চেহারা যেটা, তার ফটো নেওয়ার সুযোগ আর মেলেই না। সলিল বাবু বুঝ্লেন, ফটো নিতে হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে তাঁকে এগুতে হবে—সে পথ বড়ই মারাত্মক, বড়ই বিপজ্জনক; সে পথে যেতে হলে মনে চাই দুরন্ত সাহস। ওঁর মত একজন নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা ভালোমানুষ সে পথে গিয়ে কি ভাবে যে কাজটা হাসিল কর্‌লেন ভেবে অবাক্ হচ্ছি, কেননা কাজটা সমাধা হ’ল বাস্তবিকই নিখুঁৎ ভাবে।

শ্মশানের চুল্লী থেকে আধ-পোড়া অবস্থায় উঠে এলে মানুষের মুখের চেহারা যেমন ধারা হয় ঠিক সেই রকমের একটা মুখোস আর তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আরও দু’একটা সরঞ্জাম

সেদিন বিকেল বেলাতেই সমস্ত টেরিটিবাজার আর মিউনিসিপ্যাল মার্কেট্ ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করে ফেল্লেন। আর সংগ্রহ কর্‌লেন একটা দড়ির মই। তার মাথার দিকে দু’টো লোহার ডাণ্ডা এম্‌নি গোলভাবে বাঁকান রয়েছে যে, তাগ্ করে ছুঁড়ে ফেল্‌তে পারলে কাঠের রেলিংয়ের ওপর সে দুটো চমৎকার আট্‌কে যায়; তখন খুব ভারী মানুষও যদি মই বেয়ে ওপর পানে উঠ্‌তে থাকে তা’ হলে হড়্‌কে পড়বার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সমস্ত সাজ-সরঞ্জামে তৈরী হয়ে গভীর রাতে সলিল বাবু সুরযমল নগরচাঁদ লেনে এসে হাজির হলেন—তাঁর কোমরে আঁটা ক্যামেরা, হাতে অসম্ভব পাওয়ারফুল টর্চ্চ যার আলোতে স্বাভাবিক মানুষের চোখ ধেঁধে যায়। ডাকাত-দলের খোদ আস্তানায় ঢুকে একেবারে খোলা জান্‌লার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের স্বাভাবিক চেহারা ক্যামেরায় বন্দী করে নেবেন; তা ছাড়া তাঁর আর কি উপায় আছে? যে জায়গাটিতে আসা দরকার দড়ির মইয়ের সাহায্যে ঠিক সেই জায়গায় এসে তিনি উপস্থিত হলেন।

“মনস্তত্ত্বের ওপর সলিল বাবুর যে দস্তরমত অধিকার আছে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অত রাত্রে ডাকাত-দল যদি ঘুমিয়ে থেকে থাকে তবে তাঁর কাজটা অনেকখানিই সোজা হয়ে পড়্‌বে সন্দেহ নেই, কিন্তু অতটা সৌভাগ্য বাস্তবিকই তিনি প্রত্যাশা করেন নি। কেউ-না-কেউ তাদের মধ্যে সতর্ক হয়ে জেগে থাকৃবে এইটে ধরে নিয়েই তিনি কাজে নেমেছিলেন, আর সেই জন্যেই নিজের তরফ্ থেকে তাঁর এতখানি সতর্কতা। মোটামুটি ওঁর কাজের প্রোগ্রামটা হ’ল এই রকম—ভূতুড়ে মুখোস এঁটে বীভৎস চেহারা নিয়ে জান্‌লার পাশে এসে তিনি দাঁড়াবেন; ভেতরে যারা জেগে আছে তারা আচম্‌কা ও মূর্ত্তি দেখে ভয়ে শিউরে উঠ্‌বে; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তিনি এক হাতে টিপে ধরবেন টর্চ্চের বোতাম, অন্য হাতে ক্যামেরার কল—ব্যস্ ফটো উঠে যাবে। আপনারা হয়তো প্রশ্ন তুল্‌বেন, ভূতের অস্তিত্বে সকলেই তো আর বিশ্বাস করে না,—এমনও তো কেউ ওদের দলে থাকৃতে পারত যে মোটেই ভূত মানে না! সলিল বাবুর আবির্ভাবে ভয় না খেয়ে পাল্‌টে সে যদি ওঁকেই আক্রমণ করে বস্‌ত? কিন্তু আগেই বলেছি, মনস্তত্ত্বে সলিল বাবুর সত্যিই দখল আছে। বাস্তবিকই যারা ভূত মানে না তারাও দুপুর রাত্রে ওরকম মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেলে সাময়িক ভাবে কিছু বিচলিত হয়ে পড়ে—অন্ততঃ তক্ষুণি সিংহ-বিক্রমে তার ওপর ঝাঁপিয়ে যে পড়ে না সেটা সত্যি। আসল বস্তুটা কি সেটা জান্‌বার জন্যে তাদের ঔৎসুক্য হওয়া সম্ভব বটে, তবে তারা এগোয় আস্তে আস্তে, চারদিক্‌কার আটঘাঁট বেঁধে নিজেদের বাঁচিয়ে, তারপর। যেটুকু সময় তাতে যাবার কথা, দড়ির মই বেয়ে নীচে নেমে সট্‌কে পড়ার পক্ষে তা যে যথেষ্ট সলিল বাবুর সে কথা জানা ছিল। আর বাস্তবিক ঘট্‌লও সত্যিই তাই।

"এইবারে সলিল বাবু ফটো খানা বেনামীতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ; একটা লোক বোধ করি জান্‌লার কাছে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল, ফটোতে তার চেহারাটাই খুব স্পষ্ট উঠেছে, বাকী কয়জনের একটু ঝাপসা ঝাপসা—তারা পেছনে রয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে টাইপ্-রাইটারে লেখা একটা চিঠিও ছিল—মিষ্টার বাসুকে বাঁচিয়ে এই নতুন দস্যু-দলের বিষয় যেটুকু খবর নির্ভয়ে দেওয়া চল্‌ত সেটুকু খবর ওই চিঠিতেই দেওয়া ছিল। ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না, আমাকে সত্যিই সাহায্য করবার জন্য এ ব্যবস্থা করা হ'ল, না কি উল্টে সম্পূর্ণ বিপথে চালিত করবার উদ্দেশ্যে। যাই হোক, সুরযমল নগরচাঁদ লেনের বাড়ীটার ওপর একটু নজর রাখা দরকার মনে করলাম। সে ভারটা আপাততঃ দেওয়া গেল রণজিৎ বাবুর ওপরে। উনি সে ঠিকানাটার কাছাকাছি যেতেই দেখ্‌তে পেলেন, ওরা কল্‌কাতা ছেড়ে ভেগে পড়্‌বার মৎলবঃকর্‌ছে—অবশ্যি ছদ্মবেশে। সঙ্গে সঙ্গে উনিও ট্যাক্সি নিয়ে তাদের পেছু-ধাওয়া কর্‌লেন। ওরা গিয়ে উঠ্‌ল জগন্নাথ ঘাটে ; সোজা রেলের পথে না পালিয়ে খানিকটা পথ ষ্টিমারে এগিয়ে পরে রেল ধর্‌বে—এই মৎলব। (ক্রমশঃ)

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রহিকাদের লেখা

'রামধনু'র জন্মদিনে

(শ্রীঅজয়কুমার মিত্র)

আকাশ ভরে যেথায় নিতি সূর্য্যি মামার ঝিলিক্ ফোটে,
মিলিয়ে হাসি সেথায় যখন হাজার মেঘে গর্জ্জে ওঠে,
অচিন্ দেশের কোন্ শিকারী সাতরঙ্গা এক ধনুক হাতে
শাসন করে মত্ত দানব, স্বরগপুরীর আগুন হ'তে।

সেই ধনুকও জোগায় কভু শিশু-মনের মোহন খোরাক্,
রঙ্গীন দেশে যায় যে নিয়ে পরিয়ে তারে কল্প-পোষাক ;
বৃষ্টি-বাদলভরা দিনে নীল আকাশের রঙ্গীন্ খোকা,
ঘরের মাঝে হেসে এসে নতুন রূপে দেয় যে দেখা।
সঙ্গে করে আনে সে ভাই, অচিন্ দেশের নতুন খবর,
কী সে মোহ, কী সে যাদু ভরা তাহার অস্ফুটস্বর।
রামের হাতের মায়ার ধনুক যাদুকরের তূলির রেখায়
নতুন নতুন রূপ ধরে রোজ মায়াপুরীর পরশ জাগায়।
নন্দিত আজ করছি তোমায় দশ বছরের জনম-দিনে,
হে রামধনু, রঙ্গীন্ কর মূর্ত্ত হয়ে শিশুর মনে।

"বীর-সৈনিক"

(শ্রীহিরণলাল সান্যাল)

কয়েক জন সৈনিক যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া নিজেদের গুণাবলী বলাবলি করিতেছিল। এক জন বলিল, "এক দিন রাত্রিতে আমি ভাই, শিবির পাহারা দিচ্ছি, হঠাৎ দেখি সামনে কতকগুলি শত্রুসৈন্য। ভাবলুম, আমি একা আর ওরা ৭।৮ জন। কি করা যায়? অন্যদের জাগাব কি? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, তা হ'লে তো আমার কাপুরুষ নামই রটবে। কুছ্ পরোয়া নেই, আমি তখনই চুপিচুপি শত্রুদের কাঁছে গিয়ে সকলের পা কেটে দিয়ে এলুম। শত্রুরা আর এগোতে পার্‌ল না। এ জন্য অবশ্য আমি একটা মেডেল পেয়েছি।"

গল্প শেষ হইলে আর একজন সৈন্য বলিল, "ভারী তো করেছিস্, আমি সেখানে থাকলে শত্রুদের সবগুলোর মাথাই কেটে ফেলে আস্‌তুম।"

প্রথম সৈনিক বলিল, "আরে, আমিও তো তাই ভেবেছিলুম কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি বেটাদের একটারও মাথা নেই, সব মাথা-কাটা। অগত্যা পা-ই কাটতে হ'ল।" *

* ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

ডাকটিকেটের গল্প

(শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত)

আগে ইংলণ্ডে চিঠিপত্র পাঠাবার খুব বেশী খরচ ছিল। চিঠির খরচ মাইল হিসাবে দিতে হ'ত। বেয়ারিং চিঠি (অর্থাৎ যে সব চিঠিতে উপযুক্ত মাশুল দেওয়া না থাকৃত) মালিক রাখতে না চাইলে সেগুলির জন্য আর পয়সা দিতে হ'ত না। পয়সার অভাবে অনেক গরীব লোকই চিঠি লিখতে পারত না। একদিন ইংলণ্ডের একজন সম্ভ্রান্ত লোক দেখলেন যে একটি গরীব মেয়ের কাছে একটা বেয়ারিং চিঠি আনা হয়েছে কিন্তু সে চিঠিটা ফেরৎ দিচ্ছে। তিনি তখন নিতান্ত আশ্চর্য্য হয়ে টিকেটের দাম দিয়ে চিঠিটা পিওনের কাছ থেকে নিয়ে মেয়েটিকে দিলেন। সে তখন বলে উঠল, "আপনি মিছামিছি এতগুলি পয়সা নষ্ট করলেন। ওটা একটা সাদা চিঠি ছাড়া কিছুই না।" ভদ্রলোক আরও আশ্চর্য্য হয়ে মেয়েটিকে সব খুলে বলতে বল্লেন। মেয়েটি বল্ল, "দেখুন, আমার সংসারে এক ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। সেও বিদেশে থাকে! পয়সা দিয়ে চিঠি লিখে পরস্পরকে কুশল জানাবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই। আমরা বড় গরীব। তাই আমরা পরামর্শ করেছি যে, আমার ভাই যদি ভাল থাকে তা হ'লে সে শুধু একটা সাদা চিঠি লিখবে, টিকেট লাগাবে না। এখানে চিঠি আসলে সে চিঠি থেকেই বুঝতে পারি আমার ভাই কুশলে আছে। কাজেই চিঠিটা রাখার কোন দরকার হয় না।" এ কথা শুনে সেই ভদ্রলোক চিঠির দাম বেশী হওয়ায় গরীবদের কি কষ্ট তা বুঝতে পেরে পোষ্ট-অফিসের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এ কথা জানান্। তার পর থেকেই টিকেটের দাম ক্রমে কমে আসছে।

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

কার্ত্তিক মাসের রামধনুতে যে পুরস্কার-প্রতিযোগিতা বাহির হইয়াছিল তার ফলাফল নীচে দেওয়া হইল—

প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার পাইলেন—শ্রীপ্রতাপকুমার রায়—গ্রাঃ নং ১৮১৮ এবং কবিতার জন্য পাইলেন—শ্রীদীনেন মুখোপাধ্যায় গ্রাঃ নং ১৯০১। পুরস্কার মাঘ মাসের মধ্যেই দেওয়া হইবে।

চিঠিপত্র

(১)

রামধনুর পাঠক-পাঠিকারা,

আজ দশ বছরের জন্মদিনে রামধনুর পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রামধনুকে তোমরা কত ভালবাস তা তোমাদের চিঠিপত্র থেকেই আমরা জানতে পারি। রামধনু যাতে সব দিক্ দিয়ে তোমাদের মনের মত হয় তার জন্যও আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি—তোমাদের দেওয়া নানা রকম অভিমত আমাদের খুবই কাজে লাগছে।

এ বছর আমরা কয়েকটা নতুন বিভাগ খুল্‌ব ঠিক করেছি। প্রথম সংখ্যায় আমরা তার জায়গা করে উঠতে পারলাম না—প্রত্যেক মাসে সব বিভাগ রাখতে না পারলেও মাঝে মাঝে সেগুলি দেবার ব্যবস্থা আমরা কর্‌ব। সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর, ছোটদের চিত্রশালা প্রভৃতি বিভাগ এ মাসে বাদ দিতে হ'ল, ওগুলি বারান্তরে বেরোবে।

'চিঠিপত্র' বিভাগটা নিয়মিত বেরোয় না বলে কেউ কেউ অনুযোগ করেছ—কিন্তু সে তো তোমাদেরই হাতে! যে চিঠি ছাপাবার মত—বিশেষত্বপূর্ণ, সব গ্রাহকেরাই সমান পছন্দ করবে তা তোমরা পাঠালেই আমরা প্রকাশ করতে পারি। একেবারে ব্যক্তিগত চিঠি কি করে আমরা প্রকাশ করি? আশা করি তোমাদেরই সাহায্যে "চিঠিপত্র" বিভাগ এবার থেকে নিয়মিত বেরোতে পারবে।

নতুন বছরের রামধনু কেমন লাগে জানিও।

—ইতি রাঃ সঃ

(২)

উত্তর ভারতে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের মাথায় কোন না কোন শিরস্ত্রাণ আছে। বাঙ্গালীদের মাথায় কোন টুপি থাকে না। এদিক্‌কার লোকেরা তো বাঙ্গালীদের "শিরনাঙ্গা" বলিয়া থাকে। বাঙ্গালীরা কেন এবং কবে হইতে "শিরনাঙ্গা"? ইহার কি কোন কারণ আছে?

আর একটা কথা, বাঙ্গালীরা প্রায় প্রত্যেকেই মাছ খাইয়া থাকে, অথচ ভারতের অন্যান্য বহু দেশের লোকেরা মাছ খায় না—মাছকে অপবিত্র মনে করে। ইহারই বা কারণ কি? আশা করি রামধনুর গ্রাহকদের মধ্যে কেহ ইহার উত্তর দিবেন।

—শ্রীরেবন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (বিকানীর)

সন্দেশ

মেলবোর্ণে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার তৃতীয় ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ্ শেষ হইয়াছে। তোমরা জান, প্রথম দুইটি টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের কাছে বিশ্রী ভাবে হারিয়া গিয়াছিল—কিন্তু তৃতীয় টেষ্টে তারা সে অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছে ৩৬৫ রানে জিতিয়া। অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্‌টেন্ ব্র্যাড্‌ম্যান্ ১ম দু'টি টেষ্টে তেমন কিছু করিতে পারেন নাই, সকলেই মনে করিয়াছিল ব্র্যাড্-ম্যানের ক্রিকেট-জীবন বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তা যে মোটেই নয়, এবার

ব্র্যাড্ম্যান্ তা দেখাইয়াছেন্। ২য় ইনিংসে তিনি একা ২৭০ রান্ করেন। তিনি এবং ফিঙ্গ্লটন্ এক সঙ্গে ব্যাট্ করিয়া এবার ষষ্ঠ উইকেটে পৃথিবীর রেকর্ড্ ভাঙ্গিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার রান্ হইয়াছে প্রথম ইনিংস্-এ ২০০ (৯ উইঃ) (ম্যাক্‌কেব—৬৩)। ২য় ইনিংস্-এ ৫৬৪ (ব্র্যাড্ম্যান্ ২৭০, ফিঙ্গ্লটন্ ১৩৬)। ইংলণ্ডের রান্ হইয়াছে ১ম ইনিংস্-এ ৭৬ (৯ উইঃ) (হামণ্ড্ ৩২); ২য় ইনিংস্-এ ৩২৩ (লেল্যাণ্ড্ ১১১, রবিন্স্ ৬১, হামণ্ড্ ৫১)।

* * *

এদিকে প্রতি বারের মত এবারেও বোম্বাইএ কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ম্যাচ্ হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে পর পর ত্ু'বার মহামেডান্ দল এই খেলায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার তাঁরা ১ম রাউণ্ডেই হিন্দুদের কাছে হারিয়া যান। পার্শীরা হারেন ইউরোপীয়ান্দের কাছে। ফাইনালে হিন্দু দল ইউরোপীয়ান্ দলকে হারাইয়া বিজয়ী হইয়াছেন। হিন্দুদের মধ্যে মার্চ্চেণ্ট অতি চমৎকার খেলা দেখাইয়াছেন। ইনি দু'বার দু'টি সেঞ্চুরি করিয়াছেন। এস্. ব্যানার্জ্জি এবং অমরসিংও খুব ভাল খেলিয়াছিলেন। ইউরোপীয়ান্ দলে বিশ্ববিখ্যাত বোলার লারউড্ খেলিয়াছিলেন—আর খেলিয়াছিলেন ৫৫ বছরের বৃদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ান্ খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট্। ট্যারাণ্টের খেলা অতি চমৎকার হইয়াছিল।

* * *

বিজ্ঞানের দেশ আমেরিকায় আজকাল এক রকম খবরের কাগজ বাহির হইয়াছে—তাকে 'কথা-বলা কাগজ' বা টকি-পত্রিকা বলা চলে। এই কাগজগুলির (?) এক পিঠে সাধারণ পত্রিকার মত লেখা অপর পিঠ গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত। ইচ্ছা হইলে এই পত্রিকা যন্ত্রের মধ্যে বসাইয়া চাবি ঘুরাইয়া দিলেই কল গ্রামোফোনের মত খবরগুলি আওড়াইয়া যাইবে।

* * *

'বড়'লোক বলিয়া দেশে যাঁরা নাম করিয়াছেন তাঁদের অনেকের অন্য নানা রকম সখও আছে। জার্ম্মানীর হের হিট্লার নাকি ছবি আঁকিতে খুব ভালবাসেন। ইংল্যাণ্ডের উইন্‌ষ্টন্ চার্চ্চিলেরও সে সখ আছে। ইটালীর মুসোলিনী নাকি বাজনা বাজাইতে ভারী ওস্তাদ্।

* * *

বসন্তের টীকা যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম জান? ই, জেনর।

* * *

সুয়েজ খাল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কাটা হইয়াছিল। তার ইঞ্জিনিয়ারের নাম ছিল ডি লেসেপ্স্, ইনি জাতিতে ফরাসী। সুয়েজ খাল কাটিতে খরচ পড়িয়াছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড্।

* * *

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দীর্ঘকায় জাত হইতেছে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার লোকেরা; আর সব চেয়ে খর্ব্বকায় জাত হইতেছে মধ্য আফ্রিকার কাফ্রীরা।

* * *

শুভঙ্করী তোমরা সকলেই পড়িয়াছ। মুখে মুখে খুব তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষিবার অমন সহজ নিয়ম বোধ হয় আর নাই। শুভঙ্করী যিনি মাথা খাটাইয়া বাহির করিয়াছিলেন তিনি একজন বাঙ্গালী কায়স্থ। তাঁর নাম শুভঙ্কর। তাঁর নাম হইতেই শুভঙ্করী নামের উৎপত্তি।

লীগ্ অব্ নেশন্স্ বা বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের নাম তোমরা সবাই বোধ হয় শুনিয়াছ। সমস্ত পৃথিবী-যোড়া এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠান গড়িবার কল্পনা যাঁর মাথায় প্রথম আসে, তাঁর নাম উড্রো উইল্সন্—ইনি আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন। অথচ আশ্চর্য্য এই, তাঁহার নিজের দেশ আমেরিকা কিন্তু আজ পর্য্যন্ত লীগের সভ্য হয় নাই।

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর

১ = ০, ২ = ৫, ৩ = ৯, ৪ = ২,
৫ = ১, ৬ = ৩, ৭ = ৮, ৮ = ৪,
৯ = ৭, ০ = ৬,

গতমাসের ধাঁধার উত্তর

(১) মামা, মাসী, (২) কাকী, মেশো, পিসে, (৩) জা, মা, জামাই, (৪) জ্যাঠা, (৫) ননদ, (৬) ভাই, (৭) পিতা, (৮) কাকা, (৯) দিদি, (১০) দাদা।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা অগ্রহায়ণ ও পৌষ দু'মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন—

কল্যাণী, সরলা, নমিতা প্রভৃতি (কলিকাতা); রত্না দেবী (পাটনা); রমাপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা); মণি, সাধনা, ফণী প্রভৃতি (শিলচর); ভানু, মিঠু, মঞ্জু প্রভৃতি (বালুরঘাট); হরিহর, পুষ্প, গৌরী মজুমদার (ধুবড়ী) তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরীর শিশুবিভাগের সভ্যবৃন্দ (কলিকাতা); রণেন্দ্র, বিভা, রথীন্দ্র প্রভৃতি (ধুবড়ী); শৈলেশ, অনিল, নিরু; প্রভা, বিভা (জলপাইগুড়ি); রাণী ও অনুদি' (জলপাইগুড়ি)।

যাঁরা শুধু অগ্রহায়ণের ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন—

কালী, তারা, রাখাল প্রভৃতি (নীলফামারী); উমা সান্যাল (রেঙ্গুন); আভা সেন (পাটনা)।

যাঁরা শুধু পৌষের ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন—

ভাস্কর, শঙ্কর, মাসিমা প্রভৃতি (ভবানীপুর); প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত; রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); দেববালা বিশ্বাস (ডিব্রুগড়); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, পুতুল (বালিগঞ্জ); দীনেন

ছোটদি, মা প্রভৃতি (নলহাটী) ; দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্দ্ধণ (শালিখা) ; প্রফুল্ল হাজরা, অনিল হাজরা ও বাড়ীর আর সকলে (মিনজান) ; মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া) ; শান্তি, পক্ষিরাজ গদো প্রভৃতি (কলিকাতা) ; খোকন, বিদ্যুৎ, অনু প্রভৃতি (ছাপরা) ; বালুরঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (বালুর ঘাট) ; রামেন্দু, দিব্যেন্দু, সুনন্দা দাশগুপ্ত (ভবানীপুর) ; সুনীলকান্তি সেন, নন্দু, কাকীমা (মুন্সীগঞ্জ) ; জ্যোতিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক-গ্রাহিকা (সৈদপুর) ; পাঁচুগোপাল ঘোষ, কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (নওয়াপাড়া) ; লীলা দাস (কুমিল্লা) ; মনু সোনু, খুসী প্রভৃতি (কলিকাতা) ; অচলকুমার দত্ত (ভবানীপুর ;) জ্যোতির্ম্ময়, বিনয়, অরুণ প্রভৃতি (পাটনা) ; বাণীমন্দির (যশোহর) নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিন ষ্ট্রীট)।

যাঁরা পৌষের ধাঁধার কতকগুলির উত্তর দিয়েছেন—

প্রসূন রায় (নালান্দা) ; প্রমোদচন্দ্র মুস্তফী, প্রবীর, রমা (জামসেদপুর) ; নিখিল চৌধুরী কনক, মণীন্দ্র (রাজসাহী) ; শিবানী, ভবানী, কল্যাণী (ধুবড়ী)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

রাম বাবু বড় খামখেয়ালী লোক। তিনি নীচের এই কয়েকটি লাইন ইংরাজী কথার খামখেয়ালো তর্জ্জামা ক'রে লিখেছেন। একদিন তিনি ঐ রকমের একটা চিঠিতে **farmer** কথাটির মানে ক'রেছিলেন "গোলাবাড়ীতর" ;—কাজেই বুঝ্‌তে পারছ ব্যাপারটা। তর্জ্জামার কথাগুলি ' ' চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তোমরা ঠিক ক'রে লাইনগুলিতে ইংরাজী কথাগুলি বসিয়ে পড়্‌তে পার কি ? দরকার হলে Dictionary ব্যবহার কর্‌তে পার। লাইনগুলি এই :—

'বন' একটি 'উচ্চভাবে' 'ব্যবহারপূর্ণ' জিনিষ। 'গাড়ী-কলম-চেষ্টা'র কাজে 'সমুদ্র-পুত্র' করা 'বন' এর যথেষ্ট পরিমাণে 'যক্ষ্মা' হয়। 'মনুষ্য-ষাও'র 'অসমুদ্রপুত্রকৃত' 'বন' 'মোকদ্দমা'র কাজে অনেক লাগে। 'ভস্ম' 'বন' ও 'উচ্চভাবে' 'ব্যবহারপূর্ণ' ;—ইহার 'সমগ্র-বিক্রয়' ও 'পুনর্লেজ' 'ব্যস্ততা' উত্তর দেশের একটি 'আমদানী-পিপীলিকা' 'ব্যস্ততা'। রামবাবুর একটি 'পুনর্দায়ী' 'ভাল্লুকতর' এখন সেখানের 'ব্যস্ততা পুরুষ'। তাহার 'ব্যস্ততা' 'ব্যবহার' ও 'মনুষ্য-বয়স' করিবার 'টুপি-একটি-সহর' আছে। সে দেশের 'স্বপক্ষতম' 'মাখন-মাছি', 'মটর-মোরগ', 'কৃষ্ণ-বহন' প্রভৃতিতে ভরা।

দ্রষ্টব্য ঃ—পৌষ মাসের মুখপত্রের ছবিটা শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তোলা।

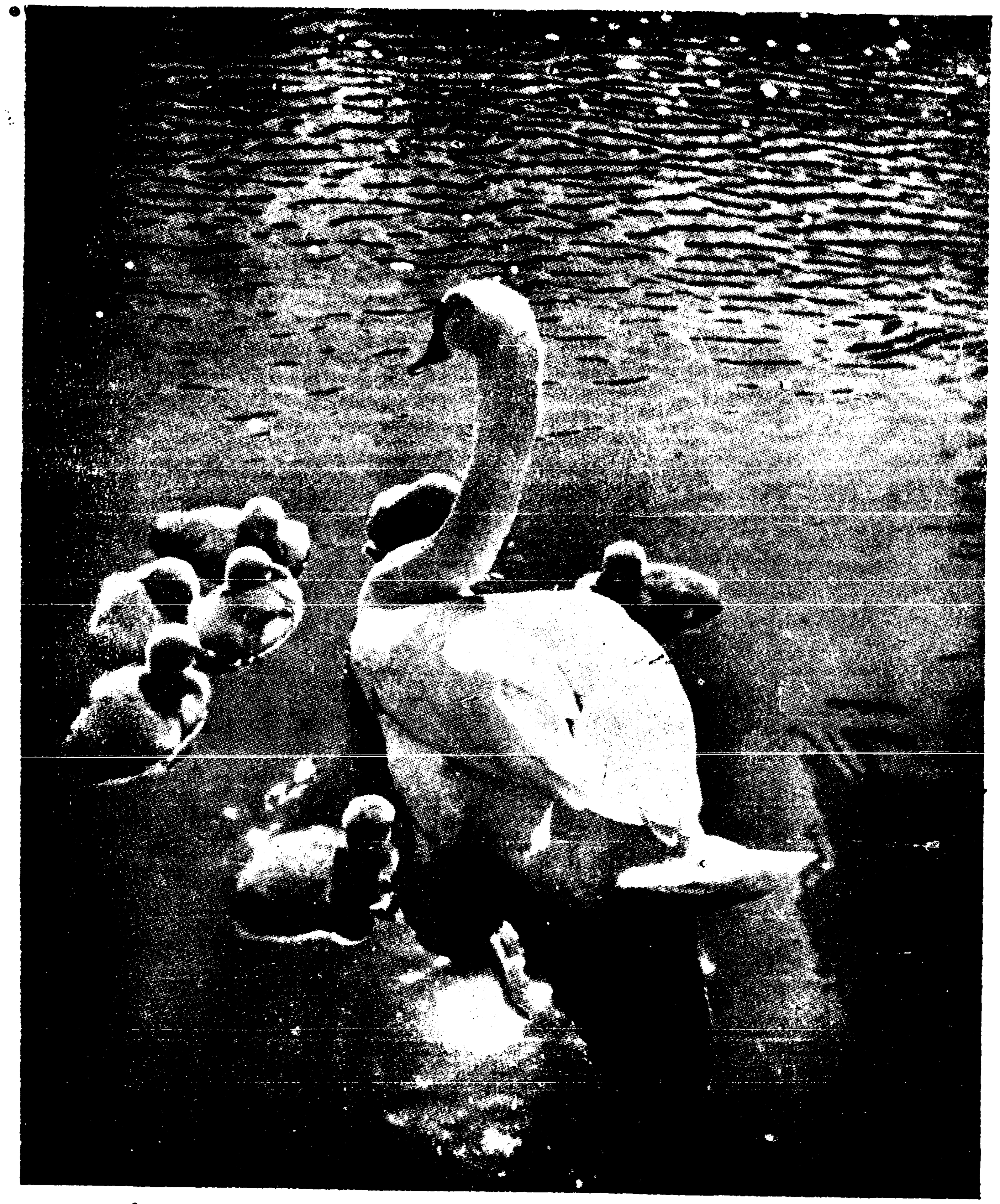

মায়ের কাছে

১০ম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৩ | ২য় সংখ্যা

গন্ধগোকুল

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী)

একলা বেড়াই সকালবেলা কাঁঠাল-তলাতে,
রাখাল-ছেলে গান গেয়ে যায় পাঁচনি হাতে।
আর কেহ নাই, নিরালা বন শিশির ঝরে নি—
নেবু ফুলের গন্ধে বাগান আজো ভরে নি!
শুকনো বনের পানে চেয়ে উদাস করে মন,—
ইচ্ছা করে সেতার বাঁজাই ঝন্‌ঝনা ঝন্ ঝন্।
ঘাড় তুলিয়ে সেতার বাজাই বনের কিনারে।
ভাসিয়ে দেব ভাবের ডিঙা অথই পাথারে।

এম্‌নি নানান্ ইচ্ছে নিয়ে কাঁঠাল-তলাতে,
এক্‌লা বেড়াই সকালবেলা পাঁচনি হাতে।
কাঠবেড়ালীর ল্যাজের ঝালর দেখ্‌ছি ব'সে গো—
তিতির পাখীর গম্ভীর মুখ দেখ্‌ছি ব'সে গো—
আঁধার-রাতে হুতোমথুমির বচন শুনিয়া—
মনের মত দখিণ্ হাওয়া যায় যে থামিয়া—
বেড়াই, বসি, গান গেয়ে যাই কাঁঠাল-তলাতে।
রাখাল-ছেলে যায় না'ক আর পাঁচনি হাতে।
খঞ্জনীদের গান শুনি আর ইচ্ছা করে হই—
রৌদ্রছায়ায় পাখীর মত, মনের কথা কই ;
এমন সময় বল্‌ব না ভাই—ভয়ের কথা সে
কেমন-তর গন্ধ যেন ভাস্‌ল বাতাসে—
রাখাল-ছেলে দৌড়ে গেল বনের ও-ধারে
ল্যাজ তুলে সব গরু পলায় পাইনা দিশা রে।
শীতের হাওয়া লাগ্‌ল যেন বনের পাতাতে
জড়িয়ে গেল কাপড় আমার পথের কাঁটাতে
রাখাল-ছেলে দৌড়ে এল যষ্টি তুলিয়া—
বল্‌লে, বাবু ভয় ডা কিসের, যাও গা চলিয়া।
বাঘের মত গন্ধ যেন বনের মাঝারে,
বাঘ ওটা নয়, গন্ধগোকুল, বাঘের মামা রে।
হাস্‌ছি যত কাঁদ্‌ছি তত নিজেরি মনে—
পণ করিনু আস্‌ব না আর কাঁঠালী বনে।

দস্যুর দলে ভোমরা

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

২

পাণ্ডাজি

দু' তিন মিনিট কারো মুখেই কথা নেই, তার পর লুঙ্গি-পরা লোকটি ডাক দিলে, 'গণ্‌শা !'

দাড়িগোঁফ-কামানো ভীমচন্দ্রের মুখ দিয়ে আশ্চর্য্য রকম একটা মিহি সুর বেরিয়ে এলো।

'ছট্টু সিং কাল ক'সের ভাঙ বেটেছিলো বলতে পারিস ? কী, জবাব নেই যে ? বোবা হ'য়ে গেলি নাকি এইমাত্র ?'

গণ্‌শা তার শরীরের ভার ডান পা থেকে বাঁ পায়ে বদলি ক'রে বাঁকা হ'য়ে দাঁড়ালো।

'বাঃ, বোবা হ'য়ে গেলি নাকি এইমাত্র ? মাণ্‌কে চিলটা ঠিক কোন্ সময়ে এসে তোদের চোখগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো সেটা জানতে চাই।'

গুঁফোটা খক্‌খক্ ক'রে একবার কেসে উঠলো। ভোমরা তাকিয়ে দেখলো, ওদের দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে আমসি হ'য়ে গেছে। ঐ রোগা লোকটিই তা হ'লে এই গুণ্ডার দলের সর্দার ! ঐ মুখ-বাঁধা অবস্থাতেও ভোমরা অবাক্ হ'য়ে গেলো—একটু যেন হতাশও হ'লো। সে ভেবেছিলো প্রকাণ্ড একটা জাঁদরেল যোয়ান, দেখলেই বুক কাঁপবে। ওমা, তা তো নয়, দস্তুরমত ফিটফাট বাবু যে ! কী কায়দাসে টেড়ি বাগিয়েছে দ্যাখো না ! অনেকটা তার মামাবাবুর মত, যে মামা কাজ করেন ঝরিয়ার কয়লা-খনিতে।

ভোমরা খুব লক্ষ্য ক'রে সর্দারকে দেখছে আর মনে মনে ভাবছে এখান থেকে একবার ছাড়া পেলে গল্প করবার মত কিছু হবে বটে ! এমন সময়

সর্দারেরও চোখ পড়লো তার উপর। বড় বড় দুটো জলজ্বলে চোখ, এমন ভাবে তাকায় যেন পেটের কথা ফুঁড়ে বার ক'রে আনবে।

'মাণ্কে, ওর মুখের কাপড়টা খুলে দে।'

তক্ষুণি হুকুম তামিল করলে গুঁফোটা। এত শক্ত ক'রে বেঁধেছিলো যে চোয়ালসুদ্ধ ব্যথা হ'য়ে গেছে। ষণ্ডামার্ক পাষণ্ড!

সর্দার জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার নাম কী?'

ভোমরা নির্ভীক ভাবে জবাব দিলে, 'প্রীতিকান্ত মিত্র।'

'প্রীতিকান্ত, বাঃ! বেশ নামটি তোমার। তা সবাই তোমাকে ডাকে কী ব'লে?'

ভোমরা একটু লজ্জিত ভাবে বললে, 'ভোমরা। গেলো বছর থেকে এ নামটা তার আর বেশি পছন্দ হচ্ছে না, মনে হচ্ছে বড্ড মেয়েলি।

কিন্তু সর্দার ভারী খুসী। ঝক্ঝকে দাঁত দেখিয়ে হেসে বললে: 'ভোমরা! ভোমরা! নাম তো নয় যেন গান! তা ভোমরা, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। ঠিক রকম জবাব দেবে।'

আস্ত একটা গুণ্ডার সর্দার তার সঙ্গে সমান-সমান ভাবে কথা কইছে, ভোমরা মনে মনে খুসীই হ'লো। খুব গম্ভীর মুখে বললে, 'আচ্ছা।'

'ওঃ হো, তোমার বাবার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি।'

'আমার বাবা নেই।'

সর্দারের মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেলো।—'ক' ভাইবোন তোমরা?'

'আমার আপন ভাই-বোন নেই।'

সর্দার এইবার যেন একটু খুসী হ'য়ে বললে, 'তোমার মা তোমাকে খুব ভালোবাসেন—না?'

মা-র কথা শোনামাত্র ভোমরার চোখ আবার ছলছলিয়ে উঠলো, তেমনি মনে মনে তার রাগও হ'লো ভয়ানক—লোকটা নিশ্চয়ই তাকে ঠাট্টা করছে—কী যে জবাব দেবে ভেবে পেলো না। সর্দার আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'রাগ করলে নাকি?'

ভোমরা মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

'বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে, না?'

ভোমরা চোখ তুলে মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'না, একটুও না।'

'বাঃ বেশ, বেশ। এই তো চাই। তবে কিনা, আমাদের এখানে খুব বেশী দিন থাকতে তোমার ভালো নাও লাগতে পারে—কী বলো?'

ভোমরা হঠাৎ চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'ফাঁকি দিয়ে ধ'রে এনেছো তায় আবার এত বাহাদুরি! যেতে না দেবে তো না দেবে—ব'য়ে গেছে!'

মস্ত মুখওয়ালা গণ্শাটা চোখ পাকিয়ে বলতে আরম্ভ করলে, 'ছ্যাখ্ ছোঁড়া—'

সঙ্গে সঙ্গে সর্দার ব'লে উঠলো, 'থাক্, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না তোদের! ঐটুকু একটা ছোকরাকে দু-দুটো ষণ্ডা মিলে তো ধ'রে এনেছিস, তাও তো নিয়ে এলি ঝুটা মাল!'

মুহূর্ত্তে গণ্শা কুঁচকে একেবারে কেঁচো হ'য়ে গেলো।

'আটঘাঁট সবই তো বাৎলে দিলুম—তবু মুক্তো তুলতে শামুক! এখন খা চিবিয়ে-চিবিয়ে শামুকের খোলস।'

সর্দারের এই কথায় ভোমরা শুধু এইটুকু বুঝলে যে তাকে শামুকের সঙ্গে তুলনা করা হ'লো। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলে।

এতক্ষণে সাহস ক'রে বললে মাণ্কে: 'পাণ্ডাজি, হুকুম করলেই খাঁটি মাল এনে হাজির করবো।'

'আর এরও কি কিছু দাম না হবে!' বললে গণ্শা। 'ওরা জোড়ে আসছিলো—কে যে আগে ঢুকে গেলো আর কে যে রইলো ঠিক ঠাহর হ'লো না। ইস্, এমন দাঁও ফস্কায়!'

মাণ্কে আরো একটু উৎসাহ নিয়ে বললে; এবারে মাপ করো পাণ্ডাজি—কাল আমাদের ফুটফুটে রাজপুত্তুরকে যখন দেখবে—'

সর্দার বোধ হয় ওদের কথা ভালো ক'রে শুনছিলোও না, নিজের মনে কী ভাবছিলো, হঠাৎ গ'র্জে উঠলো, 'চুপ কর্ তোরা, চুপ কর্। এই বুদ্ধি নিয়ে

মহাবিত্তার ব্যবসায় না এসে ক্লাইব ইষ্টিটের কেরাণী হ'তে পারলি নে? দেখো একদিন সব ক'টাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে। তার পর দালালি আপিস খুলে বসবো এম্-এ পাশ চাকর রেখে।'

গণ্শা মাণ্কে যেন গুলি খেয়ে চুপ ক'রে গেলো, কিন্তু ভোমরা মোটেও ঘাবড়ালো না—তাকে তো কিছু বলা হচ্ছে না। বরং ঐ ষাঁড়তুটো যে এ রকম পদে-পদে জব্দ হচ্ছে তা'তে তার খুব খুসীই লাগছিলো। কই, এখন তু' একটা রসিকতা বেরোক্ না!

সে খুব মন দিয়েই ওদের কথা শুনছিলো, সর্দার থামতেই মুচকি হেসে বললে—'বুঝেছি আমি ব্যাপারটা।'

'তা বুঝবে না! তোমার মাথা তো আর ওদের মত ঘুঁটের ক্ষেত নয়!'

'আমরা তু'জনে আসছিলাম—আমাকে ভুল ক'রে এনেছে। কাল আবার যাবে বিরিঞ্চিকে আনতে। সত্যি যাবে তো ওরা? ওঃ, বিরিঞ্চি এলে বেশ হয়। ওর ক্যারম-বোর্ড্টাও আনে যেন।'

সর্দারের মুখ কালো হ'য়ে গেলো। সেটা বিশেষ লক্ষ্য না ক'রে ভোমরা জুড়ে দিলে : 'বিরিঞ্চি আমার খুব বন্ধু কিনা!'

একটু পরে বললে সর্দার : 'ওহে খোকা, তোমার দেখি বাড়ি ফেরবার মোটে ভাবনাই নেই। আমাদের খুব পছন্দ হ'য়ে গেছে—না?'

'অত গরজ থাকে পৌঁছিয়ে দিলেই হয়।'

'বাবাঃ, অমন একখানা জমকালো গাড়ি ক'রে নিয়ে এলাম, আবার পৌঁছিয়েও দিতে হবে!'

'না দিলে তবে, একা-একা আমি যেতে পারবো না।'

'তা হ'লে আমাদের এখানেই তুমি থাকবে।'

'ব'য়ে গেছে! আমার দাদামশাই আছেন পুলিশের বড় সায়েব, তিনি আমাকে খুঁজে বার করবেনই—তোমরাও জেলে যাবে।'

দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলো সর্দারের চোখ। 'কে, কে তোর দাদামশাই, বল দেখি!'

'ব'য়ে গেছে বলতে।'

'বলবি না?' হাড়-কাঁপানো স্বরে হুমকি দিয়ে উঠলো সর্দার।

'না, বলবো না তো!' ঝাঁকড়া চুল তুলিয়ে ব'লে উঠলো ভোমরা। আর সত্যি, বলবেই বা কী, কবে ম'রে গেছেন তার দাদামশাই, আর তিনি ছিলেন পুলিশের বড় সায়েব নয়, জন ডিকিন্সনের বড় বাবু।

'বটে?' ব'লে সর্দার খপ্ ক'রে ভোম্‌রার একটা হাত ধ'রে ফেললো—মনে হ'লো তার হাতটা যেন একটা লোহার সাঁড়াশির মধ্যে আটকে গেছে। অসম্ভব শক্তিতে একটু-একটু ক'রে মোচড়াতে-মোচড়াতে সর্দার বলতে লাগলো : 'বলবি? বল্! বল্!'

যন্ত্রণায় পাগল হ'য়ে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো ভোমরা। কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলো : 'ইস্, ভারী শাসাচ্ছো! মেরে ফেলবে নাকি? মারো না; মারো না—আমি কিনা ছোট, আমার কিনা গায়ে জোর নেই—না, বলবো না তো! কী করবে? দরকার থাকে খুঁজে নিলেই পারো। এটুকুও পারো না তো গুণ্ডার দলের সর্দার হয়েছো কী করতে? ক্লাইভ ইষ্টিটের কেরাণী হও গে, যাও।' রাগের ঝোঁকে যা খুসী তাই বলতে লাগলো ভোমরা।

সর্দারের কী মনে হ'লো, দিলে হঠাৎ হাত ছেড়ে।—'যা-যাঃ, ছিঁচকাঁতুনে ক্যাবলকান্ত, এতেই লাগলো!'

'না, লাগবে না! দিই তো তোমার আঙুলগুলো জাঁতা দিয়ে পিষে—দেখি, কেমন লাগে!' ব'লে ভোমরা একেবারে হু-হু ক'রে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

'কী মুস্কিল! কোত্থেকে একটা কাঁতুনে বাচ্চাকে ধ'রে এনেছে রে! যা, যা, এটাকে দিয়ে আয় রাস্তায় ছেড়ে। যত আপদ! কী রে, শুনছিস্ না কথা?'

গণ্শা এলো এগিয়ে, কিন্তু সে যেই ভোমরাকে ছুঁতে পেরেছে অমনি সে মেঝের উপর লুটিয়ে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। 'যাবো না, কিছুতে যাবো না। রাস্তায় ছেড়ে দিলেই আমি পারবো নাকি যেতে! কোথায় এনেছো

আমাকে আমি কি জানি? আমি কি রাস্তা চিনি? আমার কাছে কি পয়সা আছে যে ট্র্যামে চড়বো! বেশ তো, দাও না ছেড়ে—আমি এক্ষুণি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করছি, তার পর পুলিশ এসে যখন সব ক'টাকে হাজতে পূরবে, তখন টের পাবে মজা। চলো না!'

কিন্তু সর্দারের ইঙ্গিতে গণ্শা গেলো থেমে। ছেলেটা যা বলছে তা যে হ'তে না পারে তা নয়। তাদের এই আড্ডার সন্ধান এ পর্য্যন্ত পায় নি কোনো পুলিশ। ছোটখাটো কাজ করতে গিয়ে আলাদা-আলাদা লোক ধরা পড়েছে, জেল খেটেছে—কিন্তু শিবু সর্দারের নাম কেউ ফাঁস করে নি, জেল থেকে বেরিয়ে আবার তার দরজাতেই হাজির। কলকাতার বুকেরই উপর চিৎপুরের এক গলিতে বহু পুরোনো এই বাড়িতে যারা থাকে তাদের আসল ব্যবসা যে কী কেউ জানে না। রাস্তার দিকে যতগুলো ঘর সব ক'টায় সাইনবোর্ড ঝুলছে—কোনোটা মনোহারী দোকান, কোনোটা দরজির, কোনোটা দপ্তরির। প্রায় চল্লিশটি লোক এক জায়গায় আছে শিবু সর্দারের অধীনে—ঐ পাৎলা চেহারার বাবু লোকটি না থাকলে দু' দিনে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি খাওয়া-খাওয়ি ক'রে সব ফাঁসিয়ে দিতো। মাণিক আর গণেশ হচ্ছে দুই ছোট কাপ্তেন—শক্ত কোনো কাজ হ'লেই ওদের ডাক পড়ে। আস্তানাটা তাদের বেশ জমজমাট—এখন এই ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে নাকি ফাঁদে পড়বে! রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকাটা নিশ্চয়ই চ্যাঁচাবে, লোক জড়ো হ'তে কতক্ষণ! ও গল্প করবে সবিস্তারে, পুলিশ আসবে, তার পর খোঁজ-খোঁজ, তার পর··কে জানে! সর্দারের অবাক্ লাগলো এই ভেবে যে এই সোজা কথাটাও কিনা ঐ বাচ্চাটাই ব'লে দিলে! তার নিজেরও মাথা গুলিয়ে গেলো নাকি? এ ধরণের কাজে এই সে প্রথম হাত দিলে—সুরুতেই কেমন যেন গুলিয়ে গেলো।

একটু ভেবে সর্দার বললে, 'যা, ঐ গাড়িতেই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়। দেখিস, আবার কোনো বিপদ্ ঘটাস নি।'

ভোমরা লাফিয়ে উঠে বললে: বেশ, বেশ, চলো।'

গণ্শা বললে: 'পাণ্ডাজি, যেখানে নামাবো কেউ যদি দেখে ফেলে? ও যদি চ্যাঁচায়? আর, একটা মুখ-বাঁধা ছেলেকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলে লোকে ভাববে কী?'

'পারবি না বুঝি এটাকে ছেড়ে আস্তে? ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার!'

গণ্শা চুপি-চুপি বললে, 'রাত বাড়ুক্।'

সর্দার বললে, 'হুঁ।'

সত্যি, নিয়ে আসা যত সোজা হয়েছিলো, দিয়ে আসাটা মোটেও সে-রকম নয়। প্রতি পদেই বিপদ্। ভারী তো মুস্কিল হ'লো।

গণ্শা ফিসফিসি ক'রে বললে, 'আমি বলি কী, দু' একটা দিন যাক্ না। যদি কিছু···। একেবারে একাদশী হবে—তার চাইতে··'

সর্দার বললে, 'হুঁ।' তার পর ভোমরার দিকে তাকিয়ে বললে: 'নে, এই সন্ধ্যেবেলা প'ড়ে-প'ড়ে কাঁদতে হবে না। এখানেই থাকবে তুমি, ভয় নেই।'

ইস্, এঁদের এখানে থাকবার জন্যে আমার যেন প্রাণ যাচ্ছে! কিন্তু ভোমরা মুখে কিছু বললে না, কান্নার দু' একটা ঝাপটা এখনো উঠছিলো তার গলা ঠেলে।

'কাঁদিসনে বলছি, চুপ কর্।'

'না, কাঁদবো না! সেই কখন্ খেয়ে ইস্কুলে গেছলাম—এতক্ষণেও বুঝি ক্ষিদে পায় না! চালাকি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, দিচ্ছে খাবার এনে। কী খাবি?'

'ইস্কুল থেকে এসে আমি রোজ লুচি আর সন্দেশ আর দুধ খাই।' ভোমরা অনায়াসে বললে ও-কথা, যদিও আসলে সে ভাত খায় নন্দ-বসন্তর সঙ্গে ব'সে।

'ওঃ, মামাবাড়ির আব্দার পেয়েছো, না চাঁদ? আর কী-কী খাও শুনি? চাঁদের পায়েস খাও না?'

'তোমার মুণ্ডুর বড়া খেতে পারলে খুব ভালো লাগতো,' জবাব দিলে ভোমরা।

'বটে?' গণ্শা আর মাণ্কে ভাবলে পাণ্ডাজি বুঝি ছেলেটাকে খপ্ ক'রে খেয়েই ফ্যালে! উঃ, শিবু সর্দারের মুখের উপর ও-রকম বলা! ছেলেটার কি

প্রাণের ভয়ও নেই? এর একশো ভাগও কি কেউ কখনো বলতে পেরেছে সর্দারকে? অবাক্ করলে যে!

কিন্তু তারা একেবারেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো যখন সর্দার বললে: 'যা, যা, ভালো দেখে কয়েকটা সন্দেশ আনিয়ে দে তো। খাক্ ছেলেটা।'

'সন্দেশের সঙ্গে শিঙাড়াও,' ভোমরা ব'লে উঠলো।

'আচ্ছা, শিঙাড়াও ব'লে দে—গরম।'

ভোমরার সত্যি বড়ো ক্ষিদে পেয়েছিলো, খাবার আনানো হচ্ছে দেখে উৎসাহে উঠে বসলো। সর্দারের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'তুমিও খাবে তো আমার সঙ্গে ব'সে?'

'নে নে, আর ফাজলেমি করতে হবে না,' ব'লে শিবু সর্দার মুখ ফেরালো।

(ক্রমশঃ)

গুপ্ত ভ্রাতৃর্দ্বয়

নীচে যাঁদের ছবি দেওয়া হ'ল তাঁরা দু'টি ভাই—দু' জনেই খেলাধূলায় এবং শরীরচর্চ্চায় খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। শ্রী অজিতরঞ্জন একজন বড় স্পোর্ট্স্ম্যান্, তা ছাড়া এ বছর পোল-ভল্টএ ইনি ইণ্টার কলেজ চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছেন। অসিতরঞ্জন নানা রকম শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। ইনি মল্লিক হেল্‌থ্ হোমের একজন বিশিষ্ট ছাত্র। এঁর শারীরিক শক্তি দেখে ১৯৩৫ সনে এঁকে সিলভার জুবিল্লী মেডেল দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীঅজিতরঞ্জন গুপ্ত

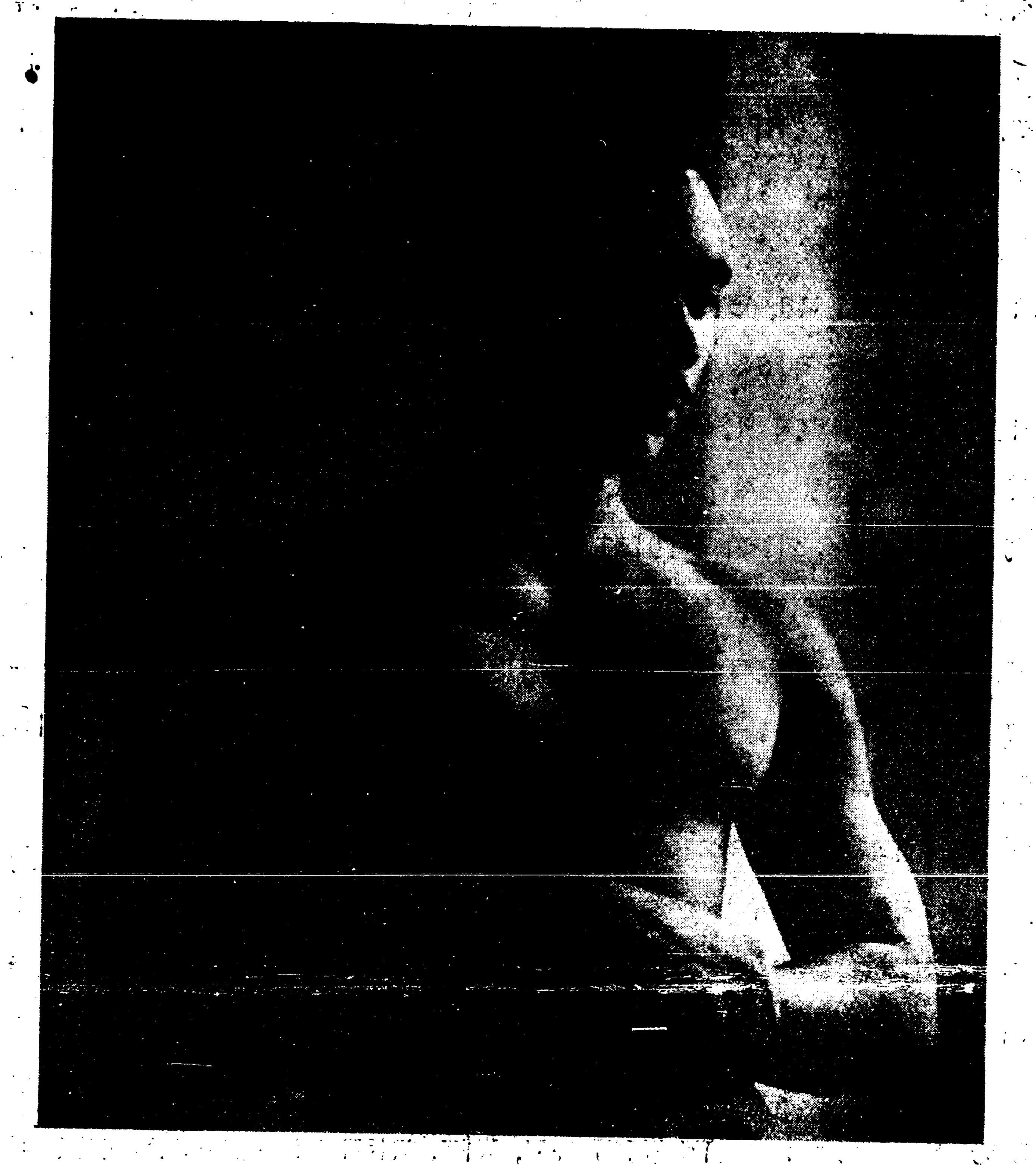

শ্রীঅসিতরঞ্জন গুপ্ত

প্রত্যহ কিছু পরিমাণে কাঁচা খাদ্য খাইবে

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি, বি-ই-এস)

আজকাল ইউরোপে ও আমেরিকায় কাঁচা জিনিস খাইবার খুব ধূম পড়িয়া গিয়াছে। যে সব পণ্ডিত পুষ্টিবিজ্ঞান, খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া চর্চ্চা করেন

তাঁহারা বলিতেছেন, আমাদের রোজকার খাবারে খানিকটা করিয়া কাঁচা জিনিস থাকা উচিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহা বাতিকেও পরিণত হইয়াছে। যেমন আমেরিকায় এক দল লোক বলিতেছেন—কোনও জিনিস রাঁধা খাওয়া উচিত নয়, সব জিনিসই কাঁচা খাইতে হইবে। কাজেও তাঁহারা করিতেছেন ঠিক তাই। তাই বলিয়া যেন মনে করিও না তাঁহারা সত্যসত্যই ছাগলটাকে ধরিয়া কাঁচাই খাইয়া ফেলেন। তা নয়, তাঁহারা সকলেই প্রায় নিরামিষাশী। দুধ, ফল, গাছের বীজ ও পাতা এবং কচিৎ ডিম—এই সবই তাঁহারা কাঁচা খাইয়া থাকেন। এবং অনেকে বলেন এই নিয়মে খাওয়ায় তাঁহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই হইয়াছে।

ভারী মজা, নয় কি? ছেলেদের আর ভাবিতে হইবে না। তাহাদের সাধের কাঁচা, ডাঁশা ও পাকা পেয়ারা এইবার রক্ষা পাইল। তা ছাড়া কুল, আম বুনো শেয়াকুল, কামরাঙ্গা, আমড়া, তেঁতুল, আমলকী, খেজুর, জাম, জামরুল, গোলাপজাম ইহারাও সকলেই এখন নব্যপুষ্টিবিজ্ঞানের কৃপায় বেশ হোমরা-চোমরা হইয়া পড়িল। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন ঐ সকল ফলের মধ্যে আছে ভিটামিন সি; আর ভিটামিন সি নাকি শরীর ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

এই ভিটামিন 'সি' কেমন করিয়া আবিষ্কৃত হইল তার গল্প শোন:—সেকালে (প্রায় তের শ' বছর আগে) এখনকার মত ষ্টীম এঞ্জিনের জাহাজ ছিল না। তখন ছিল পাল-তোলা জাহাজ। নাবিকেরা দু'-তিন মাস ধরিয়া সেই জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিত; ডাঙ্গার সহিত তাহাদের তখন কোনও সম্পর্ক থাকিত না। ঐ সময়ে তাহারা খাইত রুটী এবং টিনে রক্ষিত মাংস। আজকাল জাহাজে একটা করিয়া ঠাণ্ডা ঘর থাকে; উহার মধ্যে ফল, মাছ, মাংস রাখিয়া দিলে সেগুলি পচিয়া যায় না। জাহাজের ঐ ঠাণ্ডা-ঘরে বসাইয়া আজকাল কালিফোর্ণিয়া বা কানাডা হইতে আঙ্গুর, আপেল কলিকাতার বাজারে আমদানী হইতেছে। পাল-তোলা জাহাজ সমুদ্রে অল্প বেগেই চলিত, বাতাস বা সমুদ্রস্রোতের বাধা পাইলে চলিত আরও ধীরে। নাবিকেরা জাহাজে থাকিয়া ঐ দীর্ঘকাল সংরক্ষিত খাদ্য খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। এই সব জাহাজের নাবিকদের মধ্যে প্রায়ই একটা রোগ দেখা যাইত—তার নাম স্কার্ভি (scurvy)।

স্কার্ভির প্রথম লক্ষণ ছিল যে আক্রান্ত নাবিক অত্যন্ত আলসে হইয়া পড়িত, তাহারা একদম কাজ করিতে চাহিত না। উপরওয়ালা কর্ম্মচারীরা ভাবিত যে তাহারা ইচ্ছা করিয়াই কাজ করিতেছে না। জোরজবরদস্তি করিয়া তাহাদের দিয়া কাজ করান হইত; ফলে এমনও হইত যে উঁচু মাস্তুলের উপর উঠিয়া হয়তো নাবিক পড়িয়া মরিয়া গেল। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে লোকের কর্ত্তব্যবুদ্ধির পর্য্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটে। কে বলিতে পারে, ক্লাসের আলসে ছেলেটির আলস্যের কারণ তাহার উপযুক্ত খাদ্যের অভাব নয়?

স্কার্ভি রোগাক্রান্ত লোকের শরীরে রক্ত কমিয়া যায়। সে ফ্যাকাশে ও দুর্ব্বল হয়; এবং অল্প পরিশ্রমেই হাঁফাইয়া পড়ে। তাহার দাঁতের মাড়ি ফুলিয়া উঠে এবং মাড়ি হইতে সহজেই রক্ত বাহির হয়—উহাতে ক্ষত হয়। দাঁত নড়িতে থাকে, কখনও বা পড়িয়া যায়। গায়ের চামড়া হইতেও সহজে রক্তপাত হয়—উহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

জাহাজের কাপ্তেনদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতে পারিলেন যে টাটকা খাদ্যের অভাবেই ঐ ব্যারাম হয়, এবং পরিশেষে তাঁহারা দেখিলেন, নানা জাতের লেবুর রসে স্কার্ভি-প্রতিষেধক ঔষধ বিদ্যমান আছে। তখন আইন হইল, প্রত্যেক জাহাজকে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় লেবুর রস লইয়া যাইতে হইবে।

আজকালকার পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে বিবিধ কাঁচা খাদ্যে এক রকম ভিটামিন আছে—তাহার অভাব হইলেই এই স্কার্ভি রোগ জন্মে। অভাব গুরুতর হইলেই ঐ রোগের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়, নচেৎ আংশিক লক্ষণ দেখা যায়। এই ভিটামিনের নাম তাঁহারা দিয়াছেন ভিটামিন 'সি'।

ভিটামিন সি সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা জানিয়া রাখ—

(১) অধিকাংশ কাঁচা খাদ্যে অল্পবিস্তর ভিটামিন 'সি' আছে।

(২) অম্লরসযুক্ত ফলে ভিটামিন 'সি' সব চেয়ে বেশী থাকে।

(৩) সিদ্ধ করিলে ভিটামিন 'সি' ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকে।

(৪) সিদ্ধ করিবার সময়ে যদি খাদ্যবস্তুতে বাতাস যায় তাহা হইলে ভিটামিন 'সি' আরও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়।

(৫) অম্লরসযুক্ত খাদ্য বস্তু সিদ্ধ করিলে কিন্তু ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয় না।

এইবার আরও কয়েকটি কাজের কথা বলিব। কাঁচা দুধ, কাঁচা আলু পটল বাঁধাকপি প্রভৃতিতে ভিটামিন 'সি' আছে। তবে কি এসব জিনিস কাঁচা খাইবে? শীতপ্রধান দেশের লোকে দুধ কাঁচাই খায়, এবং অনেক আনাজ (যেমন কপি, শালগম) কুচাইয়া কিছু ভিনিগার বা লেবুর রসের সঙ্গে মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দেয়; উহাকে বলে স্যালাড্। তাহাদের খাবারের সঙ্গে স্যালাড্ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঠিক ও নিয়ম চলে না, কারণ এ দেশে জিনিষপত্র বড় সহজেই পচিয়া যায়। এজন্য এখানে দুধ জ্বাল না দিয়া খাইবার এবং কপি প্রভৃতি কাঁচা খাইবার প্রথা নাই। বিশেষতঃ কপি বহুস্থানে যে ভাবে জন্মে তাহাতে উহার মধ্যে সহজেই নানা রোগের বীজ বাসা লইতে পারে। অতএব উহা কাঁচা না খাইয়া রাঁধিয়া খাওয়াই উচিত। তবে স্যালাডের পক্ষে এই বলা যায় যে কাঁচা আনাজ লেবুর অম্লরস দিয়া ভিজাইয়া ঘণ্টাখানেক রাখিয়া দিলে উহার ভিতরকার রোগের বীজাণু, এবং যে সব বীজাণুর জন্য জিনিষ পচে সেগুলি, প্রায় নষ্ট হইয়া যায়।

খানিকটা আনাজ ভাতে বা পোড়া খাইতে অভ্যাস করা উচিত। আলু সিদ্ধ করিলে উহার ভিটামিন 'সি' খানিকটা নষ্ট হয় এ কথা ঠিক, কিন্তু একটি বড় আলু বা বেগুনের মধ্যভাগের তাপ সব সময়ে ফুটন্ত জলের তাপের সমান হয় না, আর উহার বাহিরের দিকের ভিটামিন বাতাসের সংস্পর্শে আসার দরুণ যত শীঘ্র নষ্ট হয় ভিতরেরটা তত শীঘ্র নষ্ট হয় না।

বাঙ্গালী জাতির খাবারের মধ্যে ভিটামিন 'সি'র প্রধান আধার হইতেছে তেঁতুল। উহাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। তেঁতুলের পরই আম—আমসি, আমসত্ব। তার পরই পাতি, কাগজি, বাতাবি ও কমলা প্রভৃতি লেবু—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহাদের চলন যে খুব বেশী তা বলা যায় না।

তেঁতুল বা আমের অম্বলের সহিত রাঁধা মাছ বা আনাজের ভিটামিন 'সি' অনেকটাই বজায় থাকে।

বেচারী !

(শ্রীসুকুমার দে সরকার)

স্ট্র্যাণ্ড রোড ছাড়িয়ে নিমতলার পাশ দিয়ে গঙ্গার কোল ঘেঁসে যে রাস্তাটা গিয়েছে তারই একটা পাটের গুদাম থেকে পাঁশুটে রঙের একটা শুকনো বেড়াল বেরিয়ে এসে করুণ চোখে রাস্তাটা পর্য্যবেক্ষণ করে শঙ্কিত সখেদকণ্ঠে বলে উঠল—মিয়াউ !

বেলা যায়। গঙ্গার জলে পড়ন্ত সূর্য্যের লাল আভা চিক্‌চিকিয়ে ভেসে চলেছে। পাড়ে নানা রকমের কলরব, লোকের ভিড়। নৌকোগুলোকে জোয়ারের মুখেই ভেসে পড়তে হবে। কেউ হাঁড়ি বোঝাই করছে, কেউ বা চাল। কারও বোঝাই শেষ হয়ে গেছে, নৌকোর গলুইএ বসে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানতে টানতে জোয়ারের অপেক্ষা করছে সে। বেচারী বেড়ালটার সারাদিন আহার জোটে নি। যেখানে গেছে সকলেই মার মার করে উঠেছে। কিছু যদি শিকার পাওয়া যায় এই আশায় সে পাটের গুদামে ঢুকেছিল; কিন্তু তার পাঁকাটির মত শুকনো চেহারা দেখে ইয়া জাঁদরেল চেহারার ইঁদুরগুলোই গোঁফ ফুলিয়ে তেড়ে আসে। বেচারী মানে মানে বেরিয়ে এসেছে।

শুকনো গোঁফে একবার জিভ বুলিয়ে উদাস-দৃষ্টি পথের ওপর ফেলে সে আবার সখেদে বলে উঠল—মিয়াউঁ, অর্থাৎ জগতে আর সুখ নেই ভায়া একেবারে সুখ নেই। হঠাৎ তার চোখ পড়ল রাস্তার এক কোণে ময়লা-ফেলবার টিনটার ধারে কি যেন রাশীকৃত জমে আছে, আর সেখান থেকে কেমন মিষ্টি-মিষ্টি মাছের আঁশের আর কাঁটার গন্ধ ভেসে আসছে।

—তবে কি?

নাঃ, আর ভাবে না; কাজ ফেলে মিথ্যে সময় নষ্ট করে বোকারা। বেড়ালটা ত্রস্তপদে এগিয়ে গেল। মাছের আঁশ আর খোলাই বটে। কি তার সুগন্ধ! এমন জিনিস যে বোকা লোকগুলো কেন ফেলে দেয় সে ভেবে পেল না।

সারাদিনের পর ভাগ্য নেহাৎই মুখ তুলে চেয়েছে, একেবারে মহাভোজ সামনে। এই ভেবে বেচারী যেই খাবারে মুখ দিতে গেছে, কোথা থেকে এক হতভাগা কুকুর সগর্জ্জনে ধেয়ে এল।

—ভৌ ঔ, যাদুধন আর যাবে কোথায় ?

বেড়ালটা শুকনো শরীরটা যথাসম্ভব ফুলিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে—ফ্যাঁশ্-শ্-শ্।

কিছু ফল হ'ল না। কুকুরটা আরও দু'পা এগিয়ে এল এবং আরও গম্ভীর আওয়াজ দিয়ে বললে—ভৌ-ভৌ ঔ। বেড়ালটার মুখের গ্রাস পড়ে রইল, লেজ তুলে সে মারলে দৌড়। যেই না ছুট মারা কুকুরটা বললে—ইস্ ফাঁকি দেবে ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি !

সেও পেছু নিল।

পড়ে রইল পেছনে টিনের ময়লার ঘেরাটা, পড়ে রইল পাটগুদাম। ছুট ছুট, হতভাগা কুকুর আর পেছন ছাড়ে না। বেড়ালটা হঠাৎ বাঁয়ে খানিক গিয়ে একটা নৌকোয় লাফিয়ে পড়ল। নৌকোটা ডাঙ্গায় লগি দিয়ে ঠেলা মারছিল, গঙ্গায় জোয়ার এসে গেছে। দেখতে দেখতে ডাঙ্গার সঙ্গে নৌকোটার এক বাঁশ তফাৎ হয়ে গেল। কুকুরটা বাধা পেয়ে এক মিনিট হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, শেষে গলা বাড়িয়ে হেসে বলল—ভো-ভৌ, দূয়ো পালিয়ে গেল, হোঃ হোঃ, ভৌ। বেড়ালটা তখন নৌকোর এড়ো কাঠটার আড়ালে বসে কাঁপছে।

নদীর জল ছল-ছল, ছল-ছল করে ছুটে চলেছে, পেছনে পড়ে রইল কলকাতা। কারখানার চোঙা আর চিমনিগুলো আবছা হয়ে আসছে। পশ্চিমে বাঁকের মুখে রাঙা সূয্যিঠাকুর জল ছুঁয়েছে, জলের আড়ালেই এবার মুখ লুকোবে। আজন্ম কলকাতার রাস্তায় বেড়ে-ওঠা বেড়ালটা কলকাতা ছেড়ে ভেসে পড়ল। পড়ে রইল আশৈশবের লীলাক্ষেত্র, পরিচিত স্থান। কে জানে কোন্ অজানার উদ্দেশে ভাগ্য তাকে টান দিয়েছে এবার। নৌকোর মাঝি হাল ধরে ছৈএর উপর বসে ভাগলপুরী গলায় তান সাধছিল। একজন দাঁড়ী তামাকু সাজতে এসে

বেড়ালটাকে দেখতে পেয়ে বললে—আঃ মর, আবার একটা কেলে বেড়াল জুটল কোথা থেকে ?

তান থামল !

—কী হয়েছে ? মাঝি জিজ্ঞাসা করলে।

—একটা বেড়াল কোথা থেকে নৌকোয় চেপে বসেছে, দেব নাকি ফেলে ?

—আহা হা থাক কেষ্টর জীব ! ডাঙ্গায় নৌকো ভিড়লে সেখানে ছেড়ে দিলেই হবে।

নৌকোয় রয়ে গেল বেড়ালটা।

দু'পাশ দিয়ে আবছা, অস্পষ্ট গাছপালা, বাঁশঝাড়, কোথাও কোন নির্জ্জন পুরীতে যক্ষপুরীর মাণিক জ্বলছে। আকাশে চাঁদ উঠল আর জলে উঠল চাঁদের ছায়া। নৌকোর সাথে তার পাল্লা দূর পাড়িতে। কোন্নগরের পূব কোণ বেয়ে, বাঁশবেড়ের বাঁশঝাড়ের গা ঘেঁষে চল্‌ল নৌকো। মাঝিরা উলুবেড়ের, তারা উলুখড় বোঝাই করল। তার পরে চল্‌ল নৌকো, স্রোতের ওপর ভাসতে ভাসতে, আর ভেসে চল্‌ল সময়। বেড়ালটা নৌকোর খোলে শুয়ে ঝিমুচ্ছিল হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে তার তন্দ্রা ছুটে গেল। ডাঙ্গায় নৌকো ভিড়েছে। কোথাও এতটুকু আলো দেখা যায় না, রাত গভীর। তন্দ্রা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষিধে আবার চাড়া দিয়ে উঠল। সে আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়ল। নৌকোর এক পাশে মাঝিরা ভাত চাপিয়েছে, সেদিকে গলা বাড়াতেই একজন মারলে এক তাড়া—হট্ হট্, হ্যাঃ।

বেড়ালটা বলল—মিয়াউঁ।

একটা দাঁড়ী চটে মটে কসিয়ে দিলে এক সুট্ ; আর একটাও বোধ হয় দিতে আসছিল, কিন্তু আর সে অপেক্ষা করে ? চোখ কান বুজে বেড়ালটা মারল ডাঙ্গায় লাফ। একবার ফিরে দেখল তাড়া করে আসছে কি না, তার পরে মনের দুঃখে পা বাড়াল অন্ধকারে—যেদিকে দু' চোখ যায়।

তার মাথা ছাড়িয়ে এক বিঘৎ লম্বা ঘাস। পাশ দিয়ে খস্ খস্ করে কী

যেন একটা চলে গেল, সাপ হবে বোধ হয়। ঘাসের বন ঠেলে বেড়ালটা এগোতে লাগল। অনির্দ্দেশ যাত্রা। সামনে একটা অস্পষ্ট সাদা মতন কি দেখা যায় যেন। একটা দেওয়াল। তার ওপরে ওগুলো কি রেলিং? বেড়ালটা লাফিয়ে উঠল রেলিঙের পাশে। ভেতরে বাগান তার পরে একটা অন্ধ দৈত্যের মত বাড়ী। কোথাও এতটুকু প্রাণের স্পন্দন নেই, সব নিথর নিস্পন্দ। বেড়ালটা রেলিঙের ওপর দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল। তার আহার আর আশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। যাকে সে বাগান ভেবেছিল সেখানে কেবল বন আর আগাছা; বাড়ীটার আটঘাটও সমস্ত ধন্ধ। শার্শিতে আঁচড় কেটে সে দেখল, জানলায় ঠেলা মেরে ঢোকবার কোন উপায় নেই। শেষে নর্দ্দমা দিয়ে ভেতরে গলে পড়ল।

প্রথমেই একটা বদ্ধ ভাপসা গন্ধ। ঘুমন্ত জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই, গাঢ় মসীময় অন্ধকারে স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে চাঁদের ক্ষীণ আলো ভূতুড়ে হাসি হাসছে। বেড়ালটা একবার সাড়া দিলে—মি-মিয়াউঁ।

হুস করে মাথার কাছে কি একটা শব্দ হল, মাথায় কে কসিয়ে দিলে এক চাঁটি। বেড়ালটা বাঁ পাশ ঘেঁষে মারলে এক লাফ। কি যেন একটা হুড়মুড়িয়ে পড়ল। হুস্ করে শব্দ আবার মাথার ওপর। বেড়ালটা এবার নেহাৎই চটে গিয়েছিল, নিজের মাথা লক্ষ্য করেই সে মারলে প্রচণ্ড এক লাফ। অন্ধ স্তব্ধতা ভেঙ্গে কে যেন কিচমিচ করে উঠল। বেড়ালটা চট্ করে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সুট্ করে কারা সব যেন সরে পড়ল চারদিকে।

ঘরের এক কোণ থেকে আওয়াজ এল—খুট্ খুট্; সেই কোণ লক্ষ্য করে বেড়ালটা সেদিকে তেড়ে গেল। ঘরের অন্য কোণ থেকে তখন আওয়াজ এল—খুট্ খুট্ খুট্।

ফর্‌র্... ..

কানের পাশ দিয়ে কারা যেন উড়ে গেল। বেড়ালটা ভাবল এ কোথায় এসে হাজির হলাম রে বাবা! ভূতের বাড়ী? অন্ধকারে কে জবাব দিল—টিক-টিক, ঠিক-ঠিক ঠিক। এল একটা দমকা হাওয়া। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে জানলা

শার্শিগুলো খট্ ঘট্ ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। হঠাৎ কথাবার্ত্তা নেই, মাথায় সজোরে কি একটা পড়ল, মুখ চোখ বালিতে ভরে গেল। বেড়ালটা জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

...

হু হু করে সময়ের ঘোড়া ছুটে চলেছে। মাঝ-আকাশের চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। প্রহর জানিয়ে দূর থেকে শেয়ালের দল হৈ হৈ হোয়া করে ডাক ছাড়ল। নদীর পাড়ে শরের বনে ঘস্ করে নতুন একটা নৌকো এসে লাগল। নৌকোয় লণ্ঠনের দোলাদুলি ছুটোছুটি।

ভূতুড়ে বাড়ীতে ওদিকে তেমনিই রহস্য। এখানে হুস্ করে কি একটা চলে গেল; ওখানে লুকোন ফিস-ফিসানির মত শব্দ—খুট্, টুক্ টুক্।

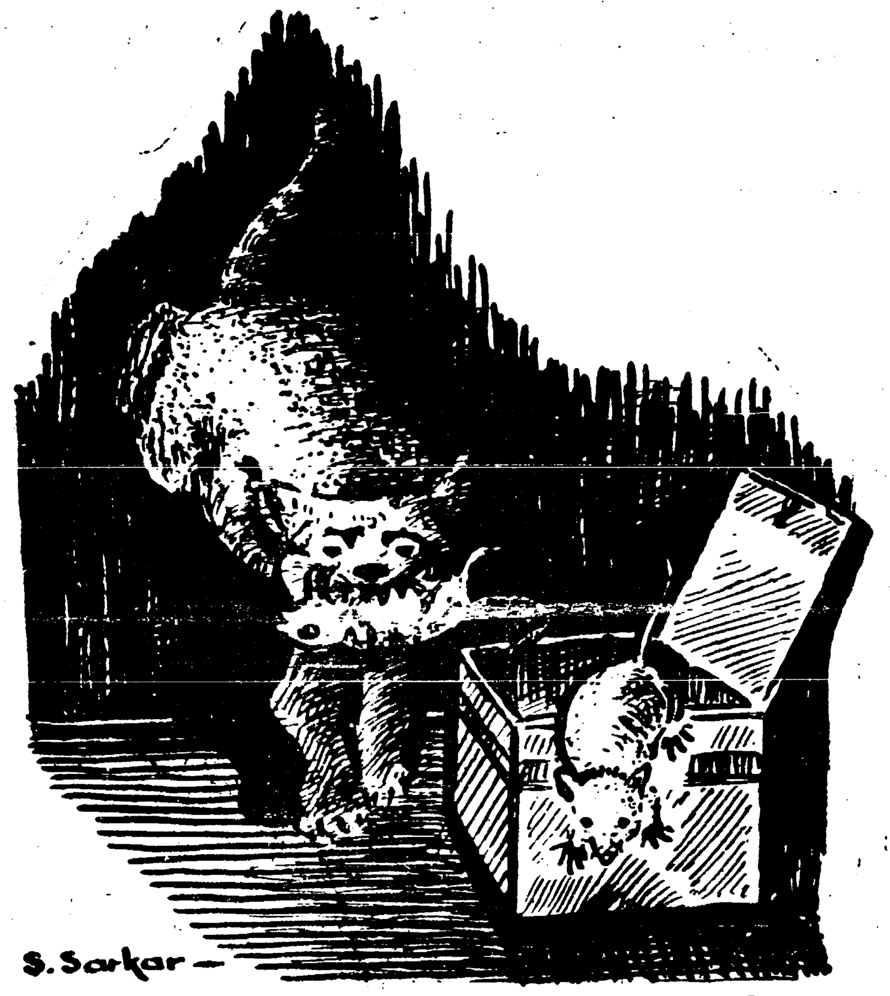

ভোরের ঠাণ্ডা একটা দমকায় বেড়ালটার জ্ঞান ফিরে এল। এক মিনিট সে উঠে হতভম্বের মত বসে ছিল, তার পরে সে ক্ষেপে গেল।

—খুট্ খুট্—

বেড়ালটা শিকারের ভঙ্গীতে টান হয়ে বস্‌ল। ওই ত ওখানে আধো অন্ধকারে কি একটা নড়ছে যেন! সেটা লক্ষ্য করে মারলে এক লাফ।

—কিচ্ কিচ্ কিচ্—

সূয্যি ঠাকুরের প্রথম স্তিমিত রশ্মি তখন ঘুমন্ত পৃথিবীকে ঠেলা মেরে বলছে—টু!

একটা নেংটি ইঁদুর লুটিয়ে পড়েছে আবার ঘাসে। আর একটা পালাচ্ছিল। কাঠের সিন্দুকটার ওপর ইঁদুরটাকে লাফিয়ে আলগোছে ধরে ফেল্‌ল সে।

ভোর হয়ে গেছে।

মচ্ মচ্ করে হঠাৎ দরজা খুলে গেল। লালপাড় একটা চওড়া শাড়ী ভেতরে ঢুকে বললেন—ওমা ঘর-দোরের কি ছিরি হয়েছে একবার দেখ! চামচিকায় ভরে গিয়েছে, আবার ছাত থেকে বালি খসে পড়েছে। এই ত মোটে ছ' মাসের জন্যে একটু চেঞ্জে গিয়েছি, আর এই অবস্থা। বল্‌লাম ওঁকে একটা মালী রেখে যেতে, তা তো শুনবেন না! লালপাড় শাড়ীর পেছনে একটা ছোট্ট ফ্রক্-পরা ঝাঁকড়া-মাথা ঘরে ঢুকেই বললে—ও মাঃ, কি সুন্দর একটা বেড়াল! আবার কতগুলো ইঁদুর মেরেছে! দেখ মা। ওটাকে আমি পুষব। আয় আয় মিনু মিনু, আয় চু চ্চু!

বেচারী বেড়ালটা কখনও জীবনে আদর পায় নি, তবু সে বুঝতে পারলে যে এটা আদরের ডাক। সমস্ত শরীরটা ফুলিয়ে আব্দারের ভঙ্গীতে সে বলল—মিয়াউঁ।

সাপের স্বভাব

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

সাপের সম্বন্ধে সবাই সর্ব্বদা সাবধান। স্বভাবখানা তো জানাই আছে, কাজেই, সাবধানের মার নাই। কখন ফস্ ক'রে ছোবল মেরে দেবে কে জানে? কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে বেচারাদের বৃথা বদ্‌নাম। ভাল ক'রে খবর নিলে দেখা যাবে, সাপেরা বেশীর ভাগ আত্মরক্ষার জন্যই ছোবল মারে। কখনও কখনও রেগেও মারে;—কিন্তু, রাগটা অকারণ হয়তো নয়। যা' হোক্, বিষধরের যদি ছোবল মারার সম্ভাবনাও থাকে, তা'কে সমীহ ক'রে চলাই ভাল।

গত বৎসরে (ডিসেম্বর, ১৯৩৬) ফৈজপুর গ্রামে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়েছিল জান বোধ হয়? সেখানে নাকি সাপের উপদ্রব আছে। সেজন্য অনেকে ভয় পেয়েছিলেন; কিন্তু, শীতকালে সাপের ভয় থাকে না এ কথাটা হয়তো তাঁদের মনে ছিল না।

সাপেরা শীতকালে করে কি? যায় কোথায় তা'রা? —তোমরা অনেকেই

ঘুমের বেলায়।
দল বেঁধে সাপেরা শীতের ঘুমে মগ্ন

হয়তো এ কথার ভাল উত্তর দিতে পার্‌বে না। সাপেরা, এবং অন্যান্য অনেক প্রাণীরা (ইঁদুর, ভাল্লুক, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, প্রভৃতি) সারা শীতকাল নিরিবিলি কোণায় লুকিয়ে চুপটি ক'রে ঘুমিয়ে কাটায়। এ ঘুম সাধারণ ঘুমের মত নয়—প্রায় অজ্ঞান অবস্থার মতন। সে সময় তাদের রক্ত-চলাচল ধীরে হয়, নিঃশ্বাসও

ইঁদুর-শিকার
এবার একে উদরস্থ করাই এক ব্যাপার হবে!

খুবই আস্তে পড়ে। সচরাচর তারা একটি দল বেঁধে একত্র হ'য়ে ঘুমায়। ঘুমের আগে কিছু দিন বেশ ক'রে খেয়ে নিয়ে, মোটা হয়। শরীরে যে চর্ব্বি থাকে, ঘুমের মধ্যে সেটাই তাদের খাদ্যের কাজ করে। ঘুম যখন ভাঙ্গে তখন দেখা যায় যে তা'রা আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে। শীতের সময় শীতপ্রধান দেশে খাবার জিনিষের বড়ই অভাব। কিন্তু, এই ঘুমের দরুণ খাবার অসুবিধাটা এই সব লম্বা-ঘুমের প্রাণীরা বুঝ্‌তেই পারে না। যখন জাগে তখন তো শীত কাবারই হ'য়ে যায়!

ঘুম ভাঙ্গার পর আবার খাবারের সন্ধান হয়। সাপেরা তো রোজ খায় না, একবার একটি বড় গোছের শিকার পেলে তা'কে ধীরে-সুস্থে গিলে কিছুকাল পেটের ভারে কাবু হয়ে প'ড়ে থাকে। তার পর, খাবার হজম হ'য়ে গেলে আবার নড়ে-চ'ড়ে বেড়ায়। শিকার ধর্‌বার সময় হয়তো মনে হবে, "সর্ব্বনাশ! এত বড় জিনিষটাকে সাপ গিল্‌বে কেমন ক'রে?" কিন্তু, তাদের গিল্‌বার ক্ষমতাও বড় কম নয়; শরীরের গড়নও খুব স্থিতিস্থাপক। আস্তে আস্তে টেনে-টুনে কোনও রকমে মস্ত বড় শিকার একবার পেটের মধ্যে ঢুকা'তে পার্‌লেই হয়—তার পর চুপটি ক'রে ব'সে থাক্‌লেই হ'লো। সে সময় যদি কেউ এসে তা'কে আক্রমণ করে, তা' হ'লেই সাপের বিপদ্।

সাপেরা কামড় দিয়ে শিকারকে ধর্‌তে পারে, কিন্তু দাঁত দিয়ে ছিঁড়্‌বার কোনও ক্ষমতা নাই। গিলে খাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় তা'রা জানে না। নিরামিষ তা'দের মোটেই রোচে না।

সাপের বিষ-দাঁত থাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য—কাম্‌ড়ে খাবার জন্য নয়। উপর্য্যুপরি কয়েকবার আঘাত কর্‌লে দাঁতের বিষ অনেক কমে যায়; তখনকার কামড়ে বেশী ভয় থাকে না। অনেক সময় দেখা গেছে, গোখুরো সাপ হয়তো দু'চার জন পূর্ণবয়স্ক লোককে কামড় দেওয়ায় তাদের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু, একটি শিশুকে কামড় দেওয়ায় তা'র বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নি;—অর্থাৎ, আগের কামড়ে তা'র বিষ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল।

সাপেরা ছোবল মারার সময় মাথাটি তুলে, একটু দুলিয়ে নিয়ে আঘাত

করে। সাপকে সাপ কামড় দিতে হ'লে হয়তো টুঁটি চেপে ধর্‌বে, কিন্তু, অন্য জন্তুর বেলা মাথা তুলে ছোবল মার্‌বে। তাই দেখ, বুদ্ধিমান্ কাঁটাচুয়া কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে, মাথাটি নীচু ক'রে সাপের সাম্‌নে ব'সে রয়েছে। সাপ দু' একবার ছোবল দিতে গিয়ে জব্দ হ'য়ে মাথাটি উঁচু ক'রে রয়েছে—হয়তো ভাব্‌ছে, "কি করা"! কাঁটাচুয়াও যে একেবারে নিশ্চিন্ত রয়েছে, তা' নয়। তারও মাথায় ফন্দি আঁটা আছে;—সুযোগ পেলেই সাপের গলাটি কাম্‌ড়ে ধ'রে তা'র দফা শেষ কর্‌বে। বেজি সাপের আর এক শত্রু;—বল্‌তে গেলে, প্রধান শত্রু। তা'র সঙ্গে কিন্তু

জাত-ভাইকে আক্রমণ
বিষধর সাপ বিষহীন বড় সাপের গলা কাম্‌ড়ে ধরেছে

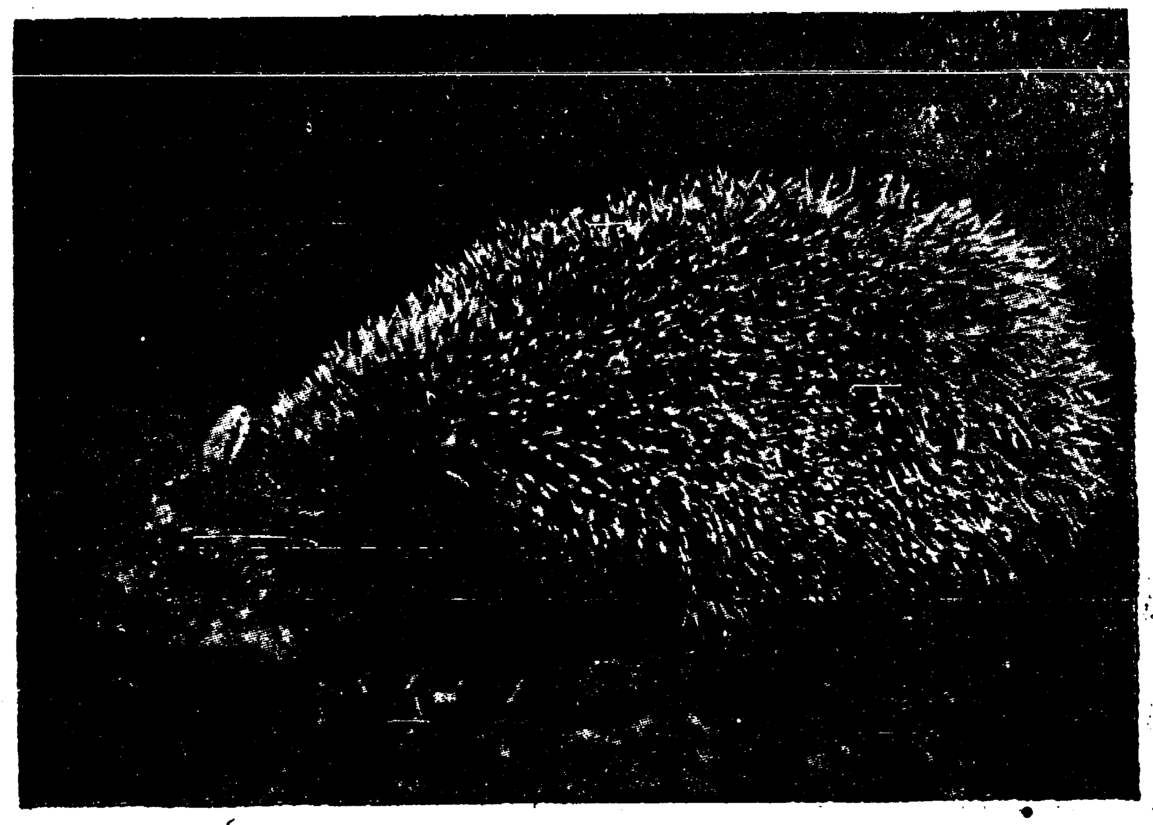

সেয়ানে-সেয়ানে
সাপ কাঁটাচুয়ার কাছে জব্দ

রীতিমত লড়াই চলে। বলা বাহুল্য, জিত্‌বার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাক্‌লে বেজি লড়াই আরম্ভই কর্‌বে না কখনও।

সাপেরা এক সঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। অতগুলি ডিম ফুটে যখন ছানা বের হয়, তখন না জানি কি রকম 'কিলবিল' ব্যাপার হয়! ছানার সঙ্গে সাপের কোনও সম্বন্ধ থাকে না; তা'রা 'চাচা আপনা বাঁচা' কর্‌তে বাধ্য হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, বিষধর সাপের সঙ্গে বিষহীন সাপের ভাব হয়। আমেরিকার Rattle snake এর সঙ্গে সেখানকার এক জাতের কালো বিষহীন সাপের বেশ ভাব দেখা যায়।

বিষাক্ত সাপের গায়ে উজ্জ্বল রং বা চক্র প্রায়ই থাকে; সেগুলিকে 'সাবধানকারী চিহ্ন' বলা যেতে পারে। বিষহীন সাপের রং অধিকাংশ সময়েই কালো, ছেয়ে কিংবা মেটে হয়। কালো অজগর—আকারে বিরাট্, কিন্তু বিষধর নয়। আমেরিকায় অজগর পোষার-বাতিক অনেক মেমসাহেবের আছে। সে দেশে বড় বড় অজগর-ব্যবসায়ী আছেন।

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠায় উত্তর দেওয়া হ'ল)

১। জাপানের বিখ্যাত 'হারাকিরি' প্রথার অর্থ কি?

২। নিম্নলিখিত বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী কে?

(ক) কংগ্রেসের সভাপতি (খ) ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের সভ্য (গ) ভারতীয় 'সিভিলিয়ান্' (I. C. S.) (ঘ) বিলাতের রয়াল সোসাইটির সদস্য, অর্থাৎ F. R. S. (ঙ) একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল (চ) ডিরেক্টার অব্ পাব্লিক ইন্‌স্‌ট্রাকসন্ (ছ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার (জ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধিধারী।

৩। 'আভেস্তা' বলিলে বুঝায়—

পেস্তা জাতীয় এক রকম কাবুলী মেওয়া; মেবারের রাজপুতদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে কুশল-জিজ্ঞাসা; অগ্নি-উপাসক পার্শি জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ; গাড়োয়ালীদের সামাজিক প্রথা—কোন্‌টি ঠিক?

৪। ক্রিকেট্ খেলায় যে নূতন "এল্-বি-ডব্লিউ" নিয়মের চল হয়েছে সেটা কি?

কঙ্গো হীরার পলায়ন

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

আমার ছোট মামা লোকটি ছিলেন ভারী আমুদে। দাদামশাই-এর টাকা ছিল বিস্তর, কাজেই কাজকর্ম্ম নিয়ে তাঁকে বিশেষ বিব্রত থাকতে হ'ত না। সন্ধ্যার পর প্রায় রোজই তাঁর বাড়ীতে একটা বড় রকমের মজলিস বস্‌ত এবং তা ভাঙ্গতে বেশ রাতই হ'ত। সেদিনও সন্ধ্যায় এই রকম একটা আড্ডা জমে উঠেছে; দিনটা ছিল বাদ্‌লা, লোক যে খুব বেশী এসেছিল তাও নয়—তবে যে ক'জন ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন খুব উৎসাহী সভ্য, কাজেই রসভঙ্গের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা ছিল না। এ কথা-সে কথার পর ভুবন বাবু প্রস্তাব করলেন, "ঠাণ্ডার দিন আছে, কেউ বেশ একটা রগ্‌রগে গল্প ধরুন না।" ডাক্তার সেন জাহাজে ডাক্তারী করেন, পৃথিবীর নানা জায়গা ঘুরেছেন—তা ছাড়া গল্প-লেখক বলেও তাঁর একটু-আধটু খ্যাতি আছে, কাজেই সকলে তাঁকেই পাকড়াও কর্‌ল। ডাক্তার সেন বল্‌লেন, "বেশ, আরম্ভ করছি, তবে তার আগে জন প্রতি এক কাপ্ করে চায়ের হুকুম করুন।" ভুবন বাবু বল্লেন, "হ্যাঁ বলুন, কিন্তু আপনার ঐ ইন্‌জেক্‌শনের গল্প কিংবা কি রকম কেস্ কখনও চোখে পড়ে নি সে সব পচা গপ্প চলবে না, দস্তুরমত রোমাঞ্চকর গল্প চাই—যার কথায় কথায় থাকবে রহস্য—চাই কি দু'-চারটে খুনখারাপী হ'লেও আপত্তি নেই। আছে আপনার ষ্টকে?" "আলবৎ আছে"—ডাক্তার সেন জবাব দিলেন। তার পর একটু ভেবে বল্লেন, "শুনুন তবে, সত্যি ঘটনাই একটা বলি, কিন্তু একেবারে উপন্যাস। তাই আমি গল্পের ভাষায়ই বল্‌ব। সিন্ ক্রিয়েট্ করার জন্য দু'টো-একটা নিজের ভাষা বোধ হয় দেওয়া চলবে?" "নিশ্চয় নিশ্চয়।"—সবাই সমস্বরে সায় দিল। চা এলে ডাক্তার সেন গল্প সুরু করলেন :—

"বছর দুই আগে খবরের কাগজে একটা বড় চুরির খবর বেরিয়েছিল, আপনাদের মনে আছে কি? থাকা উচিত—কারণ সে ছিঁচকে চুরি নয়, অমন চুরি কলকাতা শহরে একশ' বছরেও একটা হয় না। আমি "দি গ্রেট্ কঙ্গো ডায়মণ্ড্" চুরি যাওয়ার কথাই বলছি। সে আশ্চর্য্য চুরির কোনও কিনারা এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। এখানকার পুলিশ তো হিমসিম খেয়ে গেছেই—স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড্ থেকে লোক এসেও কিছু করতে পারে নি। সেই চুরির কথাই আমি বলছি। আচ্ছা গোড়া থেকেই বলি।

"কঙ্গো হীরার যে মালিক ছিল তার নাম বোধ হয় মনে আছে? মিঃ নীলুভাই—বম্বে অঞ্চলের লোক। এখন নাকি সে ঘোর উন্মাদ, রাঁচি না কোথায় পাগলা-গারদে আছে। যাক্ সে কথা, নীলুভাই প্রথম যৌবনে এত বড়লোক ছিল না—ভাগ্য অন্বেষণে সে যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়; সেখানে তার গুটি তিনেক বন্ধু জোটে, তাদের সকলের নাম আমার মনে নেই, একজনের নাম গয়ারাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় নীলুভাই আর তার বন্ধুরা কি ভাবে কাটিয়েছিল তা আর নাই শুনলেন, তা হ'লে এ গল্প আজ আর শেষ হবে না—তবে খুব সাধু ভাবে যে নয় এটুকু বলা যেতে পারে। ফলে টাকা যা করবার তা তারা কর্‌ল এবং অবশেষে এই বিরাট্ কঙ্গো হীরা—যার যুড়ি নাকি পৃথিবীতে খুব বেশী নেই—এদের হাতে এসে পড়্‌ল। গয়ারাম আর অন্য বন্ধুরা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা হজম করতে পার্‌ল না—হয়তো নীলুভাইয়েরই তাতে বিশেষ হাত ছিল—যাই হোক্ শেষ পর্য্যন্ত তারা তিন জনেই গেল শ্রীঘরে, আর নীলুভাই চলে এল কলকাতায়, পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ রত্নের মালিক হয়ে। চৌরঙ্গীর উপর ক্রোড়পতি নীলুভাইয়ের নাম লেখা পেতলের ফলক—দু'পাশে বন্দুকধারী গুর্খাসহ কয়েক বছর আগে আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন। গয়ারাম আর তার বন্ধুরা জেলে গেল বটে কিন্তু তিন জনই পরস্পরকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল, এর শোধ তারা নেবেই—কঙ্গো হীরা দখল তারা করবেই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গয়ারাম ছাড়া অপর দু'জন প্রতিজ্ঞা রাখতে পার্‌ল না—জেলের ভিতরই তাদের জীবনান্ত হ'ল।

"এদিকে নীলুভাই কলকাতায় এসে ধনী সমাজের একজন চাঁই হয়ে পড়্‌ল। হবে না? পৃথিবীর সেরা রত্নের একখানি যে তারই ঘরে রয়েছে। বেছে বেছে রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে সে মিশতে লাগ্‌ল। তার পয়সার জোরে সবাই তাকে খাতির করে চল্‌ত। দেখতে দেখতে তার নাম—তার ধনসম্পদের কথা লোকের মুখে মুখে শোনা যেতে লাগ্‌ল।

কঙ্গো হীরাটা নীলুভাই প্রথমে ব্যাঙ্কের নিরাপদ ঘরে জমা রেখেছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে তার মনে হ'ল এমন একটা জিনিষ যদি সবাইকে না-ই দেখান গেল তবে আর থেকে লাভ কি? তখন সে সেটা ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের বাড়ীর ড্রইং-রুমে সাজিয়ে রাখ্‌ল। না না, অত দামী একটা হীরা সে সাধারণ ভাবে রাখা যায় না তা কি আর সে জান্‌ত না?

হীরা নিরাপদ রাখবার জন্য যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার তা সে করেছিল। ড্রইং-রুমের মাঝখানে একটা বড় পুরু কাচের বাক্সে মখমলের ওপর হীরাটা রাখা হ'ল। বাক্সের চারদিকে ইলেক্‌ট্রিকের তার এমন ভাবে লাগান হ'ল যে কেউ তা ছুঁলে সমস্ত বাড়ীময় বিপদ্‌সূচক ইলেক্‌ট্রিক্ বেল তো বেজে উঠবেই, সঙ্গে সঙ্গে বাক্সে যে হাত দেবে সে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে ছিটুকে পড়বে। সে শক্ এত ভীষণ হবে যে যত বড় যোয়ান লোকই হোক্ না কেন, প্রাণে মারা না গেলেও কয়েক ঘণ্টা তাকে মূর্চ্ছিত হয়ে থাকতে হবেই। তা ছাড়া সে ঘর পাহারা দেবার জন্য দু'জন অত্যন্ত বিশ্বস্ত গুর্খা সর্ব্বদা সজাগ থাকৃত। কাজেই বুঝতে পারছেন, বাড়ীতে অতিথ-অভ্যাগত সকলকেই নির্ভয়ে হীরা দেখান যেত এবং তারা সবাই তা দেখে চক্ষু সার্থক কর্‌ত। কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ অতিথি এলে নীলুভাই তাদের হাতে করে হীরা দেখতে দিত—তবে সে যাকে তাকে নয় এবং সে সময় সে নিজে কাছে উপস্থিত থাকৃত, এবং অলক্ষিতে পাহারার ব্যবস্থাও রাখ্‌ত খুব জোর।

"বেশ নিরাপদে দিন কাটছিল, এমন সময়ে হঠাৎ নীলুভাই একখানা চিঠি পেল—এলাহাবাদের ছাপ-মারা। চিঠিতে লেখা—"আমি জেল থেকে বেরিয়েছি, আশা করি শীগ্‌গিরই তোমার হীরাখানি আমায় দেবে।" ইংরেজীতে টাইপ্ করা চিঠি, তলায় নাম লেখা "গয়ারাম"—তাও টাইপ্ করা। নীলুভাই অবশ্য তখনই পুলিশে খবর দিল কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। অনেকে তাকে পরামর্শ দিল হীরাখানা আবার ব্যাঙ্কে জমা দাও। কিন্তু গয়ারামের ভয়ে এতটা কাপুরুষতা স্বীকার করতে নীলুভাই রাজী ছিল না—তা ছাড়া যে ভাবে সে হীরা রেখেছিল তাতে যে চোরের রাজারও সাধ্যি নেই ও হীরা সরায় তা সে ভাল করেই জান্‌ত। তবু সে গয়ারামকে ধরবার জন্য লোক লাগাতে ত্রুটী কর্‌ল না। উমেরগঞ্জের রাজা সম্প্রতি নীলুভাইএর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। ভারী স্ফূর্ত্তিবাজ লোকটি, পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরেছেন, নানা ভাষায় কথা বলতে পারেন, কিছুদিন হ'ল বিবাহও করেছেন একটি মার্কিন মহিলাকে; তিনি নীলু ভাইকে আশ্বাস দিলেন গয়ারামের সন্ধান তিনি এনে দেবেনই—তাঁর জানাশোনা ২।১টি মার্কিন ডিটেক্‌টিভ্ আছে—তাদের কেব্‌ল্ করা হ'ল। কিন্তু গয়ারামের খোঁজ পাওয়া গেল না। অথচ প্রায় প্রত্যেক মাসেই—এমন কি কোন কোন মাসে ২।৩ বার করেও ভারতের নানা অঞ্চল থেকে তার হুমকি-দেওয়া ভয়-দেখান চিঠি আসতে লাগ্‌ল—হীরা সে দখল করবেই, এবং বলে-কয়ে করবে। এই ভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল; কিন্তু হুমকি ছাড়া গয়ারামের আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

"সেদিন নীলুভাইয়ের বাড়ীতে একটা চায়ের পার্টি ছিল। আমেরিকাবাসী কীটতত্ত্ববিদ্ এবং অন্যতম ক্রোড়পতি ডক্টর হাওয়েল ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং উমেরগঞ্জের রাজার অতিথি

হয়ে ছিলেন; তাঁকেই উদ্দেশ করে এই পার্টি। সেই সঙ্গে সস্ত্রীক উমেরগঞ্জ-রাজ এবং বিখ্যাত রত্নব্যবসায়ী নিমচাঁদ ঝুঁটিলালেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

"নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত; সকলে জটলা করে খেতে বসেছেন এমন সময় দ্বরোয়ান্ একখানা চিঠি নিয়ে এল। চিঠিখানায় টিকেট নেই, কে একজন একটু আগে হাতে দিয়ে গেছে আর বলে গেছে চিঠিখানা "জরুরী"।

"নীলু ভাই একটু বিরক্ত হয়ে চিঠিখানা খুল্‌ল, খুলেই কিন্তু তার ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। চিঠিখানা এই রকম—

"আজই কঙ্গো হীরাখানা আমার হাতে আসবে—সাবধানে থেক।—গয়ারাম।" চিঠিখানা বরাবরকার মত টাইপ্ করা। নীলুভাই এবার আর ব্যাপারটাকে অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারল না, কারণ এ চিঠিখানা ডাকে আসে নি, হাতে এসেছে, তার মানেই শত্রু অতি কাছে, এবং আজই তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।

"খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ড্রইং-রুমে এসে বস্‌ল। উমেরগঞ্জের রাণী সাহেবা প্রস্তাব করলেন, 'এবার আপনার হীরা দেখাবেন না মিষ্টার নীলুভাই? ও কি, আপনাকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন! কি হয়েছে?' বাস্তবিকই নীলুভাই একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল, সে জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বল্‌ল, 'না, হ্যাঁ, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি বোধ হয়, মাপ করবেন। তবে ব্যাপারটা খুলেই বলি। একজন অত্যন্ত বদমায়েস লোক কিছুদিন থেকে এই হীরাটা চুরি করবে বলে আমাকে শাসাচ্ছে। একটু আগে সে চিঠি দিয়েছে, আজই নাকি সে হীরা দখল করবে। না না, আপনারা ভয় পাবেন না, তার হুমকিকে আমি থোড়াই কেয়ার করি, আটঘাট বেঁধেই আমি কাজ করেছি। আপনারা যখন হীরাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন সেই সময়েই যে সে ঘরে ঢুকবে তাতে সন্দেহ নেই, এবং ঘরে ঢুকতে হলে তার একমাত্র পথ হবে এই জানলা। আপনারা দয়া করে হীরা দেখতে দেখতে কেউ জানলার দিকে তাকাবেন না। আমি হাতে এই পিস্তলটা নিয়ে জানলার নীচে থাক্‌ব। লোকটা জানলায় উঠলেই তাকে বাধা দেব, ইতিমধ্যে আমার দু' জন গুর্খা পাহারাদার জানলার পেছনে এসে পেছন দিক থেকে তাকে বেঁধে ফেলবে। আপনাদের ভয়ের কোনই কারণ নেই।' কথা শেষ করে নীলুভাই আস্তে কাচের বাক্স থেকে হীরাটা বার করে মিসেস্ নিমচাঁদের হাতে দিল, সুইচ্ সে আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। মিসেস্ নিমচাঁদ এক মুহূর্ত্ত অবাক্ হয়ে হীরাটার দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি জহুরীর স্ত্রী—জীবনে অনেক হীরা-পান্না ঘেঁটেছেন, কিন্তু এমনটা কোন দিন দেখেন নি! চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ হাতে রাখতে তাঁর সাহস হ'ল না, তিনি উমেরগঞ্জের রাজার হাতে সেটা তাড়াতাড়ি গুঁজে দিলেন। রাজার সাহসও তথৈবচ, 'দেখুন ডক্টর হাওয়েল, আপনিই

তো হলেন আসল অতিথি' বলে তিনিও মুহূর্ত্ত পরে সেটা হাওয়েল সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। ঘরে যে এত কাণ্ড হচ্ছিল হাওয়েল সাহেব কিন্তু এতক্ষণ সেদিকে হুঁসই দেন নি—তাঁর চোখ এবং সম্ভবতঃ মনও পড়ে ছিল ঘরের অপর কোণে কি একটা জিনিষের ওপর। পকেট থেকে কি একটা যন্ত্র তিনি বার করেছিলেন, হীরা হাতে পাওয়া মাত্র তিনি তাচ্ছীল্যসহকারে সেটা রাণী সাহেবার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে ঘরের অপর কোণে গিয়ে হাজির হলেন, তার পর হাতের যন্ত্র দিয়ে একটা অদ্ভুত গুবরে পোকা জাতের পোকা টেনে বার করলেন। মুখ-চোখ তাঁর তখন আনন্দে ভরে গেছে,

চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগ্‌ছিল।

তিনি চীৎকার করে উঠলেন—"আরে, এ যে নাইকোপ্সা টোরুচেল্লি—এ জাতের পোকা তো পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে বলে জানতাম!—দেখুন দেখুন, আশ্চয্য কাণ্ড!"

"ঘরের সবাই অবাক্ হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল। ডক্টর হাওয়েল একজন বড় কীটতত্ত্ববিদ্ তা সকলেই জানতেন তবে তিনি যে তা নিয়ে এতটা মেতে যান যে পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ রত্নের দিকেও একবার ফিরে চাইবেন না এ কথা কেউ ভাবতে পারে নি। বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কাটলে কথা কইলেন নীলুভাই নিজে; একটু শ্লেষ করেই তিনি বল্লেন, 'আচ্ছা, এবার বোধ হয় আমরা আবার সেই তুচ্ছ হীরাটার দিকে নজর দিতে পারি? দেখুন তো মিষ্টার নিমচাঁদ, আপনি তো একজন পাকা জহুরী, জিনিষটা হীরা বলে মনে হয় কিনা?' হীরাটা

তখনও রাণী সাহেবার হাতে ছিল, তিনি সেটা নিমচাঁদের হাতে দিলেন। ডক্টর হাওয়েল কিন্তু নীলুভাইএর কথায় কানও দিলেন না—মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুবরে পোকাটি হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। জবাব দিলেন নিমচাঁদ; হীরাটা ভাল করে নেড়েচেড়ে তিনি বল্লেন, 'যা বলেছেন, জিনিষটা প্রায় হীরা বলেই মনে হয়; আর একটু উজ্জ্বল করতে পারলে আমরাও বুঝতে পারতাম না যে এটা নকল—আসল হীরা নয়।" "নকল!" নীলুভাই যেন আকাশ থেকে পড়্‌ল? কি মাথামুণ্ডু বলছেন! তার স্বরে একটু রাগই প্রকাশ পেল। "ঠাট্টা তো আমি করছি না মিষ্টার নীলুভাই, সত্যিই যে এটা হীরা নয়, কাচ, তা কি আপনি জানেন না? বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন। হীরা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শক্ত জিনিষ তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে? হীরা দিয়ে যে কোনও জিনিষে আঁচড় কাটা যায়। কিন্তু এই দেখুন, এই শার্শির কাচে এ দিয়ে কোন আঁচড়ই পড়ছে না!' নীলুভাই এবার সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেল, চেঁচিয়ে বল্লে, 'কে আমার হীরা পাল্‌টে দিয়েছে? আমি এক্ষুণি খানাতাল্লাস করব!'

"নীলুভাইয়ের কথা শুনে সকলেই অবমানিত বোধ করেছেন বোঝা গেল। এমন কি ডক্টর হাওয়েল শুদ্ধ তাঁর গুবরে পোকার কথা ভুলে যন্ত্রটা নীলুভাইয়ের নাকের সামনে ধরে বল্লেন, 'দেখুন, খানাতাল্লাস করুন, কিন্তু মনে রাখবেন, এ ব্যাপার আমি সহজে ভুলব না—এ অপমানের শোধ আপনাকে নিতে হবে।' মিঃ নিমচাঁদ তাঁকে থামিয়ে নীলুভাইকে উদ্দেশ করে বল্লেন, "আকস্মিক বিপদ্‌পাতে আপনার মাথা গুলিয়ে গেছে, মিষ্টার নীলুভাই, নইলে এঁদের সম্বন্ধে এমন কথা আপনার কল্পনা করাই যে অন্যায়।' উমেরগঞ্জের রাজা তাঁকে সায় দিয়ে বল্লেন, 'হাঁ, বিপদের সময়ে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না—তখনকার কথা নিয়ে মানহানির মোকদ্দমা করলে চলে না। আমার মনে হয় মিষ্টার নীলুভাই একটু হিসেবে ভুল করছেন। যে লোকটি হীরা চুরি করবে বলে শাসিয়েছিল সে যে এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল এই ধারণাটাই হয়ত এত গোলের কারণ। এমনও তো হতে পারে যে সে আগেই হীরা সরিয়ে তার জায়গায় নকল হীরা রেখে গেছে, যাওয়ার সময় আপনাকে খেলো করবার জন্য চিঠি দিয়ে এ চালটা চেলে গেছে। নইলে সে এতক্ষণ আসছে না কেন? আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন, ঐ নকল হীরা আবার যথাস্থানে রেখে অপেক্ষা করুন, দেখুন চোর আসে কিনা। এ ঘরের লোকেরা ছাড়া তো আর কেউ জানে না ওটা নকল হীরা।'

"উমেরগঞ্জ-রাজের যুক্তি সকলকেই মানতে হ'ল; এবং করাও হ'ল তাই, কিন্তু চোরের আর দেখা মিল্‌ল না। নকল হীরা আসন যুড়ে রইল, আর আসল কঙ্গো হীরা কোথায় চলে গেল কেউ জান্‌ল না।—আজও কেউ তার খোঁজ পায় নি। এই হ'ল কঙ্গো হীরা পলায়নের ইতিহাস।"

এই পর্য্যন্ত বলে ডাক্তার সেন থামলেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে গল্প শুন্‌ছিল, ডাক্তার সেন থামতেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "তার পর? তার পর কি হ'ল?"

"তার পর আর কি হবে, কিছু দিন জোর খোঁজাখুজি চল্‌ল, উমেরগঞ্জের রাজা বন্ধুর হয়ে অনেক সাহয্য করলেন, কিন্তু গয়ারামকে পাওয়া গেল না। অবশেষে নীলুভাই হীরার শোকে পাগল হয়ে গেল। ব্যস্, ব্যাপার চুকে গেল।"

"কি আপদ! রহস্য যদি না ভাঙ্গলেন তো এ গল্প বলা কেন? গয়ারাম গেল কোথায়? তাকে কি সত্যিই পাওয়া গেল না?"

ডাক্তার সেন হেসে বল্লেন, "না, পাওয়া যাবে কেমন করে? গয়ারাম যে এই ঘটনা ঘটবার এক বছর আগেই মারা গিয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা, বাকিটা বল্‌ছি, আর একবার তা হ'লে চায়ের হুকুম করুন।" চা এলে আবার তাঁর গল্প সুরু হ'ল:

"গয়ারাম এবং নীলুভাইয়ের অন্য দু'টি সহচর জেলে গিয়েছিল সে কথা আপনাদের আগেই বলেছি। জেলে গিয়ে অপর দু'জন মারা যায়, গয়ারাম শেষ পর্য্যন্ত বেঁচেছিল। জেলে থাকতে তারা কি করে নীলুভাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নেবে সর্ব্বদা তার জল্পনা-কল্পনা কর্‌ত—এমন কি জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গেও পরামর্শ কর্‌ত। এই রকম একজন কয়েদী ছিল তুলিরাম। তুলিরাম বেশ শিক্ষিত লোক, সে পৃথিবীর নানা জায়গা ঘুরেছিল, বিয়েও করেছিল আমেরিকায়। কিন্তু লোকটি ছিল ভয়ানক ধূর্ত্ত, আর তেমনি বদমাইস্। চুরি-জোচ্চুরি করে টাকা সে করেছিল বিস্তর কিন্তু বদ্‌স্বভাব ছাড়তে পারে নি। জেল থেকে গয়ারাম আর তুলিরাম এক সঙ্গেই বেরোয়। গয়ারামের তখন টাকার বিশেষ দরকার। টাকা রোজগারের অন্য কোনও উপায় না পেয়ে সে যায় এক জুয়ার আড্ডায়, তুলিরামও তার সঙ্গে যায়। জুয়ার আড্ডায় প্রায়ই যা হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল, কি একটা নিয়ে একজন জুয়াড়ীর সঙ্গে গয়ারামের হ'ল বচসা, তার পর হাতাহাতি, তার পর চল্‌ল ছুরি। গয়ারাম সেখানেই প্রাণ হারাল। গয়ারামের মৃত্যুসংবাদ জুয়ার আড্ডায়ই চাপা রইল, বাইরের কেউ তা জানল না, জান্‌ল শুধু তুলিরাম। তুলিরাম ইতিপূর্ব্বেই গয়ারামের কাছে নীলুভাই এবং কঙ্গো হীরার কথা শুনেছিল। এইবার তার মাথায় কুবুদ্ধি চাপ্‌ল, গয়ারামের আড়ালে থেকে সে হীরাখানা বাগাবার চেষ্টা করবে। গয়ারামের নাম দিয়ে তখন থেকে সে নানা রকম হুমকি দেওয়া চিঠি ছাড়তে লাগ্‌ল নীলুভাইয়ের কাছে। উদ্দেশ্য—যাতে সন্দেহ এবং আক্রোশটা গয়ারামের ওপরই পড়ে, নিজে সে অলক্ষ্যে থেকে কাজ উদ্ধার করবে। তুলিরাম কলকাতায় এল, সস্ত্রীক চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাসা করল—তখন আর সে তুলিরাম নয়, তখন সে একজন দেশীয় রাজা—'রাজা অব্ উমেরগঞ্জ'।

"রাজা-মহারাজার ওপর নীলুভাইয়ের বরাবরই ভারী দরদ। কাজেই নকল রাজা সেজে

ছুলিরামের পক্ষে তার সঙ্গে ভাব জমান (জমিয়ে তাকে কৃতার্থ করা) এবং অল্প দিনের মধ্যেই
তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাওয়া ছুলিরামের মত ধূর্ত্ত লোকের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হ'ল না।
তার পর এল ডক্টর হাওয়েল। হাওয়েল আসলে ডক্টর নয়, কীটতত্ত্ববিদ্‌ও নয় এবং ক্রোড়পতিও
নয়, তবে আমেরিকার লোক বটে ; সে হচ্ছে ছুলিরামের শ্যালা—অর্থাৎ তার আমেরিকান্ স্ত্রীর
ভাই। শঠতায় সে ছিল ছুলিরামেরই যুড়ি।

"এইবার আরম্ভ হ'ল আসল কাজ। নীলুভাইয়ের বাড়ীতে হরদম যাতায়াতের ফলে বাইরে
দেখে ছুলিরাম কঙ্গো হীরার চেহারা অনেকবার দেখেছিল—কাজেই ও রকম একটা কাচের নকল
হীরা তৈরী করান তার পক্ষে কিছু কঠিন হয় নি। ইতিমধ্যে ছুলিরাম নানা ভাবে ডক্টর হাওয়েল
সম্বন্ধে নীলুভাইয়ের মনে একটা উঁচু ধারণা করিয়ে এই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করল। তার পর এল
নিমন্ত্রণের দিন। আটঘাট বেঁধে ছুলিরাম কি ভাবে কাজে নাম্‌ল তার পরিচয় আপনারা আগেই
পেয়েছেন। হীরা দেখবার সময় "কীটতত্ত্ববিদ্" ডক্টর হাওয়েল কি ভাবে হঠাৎ একটা অদ্ভুত
গুবরে পোকার সন্ধান পেল এবং নিতান্ত তাচ্ছীল্যভরে হীরা ফেলে [illegible] প্রতি ধাবিত হয়ে
কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সকলের মনটা হীরা থেকে গুবরে পোকার দিকে আকৃষ্ট করল তা আপনারা
জানেন। মিসেস্ ছুলিরাম ওরফে উমেরগঞ্জের রাণী সাহেবা [illegible] ক্ষিপ্রহাতে আসল
হীরা ভ্যানিটি-ব্যাগে ফেলে তার জায়গায় নকল হীরা বসিয়ে দিল। [illegible] মধ্যে কাজটা
হাসিল হল এবং শেষ পর্য্যন্ত নীলুভাই হয়তো কিছু সন্দেহ [illegible] পারত না—
কিন্তু একটু গোল বাধালেন নিমচাঁদ। নিমচাঁদ অবশ্য খাঁটি [illegible] ব্যাপারের বিন্দু-
বিসর্গও জানতেন না, আর তিনি ছিলেন পাকা জহুরী। [illegible] পড়া মাত্র তিনি
বুঝলেন ওটা নকল। ব্যাপারটা একটু ঘোরালও হয়ে পড়ে [illegible] চালে তখনই
চাপা পড়ে গেল। আসল ব্যাপার কেউ সন্দেহ করতে [illegible] বলুক, একটু
না ভেবে-চিন্তে হঠাৎ একজন দেশীয় রাজার রাণীর ব্যাগ [illegible] কত দূর বিপজ্জনক
তা নীলুভাইয়ের অজানা ছিল না।

"তার পর হীরার শোকে নীলুভাই পাগল হয়ে গেল। [illegible] দেখল এ হীরা
ভারতে বসে হজম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—কাজেই সে [illegible] পাততাড়ি গুটিয়ে
তার চোরাই ব্যবসার অংশীদার শ্যালকটি সহ আমেরিকা [illegible] অবশ্য সে আবার
ছুলিরাম হয়েছে।

"যে জাহাজে তারা রওনা হ'ল তার নাম এস্ এস্ [illegible] জাপান ঘুরে
আমেরিকা যাচ্ছিল। আমিই ছিলাম সে জাহাজের মেডিকাল অফিসার। একদিন জাহাজের
মধ্যে হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি—একজন আমেরিকান্ সাহেব আর একটি

লোককে রিভলভার দিয়ে জখম করেছে। আমেরিকান্ সাহেবটি আর কেউ নয়—হাওয়েল এবং আহত লোকটি হচ্ছে ছুলিরাম। হয়তো বখরা নিয়ে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছিল এবং তারই ফলে হাতাহাতি এবং অবশেষে এই কাণ্ড!

"হাওয়েল পুলিশের জিম্মায় গেল, ছুলিরাম আরও একদিন বেঁচে ছিল, অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত [illegible]কে বাঁচান গেল না—তার কৃতকর্ম্মের ফল তাকে ভুগতে হ'ল। মরবার আগে তারই মুখে [illegible] ঘটনা আমি শুনেছিলাম—কাজেই এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই।"

ডাক্তার সেন একটু চুপ্ করলেন। ছোটমামা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর সেই কঙ্গো [illegible]টা? সেটা এখন কার কাছে?"

"কার কাছে?" ডাক্তার সেন হেসে বল্লেন, "বরুণদেবের কাছে। মারামারির সময়ে নিতান্ত [illegible]ছাড়া হচ্ছে দেখে রাগে ছুলিরাম সেটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের [illegible] নেমে খোঁজ করলে হয়তো তার সন্ধান পেতে পারেন। দেখবেন চেষ্টা করে?" *

কঙ্কালের সাথে কোলাকুলি

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্‌সি)

টেলিফোনে কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল।

চোঙাটা মুখের কাছে এনে আমি বল্লাম, "কি বল্‌ছেন, গল্প চাই? [illegible], হাসির গল্প? তা হলেই তো সেরেছেন মশাই! ওবস্তু যে সর্ব্বদা [illegible]সে না—হাসা যত সোজা, হাসান তত সোজা নয়। হাসির গল্প লিখ্‌তে [illegible] অনেক সময় কান্না এসে যায়—এম্‌নি শক্ত ও কাজটি। মাথার বড় [illegible]শ্রম! কী বল্‌ছেন, অনেকেই তো দিনের পর দিন রাশি রাশি হাসির গল্প লিখে মাসিকের পাতা ভরে ফেল্‌ছে? রক্ষা করুন মশাই, ও রকম গল্প লিখ্‌তে আমার দশ বছর বয়সের সময় আমাকে ঠাকুরদা' বারণ করে দিয়েছিলেন—'ওগুলি

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা।

পড়ে নাকি তাঁর কেবল কান্নাই পেত। স্বর্গগত পিতামহের আদেশটা ঠেল্‌তে আর এ বয়সে প্ররোচনা দেবেন না !”

সম্পাদক মশাই বল্লেন, “কিন্তু কি করি, ছেলেরা যে আপনার লেখার ভয়ানক ভক্ত !”

ছেলেদের নাম শুনে আমার মেজাজ নরম হ'ল। কিন্তু লিখিই বা কি করে ? বল্লাম, “তার চাইতে তোফা একটা ভূতের গল্প লিখে দিই না কেন ? কোন চিন্তার দরকার নেই, কেননা ভূতে সব পারে। স্রেফ্ কলম নিয়ে লিখে যাও।”

সম্পাদক মশাই আবার হেসে বল্লেন, “বেশ, আপনি না হয় এ মাসে একটা ভূতের গল্পই লিখুন। অবশ্য আজকাল যে রকম সব ভূতের গল্প সাধারণে লিখ্‌ছে সেই রকম গল্প লিখ্‌বেন, সে হাসির গল্পই হ'বে। ও রকম ভূতের গল্প পড়লে হাসিই পাবে নিশ্চয় !”

“বেশ, ভূতের গল্পই লিখ্‌ব।” বলে রিসিভার নামিয়ে রাখ্‌লাম। মনটা একটু হাল্কা হ'ল, ভাবলাম সন্ধ্যাবেলা বসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লিখে ফেল্‌ব। ভাবনাটা কি ? পানের দোকানে পান কিনে পয়সা দিতে গিয়ে দেখব পানওয়ালা মানুষ নয়, স্রেফ কঙ্কাল—পয়সা নেবার জন্য তা'র মাংসশূন্য হাতখানা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিংবা রাত্রি একটার সময় বায়স্কোপ দেখে যখন বাড়ী ফিরব তখন যে দরজা খুলে দেবে সে আমাদের চাকর নয়, ঠোট-নাক-চোখ খসা বিকটাকার কেউ একটা ; কিংবা নিদানে পিসীমা রাতে যখন ইলিস মাছ ভাজবেন তখন হঠাৎ সাদা কাপড়-পরা কেউ একটা পাঁচ হাত লম্বা হাত বা'র করে মাছ চাইবে—এমনি কিছু একটা লিখলেই হ'বে। এ লেখা তো ঘণ্টাখানেকের মামলা ; সন্ধ্যাবেলাই যখন লিখ্‌ব তখন রবিবারের তুপুর বেলাটা নষ্ট করি কেন ? টেনে একটা ঘুম দেব ঠিক কর্‌লাম। খেয়েদেয়ে শোয়ার পর ভাবলাম গল্পের প্লটটা ভেবে রাখি। কিন্তু মহা মুস্কিল, শেষ পর্য্যন্ত গল্পের ভূতকে কিছুতেই ভূত রাখ্‌তে পারি নে। ভূতের গল্প লিখ্‌তে হ'লে নিজের স্বভাবটা একটু মেয়েদের মত, আর চেহারাটা একটু বেশ ‘পুঁয়ে পাওয়া’ লিক্‌লিকে প্যাটার্ণের হাওয়া দরকার বোধ হচ্ছে। আমার এ “বারবেল-মুগুর-ভাঁজা” চেহারায় বোধ হয় ঐ

ধরণের ভয়-দেখান ভূতের গল্প লেখা চলে না। মনে পড়ে আমার বছর ষোল বয়সে একবার এক ভূতকে ভীষণ ঠেঙিয়েছিলাম। আমার মামার বাড়ীর বাগানে একবার ভীষণ ভূতের উপদ্রব হ'লো, রোজ রাত্রে ছোট ছেলের কান্না শোনা যায়—সাদা কাপড় জড়িয়ে কে আনাগোনা করে। ভয়ে আর বাগানের দিকে কেউ আসে না—বাগানের মালীরাও ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। আমি যেদিন মামার বাড়ী ছুলাম সেদিন ঐ গল্প শুনে সন্ধ্যাবেলা হাতে একটা লাঠি নিয়ে বাগানের মধ্যে একটা আমগাছে চড়ে বসে রইলাম—মামীমা কত বারণ কর্‌লেন, অন্য সবাই বল্লে, ‘কি ডাকাত ছেলে রে বাবা, ভূতের হাতে আজ ওর প্রাণটা যাবে নিশ্চয়। ভূতের সঙ্গে তো গায়ের জোর চল্‌বে না !—’ যাই হোক, রাত তখন প্রায় ন'টা-দশটা—সেই ছেলের কান্না, ভূতটাও ঢুকেছে বাগানে সাদা কাপড় জড়িয়ে। ভূতটা সোজা আমার দিকেই আস্‌ছে যে—আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে নাকি ? ভাবলাম এক হাত লড়্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি ভূতের সঙ্গে। ভূতটা তার ছেলে-কান্না থামিয়ে সোজা গাছে উঠবার উপক্রম কর্‌ল—আমিও মোটা তুটো ডালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক হাতে একটা গাছের ডাল আর এক হাতে লাঠিটা বাগিয়ে ধরলাম। ভূতটা দেখ্‌লাম অনেক কষ্টে গাছে উঠ্‌ল। ই কি রে বাবা ! ভূত তো শুনেছি হাওয়ায় ভাসে, তা হ'লে অত কষ্ট করে ওঠা কেন ? যাই হোক, উপরের ডালে ‘যুদ্ধং দেহি’ ভাবে রইলাম বসে। কিন্তু ভূত মহাপ্রভু আমার কাছ পর্য্যন্ত এলেন না—নীচের ডাল থেকেই আম পেড়ে কোঁচড়ে ভরতে লাগ্‌লেন এবং খানিক পরে সোজা নেমে আবার ছোট ছেলের কান্না কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাগানের দরজার দিকে চল্‌লেন। আমিও তাড়াতাড়ি নেমে ছুটে এসে পিছন দিক্ থেকে মোক্ষম জোরে তা'র ঘাড়টা ধর্‌লাম চেপে—সঙ্গে সঙ্গে তা'র ছেলের কান্না গেল থেমে—সে চীৎকার করে উঠ্‌ল “কে রে বাবা !”—আমি বল্লাম—“বেহ্মদৈত্যি”। তার পর বল্লাম, “বাপধন ভূত, ক'টা আমগাছ সাবাড় কর্‌লে আজ পর্য্যন্ত ?”—তাকে টান্‌তে টান্‌তে মামার বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে বল্লাম, “এই নিন আপনাদের ভূত !” সকলে তো অবাক্, বল্লে “এ যে আমাদের পাড়ার হীরু গয়লা !” তাকে বেশ কয়েক ঘা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। অবশ্য শেষের দিক্‌টুকু না বল্লে এই নিয়েই দেখ্‌তে

ভূতুড়ে গল্প-লিখিয়েরা স্রেফ্—"রাত্রে যা'রা আম খেতে আসে" বলে প্রকাণ্ড একটা বই লিখে ফেল্‌ত। আমার কিন্তু গল্প লেখার চেয়ে শরীরের মাংসপেশীগুলির শক্তিটা পরীক্ষা করাতেই আনন্দ বেশী। তাই ভূত শেষ পর্য্যন্ত হীরু গয়লা হয়ে গেল।

কাজেই মন থেকে আমার গল্পের প্লট বানানো চল্‌বে না। আলমারী থেকে কয়েকজন বিদেশী লেখকের প্রেততত্ত্বের বই, কয়েকখানা ম্যাগাজিন পেড়ে নিয়ে এলাম—প্রবন্ধ সমস্ত পড়ে দেখলাম—উঁহু, আমাদের ভূতুড়ে গল্প লেখকদের ভূতেদের কাছে ও দেশের ভূত সব নেংটী ইঁদুর। চল্‌ল না, মহা মুস্কিলে পড়লাম তো! কেন মর্‌তে ভূতের গল্প লিখব ভাবলাম! অনেক ভেবে ভেবে ঠিক কর্‌লাম যে যখন অনেক রাত হ'বে তখন আমাদের বাড়ী থেকে মাইলখানেক দূরে যে পাড়ার খৃষ্টানদের পুরানো "গোরস্থান" আছে সেইখানে গিয়ে বস্‌ব। নিশ্চয় গা-টা একটু ছম্ ছম্ কর্‌বে, তার পর ফিরে এসে বাড়ীর সমস্ত লাইট নিবিয়ে দিয়ে নীচেকার ঘরে একটা প্রদীপ জ্বেলে একা বসে বসে গল্প লিখ্‌ব। এই ভেবে পাশ ফিরে চোখ বুজলাম।

সেই পুরানো গোরস্থানের একটা কবরের উপর একটী খাতা হাতে বসে আছি, চারিদিক্ নিঝুম, নিস্তব্ধ—কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই।

রাত ন'টা-দশটায় এসেছি আর এখন রাত প্রায় একটা। কই, গা ছম্ ছম্ কর্‌ছে না তো মোটেই! কি করি, এক আধটা ভূতের যদি দেখা পেতাম!

বসে বসে ভাব্‌ছি, হঠাৎ আমি যে কবরটার কাছে বসে আছি সেইটা নড়ে উঠ্‌ল একটু। ভাবলাম হয়তো মনের ভুল—কিন্তু কবরটা আরও দু'-তিনবার বেশ নড়ে উঠ্‌ল, তার একটু পরেই সেই কবরের মধ্যে থেকে কে যেন অতি কাতর ভাবে বল্লে, 'একটু ধর না বাবা, অনেক দিনের বুড়োর কঙ্কাল, কবর ঠেলে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে যে—'

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কবর ঠেলে একটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল 'বার হয়ে এল—কোথাও মাংসের নাম মাত্র নেই, সমস্ত হাড়গুলো যেন ক্ষয়ে গেছে—সব নড়বড় কর্‌ছে।

কঙ্কালটা যেন বড় খুসী—বল্লে, "তুমি কে বাবা, কেনই বা এখানে এসেছ? এখানে তো কেউ ভুলেও পা দেয় না। অতি পুরোনো গোরস্থান; এর তো আর কোন দামই নেই—সবাই অবহেলা করে।"

বুঝলাম, কঙ্কালটীর বুকে, অর্থাৎ বুকের হাড়ে একটা ব্যথা বা অভিমান জমে উঠেছে। বল্‌লাম—"আমি একজন গল্প-লিখিয়ে, ভূতের গল্প লিখ্‌তে হ'বে আমাকে, তাই এখানে এসেছি আপনাদের বিষয় কিছু জান্‌তে।"—'আপনি' বলেই ওকে কথা বল্‌লাম, কি জানি কার কঙ্কাল, হয়তো কোন হোমরা-চোমড়ার কঙ্কাল হ'বে হয়তো।

কঙ্কালটী এবার যেন আরও খুসী হয়ে উঠে বল্‌লে, "আহা বড় ভাল ছেলে বাবা তুমি—আমাদের কেউ খোঁজ-খবর নেয় না, কি দুঃখে যে আছি ভগবান্ জানেন"—বল্‌তে বল্‌তে তার নাকের হাড়ের পাশ দিয়ে যেন দুটো দীর্ঘনিঃশ্বাস বার হয়ে এল,—তার পরে বল্‌লে, "আমাদের কথা লিখ্‌বে? বেশ, বেশ, আমাদের দুঃখের কথা শুনে একটু জগৎ-সংসারকে জানিও লিখে।" বলে সে বল্‌তে লাগ্‌ল—

"আমি আজ ত্রিশ বৎসর এই কবরের মধ্যে আছি—ত্রিশটী বৎসর আগেকার কথা; খুব বুড়ো হয়ে ভুগে ভুগে ম'লাম। তার পরে সকলে আমার মৃতদেহ নিয়ে এসে মহাসমারোহ করে এইখানে আমাকে কবর দিল। কি ভাল যে লাগ্‌ল—সুন্দর কাঠের বাক্স—যাকে তোমরা ইংরাজিতে 'কফিন' বল, বাংলায় বল শবাধার—সেই কাঠের বাক্সের মধ্যে, সুন্দর করে আমাকে পোষাক পরিয়ে, সারা গায়ে সুগন্ধি মাখিয়ে—আঃ ভাবতেও আরাম লাগে। ভাবলাম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—আর দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই। যখন মাটী খুঁড়ে 'কফিন'টী শুদ্ধ আমাকে মাটীর মধ্যে নামিয়ে দিল"—বলে সে চুপ কর্‌ল, কি যেন খানিক ভাবল, তার পর আবার বল্‌তে সুরু কর্‌ল—"আঃ, এখনও মনে পড়ে যখন তারা মাটী দিয়ে কবরটা ভরাট কর্‌তে লাগ্‌ল—কি সে আনন্দ! পরম নিশ্চিন্ত হয়ে এখন নিদ্রা দেওয়া যাবে। তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পার্‌ছ না সে কি আনন্দ! একবার পরীক্ষা করে দেখতে পার; শোবে এই কবরের মধ্যে একবার?

দেখ না তেমনি করে শুয়ে।”—বলে সে আমার কাঁধে তার হাত রাখল। ওরে বাবা, কি ঠাণ্ডা আর কি শক্ত সেই হাত! ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগ্‌ল। আমি কোনও রকমে বল্‌লাম, “না, না, পরীক্ষা আমি কর্‌তে চাই না, বেশ বুঝতে পার্‌ছি খুব আনন্দ—” সে বল্‌লে, “বুঝতে পার্‌ছ, বেশ বেশ, ভাল। তা হ’লে শোন; তখন এই গোরস্থান স্বর্গ ছিল, চারিদিকে ফুলের গাছ, কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুট্‌ত, কত পাখী ডাক্‌ত! এই কবরের চারিদিক্ দিয়ে লাল রাস্তা ছিল, আর তার মাঝে মাঝে কচি কচি ঘাস। আর সেই জায়গায় আজ? সমস্ত আগাছায় ঢেকে গেছে, চারিদিকে বন গজিয়ে উঠেছে, গরুবাছুরের আস্তানা হয়েছে—কেউ ভুলেও এ পথ মাড়ায় না। মাড়াবে কেন? এ গোরস্থান যে

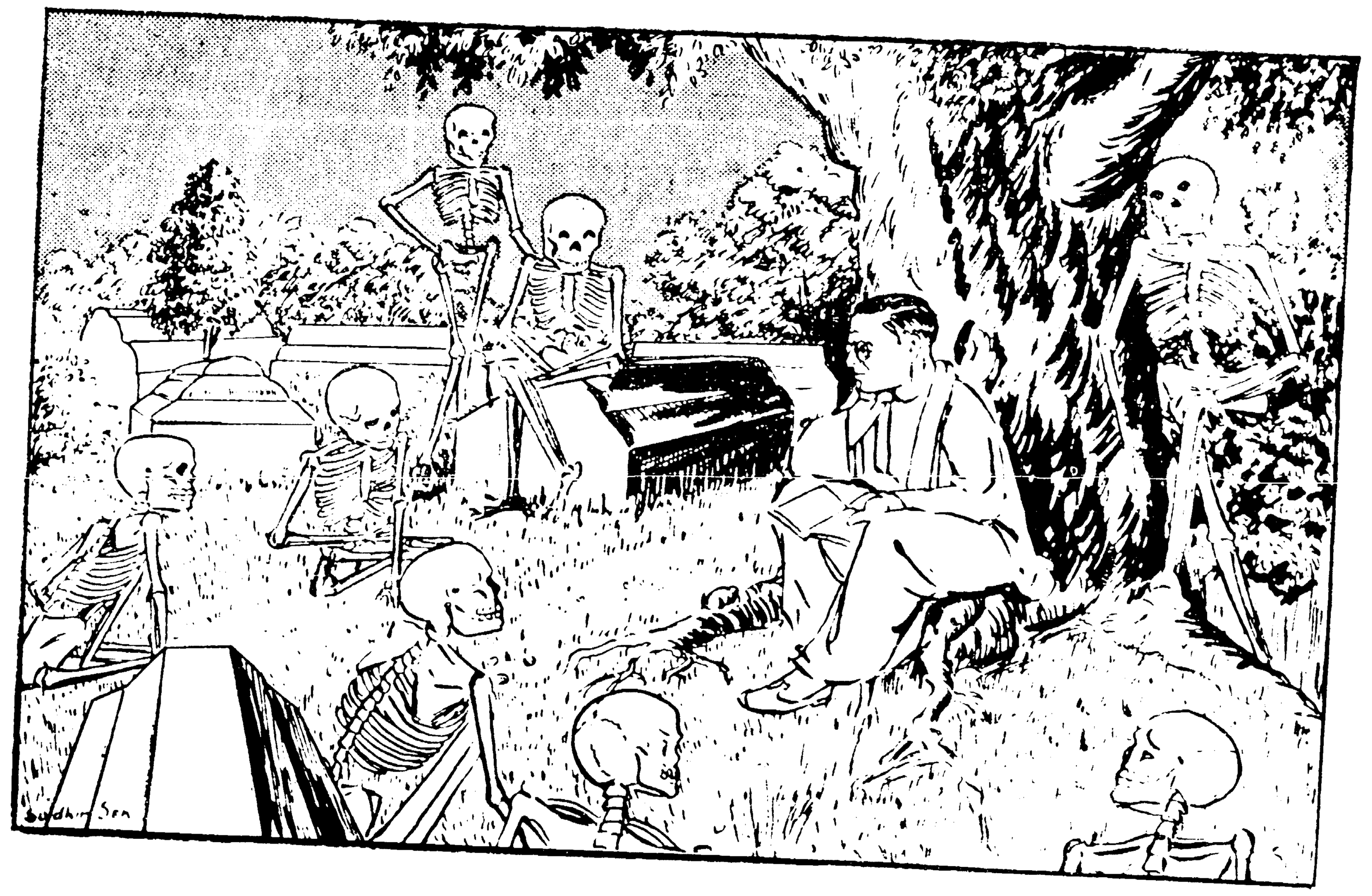

আমি একেবারে কঙ্কাল-পরিবেষ্টিত!

এখন ভর্ত্তি হয়ে গেছে—নতুন গোরস্থান তৈরী হয়েছে যে ঐদিকে!” মাথা নীচু করে ওর কথা শুনছিলাম, হঠাৎ মাথা তুলে দেখি ওর পাশে আর কয়েকটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে, বসে। আমি একেবারে কঙ্কাল-পরিবেষ্টিত! এবার ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে এল প্রায়। পাশ থেকে আর একটা কঙ্কাল চেরা চেরা গলায় বলে

উঠ্‌ল—“লেখই যদি আমাদের গল্প তা হ’লে আমাদের দুঃখের কথা সব শুনে যাও। একদিন ছিল যখন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাতে কবরগুলির কোনও ক্ষতি কর্‌তে পার্‌ত না। কিন্তু এগুলি এখন এতই পুরানো হয়ে গেছে যে সমস্ত কবর ছেঁদা হয়ে গেছে—বর্ষাকালে সেই সমস্ত ছেঁদা দিয়ে হু হু করে জল ঢুকে সমস্ত কবর ভর্ত্তি হয়ে যায়—তখন আমাদের জলের তলায় দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই বাধ্য হয়ে তখন আমরা ঐ গাছগুলোর ডালের উপর গিয়ে আশ্রয় নিই; কিন্তু সেখানেও বৃষ্টি হ’লে হাড়ে এসে জল লাগে—কি কষ্ট যে হয় বর্ষার দিনে, ঠাণ্ডায় হাড়ে জল লাগ্‌লে তা তোমরা কি বুঝবে? তোমাদের হাড় তো চামড়া-মাংস দিয়ে ঢাকা!—”

তার পাশ থেকে আর একটা কঙ্কাল হঠাৎ খেঁকি গলায় বিকট চীৎকার করে উঠে বল্‌লে, “দেখ, ঐ বড় রাস্তার উপর যে প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ীটা দেখ্‌ছ, ওটা ছিল আমার বাড়ী, টাকাও ছিল আমার প্রচুর। ঐ বাড়ীটাতে এখন বাস করে এক বেটা জোচ্চর, ভণ্ড। বেটা দূর সম্পর্কে আমার ভাইপো হয়। ও আমার বুড়ো বয়সে কোথা থেকে এসে জুট্‌ল। কি সেবা কর্‌তে লাগল আমার! মর্‌বার দু’ একদিন আগে বল্‌লে, “কাকা, যত দিন জীবন থাক্‌বে তত দিন আপনার ঐ স্নেহমাখা মুখখানি আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না”—বলে সে কি কান্না! দিলাম বেটাকে সব উইল করে। এখন বেটা ভুলেও একবার আমার নাম করে না! এ কবরটা দু’-চার আনা পয়সা খরচ করে মেরামত পর্য্যন্ত করে দেয় না! তুমি ঐ বেটাকে ব’ল যে ওকেও একদিন মর্‌তে হবে, এ কবরে না হয় ঐ কবরটায় আস্‌তে হ’বে তখন, তখন বেটাকে আমি গুণে গুণে দু’শ’ লাথি লাগাব—তবে ছাড়্‌ব।”

ভাবলাম কঙ্কালের কি রাগ রে! যদি আমাকেই ঐ পায়ের হাড় দিয়ে লাথি বসিয়ে দেয়!—তাড়াতাড়ি বল্‌লাম, নিশ্চয় বল্‌ব, নিশ্চয় বল্‌ব, ভারী অন্যায় তো।”

বুড়ো কঙ্কালটা আবার কথা কইল—বল্‌লে, “তোমাদের বেশ, পুড়িয়ে ফেলে। আমাদের এর চেয়ে ভাল। প্রথম রাজার আরামে রেখে তার পর এই ভিখারীর কষ্ট! তার চেয়ে পোড়ান ভাল, পোড়াবার সময় অবশ্য খুব কষ্ট—কিন্তু তার পরে তো সব ছাই, নিশ্চিন্ত।”

একটা কঙ্কাল বাধা দিয়ে বল্‌লে—"ছাই নিশ্চিন্ত, ও সব সমান, সব সমান। সেবার সেদিন খুব বৃষ্টি, আমি একটা বটগাছে বসে আছি, এমন সময় আমার পাশে একটা আধখান কঙ্কাল এসে বস্‌ল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কে তুমি ?' সে বল্‌লে, 'আমি হরিধন চাটুয্যে'—আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম, 'তুমি তো ব্রাহ্মণ, তবে তোমার এ হাড়ের দেহ রইল কি করে ? তোমাদের তো পুড়িয়ে ফেলে !' সে একটু হেসে বল্‌ল—'তোমরা কলকাতার শ্মশানঘাট দেখে ঐ কথা ভাব। কলকাতায় আর ক'টা লোক ? লোক তো সব দেশের গ্রামেই থাকে। গ্রামের মড়া বুঝি সব শেষ পর্য্যন্ত পোড়ায় ? গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে কোনও রকমে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। খানিক আগুনে জ্বলে পুড়ে মরি—তার পর আগুন যায় নিবে, তখন শেয়াল কুকুরে সেই আধখান পোড়া দেহ নিয়ে টানাটানি করে। কি রকম আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বল তো ? কখনও কখনও আবার সব জুড়োতে না জুড়োতে জলে ভাসিয়েও দেয়—হয়তো তখন ভীষণ শীত ! কি ভীষণ কষ্ট শীতের মধ্যে ? তোমাদের তো কেমন সুন্দর বাক্স করে মাটীর মধ্যে শুইয়ে দেয় ! আমাদের বেশীর ভাগ সময়েই আধপোড়া অবস্থাতেই থাক্‌তে হয়। এই দেখ না, এত বড় ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা কি হ'ত যদি তাকে পোড়াতে না নিয়ে যেত—ঐ তো আগুন দিয়েছিল বলেই তো এত তর্ক—পুড়েছে কি পোড়ে নি ?"

এই সময়ে দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা খটাস্ খটাস্ শব্দ শোনা গেল। শব্দটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দিকেই আসছিল। একটু পরে দেখলাম, একটা কঙ্কাল ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছে—তারই পায়ের খটাস খটাস শব্দ হচ্ছে। সে এসেই সকলের মাঝে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সব কঙ্কালগুলো এক সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কি রে, কি হয়েছে, কি হয়েছে ?" সে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—"আমার 'কফিন'টা একেবারে ভেঙ্গে গেছে, তাই ঐ নতুন কবরটায় গিয়েছিলাম একটা নতুন 'কফিন' চুরি করে আন্‌তে। [illegible] একজন যেই বার হয়ে কোথায় গেছে, আমিও তার কফিনটা কাঁধে [illegible]। পথের মাঝে ধরা পড়ে গেলাম। ভীষণ মারলে আমাকে সবাই [illegible]—এই দেখ একখানা হাত একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে। বলে সে আবার কাঁদতে লাগল। সত্যিই ওর

একখানা হাতের সমস্ত হাড় চূরমার হয়ে গেছে।" আমার ভয়ানক মায়া হ'ল—কিন্তু ওরা কেউ সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌লে না। বল্‌লে, "বেশ হয়েছে, যেমন গিয়েছিলি বেটা ভূত !"

ওদের মধ্যে হঠাৎ একটা কঙ্কাল আবার ঐ হাতভাঙ্গা কঙ্কালটাকে পেটাতে আরম্ভ কর্‌ল—বল্লে, "আর যাবি, বল্ আর কক্ষণো যাবি ? আত্মসম্মান নেই তোর একটু ?"

বুঝলাম ঐ কঙ্কালটা ঐ হাতভাঙ্গা কঙ্কালটার নিশ্চয় কোন গুরুজন হবে। কঙ্কাল হয়ে গেছে তবুও গুরুজনের আধিপত্যটুকু ছাড়ে নি। বুড়ো কঙ্কালটা গিয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরল—ও তখন ক্ষেপে গেছে, কিছুতেই ছাড়বে না। বুড়ো কঙ্কালটা অনেক কষ্টে তাকে থামাল। থামানোর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো বেচারা কাতরাতে লাগ্‌ল। এতক্ষণে আমি কথা কইলাম, বুড়ো কঙ্কালটা সত্যিই বড় ভাল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কি হ'ল ?"

সে আমার পাশে এসে বসে অতি কাতর ভাবে বল্ল, "ওদের থামাতে গিয়ে আমার দু'খানা পাঁজরার হাড় শিরদাঁড়া থেকে খুলে এসেছে। বুড়ো হাড়—সব যোড়গুলো ঢিলে হয়ে গেছে। একটু কিছু দিয়ে বেঁধে দিতে পার ?"

আমি আমার রুমালটা বার করে ওর পাঁজরার হাড় দুটো শিরদাঁড়ার সঙ্গে বেঁধে দিতে লাগলাম।

ও বল্‌তে লাগ্‌ল—"তোমাকে এতক্ষণ আমাদের দুঃখ-কষ্টের যে সব কথা শোনাচ্ছিলাম সে সব দুঃখ এক দুঃখের কাছে হার মেনে যায়। সে দুঃখ হচ্ছে আমাদের আত্মসম্মানের হানি। তুমি তো জান—মানুষের মধ্যে বড়লোকেরা গরীবদের অবজ্ঞা করে। মরে গিয়েও সে স্বভাব যায় না। দেখ না, ঐ নতুন গোরস্থানের কঙ্কালগুলোর কি গুমোর—নতুন কফিন, নতুন জামাকাপড়, সুন্দর বাগান ! ওরা প্রায়ই এসে ওদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে আমাদের ঠাট্টা করে যায়—এ দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য আমরা তো দায়ী নই—"

এমন সময় কোথা থেকে এক ছোট মত কঙ্কাল এসে কড়া স্বরে বল্লে, "কার কাছে দুঃখ জানাচ্ছ—আত্মসম্মান হানির কথা বল্‌ছ ? এ যাই হোক সবাই কঙ্কাল,

হয়ে ছিলেন; তাঁকেই উদ্দেশ করে এই পার্টি। সেই সঙ্গে সস্ত্রীক উমেরগঞ্জ-রাজ এবং বিখ্যাত রত্নব্যবসায়ী নিমচাঁদ ঝুঁটিলালেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

"নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত; সকলে জটলা করে খেতে বসেছেন এমন সময় দ্বরোয়ান্ একখানা চিঠি নিয়ে এল। চিঠিখানায় টিকেট নেই, কে একজন একটু আগে হাতে দিয়ে গেছে আর বলে গেছে চিঠিখানা "জরুরী"।

"নীলু ভাই একটু বিরক্ত হয়ে চিঠিখানা খুল্ল, খুলেই কিন্তু তার ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। চিঠিখানা এই রকম—

"আজই কঙ্গো হীরাখানা আমার হাতে আসবে—সাবধানে থেক।—গয়ারাম।" চিঠিখানা বরাবরকার মত টাইপ্ করা। নীলুভাই এবার আর ব্যাপারটাকে অত সহজে উড়িয়ে দিতে পার্‌ল না, কারণ এ চিঠিখানা ডাকে আসে নি, হাতে এসেছে, তার মানেই শত্রু অতি কাছে, এবং আজই তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।

"খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ড্রইং-রুমে এসে বস্‌ল। উমেরগঞ্জের রাণী সাহেবা প্রস্তাব করলেন, 'এবার আপনার হীরা দেখাবেন না মিষ্টার নীলুভাই? ও কি, আপনাকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন! কি হয়েছে?' বাস্তবিকই নীলুভাই একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল, সে জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বল্‌ল, 'না, হ্যাঁ, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি বোধ হয়, মাপ করবেন। তবে ব্যাপারটা খুলেই বলি। একজন অত্যন্ত বদমায়েস লোক কিছুদিন থেকে এই হীরাটা চুরি করবে বলে আমাকে শাসাচ্ছে। একটু আগে সে চিঠি দিয়েছে, আজই নাকি সে হীরা দখল করবে। না না, আপনারা ভয় পাবেন না, তার হুমকিকে আমি থোড়াই কেয়ার করি, আটঘাট বেঁধেই আমি কাজ করেছি। আপনারা যখন হীরাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন সেই সময়েই যে সে ঘরে ঢুকবে তাতে সন্দেহ নেই, এবং ঘরে ঢুকতে হলে তার একমাত্র পথ হবে এই জানলা। আপনারা দয়া করে হীরা দেখতে দেখতে কেউ জানলার দিকে তাকাবেন না। আমি হাতে এই পিস্তলটা নিয়ে জানলার নীচে থাক্‌ব। লোকটা জানলায় উঠলেই তাকে বাধা দেব, ইতিমধ্যে আমার দু' জন গুর্খা পাহারাদার জানলার পেছনে এসে পেছন দিক্ থেকে তাকে বেঁধে ফেলবে। আপনাদের ভয়ের কোনই কারণ নেই।' কথা শেষ করে নীলুভাই আস্তে কাচের বাক্স থেকে হীরাটা বার করে মিসেস্ নিমচাঁদের হাতে দিল, সুইচ্ সে আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। মিসেস্ নিমচাঁদ এক মুহূর্ত্ত অবাক্ হয়ে হীরাটার দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি জহুরীর স্ত্রী—জীবনে অনেক হীরা-পান্না ঘেঁটেছেন, কিন্তু এমনটা কোন দিন দেখেন নি! চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ হাতে রাখতে তাঁর সাহস হ'ল না, তিনি উমেরগঞ্জের রাজার হাতে সেটা তাড়াতাড়ি গুঁজে দিলেন। রাজার সাহসও তথৈবচ, 'দেখুন ডক্টর হাওয়েল, আপনিই

তো হলেন আসল অতিথি' বলে তিনিও মুহূর্ত্ত পরে সেটা হাওয়েল সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। ঘরে যে এত কাণ্ড হচ্ছিল হাওয়েল সাহেব কিন্তু এতক্ষণ সেদিকে হুঁসই দেন নি—তাঁর চোখ এবং সম্ভবতঃ মনও পড়ে ছিল ঘরের অপর কোণে কি একটা জিনিষের ওপর। পকেট থেকে কি একটা যন্ত্র তিনি বার করেছিলেন, হীরা হাতে পাওয়া মাত্র তিনি তাচ্ছীল্যসহকারে সেটা রাণী সাহেবার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে ঘরের অপর কোণে গিয়ে হাজির হলেন, তার পর হাতের যন্ত্র দিয়ে একটা অদ্ভুত গুবরে পোকা জাতের পোকা টেনে বার করলেন। মুখ-চোখ তাঁর তখন আনন্দে ভরে গেছে,

চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগ্‌ছিল।

তিনি চীৎকার করে উঠলেন—"আরে, এ যে নাইকোম্বা টোরুচেল্লি—এ জাতের পোকা তো পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে বলে জানতাম!—দেখুন দেখুন, আশ্চর্য্য কাণ্ড!"

"ঘরের সবাই অবাক্ হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল। ডক্টর হাওয়েল একজন বড় কীটতত্ত্ববিদ্ তা সকলেই জানতেন তবে তিনি যে তা নিয়ে এতটা মেতে যান যে পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ রত্নের দিকেও একবার ফিরে চাইবেন না এ কথা কেউ ভাবতে পারে নি। বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কাটলে কথা কইলেন নীলুভাই নিজে; একটু শ্লেষ করেই তিনি বল্লেন, 'আচ্ছা, এবার বোধ হয় আমরা আবার সেই তুচ্ছ হীরাটার দিকে নজর দিতে পারি? দেখুন তো মিষ্টার নিমচাঁদ, আপনি তো একজন পাকা জহুরী, জিনিষটা হীরা বলে মনে হয় কিনা?' হীরাটা

তখনও রাণী সাহেবার হাতে ছিল, তিনি সেটা নিমচাঁদের হাতে দিলেন। ডক্টর হাওয়েল কিন্তু নীলুভাইএর কথায় কানও দিলেন না—মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুবরে পোকাটি হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। জবাব দিলেন নিমচাঁদ; হীরাটা ভাল করে নেড়েচেড়ে তিনি বল্লেন, 'যা বলেছেন, জিনিষটা প্রায় হীরা বলেই মনে হয়; আর একটু উজ্জ্বল করতে পারলে আমরাও বুঝতে পারতাম না যে এটা নকল—আসল হীরা নয়।" "নকল!" নীলুভাই যেন আকাশ থেকে পড়্‌ল? কি মাথামুণ্ডু বলছেন! তার স্বরে একটু রাগই প্রকাশ পেল। "ঠাট্টা তো আমি করছি না মিষ্টার নীলুভাই, সত্যিই যে এটা হীরা নয়, কাচ, তা কি আপনি জানেন না? বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন। হীরা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শক্ত জিনিষ তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে? হীরা দিয়ে যে কোনও জিনিষে আঁচড় কাটা যায়। কিন্তু এই দেখুন, এই শার্শির কাচে এ দিয়ে কোন আঁচড়ই পড়ছে না!' নীলুভাই এবার সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেল, চেঁচিয়ে বল্লে, 'কে আমার হীরা পাল্‌টে দিয়েছে? আমি এক্ষুণি খানাতাল্লাস কর্‌ব!'

"নীলুভাইয়ের কথা শুনে সকলেই অবমানিত বোধ করেছেন বোঝা গেল। এমন কি ডক্টর হাওয়েল শুদ্ধ তাঁর গুবরে পোকার কথা ভুলে যন্ত্রটা নীলুভাইয়ের নাকের সামনে ধরে বল্লেন, 'দেখুন, খানাতাল্লাস করুন, কিন্তু মনে রাখবেন, এ ব্যাপার আমি সহজে ভুলব না—এ অপমানের শোধ আপনাকে নিতে হবে।' মিঃ নিমচাঁদ তাঁকে থামিয়ে নীলুভাইকে উদ্দেশ করে বল্লেন, "আকস্মিক বিপদ্‌পাতে আপনার মাথা গুলিয়ে গেছে, মিষ্টার নীলুভাই, নইলে এঁদের সম্বন্ধে এমন কথা আপনার কল্পনা করাই যে অন্যায়।' উমেরগঞ্জের রাজা তাঁকে সায় দিয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ, বিপদের সময়ে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না—তখনকার কথা নিয়ে মানহানির মোকদ্দমা করলে চলে না। আমার মনে হয় মিষ্টার নীলুভাই একটু হিসেবে ভুল করছেন। যে লোকটি হীরা চুরি করবে বলে শাসিয়েছিল সে যে এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল এই ধারণাটাই হয়তো যত গোলের কারণ। এমনও তো হতে পারে যে সে আগেই হীরা সরিয়ে তার জায়গায় নকল হীরা রেখে গেছে, যাওয়ার সময় আপনাকে খেলো করবার জন্য চিঠি দিয়ে এ চালটা চেলে গেছে। নইলে সে এতক্ষণ আসছে না কেন? আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন, ঐ নকল হীরা আবার যথাস্থানে রেখে অপেক্ষা করুন, দেখুন চোর আসে কিনা। এ ঘরের লোকেরা ছাড়া তো আর কেউ জানে না ওটা নকল হীরা।'

"উমেরগঞ্জ-রাজের যুক্তি সকলকেই মানতে হ'ল; এবং করাও হ'ল তাই, কিন্তু চোরের আর দেখা মিল্‌ল না। নকল হীরা আসন যুড়ে রইল, আর আসল কঙ্গো হীরা কোথায় চলে গেল কেউ জান্‌ল না।—আজও কেউ তার খোঁজ পায় নি। এই হ'ল কঙ্গো হীরা পলায়নের ইতিহাস।"

এই পর্য্যন্ত বলে ডাক্তার সেন থামলেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে গল্প শুন্‌ছিল, ডাক্তার সেন থামতেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "তার পর? তার পর কি হ'ল?"

"তার পর আর কি হবে, কিছু দিন জোর খোঁজাখুজি চল্‌ল, উমেরগঞ্জের রাজা বন্ধুর হয়ে অনেক সাহয্য করলেন, কিন্তু গয়ারামকে পাওয়া গেল না। অবশেষে নীলুভাই হীরার শোকে পাগল হয়ে গেল। ব্যস্, ব্যাপার চুকে গেল।"

"কি আপদ! রহস্য যদি না ভাঙ্গলেন তো এ গল্প বলা কেন? গয়ারাম গেল কোথায়? তাকে কি সত্যিই পাওয়া গেল না?"

ডাক্তার সেন হেসে বল্লেন, "না, পাওয়া যাবে কেমন করে? গয়ারাম যে এই ঘটনা ঘটবার এক বছর আগেই মারা গিয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা, বাকিটা বল্‌ছি, আর একবার তা হ'লে চায়ের হুকুম করুন।" চা এলে আবার তাঁর গল্প সুরু হ'ল:

"গয়ারাম এবং নীলুভাইয়ের অন্য দু'টি সহচর জেলে গিয়েছিল সে কথা আপনাদের আগেই বলেছি। জেলে গিয়ে অপর দু'জন মারা যায়, গয়ারাম শেষ পর্য্যন্ত বেঁচেছিল। জেলে থাকতে তারা কি করে নীলুভাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নেবে সর্ব্বদা তার জল্পনা-কল্পনা কর্‌ত—এমন কি জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গেও পরামর্শ কর্‌ত। এই রকম একজন কয়েদী ছিল দুলিরাম। দুলিরাম বেশ শিক্ষিত লোক, সে পৃথিবীর নানা জায়গা ঘুরেছিল, বিয়েও করেছিল আমেরিকায়। কিন্তু লোকটি ছিল ভয়ানক ধূর্ত্ত, আর তেমনি বদমাইস্। চুরি-জোচ্চুরি করে টাকা সে করেছিল বিস্তর কিন্তু বদ্‌স্বভাব ছাড়তে পারে নি। জেল থেকে গয়ারাম আর দুলিরাম এক সঙ্গেই বেরোয়। গয়ারামের তখন টাকার বিশেষ দরকার। টাকা রোজগারের অন্য কোনও উপায় না পেয়ে সে যায় এক জুয়ার আড্ডায়, দুলিরামও তার সঙ্গে যায়। জুয়ার আড্ডায় প্রায়ই যা হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল, কি একটা নিয়ে একজন জুয়াড়ীর সঙ্গে গয়ারামের হ'ল বচসা, তার পর হাতাহাতি, তার পর চল্‌ল ছুরি। গয়ারাম সেখানেই প্রাণ হারাল। গয়ারামের মৃত্যুসংবাদ জুয়ার আড্ডায়ই চাপা রইল, বাইরের কেউ তা জান্‌ল না, জান্‌ল শুধু দুলিরাম। দুলিরাম ইতিপূর্ব্বেই গয়ারামের কাছে নীলুভাই এবং কঙ্গো হীরার কথা শুনেছিল। এইবার তার মাথায় কুবুদ্ধি চাপ্‌ল, গয়ারামের আড়ালে থেকে সে হীরাখানা বাগাবার চেষ্টা করবে। গয়ারামের নাম দিয়ে তখন থেকে সে নানা রকম হুমকি দেওয়া চিঠি ছাড়তে লাগ্‌ল নীলুভাইয়ের কাছে। উদ্দেশ্য—যাতে সন্দেহ এবং আক্রোশটা গয়ারামের ওপরই পড়ে, নিজে সে অলক্ষ্যে থেকে কাজ উদ্ধার করবে। দুলিরাম কলকাতায় এল, সস্ত্রীক চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাসা কর্‌ল—তখন আর সে দুলিরাম নয়, তখন সে একজন দেশীয় রাজা—'রাজা অব্ উমেরগঞ্জ'।

"রাজা-মহারাজার ওপর নীলুভাইয়ের বরাবরই ভারী দরদ। কাজেই নকল রাজা সেজে

ঢুলিরামের পক্ষে তার সঙ্গে ভাব জমান (জমিয়ে তাকে কৃতার্থ করা) এবং অল্প দিনের মধ্যেই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাওয়া ঢুলিরামের মত ধূর্ত্ত লোকের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হ'ল না। তার পর এল ডক্টর হাওয়েল। হাওয়েল আসলে ডক্টর নয়, কীটতত্ত্ববিদ্‌ও নয়. এবং ক্রোড়পতিও নয়, তবে আমেরিকার লোক বটে ; সে হচ্ছে ঢুলিরামের শ্যালা—অর্থাৎ তার আমেরিকান্ স্ত্রীর ভাই। শঠতায় সে ছিল ঢুলিরামেরই যুড়ি।

"এইবার আরম্ভ হ'ল আসল কাজ। নীলুভাইয়ের বাড়ীতে হরদম যাতায়াতের ফলে বাইরে দেখে ঢুলিরাম কঙ্গো হীরার চেহারা অনেকবার দেখেছিল—কাজেই ও রকম একটা কাচের নকল হীরা তৈরী করান তার পক্ষে কিছু কঠিন হয় নি। ইতিমধ্যে ঢুলিরাম নানা ভাবে ডক্টর হাওয়েল সম্বন্ধে নীলুভাইয়ের মনে একটা উঁচু ধারণা করিয়ে এই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা কর্‌ল। তার পর এল নিমন্ত্রণের দিন। আটঘাট বেঁধে ঢুলিরাম কি ভাবে কাজে নাম্‌ল তার পরিচয় আপনারা আগেই পেয়েছেন। হীরা দেখবার সময় "কীটতত্ত্ববিদ্" ডক্টর হাওয়েল কি ভাবে হঠাৎ একটা অদ্ভুত গুবরে পোকার সন্ধান পেল এবং নিতান্ত তাচ্ছীল্যভরে হীরা ফেলে তারই প্রতি ধাবিত হয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সকলের মনটা হীরা থেকে গুবরে পোকার দিকে আকৃষ্ট কর্‌ল তা আপনারা জানেন। মিসেস্ ঢুলিরাম ওরফে উমেরগঞ্জের রাণী সাহেবা সেই সুযোগে ক্ষিপ্রহাতে আসল হীরা ভ্যানিটি-ব্যাগে ফেলে তার জায়গায় নকল হীরা বসিয়ে দিল। পলকের মধ্যে কাজটা হাসিল হল এবং শেষ পর্য্যন্ত নীলুভাই হয়তো কিছু সন্দেহও কর্‌ত না—ধরতেও পারত না—কিন্তু একটু গোল বাধালেন নিমচাঁদ। নিমচাঁদ অবশ্য খাঁটি লোক, তিনি এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না, আর তিনি ছিলেন পাকা জহুরী। কাজেই হীরা হাতে পড়া মাত্র তিনি বুঝলেন ওটা নকল। ব্যাপারটা একটু ঘোরালও হয়ে পড়ছিল কিন্তু ঢুলিরামের বোল-চালে তখনই চাপা পড়ে গেল। আসল ব্যাপার কেউ সন্দেহ করতে পার্‌ল না—কারণ মুখে যাই বলুক, একটু না ভেবে-চিন্তে হঠাৎ একজন দেশীয় রাজার রাণীর ব্যাগ খানাতাল্লাস করা যে কত দূর বিপজ্জনক তা নীলুভাইয়ের অজানা ছিল না।

"তার পর হীরার শোকে নীলুভাই পাগল হয়ে গেল ; এদিকে ঢুলিরামও দেখ্‌ল এ হীরা ভারতে বসে হজম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—কাজেই সে একদিন নিরিবিলি পাততাড়ি গুটিয়ে তার চোরাই ব্যবসার অংশীদার শ্যালকটি সহ আমেরিকায় পাড়ি দিল। তখন অবশ্য সে আবার ঢুলিরাম হয়েছে।

"যে জাহাজে তারা রওনা হ'ল তার নাম এস্ এস্ অলিম্পিয়া। জাহাজখানা জাপান ঘুরে আমেরিকা যাচ্ছিল। আমিই ছিলাম সে জাহাজের মেডিক্যাল অফিসার। একদিন জাহাজের মধ্যে হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি—একজন আমেরিকান্ সাহেব আর একটি

লোককে রিভলভার দিয়ে জখম করেছে। আমেরিকান্ সাহেবটি আর কেউ নয়—হাওয়েল এবং আহত লোকটি হচ্ছে ঢুলিরাম। হয়তো বখরা নিয়ে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছিল এবং তারই ফলে হাতাহাতি এবং অবশেষে এই কাণ্ড!

"হাওয়েল পুলিশের জিম্মায় গেল, ঢুলিরাম আরও একদিন বেঁচে ছিল, অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তাকে বাঁচান গেল না—তার কৃতকর্ম্মের ফল তাকে ভুগতে হ'ল। মরবার আগে তারই মুখে এ সব ঘটনা আমি শুনেছিলাম—কাজেই এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই।"

ডাক্তার সেন একটু চুপ্ করলেন। ছোটমামা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর সেই কঙ্গো হীরাটা? সেটা এখন কার কাছে?"

"কার কাছে?" ডাক্তার সেন হেসে বল্লেন, "বরুণদেবের কাছে। মারামারির সময়ে নিতান্ত হাতছাড়া হচ্ছে দেখে রাগে ঢুলিরাম সেটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় নেমে খোঁজ করলে হয়তো তার সন্ধান পেতে পারেন। দেখবেন চেষ্টা করে?" *

কঙ্কালের সাথে কোলাকুলি

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্‌.সি)

টেলিফোনে কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল।

চোঙাটা মুখের কাছে এনে আমি বল্লাম, "কি বল্‌ছেন, গল্প চাই? য়্যাঁ, হাসির গল্প? তা হলেই তো সেরেছেন মশাই! ওবস্তু যে সর্ব্বদা আসে না—হাসা যত সোজা, হাসান তত সোজা নয়। হাসির গল্প লিখ্‌তে বসে অনেক সময় কান্না এসে যায়—এম্‌নি শক্ত ও কাজটি। মাথার বড় পরিশ্রম! কী বল্‌ছেন, অনেকেই তো দিনের পর দিন রাশি রাশি হাসির গল্প লিখে মাসিকের পাতা ভরে ফেল্‌ছে? রক্ষা করুন মশাই, ও রকম গল্প লিখ্‌তে আমার দশ বছর বয়সের সময় আমাকে ঠাকুরদা' বারণ করে দিয়েছিলেন—ওগুলি

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা।

পড়ে নাকি তাঁর কেবল কান্নাই পেত। স্বর্গগত পিতামহের আদেশটা ঠেল্‌তে আর এ বয়সে প্ররোচনা দেবেন না!"

সম্পাদক মশাই বল্লেন, "কিন্তু কি করি, ছেলেরা যে আপনার লেখার ভয়ানক ভক্ত!"

ছেলেদের নাম শুনে আমার মেজাজ নরম হ'ল। কিন্তু লিখিই বা কি করে? বল্লাম, "তার চাইতে তোফা একটা ভূতের গল্প লিখে দিই না কেন? কোন চিন্তার দরকার নেই, কেননা ভূতে সব পারে। স্রেফ্ কলম নিয়ে লিখে যাও।"

সম্পাদক মশাই আবার হেসে বল্লেন, "বেশ, আপনি না হয় এ মাসে একটা ভূতের গল্পই লিখুন। অবশ্য আজকাল যে রকম সব ভূতের গল্প সাধারণে লিখ্‌ছে সেই রকম গল্প লিখ্‌বেন, সে হাসির গল্পই হ'বে। ও রকম ভূতের গল্প পড়লে হাসিই পাবে নিশ্চয়!"

"বেশ, ভূতের গল্পই লিখ্‌ব।" বলে রিসিভার নামিয়ে রাখ্‌লাম। মনটা একটু হাল্কা হ'ল, ভাবলাম সন্ধ্যাবেলা বসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লিখে ফেল্‌ব। ভাবনাটা কি? পানের দোকানে পান কিনে পয়সা দিতে গিয়ে দেখব পানওয়ালা মানুষ নয়, স্রেফ কঙ্কাল—পয়সা নেবার জন্য তা'র মাংসশূন্য হাতখানা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিংবা রাত্রি একটার সময় বায়স্কোপ দেখে যখন বাড়ী ফিরব তখন যে দরজা খুলে দেবে সে আমাদের চাকর নয়, ঠোঁট-নাক-চোখ খসা বিকটাকার কেউ একটা; কিংবা নিদানে পিসীমা রাতে যখন ইলিস মাছ ভাজবেন তখন হঠাৎ সাদা কাপড়-পরা কেউ একটা পাঁচ হাত লম্বা হাত বা'র করে মাছ চাইবে—এমনি কিছু একটা লিখলেই হ'বে। ও লেখা তো ঘণ্টাখানেকের মামলা; সন্ধ্যাবেলাই যখন লিখ্‌ব তখন রবিবারের দুপুর বেলাটা নষ্ট করি কেন? টেনে একটা ঘুম দেব ঠিক কর্‌লাম। খেয়েদেয়ে শোয়ার পর ভাবলাম গল্পের প্লটটা ভেবে রাখি। কিন্তু মহা মুস্কিল, শেষ পর্য্যন্ত গল্পের ভূতকে কিছুতেই ভূত রাখ্‌তে পারি নে। ভূতের গল্প লিখ্‌তে হ'লে নিজের স্বভাবটা একটু মেয়েদের মত, আর চেহারাটা একটু বেশ 'পুঁয়ে পাওয়া' লিকলিকে প্যাটার্ণের হাওয়া দরকার বোধ হচ্ছে। আমার এ "বারবেল-মুগুর-ভাঁজা" চেহারায় বোধ হয় ঐ

ধরণের ভয়-দেখান ভূতের গল্প লেখা চলে না। মনে পড়ে আমার বছর ষোল বয়সে একবার এক ভূতকে ভীষণ ঠেঙিয়েছিলাম। আমার মামার বাড়ীর বাগানে একবার ভীষণ ভূতের উপদ্রব হ'লো, রোজ রাত্রে ছোট ছেলের কান্না শোনা যায়—সাদা কাপড় জড়িয়ে কে আনাগোনা করে। ভয়ে আর বাগানের দিকে কেউ আসে না—বাগানের মালীরাও ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। আমি যেদিন মামার বাড়ী পৌঁছুলাম সেদিন ঐ গল্প শুনে সন্ধ্যাবেলা হাতে একটা লাঠি নিয়ে বাগানের মধ্যে একটা আমগাছে চড়ে বসে রইলাম—মামীমা কত বারণ কর্‌লেন, অন্য সবাই বল্লে, 'কি ডাকাত ছেলে রে বাবা, ভূতের হাতে আজ ওর প্রাণটা যাবে নিশ্চয়। ভূতের সঙ্গে তো গায়ের জোর চলবে না!—' যাই হোক, রাত তখন প্রায় ন'টা-দশটা—সেই ছেলের কান্না, ভূতটাও ঢুকেছে বাগানে সাদা কাপড় জড়িয়ে। ভূতটা সোজা আমার দিকেই আস্‌ছে যে—আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে নাকি? ভাবলাম এক হাত লড়্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি ভূতের সঙ্গে। ভূতটা তার ছেলে-কান্না থামিয়ে সোজা গাছে উঠবার উপক্রম কর্‌ল—আমিও মোটা দুটো ডালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক হাতে একটা গাছের ডাল আর এক হাতে লাঠিটা বাগিয়ে ধরলাম। ভূতটা দেখ্‌লাম অনেক কষ্টে গাছে উঠ্‌ল। ই কি রে বাবা! ভূত তো শুনেছি হাওয়ায় ভাসে, তা হ'লে অত কষ্ট করে ওঠা কেন? যাই হোক, উপরের ডালে 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে রইলাম বসে। কিন্তু ভূত মহাপ্রভু আমার কাছ পর্য্যন্ত এলেন না—নীচের ডাল থেকেই আম পেড়ে কোঁচড়ে ভরতে লাগ্‌লেন এবং খানিক পরে সোজা নেমে আবার ছোট ছেলের কান্না কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাগানের দরজার দিকে চল্‌লেন। আমিও তাড়াতাড়ি নেমে ছুটে এসে পিছন দিক্ থেকে মোক্ষম জোরে তা'র ঘাড়টা ধর্‌লাম চেপে—সঙ্গে সঙ্গে তা'র ছেলের কান্না গেল থেমে—সে চীৎকার করে উঠ্‌ল "কে রে বাবা!"—আমি বল্লাম—"বেহ্মদৈত্যি"। তার পর বল্লাম, "বাপধন ভূত, ক'টা আমগাছ সাবাড় কর্‌লে আজ পর্য্যন্ত?"—তাকে টান্‌তে টান্‌তে মামার বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে বল্লাম, "এই নিন আপনাদের ভূত!" সকলে তো অবাক্, বল্লে "এ যে আমাদের পাড়ার হীরু গয়লা!" তাকে বেশ কয়েক ঘা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। অবশ্য শেষের দিক্‌টুকু না বল্লে এই নিয়েই দেখ্‌তে

ভূতুড়ে গল্প-লিখিয়েরা স্রেফ্—"রাত্রে যা'রা আম খেতে আসে" বলে প্রকাণ্ড একটা বই লিখে ফেল্‌ত। আমার কিন্তু গল্প লেখার চেয়ে শরীরের মাংসপেশীগুলির শক্তিটা পরীক্ষা করাতেই আনন্দ বেশী। তাই ভূত শেষ পর্য্যন্ত হীরু গয়লা হয়ে গেল।

কাজেই মন থেকে আমার গল্পের প্লট বানানো চল্‌বে না। আলমারী থেকে কয়েকজন বিদেশী লেখকের প্রেততত্ত্বের বই, কয়েকখানা ম্যাগাজিন পেড়ে নিয়ে এলাম—প্রবন্ধ সমস্ত পড়ে দেখলাম—উঁহু, আমাদের ভূতুড়ে গল্প লেখকদের ভূতেদের কাছে ও দেশের ভূত সব নেংটী ইঁদুর। চল্‌ল না, মহা মুস্কিলে পড়লাম তো! কেন মর্‌তে ভূতের গল্প লিখব ভাবলাম! অনেক ভেবে ভেবে ঠিক কর্‌লাম যে যখন অনেক রাত হ'বে তখন আমাদের বাড়ী থেকে মাইলখানেক দূরে যে পাড়ার খৃষ্টানদের পুরানো "গোরস্থান" আছে সেইখানে গিয়ে বস্‌ব। নিশ্চয় গা-টা একটু ছম্ ছম্ কর্‌বে, তার পর ফিরে এসে বাড়ীর সমস্ত লাইট নিবিয়ে দিয়ে নীচেকার ঘরে একটা প্রদীপ জ্বেলে একা বসে বসে গল্প লিখ্‌ব। এই ভেবে পাশ ফিরে চোখ বুজলাম।

সেই পুরানো গোরস্থানের একটা কবরের উপর একটী খাতা হাতে বসে আছি, চারিদিক্ নিঝুম, নিস্তব্ধ—কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই।

রাত ন'টা-দশটায় এসেছি আর এখন রাত প্রায় একটা। কই, গা ছম্ ছম্ কর্‌ছে না তো মোটেই! কি করি, এক আধটা ভূতের যদি দেখা পেতাম!

বসে বসে ভাব্‌ছি, হঠাৎ আমি যে কবরটার কাছে বসে আছি সেইটা নড়ে উঠ্‌ল একটু। ভাবলাম হয়তো মনের ভুল—কিন্তু কবরটা আরও দু'-তিনবার বেশ নড়ে উঠ্‌ল, তার একটু পরেই সেই কবরের মধ্যে থেকে কে যেন অতি কাতর ভাবে বল্লে, 'একটু ধর না বাবা, অনেক দিনের বুড়োর কঙ্কাল, কবর ঠেলে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে যে—'

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কবর ঠেলে একটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল বার হয়ে এল—কোথাও মাংসের নাম মাত্র নেই, সমস্ত হাড়গুলো যেন ক্ষয়ে গেছে—সব নড়বড় কর্‌ছে।

কঙ্কালটা যেন বড় খুসী—বল্লে, "তুমি কে বাবা, কেনই বা এখানে এসেছ? এখানে তো কেউ ভুলেও পা দেয় না। অতি পুরোনো গোরস্থান; এর তো আর কোন দামই নেই—সবাই অবহেলা করে।"

বুঝলাম, কঙ্কালটার বুকে, অর্থাৎ বুকের হাড়ে একটা ব্যথা বা অভিমান জমে উঠেছে। বল্‌লাম—"আমি একজন গল্প-লিখিয়ে, ভূতের গল্প লিখ্‌তে হ'বে আমাকে, তাই এখানে এসেছি আপনাদের বিষয় কিছু জান্‌তে।"—'আপনি' বলেই ওকে কথা বল্‌লাম, কি জানি কার কঙ্কাল, হয়তো কোন হোমরা-চোমড়ার কঙ্কাল হ'বে হয়তো।

কঙ্কালটী এবার যেন আরও খুসী হয়ে উঠে বল্‌লে, "আহা বড় ভাল ছেলে বাবা তুমি—আমাদের কেউ খোঁজ-খবর নেয় না, কি দুঃখে যে আছি ভগবান্ জানেন"—বল্‌তে বল্‌তে তার নাকের হাড়ের পাশ দিয়ে যেন দুটো দীর্ঘনিঃশ্বাস বার হয়ে এল,—তার পরে বল্‌লে, "আমাদের কথা লিখ্‌বে? বেশ, বেশ, আমাদের দুঃখের কথা শুনে একটু জগৎ-সংসারকে জানিও লিখে।" বলে সে বল্‌তে লাগ্‌ল—

"আমি আজ ত্রিশ বৎসর এই কবরের মধ্যে আছি—ত্রিশটী বৎসর আগেকার কথা; খুব বুড়ো হয়ে ভুগে ভুগে ম'লাম। তার পরে সকলে আমার মৃতদেহ নিয়ে এসে মহাসমারোহ করে এইখানে আমাকে কবর দিল। কি ভাল যে লাগ্‌ল—সুন্দর কাঠের বাক্স—যাকে তোমরা ইংরাজিতে 'কফিন' বল, বাংলায় বল শবাধার—সেই কাঠের বাক্সের মধ্যে, সুন্দর করে আমাকে পোষাক পরিয়ে, সারা গায়ে সুগন্ধি মাখিয়ে—আঃ ভাবতেও আরাম লাগে। ভাবলাম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—আর দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই। যখন মাটী খুঁড়ে 'কফিন'টী শুদ্ধ আমাকে মাটীর মধ্যে নামিয়ে দিল"—বলে সে চুপ কর্‌ল, কি যেন খানিক ভাবল, তার পর আবার বল্‌তে সুরু কর্‌ল—"আঃ, এখনও মনে পড়ে যখন তারা মাটী দিয়ে কবরটা ভরাট কর্‌তে লাগ্‌ল—কি সে আনন্দ! পরম নিশ্চিন্ত হয়ে এখন নিদ্রা দেওয়া যাবে। তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পার্‌ছ না সে কি আনন্দ! একবার পরীক্ষা করে দেখতে পার; শোবে এই কবরের মধ্যে একবার?

দেখ না তেমনি করে শুয়ে।"—বলে সে আমার কাঁধে তার হাত রাখল। ওরে বাবা, কি ঠাণ্ডা আর কি শক্ত সেই হাত! ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগল। আমি কোনও রকমে বললাম, "না, না, পরীক্ষা আমি করতে চাই না, বেশ বুঝতে পারছি খুব আনন্দ—" সে বললে, "বুঝতে পারছ, বেশ বেশ, ভাল। তা হ'লে শোন; তখন এই গোরস্থান স্বর্গ ছিল, চারিদিকে ফুলের গাছ, কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটত, কত পাখী ডাকত! এই কবরের চারিদিক দিয়ে লাল রাস্তা ছিল, আর তার মাঝে মাঝে কচি কচি ঘাস। আর সেই জায়গায় আজ? সমস্ত আগাছায় ঢেকে গেছে, চারিদিকে বন গজিয়ে উঠেছে, গরুবাছুরের আস্তানা হয়েছে—কেউ ভুলেও এ পথ মাড়ায় না। মাড়াবে কেন? এ গোরস্থান যে

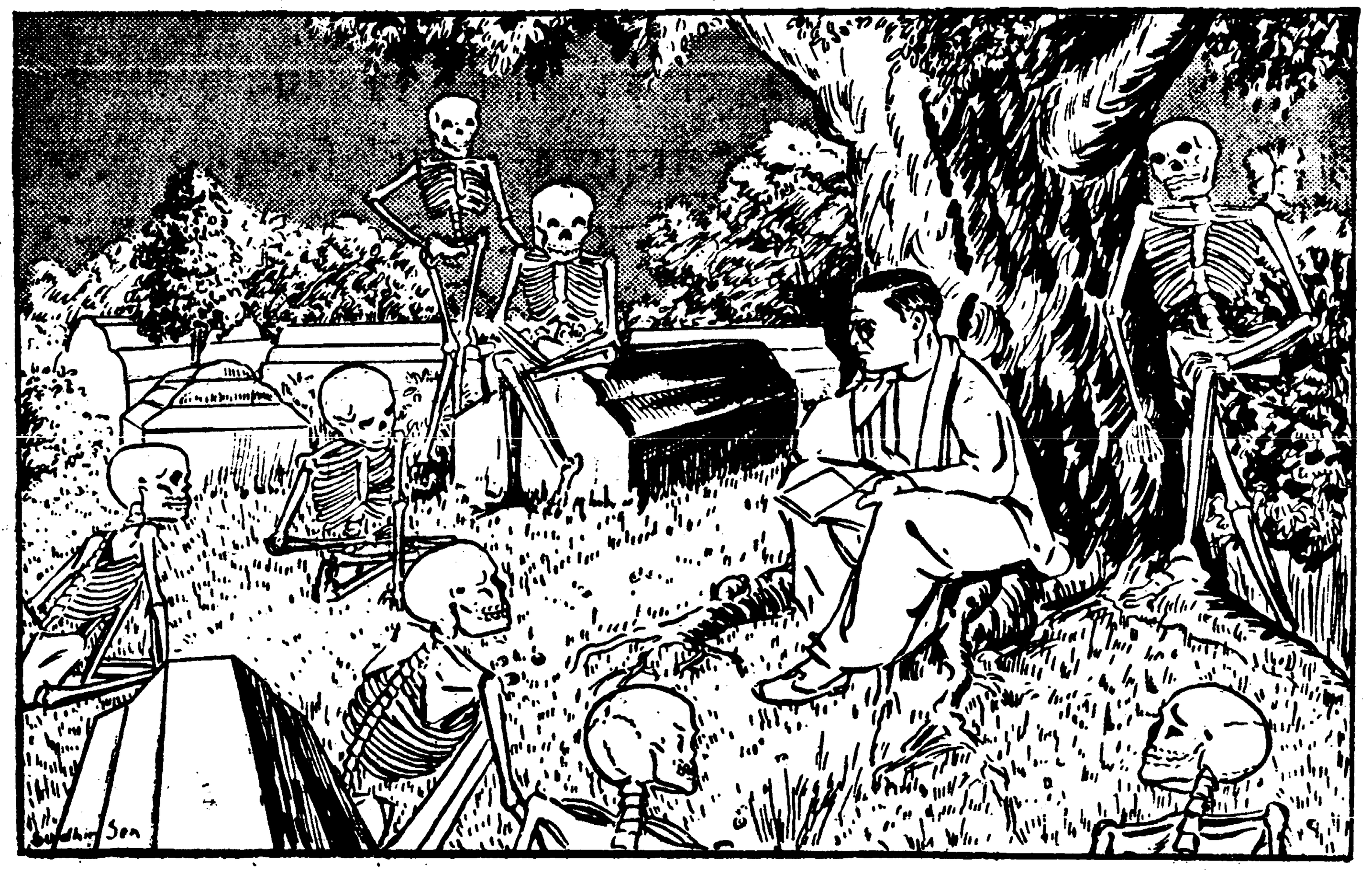

আমি একেবারে কঙ্কাল-পরিবেষ্টিত!

এখন ভর্ত্তি হয়ে গেছে—নতুন গোরস্থান তৈরী হয়েছে যে ঐদিকে!" মাথা নীচু করে ওর কথা শুনছিলাম, হঠাৎ মাথা তুলে দেখি ওর পাশে আর কয়েকটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে, বসে। আমি একেবারে কঙ্কাল-পরিবেষ্টিত! এবার ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে এল প্রায়। পাশ থেকে আর একটা কঙ্কাল চেরা চেরা গলায় বলে

উঠল—"লেখই যদি আমাদের গল্প তা হ'লে আমাদের দুঃখের কথা সব শুনে যাও। একদিন ছিল যখন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাতে কবরগুলির কোনও ক্ষতি করতে পারত না। কিন্তু এগুলি এখন এতই পুরানো হয়ে গেছে যে সমস্ত কবর ছেঁদা হয়ে গেছে—বর্ষাকালে সেই সমস্ত ছেঁদা দিয়ে হু হু করে জল ঢুকে সমস্ত কবর ভর্ত্তি হয়ে যায়—তখন আমাদের জলের তলায় দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই বাধ্য হয়ে তখন আমরা ঐ গাছগুলোর ডালের উপর গিয়ে আশ্রয় নিই; কিন্তু সেখানেও বৃষ্টি হ'লে হাড়ে এসে জল লাগে—কি কষ্ট যে হয় বর্ষার দিনে, ঠাণ্ডায় হাড়ে জল লাগলে তা তোমরা কি বুঝবে? তোমাদের হাড় তো চামড়া-মাংস দিয়ে ঢাকা!—"

তার পাশ থেকে আর একটা কঙ্কাল হঠাৎ খেঁকি গলায় বিকট চীৎকার করে উঠে বললে, "দেখ, ঐ বড় রাস্তার উপর যে প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ীটা দেখছ, ওটা ছিল আমার বাড়ী, টাকাও ছিল আমার প্রচুর। ঐ বাড়ীটাতে এখন বাস করে এক বেটা জোচ্চর, ভণ্ড। বেটা দূর সম্পর্কে আমার ভাইপো হয়। ও আমার বুড়ো বয়সে কোথা থেকে এসে জুটল। কি সেবা করতে লাগল আমার! মরবার দু' একদিন আগে বললে, "কাকা, যত দিন জীবন থাকবে তত দিন আপনার ঐ স্নেহমাখা মুখখানি আমি ভুলতে পারব না"—বলে সে কি কান্না! দিলাম বেটাকে সব উইল করে। এখন বেটা ভুলেও একবার আমার নাম করে না! এ কবরটা দু'-চার আনা পয়সা খরচ করে মেরামত পর্য্যন্ত করে দেয় না! তুমি ঐ বেটাকে ব'ল যে ওকেও একদিন মরতে হবে, এ কবরে না হয় ঐ কবরটায় আসতে হ'বে তখন, তখন বেটাকে আমি গুণে গুণে দু'শ' লাথি লাগাব—তবে ছাড়ব।"

ভাবলাম কঙ্কালের কি রাগ রে! যদি আমাকেই ঐ পায়ের হাড় দিয়ে লাথি বসিয়ে দেয়!—তাড়াতাড়ি বললাম, নিশ্চয় বলব, নিশ্চয় বলব, ভারী অন্যায় তো।"

বুড়ো কঙ্কালটা আবার কথা কইল—বললে, "তোমাদের বেশ, পুড়িয়ে ফেলে। আমাদের এর চেয়ে ভাল। প্রথম রাজার আরামে রেখে তার পর এই ভিখারীর কষ্ট! তার চেয়ে পোড়ান ভাল, পোড়াবার সময় অবিশ্যি খুব কষ্ট—কিন্তু তার পরে তো সব ছাই, নিশ্চিন্ত।"

একটা কঙ্কাল বাধা দিয়ে বল্‌লে—"ছাই নিশ্চিন্ত, ও সব সমান, সব সমান। সেবার সেদিন খুব বৃষ্টি, আমি একটা বটগাছে বসে আছি, এমন সময় আমার পাশে একটা আধখান কঙ্কাল এসে বস্‌ল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কে তুমি?' সে বল্‌লে, 'আমি হরিধন চাটুয্যে'—আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম, 'তুমি তো ব্রাহ্মণ, তবে তোমার এ হাড়ের দেহ রইল কি করে? তোমাদের তো পুড়িয়ে ফেলে!' সে একটু হেসে বল্‌ল—'তোমরা কলকাতার শ্মশানঘাট দেখে ঐ কথা ভাব। কলকাতায় আর ক'টা লোক? লোক তো সব দেশের গ্রামেই থাকে। গ্রামের মড়া বুঝি সব শেষ পর্য্যন্ত পোড়ায়? গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে কোনও রকমে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। খানিক আগুনে জ্বলে পুড়ে মরি—তার পর আগুন যায় নিবে, তখন শেয়াল কুকুরে সেই আধখান পোড়া দেহ নিয়ে টানাটানি করে। কি রকম আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বল তো? কখনও কখনও আবার সব জুড়োতে না জুড়োতে জলে ভাসিয়েও দেয়—হয়তো তখন ভীষণ শীত! কি ভীষণ কষ্ট শীতের মধ্যে? তোমাদের তো কেমন সুন্দর বাক্স করে মাটীর মধ্যে শুইয়ে দেয়! আমাদের বেশীর ভাগ সময়েই আধপোড়া অবস্থাতেই থাক্‌তে হয়। এই দেখ না, এত বড় ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা কি হ'ত যদি তাকে পোড়াতে না নিয়ে যেত—ঐ তো আগুন দিয়েছিল বলেই তো এত তর্ক—পুড়েছে কি পোড়ে নি?"

এই সময়ে দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা খটাস্ খটাস্ শব্দ শোনা গেল। শব্দটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দিকেই আসছিল। একটু পরে দেখলাম, একটা কঙ্কাল ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছে—তারই পায়ের খটাস্ খটাস্ শব্দ হচ্ছে। সে এসেই সকলের মাঝে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সব কঙ্কালগুলো এক সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কি রে, কি হয়েছে, কি হয়েছে?" সে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—"আমার 'কফিন'টা একেবারে ভেঙ্গে গেছে, তাই ঐ নতুন কবরটায় গিয়েছিলাম একটা নতুন 'কফিন' চুরি করে আন্‌তে। ওদের একজন যেই বার হয়ে কোথায় গেছে, আমিও তার কফিনটা কাঁধে ফেলে দে ছুট! পথের মাঝে ধরা পড়ে গেলাম। ভীষণ মারলে আমাকে সবাই মিলে—এই দেখ একখানা হাত একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে। বলে সে আবার কাঁদ্‌তে লাগল। সত্যিই ওর

একখানা হাতের সমস্ত হাড় চুরমার হয়ে গেছে।" আমার ভয়ানক মায়া হ'ল—কিন্তু ওরা কেউ সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌লে না। বল্‌লে, "বেশ হয়েছে, যেমন গিয়েছিলি বেটা ভূত!"

ওদের মধ্যে হঠাৎ একটা কঙ্কাল আবার ঐ হাতভাঙ্গা কঙ্কালটাকে পেটাতে আরম্ভ কর্‌ল—বল্লে, "আর যাবি, বল্ আর কক্ষণো যাবি? আত্মসম্মান নেই তোর একটু?"

বুঝলাম ঐ কঙ্কালটা ঐ হাতভাঙ্গা কঙ্কালটার নিশ্চয় কোন গুরুজন হবে। কঙ্কাল হয়ে গেছে তবুও গুরুজনের আধিপত্যটুকু ছাড়ে নি। বুড়ো কঙ্কালটা গিয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরল—ও তখন ক্ষেপে গেছে, কিছুতেই ছাড়বে না। বুড়ো কঙ্কালটা অনেক কষ্টে তাকে থামাল। থামানোর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো বেচারা কাতরাতে লাগ্‌ল। এতক্ষণে আমি কথা কইলাম, বুড়ো কঙ্কালটা সত্যিই বড় ভাল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কি হ'ল?"

সে আমার পাশে এসে বসে অতি কাতর ভাবে বল্ল, "ওদের থামাতে গিয়ে আমার দু'খানা পাঁজরার হাড় শিরদাঁড়া থেকে খুলে এসেছে। বুড়ো হাড়—সব যোড়গুলো ঢিলে হয়ে গেছে। একটু কিছু দিয়ে বেঁধে দিতে পার?"

আমি আমার রুমালটা বার করে ওর পাঁজরার হাড় দুটো শিরদাঁড়ার সঙ্গে বেঁধে দিতে লাগলাম।

ও বল্‌তে লাগ্‌ল—"তোমাকে এতক্ষণ আমাদের দুঃখ-কষ্টের যে সব কথা শোনাচ্ছিলাম সে সব দুঃখ এক দুঃখের কাছে হার মেনে যায়। সে দুঃখ হচ্ছে আমাদের আত্মসম্মানের হানি। তুমি তো জান—মানুষের মধ্যে বড়লোকেরা গরীবদের অবজ্ঞা করে। মরে গিয়েও সে স্বভাব যায় না। দেখ না, ঐ নতুন গোরস্থানের কঙ্কালগুলোর কি গুমোর—নতুন কফিন, নতুন জামাকাপড়, সুন্দর বাগান! ওরা প্রায়ই এসে ওদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে আমাদের ঠাট্টা করে যায়—এ দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য আমরা তো দায়ী নই—"

এমন সময় কোথা থেকে এক ছোট মত কঙ্কাল এসে কড়া সুরে বল্লে, "কার কাছে দুঃখ জানাচ্ছ—আত্মসম্মান হানির কথা বল্‌ছ? এ যাই হোক সবাই কঙ্কাল,

এ কবর হোক আর নতুন কবর হোক। কিন্তু ওরা সব সাহিত্যিক-মানুষ,—ওরা আমাদের নামে যা-তা গল্প লিখে ছাপায়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেই সব গাঁজাখুরি গল্প পড়ে বিশ্বাস করে। আমাদের মধ্যে কেউ সাদা কাপড় পরে বেড়াই নে, কখনও কেউ মাছ চাই না—সে রকম হ্যাংলা আমরা নই। রাতে আমরা কক্ষণো দাঁত খিঁচোই না, সব মিথ্যা, বানানো—”

ফাজিল কঙ্কালটাকে কথার মাঝে তাড়া দিয়ে থামিয়ে দিলাম। বল্লাম—“দেখ, না জেনে-শুনে যা-তা ব'ল না—আমি সে সব লেখকদের মধ্যে নই—আমি তোমাদের গল্প কোনও দিন লিখি নে। তবে তোমাদের এইটুকু বল্‌তে পারি যে বাজে লেখকেরা তোমাদের সম্বন্ধে যা-তা আজগুবি লিখলেও দু'-একজন লেখক আছেন যাঁরা তোমাদের সম্বন্ধে ভাল গল্পই লেখেন, তাতে তোমাদের আত্মসম্মানের হানি হয় না; আর একটা কথা জেনে নিশ্চিন্ত হ'তে পার যে ঐ সব বাজে ভূতের গল্প যা'রা লেখে তাদের গল্প আমরা তো কেউ বিশ্বাস করিই নে, ছোট ছেলেরাও তা অনেকে বিশ্বাস করে না। দু'-চারজন ভাল মানুষ ছোট ছেলে যদি বিশ্বাসও করে, বড় হ'লে তারা বুঝতে পারে যে সে সব মিথ্যা—”

আমার এ কথায় সকলে যেন ভীষণ খুসী হয়ে উঠ্‌ল। দু' একটা কঙ্কাল হঠাৎ আনন্দের চোটে আমাকে জড়িয়েই ধর্‌ল। তাদের হাড়গুলো সব গায়ে ফুট্‌তে লাগল—আমি তাদের আলিঙ্গনের মধ্যে প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়লাম।

বৈকাল পাঁচটা; দেখি আমার ছোটদি আমাকে ডাকছে—“এই, ওঠ্, আজ কি ঘুম ঘুমুচ্ছিস, ভূতে পেয়েছে নাকি তোকে?”

বললাম—“ছোটদি, সত্যিই এতক্ষণ ভূতে পেয়েছিল। দাঁড়াও”—বলে টেবিলের কাছে বসে স্বপ্নের সমস্ত ঘটনাটা লিখে ফেললাম। ভাবলাম এটা অনেকটা সত্য ঘটনাই তো, স্বপ্ন হ'লে কি হয়? কঙ্কাল ভায়াদের কথাগুলো তো একটু ভেবে দেখলে, সত্যিই।—সম্পাদক মশায়ের কাছে এই লেখাটাই পাঠিয়ে দিলাম; সঙ্গে একটু নোটও লিখে দিলাম—ভূতের রাজা বাবা মহাদেবের কৃপায় স্বপ্নে পাওয়া গল্প, স্বপ্নাদ্য মাদুলীর মত অনেকটা; কাজেই এর ফল ভাল হ'বে।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(২৮)

বিশ্লেষণ

“জগন্নাথ ঘাটে ঢুকে রণজিৎ বাবু আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর টিকেট কেনা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, বুঝ্‌লেন অন্ততঃ হুগ্‌লী পর্য্যন্ত এই ষ্টিমারে এগোনই ওদের মৎলব। আরও বুঝ্‌লেন, ওদের সন্দেহ এড়াতে হ'লে জগন্নাথ ঘাটেই ষ্টিমারে ওঠাটা তাঁর উচিত হবে না, উচিত হবে হাওড়া থেকে ট্রেনে উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে সেখানে এই ষ্টিমার ধরা। ই. আই আর. এর টাইম-টেব্‌ল্ হাতে একজন ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করে নিলেন, উত্তরপাড়ার গাড়ী ক'টায়। প্রকাশ্যে ওই ধরণের প্রশ্নটা করাই হল তাঁর প্রথম ভুল, কেননা তাঁর অজানাতে ওটা গিয়ে এমন একজন লোকের কানে পৌঁছাল, যে নাকি শেষ পর্য্যন্ত ওঁর সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল হয়ে দাঁড়াল। অশনিকান্তের কথা বল্‌ছি।

“সলা-পরামর্শ আগে থেকেই সব ঠিক ছিল, অশনিকান্ত এসেছিল তাই বন্ধুদের নিজে উপস্থিত থেকে ষ্টিমারে তুলে দিতে—তারা কল্‌কাতা ছেড়ে গেছে, নিজে চোখে এটা দেখে তবে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়্‌বে। হঠাৎ রণজিৎ বাবুকে ওখানে দেখে আর তাঁর প্রশ্ন শুনে ওঁর আসল উদ্দেশ্য অশনিকান্তের চোখে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল—হাজার হোক্ চালাক লোক তো! চুপি সারে বন্ধুদের কাছে এগিয়ে সে উপদেশ দিয়ে এল—তারা যেন পরের ষ্টেশনেই নেমে পড়ে, পেছনে ফেউ লেগেছে। তার পর ষ্টিমার বাঁশী বাজাতেই হাল্কা মনে সে বাইরে বেরিয়ে আস্‌ছিল, স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে নি যে তার পাপের প্রথম দফা প্রায়শ্চিত্ত জগন্নাথ ঘাটের ফটকের সাম্‌নেই অপেক্ষা কর্‌ছে।

“আপনাদের বোধ হয় আগেই এ কথা বলেছি যে অশনিকান্ত ছাড়া মিষ্টার বাসুর

অন্তরঙ্গদের ভেতরে আরও জনা দুত্তিন অল্পবয়সী ছোকরা ছিল, আর তারাও সকলেই ডায়মণ্ড্ কর্পোরেশনের চাঁই মেম্বার। সোনার হরিণ লুট হয়ে যাবার পর আগাগোড়া তারা অশনিকান্তের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে দেখ্‌ল—নিশ্চয়ই এর ভেতর তার কোন ছলাকলা রয়েছে! সেই তো একটা ছুতো ধরে সবাইকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়ে লুটের পথ সহজ করে দিয়েছে! অশনিকান্তের পরের ব্যবহারও নিশ্চয়ই তাদের চোখে সন্দেহজনক ঠেকেছিল। একে গরম রক্ত, তার ওপর আশাভঙ্গ, প্রতিশোধ নেবার সুযোগে রইল তারা। কি উদ্দেশ্যে তা অবশ্য আঁচ্‌তে পারে নি, তবে জগন্নাথঘাটে সে যে সেদিন সকালবেলায় গেছে সেটা তারা বার করে ফেল্লে। ব্যস্, তার পর অশনিকান্তও ফটক থেকে বার হয়েছে, তারাও হাণ্টার দিয়ে তাকে চাব্‌কে লাল করে দিল।

"এদিকে রণজিৎ বাবু তো উত্তরপাড়ার ফেরিঘাট থেকে ষ্টিমারে উঠেই একদম্ বেকুব—বাবাজীদের চিহ্নমাত্র নেই। পরের সব ঘটনা খুঁটিয়ে বল্‌বার দরকার নেই, আপনাদের বোঝ্‌বার পক্ষে শুধু এটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন থেকে উনি যখন কল্‌কাতায় ফিরে আস্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছিলেন হঠাৎ তখন প্ল্যাটফর্ম্মের ওপরেই অপ্রত্যাশিত ভাবে রামদয়ালের দেখা পেয়ে গেলেন। ইনিই যে সেই ষ্টিমার থেকে অদৃশ্য-হাওয়া বাবাজীটি তা অবশ্য রণজিৎ বাবু বুঝ্‌তে পারেন নি, কেননা ষ্টিমারে ওঠার সময় ছিল তার ছদ্মবেশ আর এখন ফুটে উঠেছে একেবারে আদি অকৃত্রিম চেহারা! ট্রেনের ভেতরেই এ রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু তবুও যে রণজিৎ বাবু প্রতারিত হলেন না, সেই গাড়ীতেই তাকে অনুসরণ করলেন, তার কারণ হচ্ছে সেই ফটোগ্রাফ খানা। সলিল বাবুর তোলা মূল ফটোটা তাঁর হাতে দিই নি, সেটা আমার কাছে এখনও রয়েছে; পেছনের লোকগুলোর চেহারা তাতে খুব ঝাপ্‌সা রকমের উঠেছিল, তা থেকে জীবন্ত মানুষের সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট উঠেছিল শুধু রামদয়ালেরই চেহারাটা, তাই আমি আমার নিজস্ব ডার্ক্‌রুমে বসে রামদয়ালের চেহারাটাই এন্‌লার্জ্জ করে নিয়েছিলাম, অন্য চেহারাগুলো একদম্ উড়িয়ে দিয়ে। রণজিৎ বাবুকে সুরযমল নগরচাঁদ লেনে পাঠাবার সময় এই দ্বিতীয় ফটোখানা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম ফটোর লোকটার ওপর একটু বেশী রকম নজর রাখ্‌তে। তাই ব্যাণ্ডেলে এসে প্রথম সেই মূর্ত্তির দর্শন পেয়েই উনি অতটা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন।

"গাড়ীতে কি কি ঘটনা ঘটেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত কাশী এসে গুণ্ডার দল নানান্ রকমে রণজিৎ বাবুকে বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা করে শেষটায় কি ভাবে একদিন বাগে পেয়ে বন্দী করে ফেল্ল সে সবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে কথা বাড়াতে চাইনে, তবে এটুকু জান্‌বেন যে ট্রেনের ভেতর কিন্তু ওঁর ওপর রামদয়ালের কোন সন্দেহ হয় নি, হয়েছিল ওঁরই কামরার আর একজন যাত্রীর ওপর; তিনি সলিল বাবুদেরই ভাগ্‌নে। দুপুর রাত্রে গাড়ীতে ঢুকে রামদয়াল তাকেই চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয়, অথচ রণজিৎ বাবুকে ঘুমন্ত পেয়েও ওঁর কোন অনিষ্ট করে নি!"

সকলে অভিভূত হইয়া হুকা-কাশির এই চমকপ্রদ বর্ণনাগুলি গোগ্রাসে গিলিতেছিল, হঠাৎ সন্তোষ কথার মধ্যেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "মাপ কর্‌বেন, মিষ্টার হুকা-কাশি, একটা প্রশ্ন না করে থাক্‌তে পার্‌ছি না। এ সমস্ত জটিল তথ্যগুলিই কি আপনি শুধু বিশ্লেষণ করে করেই বার করে ফেলেছেন? এ যে জ্যোতিষীদেরও ক্ষমতার বাইরে!"

হুকা-কাশি হাসিলেন, কহিলেন, "আগেই তো আপনাকে বলেছি, এ ঠিক অঙ্ক কষার মত; নির্ভুল ভাবে ধাপে ধাপে অঙ্ক কষে যেতে পার্‌লে শেষ পর্য্যন্ত ফল আপনার মিল্‌বেই। রহস্যের সাড়ে পনেরো আনা সন্ধান সেই ভাবেই আমি পেয়েছি, খুঁটিনাটি সামান্য যেটুকু জান্‌বার ছিল কাল রাত্রে সলিল বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সম্পূর্ণ গল্পটি তৈরী হয়ে গেছে। শুধু এই জন্যেই নৌকোর ভেতর আমার বক্তব্য শেষ করি নি, সলিল বাবুর জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। কি ভাবে একটু একটু করে ধীরে ধীরে গোটা রহস্যটা আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল তা জান্‌তে আপনাদের যদি কৌতূহল হয়ে থাকে তবে তা মেটাতে এখন আর কোন বাধা নেই। শুনুন—

"প্রথমে খবর পেলাম, দ্বারিক বাবুর সই-করা একখানা চিঠি দেখিয়ে অহিভূষণ চৌধুরী এটর্ণী অবিনাশ বাবুর কাছ থেকে সোনার হরিণ সরিয়ে নিয়ে গেছে—অথচ দ্বারিক বাবু দৃঢ়স্বরে বল্‌ছেন তিনি কখনই ও-চিঠিতে সই দেন নি। হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞ দুর্গাপ্রসন্ন বাবু কিন্তু আবার তেম্‌নি দৃঢ়স্বরেই বল্‌ছেন যে ও সই জাল নয়, নির্ঘাৎ দ্বারিক বাবুরই হাতের অক্ষর। তবে এ ব্যাপারের মানে কি? এ কথা আমায় আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে দ্বারিক বাবু সম্প্রতি চোখের অসুখে বড়ই ভুগ্‌ছেন, দৃষ্টিশক্তি বেজায় কমে এসেছে। তবে কি তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টির সুযোগ নিয়েই অহিভূষণ চৌধুরী কোন চাতুরী খেল্‌ল নাকি? আপনারাই বলুন, ঠিক এই ধরণেরই একটা সন্দেহ সকলের মনেই আসা উচিত ছিল কিনা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কারো মনেই আসে নি। টাইপ-করা চিঠিখানা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের নীচে ফেল্‌তেই দেখ্‌লাম, যা ভাবা গেছে অবিকল তাই। বিশেষজ্ঞেরা নিজেদের বিষয়টা বেশ ভাল বোঝেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে একটু বিশেষ অজ্ঞই থেকে যান। দুর্গাপ্রসন্ন বাবু যদি সইটা নিয়েই উঠে পড়ে না লেগে সই-এর ওপরেও একটু দৃষ্টি দিতেন তবে তাঁর ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস নিশ্চয়ই তাঁকে দেখিয়ে দিত যে সেখানে পাশাপাশি সমস্ত কাগজটা ব্যেপে বেশ একটা অস্পষ্ট দাগের ছাপ রয়ে গেছে। খালি চোখে কিছুই নজরে আসে না সত্যি, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ইরেজার দিয়ে কি একটা জিনিষ আগাগোড়া ঘষে তুল্‌বার চেষ্টা হয়েছে। চিঠির রহস্য তখন ভেদ হয়ে গেল—অহিভূষণ চৌধুরী নিশ্চয়ই কাগজে চিঠিখানা টাইপ করে, লম্বায় ছোট অথচ চওড়ায় ঠিক ওই মাপেরই আর একখানা কাগজ হাল্কা আঠায় তার ওপর জুড়ে দিয়েছিল—১ম চিঠির নীচের অংশ বাইরে রেখে। দ্বিতীয় চিঠিখানায় লেখা হয়েছিল ব্যবসা-সংক্রান্ত অন্যান্য সব কথা—দ্বারিক বাবু

সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নীচে সই করেছেন, আর সে সই পড়েছে গিয়ে প্রথম চিঠির ওপর। তাই দেখিয়ে অহিভূষণ সোনার হরিণ আদায় করে নিয়েছে। এ ছাড়া আর কি অর্থ হতে পারে ও দাগটার আমায় আপনারা বুঝিয়ে দিন!

"তার পর অহিভূষণ চৌধুরীর অন্তর্দ্ধানের কথা। দ্বারিক বাবুর বাড়ীতে অনেকেরই ধারণা ঘরে বসে কাজ কর্‌তে কর্‌তে সে হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে, কেননা তার টেবিলের ওপর খোলা খাতা, কাগজ-পত্র, লালনীল পেন্সিল সমস্তই পড়ে রয়েছিল। কল্‌কাতা ফেরবার সময় ওগুলো রোজই সে ড্রয়ারে বন্ধ করে যেত। সেদিন দিনের শেষে সে বাড়ী ফিরে যাবার পর কই ওগুলো তো কেউ টেবিলের ওপর পড়ে থাকৃতে দেখে নি! তবে পর দিন সে কাজে বাস্তবিক না এসে থাক্‌লে ড্রয়ার থেকে ওগুলো কে বার করলে? তার ড্রয়ারের চাবি তো আর অপর কারো কাছেই থাকে না! কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে পরের দিন সে আদবেই দ্বারিক বাবুর বাড়ী আসে নি, শুধু তার অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে লোকের মনে সম্পূর্ণ একটা মিথ্যে ধারণা জন্মিয়ে তাদের ভুল পথে চালিত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক অহিভূষণ সেদিন সকালে এসেছিল কি আসে নি তা কিন্তু অতি সহজেই পরখ্ করা চল্‌তে পারে। আসলে না এসেও লোকের চোখে ধুলো দিতে হলে তার পক্ষে সব চেয়ে সহজ পন্থা ছিল একটি; আগের দিনে বাড়ী ফেরবার সময় জরুরী খাতাপত্তর গুলি খোলা-অবস্থায় টেবিলের ওপর রেখে, টেবিলটাকে একটা গাঢ় রংয়ের চাদরে ঢেকে রেখে যাওয়া। তার ঘরখানা এম্‌নি জায়গায় যে দুপুরের খটখটে রোদেও সেখানে যেন একটু অন্ধকার-অন্ধকার ভাব লেগেই আছে, বেলাশেষে তো কথাই নাই। এ অবস্থায় বেলা পড়ে এলে ঘোর রংয়ের একখানা চাদরে যদি টেবিলের ওপরকার খোলা খাতাপত্তরগুলোকে ঢেকে রেখে যাওয়া যায়, তবে কারোই নজর সেদিকে পড়্‌বার কথা নয়। যে চাকরটা সে ঘর পরিষ্কার করে, যাবার সময় তাকে বলে গেলেই হ'ল যে সকালবেলা এসেই চাদরখানা সে যেন সরিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য এ ছাড়া আরও একটা পন্থা যে ছিল না, তা নয়। চাকরটাকে কিছু বখ্‌শিশ কব্‌লে তারই হাতে ড্রয়ারের চাবিটা সে রেখে যেতে পারৃত, বন্দোবস্তটা হ'ত এই যে, সকালবেলা এসে ড্রয়ার খুলে খাতাপত্তরগুলো সে-ই টেবিলের ওপর খুলে রেখে দেবে। কিন্তু শেষের চাইতে আগের মৎলবটাই যে বেশী সোজা তা বোধ হয় আপনারা স্বীকার কর্‌বেন। চাকরটার হাতে 'পান খেতে' আনা চারি পয়সা দিয়ে আমি যদি বলি 'ওরে, কাল আমার আস্‌তে একটু দেরী হতে পারে, আর সবাই কিছু টের পাবার আগে তুই টেবিলের ওপরকার এই চাদরটা সরিয়ে নিয়ে যাস্ তো!' তা হলে তার মনে গুরুতর কোন রকম সন্দেহ হওয়ার কথা নয়—বড় জোর ভাব্‌বে, কর্ত্তা কড়া লোক, বাবু দেরী করে এসেছেন শুন্‌লে হয়তো রাগ কর্‌বেন, তাই তাকে ওকাজ কর্‌তে বলা হচ্ছে, যাতে সবাই বুঝতে পারে তিনি সময় মত

এসেই কাজে বসেছিলেন, হঠাৎ কোথায় উঠে গেছেন। কিন্তু তার হাতে জরুরী দলীলপত্রের চাবি দিয়ে গেলে স্বভাবতঃই মনে তার বিশ্রী রকমের সন্দেহ এসে যাবে, হয়তো ভবিষ্যতে বিপদে পড়্‌বার ভয়ে চাবি নিতেই সে রাজী হবে না, উল্টে পাঁচ জনের কাছে তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করে দেবে। আর তা ছাড়া কর্ত্তার গোপনীয় কাগজপত্র যে ড্রয়ারে রয়েছে তার তালায় সে চাবি লাগাতেই বা যাবে কোন্ ভরসায়, কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেলে যে একদম্ শ্রীঘর-বাস। অহিভূষণ চৌধুরী তখন তার হয়ে সাক্ষী দিতে আস্‌বে নাকি? রামচন্দ্রঃ!

"এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে ঠিক কর্‌লাম, আমার এ অনুমান ঠিক কিনা গোড়াতেই সেটা পরখ্ করে দেখ্‌তে হবে; অনুমান যদি ঠিক হয় তবে অন্ধকারের ভেতর অনেকটাই আলোর রেখা যে ফুটে উঠ্‌বে তা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার কর্‌বেন। অনুমান মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হলে, অবশ্য অন্য পথে এগুনো দরকার হয়ে পড়্‌বে।

"যে ঘরটায় বসে কাজ কর্‌তে কর্‌তে অহিভূষণ চৌধুরী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলে প্রকাশ, আমরা তখন সেই ঘরটাতেই দাঁড়িয়ে—আমি রণজিৎ বাবু, দ্বারিক বাবু আর আপনি সন্তোষ বাবু, মনে পড়ে? হঠাৎ দ্বারিক বাবু এমন একটা প্রশ্ন করে বস্‌লেন যাতে আমার কাজ অর্দ্ধেক এগিয়ে গেল। ক'দিন ধরে ঘরটায় ঝাঁট না পড়ায় মেঝেতে বেজায় ধুলো জমে রয়েছিল, তিনি রাগতঃ স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'এ ঘর পরিষ্কারের জিম্মা কার ওপর?' জবাব পেলেন—চাকর কালীচরণের ওপর। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলে উঠ্‌লেন, 'ডাক সে হতভাগাকে আমার কাছে।'

"দূর থেকে কালীচরণকে আস্‌তে দেখেই আমি মনে মনে আমার কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেল্লাম—লোকটাকে ভাববার জন্য একটুও সময় দেওয়া হবে না; কাছে আস্‌তেই এম্‌নি দৃঢ় ভাবে প্রশ্ন করে বস্‌ব যাতে সে মনে মনে বুঝ্‌তে পারে আমি সব কথা আগাগোড়া জানি, আমার কাছে কোন জিনিষ চেপে রেখে ফল হবে না। সে ঘরে ঢুক্‌তেই তীব্র ভাবে তার মুখের পানে তাকিয়েই একেবারে সোজা প্রশ্ন করে বস্‌লাম, "'কোথায় রেখেছ সে চাদরটা?' কালীচরণ থতমত খেয়ে গেল, কিছুই অস্বীকার কর্‌তে সাহস পেলে না, বল্লে, 'আছে, আমারই ঘরে।' যাক্ আমার অনুমান তা হলে মিথ্যে হয় নি, অঙ্ক শুদ্ধ হয়েছে, ফল মিলে গেছে: তাকে বল্লাম, 'যাও, সেটা নিয়ে এস গে'। আসলে কিন্তু চাদরটার চেহারা দেখ্‌বার জন্যই যে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল, তা নয়; অন্য মৎলব ছিল। তাকে সকলের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে আরও গুটিকয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে। চাদর আনবার উদ্দেশ্যে যেই সে বাইরে এসেছে অম্‌নি আমিও তার পেছু পেছু এসে প্রশ্ন কর্‌লাম, 'সেদিন অহিভূষণ বাবু তাঁর টেবিলের নীচে কতগুলি ছেঁড়া কাগজ দেখিয়ে বলেছিলেন, এগুলো খবর্দ্দার ফেলে দিও না, এই ঘরের দরজার গোড়ায় জমা করে রে'খ, কেমন ঠিক নয় কি?'

"'আজ্ঞে হাঁ বাবু মশাই।'

"'আর সেই ছেঁড়া কাগজের ভেতর একটা মুখ খোলা আস্ত খামও ছিল, কেমন?'

"'আজ্ঞে হাঁ, তাও ছিল, মনে পড়্ছে।'

"ব্যস্, আরও খানিকটা আলোর সন্ধান মিল্ল, অহিভূষণের চরিত্র সম্পূর্ণ বোঝা গেল। কেউ তাকে শাসিয়ে কোন চিঠিই লেখে নি, সে নিজেই দ্বারিক বাবুর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে সোনার হরিণ গাপ্ করেছে; তার পর যাতে কাল্পনিক একটা দলের ওপর সকলের সন্দেহ পড়ে সেই মৎলবে ওই ভয়-দেখানো চিঠিখানা লিখে সেটাকে এমন জায়গায় রাখ্বার বন্দোবস্ত করে গেছে যাতে তার খোঁজ কর্তে গেলেই চিঠিখানা নজরে আসে। নতুবা শুনেছেন কখনো যে ওরকম চিঠি মানুষ অত তাচ্ছীল্য করে ফেলে দেয়? ঘরের দোরে পাওয়া গেছে শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে ওটা ইচ্ছাকৃত।"

(ক্রমশঃ)

ছোটদের চিত্রশালা

"এসগো জননি, দীন বঙ্গে,
দেহে দেহে মনে মনে
গেহে গেহে বনে বনে
স্নেহময়ী ঋতুরাণী-সঙ্গে।"

(কবিশেখর কালিদাস রায়)

আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র

মণি-মঞ্জুষা

(এই বিভাগে পৃথিবীর নানা ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলি সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া হবে।)

মুদ্রারাক্ষসম্

(শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-সি-এস্)

'মুদ্রারাক্ষস' সংস্কৃত-সাহিত্যের একখানা বিখ্যাত নাটক। নাটকটির রচয়িতার নাম বিশাখদত্ত। তিনি ছিলেন এক রাজপরিবারের ছেলে। মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান সহায় চাণক্য ও নন্দবংশের শেষ রাজার মন্ত্রী রাক্ষস—এই দু'জনার কূটবুদ্ধির প্রতিযোগিতা নিয়ে এই নাটক খানা রচিত হয়েছে, অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়েছেন চাণক্য। নাটকের গল্পাংশ খুব সংক্ষেপে বল্তে গেলে এই রকম:—

চাণক্যের অসাধারণ বুদ্ধির জোরে এবং পর্ব্বতেশ্বর নামে আর এক রাজার সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদ করে রাজধানী পাটলীপুত্র দখল কর্লেন। নন্দরাজের মন্ত্রী ছিলেন রাক্ষস; যেমন তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, তেম্নি অসীম প্রভুভক্তি। যে করেই হোক, প্রভু-হন্তা চন্দ্রগুপ্তকে তিনি নিপাত করবেন—এই হ'ল তাঁর মৎলব। নিজ পরিবারকে চন্দনদাস নামে এক মণিকারের আশ্রয়ে রেখে নানান্ ফিকির তিনি খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই পণ্ড করে দেয় চাণক্যের কুশাগ্রবুদ্ধি। শেষে রাক্ষসের এক ফিকিরের জবাবে চাণক্য এম্নি এক চাল চাল্লেন যে তাতে চন্দ্রগুপ্তের কোন অনিষ্টই হ'ল না, মারা পড়্ল পর্ব্বতেশ্বর। পর্ব্বতেশ্বরকে চাণক্য বরাবরই চন্দ্রগুপ্তের পথের কাঁটা বলে মনে করে আস্ছিলেন, কেননা তাঁর সঙ্গে গোড়া থেকেই এই বন্দোবস্ত ছিল যে পাটলীপুত্র দখলে এলে রাজ্যের অর্দ্ধেক তাঁকে দিতে হবে। অবশ্য, চাণক্যের পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড নীতিবিগর্হিত কৃতঘ্নতা হল সন্দেহ নাই, তবে সে যাই হোক্, নাটকে যেমন আছে তেম্নি বলে যাচ্ছি। পথের কাঁটা দূর হওয়া মাত্র চাণক্য প্রজাদের মধ্যে রটিয়ে দিলেন যে পর্ব্বতেশ্বরকে হত্যা করেছেন রাক্ষস—উদ্দেশ্য রাজ্যের লোকেদের কাছে নিজেদের সুনাম বজায় রাখা। এদিকে আবার সেনাপতির ভাই ভাগুরায়ণকে দিয়ে পর্ব্বতেশ্বরের পুত্র মলয়কেতুকে গোপনে বলালেন যে, তার বাপকে হত্যা করেছে রাক্ষস নয়, চাণক্য; উদ্দেশ্য, মলয়কেতু ভয় পেয়ে অর্দ্ধরাজ্যের দাবী-দাওয়া ছেড়ে পালাবে। মলয়কেতু পালিয়ে রাক্ষসের কাছে চলে এল; তার পর দু'জনে মিলে যুদ্ধের আয়োজন করলেন—চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন আরও পাঁচ জন রাজা। চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তের বল-ভরসা, কাজেই রাক্ষসের চেষ্টা হ'ল চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কোন গতিকে

চাণক্যের বিরোধ ঘটিয়ে দেওয়া। চাণক্য কিন্তু রাক্ষসের গুণমুগ্ধ, তাঁর উদ্দেশ্য, অন্যান্য সমস্ত শত্রুদের নিপাত করে শেষ পর্য্যন্ত রাক্ষসকেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে একদিন তিনি তাঁর সঙ্গে একটা মিথ্যা ঝগড়ার ভাণ (কপট কলহ) করলেন, রেগে তাঁর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন। শুনে তো রাক্ষস খুব খুসী।

এদিকে রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিরূপে পেতে হলে তাঁর সঙ্গে মলয়কেতুর বিরোধ ঘটানো দরকার—চাণক্য এইবার তাঁর কৌশলের জাল বিস্তার করলেন। তাঁরই বাল্যবন্ধু ইন্দুশর্ম্মা সন্ন্যাসীর বেশে 'জীবসিদ্ধি' নাম নিয়ে রাক্ষসের কাছে গিয়ে তাঁর বন্ধুভাবে রইল। চাণক্যের গুপ্তচর নিপুণক বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে বেড়াত, অন্দরমহলেও তার গতি ছিল। একদিন মণিকার চন্দনদাসের বাড়ীতে সে গান গাইছে, এমন সময় রাক্ষসের এক ছোট ছেলে বাইরে এসে উপস্থিত। রাক্ষসের স্ত্রী তাড়াতাড়ি তাকে সাম্‌লাতে গেছেন, হঠাৎ তাঁর হাত থেকে রাক্ষসের নাম লেখা আংটিটি খুলে পড়ল। নিপুণক চুপিচুপি সেটি তুলে নিয়ে এসে চাণক্যকে দিলে, আর সেই সঙ্গে তাঁকে জানিয়ে দিলে যে পাটলীপুত্র সহরে রাক্ষসের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছে চন্দনদাস আর শকটদাস। শকটদাস ছিল এক 'কায়স্থ', অর্থাৎ তার কাজ ছিল চিঠিপত্র নকল করা। চাণক্য অম্‌নি একটা চিঠির খস্‌ড়া করে শকটদাসকে দিয়ে সেটা নকল করিয়ে আনালেন; তার পর সেই চিঠির উপর রাক্ষসের নাম লেখা আংটিটির ছাপ এঁটে সিদ্ধার্থক নামে তাঁর এক অনুচরের হাতে সেটা দিয়ে কানে কানে গুটি কয়েক কথা বলে দিলেন। তার পরেই শোনা গেল শকটদাসকে শূলে দেওয়া হবে, কেননা সে চন্দ্রগুপ্তের অশুভাকাঙ্ক্ষী। এদিকে কিন্তু গোপনে বন্দোবস্ত হল, শকটদাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ামাত্র সিদ্ধার্থক এসে তাকে উদ্ধার করে একেবারে রাক্ষসের কাছে নিয়ে হাজির করবে। তা হলে নিশ্চয়ই সে রাক্ষসের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠ্‌বে। ঠিক সেই ভাবেই কাজ হল। রাক্ষস মহা খুসী, একটু আগেই মলয়কেতু তাঁকে তিনটি অলঙ্কার উপহার দিয়েছিল. খুসীর বশে সেগুলি তিনি সিদ্ধার্থককে বখ্‌শিশ্‌ করে ফেল্লেন; বলা বাহুল্য তাকে নিজের কাছে আশ্রয়ও দিলেন।

এদিকে চাণক্য ভাগুরায়ণকেও গোপনে যথারীতি উপদেশ দিয়ে প্রকাশ্যে একটা দোষ দেখিয়ে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেন। সে চলে এল মলয়কেতুর শিবিরে। মলয়কেতু তাকে জানে নিজের প্রাণরক্ষক বলে, তাই সে সসম্মানে তাকে মন্ত্রীর পদ দিয়ে দিলে। এইভাবে রাক্ষস এবং মলয়কেতু শত্রুর চরে একেবারে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন। চাণক্য এবার আর এক চাল চাললেন, পর্ব্বতেশ্বরের তিনটি অলঙ্কার এক বণিকের সাহায্যে রাক্ষসের কাছে বেচে দিয়ে।

চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে শুনে রাক্ষস আরম্ভ করলেন যুদ্ধের

আয়োজন, আর সেই ফাঁকে ভাগুরায়ণ সুরু করলে রাক্ষসের ওপর মলয়কেতুর মন বিষিয়ে দিতে—এই, বলে যে তাঁর আসল উদ্দেশ্য মলয়কেতুর সাহায্য করা নয়, চাণক্যকে সরিয়ে নিজেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হওয়া।

যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয়েছে—ভাগুরায়ণের অনুমতি ছাড়া এখন আর কেউ মলয়কেতুর শিবিরে ঢুকতেও পারে না, শিবির থেকে বারও হতে পারে না। এইবার চাণক্যের অনুচরেরা তাদের আসল কাজ সুরু করল। হঠাৎ জীবসিদ্ধি বলে বস্‌ল তাকে শিবির থেকে চলে যেতে দেওয়া হোক্, কেননা রাক্ষস যখন মলয়কেতুর বাবাকে হত্যা করে তখনও সে কোন মতে সহ্য করেছিল কিন্তু এবার সে যে জঘন্য কাজে হাত দিয়েছে তাতে কোন মতেই সে আর এ সংশ্রবে থাকতে পারে না। মলয়কেতু শুনে থ হয়ে গেল—এই সে প্রথম শুন্‌ল যে তার পিতার হত্যাকারী রাক্ষস। ঠিক সেই সময়েই প্রহরীরা সিদ্ধার্থককে ধরে নিয়ে এল, সে নাকি বিনা হুকুমেই শিবির ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। তার কাছে পাওয়া গেল চাণক্যের রচনা করা সেই চিঠি; চিঠিখানা লেখা হয়েছে চন্দ্রগুপ্তের উদ্দেশ্যে, আর তাতে আছে রাক্ষসের আংটির শীল মোহর। সে চিঠিতে লেখা—সাহায্য করার ছুতো নিয়ে যে পাঁচ রাজা এসেছে, তারা মলয়কেতুর মহাশত্রু—কেউ তার রাজ্যলোভী, কেউ বা অর্থলোভী। সিদ্ধার্থকের কাছে আরও পাওয়া গেল রাক্ষসের দেওয়া সেই অলঙ্কারগুলি। সে মার খেয়ে বেমালুম বলে বস্‌ল রাক্ষসই তাকে ওই চিঠি দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পাঠাচ্ছিল। মলয়কেতু ক্রোধে অস্থির হয়ে রাক্ষসের তলব করল। তিনি তখন যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন—দেখা গেল সেই ব্যূহে ওই পাঁচ জন রাজাকেই মলয়কেতুর দেহরক্ষী করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাক্ষসের গায়ে মৃত পর্ব্বতেশ্বরের অলঙ্কার! ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে তখনই মলয়কেতু সেই পাঁচ রাজাকেই কোতল করে ফেল্‌ল আর রাক্ষসকে দিল নির্ব্বাসন-দণ্ড। এই সুযোগে ভাগুরায়ণের দল মলয়কেতুকেও বন্দী করে ফেল্‌ল।

চাণক্যের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, দ্বিতীয়টি বাকী। তিনি ইতিপূর্ব্বে চন্দনদাসকে বন্দী করে রেখেছিলেন। রাক্ষস মনের দুঃখে আত্মহত্যাই করতেন, কেবল চন্দনদাসের কথা ভেবে নিরস্ত হলেন। পাটলীপুত্র সহরের একটা পুরানো বাগানের ভেতর তিনি এসেছেন, এমন সময়ে চাণক্যের নির্দ্দেশমত দড়ি হাতে একটা লোক যেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে এমনি ভাব দেখিয়ে রাক্ষসের প্রশ্নের জবাবে বল্‌লে, "রাক্ষসের পরিবারের খবর দিচ্ছে না বলে চন্দনদাস শূলে যাচ্ছে; তার প্রাণের বন্ধু বিষ্ণুদাস সেই শোকে পুড়ে মরবে, বিষ্ণুদাসের বিচ্ছেদ সওয়ার চাইতে আমার পক্ষে মরণই ভাল।" এই কথা কানে যাওয়ামাত্র রাক্ষস ছুটে চলে এলেন বধ্যভূমিতে। খবর পেয়ে স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্যও এসে উপস্থিত।

চন্দ্রগুপ্ত সবিনয় রাক্ষসকে প্রণাম কর্‌লেন; চাণক্য রাক্ষসের শতমুখে প্রশংসা করে অবশেষে বল্‌লেন, চন্দনদাসকে মুক্তি দিতে পারি, যদি আপনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করেন। রাক্ষসের চিত্ত বিগলিত হয়ে গেল—তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন। মলয়কেতু অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি পেল।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রহিকাদের লেখা

গাঁজাখুরী

(শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়)

আরে আরে বিপিন কাকা, একটা কথা একটু শোনো—
ওরে ভজা, তামাক দে' যা,—একটু ব'সো যাচ্ছো কেন?
আরে খুড়ো, আজকে ভোরে নীলমণিদের পুকুরপাড়ে
রান্না সুরু কর্‌ল কে এক—সারা পুকুর আগুন ধরে।
আরে কাকা, হাস্‌ছ যে হে? একটুখানি আরও শোনো,
এমনি মজা! শুনলে পরে অবাক্ হ'বে, সত্যি জেনো।
পুকুর-জলে আগুন লাগায় মাছগুলো সব উঠলো গাছে
কার আগে কে উঠ্‌তে পারে, তাকায় নাকো একটু পাছে!
আরে খুড়ো, দেখ্‌তে যদি মাছেদের সে ছুটোছুটি!
সত্যি বল্‌ছি ভূঁয়ে পড়ে খেতেই হ'ত লুটোপুটি।
এমনি ধারা কাণ্ড কাকা, বলেছিলুম সতুর কাছে
বল্লে সতু, "মাছ কি গরু, আগুন লেগে উঠ্‌বে গাছে?"

এক মিনিট

(শ্রীমল্লিকা দেবী)

বিশ্ববিখ্যাত কবি কীট্‌স্ মারা যান মাত্র ২৬ বছর বয়সে, কবি শেলীও প্রায় ঐ রকম বয়সেই। উইলিয়াম্ পিট্ ২৪ বছর বয়সে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। হেনরি পার্কার ১৮ বছর বয়সে আলকাৎরা থেকে নকল রং আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন।

চিঠিপত্র

রামধনুর পাঠক-পাঠিকারা,

চিঠিপত্র বিভাগের জন্য এবার তোমরা অনেকেই চিঠি লিখেছ এবং তোমাদের মতামত জানিয়েছ। এ খুবই সুখের কথা।

শ্রীনৃপেন্দ্র গুহ এবং শ্রীদেবব্রতরঞ্জন মুখার্জ্জি প্রস্তাব করেছেন—রামধনুর সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নগুলি গ্রাহকেরাই করবেন, এবং গ্রাহকেরাই পরের মাসে তার জবাব দেবার চেষ্টা করবেন। প্রশ্ন করার সময় এটা মনে রাখতে হবে যে উত্তর দেওয়া সম্ভব এমন প্রশ্নই করা উচিত, নইলে কতকগুলি অদ্ভুত, আজগুবি প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না।

মাঘের চিঠিপত্র বিভাগের দ্বিতীয় প্রশ্নটির অনেকে জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। 'বাঙ্গালী মাছ খায় কেন' সে সম্বন্ধে শ্রীমতী উমা চট্টোপাধ্যায়ের জবাবটি ভাল। সাধারণতঃ দেখা যায় কোন দেশের লোকেদের আচার-ব্যবহার, খাওয়া-পরার রীতি সে দেশের ভৌগোলিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। বাংলা নদীমাতৃক দেশ—কাজেই এখানে মাছ প্রচুর পাওয়া যায় এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশী পাওয়া যায়। কাজেই বাঙ্গালীরা সহজেই যে মাছের ভক্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? টুপি সম্বন্ধেও এ কথাটা কিছু খাটতে পারে। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ও নানা দিক্ দিয়ে প্রশ্নটির আলোচনা করেছেন।

শ্রীলেখা গুপ্তা গেল বারে "ডাকটিকেটের গল্পে"র সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটির নাম জানিয়েছেন। তিনি কবি কোলরীজ।

শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত জানতে চেয়েছেন—ভারতবর্ষে পঙ্গপাল আছে কি না। এর উত্তরে লেখক জানিয়েছেন—আছে; পঙ্গপালের উৎপাত আমাদের দেশেও অনেকবার হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতে শলভের উৎপাতের কথা পাওয়া যায়—শলভ পঙ্গপালেরই নাম। উড়িষ্যায়ও পঙ্গপাল দেখা যায়, তাদের বলে 'ঝিন্টিকি'। আরাকানে, ব্রহ্মদেশে পঙ্গপাল হামেশাই দেখা যায়।

এ মাসে রামধনুর পৃষ্ঠাসংখ্যা অনেক বাড়িয়েও সব ক'টা বিভাগের জায়গা করা গেল না। এবার একটা নতুন বিভাগ খোলা হ'ল। এই বিভাগে পৃথিবীর নানা ভাষার সেরা সেরা বইগুলির পরিচয় দেওয়া হবে। আপাততঃ এই বিভাগটির নাম রাখা হ'ল "মণিমঞ্জুষা"—মঞ্জুষা হচ্ছে যাকে তোমরা বল 'কাস্কেট'। তোমরা যদি বিভাগটির এর চাইতেও ভাল কোন নাম ঠিক করতে পার তবে জানিও।

—রাঃ সঃ

সন্দেশ

পৃথিবীতে ভূমিকম্প, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির আর কামাই নাই। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল বন্যা হইয়া শত শত লোক প্রাণ হারাইয়াছে। এমন ভীষণ বন্যা নাকি আজ পর্য্যন্ত সেখানে কমই হইয়াছে।

* * *

পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত ভূমিকম্পের

(এবং আগ্নেয়গিরির উৎপাতের) স্থান ও সময় দেওয়া গেল—

পম্পিয়াই	৭৯ খৃষ্টাব্দে	ইটালি	১৯২০
লিসবন্	১৫৩১ ও ১৭৫৫	জাপান	১৯২৩
ক্রাকাটোয়া	১৮৮৩	ক্যালিফোর্ণিয়া	১৯৩৩
সানফ্রানসিস্কো	১৯০৬	বিহার	১৯৩৪
		কোয়েটা	১৯৩৫

* * *

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেষ্ট্ ম্যাচ সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। তোমাদের মনে আছে ১ম দু'টি টেষ্টে ইংলণ্ড জয়লাভ করার পর তৃতীয় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন ব্র্যাড-ম্যানের অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে। ৪র্থ টেষ্টেও ব্র্যাড্ম্যান্ আবার তেমনি খেলা দেখাইয়াছেন। এবারেও এক ইনিংস্-এই তিনি ২১২ রান্ করেন। ফলে ইংলণ্ড ১৪৮ রানে হারিয়া গিয়াছে।

* * *

এদিকে কলিকাতায় ও বোম্বাইএ আন্ত-প্রাদেশিক ক্রিকেট খেলা (রণজী ট্রফী) হইয়া গেল। বাংলা প্রথম রাউণ্ডে বিহার, ২য় রাউণ্ডে মধ্য ভারত এবং সেমিফাইনালে হায়দ্রাবাদকে হারাইয়া ফাইনালে উঠিয়াছিল। ফাইনালে নবনগরের সহিত খেলা হয়। এই খেলা কলিকাতায় হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেখানে না হওয়ায় বাংলার দু'টি ভাল ভাল খেলোয়াড় উহাতে যোগ দিতে পারেন নাই, তা ছাড়া বাংলার শ্রেষ্ঠ বোলার এস্, ব্যানার্জ্জী (যিনি ভারতের হইয়া বিলাতে খেলিতে গিয়াছিলেন) নবনগরের অধীনে চাকুরী করেন বলিয়া নবনগরের রাজা তাঁকেও বাংলার হইয়া খেলিতে দেন নাই। ফাইনালে নবনগর ২৫৬ রানে জয়লাভ করিয়াছে।

* * *

খেলাধূলায় পৃথিবীর কয়েকটি রেকর্ড্ নীচে দেওয়া গেল—

১০০ গজ দৌড় জে, ডোনাল্ডসন ৯ ৩/৮ সেকেণ্ডে;
২২০ „ „ জে, ওয়েন্স্ ২০ ৩/১০ সেকেণ্ডে;
৪৪০ „ „ বি, ইষ্টম্যান্ ৪৬ ২/৫ সেকেণ্ডে;
৮৮০ „ „ বি, ইষ্টম্যান্ ১মিঃ ৪৯ ৪/৫ সেকেণ্ডে;
১ মাইল „ জি,কানিংহাম্ ৪মিঃ ৬ ৪/৫ সেকেণ্ডে
মোটর চালনায় এম্, ক্যাম্প্বেল এক ঘণ্টায় ৩০১' ১৩ মাইল;
হাই-জাম্পে সি, জনসন্ ও ডি, আলব্রিটন্ ৬ ফুট ৯ ৩/৪ ইঞ্চি
লং-জাম্পে জে, ওয়েন্স্ ২৬ ফুট ৮ ১/৪ ইঞ্চি
পোল-ভল্টে জি, ভারফ্ ১৪ ফুট ৬ ১/২ ইঞ্চি
ক্রিকেটে (প্রথম শ্রেণীর) ডি, জি, ব্র্যাড্ম্যান্ ৪৫২ রান্ —নট্ আউট।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

Wood, highly, useful, carpentry, season, wood, consumption, mango, unseasoned wood, case, ashwood, highly, useful, wholesale, retail, business, important, business reliable, bearer, businessman, business, conduct, manage, capacity, forest, butterfly, peacock, black bear.

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

অনিল, খুকী, অরুণ (রাজসাহী); পাঁচুগোপাল ঘোষ (নওয়াপাড়া); প্রসূন রায় (নালন্দা); মনোতোষ রায় ও মা (ভবানীপুর); বিমলেন্দুনারায়ণ বিশ্বাস, বেণু, মীরা প্রভৃতি (ভবানীপুর); নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী); রত্না দেবী (পাটনা); খাটু, মুকুলভায়া ও বৌদি (ভবানীপুর); মনীষাকান্ত ঘোষ (লাহিরিয়া সরাই); অচলকুমার দত্ত (ভবানীপুর); কামাখ্যাপ্রসাদ খাঁ (শিলং); শচীন্দ্রচন্দ্র সেন (ভবানীপুর); সান্ত্বনা ঘোষ ও সাধনা ঘোষ (যশোহর); জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); সিতেন্দু গুপ্ত (পাটনা); সুনীলকান্তি সেন, বাবা ও মা (চাঁদপুর); রামপ্রসাদ সিং, কাটু, হীরেন প্রভৃতি (বেহালা); লীলা দাস (কুমিল্লা); পুষ্পলতা, বনলতা, প্রীতিলতা গোস্বামী প্রভৃতি (বেতিয়া); রামেন্দু ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ি); রণেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী)।

যাঁহাদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে—

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, নির্ম্মল প্রভৃতি (বালীগঞ্জ); দীনেন, ছোটদি, মা (নলহাটী); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); বালুরঘাট বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (বালুরঘাট); কল্যাণী, গীতা, আশা (ধুবড়ী); রথীন্দ্র, দীপ্তিভূষণ ও মঞ্জুভূষণ দত্ত (বালুরঘাট); নীলা মুস্তফী (আরা); স্থাণুবালা কর (কলিকাতা); বীণাপাণি সমিতির সভ্যবৃন্দ (বাঁকুড়া); ইরা, মীরা, সুশীল বিশ্বাস প্রভৃতি (কুমিল্লা); গোলাম ময়নুদ্দীন (রঙ্গপুর); ভবানী, শিবানী, কল্যাণী সরকার প্রভৃতি (ধুবড়ী); তরেন, তপেন, ডলিপলি (নিউদিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

১। **তিনের বাড়াবাড়ি**—তিন বছর বাদে মধুর বয়স মনুর বয়সের তিনগুণ হবে। মনুর বয়স এখন যা' আছে তা'র তিনগুণ হ'লে মনুর যত বয়স হবে, মধুর বয়স এখন তা'র তিনগুণ। কা'র বয়স এখন কত?

২। **পায়ের হিসাব**—বেজায় ভিড় থেকে বেরিয়ে কয়েকটি ছেলে এক জায়গায় জড় হয়েছে। তা'দের অনেকেই ভিড়ে চটি হারিয়েছে। একজন লোক তাদের পা দেখে বল্‌ল, "চারটি

ছেলের পায়ে চটি নাই ; তিনটির ডান পায়ে চটি আছে, দু'টির বাঁ পায়ে চটি আছে।" সব চেয়ে কম সংখ্যক কত ছেলেমেয়ে হ'তে পারে, যাদের মধ্যে থেকে ঐ রকমের হিসাব পাওয়া যেতে পারে ?

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

১। হারাকিরির মানে আত্মহত্যা—ধারাল অস্ত্র দিয়ে নিজের হাতে নিজের পেট কেটে ফেলে। প্রথম কোপটি দিতে হবে নিজেরই হাতে, পরে আর সাহসে বা ধৈর্য্যে না কুলোলে কোন বন্ধুর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। দেশের বা সমাজের পক্ষে কেউ অমর্য্যাদাকর অথবা ক্ষতিকর কোন কাজ কর্‌লে তাকে "হারাকিরি" কর্‌তে বলা হত, অথবা জনমত তার বিরুদ্ধে দেখে নিজেই সে হারাকিরি করে বস্‌ত। নিজের পক্ষে হানিকর কোন কাজ কর্‌লে, কখনও কখনও আবার দেশের কোন অমঙ্গল ঘট্‌লে—যেমন ধর রাজার মৃত্যু—দেশভক্তি বা রাজভক্তি দেখাবার জন্য লোকে ইচ্ছা করেও হারাকিরি কর্‌ত। সম্প্রতি হারাকিরি-প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে দু'চারটা হারাকিরির খবর যে না পাওয়া যায় তা নয়।

২। (ক) উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাধারণতঃ ডব্লিউ. সি. বোনার্জ্জি নামে পরিচিত (খ) লর্ড্‌ সিংহ (গ) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু (ঙ) মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য (চ) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (ছ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ ঘোষ ৩। অগ্নি-উপাসক পার্শিজাতির ধর্ম্মগ্রন্থ ৪। আগে উইকেটের সোজা বল এসে ব্যাট্‌স্‌ম্যানের পায়ে (অর্থাৎ প্যাডে) লাগ্‌লে ব্যাট্‌স্‌ম্যান "লেগ্‌ বিফোর উইকেট" নিয়ম অনুযায়ী আউট হ'ত, কিন্তু বাঁকা বল ব্রেক খেয়ে সোজা এসে প্যাডে লাগ্‌লেও কিছু হ'ত না। কাজেই ব্যাট্‌স্‌ম্যান বাঁকা বল দেখলেই দু' পায়ে ষ্টাম্প্‌ ঢেকে সে বল মারতে পারত। আজকাল বাঁকা বলও যদি ব্রেক্‌ খেয়ে প্যাডে এসে লাগে আর আম্পায়ার মনে করেন ব্যাট্‌স্‌ম্যানের পা ষ্টাম্প্‌ ঢেকে আছে, (অর্থাৎ ঢেকে না থাকলে বল ষ্টাম্পে লাগ্‌ত) তবে সে আউট্‌ হবে।

নিষ্পাপ বয়স

শিল্পী-শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১০ম বর্ষ } চৈত্র, ১৩৪৩ { ৩য় সংখ্যা

কেদার

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

নামটী কেদার তার, প্রাইমারী পাস
কঙ্কণ নগরেতে ছিল তার বাস।
শিশুকাল হ'তে লেখে কবিতা সে ঢের,
শব্দ বদল ক'রে 'যদুগোপালের'।
ভাবিত সে বসে বসে হায় কত দিন
হবে মধু হেম রবি অথবা নবীন।
সব কবি এসে মেশে তার কবিতায়
সত্যেন্দ্রের সাথে দাশরথি রায়।

২

ভাবের অভাব ঢাকে উৎসাহ তার,
সব কাব্যের লেখে উপসংহার।
'রৈবতকের' আর কতটুকু দাম!
কাব্য লিখিল তার 'ছাড়তক' নাম।
'ঝাঁঝরী' লিখিল স্মৃতি কাজরী, হোলির
'চিতাঞ্জলি' সে লেখে 'গীতাঞ্জলি'র।
যাত্রার পালা লেখে, খেলে পাশা-তাস
নামটী কেদার তার, প্রাইমারী পাস।

৩

তেঁতুলের তলে ব'সে রচে কত গান,
মানে তার না থাকুক, বাড়ে তার মান।
ঘাড় নাড়ি বেহালায় টানে যবে ছড়,
সব তার বোল্‌তারা সাজে যে ভ্রমর!
পাস্থ সে, না থাকুক ক্ষমতা চলার,
সহনীয় সেবক সে শিল্প-কলার।
পরিজন বকে তারে, সহে পরিহাস,
বীণা তার না বাজুক, বাণীর সে দাস।

দস্যুর দলে ভোমরা

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

৩

মন্ত্রণা-সভা

এই মাত্র ভোর হ'লো। প্রকাণ্ড পুরোনো বাড়িটার একতলার দোকানপাট এরই মধ্যে খুলতে আরম্ভ করেছে। দোকানে যারা ব'সে, তাদের অতি নিরীহ চেহারা, দোকানী হিসেবে তারা অতিশয় সৎ। দোকান ছাড়িয়ে কারো চোখ যদি ভেতরে পড়ে তা হ'লে দেখা যাবে বাঁধানো উঠোনের কলতলায় কেউ দাঁত মাজছে, কেউ চোখে জল ছিটোচ্ছে; ভেতরের বাড়ি থেকে শোনা যাবে কথার শব্দ, হাসির শব্দ, গানের টুকরো; আর বারান্দায় শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছে দুটো বাঙ্‌লা কুত্তা। সহরের হাজার-হাজার বাড়িতে যেমন অতি সাধারণ ভাবে দিনের আরম্ভ, এখানেও ঠিক তেমনি।

এ বাড়ির তেতলায় যে একটি ঘর আছে, রাস্তা থেকে, কি বাইরে থেকে তা নজরে আসে না। ছাদের উঁচু কার্নিশ আড়াল করেছে এই ছোট নীচু ঘরখানা। সেই ঘরে, ভোরের প্রথম আলোর দিকে পিঠ দিয়ে শিবু সর্দার ব'সে আছে তাকিয়া ঠেস দিয়ে তক্তপোষে, আর তার দু'দিকে গণ্‌শা আর মাণকে। এতক্ষণ তাদের মধ্যে একটা কথা চলছিলো বুঝি, হঠাৎ কী কারণে থেমে গেছে।

একটু পরে হাবশির মত কালো একটা লোক ঘরে ঢুকলো তিন পেয়ালা চা আর একখানা খবরের কাগজ নিয়ে। সর্দার ছোঁ মেরে তুলে নিলে কাগজটা। তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে বললে, 'এই যে, বেরিয়েছে!'

অন্য দু'জন একসঙ্গে ব'লে উঠলো, 'দেখি, দেখি!'

সর্দারের কাঁধের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে ওরা বিজ্ঞাপনটা পড়লে:

'নিরুদ্দেশ কি অপহৃত

'আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ প্রীতিকান্ত মিত্র (ডাকনাম ভোমরা) গত কল্য শুক্রবার ইস্কুল হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। রমেশ মিত্র রোডের ১১এ নং বাড়ির কাছে তাহাকে শেষ দেখা গিয়াছিল। বয়েস বারো, পরনে ধুতি আর সার্ট, আনুমানিক চার ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, রোগা ও শ্যামবর্ণ, থুতনির উপর একটা কাটা দাগ আছে। তাহার বিধবা মাতা শয্যাগত। এই বালকের পুনরুদ্ধার যাহার কি যাহাদের দ্বারা সম্ভব হইবে তাহাকে কি তাহাদের আমি উপযুক্ত রকম পুরস্কার দিব। পুলিশ অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

শচীকান্ত মিত্র, এম্‌-এ, বি-এল্‌
য়্যাডভোকেট
৮৯।১২, প্রিয় মল্লিক রোড, ভবানীপুর।'

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ভোমরার ছবি।

একবার, দু'বার তিনবার ওরা বিজ্ঞাপনটা পড়লে, তার পর সর্দার কাগজটা সরিয়ে রেখে বললে: 'খুব চটপট দিয়েছে বিজ্ঞাপনটা। কাল রাত্রের মধ্যেই ওরা যা করবার সব করেছে।'

গণ্শা বললে, তা হ'লে…?'

'নে, এখন চা খা। কাল রাত্রে বুঝি ঘুমোতে দেয় নি ছোঁড়াটা?'

'আর বোলো না পাণ্ডাজি, আমি বললুম রাত্তিরেই পার ক'রে দিয়ে আসি, তা তোমার যে কী খেয়াল হ'লো!'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মাণ্কে বলতে লাগলো: 'শোনো তবে। তুমি তো সন্দেশের হুকুম দিয়ে গেলে চ'লে। এলো ঠোঙা-ভরা খাবার—খেয়ে-দেয়ে মেজাজটা ঠাণ্ডা কর্, তা তো নয়, ছেলের মুখে গাল-মন্দ ছাড়া কথা নেই। খায় আর সাপের বাচ্চার মত ফোঁসফোঁস করে। তার পর বলে—অন্ধকার হ'লো যে, আলো আলো! নিয়ে এলুম লণ্ঠন, নিয়ে এলুম একটা কম্বল আর বালিস, লম্বা হ'য়ে শুয়ে জুড়ে দিলে ভেউ-ভেউ কান্না। বাপ্‌রে এতও কাঁদতে পারে!'

'খুব জ্বালিয়েছে তো তোদের!' ব'লে শিবু সর্দার হঠাৎ হাঃ-হাঃ ক'রে হেসে উঠলো।

গণ্শা বললে, 'পাণ্ডাজি, ফূর্ত্তির কথা নয়। কান্না যদি বা থামলো, তখন বলে কী—তোমরা ঐ দরজার ধারে ব'সে থাকো, একা আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। ভয় করে না বুঝি? যদি একটু নড়ি, অমনি চীৎকার! রেগে বললুম, তবে কিন্তু তোকে বন্ধ ক'রে রাখবো দরজায় শেকল দিয়ে। যেই এ-কথা বলা, গলা আঁকড়ে ধ'রে কোলে চ'ড়ে বসে আর কি। কী মুস্কিল ভাবো তো!'

সর্দার হো-হো ক'রে আর এক কিস্তি হেসে উঠলো।—'আর তখনই বুঝি তুই ছুটে এলি আমার কাছে?'

'বলিহারি তোমাকে—হুকুম করলে, পালা ক'রে দু'জনে দরজার ধারে ব'সে থাক্। তোরা ছাড়া আর কেউ না।'

'আর কেউ ছিলো নাকি?'

'ক্ষেপেছো? তোমার মুখের কথায় কোন্ দিন ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলবো তারই আশায় আছি, আর এ তো সামান্য কথা। এক ফোঁটা ঘুমিয়েছি নাকি রাত্রে?' দু'জনকেই সমানে জাগিয়ে রেখেছে।'

'ভারি মজা তো! তোরাই চোর, আবার তোরাই পাহারাওলা!'

গণ্শা বলতে লাগলো, 'একেবারে তেরজুরির পাহারাওলা, চোখের পাতা ফেলবার জো নেই। এই—তোমরা চুপ করলে কেন, কথা বলো, কথা না বললেই আমার ভয় করে। এই, বলো না কথা! তুমিই বলো পাণ্ডাজি, রাত জেগে-জেগে এই আলালের ঘরের দুলালের সঙ্গে কী-কথা আমরা কইতে পারি!'

'তা তোরা কী করলি?'

'আবোল-তাবোল ব'কে গেলুম, ছোঁড়া হাঁ ক'রে সব গিললে যেন চণ্ডীপাঠ শুনছে। মাণ্কে গান গায়, আমি শোলোক আওড়াই—হিজিবিজবিজ বিঙ্গিবাবা, সুন্দরবনে বাঘের থাব্া—তাই শুনে ছোঁড়া হেসে মরে আর কি! বলে, আরো বলো, ঘুম পাচ্ছে না। যদি বলি, এইবার ঘুমিয়ে পড়্, তক্ষুণি ফোঁস ক'রে উঠে বলে—উঃ কী বিশ্রী বালিস, কী কুটকুটে কম্বল! এ রকম বিছানায় আমি শুয়েছি নাকি কখনো যে ঘুম আসবে! হিজিবিজবিজ বিঙ্গিবাবা কোথায় থাকে? আমি বলি, গঙ্গেশ্বরীর মন্দিরে। কেমন দেখতে সে? ঠিক যেন বডম্-গডম্। কী খায় সে? ক্ষিদে পেলে খায় লবঙ্গি, আর খুসী হ'লে খায় চিমকিচাকড়ি। আর ছেলেটা হাসতে-হাসতে খুন। এমনি ক'রে রাত যখন দুটো বাজে বুঝি, তখন তিনি ঘুমোলেন। অনেক শক্ত শক্ত কাজ তোমার জন্যে করেছি পাণ্ডাজি, কিন্তু ছড়া কেটে খোকাকে ঘুম পাড়ানো—হাঃ-হাঃ-হাঃ!'

সর্দার বললে 'এখনো ঘুমুচ্ছে?'

মাণ্কে জবাব দিলে, 'ঘুমুচ্ছে। আরে এই তো আমরা উঠে এলুম। ছোঁড়ার ক্যারদানি কত—বলে, আমি ঘুমিয়ে পড়লে তোমরা চ'লে যেতে পারবে না ব'লে দিচ্ছি। যদি ঘুম ভেঙে যায়, এমন ভয় পাবো যে চ্যাঁচাতেও পারবো না। যাবে না তো ঠিক? উঃ, উনি আমাদের ব'লে দিচ্ছেন! তা ভাবলুম, দুটো-আড়াইটেই বাজলো, ভোর হ'তে আর দেরি কী, ব'সেই থাকি। চোরের তো আর ঘুমের বালাই নেই! আলো ফুটলো তবে তো আমরা উঠলুম। পাণ্ডাজি, এই ছোঁড়াকে তুমি বিদেয় করো আজই। কিছু পুষতে হয় তো ভালো দেখে একটা বিলিতি কুত্তা।'

চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে সর্দার বললে: 'জাতভাইয়ের জন্যে খুব বুঝি

মন কেমন করে তোদের ? তা বেশ তো, দিয়ে আসিস ওকে প্রিয় মল্লিক রোডের ঠিকানায় পৌঁছিয়ে—উপযুক্ত রকম পুরস্কারও পাবি।

'ঐ উপযুক্ত রকম কথাটা ঠাট্টা ক'রে বলে নি তো ?' ব'লে ঘোড়ার মত হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে উঠলো মাণ্কে।

গণ্শা বললে, 'পাণ্ডাজি, একটা কথা। আড়ালে থেকে এম্-এ বি-এল্ ডেভোকেট সায়েবকে নিঙড়ে নিলেই তো হয়। তার পর ধড়মুণ্ডু শুদ্ধু আস্ত ছেলের বেকসুর খালাস ! কী বলো, মেহনৎটা একেবারে মারা যাবে ?'

সর্দার বললে, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম।'

উৎসাহিত হ'য়ে বলতে লাগলো গণ্শা : 'লুটিশের ভাবখানা যে রকম দেখলুম, কাছাকাছি পেলেই দড়ি লটকাবে। আমি বলি, ঘেঁষে কাজ নেই। ছোঁড়াটা আছে তো থাক্। আমরা যদি ভালো মনে ক'রে ওকে ফিরিয়েও দিই, তা হ'লেও পুলিশ পেছু নেবে। ছোঁড়াটা তো আর বোবা নয় !'

'দরকার হ'লে বোবা ক'রে দেয়া যায়,' ব'লে উঠলো মাণ্কে।

শিবু সর্দার মাণ্কের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললে, 'দরকার হ'লে সবই করা যায় রে। তোর যে জিভ নেড়ে এত ঘন ঘন কথা বলছিস, সেটা ছিঁড়ে ফেলতেও বেশীক্ষণ লাগে না।'

মুখ লাল ক'রে চুপ ক'রে রইলো মাণ্কে। সর্দার বলতে লাগলো : 'তা হ'লে কাজের কথায় আসা যাক্। যা দেখছি, উকিল বাবুর কিছু খসলো : বেশী কিছু আশা করিস নে, হাজারখানেক হ'লেই ঢের।'

গণ্শা বললে, 'বলো কী পাণ্ডাজি ! কিছু না নিলেও তো পাঁচ হাজার ! এত বড় জাল আর তো ফেলি নি কখনো। কী লিখেছে দেখো না প'ড়ে—বিধবা মা তার সর্ব্বস্ব তো দেবেই।'

সর্দার মৃদুস্বরে বললে, 'না রে থাক্, এটা অল্পেই ছেড়ে দে। তোদের বখশিষটা হবে তো !'

সর্দারের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে গণ্শা বললে : 'তুমি যদি দয়াই করবে তা হ'লে এই আখড়া না খুলে মিশনের স্বামীজি হ'লেই পারতে।'

পাণ্ডাজি বললে : 'কেন রে, আমাদের মনে বুঝি দয়া হ'তে নেই ? আরে উকিলেরও মাঝে মাঝে দয়া হয় যে !—কী বলিস, মাণ্কে ?'

মাণ্কে মুখ নীচু ক'রেই বললে, 'আমি আর কী বলবো !'

'তুই-ই বল, মাণ্কে, দয়া হওয়াটা কি দোষের ? পেটের দায়ে এটা-ওটা করি, তাই ব'লে মানুষের শরীর তো !'

বাঁকা হেসে বললে গণ্শা ; 'তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, পাণ্ডাজি, শীগ্গিরই তুমি ফোঁটা-তিলক কেটে সমেসকৃত শোলোক আওড়াতে সুরু করবে। আসল কথাটা যদি বলি রাগ করবে না তো ?'

'বাপ্রে, সাধুবাবা হ'তে সাতজন্মের পুণ্য লাগে যে ! মুনফার ছড়াছড়ি, ভয় নেই এক ফোঁটা। ও সব কি আর আমাদের কপালে ! তা তোর আসল কথাটা কী, শুনি ?'

'তুমি বুঝেছো ছেলেটাকে কেটে ফেললেও এখানে বেশী কিছু বেরোবে না। একে কাকা, তায় উকিল—হাজার শুনলে বুঝি ফিটই হবে। ঐ পুলিশ-সায়েব দাদামশায়ের গল্পটা যে ফাঁকি তা তো বুঝেছো ?'

'বুঝেছিস সেটা ? দিন দিন তোর খুব বুদ্ধি হচ্ছে তো !'

'তোমার দয়ার ভাব দেখেই সেটা বুঝলুম। বড়ো শিকার ছেড়েছে কখনো শিবু সর্দার ! সেই যে রাজা মণিবর্দ্ধনের একখানা চিঠি হারিয়ে গেলো, সে চিঠির দাম উঠলো কিনা দশ হাজার ! একটি পয়সা কম তো ছুঁলে না ! মনে নেই ?'

'যার যত আছে সে তত দেবে', সংক্ষেপে বললে সর্দার।

'তা হ'লে কালকের ভুলটা আজ শুধরে ফেলি, কী বলো ?'

হঠাৎ মাণ্কে ব'লে উঠলো : 'ক্ষেপেছো ? আজ আবার ঐ পাড়াতেই ঢুঁ মারতে গেলে রক্ষে আছে ? পুলিশ কি কাণা ?'

'বেশ, বেশ, এতক্ষণ একটা কাজের কথা বললি, মাণ্কে। যা দেখছি, ও আশা ছাড়তে হ'লো।'

গণ্শা মুখ কালি ক'রে বললে, 'এত বড়ো একটা দাঁও ফসকালো ! তুমি ভয় পাচ্ছো সর্দার।'

'ভয় পেলেই যেখানে ভালো সেখানে সাহসের নাম বোকামি। প্রথমেই তোরা টেক্কা তুলতে পাঞ্জা তুললি—এখন আর কী হবে?'

গণ্শা খুব বিরস ভাবে বললে, 'তা হ'লে থাক্।'

'নে, এখন অন্য কাজে মন দে। আসামের এক বাচ্চা রাজা এসেছেন থিয়েটার রোডে, তাঁকে আমাদের কেলাবে নিয়ে আসতে পারিস তো মন্দ হয় না। ঘোড়দৌড়ে এর মধ্যেই নাকি লাখ খানেক উড়িয়েছেন, জুয়োতে ওঁর নেশা জম্বে। টাকার ছড়াছড়ি চারদিকে, ধরতে পারলেই হয়। কী বলিস, মাণ্কে!'

মাণ্কে মুখ তুলে মুচকি হাসলো; এতক্ষণে তার রাগ প'ড়ে এসেছিলো।

'চল্ ততক্ষণ বন্দীবীরকে একবার দেখে আসি'; ব'লে সর্দার উঠে দাঁড়ালো।

(ক্রমশঃ)

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

একবার হাতী পোষার বাতিক হয়েছিল আমার কাকার। সেই হাতীর সঙ্গেই একদিন তাঁর হাতাহাতি বেধে গেল। হাতীর শুঁড় এবং কাকার কান খুব বেশি দূর ছিল না—সুতরাং তার আসন্ন ফল কি দাঁড়াবে তা আমি এবং হাতী দু'জনেই অনুমান কর্‌তে পেরেছিলাম। কাকাও যে পারেন নি তা নয়, কিন্তু দুর্ঘটনা আর বলে কাকে! সেই কর্ণবধ-পর্ব্ব থেকে এই গল্পের সুরু।

কান গেলে মানুষের যা দুঃখ, অনেক সময়ে প্রাণ গেলেও ততটা হয় না। কান হারিয়ে কাকা ভারি মুষ্‌ড়ে পড়েছিলেন; দিনকতক। আশ্চর্য্য কিছু নয়! কর্ণহীন হ'লে অমন অনেকেই মুষ্‌ড়ে পড়ে।

কর্ণের বিপদ্ পদে পদে, এই কথাটাই কাকাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি। মহাভারত পড়েও জানা যায়, তা ছাড়া পাঠশালায় পড়্‌বার সময়ও আমি এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। হাড়ে-হাড়ে না ব'লে কানে-কানে বল্‌লেই ঠিক বলা হবে। কেননা কানের মধ্যে বোধ হয় হাড় নেই, থাক্‌লে ওটা অত সুখকর 'মল্‌তব্য' ব্যাপার হ'ত না।

কাকাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কাকা বোঝেন কিনা তিনিই জানেন। তত্ত্বকথা বোঝা সহজ কথা নয়। আর তা ছাড়া আমি তাঁকে বোঝাই মনে মনে, মুখ ফুটে কিছু বলার আমার সাহস হয় না। কাকা যা বদ্‌রাগী!

কাকাকে দেখ্‌লে আজকাল আমার ভয় হয়। কর্ণচ্যুত কাকা পদচ্যুত পাহারাওলার চেয়েও ভয়াবহ। আর তা ছাড়া যে রকম কটমট ক'রে তিনি আমার দিকে তাকান! আমার মুখের পানে বড় একটা না, কেবল কানের দিকে। ঐ দিকেই তাঁর যত চোখ, যত ঝোঁক আর যত রোখ্। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি আমার কর্ণসম্পদে তিনি ঈর্ষান্বিত। হাতীর হাত থেকে বাঁচিয়েছি, এখন কাকার কবল থেকে কি ক'রে কান সামলাই সেই আমার এক সমস্যা। কাকা একবার ক্ষেপে গেলে আমাকে নিজের দশায় আন্‌তে তাঁর কতক্ষণ?

তাই আমিও যতটা সম্ভব, দূরে থাকার চেষ্টা করি। নিতান্তই কাকার কাছাকাছি থাক্‌তে হলে মর্ম্মাহত হয়েই থাকি। এবং মনে মনেই তাঁকে সান্ত্বনা দিই।

অবশেষে একদিন সকালে কাকা অকস্মাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। "মন্‌টু—মন্‌টু—" আমার ডাক পড়ে।

কাকার কাছে দৌড়োই, কান হাতে ক'রে। এত যখন ডাক-হাঁক, কি সর্ব্বনাশ হয় কে জানে! প্রাণে মর্‌তে ভয় খাই না, কিন্তু কানে মারা যাবার ভয় আমার বড্ড।

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ? হয়েছে, সব ঠিক হয়েছে। আর ভাব্‌না নেই।" উৎসাহের আতিশয্যে কাকা উথ্‌লে ওঠেন। আমি চুপ ক'রে থাকি।

"বুঝেছিস্ কিছু?" কাকার প্রশ্ন হয়।

"উঁহু—" আমি দু' কান নাড়ি। ঘাড় নাড়্‌লেই কান নড়ে যায়, আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি।

"রামপুরহাট্ যাবো। টিকেট্ কিনে আন্ গে'। একটা ফুল্, একটা হাফ্। তুইও যাবি আমার সঙ্গে।"

"রামপুরহাট? হঠাৎ?" আমি বলে ফেলি।

"হঠাৎ আবার কি? সেইখানেই তো যেতে হবে।" আমার বিস্ময়কর প্রশ্নে কাকা যেন হতভম্ব হয়ে যান। "বামাক্ষেপার জীবনী পড়িস্ নি? আর পড়্‌বিই বা কবে! বুড়ো ধাড়ি হতে চল্লি কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা হ'ল না তোর! যত বলি, সাধুমহাত্মা যোগীঋষিদের জীবনী পড়্—তা না, কেবল ডাণ্ডাগুলি, লাট্টু আর লাটাই! যদি পড়্‌তিস্ তা হলে আর জিজ্ঞাসা কর্‌তিস্ না।"

আমি আর জিজ্ঞাসা করি না। মৌন দ্বারা কেবল সম্মতি নয়, পাণ্ডিত্যেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই শিক্ষাটা আমার হয়ে যায়। আর কথা বলে কোন্ হাঁদা! কাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই

আমাকে জ্ঞান দান করতে উদ্যত হন। "রামপুরহাটের কাছেই এক মহাশ্মশান আছে, জানিস? এই, দশ-বিশ মাইলের মধ্যেই। সেই শ্মশানে ব'সে কেউ যদি একটানা তিনলক্ষ বার কোন দেবতার নাম জপ করতে পারে তা হলেই নির্ঘাৎ সিদ্ধি। স্বয়ং বশিষ্ঠ মুনি বর দিয়ে গেছেন। আমার ঠাকুর্দার কাছে শোনা। সেখানেই যাবো আমি।"

"সেখানে কেন কাকা!" আমি একটু বিস্মিতই হই। সিদ্ধির জন্য অত কষ্ট করে অত দূর যাবার কি দরকার? রামপুরহাট না গিয়ে, রামশরণ তুবেকে বল্লে এখুনি তো এক বাটি বানিয়ে এনে দেয়! কোন হাঙ্গাম নেই! হ্যাঁ, সব তাতেই কাকার বাড়াবাড়ি!

আমার সিদ্ধি মেড্‌ইজির ভূমিকা পাড়্‌বার মুখেই কাকা উস্‌কে ওঠেন—"উহুঁহুঁ, সে সিদ্ধি নয়। ও তো খেতে হয়, খেলে আবার মাথা ঘোরে। এ সিদ্ধি পেতে হয়। বামাক্ষেপা, বারদির ব্রহ্মচারী এঁরা সব ঐ শ্মশানে ব'সে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন! ব্যাপারটা কি রকম জানিস্? আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা এই রকম জপ ক'রে যাবো; যেম্‌নি তিন লক্ষ বার পূরবে অমনি মা দুর্গা হাস্‌তে হাস্‌তে দশ হাত নেড়ে এসে হাজির হবেন। এসে বল্‌বেন—'বৎস, বর নাও—'"

আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনি—"সিদ্ধিও থাক্‌বে সাথে?"

"তখন আমি যা বর চাইব, বুঝেছিস্ কিনা, সঙ্গে সঙ্গে ফল্‌বে। তাকেই বলে সিদ্ধিলাভ। আমি যদি চাই আমার আরো দুটো হাত গজাতে পারে! হুম্! তৎক্ষণাৎ!"

শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়। চতুর্ভুজ কাকাকে আমি মনে মনে কল্পনা করি।

"কিন্তু আমি তো আর হাত চাইব না। হাত তো আমার আছেই। দুটো হাতই আমার পক্ষে যথেষ্ট। পায়েরও আমার আর দরকার নেই। দুটো পা-ই মোর্ দ্যান্ এনাফ্। আমি কেবল চাইব আর একটা কান। কান না হলে আমাকে মানায় না, আয়নার দিকে তাকানোই যায় না! তাই বুঝেছিস্ কিনা, অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম রামপুরহাট্! মন্ত্রবলে চারটে হাত কি চারটে পা যদি আমার গজাতে পারে তা হলে একটা মাত্র কান গজানো এমন আর কি?"

আমারও দারুণ বিশ্বাস হয়ে যায়। মন্ত্রবলে কত কি হয় শুনেছি, কান হওয়া আর কঠিন কি? কানেই যখন মন্ত্র দেয়, তখন মন্ত্রেও কান দিতে পারে। আশ্চর্য্য কিছু নয়! তিন লাখ বার কেবল দুর্গা কি কালী কি জগদ্ধাত্রী—এর যে কোন একটা নাম—উঁহু, জগদ্ধাত্রী বাদ—চার অক্ষরের মন্ত্র তার মধ্যে আবার দস্তুরমত দ্বিতীয় ভাগ—জগদ্ধাত্রীর তিন লক্ষ মানে দুর্গার ছ লক্ষের ধাক্কা! অনর্থক শক্তি বরবাদ্ আর সময়ের অপব্যয়! পয়সা না লাগুক্, কিন্তু দেবতার নামের রাজ্যে খরচ করতেও রাজি নই আমি।

"কাকা, আমিও তা হলে বর চেয়ে নেব, যাতে না পড়ে শুনে ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারি।"

আমি একটু ভেবে নিই, "কেবল পাশ করাই বা কেন, স্কলার-শিপ্‌টা নিতেই বা ক্ষতি কি? যে-বরে পাশ হয়, স্কলার-শিপ্‌ও তাতেই হতে পারে, কি বল কাকা? মা দুর্গার পক্ষে কি খুব শক্ত হবে তেমন?"

"বাঃ-রে! আমি মর্‌বো জপ ক'রে আর তুমি পাশ্ করবে না প'ড়ে? বাঃ-রে!" কাকা খাপ্পা হয়ে ওঠেন।

"তা হলে আমার গিয়ে আর কি হবে?" আমি ক্ষুণ্ণ হই। "তোমার সঙ্গে তবে নাই বা গেলাম আমি! আমার তো কানের অভাব নেই।"

"পাগল! তা কি হয়! তোকে যেতেই হবে। সিদ্ধিলাভ করা কি অতই সোজা? জপ্ কর্‌তে বস্‌লেই তুলে দেয় যে—"

"কে? পুলিসে?"

"উহুঁ। পুলিস্ সেখানে কোথা? শুন্‌ছিস্ মহাশ্মশান! বারো কোশের মধ্যে জনমনিষ্যি নেই।"

"ও, বুঝেছি! শেয়াল! বেশ, তোমার বন্দুকটা নিয়ে যাব—কাছে এলেই—দুম্!"

"শেয়াল নয় রে পাগ্‌লা, শেয়াল নয়! ডাকিনী-যোগিনী, ভূত-প্রেত, তাল-বেতাল—এরা এসে তুলে দেয়। সিদ্ধিলাভ করতে দেয় না।"

ভূত-প্রেত শুনেই আমি গেছি! তাল-বেতালের তাল আমাকেই সাম্‌লাতে হবে ভাব্‌তেই আমার হৃৎকম্প স্বরু হয়। "কাকা—কাকা—" কম্পিত কণ্ঠ থেকে কেবল কা কা-ধ্বনি বেরোয়; আর কিছু বেরোয় না।

"আরে, ভয় কিসের তোর! আমি তো কাছেই থাক্‌ব। গতিক স্থবিধের নয় দেখ্‌লে দুর্গা-পাল্‌টে রাম নাম জপ্‌তে লেগে যাব না হয়। রাম নামে ভূত পালায়! তবে রাম হচ্ছে খোট্টাদের দেবতা—তা হোক্ গে, রামও বর দিতে পারেন। সীতা উদ্ধার করেছিলেন আর একটা কান উদ্ধার করতে পারবেন না? তবে কিনা, দুর্গাই হ'লো গিয়ে মোক্ষম্! রামকেও দুর্গার কাছে বর নিতে হয়েছে।"

তথাপি আমি ইতস্ততঃ করতে থাকি।

"আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্। তুই-ই না হয় রাম নাম জপিস্—তা হ'লে তো তোর আর ভয় নেই। রামকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাশের ফিকিরও করে নিতে পারিস্ তো ক'রে নিস্। আমার কোন আপত্তি নেই। তা ছাড়া, দাঁতব্যথা, পেট কাম্‌ড়ানো, সর্দ্দি-কাশি, লঙ্কা খেলে হেঁচ্‌কি ওঠা—স্কুলের টাস্‌ক্ না হ'লে ডায়েরিয়া হওয়া—যত তোর ব্যায়রাম আছে সব সেরে যাবে রামের মহিমায়।"

পাশের কথায় আমার উৎসাহ সঞ্চার হয়। নতুন প্রস্তাবে কাকার সঙ্গে রফা ক'রে ফেল্‌তে দেরী হয় না আমার। সেই দিনই আমরা রওনা হই: সন্ধ্যার মুখেই রামপুরহাটে পৌঁছানো: কাকার বন্ধু এক ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে আবির্ভূত হই।

ডাক্তার ভদ্রলোক সে সময়ে এক ঘোড়ার দর করছিলেন। একজন গেঁয়ো লোক ঘোড়া বেচ্‌তে এসেছিল, দিব্যি খাসা ঘোড়াটি—আকার-প্রকারে তেজী বলেই সন্দেহ হয়।

প্রাথমিক কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পরই কাকা জিজ্ঞাসা করেন—"ঘোড়া কেন হে হারাধন?"

"আর বল কেন বন্ধু!" হারাধন-ডাক্তার দুঃখ প্রকাশ করেন, "দূর দূর সব গ্রাম থেকে ডাক আসে, সেখানে তো মোটর চলে না, গোরুর গাড়ীর রাস্তাও নেই অনেক জায়গায়.—সেস্থলে ঘোড়াই একমাত্র বাহন।" অদূর-স্থিত সাইকেলের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে—"ওতে চেপে আর পোষায় না ভাই! হাঁপিয়া হয়ে যাবার যোগাড়! তাই দেখে শুনে একটা ঘোড়াই কিন্‌ছি।"

"বেশ করছ, বেশ করছ!" কাকা অন্তর থেকে ওঁকে সমর্থন করেন—"স্বদেশী ঘোড়া থাক্‌তে বিদেশী সাইকেল কেন হে! ঠিকই বুঝেছ এতদিনে! তা, তোমার ঘোড়াটিকে বেশ শান্তশিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে!" কাছে গিয়ে কাকা ঘোড়ার পিঠ চাপ্‌ড়ে প্রবল সার্টিফিকেট্ দেন।

"তোমার তো ছোট বেলায় ঘোড়ায় চাপার বাতিক ছিল হে! ঘোড়া দেখ্‌লেই চেপে বসতে!" ডাক্তার বলেন, "কি রকম জানোয়ার কিন্‌লাম, একবার চ'ড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বে না? আমায় তো ঘোড়ায় চাপা প্রাকৃটিশ্ করতেই কিছুদিন যাবে এখন!"

তৎক্ষণাৎ অশ্ব-পরীক্ষায় সম্মত হন কাকা। হাতী-ঘোড়ার ব্যাপারে বেশী বেগ পেতে হয় না রাজি করতে কাকাকে। চতুষ্পদের দিকে কাকার স্বভাবতঃই টান। সে তুলনায় বরং আমার দিকেই একটু কম: পদগর্ব্ব করবার মত কিছু আমার নেই বলেই বোধ হয়।

"ঘোড়ায় চাপ্‌বার বয়েস কি আছে আর?" কাকা সন্দিগ্ধ স্বরেই বলেন, "দেখি তবু চেষ্টা করে!" তার পর ডাক্তার বাবু, আমি এবং অশ্ব-বিক্রেতা—সর্ব্বোপরি স্বয়ং অশ্বের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় আমার কাকা কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে তো চেপে বসেন।

কাকার দেহখানি তো কম নয়, ভারাক্রান্ত হয়ে ঘোড়াটা কেমন যেন ভড়্‌কে যায়। নড়্‌বার নামটিও করে না। কাকা যতই "হেট্ হেট্" করেন সে ততই লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে থাকে।

অশ্ব-বিক্রয়ের আশা ক্রমশঃই সুদূরপরাহত হচ্ছে দেখে অশ্ব-বিক্রেতা বিচলিত হয়ে ওঠে; এবং তার হাতের ছিপ্‌টিও। কিন্তু যেই না ঘোড়ার পিঠে সপাৎ ক'রে এক ঘা বসিয়ে

দেওয়া, অম্‌নি ঘোড়াটা ঘুরপাক্ খেতে সুরু ক'রে দেয়। এ আবার কি কাণ্ড? কাকা তো 'মরীয়া' হয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরেন।

এদিকে, ঘোড়ার ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে ডাক্তার বাবুর সখের বাগানের দফা রফা। নানা প্রকার গোলাপ গাছের চারা লাগিয়েছিলেন, ঘোড়া কেন্‌বার কাছাকাছিই লাগিয়েছিলেন—ঘোড়ার পায়ে তাদের অপমৃত্যুর আশঙ্কা তো করেন নি কোনদিন! অতঃপর অশ্ববর মুহুর্মুহু এগোতে আর পেছোতে থাকে, যে পথে এগোয় সে পথে প্রায়ই পেছয় না—এবং এই বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্র অগ্র-পশ্চাৎ গতির ধাক্কায় আর এক ধারের সব শাক-সব্জীর দফা সারে। কিন্তু এ সমস্তই কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যাপার! আশ্চর্য্য ব্যস্ততার মধ্যে পর পর দুটি মহাদেশ এইভাবে বিধ্বস্ত ক'রে অশ্বরত্ন এক নিদারুণ লাফ্ মারেন—সেই এক লাফেই, কাকা-পৃষ্ঠে, বাগানের বেড়া টপ্‌কে সামনের একটা নালা ডিঙিয়ে, তাঁকে অন্তর্হিত হতে দেখা যায়।

আমিও দেরী করি না, তৎক্ষণাৎ সাইকেল্‌টায় চেপে পশ্চাদ্ধাবন করি। ঘোড়ার এবং কাকার।

ধাবমান অশ্বকে সশরীরে খুব সামান্যই দেখা যায়, অল্পক্ষণ পরেই তিনি কেবল শ্রুতিগোচর হতে থাকেন। দূর থেকে খটাখট্ কানে আসে; কিছুক্ষণ পরে আর পদধ্বনিও না—কেবল চিঁহি চিঁহি। চিঁহি চিঁহিরই অনুসরণ করি।

অনেকক্ষণ অনেক ঘোরাঘুরির পর এক 'ধূধূ' প্রান্তরে এসে পড়ি। সন্ধ্যা কখন পেরিয়ে গেছে, আধখানা চাঁদের ম্রিয়মান আলোয় কোনরকমে সাইকেল চালিয়ে চলি। কিন্তু সাম্‌নে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও চিহ্নমাত্র নেই—না ঘোড়ার না সওয়ারের।

ইতস্ততঃ সাইকেল্ চালাতে থাকি! কি আর করব? ফাঁকা মাঠ আর পরের সাইকেল্ পেলে কে ছাড়ে? কাকা-হারা হ'য়ে বাড়ী ফিরে কাকীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব সে ভাবনাও যে একটু আধটু না হয় তা নয়।

"কে রে? মন্‌টে নাকি? মন্‌টেই তো!"

চম্‌কে গিয়ে সাইকেল্ থামাই। দেখি কাকা এক উঁচু ঢিবির পাশে পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন।

"আঃ, এসেছিস্ তুই? বাঁচ্‌লুম।"

"তোমার ঘোড়া কোথায় কাকা?"

"আমাকে ফেলে পালিয়েছে! কোথায় পালিয়েছে জানি না।" কাকার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে—"আঃ, হতভাগার পিঠ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচেছি। কিন্তু এ কোথায় এনে ফেলেছে? এও কি রামপুরহাট?"

"উহুঁ, মনে তো হয় না। রামপুরহাট কত মাইল দূরে বল্‌তে পারব না, তবে বেশ কয়েক ঘণ্টা দূরে।"

"তা হলে এ কোন্ জায়গা? তুই কি বল্‌ছিস্ তবে লক্ষ্মণপুরহাট?"

"লক্ষ্মণপুর হতে পারে হনুমানপুর হতে পারে কিন্তু হাটের চিহ্নমাত্রও নেই কাকা! চারধারেই তো সাইকেল্ ক'রে ঘুরলাম, জনমানবের পাত্তাই নেই কোথাও!"

"তবে—তবে এই কি সেই—মহাশ্মশান?" কাকা নিজেই নিজের জবাব দেন, "তুল্‌ক্ষণ দেখে তাই তো মনে হয়। দম্‌কা হাওয়ায় মড়া পোড়ানোর গন্ধও পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে। দু' একটা শেয়ালকেও যেতে দেখ্‌লাম যেন। তা হলে—তা হলে কি হবে?" কাকার কণ্ঠে অসহায়তার সুর।

কাকার বিচলিত হওয়ার কারণ আমি বুঝি না।—"কেন? এখানে আস্‌বার জন্যই তো আমাদের আসা? সিদ্ধিলাভের ব্যাপার সুরু ক'রে দিলেই তো হয়!"

"আজই? আজ রাত্রেই? আজ যে সিদ্ধিলাভের জন্য মোটেই প্রস্তুত নই আমি! আজ কি ক'রে হয়?"

"যখন হয়ে পড়েছে তখন আর কি করা?" আমি কাকার পাশে বসে পড়ি। "তত ঝোপ্ ঝাড় নেই, বেশ ফাঁকা আছে—ভূতপ্রেত এলে টের পাওয়া যাবে।"

"সমস্ত দিন ট্রেনে—খাওয়া-দাওয়া হয় নি। ক্ষিদেয় নাড়ি চিঁ চিঁ করছে—এই কি সিদ্ধিলাভের সময়? তোর কি আক্কেল মন্টু? এ রকম বিপদ্ হবে জান্‌লে কে আস্‌তে চাইত—এই আমি নিজের কান মল্‌ছি, আজ যদি উদ্ধার পাই—"

কাকা অবশিষ্ট একমাত্র কানকে সজোরে মল্‌তে থাকেন। কিন্তু উদ্ধারের কোন ভরসাই পাওয়া যায় না। ততক্ষণে চাঁদ ডুবে গিয়ে অন্ধকার বেশ ঘোরালো হয়ে আসে—দু' হাত দূরেও দৃষ্টি অচল হয়। আমি কাকার কাছ ঘেঁসে বসি, আমার গা ছম্‌ছম্ করতে থাকে।

অবশেষে কাকা বলেন—"তাই করা যাক্ অগত্যা। তোর কথাই শুনি। আজ রাত্রে এখান থেকে বেরুবার যখন কোন উপায়ই নেই তখন কি আর করা? কাল সকালে একেবারে সিদ্ধি পকেটে ক'রে হারাধনের বাড়ী ফির্‌লেই হবে। এই নে আমার চাদর—এই নে আমার কোট্—" কাকা একে একে আমার হাতে তুলে দিতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করি "তুমি কি খালি গা হচ্ছ কাকা?"

"বাঃ, হব না? সাধু-সন্ন্যাসীরা কি কাপড় জামা প'রে চাদর গায়ে তপস্যা ক'রে নাকি? তা হলে কি সিদ্ধি হয় রে মুখ্যু? এই নে আমার গেঞ্জি—এই নে আমার—"

আমি সচকিত হয়ে উঠি। অতঃপরবর্ত্তী বস্তুটি কি বুঝ্‌তে আমার বিলম্ব হয় না।—"উহুঁ, কাপড়টা থাক্ কাকা! কাপড় পরাতে তত ক্ষতি হবে না—"

"তুই তো সব জানিস্!" কাকা রাগান্বিত হন,—"হ্যাঁ, কাপড়টা থাক্! তা হলেই আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে! তবে এত কাণ্ড ক'রে দর্জ্জি ডাকিয়ে গেরুয়া রঙের কৌপীনই বা তৈরী করালাম কেন আর অত কষ্ট ক'রে এঁটে পর্‌তেই বা গেলাম কেন!"

কাপড়ও আমার হাতে চলে আসে। সেই ঘুট্‌ঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে কৌপীনসম্বল কাকা কর্ণলাভের প্রত্যাশায় তপস্যা সুরু করেন।

আমি আর কি করব? কাকার কাপড়টা মাটিতে বিছিয়ে পাতি, কোট্‌কে করি বালিশ আর গেঞ্জিটাকে পাশবালিশ! তার পর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে সটান্ হই। আমি দেখেছি, জেগে থাক্‌লেই আমার যত ভয়, ঘুমিয়ে পড়লে আর আমার ভয় করে না।

অনেকক্ষণ অম্‌নি কাটে। ঘুমেরও কোন সাড়া নেই, কাকারও না। সহসা একটা আওয়াজ—চটাস্!

আমি চম্‌কে উঠি। কাঁপা-গলায় ডাকি—"কাকা!"

কাকার কোন জবাব নেই। আরো বেশী ক'রে আমি চাদর মুড়ি দিই।

আবার খানিক বাদে—চটাস্। এবার আওয়াজটা জোরালো।

আবার আমার আর্ত্তনাদ—"কাকা!"

অন্ধকার ভেদ ক'রে উত্তর আসে—"উহুঁ হুঃ।"

কাকার চাপা হুঙ্কারে আমি নিরস্ত হই। আর উচ্চবাচ্য করি না। কাকার যোগ ভঙ্গ ক'রে কি নিজের কানের বিঘ্ন ঘটাব? অন্ধকারের মধ্যেই ওঁর হাত বাড়াতে কতক্ষণ?

অনেক কাল কেটে যায়, আমার তন্দ্রার মত আসে। কিন্তু অকস্মাৎ চট্‌কা ভাঙে, চম্‌কে উঠে বসি, শুন্‌তে থাকি—চটাপট্ চচ্চড়্ চটাপট্ চচ্চড়্! অন্ধকার চৌচির করে কেবল ঐ শব্দ, আর কিছু না, এবং বেশ জোর জোর।

তবে কি—তবে কি—? ভয়ে আমার হাত পা গুটিয়ে আসে। তা হলে কি তাল-বেতালেই ধ'রে আমার কাকাকে পিট্‌তে সুরু করেছে? কিংবা, ভূতপ্রেতেই মজা ক'রে হাতের সুখ ক'রে নিচ্ছে? যাই হোক্, কোনটাই সুবিধের নয়।

আমি 'মরীয়া' হয়ে ডাক্‌তে সুরু করি—"কাকা, কাকা, কাকা—!"

"বস্‌তে দিচ্ছে না রে—"

আওয়াজ্ পেয়ে আশ্বাস পাই। তবু যা হোক্, আমার কাকান্ত ঘটে নি!—"ও-ও-ও কি-কি-কিসের শব্দ?" আমার গলা কাঁপে।

"আর বলিস্ না!" করুণ কণ্ঠের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে দারুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস!

"কিসে বস্‌তে দিচ্ছে না? ভূতে?"

"উঁহু।"

"ডাকিনী-যোগিনী ?"

"উঁহুঁহু।"

"তবে কি তাল-বেতাল ?"

"নাঃ। মশায়। ভারী মশার উৎপাত।"

"ওঃ, তাই বল।" মশার কথা শুনে ভরসা পাই। তা হ'লে অন্ত কিছু, মারাত্মক কিছু নয়। "তোমার চাদর মুড়ি দিয়ে ছিলাম ব'লে বুঝ্‌তে পারি নি এতক্ষণ! তাই তো! কি রকম মশার ডাক, শুন্‌ছ কাকা,—পন্ পন্ পন্ পন্—! এরাই ডাকিনী নয় তো ?"

"কে জানে!" কাকার বিরক্তির তীক্ষ্ণতায় অন্ধকার বিদীর্ণ হয়, "কিন্তু যোগিনী যে তা বিলক্ষণ টের পেয়েছি। গায়ের সঙ্গে যোগ হওয়া মাত্রই।"

আবার চটাপট্ সুরু হয়। মনের সুখে গালে মুখে হাতে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে চড়াতে থাকেন

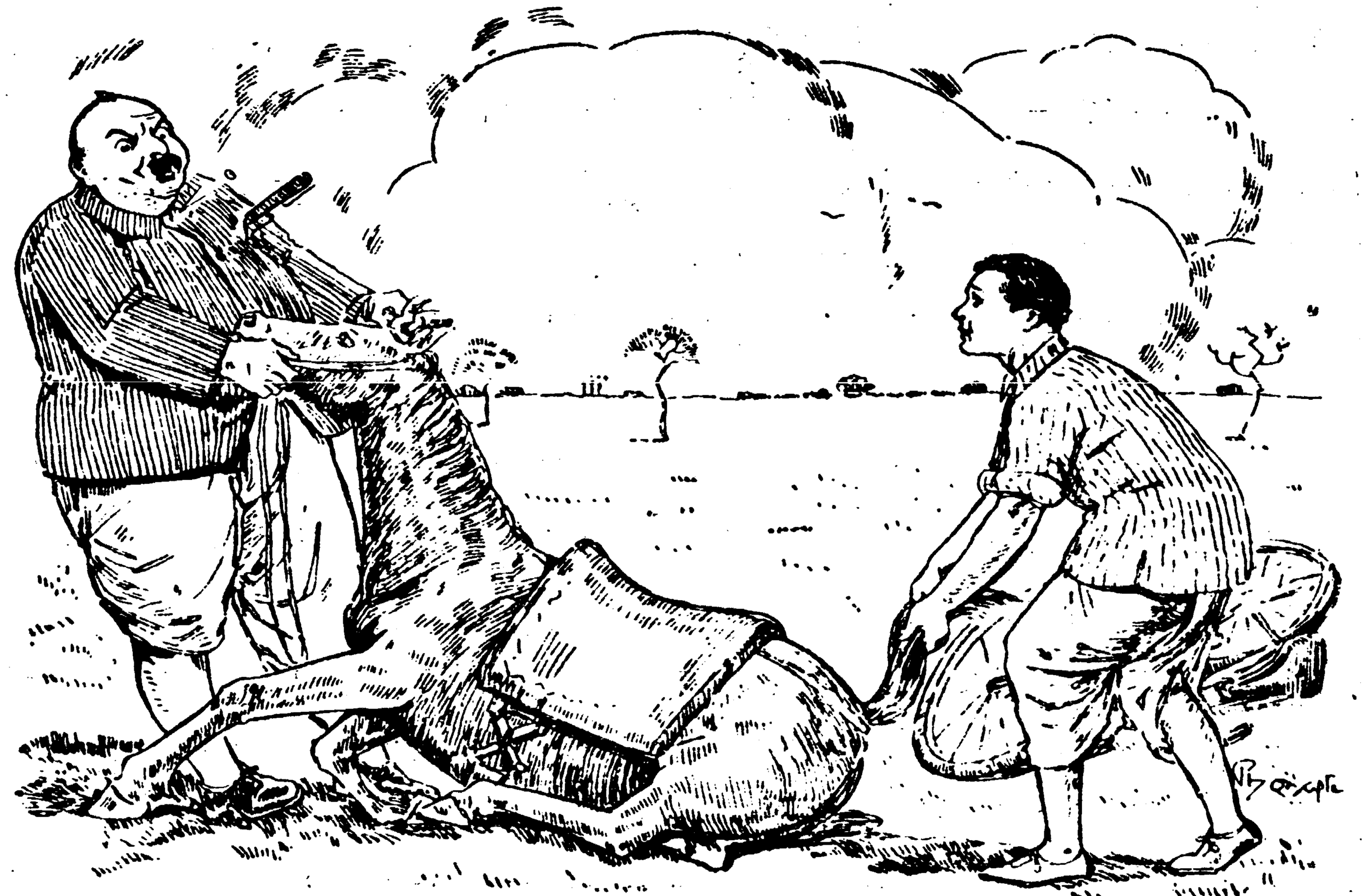

নট্ নড়ন-চড়ন

কাকা। চপেটাঘাত ছাড়া মশকবধের অন্য কি উপায় আছে ? অতঃপর কেবল চড়চাপড়ই চল্‌তে থাকে। বেশ সশব্দে। তপস্যা ওঁর মাথায় গিয়ে ওঠে।

কিন্তু মশার সঙ্গে মারামারিতে পারবেন কেন কাকা ? প্রাণী হিসেবে ওরা খেচর, কাকা নিতান্তই স্থলচর। ওদের হ'ল আকাশপথে লড়াই আর কাকার ভূমিষ্ঠ হয়ে। তা ছাড়া, কাকার

একাধারে দু'জনকে আক্রমণ—মশাকে এবং কাকাকে। কাজেই, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেই কাবু হয়ে পড়েন কাকা—তাঁকে ক্ষান্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই ঘোরতর সংগ্রামে, মশাদের মধ্যে নিহতের তালিকা আমি দিতে পারব না—তবে আহতের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি। আমার কাকা স্বয়ং।

তাঁর বৈরাগ্য আসে তপস্যায়। এমন অবস্থায় কার বা না আসে ? তিনি বলেন—"দে আমার কাপড়-জামা। আমার চাদরটাও দে। সিদ্ধিলাভ মাথায় থাক্! কানে আমার কাজ নেই, ঘুমিয়ে বাঁচি।"

বিছানা, বালিশ, পাশবালিশ, মশারি সবই ফিরিয়ে দিতে হয়। অবিলম্বেই লম্বা হন কাকা। মাটিতে শুয়ে, পরনের কাপড়কেই লেপে পরিণত করি, কি আর করব ? তারই তলায় গা ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা কর্‌তে হয়।

অমন ভয়ঙ্কর রাতও প্রভাত হয়। আবার সূর্য্যের মুখ দেখি আমরা। ইতস্ততঃ তাকাতেই চোখে পড়ে—সেই ঘোড়া! একটু দূরে, উবু হয়ে বসে আছে। অদ্ভুত দৃশ্য! ঘোড়াকে এ ভাবে বসে থাক্‌তে জীবনে কখনও দেখি নি। সারারাত তপস্যা কর্‌ছিল না তো ?

কাকা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—"যাক্, বাঁচিয়েছে। এতখানি পথ আর হেঁটে ফির্‌তে হবে না। বর না হোক্, অশ্ববর তো পাওয়া গেল!"

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ওঁর উৎসাহ নিভে আসে। গত সন্ধ্যার দুর্ঘটনা স্মরণ ক'রে উনি দমে যান্। আমি কাকাকে অভয় দিই—"সমস্ত রাত মশার কামড় খেয়ে সায়েস্তা হয়ে এসেছে ব্যাটা। দাঁড়াবারই ওর ক্ষমতা নেই, বসে পড়েছে, দেখ্‌ছ না ?"

"তাই বটে!" কাকা ঈষৎ চাঙ্গা হন, "তা হলে ঠুক্ ঠুক্ ক'রে বেশ নিয়ে যেতে পারবে। কি বলিস্ ?"

"নিশ্চয়! আর আমার তো সাইকেলই আছে।" আমি বলি।

কাছে গিয়ে ওকে উঠ্‌তে বলি—ওর গ্রাহ্যই নেই! কাকা কান মলে দেন। নট্ নড়ন-চড়ন্! গালে আমি থাব্‌ড়া মারি, তথাপি 'নির্ব্বিক্ষেপ'! অগত্যা আমি আর কাকা দু'জনে মিলে ল্যাজ ধ'রে ওকে তুল্‌তে যাই। আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টায় অবশেষে ও খাড়া হয়।

"সারারাত চুপ্‌চাপ ছিল ঘোড়াটা! এত কাছেই ছিল অথচ। এর কারণ কিরে মন্‌টে ?" কাকা জিজ্ঞাসা করেন। "এ তো ভালো লক্ষণ নয়!"

"জপ কর্‌ছিল বোধ হয়।" আমি ব্যক্ত করি, "সমাধি হয়ে গেছে দেখ্‌ছ না!"

"তাই হবে। স্থান-মাহাত্ম্য যাবে কোথায় ?" কাকার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, "এ তো সিদ্ধিলাভেরই জায়গা, তবে হ্যাঁ—যদি না তুলে দেয়—"

সিদ্ধিলাভের কথায় কাকার কানের দিকে তাকাই। কানটা যথাস্থানেই নেই! কাকার সিদ্ধিলাভ আর হ'লো না এ যাত্রা! আমার হ্রস্বনিঃশ্বাস পড়ে।

কাকা ঘোড়ার পিঠে চাপেন। ঘোড়ার চল্‌বার উদ্যোগই নেই, সেই পুরনো বদ্‌-অভ্যাস! আমাদের ছিপ্‌টি মারার সাহস হয় না। কালকের অত ঘোরাঘুরির পরে—আবার? অনেক ক'রে ওকে বোঝাই। ও কেবল জবাব দেয়—চিঁহি হি!

এই ভাবে বহুক্ষণ আমাদের কথোপকথনের পর ও রাজি হয়; হাঁটতে স্বরু করে। কিন্তু, এ আবার কি বদ্‌খেয়াল? পেছনে হাঁটতে থাকে। হ্যাঁ, সটান পেছনেই।

গতিক দেখে কাকা তো প্রায় কেঁদে ফেলেন। "কান তো গেছেই, এবার কি ঘোড়ার পাল্লায় পড়ে, প্রাণও যাবে নাকি মন্টু?"

আমিও ভাবিত হই, কিন্তু ঘাব্‌ড়াতে দিই না কাকাকে। বলি—"ভয় খেয়ো না কাকা। বুঝ্‌তে পেরেছি, কি হয়েছে। আর কিছু না, ঘোড়াটা সিদ্ধিলাভ করেছে। একে স্থানমাহাত্ম্য, তার ওপর কাল সমস্ত রাত ধরে তপস্যা—যাবে কোথায়? তার ফলে এই কাণ্ড!"

"সিদ্ধিলাভ করেছে কি ক'রে বুঝ্‌লি?" কাকার কণ্ঠ করুণতর হয়।

"এ আর বুঝ্‌ছ না কাকা? যারা সিদ্ধিলাভ ক'রে তারা কি আর আমাদের মত হবে? তা হলে সিদ্ধপুরুষে আর আমাদের মত কাঁচা পুরুষে তফাৎ কি? আমরা সাম্‌নে দিকে হাঁটি, সিদ্ধপুরুষ হাঁটবেন পেছনের দিকে। সিদ্ধিলাভ করলে পেছনে হাঁটতেই হবে। সিদ্ধপুরুষের চাল্‌চলনই আলাদা। সিদ্ধ ঘোড়ারও।"

আমার ব্যাখ্যা শুনে কাকার চোখ বড় হয়। তিনি তখন জাঁকিয়ে বসেন বাহনের পিঠে—"যাক্‌ বাঁচা গেছে, সিদ্ধিলাভের ফাঁড়াটা ঘোড়ার উপর দিয়েই গেছে। আমার হলে কি রক্ষা ছিল? এই দেহ নিয়ে এত বয়েসে পেছনে হাঁটতে হলেই তো গেছ্‌লাম! অমন সিদ্ধি আমার পোষাত না বাপু!"

আমি আন্দাজী রামপুরহাটের দিক্‌ নির্ণয় ক'রে নিয়ে সেইমুখো ঘোড়াটার পেছন ফেরাই। কাকাও ঘুরে বসেন। বলেন—"দে, ল্যাজ্‌টা তুলে দে' আমার হাতে। ওর ল্যাজ্‌কেই লাগাম্‌ করব! সিদ্ধপুরুষের আবার ল্যাজ্‌ কেন?"

ল্যাজ্‌ হস্তগত ক'রে অনুরোধ করেন কাকা—"এবার হাঁটো প্রভু!" অনেকটা গানের সুরেই।

আশ্চর্য্য! বলা মাত্রই ঘোড়াটা চল্‌তে স্বরু করে। বেশ ধীর চতুষ্পদক্ষেপে। রাগ-হিংসা-ক্ষোভ-দুঃখ-চালাকি-চতুরতা কোন কিছুর বালাই নেই ওর ব্যবহারে। শুধু সিদ্ধ নয়, এ সমস্তই সুসিদ্ধ হওয়ার লক্ষণ।

ঘোড়া চল্‌তে থাকে। পেছন ফিরিয়ে সাম্‌নের দিকে, কিংবা মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে। যেটাই বলো।

আমিও সাইকেল চালিয়ে চলি। ওর পেছনে-পেছনে। কিংবা ওর মুখোমুখিই?

বাঙালী বীর কেদার রায়

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ)

আফগান রাজত্বের শেষের দিকে ভৌমিক উপাধিধারী বাঙলার কয়েকজন বিশিষ্ট জমিদার খুব প্রবল হয়ে ওঠেন। এঁরাই বাঙলার বিখ্যাত "বারভূঞা"—এঁদেরই কথা খুব সংক্ষেপে একবার "রামধনুতে" বলা হয়েছিল। আজ এই বারভূঞার অন্যতম, বিক্রমপুরের কায়স্থ জমিদার কেদার রায়ের কথা তোমাদের বলব। চাঁদরায় এই কেদার রায়েরই বড় ভাই।

ষোড়শ শতাব্দীর কথা, তখন সবেমাত্র বাংলাদেশে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোগল সেনাপতি খাঁ জাহান হোসেন কুলি খাঁ বাঙলার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দায়ুদখাঁকে যুদ্ধে নিহত করে বাঙলায় মোগলপ্রাধান্য স্থাপিত করেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত মোগল-অধিকার সারা বাঙলায় বিস্তার লাভ করে নি। বাঙলার নানা জায়গায়, বিশেষ করে পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে স্থানীয় জমিদাররা মোগলপ্রাধান্য অস্বীকার করে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করছিলেন। ভৌমিক বা "ভূঞা"রা ছোট ছোট জমিদারিগুলোকে দখলে এনে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছিলেন। ওদিকে আবার রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠ না হওয়ার দরুণ পর্ত্তুগীজ আর মগ দস্যুরা সুবিধা বুঝে অবাধে লুটতরাজ চালাচ্ছিল।

রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে গোবিন্দ রায় নামে এক দরিদ্র যুবক কপাল ঠুকে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ থেকে পালিয়ে বাঙলায় চলে আসেন। ইনিই চাঁদ-কেদারের আদিপুরুষ। বাংলায় এসে গোবিন্দ রায় সেন রাজসরকারে একটা

চাকুরি যোগাড় করে নেন। পরে বক্তিয়ার খিলজী বাঙলাদেশ জয় করবার পর গোবিন্দ রায়ের কর্ম্মকুশলতা তাঁর নজরে এল ; খুসী হয়ে তাঁকেই তিনি বিক্রমপুর পরগণার জমিদারি এবং শাসনভার দিয়ে দিলেন। গোবিন্দ রায়ের কয়েক পুরুষ পরে যাদব রায়—ইনিই বিখ্যাত চাঁদ ও কেদারের পিতা।

ভারতবর্ষের সম্রাট্ তখন আকবর। বঙ্গবিজয়ের পর তিনি মহারাজ টোডরমল্লকে বাঙলাদেশের সুব্যবস্থা করতে পাঠালেন। বুদ্ধিমান্ টোডরমল্ল বাঙালী জমিদারদের সম্রাটের আনুগত্যে আনবার জন্য এবং রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থার জন্য গোটা বাংলাদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণায় ভাগ করে দিলেন। বিক্রমপুর সরকার সুবর্ণগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হল। অধিকাংশ জমিদারই অবিলম্বে মোগল-সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করলেন, করলেন না শুধু পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের জনা কয়েক। এঁদের মধ্যে যশোরের প্রতাপাদিত্য, সোনারগাঁর ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুরের কেদার রায় প্রধান।

ধর্ম্মপ্রাণ চাঁদরায় বড় ভাই হ'লেও রাজকার্য্য কিছুই দেখতেন না। ছোট ভাই কেদার রণকুশল, রাজনীতিজ্ঞ ও অত্যন্ত সাহসী—তিনিই রাজকার্য্য দেখতেন। চাঁদ রায়ের একটি মেয়ে ছিল—তার নাম ছিল স্বর্ণমণি। সকলে তাকে আদর করে সোনামণি বলে ডাকত। অল্প বয়সে এই সোনামণির বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের অল্প পরেই সোনামণি বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে আসেন।

এদিকে সম্রাট্ সমস্ত জমিদারকে সম্রাট্-সরকারে রাজস্ব জমা দেবার জন্য আদেশ প্রচার করলেন। এই হুকুমের ফলে বাঙলার স্বাধীনচেতা জমিদারদের ও মোগল সম্রাটের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। যশোরে প্রতাপাদিত্য, সোনারগাঁএ ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুরে কেদার রায় দুর্গ নির্ম্মাণ, পথঘাট সংস্কার ও সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। যুদ্ধের উপকরণ ও রসদ সংগ্রহের জন্য চারদিকে লোকজন পাঠান হ'ল। সুবর্ণগ্রাম হ'তে নয় ক্রোশ দূরে কালীগঙ্গার তীরে শ্রীপুর নগর স্থাপিত হ'ল। তার চারদিকে গভীর পরিখা কাটা হ'ল এবং নদীর দিকে এক বিরাট্ দুর্গ নির্ম্মাণ করে বাইরে থেকে আক্রমণের

একমাত্র পথ সুরক্ষিত করা হ'ল। এই সময় রাজ্য-রক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্য ঈশা খাঁ শ্রীপুরে এলেন। সোনারগাঁয়ে ফিরে যাবার পর তিনি সোনামণিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে দূত পাঠালেন। এই ঘটনার ফলে ঈশা খাঁ ও কেদার রায়ের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গেল। ঈশা খাঁর দূতকে বিদায় করে কেদার তাঁর নৌ-বাহিনী নিয়ে ঈশা খাঁকে আক্রমণ করলেন। কেদারের সেনাবাহিনীর আক্রমণে কলাগাছিয়ার দুর্গ ধ্বংস হল। তার পর তিনি ত্রিবেণীর দুর্গ আক্রমণ করলেন। ঈশা খাঁ এক দুর্গ ছেড়ে অন্য দুর্গে আশ্রয় নিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে চাঁদ রায়ের নিজের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে সোনামণিকে লুকিয়ে এনে ঈশা খাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এই সংবাদ শ্রীপুরে পৌঁছলে দুঃখে ও অপমানে চাঁদ রায় কোটীশ্বরের মন্দিরে অনশনে দেহত্যাগ করলেন। বিক্ষুব্ধ কেদার দ্বিগুণ বিক্রমে পরে আবার ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরও সোনামণির সঙ্গে কেদার যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। বীরত্বে সোনামণির সঙ্গে দুর্গাবতী, চাঁদবিবি প্রভৃতির তুলনা করা যেতে পারে। স্বামীর রাজ্যরক্ষার জন্য সোনামণি যে অমিত বিক্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসে তার তুলনা বেশী নেই। অবশেষে যখন রাজ্যরক্ষা অসম্ভব হ'ল তখন সোনাকুণ্ডার দুর্গে সোনামণি আশ্রয় নিলেন। যদি তোমরা কোনদিন নারায়ণগঞ্জে যাও তবে শীতললক্ষা নদীর তীরে 'নারায়ণগঞ্জ বিদ্যুৎ-সরবরাহ-কোম্পানীর' কাছে একটি প্রকাণ্ড দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাবে। এই দুর্গই সোনাকুণ্ডার দুর্গ। কেদার চারদিক্ হতে সোনাকুণ্ডার দুর্গ আক্রমণ করলেন। দুর্গ রক্ষা অসম্ভব দেখে সোনামণি দুর্গে আগুন লাগিয়ে দিলেন, আর নিজেও সেই আগুনে পুড়ে মারা গেলেন।

সোনারগাঁ বিধ্বস্ত করার পর কেদার মন দিলেন আরও পূব দিকে। দেখতে দেখ্তে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমান্ত তাঁর দখলে এল ; সন্দ্বীপ তখন একটা বিখ্যাত জায়গা—সেখানকার মোগল শাসনকর্ত্তাকে বিতাড়িত করে এ স্থানটিতেও তিনি তাঁর অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজ জলদস্যু কার্ভালো তাঁকে খুব সাহায্য করেছিল। কার্ভালোর রণনৈপুণ্যে এবং বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে

কেদার তাকে নিজের নৌবাহিনীর সেনাপতির পদ এবং সন্দ্বীপের শাসনভার দিয়ে এলেন।

এদিকে সন্দ্বীপে কেদার রায়ের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আরাকানের রাজা ভয় পেয়ে সন্দ্বীপ আক্রমণ করলেন। কিন্তু কার্ভালো ও কেদারের মিলিত নৌবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে না পেরে পর পর দু'বার হেরে তিনি পালিয়ে আসেন। আরাকান-রাজের সঙ্গে ১৬০২ সনে যে যুদ্ধ হয় তা পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেদার ও কার্ভালোর মুষ্টিমেয় নৌকার কাছে আরাকান-রাজের ১,০০০ এরও বেশী নৌকার বিরাট্ বাহিনী পরাজিত হয় এবং অধিকাংশ আরাকানী নৌকা জলে ডুবে যায়।

মহারাজ মানসিংহ

কিন্তু অন্য দিক্ দিয়ে বিপদ্ ঘনিয়ে এল। নানা গোলমালে ব্যস্ত থাকায় মোগল সুবেদার মহারাজ মানসিংহ এতদিন বারভূঞাদের সকলকে বশে আন্‌তে পারেন নি। এইবারে তিনি এ কাজে নতুন উৎসাহে লেগে পড়লেন। কার্ভালো দলবল নিয়ে শ্রীপুরে চলে এল কেদারের সাহায্যে; যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ করলেন দু'জনে।

মানসিংহ স্বয়ং যশোরের প্রতাপাদিত্যকে দমন করবার ভার নিলেন, আর কেদারকে সায়েস্তা করবার জন্য বিক্রমপুরে পাঠালেন মান্দারায়কে। অগণিত মোগল ও রাজপুত সৈন্যের সঙ্গে মেঘনা নদীর তীরে কেদারের সেনাবাহিনীর দেখা হ'ল। মান্দারায় যুদ্ধে মারা গেলেন; সেনাপতির পতনে মোগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

বড় অসময়েই এ খবর মানসিংহ পেলেন। তিনি নিজেও প্রতাপের সঙ্গে

এঁটে উঠতে পারছিলেন না। কেদারের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্য এবার তিনি বিচক্ষণ যোদ্ধা কিমলককে পাঠালেন। শ্রীনগরের পরিখার বাইরে বিরুদ্ধপক্ষীয় সেনাদলে দেখা হ'ল। কিমলক বন্দী হ'লেন।

এইবার শ্রীপুরের দিকে ধাবিত হলেন স্বয়ং মানসিংহ। কেদার রায়ের কাছে দূতের হাতে তিনি একখানা চিঠি পাঠালেন—এবার যে বড় কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং দুর্দ্ধর্ষ মানসিংহ আস্‌ছেন সেইটা জানিয়ে দিয়ে সে চিঠিতে তিনি লিখে দিলেন—"বিষম-সমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি।" দূতের এক হাতে তিনি দিয়ে দিলেন একখানা তরোয়াল, অপর হাতে একটা সোনার শিকল। কেদার এই চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয়। তিনি তরোয়াল বেছে নিয়ে দূতের হাতে জবাব পাঠালেন :—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভম্
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজ-শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥"

অর্থাৎ, সিংহ (মানসিংহ) সর্ব্বদাই হাতীর মাথা ভেঙ্গে ফেলে, বায়ুর চেয়েও ক্ষিপ্র তার গতি, পর্ব্বতের চূড়ায় তার বাস—সবই সত্যি, কিন্তু তবুও সিংহ পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। (অর্থাৎ মানুষ যে, সে তাকে ভয় করে না।)

এক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের পর মোগল-সৈন্যের সংখ্যাধিক্যই জয়ী হ'ল। সেনাক্ষয়ে হীনবল কেদার আহত এবং বন্দী হ'লেন। কিন্তু বন্ধনযন্ত্রণা তাঁকে বেশীক্ষণ ভোগ করতে হয় নি; ভালমত জ্ঞান লাভ করবার আগেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। বাংলার ইতিহাসের এক প্রবল শক্তিমান্ পুরুষ চলে গেলেন, তাঁর বিক্রমপুর মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এক পরগণায় পরিণত হ'ল।

কেদার রায় যে কেবলমাত্র যুদ্ধের নামেই নেচে উঠতেন তা নয়; বহু জনহিতকর কাজও তিনি করে গেছেন। বিক্রমপুরে তাঁর বহু "কীর্ত্তি" ছিল, দুরন্ত পদ্মার বেগ প্রায় সে সমস্ত কীর্ত্তিই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। সেইজন্যই পদ্মার এক নাম "কীর্ত্তিনাশা"। বহু ব্রাহ্মণকে তিনি ব্রহ্মোত্তর জমি দিয়েছিলেন।

অনেক রাস্তাঘাট তিনি তৈরী করিয়েছিলেন, সেগুলোর ভেতর "কাচ্‌কীর দরজা" এখনও রয়েছে। তিনি যে সব দীঘি কাটিয়েছিলেন তার মধ্যে কেশার মার (তাঁর ধাইমা) দীঘি এবং ঢোলসমুদ্র বিখ্যাত। তাঁর মার চিতাভস্মের উপর তিনি যে প্রসিদ্ধ 'মঠ' তৈরী করিয়েছিলেন সেই "রাজাবাড়ীর মঠ" সেদিন পর্য্যন্ত পদ্মার তীরে দাঁড়িয়ে ছিল, মাত্র ক' বছর হ'ল কীর্ত্তিনাশা তাকে উদরস্থ করেছে। বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর এই দুই পরগণার মধ্যে একটা দুর্গও তিনি তৈরী করতে সুরু করেছিলেন, কিন্তু নানা গোলমালে সেটি শেষ হয় নি। তার ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়।

রাজাবাড়ীর মঠ

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

(২৯)

টাইপরাইটার যন্ত্র

"শ্রীপুরে অহিভূষণ চৌধুরীর কর্ম্মস্থল ছিল দু'টি, প্রথম দ্বারিক বাবুর বাড়ীর সেই বিশেষ ঘরখানা, দ্বিতীয় চিনির কারখানা। দ্বারিক বাবুর বাড়ীতে যা কিছু দেখ্‌বার সমস্তই দেখা হয়ে

গেছ্‌ল, কাজেই দিন দুই বাদে রণজিৎ বাবুকে সঙ্গে করে একদিন চিনির কারখানায় এসে উপস্থিত হওয়া গেল।

"আপনাদের বোধ করি মনে আছে সে সময়টাতে কারখানার সমস্ত জঞ্জাল সাফ্ করে যেখানে যা কিছু খুঁটিনাটি জিনিষপত্তর পাওয়া যায় সবই এনে অপিসের টেব্‌লটার ওপর জমা করা হচ্ছিল। হঠাৎ সেই "মিউজিয়ামের" স্তূপে একটা আশ্চর্য্য বস্তু লক্ষ্য করলাম—সবুজ রংয়ের বাঁধান একটা একসারসাইজ বুক, কিন্তু অর্দ্ধেকটা তার আগুনে পুড়ে গেছে। খুলে দেখি, ফার্ষ্টবুক-পড়া এক কচি ছেলের হাতের লেখার খাতা ওখানা; শুন্‌লাম পাওয়া গেছে অহিভূষণ চৌধুরীরই বসবার ঘরের কাছে একটা উনোনের ভেতর। ভাল করে খানিকক্ষণ লেখাগুলোর ওপর তাকিয়ে থাকতেই চোখ আমার খুলে গেল। এ তো ছোট ছেলের লেখা নয়, দস্তুর মত ইংরেজী জানা কোন বয়স্ক লোকের হাতের অক্ষর! ছোট ছেলেরা যখন প্রথম লিখ্‌তে শেখে

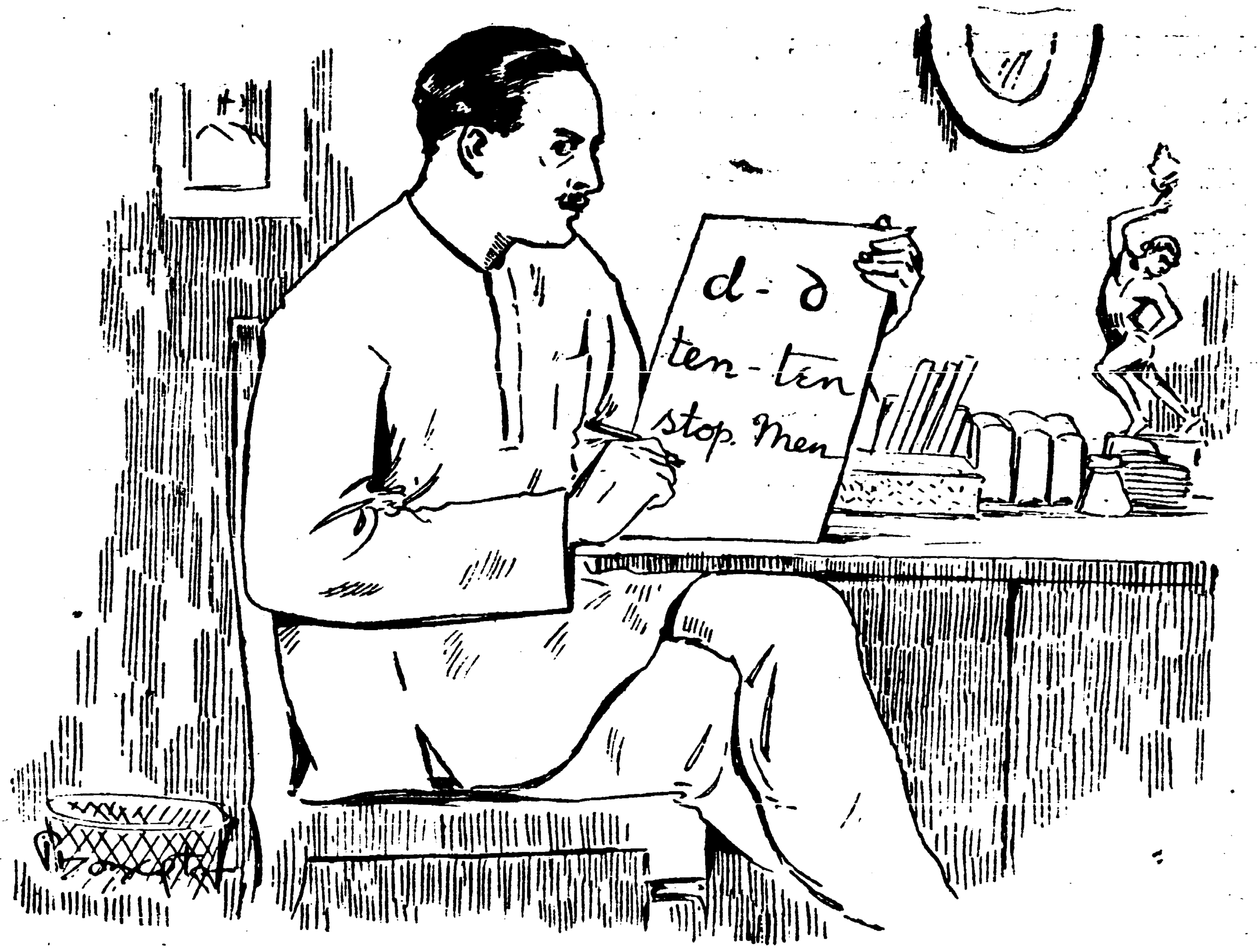

বয়স্ক লোকের হাতের অক্ষর।

তখন তাদের হাতের অক্ষর থাকে গোটা গোটা, লেখার প্যাঁচ আয়ত্ত করা তখন তাদের একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এ লেখা কাঁচা হাতের হলেও মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ লোকের লেখার মত প্যাঁচ রয়েছে এতে। ছোট হাতের 'd' গুলোর সাম্‌নের দিক্‌টা কোথাও লেজের মত নীচের দিকে

নেমে আসে নি, বরাবর টিকির মত মাথার দিকে উঠে গেছে। ছেলেরা ও ভাবে 'ডি' লেখে না! কথার মাঝখানেকার 'e' গুলো দেখ্‌লাম অনেক জায়গাতেই বড় হাতের—ও অভ্যাসও বয়স্কদের মধ্যেই দেখা যায়, ছেলেদের ভেতর কক্ষণো না! বড়দের মধ্যে অনেকে ক্যাপিটাল 'M' প্রায় লেখেই না, ফুলষ্টপের পরেও ছোট হাতের 'm' লেখাই তাদের অভ্যাস। এ লেখাতেও তাই রয়েছে—ফুলষ্টপের পর সব অক্ষরই ক্যাপিটাল, কিন্তু 'm' গুলো আগাগোড়া ছোট হাতের। কচি ছেলেরা অত শত জানে কি? আরও একটা বিশেষ লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ এই, যে প্রথম পৃষ্ঠার লেখায় আর শেষ পৃষ্ঠার লেখায় একেবারে আকাশ-পাতাল তফাৎ; খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লেখা দস্তুর মত পেকে এসেছে। ছেলেদের লেখা পাক্‌তে ঢের বেশী দেরী হয়; ওটা কতকটা নির্ভর করে ইংরাজী-জ্ঞানের ওপর কিনা!

"ব্যাপারটা তখন অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এল—একজন বয়স্ক লোক চুপি চুপি কারখানায় বসে বাঁ-হাতে লেখা অভ্যাস কর্‌ছিল; তার পর লেখা অনেকটা রপ্ত হয়ে এসেছে দেখে খাতাখানা নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে জলন্ত উনোনে সেটা ফেলে দেয়। কিন্তু কে এ লোকটি? অহিভূষণ চৌধুরী নয় তো? গোটা কারখানার ভেতর শুধু তারই একখানা একলার নিজস্ব বসবার ঘর আছে, কাজেই কারখানার ভেতর ব'সে গোপনে কোন কাজ করবার সুযোগ তারই সব চাইতে বেশী। আর তা ছাড়া অন্য সবাই শ্রীপুরেরই লোক, গোপনে লেখা পাকাতে হলে তাদের নিজেদের বাড়ী আছে, সকাল-সন্ধ্যা আছে—সে সমস্তের সুযোগ না নিয়ে কারখানায় তারা মর্‌তে আস্‌বে কিজন্য? কেবল 'অহিভূষণ'ই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, কল্‌কাতায় ফেরে রাত দশটা সাড়ে দশটায়, আবার সকাল হতে-না-হতেই বেরিয়ে পড়ে। কল্‌কাতার মেসের বাসায় তার অবসর কোথা?

"অহিভূষণ বেশী দিন হ'ল দ্বারিক বাবুর কাজে ঢোকে নি; যদি হাতের লেখার মক্স বাস্তবিক সে-ই করে থাকে, তবে খুব সম্ভব তার মৎলব ছিল এখানকার লেখাপড়ার সমস্ত কাজ সে বাঁ হাতেই চালাবে। তাই যদি হয় তবে যতদিন না লেখা বেশ রপ্ত হয়ে এসেছে, ততদিন সে নিশ্চয়ই টাইপ্‌ রাইটারের সাহায্যেই কাজকর্ম্ম চালিয়ে এসেছে—আজকাল এ অভ্যাস অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই এতে। তা হলে টাইপ্‌ রাইটারের ফিতে অবশ্যই তাকে একটু বেশী বেশী পাল্‌টাতে হয়েছে, কেননা অপিসের কাজকর্ম্ম তো বড় কম নয়! সত্যিই তাই কিনা, সেটা ঠিক সোজা আপনাদের জিজ্ঞাসা না করে মণিহারী জিনিষের হিসাবটা একবার দেখ্‌তে চাইলাম। যা ভাবা তাই, টাইপ্‌ রাইটারের ফিতে সত্যিই খুব ঘন ঘন এসেছে দেখা গেল। অঙ্ক আবার শুদ্ধ হয়েছে।

"এবার মনে প্রশ্ন জাগ্‌ল—হঠাৎ অহিভূষণের বাঁ হাতে লেখার বাতিক মাথায় ঢুক্‌ল কেন? ডান হাতে লেখায় ক্ষতি ছিল কি? ডান হাতে লিখ্‌লে পরিচিত লোকে চিনে ফেল্‌বে, এই

ভয়েই তো লোকে বাঁ হাতে লেখে জানি! তবে কি অহিভূষণের ডান হাতের লেখা আপনাদের সকলেরই পরিচিত? অহিভূষণ চৌধুরী কি তবে দ্বারিক বাবুরই পূর্ব্ব-পরিচিত কোন লোক—নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে নতুন সেক্রেটারী সেজে বসেছে? হু হু করে নতুন ধরণের এক চিন্তা মাথায় এসে ঢুক্‌ল। দ্বারিক বাবুর বাড়ীতে অহিভূষণের ঘরখানার কথা মনে পড়ে গেল; অন্ধকার ঘর তার ওপর লোকজনের যাতায়াত সেদিকে নেই বল্লেই চলে। হ্যাঁ, ছদ্মবেশধারীর পক্ষে এই ধরণের ঘরই যে খুব প্রিয় হবে তাতে আর কথা কি! শুনেছি, লোকজনের সঙ্গ সে আদৌ পছন্দ করত না; কি দ্বারিক বাবুর বাড়ীতে, কি কারখানায়, নিজের ঘরটিতে নিরিবিলি আপনার মনে কাজ করে চলে যেত। চেনা লোকের ভেতর যে আসল পরিচয় গোপন রাখ্‌তে চায় তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এটা, বরং এর উল্‌টো হলেই আশ্চর্য্য হবার কথা ছিল। ট্যারা চোখের ছুতো নিয়ে আসল দৃষ্টি লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টাও লোকের মনে ওই একই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। একটা একটা করে সমস্ত লক্ষণই হুবহু মিলে গেল; মনে মনে স্থির বুঝ্‌লাম, 'অহিভূষণ চৌধুরী' বলে কোন লোকই কোন জন্মে ছিল না, ওটা শুধু একটা বানানো ছদ্মনাম। দ্বারিক বাবুর এবং আপনাদেরই চেনা কোন লোক ওঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গবার কুমৎলবে ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে সেক্রেটারী হয়ে আপনাদের পরিবারে ঢুকেছিল, কাজ হাসিল করে এখন সট্‌কে পড়েছে। নকল চেহারা উড়িয়ে দিয়ে এখন সে তার আসল মূর্ত্তি ধরেছে—মর সবাই এখন সেই মিথ্যে লোকের, আর তার চাইতেও মিথ্যে 'চক্রান্তকারী'দের পেছনে ঘুরে!

"কে এই পরিচিত লোকটি? বড়ই জটিল, দুরূহ প্রশ্ন—কোন মতে কোন দিকে ধরা ছোঁয়া দেবার এতটুকু ফাঁক সে রেখে যায় নি।

"দিন দুই পরের ঘটনা। 'অহিভূষণ' যে বাজে চিঠিখানা এটর্ণী অবিনাশ বাবুকে দেখিয়ে সোনার হরিণ ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সেইটে দুর্গাপ্রসন্ন বাবুকে ফেরৎ পাঠাব; কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় অমৃত এসে লেপাফায় মোড়া একখানা ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। খাম খুলেই বিস্ময়ে অবাক্‌ হয়ে গেলাম—অদ্ভুত একটা বেনামী চিঠি! তাতে লেখা আছে—'সোনার হরিণ যারা সরিয়ে নিয়েছিল তাদের কাছে ও-বস্তুটি আর নেই। একদল গুণ্ডা গায়ের জোরে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। গভীর রাত্রে ভূতুড়ে মুখোস পরে কোন লোক তাদের—নং সূরযমল নগরচাঁদ লেনের আস্তানায় হাজির হয়ে ফ্ল্যাস্‌ লাইটে সেই দস্যুদের একখানা ফটো তুলে এনেছিল; সেটা সে এই সঙ্গে আপনার কাছে পাঠাল—এই ভরসায় যে হয়তো আপনার তরফ্‌ থেকে সোনার হরিণ উদ্ধারের কিছু সাহায্য তাতে হতে পারে। ইতি...'

"সে ফটোখানাও চিঠির সঙ্গেই এসেছিল। চিঠিটা যে শুধু বেনামী তাই নয়, লেখকের হাতের অক্ষর পর্য্যন্ত তাতে দেওয়া নেই, আগাগোড়া ইংরাজী টাইপ্‌-রাইটারে লেখা। এক দৃষ্টে

নেমে আসে নি, বরাবর টিকির মত মাথার দিকে উঠে গেছে। ছেলেরা ও ভাবে 'ডি' লেখে না! কথার মাঝখানেকার 'e' গুলো দেখ্‌লাম অনেক জায়গাতেই বড় হাতের—ও অভ্যাসও বয়স্কদের মধ্যেই দেখা যায়, ছেলেদের ভেতর কক্ষণো না! বড়দের মধ্যে অনেকে ক্যাপিটাল 'M' প্রায় লেখেই না, ফুলষ্টপের পরেও ছোট হাতের 'm' লেখাই তাদের অভ্যাস। এ লেখাতেও তাই রয়েছে—ফুলষ্টপের পর সব অক্ষরই ক্যাপিটাল, কিন্তু 'm' গুলো আগাগোড়া ছোট হাতের। কচি ছেলেরা অত শত জানে কি? আরও একটা বিশেষ লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ এই, যে প্রথম পৃষ্ঠার লেখায় আর শেষ পৃষ্ঠার লেখায় একেবারে আকাশ-পাতাল তফাৎ; খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লেখা দস্তুর মত পেকে এসেছে। ছেলেদের লেখা পাকৃতে ঢের বেশী দেরী হয়; ওটা কতকটা নির্ভর করে ইংরাজী-জ্ঞানের ওপর কিনা!

"ব্যাপারটা তখন অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এল—একজন বয়স্ক লোক চুপি চুপি কারখানায় বসে বাঁ-হাতে লেখা অভ্যাস কর্‌ছিল; তার পর লেখা অনেকটা রপ্ত হয়ে এসেছে দেখে খাতাখানা নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে জলন্ত উনোনে সেটা ফেলে দেয়। কিন্তু কে এ লোকটি? অহিভূষণ চৌধুরী নয় তো? গোটা কারখানার ভেতর শুধু তারই একখানা একলার নিজস্ব বসবার ঘর আছে, কাজেই কারখানার ভেতর ব'সে গোপনে কোন কাজ করবার সুযোগ তারই সব চাইতে বেশী। আর তা ছাড়া অন্য সবাই শ্রীপুরেরই লোক, গোপনে লেখা পাকাতে হলে তাদের নিজেদের বাড়ী আছে, সকাল-সন্ধ্যা আছে—সে সমস্তের সুযোগ না নিয়ে কারখানায় তারা মর্‌তে আস্‌বে কিজন্য? কেবল 'অহিভূষণ'ই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, কল্‌কাতায় ফেরে রাত দশটা সাড়ে দশটায়, আবার সকাল হতে-না-হতেই বেরিয়ে পড়ে। কল্‌কাতার মেসের বাসায় তার অবসর কোথা?

"অহিভূষণ বেশী দিন হ'ল দ্বারিক বাবুর কাজে ঢোকে নি; যদি হাতের লেখার মক্স বাস্তবিক সে-ই করে থাকে, তবে খুব সম্ভব তার মৎলব ছিল এখানকার লেখাপড়ার সমস্ত কাজ সে বাঁ হাতেই চালাবে। তাই যদি হয় তবে যতদিন না লেখা বেশ রপ্ত হয়ে এসেছে, ততদিন সে নিশ্চয়ই টাইপ্‌ রাইটারের সাহায্যেই কাজকর্ম্ম চালিয়ে এসেছে—আজকাল এ অভ্যাস অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই এতে। তা হলে টাইপ্‌ রাইটারের ফিতে অবশ্যই তাকে একটু বেশী বেশী পাল্‌টাতে হয়েছে, কেননা অপিসের কাজকর্ম্ম তো বড় কম নয়! সত্যিই তাই কিনা, সেটা ঠিক সোজা আপনাদের জিজ্ঞাসা না করে মণিহারী জিনিষের হিসাবটা একবার দেখ্‌তে চাইলাম। যা ভাবা তাই, টাইপ্‌ রাইটারের ফিতে সত্যিই খুব ঘন ঘন এসেছে দেখা গেল। অঙ্ক আবার শুদ্ধ হয়েছে।

"এবার মনে প্রশ্ন জাগ্‌ল—হঠাৎ অহিভূষণের বাঁ হাতে লেখার বাতিক মাথায় ঢুক্‌ল কেন? ডান হাতে লেখায় ক্ষতি ছিল কি? ডান হাতে লিখ্‌লে পরিচিত লোকে চিনে ফেল্‌বে, এই

ভয়েই তো লোকে বাঁ হাতে লেখে জানি! তবে কি অহিভূষণের ডান হাতের লেখা আপনাদের সকলেরই পরিচিত? অহিভূষণ চৌধুরী কি তবে দ্বারিক বাবুরই পূর্ব্ব-পরিচিত কোন লোক—নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে নতুন সেক্রেটারী সেজে বসেছে? হু হু করে নতুন ধরণের এক চিন্তা মাথায় এসে ঢুক্‌ল। দ্বারিক বাবুর বাড়ীতে অহিভূষণের ঘরখানার কথা মনে পড়ে গেল; অন্ধকার ঘর তার ওপর লোকজনের যাতায়াত সেদিকে নেই বল্লেই চলে। হ্যাঁ, ছদ্মবেশধারীর পক্ষে এই ধরণের ঘরই যে খুব প্রিয় হবে তাতে আর কথা কি! শুনেছি, লোকজনের সঙ্গ সে আদৌ পছন্দ করত না; কি দ্বারিক বাবুর বাড়ীতে, কি কারখানায়, নিজের ঘরটিতে নিরিবিলি আপনার মনে কাজ করে চলে যেত। চেনা লোকের ভেতর যে আসল পরিচয় গোপন রাখ্‌তে চায় তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এটা, বরং এর উল্‌টো হলেই আশ্চর্য্য হবার কথা ছিল। ট্যারা চোখের ছুতো নিয়ে আসল দৃষ্টি লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টাও লোকের মনে ওই একই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। একটা একটা করে সমস্ত লক্ষণই হুবহু মিলে গেল; মনে মনে স্থির বুঝ্‌লাম, 'অহিভূষণ চৌধুরী' বলে কোন লোকই কোন জন্মে ছিল না, ওটা শুধু একটা বানানো ছদ্মনাম। দ্বারিক বাবুর এবং আপনাদেরই চেনা কোন লোক ওঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গবার কুমৎলবে ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে সেক্রেটারী হয়ে আপনাদের পরিবারে ঢুকেছিল, কাজ হাসিল করে এখন সট্‌কে পড়েছে। নকল চেহারা উড়িয়ে দিয়ে এখন সে তার আসল মূর্ত্তি ধরেছে—মর সবাই এখন সেই মিথ্যে লোকের, আর তার চাইতেও মিথ্যে 'চক্রান্তকারী'দের পেছনে ঘুরে!

"কে এই পরিচিত লোকটি? বড়ই জটিল, দুরূহ প্রশ্ন—কোন মতে কোন দিকে ধরা ছোঁয়া দেবার এতটুকু ফাঁক সে রেখে যায় নি।

"দিন দুই পরের ঘটনা। 'অহিভূষণ' যে বাজে চিঠিখানা এটর্ণী অবিনাশ বাবুকে দেখিয়ে সোনার হরিণ ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সেইটে দুর্গাপ্রসন্ন বাবুকে ফেরৎ পাঠাব; কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় অমৃত এসে লেপাফায় মোড়া একখানা ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। খাম খুলেই বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলাম—অদ্ভুত একটা বেনামী চিঠি! তাতে লেখা আছে—'সোনার হরিণ যারা সরিয়ে নিয়েছিল তাদের কাছে ও-বস্তুটি আর নেই। একদল গুণ্ডা গায়ের জোরে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। গভীর রাত্রে ভূতুড়ে মুখোস পরে কোন লোক তাদের—নং সুরযমল নগরচাঁদ লেনের আস্তানায় হাজির হয়ে ফ্ল্যাস্ লাইটে সেই দস্যুদের একখানা ফটো তুলে এনেছিল; সেটা সে এই সঙ্গে আপনার কাছে পাঠাল—এই ভরসায় যে হয়তো আপনার তরফ্‌ থেকে সোনার হরিণ উদ্ধারের কিছু সাহায্য তাতে হতে পারে। ইতি···'

"সে ফটোখানাও চিঠির সঙ্গেই এসেছিল। চিঠিটা যে শুধু বেনামী তাই নয়, লেখকের হাতের অক্ষর পর্য্যন্ত তাতে দেওয়া নেই, আগাগোড়া ইংরাজী টাইপ্‌-রাইটারে লেখা। এক দৃষ্টে

অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলাম ; হঠাৎ মনে হ'ল, ধীরে ধীরে চোখের সাম্‌নে একটা কালো পর্দ্দা যেন সরে যাচ্ছে, পরিষ্কার আলোর রেখা ফুটে বার হচ্ছে। এ কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কোন টাইপ্‌-রাইটার যন্ত্র পুরোনো হলে তার সবগুলো হরফ্‌ আর কিছু একই রকমের থাকে না। কোন কোন অক্ষরের ওপর বেশী চাপ পড়ায় সেগুলোর একটা ধার হয় একটু বেশী ক্ষয়ে আসে, নয়তো বা ভেঙ্গে যায় ; কাজেই সেই-সেই অক্ষরের ছাপ কাগজের ওপর ওঠে আর আর অক্ষরের চাইতে একটু বেশী অস্পষ্ট ভাবে। এই রকম একটা পুরোনো যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় একই সময় যতগুলি চিঠি লেখা হবে তার সবগুলোতেই 'দাগী' অক্ষরগুলোর ছাপ একই রকম ভাবে উঠবে—এতটুকু ইতর-বিশেষ হবে না। একটু আগেই আমি দেখ্‌ছিলাম এটর্ণী অবিনাশ বাবুর কাছে পেশ করা 'অহিভূষণের' চিঠিখানা, আর তার অব্যবহিত পরেই এল এই নতুন চিঠি। অবাক্‌ হয়ে দেখ্‌লাম, আগের চিঠিখানায় যে-যে অক্ষরে ঠিক যে-যে রকমের খুঁৎ, শেষের খানায়ও সেই-সেই অক্ষরে অবিকল সেই রকমেরই খুঁৎ—বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই! মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝে নিলাম, বেনামী চিঠির লেখক শ্রীপুরের চিনির কলেরই কোন লোক, কেননা সেই অফিসেরই টাইপ্‌-রাইটার-যন্ত্রে প্রথম চিঠিখানা লেখা হয়েছিল,—তার প্রমাণ আছে—দ্বিতীয় খানাও লেখা হয়েছে। কে এই বেনামী চিঠির লেখক সেইটে প্রথম খুঁজে বার করতে হবে—নিশ্চয় সে আসল ব্যাপারের কিছুটা রহস্য জানে!"

কথা কয়টি বলিতে বলিতে হুকা-কাশি সলিলের দিকে তাকাইয়া একবার একটু মৃদু হাসিলেন, তার পর আবার বলিতে সুরু করিলেন, "সেদিনই রওনা হয়ে পড়া গেল শ্রীপুরে, সোজা চিনির কারখানায়।···সেখানে বসে আপনাদের সঙ্গে কথা কইছি, হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে এম্‌নি একটা ভাব প্রকাশ কর্‌লাম যেন আমার জরুরী একটা-কিছু হারিয়ে গেছে। কি হারিয়েছে আপনারা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব দিলাম, 'একটা ফটো, কিন্তু বড়ই দরকারী সেটা।' আসলে কিন্তু ফটোখানা মোটেই হারায়নি, দিব্যি বহাল-তবিয়তে আমারই ডেস্কের ভেতর বিরাজ কর্‌ছিল! আমার এ লুকোচুরির মধ্যে একটা বড় রকমের উদ্দেশ্য ছিল ; আমি জান্‌তাম, যে লোক ফটো পাঠিয়েছে সে কারখানাতেই আছে। ফটো হারিয়েছে শুনে সে মোটেই খুসী হবে না, কেননা তার আন্তরিক ইচ্ছা ওটার ওপর নির্ভর করেই আমি সোনার হরিণের খোঁজে নেমে পড়ি। ফটো যখন সে তুলেছে তখন সে ফটোর নেগেটিভ্‌-প্লেট্‌খানাও অবশ্যই তার কাছে আছে। যখন সে দেখ্‌বে হারানো ফটো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সেই প্লেট্‌ থেকে আর একখানা ফটো তুলে সে-ই আবার আমার কাছে পাঠাবে, মুখে বল্‌বে হারানো ছবিই খুঁজে পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও টের পেয়ে যাব ফটোর মালিক কে, কে আমার বেনামী চিঠির লেখক!

"যে রকম ভেবেছিলাম, অবিকল তাই ঘট্‌ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন

ফটো-উদ্ধার হ'ল না, তখন আমি কল্‌কাতায় রওনা হয়ে এলাম। আস্‌বার সময় বলে এলাম, যদি কেউ ওখানা খুঁজে পায়, আমায় যেন পাঠিয়ে দেয়, কেননা ওটা আমার বড়ই দরকারী। বাড়ী ফির্‌তেই সলিল বাবুর টেলিফোন্‌—জানালেন, ফটো উনি খুঁজে পেয়েছেন। আমি জানলাম সলিল বাবু আমার বেনামী চিঠির লেখক, রহস্যের খানিকটা সন্ধান তিনি রাখেন।"

সলিল লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "অতি কঠিন লোক আপনি!" হুকা-কাশি বলিলেন, "হ্যাঁ ; কিন্তু আপনার ওপর গোড়া থেকেই আমার একটু নজর ছিল, সলিল বাবু! কালীচরণকে যখন গোপনে প্রশ্ন করি তখন আপনাকে বড়ই উদ্বিগ্ন দেখেছিলাম, আবার যখন টাইপ-রাইটারের ফিতে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি তখনও আপনি অকারণেই ঘেমে উঠেছিলেন। এখন সে সন্দেহটা বেশ দৃঢ় হ'ল। হয় আপনি তথা-কথিত অহিভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে সাঁটে আছেন, আমাকে একটা বাজে চাল দিয়ে বিপথে চালাবার চেষ্টা পাচ্ছেন, আর নয়তো আপনি অহিভূষণের আসল পরিচয় জানেন, কিন্তু তাকে ধরিয়ে দিতে চান না ; শুধু সোনার হরিণটাই দ্বারিক বাবুকে ফিরিয়ে দিতে চান। নইলে খোলাখুলি ভাবে আমার সঙ্গে দেখা না করে অমন উড়ো চিঠি দেওয়ার মানে কি? এখন কথা হ'চ্ছে, কোন্‌ অনুমানটা ঠিক?—প্রথমটা না দ্বিতীয়টা? দ্বিতীয় অনুমানই যে ঠিক তা বোঝা গেল যখন দু'দিন পরেই টের পেলাম ফটোর লোকগুলি বাস্তবিকই বেপরোয়া দস্যু, রণজিৎ বাবু যে সোনার হরিণ উদ্ধারে নেমেছেন তা তারা জানে, এবং সেইজন্য তাকে হত্যা করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

"ব্যাপারটা বোঝা গেল এইভাবে :—

"সলিল বাবুর উড়ো চিঠি পেয়ে একখানা এন্‌লার্জ্‌ড্‌ ফটো হাতে রণজিৎ বাবুকে আমি সুরযমল নগরচাঁদ লেনের ওই লোকগুলোর ওপর একটু নজর রাখ্‌তে পাঠিয়েছিলাম। তার পর আর রণজিৎ বাবুর কোন খোঁজ নেই। বড়ই ভাবনা হ'ল, কিন্তু ক'দিন বাদেই ওঁর একখানা চিঠি পেলাম, বেনারস থেকে উনি লিখ্‌ছেন। সেই চিঠির মধ্যে দরকারী যে সব খবর ছিল সেগুলো হচ্ছে এই—সুরযমল নগরচাঁদ লেনে উপস্থিত হতেই উনি দেখলেন বাড়ী খালি করে সে বাড়ীর লোকগুলো গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে সট্‌কে পড়্‌ছে ; তারা জগন্নাথ ঘাটে পৌঁছে ষ্টিমারে হুগ্‌লীর টিকেট কর্‌লে ; অশনিকান্ত খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাদের রওনা-হয়ে-যাওয়া দেখ্‌ছিল ; হাওড়া থেকে উত্তরপাড়ার গাড়ী কটায় ছাড়্‌বে এই প্রশ্ন প্রকাশ্যে রণজিৎ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন এক টাইম্‌-টেব্‌ল্‌-ওলা ভদ্রলোকের কাছে—অবশ্য ডাকুগুলো তখন দৃষ্টি-সীমানার বাইরে ছিল। জগন্নাথ ঘাটের বাইরে এসে উনি দেখলেন অশনিকান্ত রাস্তায় পড়ে কাৎরাচ্ছে—দু'জন যুবক নাকি ফটকের বাইরে তাকে হান্টার-পেটা করে পালিয়েছে ; উত্তরপাড়ায় ষ্টিমারে উঠে রণজিৎ বাবু হতবুদ্ধি হলেন এই দেখে যে সব কটা ডাকু ইতিমধ্যেই কোথায় উধাও হয়ে গেছে ; যে

লোকটার ফটো ওঁর হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম তার দেখা পেলেন রণজিৎ বাবু ব্যাণ্ডেলে ; ট্রেনের ভেতর লোকটা রণজিৎ বাবুকে আদৌ চিন্‌তে পারে নি ; মোগল-সরাইতে মাত্র ওঁরা দু'জনই গাড়ীর একটা কামরা দখল করে বসে ছিলেন, অথচ রণজিৎ বাবুর চেয়ে ঢের বেশী পালোয়ান হওয়া সত্ত্বেও সে ওঁর কোন অনিষ্টের চেষ্টা করে নি—অনিষ্ট করা দূরে থাক্ চিন্‌তেই পারে নি ; কাশীর ষ্টেশনেও সেই অবস্থা ; রণজিৎ বাবু ওখানে গিয়ে হোটেলে ওঠার পরই কিন্তু ওরা ওঁকে চিনে ফেলে, গঙ্গায় বেড়াবার সময় ফাঁদ পেতে ডুবিয়ে মারবার চেষ্টা করে।

"চিঠি পড়েই অঙ্ক কষ্‌তে সুরু করলাম। ডাকুর দল জগন্নাথ ঘাটে রণজিৎ বাবুকে চিন্‌তে পারে নি, উনি যে ওদের পেছু নিয়েছেন সে খবরও তাদের অজানা, তবে তারা হুগ্‌লী পর্য্যন্ত যাওয়া ঠিক করা সত্ত্বেও মাত্র দু'য়েক ষ্টেশন এগিয়েই নেমে পড়্‌ল কিজন্য ? নিশ্চয়ই তবে ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী কোন লোক জগন্নাথ ঘাটে রণজিৎ বাবুকে দেখ্‌তে পেয়ে ওদের গিয়ে জানিয়ে এসেছিল—'সাবধান ! পেছনে ফেউ লেগেছে।' এ ছাড়া এ ব্যাপারের আর কি সমাধান হতে পারে বলুন দেখি ! তার পর কাশী পর্য্যন্ত ওরা রণজিৎ বাবুকে চিন্‌লে না, অথচ কাশী যাওয়ার পরই ওদের দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল—এই বা কি করে সম্ভব হতে পারে ? নিশ্চয়ই ওদের সেই 'হিতাকাঙ্ক্ষী' ব্যক্তিটি সেদিনই অন্য কোন দ্রুতগামী গাড়ীতে কাশীর দিকে রওনা হয়ে পড়েছিল, রণজিৎ বাবুকে বেনারসে দেখেই ওঁর অনুসরণ করেছে। হ্যাঁ, একটা কথা আপনাদের এখানে বলা দরকার ; আমি জান্‌তে পেরেছিলাম যে সলিল বাবুর ভাগ্নে সম্পূর্ণ দৈবাৎ রণজিৎ বাবুর সঙ্গে একই ট্রেনে যাচ্ছিলেন, ফটোয়-ধরা-পড়া গুণ্ডাটা তাঁকেই তার অনুসরণকারী মনে করে গভীর রাত্রে চলন্ত গাড়ী থেকে তাঁকে ফেলে দেয়। কাজেই লোকটার বরাবরই ধারণা ছিল—ফেউ যদি পেছনে কেউ লেগেই থাকে তো সে তাকে ইতিমধ্যেই নিপাত করে ফেলেছে। হঠাৎ তার সে ধারণা ওল্‌টাল কেন ? এ প্রশ্নের শুধু একই জবাব সম্ভব : নিশ্চয়ই সেই 'হিতাকাঙ্ক্ষী' লোকটি কাশী গিয়ে উঠেছে, তার পর রণজিৎ বাবুর অজানাতে ওঁর হোটেলে গিয়ে কৌশলে এই খবরটি সংগ্রহ করেছে যে উনি ওদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় বেড়াতে যাবেন। ব্যস্, দলকে গিয়ে খবরটি দেওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার একটি ফাঁদের পত্তন !

"এই 'হিতাকাঙ্ক্ষী' লোকটি যে অশনিকান্ত মিত্র ছাড়া আর কেউ নয় সেটা বার করে ফেল্লাম এইভাবে ; জগন্নাথ ঘাটে ওই ডাকুগুলোর ষ্টিমারে চড়া শুধু পথচারী লোকের দৃষ্টি দিয়ে নয়, নিতান্ত উদ্‌গ্রীব ভাবে যে কেবলমাত্র সে-ই লক্ষ্য করছিল, সেটা রণজিৎ বাবুরও চোখ এড়ায় নি, চিঠিতে স্পষ্ট উনি তা লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, অনবরত সে নিজেকে গোপন রাখবার চেষ্টা কর্‌ছিল, আশপাশে বারবার সন্দিগ্ধ ভাবে চাইছিল—এ কথাও রণজিৎ বাবু জানাতে ভোলেন নি। রণজিৎ বাবুকে নিশ্চয়ই সে চেনে—অনেকবার ক্যাল্‌কাটা গ্রাউণ্ডে খেল্‌তে দেখেছে ;

উনি আমার 'জুড়িদার' তাও অজানা নেই, কেননা আমার ধারণা—কালীচরণের সঙ্গে আমি যখন কথা কই..তখন অশনিকান্তকেই যেন শ্রীপুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখেছিলাম। রণজিৎ বাবু যখন উত্তরপাড়া যাওয়ার গাড়ী সম্বন্ধে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন অশনিকান্ত তখন ঠায় দাঁড়িয়ে তা শুনেছে, কিন্তু ঠিক তার পরের মুহূর্ত্তেই সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে ! তার পর যখন শুনলাম জগন্নাথ ঘাটের ফটকের সুমুখেই সে অকারণে হাণ্টার-পেটা হয়েছে তখন সব মিলে দস্তুরমত একটা সন্দেহের ভাব তার বিরুদ্ধে জেগে উঠ্‌ল। ব্যাপারটার একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে। অশনিকান্ত বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেতা, তার ওপর খবরের কাগজে পড়েছি কিছু দিন ধরে 'ডায়মণ্ড্ কর্পোরেশন' নামে একটা ফিল্ম্ কোম্পানী গড়ে তুল্‌তেও সে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজেই এ-হেন লোকের বাড়ীর ঠিকানা জোগাড় করতে বেগ পেতে হল না। ঠিকানা খুঁজে সে বাড়ীটায় গিয়ে উঠ্‌তেই তার বড় ছেলে নেমে এল, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'কি চাই ?' জবাব দিলাম 'অশনি বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।'

" 'তিনি তো নেই, ক'দিন হ'ল কল্‌কাতার বাইরে গেছেন !'

" 'কবে গেলেন ?'

"যে তারিখটার কথা শুনলাম, মনে মনে মিলিয়ে দেখি সেদিনই জগন্নাথ ঘাটের কাণ্ডগুলো ঘটেছে !

"এবারে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কোত্থেকে আস্‌ছেন ?'

"কপাল ঠুকে বলে দিলাম 'ডায়মণ্ড করপোরেশন থেকে।'

"কথা ক'টা শোনামাত্র ছেলেটির মুখের ভাব কেমন যেন হয়ে গেল ; তাতে ভয়, রাগ দুটোই ছিল। হঠাৎ কয়েক পা পেছিয়ে সে একেবারে দেয়ালের কোণ্‌টিতে চলে গেল ; সেখানে ছিল এক গাছা লাঠি ঠেসান দেওয়া, চেয়ে দেখি শক্ত মুঠোয় চেপে সে সেটা ধরেছে। তাকে আর না ঘাটিয়ে মনে মনে হেসে আমি চলে এলাম। দুটো সমস্যারই তখন মীমাংসা হয়ে গেছে—প্রথম অশনিকান্ত বাস্তবিকই সেই 'হিতাকাঙ্ক্ষী' বন্ধু, ঘটনার দিনই সে কাশী রওনা হয়ে গেছে ; দ্বিতীয়, যে যুবক দু'টি সেদিন তাকে হাণ্টার-পেটা করেছিল তারা ডায়মণ্ড করপোরেশনের লোক। নইলে ও-নাম শুনেই ছেলেটার অমন পরিবর্ত্তন দেখা গেল কেন ?

(ক্রমশঃ)

দোল

(শ্রীরমা দেবী)

দোল এল ভাই, দোল এল ভাই, লাগিয়ে মনে দোদুল-দোল্—
ঘুমিয়ে কে রে আছিস শুয়ে, এবার তোদের নয়ন খোল্ ;
হোলির খেলা খেলব মোরা, জ্বালব রঙের ফুলঝুরি
ছেলেবুড়ো রাঙিয়ে দেব—রাঙিয়ে দেব সব পুরী।
আজকে মোরা ঘুরব পথে, মান্‌ব নাক' কা'র মানা,
ব্রজের গোপাল খুঁজব মোরা—নাই বা র'ল পথ জানা !
দোল এল ভাই, দোল এল ভাই, ধরায় আগুন ছড়িয়ে দে
আবীরে আর কুঙ্কুমে ভাই আকাশ-বাতাস ভ'রিয়ে দে'।
আবীর-রাণী ডাকছে তোদের আবীর-রাঙা হাত তুলে,
খোকাখুকু, আয় ছুটে আয়, আয় ছুটে আয় সব ভুলে।
আকাশ-গাঙে ওই দেখা যায় আবীর-রঙের রামধনু
ফর্সা কালো কেউ বা বোঝে, সব যে দেখি লাল তনু !
হল্লা ক'রে খোকাখুকু আজকে তোরা আয় ছুটে
সাত-রঙা ওই 'রামধনু'রে ছু' হাত দিয়ে নে লুটে।
রঙের নেশায় মাতামাতি—আজকে তোদের আকুল মন,
অপ্‌রাজিতা কুন্দ তুলি ধরারে কর্ পলাশ বন।
আয় তোরা সব খোকাখুকু, পথে পথে রঙ ছড়াই
কোঁচড় ভরে নাও গো ভরে, মঠগুলো আর ফুট-কড়াই
বইখাতা সব আজের মত মায়ের কাছে রাখ্ জমা—
বল্‌লে পরে বলিস, "মাগো, আজের মত থাক্—ক্ষমা।"
আবীর-রঙে রাঙা হয়ে আবীর-রাণী ওই ডাকে
আবীর-রঙের অর্ঘ্য দিয়ে আজকে তোরা পূজ্ তাকে।

ছোটদের চিত্রশালা

ভারী মজা !

আলোকচিত্রশিল্পী :—শ্রীঅরুণকুমার সেন

চশ্‌মার মায়া

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

অনেক দিন আগেকার কথা।

কোনও এক সহরের ঠিক বাইরেই ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে এক বুড়ো আর তা'র এক নাতি থাক্‌ত। বুড়োর ছিল চশ্‌মা তৈরী করার ব্যবসা। সে খুব ভালো চশ্‌মা তৈরী কর্‌তে পার্‌ত আর তার থেকে যা আয় হ'ত তাইতেই তা'দের কোনও রকমে দিন কেটে যেত।

সংসারে সেই বুড়োর আর কেউ নেই, শুধু ছোট নাতিটি ছাড়া। নাতির আবার একটি পা খোঁড়া। ছোট একটা লাঠিতে ভর দিয়ে কোনও রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে বেড়ায়। নাতির জন্যে বুড়োর ভারী কষ্ট। প্রতিদিন শোবার আগে সে যখন হাঁটু গেড়ে ব'সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, দু চোখ দিয়ে তখন তার মুক্তোর সারির মত ঝরে পড়ে অশ্রুবিন্দু। মনে মনে সে বলে, 'ঠাকুর, কাউকেই তো তুমি আমার কাছে থাকতে দিলে না, একমাত্র যা'কে বা থাকতে দিলে তারও কিনা একটা পা খোঁড়া!'

সেদিন শীতের রাত। চারদিকে ঘন কুয়াশা অন্ধকারের হাত ধ'রে যেন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। আর সে কী তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা হাওয়া, হিম-বুড়ো যেন তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে সাবাইকে কেটে দিতে চায়।

রাত অনেক হ'ল। ছোট একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে বুড়ো তখন একমনে ক'য়েকটা চশ্‌মা তৈরী করতে ব্যস্ত। কিছু দূরেই খাটের উপর তার নাতি ঘুমে অজ্ঞান, গায়ে তা'র ছেঁড়া একটা কম্বল।

হঠাৎ দরজার কড়া কে যেন নাড়তে লাগল। বুড়ো চমকে উঠল। না, কোনও ভুল আর নেই—সত্যিই তো কে যেন কড়া নাড়ছে জোরে!

কাজ ফেলে সে দরজা খুলল। সেই স্তিমিত আলোয় বুড়ো দেখল একটা তেজী কালো ঘোড়ার উপর বসে রয়েছে এক দীর্ঘদেহ রাজপুরুষ। ঝকঝকে তার পোষাক-পরিচ্ছদ, বলিষ্ঠ তার গড়ন।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই আপনার?'

'আমার জন্য একটা চশ্‌মা তৈরী ক'রে দিতে হ'বে'—সেই দীর্ঘদেহ লোকটি এক নিঃশ্বাসে বলে চলল, 'কিন্তু সে চশ্‌মা মোটেই সাধারণ নয়। সে চশ্‌মা এমন হওয়া চাই যা চোখে দিলে লোকে শুধু ভালো জিনিষই দেখতে পা'বে। এক সপ্তাহ তোমায় সময় দিলাম। এর ভেতর তৈরী ক'রে দিতে না পারলে উপযুক্ত শাস্তি তুমি পা'বে—মনে রেখ।'

বুড়ো বিস্মিত হ'ল। কিন্তু সে ভাব কাটিয়ে উঠে কোনও কথা বলবার আগেই সে দেখল সেই রাজপুরুষ কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে—শুধু

অন্ধকারের বুকে তখনও তা'র তেজী ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে খটাখট্, খট্‌খট্...! ...

পরের দিন সকালেই বুড়ো গেল গ্রামের বাইরেকার একটি মন্দিরে। সবাই ব'লে সেখানকার দেবতা নাকি খুব জাগ্রত। বুড়ো গিয়েই মন্দিরের পূজারীকে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে পূজারী বললেন, 'দেখ, এর একমাত্র উপায় আমার যা মনে আসছে তাই বলছি। আজ সারাদিন কিছু না খেয়ে ভক্তিভরে তুমি মন্দিরের ধারে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাক আর একমনে ভগবান্‌কে ডাক। ঈশ্বর বড় দয়ালু, নিশ্চয়ই তিনি তোমায় এর একটা উপায় বার করে দেবেন।'

বুড়ো তাই করল। সারাদিন কেটে গেল, ক্রমশঃ রাতও বাড়তে লাগল। প্রায় তখন মাঝরাত হ'বে, চারদিকে হঠাৎ যেন হাজার হাজার প্রদীপ জ্বলে উঠল। আর সেই আলোর ভেতর থেকে ছোট্ট একটি সুন্দর ছেলে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে এসে বুড়োকে হাত ধরে তুলল। তার পর বলল, 'তোমায় কিছু বলতে হবে না বুড়ো, সবই আমি জানি। তুমি বাড়ী গিয়ে ভালো দেখে একটি চশ্‌মা তৈরী ক'র, তার পর এই জিনিষটি তার ওপর শুধু একবার ঠেকিও।'

ভক্তিভরে বুড়ো হাত পাতল। দেবতা তার হাতে ছোট্ট একটি গাছের শিকড় দিলেন।

সমস্ত রাজ্যময় হুলস্থুল প'ড়ে গিয়েছে। কে নাকি এক বুড়ো অদ্ভুত ধরণের একটা চশ্‌মা তৈরী ক'রেছে! দলে দলে লোক এসে প্রত্যহ বুড়োর দরজায় দাঁড়ায় আর বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই অদ্ভুত চশ্‌মাটা দেখে যায়।

ক্রমশঃ এ কথা রাজার কানে উঠল। শুনে তিনি অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন। শেষে একদিন তিনি নিজের ছোট্ট মেয়ে আর রাণীকে নিয়ে অনেক লোক, অনেক বাজনার সঙ্গে সাড়ম্বরে বুড়োর কুটীরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

রাজা এসে তার দুয়ারে দাঁড়িয়ে! বুড়ো যেন নিজের সৌভাগ্যের কথা

বিশ্বাস করতে পারল না। ছুটোছুটি ক'রে, হাঁপিয়ে, সে রাজার উপযুক্ত সম্মান দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রাজা বল্লেন, 'তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না বুড়ো। তোমার সেই অদ্ভুত চশ্‌মাটা আমি শুধু দেখ্‌তে এসেছি। সেটা তুমি আমাদের দেখাও।'

বুড়োর নাতি লাঠিতে ভর দিয়ে সেই চশ্‌মাটা নিয়ে এল। রাজার ছোট্ট মেয়ে তার হাত থেকে চশ্‌মাটা নিয়ে রাজার হাতে দিল।

চশ্‌মাটা প্রথমে চোখে দিলেন রাণী; তার পর চাইলেন তিনি রাজার দিকে। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার! কোথায় প্রৌঢ় রাজার কোঁচ্‌কানো মুখ? তার জায়গায় দেখা যায় এক তরুণ যুবা দাঁড়িয়ে, খুসীর হাসিতে উদ্দীপ্ত তাঁর চোখ-মুখ, সুন্দর স্বাস্থ্য তাঁর দেহে, নিখুঁত তাঁর গড়ন! রাণীর মনে পড়ে গেল সেদিনকার কথা, যেদিন ঠিক এই বেশে এই চেহারার যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল!

রাণীর হাত থেকে চশ্‌মাটা নিয়ে তার পর দেখ্‌লেন রাজা। দেখ্‌লেন, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! রাণীর চেহারা কোথায় হ'য়েছে অদৃশ্য, আর তার জায়গায় যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুলের মত সুন্দর একটি মেয়ে! রাজারও মনে পড়্‌ল—বিয়ের সময় রাণী ঠিক এই রকমই দেখ্‌তে ছিলেন।

চশ্‌মাটা রাজা ও রাণীর খুব পছন্দ হ'ল। তাঁরা অনেক দাম দিয়ে সেটা কিনে নিয়ে বিদায় নিলেন। তাঁদের গাড়ী ছুট্‌ল রাস্তা কাঁপিয়ে—রাজা আর রাণীর চোখে তখন খুসীর হাসি। কিন্তু তাঁদের ছোট্ট মেয়ে? ছল্‌ছলে জলভরা চোখে সে তখন চেয়ে রয়েছে বৃদ্ধের কুটীরের দিকে! বুড়োর নাতি সেখানে দাঁড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে। রাজার মেয়ের মন তখন কান্নায় ভরে আস্‌ছে, আহা বেচারা! একটা পা তার খোঁড়া, সে খেল্‌তে পারে না, সে বেড়াতে পারে না ভালো ক'রে!

সে রাতটাও খুব দুর্য্যোগময়। সবে প্রদীপ নিবিয়ে বুড়ো শুতে যাচ্ছে, এমন সময়ে দরজায় তার কে যেন ধাক্কা দিল। বুড়ো বিস্মিত হ'ল; এত রাত্রে এ আবার কে!

ধীরে ধীরে বুড়ো দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। মুহূর্ত্তের জন্য জ্ব'লে উঠ্‌ল বিদ্যুৎ। সেই তীক্ষ্ণ চকিত আলোয় বুড়ো দেখ্‌ল সাদা ধব্‌ধবে ঘোড়ার উপর ব'সে রয়েছে সেই বলিষ্ঠ রাজপুরুষ। সুন্দর উন্নত তার চেহারা, দেহের ভেতর দিয়ে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে এক অপার্থিব জ্যোতিঃ। তার তীক্ষ্ণ বর্শার ফলা বেয়ে, তার ঝক্‌ঝকে তরোয়ালের গায়ে দানা দানা হ'য়ে ঝরে পড়্‌ছে বর্ষার জল।

বুড়োকে দেখে রাজপুরুষ বল্‌লে, 'তুমি তো এমন এক চশ্‌মা বার করেছ যা'র ভেতর দিয়ে শুধু ভালো জিনিষই দেখায়। কিন্তু এমন চশ্‌মা কি তুমি বার কর্‌তে পার যা'র ভেতর দিয়ে চাইলে লোকে দেখ্‌তে পাবে সত্যকে? চেষ্টা ক'রে দেখো সে রকম চশ্‌মা তুমি বা'র করতে পার কিনা'।

অন্ধকারের ভিতর আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, শুধু ঘোড়ার ক্ষুরের খট্‌খট্‌ প্রতিধ্বনি ক্রমশঃ স্তিমিত হ'য়ে এল।

দেবতার দয়ায় এবারেও বুড়ো কৃতকার্য্য হ'ল। আবার সমস্ত দেশে বইল বিস্ময়ের বন্যা! এবারে সেই আগেকার বুড়োই নাকি এমন একটা চশ্‌মা আবিষ্কার করেছে যা'র ভিতর দিয়ে চাইলে লোকে সত্যকে জান্‌তে পার্‌বে!

রাজার কানে আবার গেল সেই কথা। আবার একদিন রাজা সপরিবারে এসে হাজির হলেন বৃদ্ধের কুটীরের দুয়ারে, আর তাঁদের ঘিরে এলো পাত্র-মিত্র, সমস্ত সভাসদেরা।

রাণী আগে চশ্‌মাটা চোখে দিয়ে দেখ্‌লেন রাজাকে। কিন্তু কী ভয়ানক! তিনি দেখ্‌লেন যেন সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কদাকার বিশ্রী লোক, স্বার্থপর তার স্বভাব, চোখে তার লোভ আর গর্ব্বের এক কুশ্রী দৃষ্টি!

বিহ্বল রাণীর কাছ থেকে রাজা চশ্‌মাটা নিয়ে চোখে পর্‌লেন। কিন্তু কোথায় রাণীর চেহারা! সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন এক বিশ্রী, কদাকার বুড়ী! সঙ্কীর্ণ তার মন, সেখানে নেই দয়ামায়া, নেই স্নেহ-ভালবাসা!

রাজা রেগে উঠ্‌লেন। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! যিনি রাজ্যের রাণী তিনি কি কখনও এ রকম হ'তে পারেন? সমস্তটাই এ বুড়োর চালাকী! তিনি আদেশ

দিলেন বুড়ো আর তার নাতিকে বন্দী করতে। আজই হবে তাদের ফাঁসী। তাঁদের ছোট্ট মেয়ে এই অন্যায় আদেশ শুনে কেঁদে ফেল্‌লে। কিন্তু রাজার মতের পরিবর্ত্তন হ'ল না।

চারদিক্ লোকে লোকারণ্য। সবাই দেখ্‌তে এসেছে বুড়ো আর তার নাতির শাস্তি। সিংহাসনে রাজা ও রাণী ব'সে, সঙ্গে তাঁদের মেয়ে—কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে তার চোখ। ঘাতক প্রস্তুত।

হঠাৎ সমস্ত রাজ-সভা আলোয় আলো হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আলোর কাছে ম্লান হ'ল সমস্ত দিনের আলো। আর একটি ছোট ছেলে হাস্‌তে হাস্‌তে এসে দাঁড়াল রাজ-সভায়। বল্‌ল, 'মহারাজ! মিছামিছি আপনি এদের শাস্তি দিতে যাচ্ছেন। দোষ তো এদের নয়, যা' সত্য তা' সব সময়ে সুন্দর হয়তো হয় না, কিন্তু সেটা কি এই বুড়োর দোষ? এর ভেতর যে বুড়োর কোনও কার্‌সাজি নেই তা' আমি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।'—এই ব'লে সেই ছোট ছেলেটি রাজার মেয়েকে বল্‌ল, 'খুকি! এস তো' তুমি এইদিকে। আচ্ছা বল তো এই চশ্‌মাটা পরে তুমি কি দেখ্‌ছ?'

চশ্‌মাটা সে খুকীর চোখে পরিয়ে দিয়ে রাজারাণীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিল। খুকী ভয়ে শিউরে উঠ্‌ল, তার পর ধীরে ধীরে ব'লে চল্‌ল—রাজা ও রাণী আগে পরস্পর পরস্পরকে যে রকম দেখেছিলেন।

ছেলেটি এবার হেসে উঠ্‌ল। বল্‌ল, 'শুন্‌লেন তো মহারাজ? বুজ্‌রুকি এর ভিতর কোথাও নেই। আপনাদের মেয়েই তো সব বল্‌ল। তা' হ'লে কেন মিছামিছি আপনি এদের শাস্তি দেবেন?'

এই বলে ছেলেটি নাচতে নাচতে সেই বুড়ো আর তার নাতির কাছে গিয়ে তাদের স্পর্শ কর্‌ল। সভার সবাই আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌ল যে তার স্পর্শেই খুলে গেল তাদের বাঁধন।

তার পর ছেলেটি সেই দু' রকম চশ্‌মা নিয়ে বল্‌লে, 'শোন বুড়ো! ভগবান্ সবাইকে যে দৃষ্টি দিয়েছেন তাই ভালো। মানুষ কোন রকমে কৃত্রিম উপায়ে যদি

তার অন্যথা কর্‌তে যায় তা' হ'লেই নানান্ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে। আর তুমি এ রকম চশ্‌মা তৈরী ক'র না। এ দুটোকে নিয়ে আমি চল্‌লাম।'

ধীরে ধীরে সেই ছেলেটির চেহারা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

বুড়োর নাতি হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌ল, 'দাদু দাদু! এই দেখ আমি কি রকম ভালো ক'রে হাঁট্‌তে পাচ্ছি! আমি ছুট্‌তে পাচ্ছি! কি মজা, কি মজা!'

রাজার ছোট মেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে এসে ধর্‌ল সেই গরীব ছেলেটির হাত। নাচতে নাচতে তারা বেরিয়ে গেল খেলা কর্‌তে।

আর এদিকে তখন রাজা আর রাণীর চোখে জল, আর বুড়োর মুখে হাসি।*

ডাইনোসরসের বংশধর

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

সেকালকার অতিকায় জীব ডাইনোসরসের গল্প তোমরা অনেকেই বোধ হয় পড়িয়াছ। সেই যে বিরাট্‌কায় জানোয়ারগুলি—৩০ ফুট, ৪০ ফুট, ৮০ ফুট লম্বা এক-একটা দেহ লইয়া যারা আদ্যিকালের পৃথিবীর বুকে ঘুরিয়া বেড়াইত। কোন মানুষ তাদের জীবিত অবস্থায় দেখে নাই—পৃথিবীতে

সেকালকার একটি অতিকায় ডাইনোসরস্

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

মানুষ আসিবার অনেক আগেই তারা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছে। মাটীর তলায় চাপা-পড়া তাদের পাথুরে কঙ্কাল দেখিয়া পণ্ডিতেরা তাদের কথা জানিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু এই সব অতিকায় প্রাণী পৃথিবী হইতে লোপ পাইলেও তাদের বংশধরেরা এখনও পৃথিবীতে বাস করিতেছে। অবশ্য তাদের অনেকের সহিতই আকারে-প্রকারে কোন দিক্ দিয়াই এই সব অতিকায় জীবদের কোন রকম মিল নাই, কিন্তু তবুও এমন কয়েকটি জীব এখনও পৃথিবীতে আছে যাদের এই সব পূর্ব্বপুরুষদের "ক্ষুদে সংস্করণ" বলিলে বোধ হয় একেবারে দোষের হইবে না।

ডাইনোসরস্‌রা ছিল সরীসৃপ, অর্থাৎ টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর—এদেরই জাতভাই। ডাইনোসরসের জাতভাই টিকটিকি বলিলে তোমরা সকলেই একটু মুখ বাঁকাইয়া হাসিবে, কিন্তু কুমীর বলিলে অতটা সহজে মুখ বাঁকান চলিবে না। আফ্রিকার নীল নদে এমন সব কুমীর এখনও ঘুরিয়া বেড়ায় যারা লম্বায় এক-একটা ২৫।৩০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। এই সব কুমীর যে হিংস্রতায়ও নেহাৎ কম যায় না তা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। কিন্তু সে যাই হোক্, কুমীরের গল্প তোমরা অল্প-বিস্তর সকলেই কিছু কিছু জান, কুমীরের গল্প আজ আর তোমাদের কাছে করিব না। কুমীরেরই মত অন্যান্য যে সব সরীসৃপ ডাইনোসরস্‌দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় তাদেরই ছু'-একটির কথা বলিব।

আটলান্টিক্ মহাসমুদ্রের এজোর্‌স্ দ্বীপে 'ড্রাগন অব্ কোমোডো' নামে এক জাতের গিরগিটি বাস করে। এদের এক-একটি আকারে ১০।১২ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এরা মাংসাশী; দিনের বেলা শিকারের খোঁজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাগে পাইলে বড় বড় হরিণকে শুদ্ধ ধরিয়া খাইতে কসুর করে না; রাত্রে গাছের তলায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া তার মধ্যে থাকে। এই জাতের গিরগিটিকে বলা হয় 'মনিটর'। মনিটর আরও নানা জাতের আছে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার নানা জায়গায় মনিটর দেখা যায়। যে সব মনিটর জলের কাছাকাছি থাকে তাদের সকলেরই একটা প্রিয় খাদ্য হইতেছে কুমীরের ডিম। অবশ্য ডিম চুরি করিতে গিয়া খোদ কুমীরের কবলে পড়িলে আর নিস্তার নাই!

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে বিষুবরেখার কাছাকাছি কতকগুলি ছোট ছোট আগ্নেয়গিরির দ্বীপ আছে। তাদের বলা হয় গলাপেগোস্ আর্কিপেলেগো। নিতান্তই কাঠখোট্টা দেশ—শুধু কতকগুলি জমাট লাভা আর পাথর ছাড়া সেখানে আর কিছু পাইবে না। এই জনমানবহীন দ্বীপগুলি যেন সেই সেকালকার ডাইনোসরস্‌দের আমলের পৃথিবী, এবং রাজত্বও করে এখানে তাদেরই কতকগুলি বংশধর—সামুদ্রিক গিরগিটি। চেহারায়ও এগুলি ঠিক সেই সেকালকার অতিকায় জীবদের অনুরূপ, অবশ্য আকারে অনেক ছোট—৮০ ফুটের বদলে মাত্র ৪ ফুট। কিন্তু এদের হাবভাব, চালচলন—পাথরের উপর উঠিয়া যখন এরা সমুদ্রের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে তখন তাদের সেই মুখের ভাব তাদের সেকালকার পূর্ব্বপুরুষদের কথাই মনে করাইয়া দেয়। এই গিরগিটিদের কথা লোকে আগে জানিত না—মাত্র বছর কয়েক হইল এদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ডাইনোসরসের বংশধর—সামুদ্রিক গিরগিটি

স্ফেনোডন নামে আর এক জাতের সরীসৃপ আছে। এগুলি আকারে বেশী বড় নয়—এই ছু'ফুট আড়াই ফুট হইবে, কিন্তু এদের বিশেষত্ব এই যে লক্ষ লক্ষ বছর আগে এদের পূর্ব্বপুরুষদের চেহারা যেমনটি ছিল এখনও এদের চেহারা ঠিক তেমনটি আছে—কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাই বৈজ্ঞানিকেরা এদের নাম দিয়াছেন "জ্যান্ত ফসিল্"। সেকালকার অনেক জানোয়ারেরই তিনটা করিয়া

চোখ থাকিত। স্ফেনোডনের কপালে আজও এই তৃতীয় চোখ রহিয়া গিয়াছে—তবে দুঃখের বিষয় এ চোখ এখন শুধু তার অঙ্গশোভারই কাজ করে, এ দিয়া সে আর দেখিতে পায় না।

সেকালে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারার সরীসৃপ ছিল, একালকারও একটি অদ্ভুত চেহারার সরীসৃপের নাম এখানে উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না,—অষ্ট্রেলিয়ার 'লেস্‌ওয়ালা' গিরগিটির কথা বলিতেছি। প্রায় তিন ফুট লম্বা জন্তুটি। এদের গলার কাছে পর্দ্দার মত একটা জিনিষ থাকে। রাগিয়া উঠিলে কিংবা ভয় দেখাইতে হইলে এরা এই পর্দ্দা খাড়া করিয়া তুলিতে পারে, তখন জিনিষটা গলার চারদিকে একটা বিরাট্ লেসের মত দেখায়—রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংল্যাণ্ডের বড় বড় লোকেরা যে ধরণের লেসের কলার-ওয়ালা জামা পরিত ঠিক সেই রকম। এই রকম চেহারা লইয়া এরা যখন উচ্চস্বরে শিস্ দেওয়ার মত একটা আওয়াজ করিতে থাকে তখন ভয় হইবারই কথা। এরা ক্যাঙ্গারুর মত দু'পায়ে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে আর ঐভাবে দিব্যি ছুটিতেও পারে।

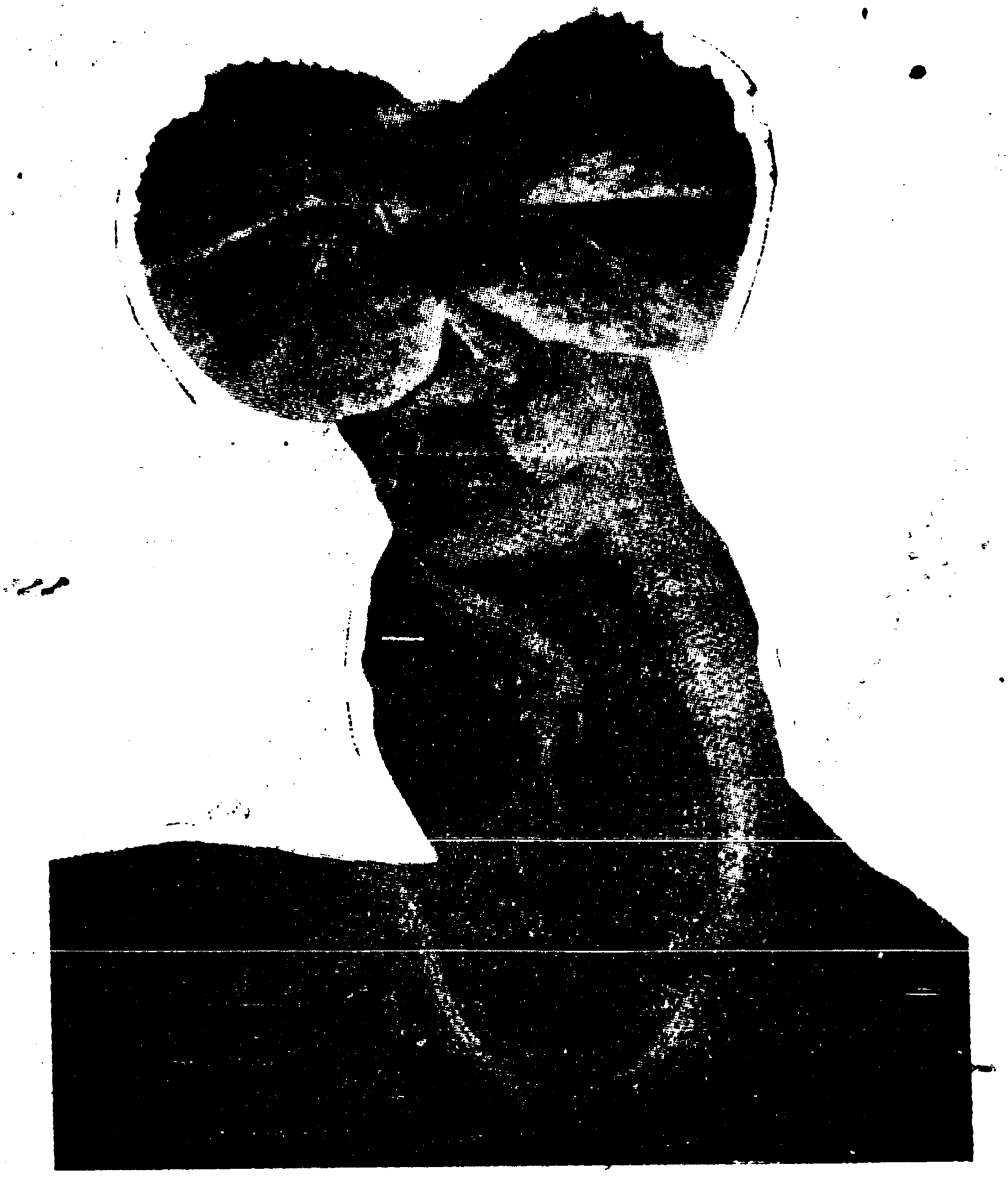
অষ্ট্রেলিয়ার 'লেস্‌ওয়ালা' গিরগিটি

ডাইনোসরস্‌দের কয়েকটি বংশধরের কথা বলিলাম, এবার টেরোড্যাক্‌টাইলের একটি বংশধরের কথা বলি। টেরোড্যাক্‌টাইলের নামও তোমরা ইতিপূর্ব্বে

রামধনুতেই পড়িয়াছ। সেকালকার উড়ুক্কু সরীসৃপদের কথাই আমি বলিতেছি—অর্থাৎ যে সব সরীসৃপ পাখী না হইয়াও পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইত। টেরোড্যাক্‌-টাইলের বংশ এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছে, যেটির কথা বলিতেছি এটি নিতান্তই একটি ক্ষুদে সংস্করণ। মালয় দেশে এবং ফিলিপাইন্ দ্বীপে এক রকম উড়ুক্কু গিরগিটি দেখা যায়। এদের পাঁজরার কয়েকখানা হাড় বুকের চামড়া ফুটা করিয়া দু'পাশে বাহির হইয়া থাকে—সেগুলি আবার পাৎলা পর্দ্দার মত চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে। এই পর্দ্দা এরা সাধারণতঃ গুটাইয়া রাখে, কিন্তু দরকার হইলেই পর্দ্দাটাকে পাখার মত ছড়াইয়া এরা স্বচ্ছন্দে বাতাসে ভর দিয়া এক গাছ হইতে আর এক গাছে উড়িয়া যাইতে পারে। ব্যাপারটাকে ঠিক ওড়া বলা বোধ হয় ঠিক হইবে না, লাফই বলিতে হয়, কিন্তু সে লাফ দেখিতে ওড়ারই মত এবং ঐটুকু কয়েক ইঞ্চি লম্বা প্রাণীটি এই ভাবে এক-একবারে প্রায় আকাশের ত্রিশ ফুট রাস্তা পার হইয়া যায়। এরা গিরগিটি, অর্থাৎ সরীসৃপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কাজেই এদের টেরোড্যাক্‌টাইলের বংশধর বলিলে নেহাৎ অন্যায় হয় কি?

চিঠিপত্র

ভাই রামধনুর পাঠকপাঠিকারা,

এ মাসেও তোমরা অনেকেই চিঠিপত্র পাঠিয়ে রামধনুর প্রতি তোমাদের ভালবাসা জানিয়েছ। তবে ছাপাবার মত চিঠি সবাই লেখ নি। 'মণিমঞ্জুষা' বিভাগটা তোমাদের খুব পছন্দ হয়েছে—খুবই ভাল কথা। এ মাসে কিন্তু 'মণিমঞ্জুষা' বিভাগটা শেষ মুহূর্ত্তে আমরা আর দিয়ে উঠতে পারলাম না—আসছে মাসে আবার দেব। সুসাহিত্যিক ও প্রসিদ্ধ সমালোচক অধ্যাপক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি মহাশয় আসছে বারে তোমাদের জন্য এ বিভাগটা লেখবার ভার নিয়েছেন। 'সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর'টাও এবারের মত মুলতুবী রইল, বারান্তরে বেরোবে। তোমাদের মধ্যেও অনেকে অনেক প্রশ্ন পাঠিয়েছ—তার মধ্যে থেকেও কিছু কিছু আমরা প্রকাশ করব।

গত ১৩৪৩ সালের পূজা সংখ্যা রামধনুতে 'লে মিজারেবল্‌স্' বইএর একটি বাক্যের কথা লেখা হয়েছিল—বাক্যটি ২½ পৃষ্ঠা লম্বা। শ্রীমান্ মঞ্জুভূষণ দত্ত আমাদের জানিয়েছেন—বাণভট্ট-রচিত অমর সংস্কৃত-গ্রন্থ 'কাদম্বরী'তেও অনুরূপ একটি বাক্য আছে—সেটাও ৭৪ লাইন্ লম্বা—অর্থাৎ রামধনুতে ছাপলে প্রায় তার' তিন পৃষ্ঠা যুড়ে যাবে। এই বাক্যটি জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত কাদম্বরীতে তিনি পেয়েছেন।

—রাঃ সঃ

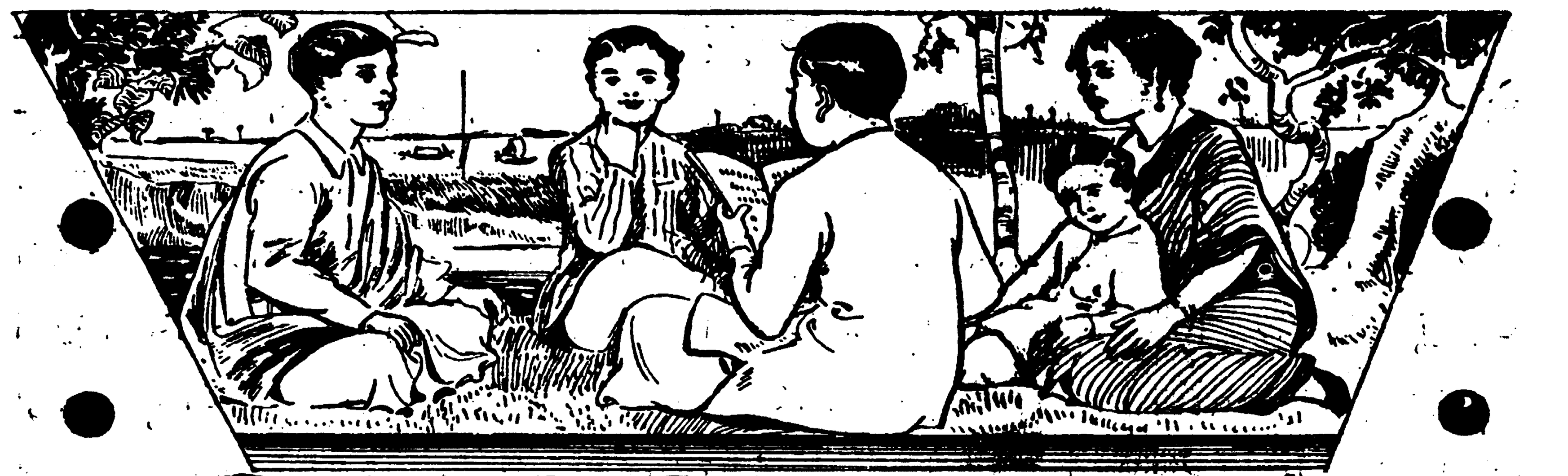

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বৃদ্ধার বাহাদুরী

[সত্য ঘটনামূলক]

(শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র)

সে অনেক দিন আগেকার কথা। নারায়ণগঞ্জে এক পাট-কলের কাছাকাছি এক গরীব বৃদ্ধা বাস করত। সংসারে তা'র কেউ ছিল না, ছিল শুধু দু'টী ছাগল। সেই ছাগলের দুধ বিক্রী করেই তা'র কোনও রকমে দিন কাট্‌ত।

রোজ দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সে তা'র ছাগল দু'টীকে মাঠে ঘাস খাওয়াতে রেখে আস্‌ত, আর সন্ধ্যার আগে গিয়ে তাদের নিয়ে আস্‌ত।

গুজব ছিল,—গুজব কেন সত্য সত্যই ঐ নদীতে কুমীর থাকৃত। বৃদ্ধা কিন্তু তা' জান্‌ত না। একদিন দুপুরবেলা একটী ছাগল ঘাস খেতে খেতে নদীর একেবারে ধারে চলে গেল। এমন সময়ে একটা কুমীর আস্তে আস্তে ডাঙ্গায় উঠে খপ্ করে ছাগলটীকে ধরে জলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেল্‌ল।

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধা এসে একটী ছাগলকে পেল, আর একটাকে পেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নদীর ধারে কুমীরের ও ছাগলের পায়ের ছাপ দেখ্‌তে পাওয়া গেল; তখন বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে ছাগলটীকে কুমীরেই খেয়েছে।

মনের দুঃখে বৃদ্ধা ঐ একটী ছাগল নিয়েই বাড়ী ফিরল। পরদিন সকালে সে খবরটা পাড়া-পড়্‌শী সবাইকে জানাল। শুনে সবাই খুব দুঃখ প্রকাশ করল, কিন্তু কেউই কোন সাহায্য করল না। বৃদ্ধা কিন্তু ঠিক করল কুমীরটাকে সে মারবেই মারবে।

২।১ দিন পরে বৃদ্ধা খবরটী ঐ জুটমিলের ম্যানেজার বাবুকে জানাল। ম্যানেজার বাবু একজন বাঙ্গালী "সাহেব"; বড়লোক—বাড়ীতে বন্দুক, বর্শা, ইত্যাদি আছে। বৃদ্ধার মিনতিতে তিনি কুমীরটাকে মারতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু কুমীরকে পাওয়া যা'বে কি ক'রে?

ভেবে-চিন্তে একদিন ম্যানেজার সাহেব বৃদ্ধা ও বাকী ছাগলটাকে নিয়ে সেই নদীর ধারে গেলেন। তার পর ছাগলটাকে নদীর পাড়ে বেঁধে রেখে নিজে একটু দূরে লুকিয়ে রইলেন—বন্দুক বাগিয়ে ধরে।

এক ঘণ্টা—দু' ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা কেটে যায়, কিন্তু কুমীর আর আসে না। "সাহেব" ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়লেন। শেষে বৃদ্ধাকে বল্লেন,—"কোথায় তোমার কুমীর? হ্যাঁ,—যত সব বাজে কথা; তোমার ছাগলকে কুমীর-টুমীরে খায় নি—কোথাও চলে-টলে গেছে, ভাল করে খুঁজে দেখ।" এই বলে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে ম্যানেজার বাবু বাড়ী ফিরে গেলেন। কুমীরটার ওপর রাগ কিন্তু বৃদ্ধার কিছুতেই কমল না। সে যে নিজের চোখে পাড়ে কুমীরের পায়ের দাগ দেখেছে! যাক্, সেদিনকার মত বৃদ্ধা ছাগলটীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

পর দিন বৃদ্ধা আবার ম্যানেজার বাবুর কাছে গিয়ে বল্‌ল যে সে নিজেই কুমীর মারবে, সেজন্য সে কয়েকটা টাকা সাহায্য চায়।

ম্যানেজার বাবু বৃদ্ধার হাতে টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করলেন।

বৃদ্ধা টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনে আনল। সেটাকে কসাইয়ের দোকান থেকে মেরে এনে তার পেট হতে নাড়ী-ভুঁড়ি সব বের করে ফেল্‌লে। তার পর বাজার থেকে সের ১০।১২ পাথুরে চূণ কিনে এনে ছাগলটার পেটের মধ্যে পূরে দিল। সব পোরা হয়ে যাবার পর মোটা সূতা দিয়ে পেটটা সেলাই করে দিল।

ব্যস্, এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে, বৃদ্ধা ঐ চূণ-পোরা ছাগলটাকে নিয়ে সেই নদীর তীরে গেল। সেখানে জলের একেবারে কাছে সেটাকে ইট্, কাঠি ইত্যাদি দিয়ে কোনও রকমে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে একটু দূরে গিয়ে লুকিয়ে রইল। দূর থেকে ছাগলটাকে সত্যিই জ্যান্ত বলে ভুল হচ্ছিল। বেলা তখন প্রায় বারোটা হ'বে।

বৃদ্ধা বসে আছে তো বসেই আছে, কুমীর আর ওঠে না। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ মনে হ'ল ছাগলটাকে কে যেন জলের মধ্যে টেনে নিল। বৃদ্ধা ছুটে দেখ্‌তে গেল কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেল না—ছাগলটাকেও না। নিশ্চয়ই কুমীরেই ছাগলটাকে নিয়েছে।

এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে বৃদ্ধা আবার একটা গাছের নীচে বসে পড়ল, আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধার মনে হ'ল যে নদীর জলটা যেন খুব নড়্‌ছে—অর্থাৎ তোলপাড় হচ্ছে।

হঠাৎ সেখান থেকে কিছু দূরে নদীর জল থেকে ডাঙ্গায় কি যেন একটা উঠে আস্‌ছে বলে বোধ হ'ল। বৃদ্ধা আস্তে আস্তে সেটার কাছে গিয়ে দেখে যে একটা কুমীর ডাঙ্গায় উঠে খুব মুখ ঘষ্‌ছে ও ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। বৃদ্ধা হাস্‌তে থাকে ও মনে মনে বলে—"ঠিক হয়েছে, আর ছাগল খাবে? চূণের যন্ত্রণা এবার বুঝেছ তো?"

বৃদ্ধা "কুমীর, কুমীর—ডাঙ্গায় কুমীর উঠেছে" বলে খুব চীৎকার করতে লাগল। দূরে ২।৪ জন রাখাল গরু চরাচ্ছিল; বৃদ্ধার চীৎকার শুনে তা'রা লাঠি হাতে ছুটে আসে। এসেই তা'রা দমাদ্দম্ করে কুমীরটাকে খুব পেটাতে লাগল,—কুমীরটা গেল মরে।

বৃদ্ধা ছুটে গিয়ে ম্যানেজার বাবুকে খবর দিল। ম্যানেজার বাবু এসে দেখেন মস্ত একটা কুমীর ডাঙ্গায় মরে পড়ে রয়েছে।

ম্যানেজার বাবু বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কুমীরটাকে ডাঙ্গায় তুল্লে কি করে?"

"আপনি ওর পেটটা চিরে দেখুন, তা' হলেই সব বুঝ্‌তে পারবেন।"

ম্যানেজার বাবু তখন রাখালদের কুমীরের পেট চিরে ফেল্‌তে আদেশ দিলেন।

পেট চিরে দেখা গেল কুমীরের পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি সব ফুলে উঠেছে—চূণ ও জল মিশে মিশে পেট তা'র জ্বলে গেছে। তাই সে যন্ত্রণায় ডাঙ্গায় উঠে পড়েছিল।

ম্যানেজার বাবু বৃদ্ধার বুদ্ধিকে খুব প্রশংসা করে তাকে আরও কয়েকটা টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

পদ্ম

(শ্রীসুনীলকান্তি সেনগুপ্ত)

ভোরের বেলার শুকতারাটি
উঠল যখন জ্ব'লে
পদ্মগুলি আলো করি'
ফুটল দীঘির কোলে।
কালো জলের মাঝে যখন
বর্ণ ওঠে ফুটি,
আকাশে চাঁদ ভাবে তখন
এবার আমার ছুটি।

দীপ্ত রবির তপ্ত মুখে
উর্দ্ধে নয়ন তুলি'
তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষে
রঙ্গীন পাপ্‌ড়িগুলি।
সারাটি দিন কালো জলে
আলোক ক'রে দান
সান্ধ্য রবির সাথেই তাহার
জীবন অবসান।

শেষ টেষ্ট ম্যাচ—ইংল্যাণ্ড্ বনাম অষ্ট্রেলিয়া

টেষ্ট্‌ম্যাচ শেষ হয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত হার হয়েছে ইংল্যাণ্ডের; দারুণ হারই বলতে হবে—এক ইনিংস্ এবং ২০০ রানে।

অষ্ট্রেলিয়ার এই অপূর্ব্ব কৃতিত্বের মূলে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন ডন্ ব্র্যাডম্যান—অষ্ট্রেলিয়া-দলের অধিনায়ক, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার, অদ্বিতীয় ব্র্যাডম্যান। নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে এত বড় ক্রিকেটার আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আর কেউ জন্মায় নি। টেষ্টের সময় এই একটি মাত্র ব্যক্তির ভয়ে সারা ইংল্যাণ্ড্ তটস্থ হয়ে থাকে; রসিকতা করে কেউ তাঁকে বলে 'ব্যাড্‌ম্যান্,' কেউ বলে 'ইংল্যাণ্ড্‌স্ পাব্‌লিক এনিমি নাম্বার ওয়ান্,' কেউ বা বলে 'ব্র্যাডম্যান আন্‌লিমিটেড্'। টেষ্ট্‌ম্যাচে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড্ ৩৩৪, সে রেকর্ড্ করেছেন ব্র্যাডম্যান। ফার্ষ্ট্ ক্লাস্ ক্রিকেটে পৃথিবীর রেকর্ড ৪৫২, সেটাও ব্র্যাডম্যানেরই কীর্ত্তি। আজ পর্য্যন্ত টেষ্ট্‌ম্যাচে ইনি সবশুদ্ধ ৪০ ইনিংস্ খেলেছেন, আর রান করেছেন ৩৪০৬।

ডন্ ব্র্যাড্‌মান্

অবশ্য হব্‌স্ তুলেছেন ৩৬৩৬ রান; তবে তা অনেক দিন খেলার পর, প্রায় ৪৩।৪৪ বছর বয়সে। এদিকে ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান বোধ হয় এখনও ত্রিশ বছরও উৎরান নি। হব্‌সের ক্রিকেট-জীবন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ব্র্যাড্‌ম্যানের খেলা চল্‌বে এখনও বহু দিন। অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে আরও হাজার খানেক রান্ তুলে ফেল্‌বেন তা আর বেশী কথা কি? এবারকার পাঁচটি খেলার ভেতর তিনি করেছেন দু'টো ডবল সেঞ্চুরি (২৭০, ২১২), একটা সেঞ্চুরি (১৬৯)। তাঁর এভারেজ্ হয়েছে ৯০; অথচ ইংল্যাণ্ড-দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌স্‌ম্যান হ্যামণ্ডের এভারেজ ৫৮·৫০ [অন্যান্য—লেল্যাণ্ড (ইং) ৫৫·১২, ম্যাক্‌কেব (অ) ৫৪·৫৫, গ্রেগারি (অ) ৫১, ফিঙ্গ্‌ল্‌টন (অ) ৪৪·২২, বার্ণেট্ (ইং) ৪৩·৮৮]

ও'রিলি

অদ্ভুত দেশ এই অষ্ট্রেলিয়া। লোক-সংখ্যা আমাদের ময়মনসিংহ জেলার চেয়ে বেশী হবে না, অথচ তারই ভেতর থেকে নিত্যি নতুন বার হচ্ছে বিশ্বজয়ী সব খেলোয়াড়। নতুন যে সব খেলোয়াড়কে এবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই একেবারে 'বাঘা-মার্কা'। ব্যাড্‌ককের খেলা দেখে মনে হয় তাঁর সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কুড়ি বছরের ছেলে গ্রেগারীর দাপটে ইংল্যাণ্ড্ অস্থির হয়ে গেছে। ফিঙ্গ্‌ল্‌টনও বড় কম যান না, ব্যাডককের মত ইনিও সেঞ্চুরি করে ছেড়েছেন। বল হাতে প্রলয়ঙ্কর-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছেন ফ্লীট্‌উড্ স্মিথ্; ম্যাক্‌-কর্ম্মিকের হাত থেকে বল ছুটেছে উল্কার বেগে। তাঁদের সঙ্গে পুরোনো খেলোয়াড় ও'রিলি তো আছেনই—যিনি অনেকের মতে আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোলার।

ইংল্যাণ্ড-দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌স্‌ম্যান হ্যামণ্ড, পর্ব্বতের-চূড়ার মতই তিনি দৃঢ়। অসাধারণ খেলোয়াড় তিনি সন্দেহ নাই—এ যাত্রাই একবার টেষ্টে ২৩১ রান তুলে নট্ আউট্ ছিলেন। তাঁর পরেই উল্লেখযোগ্য লেল্যাণ্ডের নাম। নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হলে ইনিও শীগ্‌গির ব্যাট ছাড়বার নাম করেন না।

হ্যামণ্ড্

পঞ্চম টেষ্টের খবর সংক্ষেপে এই—অষ্ট্রেলিয়া টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং সুরু করে; রান ওঠে প্রচুর—৬০৪ (ব্র্যাড্‌ম্যান ১৬৯, ব্যাড্‌কক্ ১১৮, ম্যাক্‌কেব্ ১১২, গ্রেগারী ৮০। ফার্ণেস্ ৯৬ রানে ৬ উইকেট্ পান) প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড তোলে মাত্র ২৩৯ রান (হার্ড্‌ষ্টাফ্ ৮৩; ও'রিলি ৫১ রানে ৫ উইকেট্ আর ন্যাস্ ৭০ রানে ৪ উইকেট্ পান) অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্‌টেন ব্র্যাডম্যান তখন ইংল্যাণ্ডকে ফলো-অন্ করালেন। এবার ইংল্যাণ্ডের পরিণতি হ'ল অতি শোচনীয়, সর্ব্বসাকল্যে রান উঠল মাত্র ১৬৫। (হ্যামণ্ড ৫৬, বার্ণেট্ ৪১, লেল্যাণ্ড্ ২৮; ও'রিলি ৫৮ রানে ৩ উইকেট, ফ্লীট্‌উড্‌স্মিথ্ ৩৬ রানে ৩ উইকেট এবং ম্যাককর্ম্মিক ৩৩ রানে ২ উইকেট্ পেলেন)

ফলে ইংল্যাণ্ডের এক ইনিংস্ এবং ২০০ রানে পরাজয় ঘট্‌ল। তোমাদের হয়তো মনে আছে, এর আগের বার ইংল্যাণ্ডে যে টেষ্টম্যাচ্ হয় তাতে ইংল্যাণ্ড্‌ই হেরেছিল। অষ্ট্রেলিয়া ক্রমান্বয় দু'বার 'য়্যাসেজ্' পেল।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

ঠাকুরমার মহাভারত—শ্রীনির্ম্মলা দেবী প্রণীত। এজেন্ট্‌স্ ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা। দাম ৮০। মহাভারতের মূল গল্প ঠাকুরমার মুখের গল্পের মত মিষ্টি ভাষায় এই বইখানায় লেখা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত আমাদের বড় গৌরবের জিনিষ—প্রত্যেক বাঙ্গালীর তা মুখস্থ রাখা উচিত। গল্প-হিসাবেও এ বইএর তুলনা নেই। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েরা অত বড় মহাভারত পড়ে উঠতে পারে না, কাজেই ঠাকুরমার মহাভারত তাদের খুব কাজে লাগবে। আমরা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে এ বইখানা পড়তে বলি। ছাপা, কাগজ খুব সুন্দর, অনেকগুলি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবিও আছে।

মুক্তাডুবুরী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক বাগচী এণ্ড কোং, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা; দাম ॥৵০। মুক্তাডুবুরীদের "এড্‌ভেঞ্চারপূর্ণ" জীবন নিয়ে এই বইখানা লেখা হয়েছে। খগেন বাবুর পাকা হাতের লেখা, পড়ে তোমরা সবাই খুসী হবে—সেই সঙ্গে মুক্তাডুবুরীদের সম্বন্ধেও অনেক কথা জানতে পারবে।

সন্দেশ

সম্প্রতি চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাংলার অনেক বড় বড় সাহিত্যিক এই সম্মেলনীতে যোগ দিয়াছিলেন। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অন্যান্য শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন এই রকম—সাহিত্য—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, কথাসাহিত্য—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, ইতিহাস—স্যর যদুনাথ সরকার, দর্শন—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, সাংবাদিক সাহিত্য—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পকলা—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, শিশুসাহিত্য—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়ছিলেন শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ। আগামীবারের সম্মেলন নদীয়ায় হইবে ঠিক হইয়াছে।

গেল মাসের রামধনুতে তোমাদের আমেরিকার ভীষণ বন্যার কথা বলিয়াছিলাম। এই বন্যায় সেখানে যে ক্ষতি হইয়াছে তার একটা হিসাব করা হইয়াছে। হিসাব মত ক্ষতির পরিমাণ—প্রায় ১০৫০০০০০০০ টাকা।

* * *

গত মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের অনেক দেশে সাধারণতন্ত্র (রিপাব্‌লিক) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯১৮ সনের ৯ই নভেম্বর জার্ম্মেনীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; ঐ বছরই ১২ই নভেম্বর অষ্ট্রিয়ায় এবং ১৪ই নভেম্বর নতুন দেশ চেকোস্লোভেকিয়ায়ও সাধারণতন্ত্র সুরু হয়। তার পর ১৯৩১ সনের ১৪ই এপ্রিল স্পেনেও সাধারণতন্ত্র সুরু হইয়াছে।

* * *

ইয়োরোপে এখন যে সব সাধারণতন্ত্র (Republic) আছে তার মধ্যে সব চেয়ে পুরানো সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্র। ইংল্যাণ্ডে বাস্তবিক গণতন্ত্র থাকিলেও তাকে Republic বলা হয় না।

* * *

পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্যগুলির একটু পরিচয় দিতেছি—

ব্রিটীশ সাম্রাজ্য—আয়তন ১৩৩৫৫৪২৬ বর্গ মাইল; জাপান সাম্রাজ্য—২৬৫১২৯ বর্গ মাইল; ইটালিয়ান্ সাম্রাজ্য—৯৩৫৪৪০ বর্গ মাইল; চীন সাম্রাজ্য—৪২৭৯১৭০ বর্গ মাইল; ফরাসী ও উপনিবেশ—৪৪৫০,০০০ বর্গ মাইল; সোভিয়েট রাশিয়া—৯২৫১৭৯৬ বর্গ মাইল।

* * *

পৃথিবীতে যত পেট্রোল খরচ হয় তার চার ভাগের তিন ভাগ আসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে, যত কফি খরচ হয় তার তিন ভাগের ২ ভাগ আসে ব্রেজিল হইতে, আর যত চা খরচ হয় তার প্রায় অর্দ্ধেক পাওয়া যায় ভারতবর্ষে। পাট সবটাই পাওয়া যায় বাংলা দেশে।

* * *

১৯২৭-২৮ সনে সমস্ত ভারতবর্ষে যত রাস্তা ছিল তা একত্র করিলে ১৪৪০৫১ মাইল্ হইত। ১৯৩২-৩৩ সনে সেটা বাড়িয়া হয় ১৯০৫৩৪ মাইল্।

* * *

ডাক্তারেরা বুক, পিঠ পরীক্ষা করিবার সময়ে ষ্টিথোস্‌কোপ্ নামে যে যন্ত্র কানে লাগান তা কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন জান? তাঁর নাম লেনেক্। ইনি ফরাসী দেশের লোক। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই যন্ত্র মাথা খাটাইয়া বাহির করেন; সেই হইতে উহা ডাক্তারী ব্যবসায়ের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। মধুর বয়স এখন ৯, মনুর বয়স এখন ১।

২। ৭টি ছেলে;—৪টির দুই পা খালি; একটির ডান পায়ে চটি, দু'টির দুই পায়েই চটি।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

দিলীপকুমার ব্যানার্জ্জি ও মা (জলপাইগুড়ি); সিতেন্দু, দীপ্তিকেন্দু ও সুনীলেন্দু গুপ্ত (স্বর্ণাসন—পাটনা); শঙ্কর, ভাস্কর, মাসিমা (ভবানীপুর); রবীন্দ্রমোহন দাস ও মঞ্জুভূষণ দত্ত (বালুরঘাট); সান্ত্বনা ঘোষ ও সাধনা ঘোষ (যশোহর); রমাপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা);

অতুল, মাষ্টার সতু, অরুণ প্রভৃতি (রাজসাহী); অনিল, খুকী, অরুণ (রাজসাহী); রণেন্দ্র, মাষ্টার মহাশয়, রমেন্দ্র (ধুবড়ী); অচলকুমার দত্ত (ভবানীপুর); শ্রীলেখা গুপ্ত (কলিকাতা); ফালু, রেণু, নীলিমা (কুমিল্লা); সমরেন্দ্রকুমার সেন (খড়্গপুর); রামেন্দু দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); দলু, বিজু, অঞ্জলি চৌধুরী (কলিকাতা); কল্যাণী, সরলা, আমেনা প্রভৃতি (কলিকাতা); নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী)।

যাঁহারা ১টির ঠিক উত্তর দিয়াছেন—

রমেন, সবিতা, হীরেন প্রভৃতি (রাজসাহী); নীরু, ধ্রুব, ব্রজগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি (বাণীগ্রাম); সত্যনারায়ণ লাহিড়ী (বর্দ্ধমান), সত্যানন্দ প্রামাণিক (চক্রধরপুর); রত্না দেবী (পাটনা); ঝণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় ও নণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (ডোমার); ভূপতিনাথ ভট্টাচার্য্য (নিউদিল্লী); অমল রায়, জয়দেব, শোভনা প্রভৃতি (সাভার—ঢাকা); কুমার সুধীরকুমার রায় (ডোমার); ভবরূপ ভট্টাচার্য্য (মল্লিকপুর); কল্যাণকুমার ও অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (পুরুলিয়া); তপন ও সবিতা (রেঙ্গুন); সুনীলকান্তি সেন, গৌরীদি, দোলনদি (চাঁদপুর); করুণা, শান্তি, তুলু (ইকড়া); কর্কট, কুম্ভ ও রামপ্রসাদ (বেহালা)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

'কর' কথাটির আগে অথবা পরে অক্ষর বসিয়ে অনেক কথা বানান যায় ;—যেমন 'প্রভাকর' 'শঙ্কর' 'করঙ্ক'। নীচে ঐ রকমের কয়েকটি কথার মানে, অথবা সে কথায় কি রকমের জিনিষ বোঝায়, লিখে দেওয়া হয়েছে। কথাগুলি কি, বল্‌তে পার কি তোমরা ?

(১) জন্তু—কর
(২) আকাশ থেকে পড়ে—কর
(৩) তরকারী—কর
(৪) অস্ত্র—কর
(৫) রত্নগর্ভ—কর
(৬) আজ্ঞাবাহী—কর
(৭) সকল—কর
(৮) না ব'লে জিনিষ নেয়—কর
(৯) প্রজার দেয় দিচ্ছে—কর
(১০) প্রজার দেয় দিতে হয় না—কর
(১১) জলবাসী—কর
(১২) বড় প্রাণীর ছানা—কর

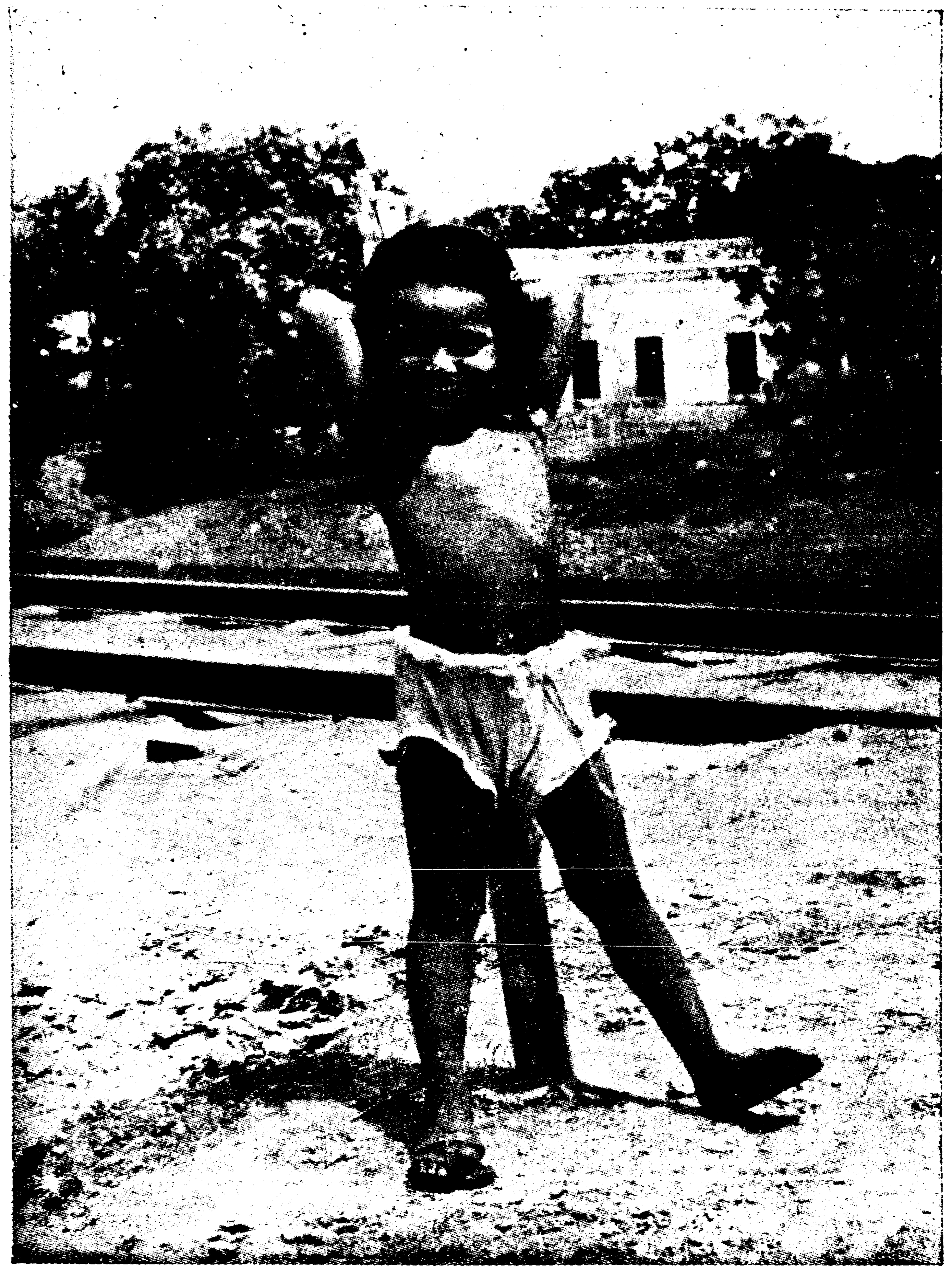

“একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লীটি তার দখলে,
সবাই তারই পূজো যোগায়, লক্ষ্মী বলে সকলে ;
আমি কিন্তু বলতে পারি কথায় যদি মন দেহ,
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে আছে আমার সন্দেহ।”

১০ম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৪ { ৪র্থ সংখ্যা

ছুটির ছড়া

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

ছুটি ছুটি
পাখী ছুটী
কি গান গেয়ে
যায় রে ধেয়ে ?
নীল সকালে
ফুলের ডালে

বাতাস কাঁপে
ভ্রমর ঝাঁপে ;
ঘুম থেকে ভাই
হঠাৎ উঠি
খবর পেলাম
আজকে ছুটি।

২

কে যেন কে
আজ এসেছে
আকাশ-পথে
সবুজ রথে।
তারে দেখে
গহন থেকে
পাখী ডাকে
নদীর বাঁকে।
ছড়িয়ে ছায়ায়
আলোর মুঠি
এসেছে আজ
সোনার ছুটি।

৩

বাঁশী হাতে
উজল প্রাতে
মাঠের ধারে
বারে বারে
সবায় ডাকে,
চাঁপার শাখে
দোলায় দোলা
আপন ভোলা।
তৃণের কোলে
পড়ছে লুটি
ডাক্‌ছে সবে—
'আয় রে ছুটি'।

৪

দুপুর বেলা
নতুন খেলা
বনের ধারে ;
আজ সবারে
ভালবেসে
হেসে হেসে
এসেছে সে
মোদের দেশে।
খেলায় চপল
চরণ দু'টী
চির সাথী
মোদের ছুটি।

৫

বোশেখ মাসে
ভোর বাতাসে
ও কে আসে
ও কে হাসে!
জষ্টি দুপুর
টাপুর টুপুর
যষ্টি মধু
ঝরছে শুধু।

আষাঢ় আসে
বাজিয়ে মাদল
দূর আকাশে
নামে বাদল।

...

কেয়া কদম
উঠ্‌ল ফুটি
এলো মোদের
নতুন ছুটি

দস্যুর দলে ভোমরা

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

৪

মাম্বু-জাম্বু!

ওরা তিনজন যখন দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো, ভোমরা তখনও ঘুমুচ্ছে। ততক্ষণে বেশ বেলা হয়েছে, কিন্তু চারদিকের দেয়াল পেরিয়ে ঐ ছোট্ট কুঠুরিতে আলো এসে পৌঁছয় নি।

বালিস থেকে সরে এসেছে ভোমরার মাথা, হাতের উপর মাথা রেখে উপুড় হ'য়ে সে এমন ভাবে শুয়েছে যাতে পা দুটো কম্বল ছাড়িয়ে চ'লে এসেছে মেঝেতে।

সর্দার খানিকক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো, যেন কী অদ্ভুত জিনিস দেখছে।

গণ্‌শা বললে, 'জেগে উঠেই তো উনি হুকুমের চোটে অস্থির ক'রে তুলবেন। যে-ক'দিন পুষবে বেশ ভোগাবে, পাণ্ডাজি।'

শিবু সর্দার বললে, 'তা কিছু তো ভোগাবেই।'

'যত শীগ্‌গির পারো চুকিয়ে ফেলো ব্যাপারটা।'

সর্দার শুধু বললে, 'হুঁ'।

হয়তো ওদের কথাতেই—কি শোবার অসুবিধের জন্যে—ভোমরার ঘুম গেলো ভেঙে। প্রথম চোখ মেলেই ওর মনে হ'লো—ইস্, বড্ড দেরি হ'য়ে গেলো উঠতে, কাকাবাবু বকবেন। তার পরেই মনে পড়লো আজ শনিবার, বিরিঞ্চির সঙ্গে সিনেমায় যাবে ইস্কুলের শেষে। উৎসাহে লাফিয়ে নামতে গিয়েই অবাক্ হ'য়ে গেলো। কোথায় তার খাট? কোথায় শুয়েছে সে? চারদিকে তাকিয়েও কিছু মনে পড়ে না। তার পর যেই দেখলো দরজায় ওদের তিনজনের মূর্ত্তি, অমনি সব মনে পড়লো, অমনি হু-হু ক'রে কান্না এলো তার দুই চোখ ছাপিয়ে।

গণ্শা তার কাছে এসে বললে, 'সকালে উঠেই চোখের জল! অলক্ষী, অলক্ষুণে কোথাকার!'

মাণ্কে একটু মোলায়েম হবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'আহা, কাঁদছিস কেন? তোকে কি কেউ মেরেছে না ধরেছে না খেতে দেয় নি? সারাটা রাত জেগে পাহারা দিলুম না!'

কিন্তু ওদের কথা শুনে ভোমরা আরো বেশি কাঁদতে লাগলো।

তখন সর্দার এগিয়ে এসে বললে: 'ছি-ছি, এত বড় ছেলে, অমন ক'রে কাঁদে নাকি? লোকে শুনলে কী বলবে?'

কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে ভাঙা-ভাঙা গলায় ব'লে উঠলো ভোমরা: 'না, কাঁদবে না—আহ্লাদে ধেই-ধেই ক'রে নাচবে! পাজি জোচ্চোর গুণ্ডা!'

গণ্শার মুখ একবার হাঁ ক'রেই টপ্ ক'রে আবার বুজে গেলো। পাণ্ডাজির কাছে একবার ধমক খেলে সেটা সহজে ভোলবার নয়। কিন্তু এ সব হচ্ছে কী? পাণ্ডাজি এখনো যদি ছেলেটাকে শায়েস্তা না করে, তা হ'লে একেবারে বেসামাল হ'য়ে উঠবে যে!

ভোমরা চীৎকার ক'রে বলতে লাগলো: 'দিয়ে এসো আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে, ডাকো তোমাদের গাড়ি—আজ যে আমি বায়োস্কোপে যাবো বিরিঞ্চির সঙ্গে।' তার পরেই অন্য রকম সুরে বললে: 'কই, বিরিঞ্চি নাকি আজ আসছে এখানে?'

সর্দার মুচকি হেসে বললে: 'বিরিঞ্চি এলে তোমার আর এখানে থাকতে কষ্ট হবে না?'

নাক কুঁচকে বললে ভোমরা: 'ব'য়ে গেছে আমার তোমাদের এখানে প'চে মরতে। যা গরম! আচ্ছা, ইলেক্‌ট্রিকের আলো নেই কেন তোমাদের? আর পাখা?'

সর্দার বললে: 'আমরা গরীব মানুষ—কোথায় পাবো ও-সব?'

'গরীব না হাতী! কত বড় মোটর-গাড়ি তোমাদের! কী গাড়ি ওটা? অস্টিন?'

'তুমি বুঝি খুব গাড়ি চড়তে ভালোবাসো?'

'আরে তাই জন্যে তো তোমার ঐ হাঁদা দুটো আমাকে ধরতে পারলো। নয়তো ওরা আমাকে এখানে নিয়ে আসতে পারতো নাকি ভেবেছো?'

'পাগল! তোমার বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে উঠবে ওরা!'

ভোমরা সন্দেহের চোখে মিটমিট ক'রে তাকিয়ে বললে: 'ঠাট্টা করছো—না?'

'না, না, ঠাট্টা করবো কেন? তোমার কেলাশে তুমি যে ফাষ্ট বয় তা তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি।'

ভোমরা খিলখিল ক'রে হেসে বললে: 'ইস্—তুমি যেন সবজান্তা! ফার্স্ট বয় তো অমূল্য, থাকে মনোহরপুকুরে। আমি ফার্স্ট হবো কেমন ক'রে—অঙ্কে তো লাড্ডুমার্কা। অমূল্যকে চেনো তুমি?'

সর্দার ঘাড় নেড়ে বললে, 'না। আরো কত ভালো-ভালো লোককে চিনি নে কে জানে!'

'ওঃ, ভালো বলতে হয় তো বিরিঞ্চি! পরীক্ষায় ফার্স্ট হ'লেই ভালো হ'লো বুঝি! তুমিও যেমন! বিরিঞ্চির কাছে ক্লাশের একটা ছেলেও কি দাঁড়াতে পারে!'

'—তুমি ছাড়া।'

'তা তো বলবেই, তা তো বলবেই!' কোঁকড়া চুল দুলিয়ে হেসে উঠলো ভোমরা। 'আনতে যদি বিরিঞ্চিকে এখানে, তা হ'লে দেখিয়ে দিতাম!'

'কী দেখিয়ে দিতে ?'

'তোমরা তো গুণ্ডা—আমাদের চুরি ক'রে এনেছো। বেশ—আমরাও যেতাম পালিয়ে, ধরতে পারতে না।'

'কী ক'রে পালাতে ?'

'তা বলবো কেন ? তবে ও-সব ফাঁক-ফন্দী ঠিক জানা আছে আমাদের। এত রাজ্যের রোমাঞ্চকর য়্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়লাম—আর এ-ও পারবো না ! আমরা কি তোমাদের চেয়ে কম ! তাও তোমরা শার্লক্ হোম্‌স্‌-এর গল্প পড় নি।'

'সে আবার কে ?'

ভোমরা হেসে বললে,—'কেমন ! বলি নি ? কোত্থেকে জানবে তোমরা ও-সব ? যত বড়ই ধূর্ত্ত হও না, শার্লক্ হোম্‌স্‌-এর হাতে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই।'

সর্দার ভয়ে ভয়ে বললে, 'লোকটা আমাদের দেশে থাকে না তো !'

এবার ভোমরা হাসতে হাসতে একেবারে লুটিয়ে পড়লো।—'কী যে বলে ! কী বোকা ! তুমি একেবারে মূখ্যু দেখছি। শার্লক্ হোম্‌স্ ব'লে সত্যি-সত্যি একজন আছে বুঝি ? ও তো ইংরিজি বইয়ের গল্প।'

'ও, গল্প ? তাই বলো।' ব'লে সর্দার নিঃশ্বাস ছাড়লো। 'তা তুমি যখন এতই জানো, তখন একাই হয়তো একদিন পালিয়ে চ'লে যাবে—কী বলো ?'

ভোমরা অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'অসম্ভব কী ?'

'তা হ'লে তো আমাদের খুব সাবধান হ'তে হয়। মাটির নীচে আমাদের একটা ঘর আছে—সেখানেই তোমাকে রাখি। কী বলো ?'

ভোমরার মুখ তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে গেলো, কিন্তু ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে দস্তুরমত হুমকি দিয়ে সে বললে : 'ওঃ, রাখো না ! ভারী তো !'

'তুমি যে রকম ভয়ানক মানুষ, তোমার হাত দুটোও তা হ'লে বেঁধে রাখতে হয়।'

'ভয় দেখাচ্ছো তো ? ছোঃ ! আর কি করবে ? টুকরো-টুকরো ক'রে কাটবে না হাত-পা ?'

'দরকার হ'লে কাটতে হবে বই কি।'

'এসো না কাটতে। কান কামড়ে যখন ছিঁড়ে ফেলবো, টের পাবে মজা। কই, বিরিঞ্চিকে আনতে যাবে না ঐ তুই গঙ্গারাম ? নাকি আর ক্যারদানিতে কুলোচ্ছে না ?'

গণ্‌শা আর থাকতে না পেরে ব'লে উঠলো 'দ্যাখ্, ফের ও-রকম কথা বলবি তো এক আছাড়ে ঘিলু বার ক'রে দেব।'

'বলবো তো ! একশ' বার বলবো। বিরিঞ্চিকে ধ'রে আনতে পারতে তবে বুঝতুম কেরামতি ! অত সাহস আছে নাকি তোমাদের ?'

গণ্‌শা চোখ লাল ক'রে হুঙ্কার ছেড়ে বললে, 'চুপ ! চুপ বলছি।'

ভূগোলের ঈশান বাবুর ধমক শুনে যেমন হয়, তেমনি কেঁপে উঠলো ভোমরার বুক। চট্ ক'রে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে : 'সত্যি কথা ব'লেই তো এত লাগছে। আর যাবে ও-পাড়ায় ! পুলিশ সব ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে না ! ক্যাঁক্ ক'রে ধ'রে সোজা আন্দামান !'

সর্দার হেসে উঠলো।

বললে মাণ্‌কে : 'পাণ্ডাজি, তুমি হাসছো ? এ সব বেয়াদবির এতটা আস্কারা দেয়া কি ভালো হচ্ছে ?'

বললে গণ্‌শা : 'এদিকে আজকের কাজকর্ম্ম কিছুই তো এখনও আরম্ভ হ'লো না।'

সর্দার হাসিমুখে বললে : 'তোদের এক-একজনকে দেখছি কাজের ভূতে পেয়ে বসেছে। গণ্‌শা, তুই যা, সকলকে ব'লে দিয়ে আয়। আজ শনিবার, বাঞ্ছারাম যাবে ব্যারাকপুরের ঘোড়দৌড়ে। সাবধানে হাত চালায় যেন। আর বৌবাজারের গয়নার দোকানে পাঠিয়ে দে আলতাফকে হীরের আংটি কিনতে। কী করতে হবে ও সব জানে। বেশি বক্‌বক্ না করে যেন, তা হ'লেই সন্দেহ হবে। আর সেই আসামী রাজার কথা অবিশ্যি ভুললে চলবে না। সে পরে হবে। আজ তো আর বিশেষ কিছু দেখছি না।'

'পাণ্ডাজি, তোমার যেন আজ তেমন কাজে মন নেই।'

'যা, যা—যা বলছি তা-ই কর্ গে। তোদের কি বুদ্ধি আছে যে বুদ্ধি ধার দিতে চাস্? আর মাণ্‌কে, তুই যা, কেষ্টকে ব'লে দিয়ে আয় কিছু খাবার নিয়ে আসতে। গরম দুধও আনে যেন এক পেয়ালা। যা—দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

বাঁকা চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চ'লে গেলো পাণ্ডাজির ডান হাত ও বাঁ হাত। তখন ভোমরা বললে: 'তোমার চ্যালাদের পাঠালে বুঝি চারদিকে চুরি-জোচ্চুরি করতে? লজ্জা করে না?'

'আমাদের জন্য কারো কি লজ্জা হয় যে আমাদের লজ্জা করবে?'

'উঃ, আমি তো ভাবতে পারি নে! চোরের সর্দারি ক'রে আছো বেশ! আচ্ছা, আমাকে যে ধ'রে এনেছো এতে তোমাদের কী লাভ হবে?'

সর্দার মুচকি হেসে বললে, 'বলো তো কী লাভ? বুদ্ধির পরীক্ষা নিচ্ছি তোমার।'

ভোমরা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে: 'জানি, জানি। কিছু টাকা পেলে তবে আমাকে ছাড়বে, এই তো? আমেরিকায় কত হচ্ছে আজকাল এই রকম। তা কত টাকা চাই তোমার?'

ভোমরা এমন সহজভাবে বললে কথাটা যে শিবু সর্দারও একটু থতমত খেয়ে গেলো। একটু পরে বললে, 'কত আর—ধরো, দশ হাজার।'

ভোমরা বললে: 'না, দশ হাজার টাকা দিতে পারবো না। তবে আমাকে যদি এক্ষুণি বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো তা হ'লে মা'র কাছে চেয়ে দশ টাকা ঠিক দেবো তোমাকে। রাজি?'

শিবু সর্দার বললে, 'না, দশ টাকায় পারবো না।'

'তবে কলা খাও। এর বেশি কেউ দিতেই গেছে তোমাকে! টাকা অত সোজা কথা কিনা! বায়োস্কোপের জন্য আট আনাই দিতে চান না মা। তবে এবার পূজোর সময় আমাকে দিয়েছিলেন দশ টাকার একটা নোট।'

'বেশ তবে। যত দিন টাকা না পাচ্ছি, তোমাকে ছাড়ছিও না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আর ভয় দেখাতে হবে না। আমার মত ছোট ছেলের

উপরেই তো ষণ্ডামি করবে—সাবাস্ বীরপুরুষ। তাও তো ঝিরিঝিকে আনবার কথায় ল্যাজ গুটোলে?' হঠাৎ মুখ-চোখ উজ্জ্বল ক'রে ভোমরা বললে, 'ও—বুঝেছি। পাঠিয়েছিলে বিরিঞ্চিকেই আনতে—ওর বাবার কিনা ঢের টাকা, এক লাফেই বড়লোক! এদিকে তোমার নন্দী-ভৃঙ্গী ভুল ক'রে নিয়ে এসেছে আমাকে—আমার জন্যে দশ টাকার বেশি পাচ্ছো না। টাকডুমাডুম্ তাধিন্‌ধিন্।'

কপাল কুঁচকে বললে সর্দার: 'ইস্, বড় খুসী যে! বিরিঞ্চির বাপের এত টাকা যে তুই আর আমি এক মাস ব'সে গুণে শেষ করতে পারবো না। তা থেকে কিছু খসলে তোর গায়ে ফোস্কা পড়তো নাকি?'

চোখ ঘুরিয়ে জিভ বার ক'রে বললে ভোমরা: 'টাকডুমাডুমডুম্! আক্কেল গুড়ুম্!'

সর্দার তার ফাজলেমি গায়েও মাখলো না। বললে, 'অত টাকা তো কারুরই কোন কাজে লাগে না—আমরা দু'-চার ফোঁটা পেলে খেয়ে বাঁচি।'

'ইস্—দেবে কেন তোমাদের টাকা? যে চোর, যে গুণ্ডা, তাকে বুঝি কেউ কখনও টাকা দেয়!'

'দেবে বই কি, আলবৎ দেবে! কী ক'রে আদায় করতে হয় জানি। তোর কাকাবাবুর ঘাড় মটকেই আদায় করবো।'

ভোমরা অবাক্ হ'য়ে গিয়ে বললে, 'কাকাবাবুর কথা তুমি জানলে কেমন ক'রে?'

'তোর সেই পুলিশ সায়েব দাদামশায়ের ভূত এসে খবর দিয়ে গেছে।'

মিথ্যে কথা ধরা প'ড়ে ভোমরা একটু লজ্জিত হ'লো বই কি। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে হ'য়ে সে লাফিয়ে উঠলো।

—'ও, বুঝেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে আর কি, নয় তো তুমি আবার অত জানবে! কেমন, ঠিক না?'

সর্দার বললে, 'সবই যদি তুমি জানো তা হ'লে আমাকে আর জিজ্ঞেস করো কেন?'

‘কই, দেখাও না আমাকে একটু কাগজটা। য়্যাঁ, দেখাবে? নাম বেরিয়েছে আমার?’

‘ছবিও বেরিয়েছে।’

‘ছবিও! উঃ, একটু দেবে না দেখতে?’ ভোমরা তার খুসির ঝোঁকটা সামলাতে না পেরে জোরে মাথা ঝেঁকে উঠলো। সত্যি-সত্যি খবরের কাগজে নাম আর ছবি বেরুলো, সোজা কথা নাকি? ক’জনের বেরোয়! ‘দেবে না?’

‘আচ্ছা দেবো।’

‘দেবে তো? ঠিক? উঃ, তুমি খুব ভালো। তোমাকে বলি নি তুমি অনেকটা আমার ঝরিয়ার মামাবাবুর মত দেখতে। আচ্ছা, ওরা তো তোমাকে পাণ্ডাজি ব’লে ডাকে, কিন্তু তোমার আসল নামটা কি?’

সর্দার গম্ভীর হ’য়ে বললে, ‘বলো তো আমার কী নাম?’

হেসে বললে ভোমরা, ‘নাম তোমার, বলবো বুঝি আমি!’

‘তবে শোন। প্রথমে আমার নাম ছিলো গ্যাবং-গং, তার পর হ’লো কটকটি-বিট্‌কেল, তার পর হ’লো হাম্বুগোমারু, তার পর এখন তো চুংক্ষু নাম নিয়েই চালাচ্ছি।’ ব’লে, যেন দস্তুরমত মন খারাপ ক’রে, চুপ করলো সর্দার।

হাসতে হাসতে ভোমরার প্রায় দম আট্‌কে যায় আর কি।—‘ও বুঝেছি, আবার বুঝি এখন তোমার নাম বদলের সময়? তুমি মামাবাবুর মত দেখতে কিনা, তোমার নাম হ’লো তাই মাম্বু।’

সর্দার বললে, ‘বাঃ, বেশ, বেশ।’

‘মাম্বু! মাম্বু!’ হাত-তালি দিতে দিতে ভোমরা বলতে লাগলো: ‘মাম্বুবাবু জাম্বুমান, জহ্নুমুনির গঙ্গাপান!’ তার পর, একটু থেমে, চক্‌চকে চোখে সর্দারের দিকে তাকিয়ে বললে: ‘মাম্বু-জাম্বু, কু—ঈ!’

সর্দার বললে, ‘এইবার ঠিক হয়েছে। মাম্বু-জাম্বু একটা নামের মত নাম।’

এমন সময়ে মাণ্‌কে এলো একটা মাটির খুরিতে দুধ আর শালপাতার ঠোঙায় খাবার নিয়ে। পাণ্ডাজি এখনও এই ছেলেটার বাজে বক্‌বকানি শুনছে ব’সে-ব’সে।

সকাল থেকে শিবু সর্দারের এক মুহূর্ত্ত সময় নেই—কত কাজ, কত ভাবনা, নতুন-নতুন ফন্দী-ফিকির রোজই এই লোকটির মাথা থেকে বেরুচ্ছে। আজ হ’লো কী তার? মাণ্‌কে অবাক্ হ’য়ে গেলো। (ক্রমশঃ)

নানা কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এস্‌-সি)

সাগর-তলার রহস্য

পৃথিবীতে কত না বিচিত্র দেশ আর কত না বিচিত্র দৃশ্য! মানুষ তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে চায়,—এজন্য কত না পরিশ্রম, কত না বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে! আফ্রিকার ধূ ধূ-করা মরুভূমির মধ্যে, আমাজনের চোখ অন্ধ-করা গহন জঙ্গলের মধ্যে, মেরুর দেশে রক্ত-জমান বরফের মধ্যে—এই রকম কত বিপদ্‌সঙ্কুল জায়গায় আবিষ্কারকেরা প্রাণ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সে সবের কাহিনী তোমরা অনেক বার শুনিয়াছ। কিন্তু আমাদের চোখের আড়ালে আরও বিরাট্, আরও আশ্চর্য্য—এক কথায় কল্পনারও অতীত আর এক বিশাল রাজ্য পড়িয়া আছে সে কথা যেন আমাদের মনেই আসে না! আমি সমুদ্রের তলার অদ্ভুত রাজ্যের কথা বলিতেছি। অমন আশ্চর্য্য জায়গা পৃথিবীর কোথাও নাই। কত অদ্ভুত অদ্ভুত গাছ, শ্যাওলা, জঙ্গল—কত অদ্ভুত অদ্ভুত পাহাড়, কত রং-বেরংএর বিচিত্র জানোয়ার সে রাজ্যে ছড়াইয়া আছে তার কতটুকুই বা মানুষ জানে? তার কোনটা বা ৮।১০টা হাতীর মত বড়, বাঘ-সিংহের চেয়েও হিংস্র, আর তেমনি বীভৎস, আবার কোনটা বা ফুলের মত—শিল্পীর হাতে-আঁকা ছবির মত সুন্দর। তার কোনটার বা গা হইতে বিদ্যুৎ বাহির হইতেছে, কোনটার গা হইতে তীব্র রঙ্গিন আলো বাহির হইতেছে—কত আর বর্ণনা করিব?

এমন অদ্ভুত রাজ্যে কার না যাইতে ইচ্ছা করে? কিন্তু ইচ্ছা করাটা যত সহজ যাওয়াটা তত সহজ নয়। ডুবুরীরা অদ্ভুত পোষাক পরিয়া, নিঃশ্বাস লইবার

নানা রকম ফন্দী-ফিকির করিয়া সমুদ্রের তলায় নামে বটে, এবং অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্যও অফুরন্ত দেখিতে পায় কিন্তু খুব বেশী নীচে তারা যাইতে পারে না, এবং একেবারে নিরাপদ ভাবেও যে থাকে এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

সাগর-তলার অদ্ভুত অরণ্য

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোন কিছুই আধখানা করিয়া রাখিতে রাজী নন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর উইলিয়াম্ বীবের কথা একবার তোমাদের সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম। ডাঙ্গা হইতে হাজার হাজার ফীট্ নীচে সমুদ্রের তলায় গিয়া তিনি যে অদ্ভুত রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন তার কথা তোমাদের আর একটু বলিতে চাই।

উইলিয়াম্ বীব্ আর কেউ নন, তিনি একজন বড় প্রাণিতত্ত্ববিদ্—নিউইয়র্কের প্রাণিতত্ত্ব-পরিষদের একজন কর্ত্তা। সমুদ্রের রহস্য সম্বন্ধে তিনি আজীবন গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য তাঁকে ভাল করিয়া ডুবুরীর বিদ্যা শিখিতে হইয়াছে। কয়েক বছর আগে একবার তিনি সারগাসো সমুদ্রে গিয়া সাগর-তলার অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তথ্য যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন; সমুদ্রের তলায় 'এয়ার-টাইট্' ক্যামেরা লইয়া গিয়া মাছেদের জীবন-যাত্রার ছায়াচিত্র পর্য্যন্ত তুলিয়া

আনিয়াছিলেন, সেখানকার অদ্ভুত আলোকধারী মাছ জ্যান্ত ধরিয়া আনিয়া ডাঙার উপর অন্ধকার ঘরে তার আলোর খেলা দেখাইয়াছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে এই অসমসাহসিক কাজ করা অসম্ভব হয় নাই।

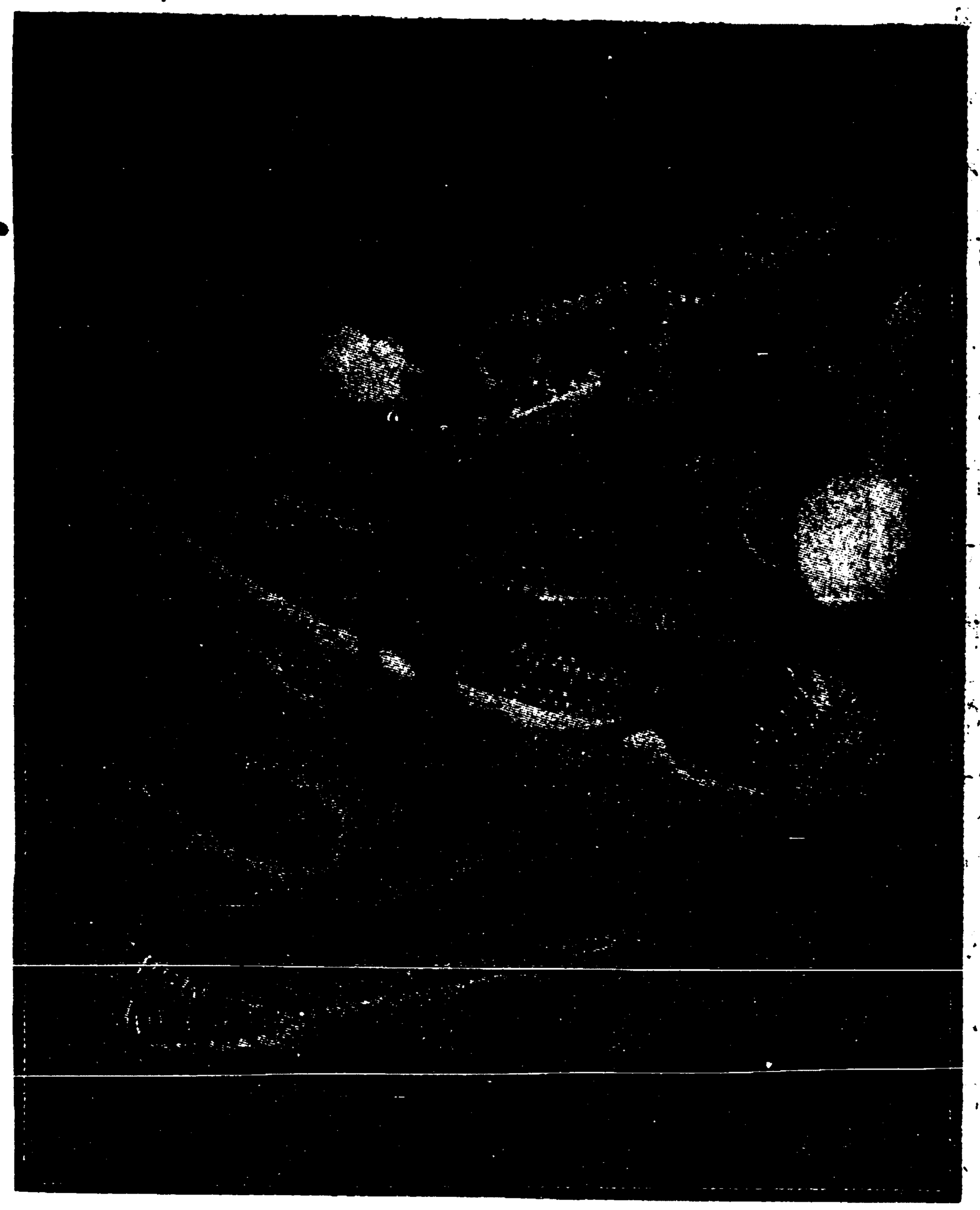

সাগরের নীচে মাছের গা হইতে আলো বাহির হইতেছে।

বীব্ কি করিয়াছিলেন জান? ইস্পাত দিয়া প্রকাণ্ড একটা ঘর তৈরী করিয়াছিলেন—ঘরটি দেখিতে ঠিক একটা বলের মত, কিন্তু এমনই কায়দায় তৈরী যে তার মধ্যে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলে তা একেবারে 'এয়ার-টাইট্' হইয়া যাইবে অর্থাৎ তার মধ্যে এক ফোঁটা বাতাস বা আর কিছু ঢুকিতেও পারিবে না, বাহির হইতেও পারিবে না। বলের মধ্যে কোয়ার্ট্‌জের তৈরী কতকগুলি জানালা আর সার্চ্চ লাইট্ ফেলিবার যন্ত্র বসান হইয়াছিল। আর বসান হইয়াছিল কয়েকটা কলের হাত—যা দিয়া ইচ্ছা করিলেই সমুদ্র হইতে কোন জিনিষ তুলিয়া লওয়া যায়। বলের দেয়াল আর জানলা এমন শক্ত করা হইয়াছিল যে বল্‌টা জলের তলায় ৫০০০ ফুট নামাইয়া দিলেও জলের প্রচণ্ড চাপ (প্রতি ইঞ্চিতে ২৮ মণেরও উপর) তার কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না। শুধু তাই নয়, বলের মধ্যে অক্সিজেন তৈরী করিবার একটা যন্ত্রও বসান হইয়াছিল—যাহাতে

নিঃশ্বাস লইবার জন্ত জলের উপরকার জাহাজের উপর নির্ভর করিতে না হয়। উপরের সঙ্গে যোগ ছিল শুধু একটা ইস্পাতের কেব্‌ল্ দিয়া—তার ভিতর দিয়া একটা টেলিফোন লাইনও বসান হইয়াছিল।

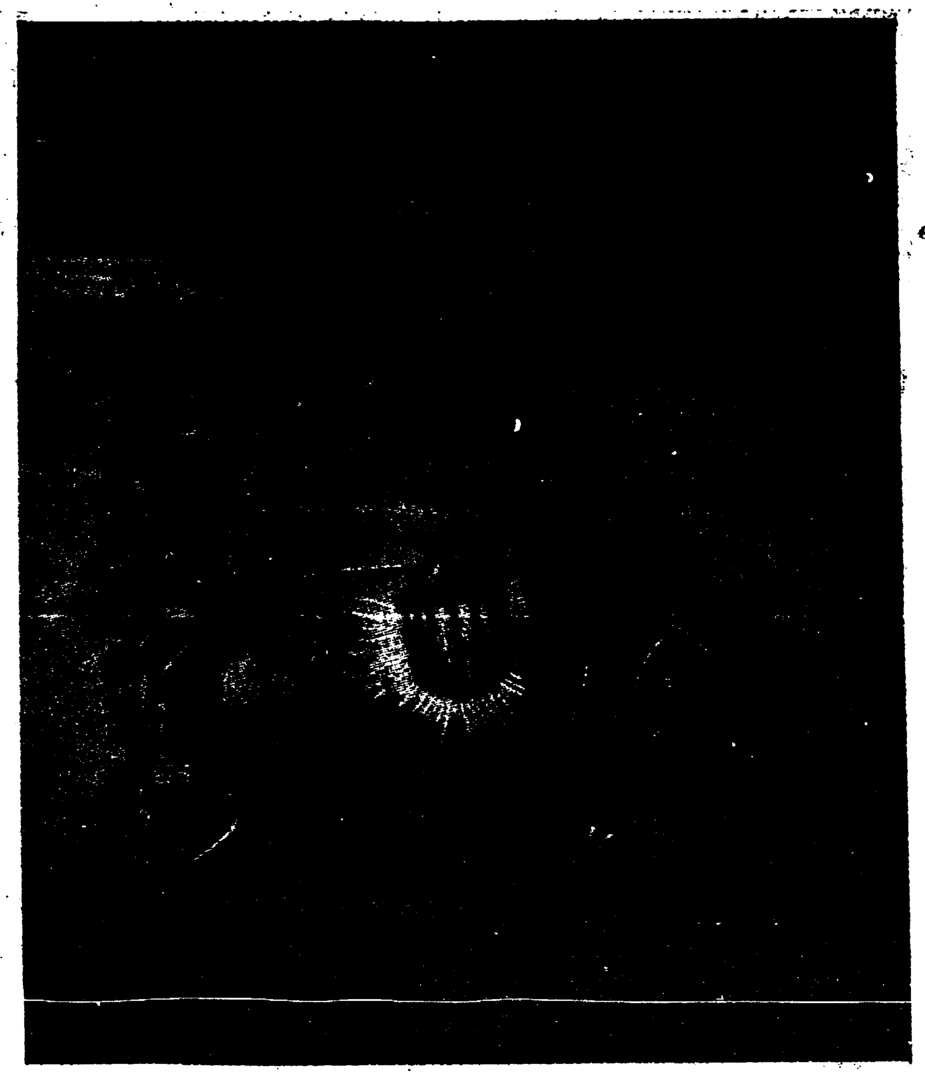

গভীর সমুদ্রে নামিয়া সেখানকার হাল-চাল পরীক্ষা করিবার জন্য তৈরী অদ্ভুত ইস্পাতের ঘর।

তার পর সেই অদ্ভুত বলে চড়িয়া বীব্ সাহেব তো গভীর সমুদ্রের তলায় নামিয়া গেলেন। কী অদ্ভুত দৃশ্যই না তাঁর চোখে পড়িল! তিনি দেখিলেন জলের তলায় প্রকাণ্ড অরণ্য, অদ্ভুত মাছ, তার চেয়েও অদ্ভুত সব জানোয়ার আর গাছ! তাদের গা হইতে কত রকম অদ্ভুত আলো বাহির হইতেছে! বীব্ সাহেব সে সব আলো লইয়া পরীক্ষা করিতে কসুর করিলেন না, যখন যা সুবিধামত পাইলেন সংগ্রহ করিলেন, আর কি দেখিতেছেন তার হুবহু বর্ণনা সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের সামনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন; জলের উপরে জাহাজে বসিয়া তাঁর ষ্টেনোগ্রাফার সঙ্গে সঙ্গে শর্ট্-হ্যাণ্ডে তা টুকিয়া লইতে লাগিল—সে কত কথা!

বীব্ সাহেবের যোগাড়-করা এই সব তথ্য ও তাঁর বিভিন্ন সংগ্রহ সাগরতত্ত্ব সম্বন্ধে—বিশেষতঃ প্রাণিবিজ্ঞানে একটা নতুন দিক্ খুলিয়া দিয়াছে; তার উপর গবেষণা করিয়া অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরাও বহু 'নতুন কিছু'র সন্ধান দিতেছেন।

জিভারোদের কথা

জিভারো নামটার সঙ্গে তোমরা হয়তো পরিচিত নও। দক্ষিণ আমেরিকায়

আমাজনের উপনদী পাস্‌টাজা, মোরোনা প্রভৃতির নাম শুনিয়াছ কি? বোধ হয় শোন নাই। এই সব নদীর ধার দিয়া এক রকম অসভ্য জাত বাস করে—তাদেরই নাম জিভারো। ...

জিভারোরা অসভ্য জাত, কিন্তু স্বাধীন। এদের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা আছে, তারই কথা তোমাদের বলিব। এদের আর এক নাম নরমুণ্ডশিকারী। এদের ধারণা শত্রুকে মারিয়া তার মাথাটা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে সেই শত্রুর মৃত আত্মা মাথার মালিকের ক্রীতদাস হইয়া থাকে—তাকে দিয়া প্রয়োজন মত অনেক কাজ করান যায়। কাজেই যে যত নরমুণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিবে পৃথিবীতে তার তত ক্ষমতা হইবে। নরমুণ্ড অবশ্য শত্রুপক্ষের অর্থাৎ বিজাতীয়ের হওয়া চাই।

ধর, কোনও জিভারো-গ্রামের কোন লোক অসুখ হইয়া মারা গেল; মৃতের কোন আত্মীয় অমনি সংবাদ দিবে, অমুক গ্রামের অমুক লোকদের জন্যই এই মৃত্যু ঘটিয়াছে। অমনি গ্রামশুদ্ধ লোক ঢাল, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেই গ্রাম আক্রমণ করিবে। তার পর চলিবে ভীষণ যুদ্ধ এবং বিজয়ী দল শত্রুপক্ষের কাটামুণ্ড লইয়া ঘরে ফিরিবে।

কিন্তু আস্ত নরমুণ্ড কাটিয়া তো ঘরে রাখা যায় না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইবে যে! এজন্য জিভারোরা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে। কি ভাবে যে করে সভ্য মানুষেরাও তা ধরিতে পারে না—অসভ্য জাতের মাথায় এ বুদ্ধি আসিল কোথা হইতে? কাটা মাথা লইয়া তারা প্রথমে তার নীচের দিকে গর্ত্ত করিয়া খুলি, মাংস সব বাহির করিয়া ফেলে। তার পর সেটা লইয়া জলের মধ্যে কোন্ এক গাছের ডালপাতা দিয়া সিদ্ধ করে। তার পর তা' নামাইয়া তার মধ্যে খুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা গোল পাথর ভরিয়া সেলাই করিয়া ফেলে, আর একটা পাথর গরম করিয়া তাই দিয়া মুণ্ডটিকে ইস্ত্রি করে। ফলে হয় কি, মাথাটা কুঁচকাইয়া ছোট হইয়া যায় কিন্তু মুখের চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তার পর পাথরটা বাহির করিয়া তার জায়গায় তার চেয়ে ছোট আর একটা পাথর ভরিয়া দিয়া আবার ইস্ত্রি করা হয়। এমনি ভাবে কয়েক বার করার পর মাথাটা কুঁচকাইয়া একেবারে ছোট

হইয়া যায়, মুখের ভাব কিন্তু তখনও বদ্‌লায় না। তার পর ঠোঁটে রং-চংএ সুতো ঝুলাইয়া এই মূল্যবান্ জিনিষগুলিকে ঘরে সাজাইয়া রাখা হয়।

আগেই বলিয়াছি জিভারোদের ধারণা যার ঘরে যত নরমুণ্ড থাকিবে সে তত ক্ষমতাবান্ হইবে। কাজেই নরমুণ্ডের খোঁজে জিভারোরা অনেক অপকর্ম্ম করিতে ইতস্ততঃ করে না। কিছু দিন আগে আমেরিকার কোন কোন মিউজিয়ামে এই নরমুণ্ড রাখিবার চেষ্টা হইতেছিল। এক-একটা নরমুণ্ডের দাম অনেক দেওয়া

একজন জিভারো ও তার সংগৃহীত দু'টি নরমুণ্ড

হইত। টাকার লোভে জিভারোরা শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের জাতভাইদের মাথাই সংগ্রহ করিতে সুরু করিয়া দিয়াছিল—বহু কষ্টে নরমুণ্ড বিক্রী বন্ধ করিয়া তা' থামাইতে হইয়াছে।

আজকাল সভ্য জাতিদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় জিভারোরাও একটু একটু সভ্য হইতেছে। পৃথিবীতে এখন প্রায় ২৫,০০০ জিভারো আছে।

চুম্বক-চরিত

চুম্বক কি তা' তোমরা সকলেই বোধ হয় জান, চুম্বক লইয়া নাড়া-চাড়াও হয়তো তোমরা অনেকেই করিয়াছ। চুম্বকের একটা গুণ এই যে তার কাছে কোন লোহার জিনিষ লইয়া গেলে সে সেটা প্রাণপণে টানিয়া ধরে। চুম্বকের আর একটা গুণ—বড় একটা চুম্বকের দুই মুখের মাঝখানে খানিকটা কুণ্ডলী-পাকান তামার তার জড়াইয়া তাড়াতাড়ি ঘুরাইলে তার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিতে থাকে। চুম্বকের এই গুণ কাজে লাগাইয়া বিদ্যুৎ তৈরীর 'ডায়নামো' তৈরী হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরী ছাড়াও নানা কাজে চুম্বক ব্যবহার করা হয়। তেমন তেমন এক-একটা চুম্বকের শক্তি বড় কম নয়, নীচের ছবিটা দেখিলেই তা' টের পাইবে। ছবিতে দেখ একটা চুম্বক প্রকাণ্ড একটা লোহার ডাণ্ডাকে টানিয়া ধরিয়াছে আর ৭।৮ জন লোক সেই ডাণ্ডা ধরিয়া ঝুলিতেছে, তবু সে ডাণ্ডাকে নামাইতে পারিতেছে না। আর একটা ছবিতে দেখ ক'জন বড় বড় পালোয়ান্ প্রাণপণ চেষ্টায়ও দু'টা লোহার হাতুড়িকে চুম্বকের টান হইতে ছাড়াইতে পারিতেছে না।

চুম্বকের শক্তি

শক্তিশালী চুম্বকগুলি কিন্তু সবই প্রায় বৈদ্যুতিক চুম্বক। লোহার গায়ে তামার তার জড়াইয়া তার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে লোহা এই রকম চুম্বক হইয়া যায়, আবার বিদ্যুৎ চালান বন্ধ করিলেই হয় সেই সাধারণ লোহা।

বৈদ্যুতিক চুম্বকের এই প্রচণ্ড শক্তিকে বুদ্ধিমান্ মানুষ ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়, তাকে দিয়া সে নিজের কাজ করাইয়া লইতে কসুর করে নাই। আজকাল বড় বড় কারখানায় কপিকলের সঙ্গে চুম্বক লাগাইয়া লোহার কড়ি-বরগা বা অন্য

কোনও ভারী লোহার জিনিষ অতি সহজেই তুলিয়া অন্য জায়গায় নেওয়া হইতেছে। ভাঙ্গা লোহালক্কড় তুলিয়া জায়গা পরিষ্কার করিতে হইবে—অনেক কুলির দরকার; একটা চুম্বককে সে কাজে লাগাইয়া দিতেই সে একা শত শত কুলির কাজ অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক বেশী শৃঙ্খলার সহিত করিয়া দিতেছে। ডাক্তারীতেও চুম্বকের ব্যবহার চলিতেছে। কারো হাতে বা শরীরে হয়তো লোহার কুচি বা লোহার কাঁটা বা পেরেক ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া গিয়াছে, অস্ত্রোপচার ছাড়া বাহির করা

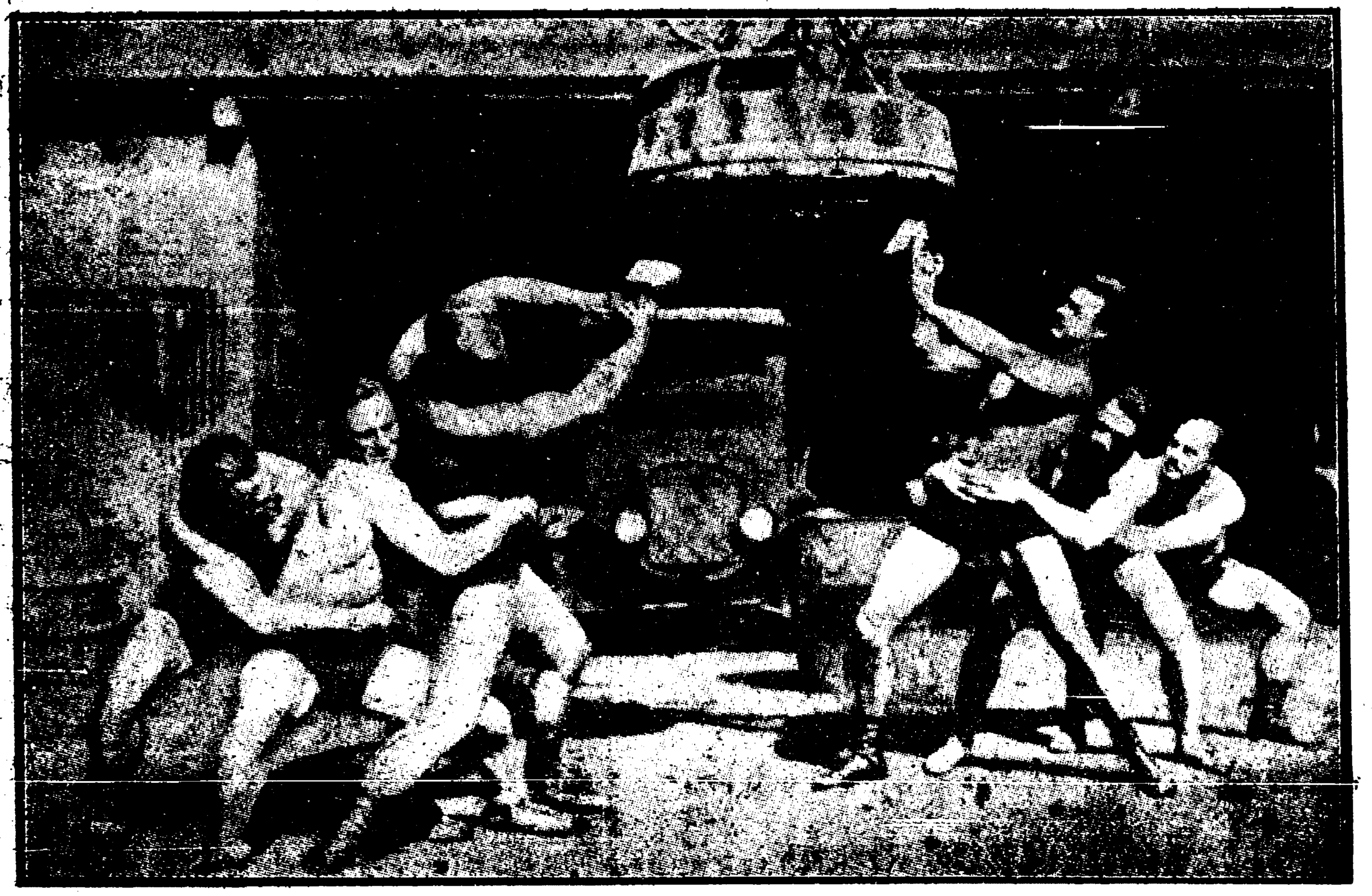

চুম্বকের শক্তির আর একটি নমুনা

সম্ভব নয়। ডাক্তার কিন্তু ছুরি-কাঁচির ধার দিয়াও যাইতেছেন না, একটা সরু পেন্সিলের মত চুম্বকের সাহায্যে চোখের নিমেষে সে ভাঙ্গা লোহা টানিয়া বাহির করিতেছেন।

চুম্বককে এই রকম আরও অনেক নতুন নতুন কাজে সুবিধা পাইলেই বৈজ্ঞানিকেরা লাগাইতেছেন—তবে এ সবের মধ্যে প্রধান হইতেছে নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে।

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

(সম্পাদক)

তোমাদের মধ্যে যারা নিয়মিত ভাবে খবরের কাগজ পড়ে থাক তারা নিশ্চয়ই জেনেছ যে গত ৩০শে ফাল্গুন, সোমবার কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নামে এক পুণ্যাত্মা পৃথিবী ছেড়ে পরলোকে চলে গেছেন। খুব সম্ভব খবরের কাগজে দেওয়া বিবরণ-টুকু ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে তোমরা আর বিশেষ কিছু জান না; না জানবার কথাই বটে, কেননা তিনি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর কীর্ত্তিকলাপ খবরের কাগজে যাতে কিছুতেই বার হতে না পারে সেজন্য একজন ব্যক্তি বরাবর চেষ্টা করে আস্‌ছিলেন—তিনি স্বয়ং হেমেন্দ্রনাথ। আজ তাঁর অভাব ঘটেছে, তাই তাঁর সম্বন্ধে আর কোন কথাই চাপা নেই—লোকের মুখে মুখে, খবরের কাগজের পাতায় পাতায় সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়্‌ছে।

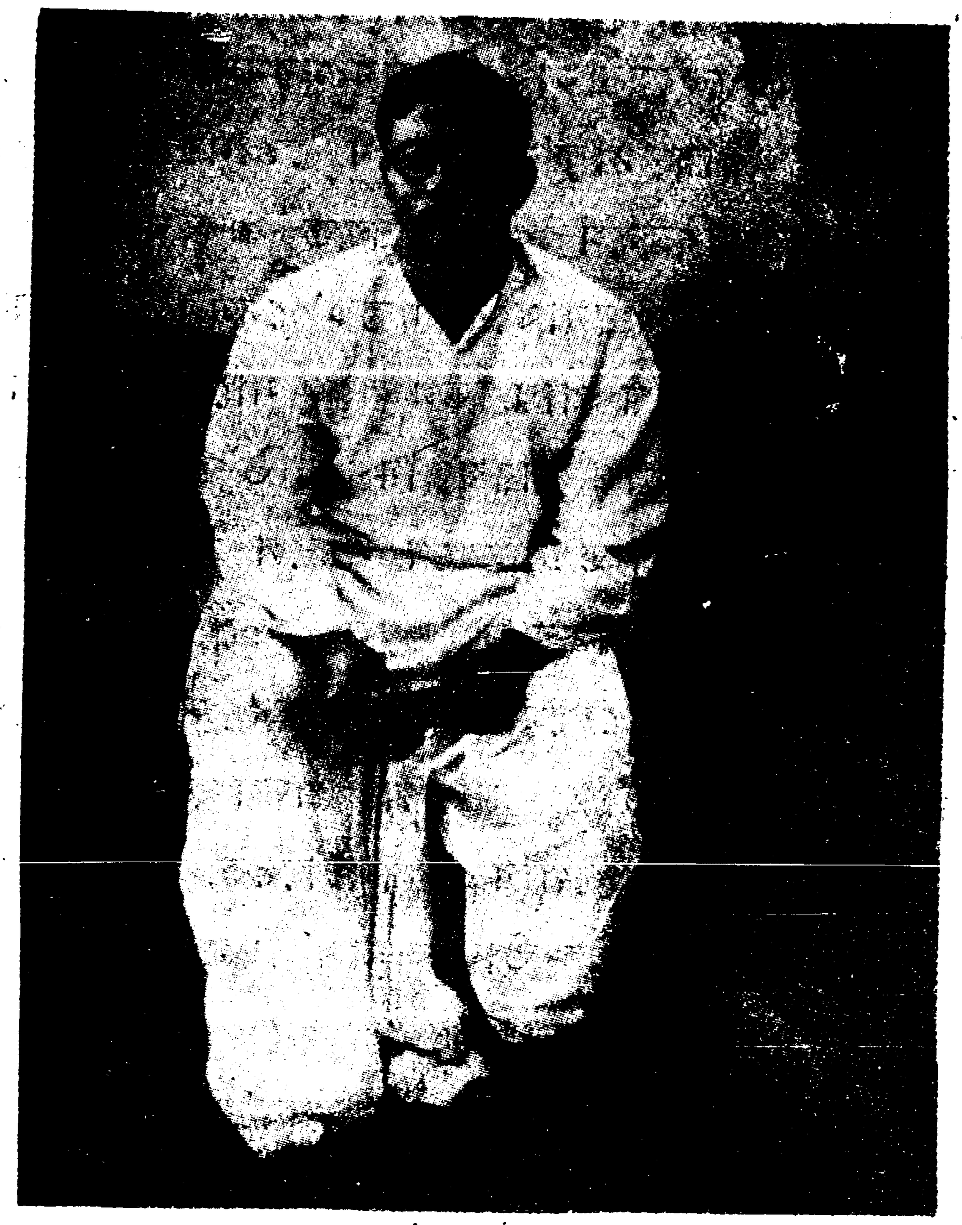

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

নারদ মুনিকে একবার কবিগুরু বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত সংগুণ একই লোকের মধ্যে রয়েছে এমন পুরুষ কে আছে? জবাবে মুনি বলেছিলেন, 'রামচন্দ্র'। হেমেন্দ্রনাথকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে চিন্‌তেন তাঁদেরকে কেউ এ যুগ সম্বন্ধে ওই ধরণের প্রশ্ন করলে, আমার মনে হয় তাঁরা করতেন হেমেন্দ্রের

নাম। মানুষ হাজার গুণে গুণী হলেও ছোটখাটো একটু-আধটু খুঁৎ প্রায় সকলের মধ্যেই থেকে যায়, কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের চরিত্রে যে সামান্য একটু খুঁৎও ছিল এ কথা তাঁর অতি-বড় শত্রুও বল্‌তে পারবে না। কথাটা লিখ্‌তে গিয়েও প্রকাণ্ড এক ভুল করে-বস্‌লাম—অতি-বড় শত্রুতা তো দূরের কথা, সামান্য শত্রুতাও হেমেন্দ্রনাথের সঙ্গে দুনিয়ায় কারো ছিল না। "অজাত-শত্রু" বল্লে যা বোঝায় তিনি ছিলেন বাস্তবিকই তাই। এমন সুন্দর, মধুর, মহান্ জীবন বড় একটা কারো চোখে পড়ে না।

কুমার হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন ময়মনসিং জেলার বিখ্যাত সন্তোষের বড় তরফের জমিদার। তাঁর ঠাকুমার নাম তোমরা হয়তো অনেকে শুনে থাক্‌বে—রাণী জাহ্নবী, যাঁর বিক্রমে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। রাণী জাহ্নবীর পুত্রবধূ রাণী দিনমণি হেমেন্দ্রনাথকে 'দত্তক' নেন। বালক হেমেন্দ্র প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মালিক হলেন, বছরে আয় প্রায় তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ টাকা। কিন্তু অত অল্প বয়সে লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়েও সরস্বতীর প্রতি ভক্তি তাঁর এক তিল কম্‌ল না; লেখাপড়ায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ম্যাট্রিকুলেশনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান দখল করলেন। দু' বছর পরেই আই-এ পরীক্ষা—ফল বার হ'ল, কুমার হেমেন্দ্রনাথ এবার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন—আই-এ, আই-এস্-সি দু'টোতে জড়িয়ে প্রথম হয়েছেন। এর পর বি-এ, এম্-এ, আইনের প্রথম পরীক্ষা, এগুলোর কোনটাতেই তাঁর প্রথম স্থান আর কেউ কেড়ে নিতে পারে নি। বি-এ তে তাঁর অনার্স ছিল অঙ্কে; তাতে তিনি যে শুধু প্রথমই হলেন তাই নয়, ঈশান-স্কলারশিপ্‌ও লাভ করলেন। বি-এ অনার্সে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন তাঁদের মধ্যে আবার যাঁর নম্বর সব চেয়ে বেশী থাকে, ঈশান-স্কলারশিপ্ তাঁরই প্রাপ্য। বি-এ তে তিনি এত বেশী নম্বর পেয়েছিলেন যে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়া থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত কেবল একজন ছাত্র ছাড়া অত নম্বর আর কেউ এ পর্য্যন্ত তুল্‌তে পারে নি। (ম্যাট্রিক এবং আই-এ দুটোতেই অঙ্কে তিনি ফুল্ মার্ক পেয়েছিলেন) অঙ্ক নিয়েই তিনি এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম হলেন, নম্বর পেয়েছিলেন ৮০০র মধ্যে ৭১৪। এর চেয়ে বেশী নম্বর আজ পর্য্যন্ত কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে মাত্র দু'জন ছাত্র

পেয়েছেন। তাঁর অধ্যাপকেরা প্রায়ই বল্‌তেন অঙ্কে এমন চমৎকার মাথা তাঁরা নাকি খুব কমই দেখেছেন। শুধু অঙ্কে নয়, সব বিষয়েই তাঁর সমান দখল ছিল। ইংরাজী-সাহিত্যে তাঁর ছিল প্রচুর জ্ঞান; আই-এ পরীক্ষায় তিনি শুধু টোটালে এবং অঙ্কেই প্রথম হন নি, ইংরাজীতেও প্রথম হয়েছিলেন। সংস্কৃতে তিনি ছিলেন ধুরন্ধর। যখন তিনি সবে ইস্কুলের ছাত্র, বয়স যখন তাঁর চোদ্দ কি পনেরো, তখনই সংস্কৃত ভাষায় কি সুন্দর শ্লোক তিনি রচনা করতে পারতেন তার একটু নমুনা শোন:—

"নিশান্ধকারোঽপসৃতো, বিলোক্য
প্রভাচ্ছটাস্ফালনমুগ্ররশ্মেঃ
যথা মৃগেন্দ্রস্য নিরীক্ষ্য দম্ভম্
দ্রবন্তি ভীতাঃ করিণঃ সমন্তাৎ ।১
সুপ্তেঃ সমুত্থায় বিহঙ্গবর্গঃ
স্তবং মহেশং মধুরং বিরৌতি
প্রফুল্ল পুষ্পান্তরবো বনেষু
মন্দং সুগন্ধঃ পবনশ্চ বাতি ।২
অলিঃ প্রহর্ষান্মৃদুগুঞ্জিতেন
স্তব্ধং তড়াগং মুখরীকরোতি
সিতারবিন্দানি বিকশ্য যত্র
তন্বন্তি শোভাং ধরণীতলস্য ।৩

কিন্তু হেমেন্দ্রনাথকে যে দেখ্‌ত সেই যে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌ত তার কারণ এ নয় যে তিনি একজন বড় 'স্কলার' ছিলেন। সেটা তাঁর সামান্য—অতি সামান্য পরিচয়। বাংলাদেশে তাঁর চেয়েও বড় পণ্ডিত আছেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও ফি বছরই কেউ-না-কেউ প্রথম হবেই। তাঁর আসল পরিচয় তাঁর হৃদয় খানা, এক দিকে সাগরের মতই যেমন তা ছিল বিরাট্, অন্যদিকে হিমালয়ের মতই ছিল তা উঁচু। গরীব ছাত্র পড়বার খরচ যোগাতে পারছে না, হেমেন্দ্রনাথ মাসে মাসে তাকে বৃত্তি দিয়ে যাচ্ছেন, নিজের বাড়ীতে রেখে তার খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন। এমন এক-আধ জন নয়, শত শত। গরীব গৃহস্থ মেয়ের বিয়ে দিয়ে উঠ্‌তে পারছে না, হেমেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে একবার উপস্থিত হ'লেই হ'ল, আশাতীত দান সে পাবেই। অমুকের বাড়ী নিলাম হয়ে যাচ্ছে, প্রায় হাজারখানেক টাকা চাই; হেমেন্দ্রের সঙ্গে তার শুধু মুখের চেনা বই আর কিছু নেই, কিন্তু তাতেই অম্লানমুখে তিনি টাকা দিয়ে দিয়েছেন এমনও প্রত্যক্ষ করা গেছে। গরীব বিধবা, অনাথ-আতুর দীনদুঃখীদের জন্য মাসে মাসে তাঁর বৃত্তির টাকা বরাদ্দ

থাকত। অথচ বছরের পর বছর এ সমস্ত দানই চলে এসেছে অত্যন্ত গোপনে—জেনেছে শুধু তারা যারা তাঁর দয়ায় দুনিয়ায় টিঁকে রয়েছে, আর জেনেছি আমরা যাদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধুত্বে বেঁধে রেখেছিলেন। শুধু এক ছত্র চিঠি দিয়ে কত সময়ে কত ছাত্রকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছি, আজ পর্য্যন্ত কেউ এসে এ কথা বলে নি যে তিনি তার কোন উপকারই করলেন না।

জমিদারীর প্রজাদের সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথের ব্যবহার ছিল দৃষ্টান্ত দেওয়ার মত। লোকে তাঁকে বল্‌ত আদর্শ জমিদার। তিনি তাদের জন্য হাসপাতাল তৈরী করেছেন, ইস্কুল চালিয়ে এসেছেন; তারা অসুবিধায় পড়লে খাজনা মাপ করে দিয়েছেন; এমন কি, বন্যার সময় নৌকা করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিজের হাতে চাল ডাল বিলিয়ে এসেছেন। এম্‌নি ধারা নানা সৎকাজে বছর বছর তাঁর প্রায় ১৬।১৭ হাজার টাকা খরচ হ'ত। প্রজাদের বলে দেওয়া ছিল 'নজর' দেবার সময় তারা টাকা না দিয়ে নিজের ক্ষেতের শাকসব্জি এনে দিলে জমিদার বেশী খুসী হবেন। পাড়াগাঁয়ে শাকসব্জির দাম কিছুই না, টাকার বদলে শাকসব্জি দেওয়ায় তাদের প্রচুর লাভ হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের কাজটাও করতে শিখ্‌ত ভাল ভাবে। মনে পড়ে বছর চারেক আগে এক দিন তাঁকে বলেছিলাম, "হেমেন, তুমি কাউন্সিলে ঢোক না, দেশের অনেক কাজ করতে পারবে!" তিনি বল্লেন, "তুমি ভাই আমাদের ওদিক্-কার সব খবর জান না, ওখানে যে আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে! আমার জমিদারীর অনেক গাঁয়ে এখনও মেয়েদের আধ মাইল, এক মাইল পথ হেঁটে জল আন্‌তে হয়। আমি মরবার আগে শুধু এইটে বন্ধ করে যেতে পারলেও জেনে যাব একটা কাজ করে গেলাম।" সেদিন এই বাল্যসুহৃদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন বাস্তবিকই নুয়ে পড়েছিল। এর পর তাঁর কাল-অসুখের সময় যখন শুনেছি সন্তোষের প্রজারা—কি হিন্দু, কি মুসলমান—দলে দলে প্রত্যেক দিন "কল্‌কাতার খবর" জান্‌বার জন্য পাগলের মত ছুটোছুটি করেছে তখন এতটুকু আশ্চর্য্য হই নি; এমন দরদী জমিদারের জন্য তাদের মন যদি না কাঁদ্‌বে তো কাঁদ্‌বে কার জন্য? যেদিন কল্‌কাতার বাড়ীতে সব শেষ হয়ে গেল সেদিন ও-বাড়ীর ছ'ফুট উঁচু প্রকাণ্ড শিখ দরওয়ানটিকে ছোট্ট ছেলের মত ভেউ

ভেউ করে কাঁদ্‌তে স্বচক্ষে দেখেছি, প্রত্যেকটা ঝি-চাকর গলা ছেড়ে ডুকরে কেঁদেছে—এমন কি বাড়ীর ঝাড়ুদার মেথরটি পর্য্যন্ত।

বাংলা দেশের একজন প্রসিদ্ধ ধনী হেমেন্দ্রনাথ, অথচ বলে না দিলে কারো তা ধরবার উপায় ছিল না, এমনি মোটা চাল। বিলাসিতা বা সৌখীনতা তাঁর ত্রিসীমানায়ও কোন দিন ঘেঁষতে পারে নি। দেশী লোকের হাতে-তৈরী জিনিষ পেলে বাইরের জিনিষ ব্যবহার করতে তাঁকে দেখি নি। আর কথাবার্ত্তায় সে কী মিষ্টত্ব—সমবয়সীদের সঙ্গে মধুর অমায়িকতা, বয়সে যাঁরা বড় তাঁদের প্রতি সে কী নম্র বিনয়ী ভাব, যেন চোখের দিকে চাইতেও সঙ্কোচ এসে পড়ে! কল্‌কাতায় ইস্কুল থেকে সুরু করে কলেজের উঁচু ক্লাস পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে একত্র পড়েছি, এমন সদানন্দ মূর্ত্তি আর চোখে পড়ে নি, এমন অকপট বন্ধুও আর দেখি নি। এমন অনেক বার হয়েছে যে হেমেন্দ্রের সঙ্গে সামান্য একটু দরকার, সেটুকু সেরেই বাড়ী চলে আস্‌তে হবে কেননা অনেক জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে; মনে মনে সঙ্কল্প করে বেরিয়েছি পাঁচ মিনিটের বেশী তাঁর বাড়ীতে বস্‌ব না। কিন্তু একবার তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেই কোথায় সে সঙ্কল্প ভেসে গিয়েছে, হু হু করে কখন তিন-চার ঘণ্টা সময় কেটে গেছে খেয়ালও হয় নি, শুধু উঠ্‌বার সময় মনে হয়েছে আরও খানিকক্ষণ কাটিয়ে গেলে ভাল হ'ত! এম্‌নি ছিল তাঁর আকর্ষণ। ছাত্রাবস্থায় মনে পড়ে কি একটা ব্যাপারে সহপাঠীদের সাম্‌নে তাঁকে বেজায় ঠাট্টা করেছিলাম (এ ধরণের হাসি-মস্করা সর্ব্বদাই চল্‌ত)। পর দিন ক্লাসে এসেই হেমেন্দ্র আমার পকেটে এক টুকরা কাগজ গুঁজে দিয়ে বল্লেন, "ভাল করে পড়ে দেখ।" কাগজ খানা খুলে দেখি আমাকে পাল্‌টা ঠাট্টা করে হেমেন এক সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছেন—

"বুদ্ধেরভাবঃ স্মিতযুক্তমাস্যম্, নিতান্ত কৃষ্ণা তনুযষ্টিশোভা
শুভ্রাস্তে দ্রংষ্ট্রা অধরস্য পার্শ্বে, জীমূতসংস্থা চপলেব ভাতি"

আমিও অবশ্য একটা শ্লোকে এর জবাব দিয়েছিলাম, তবে সে শ্লোক হেমেন্দ্রের রচনার পাশে না দেওয়াই ভাল। সে সমস্ত কথা মনে করলে আজ আর চোখের জল থামিয়ে রাখতে পারি না। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে হেমেন্দ্রনাথ তাঁর কাজ

অসমাপ্ত রেখে চলে যাবেন, আর আমি তাঁর জীবনী লিখ্তে বস্‌ব এ কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি।

তোমাদের 'রামধনু' তাঁরও বড় প্রিয় ছিল, পত্রিকা পেয়েই ছোট ছেলের মত ধাঁধার উত্তর পাঠাতেন। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের লেখার তিনি সর্ব্বদাই উচ্চ প্রশংসা করতেন।

আদর্শ ছাত্র, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ জমিদার, আর তার চাইতেও যা বড় সেই আদর্শ মানুষ হেমেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গুটি দুই কথা তোমাদের জানালাম। যদি তাঁর গুণগুলোর কিছু কিছু অনুকরণ তোমরা করতে পার, তোমাদের জীবনও মধুময় হয়ে উঠ্‌বে।

মণি-মঞ্জুষা

ঘুমতিগাঁয়ের ইতিহাস

[Legend of the Sleepy Hollow : রচয়িতা—আমেরিকার স্বনামধন্য সাহিত্যিক ওয়াশিংটন আর্ভিং]

(ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি, বি-ই-এস্)

জায়গাটি ছিল হড্‌সন্ নদীর কোল ঘেঁষে, নাম ঘুম্‌তি (Sleepy Hollow); একেবারে চুপ্‌চাপ্ আর নিঝুম, নদীর তর্‌তর আর পাখীর গান ছাড়া শব্দই নেই; দু'দণ্ড এসে বস্‌লে সত্যিই ঘুমে চোখ ভেঙে আস্‌ত।

সারা গ্রামটার গায়েই যেন যাদুর ছোঁওয়া লেগে ছিল;—এখানে ভূতের আড্ডা, ওখানে হানাবাড়ী, এটা পেত্নীর মাঠ, আর ওটা দানোয়-পাওয়া গাছ—লোকের মুখে সন্ধ্যার পর থেকে ভূত আর প্রেত, দত্যি আর দানা, ডাইনী আর পরী ছাড়া কথাই নেই! রাতে পথ চল্‌তে বুকের ভেতর কেমন ছম্ ছম্ করে ওঠে।

লোকগুলিও ছিল কেমন অদ্ভুত গোছের; আজ্‌গুবি গল্প বল্‌তে এদের জুড়ি আর কেউ

ছিল না; আর ভূতের গল্প একবার ফেঁদে বস্‌তে পারলে এদের আহার-নিদ্রা ভুলিয়ে রাখা যেতে পার্‌ত।

গাঁয়ে একটা ভূত কিছু দিন ধরে দৌরাত্ম্য কর্‌ছিল; একে ঠিক ভূত বলাও চলে না; একেবারে কবন্ধ; গাঁয়ের বহু লোক এটাকে দেখেছে; আর যে দেখেছে সেই বলেছে যে ওর দেহটা নাকি গলায় এসেই থেমে গেছে। গভীর রাতে কালো ঘোড়ায় চেপে কবরখানার ভেতর থেকে ও যখন বের হ'ত তার আগেই গাঁয়ের লোক সব ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ফেলেছে; বহু দূর পর্য্যন্ত তার ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যেত।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই আগুন জ্বেলে ব'সে লোকে এই কবন্ধের কীর্ত্তি-কারখানা আলোচনা কর্‌ত। আর সে তো গল্প নয়, এক-একটা কাহিনী; ছোট ছেলেমেয়েরা শুনে ভয়ে হিম্‌শিম্ খেয়ে যেত; বড়রা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বস্‌তে সুরু কর্‌ত; পেছন দিকে তাকাতে কেউই সাহস কর্‌ত না।

গাঁয়ের সেরা গল্পবাজ ছিলেন ইকাবড্ ক্রেন্; ভদ্রলোক বাড়ীতে বাড়ীতে পড়িয়ে দু'পয়সা রোজগার কর্‌তেন। মাষ্টার বল্‌তে গাঁয়ে এক তিনিই। তা ছাড়া তাঁর এক গানের ক্লাস ছিল, সেখানে মেয়েরা পর্য্যন্ত এসে পড়্‌ত। লোকটিকে অনেকেই পছন্দ কর্‌ত; গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী তাঁর নেমন্তন্ন লেগেই ছিল। তাঁকে একবার খেতে বল্‌লে তার দামও পাওয়া যেত—গল্প বল্‌তে তাঁর মত ওস্তাদ আর কে ছিল? আর কত গল্পই যে ভদ্রলোক জানতেন—ভূতের গল্প, পরীর গল্প, ডাইনীর গল্প; এক-একটা গল্প শুনে লোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত। গিন্নীদের মহলে ভদ্রলোকের বেশ পসার জমে উঠেছিল।

ভদ্রলোক নিজে কিন্তু খুব বীরপুরুষ ছিলেন না; ভূতের ভয়টা তাঁর কারু থেকে কিছু কম ছিল না। গভীর রাতে একা পথে ফির্‌তে ভূতের ভয় কি বস্তু প্রায়ই তাঁকে বুঝ্‌তে হ'ত। তা হ'লেও ভূতুড়ে গল্প বলা তাঁকে নেশার মত পেয়ে ব'সেছিল, কিছুতেই তাঁর গল্প করার অভ্যাস গেল না।

ইকাবডের চেহারাটা ছিল একটু উদ্ভট্; একেবারে পাত্‌লা, ছিপ্‌ছিপে গড়ন—হাড্ডিসার অথচ লম্বায় তালগাছ। রাস্তায় হাঁট্‌তে দেখ্‌লে মনে হত এই বুঝি হোঁচট খেয়ে পড়ে যান্। কিন্তু রাস্তায় হোঁচট খাবার পাত্র তিনি ছিলেন না; হোঁচট খেতে তিনি সুরু করেছিলেন, কিন্তু সে অন্য ভাবে।

তাঁর গানের ক্লাসের এক ছাত্রী ছিল, নাম কাট্রিনা ভ্যান্ টাসেল; ফুট্‌ফুটে সুন্দরী, তা ছাড়া বড়লোকের মেয়ে; এই মেয়েটিকে হঠাৎ ইকাবডের ভালো লেগে গেল; আর একে বিয়ে করার জন্যে তিনি উঠ্‌লেন ক্ষেপে।

মেয়েটির বাবা ভ্যান্ টাসেল, জমিদার গোছের লোক ; ক্ষেত-খামার, ফলের বাগান, মেহগনি-বন সে তল্লাটে তাঁর মত কারু ছিল না ; পথে যেতে যেতে ইকাবডের চোখে এই সব পড়্‌ত ; আর তিনি ভবিষ্যৎ সুখের কথা ভেবে উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌তেন।

মেয়েটির বাবা ইকাবড্‌কে বেশ আস্কারা দিয়েছিলেন, আর কাট্রিনাও যে তাঁকে অপছন্দ কর্‌ত এমন কিছু বোঝা যাচ্ছিল না ; তিনি বাড়ীতে এলেই সে আগেকারই মত গান শিখ্‌তে আসতো ; গল্প বলবার জন্যে আব্‌দার ধর্‌ত। কিন্তু পাকা কথাটি কারু মুখ দিয়েই ঠিক বেরোচ্ছিল না। না বেরোবার কারণও ছিল ; কাট্রিনার পাত্রের অভাব হচ্ছিল না ; অনেকেই তাকে বিয়ে করবার কথা তার বাবার কাছে পেড়েছিল। এই পাত্রদের মধ্যে সব চেয়ে নাম করবার মত ছিল ব্রোম্ ভ্যান্ ব্রুন্ট্, লোকে বলতো ব্রোম বোন্‌স্। লোকটা গোঁয়ার গোছের ; শরীরখানা তার লোহা দিয়ে তৈরী ; সবাই তাকে ভয় করে চল্‌ত। ঘোড়া হাঁকাতে অথবা গায়ের কস্‌রৎ দেখাতে তার যুড়ি গাঁয়ে কেউ ছিল না। ও যখন বলে বসল ও কাট্রিনাকে বিয়ে করবে, তখন আর সব পাত্রেরা একে একে ভাগ্‌তে সুরু করল। বোন্‌স্‌ও কাট্রিনাদের বাড়ী হাঁটাহাঁটি সুরু করে দিল। ভ্যান্ টাসেলের বাড়ীর দরজায় বোন্‌সের ঘোড়া বাঁধা থাক্‌লে কেউই সেদিন ও-বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না।

ভয়ে ঘাব্‌ড়ালেন না মাত্র ইকাবড্। চেহারা শুট্‌কো হলে কি হয়, মনে তাঁর সাহসের অন্ত নেই। গানের মাষ্টারির ছুতো ক'রে যেমন আস্‌ছিলেন তেমনি কাট্রিনাদের বাড়ীতে তিনি আস্‌তে থাক্‌লেন। ঐ বাড়ীতে বোন্‌সের আবির্ভাব তাঁর মোটেই পছন্দ হয় নি ; লোকটার চেহারা, হাবভাব তাঁর মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছিল না ; হাজার হ'লেও লোকটা গুণ্ডাই—ওকে কোন মতে বিদায় করবার জন্য তাঁর মন উস্‌খুস্ করছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলবারও জো ছিল না। মোট কথা, ইকাবড্ কাটা কৈ মাছের মত দাপাদাপি কর্‌ছিলেন ; আর তাঁর বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়্‌তে সুরু ক'রেছিল।

বোন্‌স্‌ও কিন্তু চুপ করে থাকবার পাত্র নয় ; প্রথমতঃ সে ইকাবড্‌কে শাসিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"দেখুন মাষ্টার মশাই, ওদিক্ আর মাড়াবেন না ; ও আমি একাই ঠিক ক'রে নিতে পার্‌ব ; আপনি না এলেও চল্‌বে।" কিন্তু মাষ্টার মশাই অনেক কিছু বুঝলেও একথার মর্ম্ম ঠিক বুঝলেন বলে মনে হ'ল না ; তিনি বোন্‌সের ছায়া মাড়ান বন্ধ ক'রে দিলেন, কিন্তু কাট্রিনার বাড়ী হাজিরা দিতে আর কাট্রিনাকে গান শেখাতে তাঁর একদিনও ভুল হবার লক্ষণ দেখা গেল না।

বোন্‌স্ মাষ্টারকে ভাগাবার জন্যে অন্য ফন্দি বার করল। প্রথমতঃ তাঁর স্কুলঘরের পাশে ধোঁয়ার ব্যবস্থা হল, অর্থাৎ, স্কুল ভাঙ্গাবার চেষ্টা। একটা হতভাগা কুকুরকে এমন ভাবে

শিখিয়ে রাখা হল যে মাষ্টার যেই গান শেখাতে আরম্ভ করবেন ঠিক সেই সময় সেও গলা ভাঁজতে সুরু করবে। কিন্তু মাষ্টার নির্ব্বিকারচিত্ত। তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেন না। বোন্‌স্ তখন তাঁর স্কুলের উপর দৌরাত্ম্যের মাত্রা ক্রমশঃ চড়াতে লাগ্‌ল। উপদ্রবে মাষ্টার অস্থির হ'য়ে উঠলেন কিন্তু টল্‌লেন না ; অর্থাৎ ভাঙলেও মচ্‌কাবার পাত্র তিনি ছিলেন না। কাট্রিনার কাছে তাঁর কদর এতটুকুও কম্‌ল না।

তখন শরতের শেষ। বিকালবেলা ইকাবড্ স্কুলের চেয়ারে ব'সে ; বেচারীর মনটা বেজায় ভার ; কাঁহাতক এমন উৎপাত সহ্য করা যায় ! অথচ কাট্রিনার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে হবে কিনা তারও ঠিক নেই ; এঁরা 'হাঁ' ও বলে না পষ্টাপষ্টি, 'না' ও ব'লে দেয় না। এ সব হাঙ্গামা আর কত দিন পোহান যায় ! এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে ; এস্পার কি ওস্পার ! কিন্তু কি করে যেএ সম্ভব হবে কিছুতেই তাঁর মাথায় খেলছিল না। অথচ তাঁর মত লেখাপড়া-জানা একজন সম্মানিত ভদ্রলোক এক গুণ্ডার ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত্ত খুঁজতে থাক্‌বেন এই বা কেমন কথা ! ঠিক্ এম্‌নি সময়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ভ্যান্ টাসেলের একজন পাইক স্কুলের দরজার গোড়ায় নেমে ইকাবডের হাতে একখানা চিঠি পৌঁছে দিল।

কাট্রিনা লিখ্‌ছে—"মাষ্টার মশাই, আজ রাতে আমাদের বাড়ী পার্টি হবে ; আস্‌বেন কিন্তু।"

ইকাবড্ আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তাড়াতাড়ি স্কুলের ছেলেমেয়েদের ছুটি দিয়ে তখনই পোষাক প'রে তৈরী হবার জন্য ছুট্‌লেন। বহু কালের পুরানো এক ডিনার সুট্ ছিল, সেইটেই ব্রুশ্ ক'রে কোনও মতে গায়ে চড়িয়ে নিলেন ; তার পর চুল আঁচড়ে, ফিট্‌ফাট্ হয়ে বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে তার পিঠে চেপে বস্‌লেন।

সন্ধ্যা হয় হয় এমনি সময়ে ভ্যান্ টাসেলের বাড়ীর দরজায় ইকাবডের ঘোড়া এসে থাম্‌ল। বাড়ীতে বহু লোকের জট্‌লা হচ্ছিল। হাসিভরা মুখে কাট্রিনা তাঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে পাশে এনে বসালে। ব্রম্ বোন্‌স্ বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল ; সে একবার কট্‌মট্ করে ইকাবডের দিকে তাকাল, তার পরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বোন্‌স্ জব্দ হওয়ায় আনন্দে ইকাবডের বুক ফেটে চৌচির হবার যোগাড় হচ্ছিল ; ফূর্ত্তির চোটে ভদ্রলোক প্লেটের পর প্লেট খাবার সাবাড় ক'রে সকলের চোখে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। মদ খাওয়াটা একটু বেশী মাত্রাতেই হয়ে গেল।

সারাটি সন্ধ্যা বোন্‌স্‌কে যেন দেখিয়ে দেখিয়েই কাট্রিনা তার মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্প ক'রে চল্‌ল ; যখন বল্ নাচ আরম্ভ হ'ল, কাট্রিনা ইকাবডকেই নাচের সঙ্গী বেছে নিল। ইকাবড্ স্বর্গে আছেন কি মর্ত্ত্যে আছেন তাঁর ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না ; কাট্রিনার হাত ধরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে তিনি একবার কাট্রিনার দিকে, একবার ভাবী শ্বশুরের (?) বহুমূল্য আস্‌বাবপত্রের দিকে

আর একবার পরমশত্রু ব্রম্ বোন্সের দিকে তাকাচ্ছিলেন; সে ব্যাটা যে হিংসায় ফেটে মর্‌ছে এ সম্বন্ধে তাঁর কোনই সন্দেহ রইল না। তাঁর মুখখানা রসে ভিজান পিঠার মত হ'য়ে উঠ্‌ল।

নাচ শেষ হ'য়ে গেলে গল্প বলার ধুম প'ড়ে গেল; ইকাবড্ এবার কাট্রিনাকে ছেড়ে ভারিক্কি লোকদের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে গল্প সুরু করলেন। গল্পের বিষয় ছিল সেই কবরখানার কবন্ধ। সকলের মাথায় নেশা চ'ড়ে গেছ্‌ল; কাজেই গল্পগুলোর উপর রং ফলিয়ে তুল্‌তে কারুকেই বেগ পেতে হচ্ছিল না। দেখা গেল কবন্ধকে দেখে নি এমন লোক সেখানে খুব কমই ছিল। এমন কি ব্রম্ বোন্স্‌ও হলফ্ ক'রে বল্‌ল কবন্ধটিকে সে স্বচক্ষে দেখেছে। একদিন গভীর রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ওর পেছন পেছন ধাওয়া করে এসেছিল; তার পর কবরখানার পাশের সেই সাঁকোটার পাশে এসে কোথায় কি করে মিলিয়ে গেল ও তা বুঝ্‌তেই পারে নি।

পার্টি যখন ভেঙে গেল তখন অনেক রাত্রি হ'য়ে গেছে। নিমন্ত্রিতেরা একে একে সবাই চলে গেলেন; ইকাবড্ যাবার আগে কাট্রিনার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌লেন; দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধ'রে কি কথা হ'ল তা তাঁরাই জানেন; কিন্তু ইকাবড্ যখন বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে বস্‌লেন, তাঁর চেহারাখানির রসমালাই-রসমালাই ভাব তখন কোথায় উড়ে গেছে; মুখখানা ভরে যেন রাজ্যের অন্ধকার এসে নেমেছে। মেঘের তলে চাঁদ ঢাকা পড়েছে; বনের ভেতর দিয়ে পথ; চারিদিকে আব্‌ছা আলো-আঁধার। আবছা গাছপালা সব ঝাপ্‌সা আলোর ভেতর প্রেতের মত দাঁড়িয়ে; পাঁজরা কাঁপিয়ে শীতের হাওয়া বইছে; পথে জনমানবের সাড়া নেই। ইকাবড্ একা একা ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ীমুখো চলেছেন; থেকে থেকে তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠ্‌ছে। এক একটা গাছের পাতা ফর্ ফর্ করে উঠ্‌লেই তাঁর মনে হয় ঐ বুঝি কেউ এল; ঝোপঝাড় নড়ে উঠ্‌লেই তিনি চম্‌কে ওঠেন। পেছনে ফিরে তাকাতেও সাহস হচ্ছিল না। এতদিন ধরে যত ভূতের গল্প বলেছিলেন, এক মুহূর্ত্তে সব এসে মনের ভেতর ভীড় পাকাতে সুরু কর্‌ল; ইকাবডের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ কর্‌তে থাক্‌ল। আর তো বেশী পথ নেই, কিন্তু পথ যে ফুরোতেই চায় না; এই পথটুকু এত ভয়ের এ কথা কে আগে জান্‌ত! ঐ ঝোপের ভেতর থেকে কারা চেয়ে আছে না? ওখানে গাছের ডালে কে ঠ্যাং ঝুলিয়ে ব'সে না! ওই যে ওখানে কে যেন হেসে উঠ্‌লো; না, ও পাখী উড়ে গেল; পেছন থেকে কেউ আস্‌ছে না তো? ইকাবড্ হঠাৎ থেমে গেলেন। না, ভুল নয়,—স্পষ্ট ঘোড়ার খুরের শব্দ—খট্ খট্ খট্; ইকাবড্ প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন; পেছনের শব্দও ক্রমশঃ বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তাই তো এসে পড়ে যে! আরও জোরে, আরও জোরে ছুট্‌তে হবে। ইকাবড্ বন ছাড়িয়ে খোলা মাঠের ভেতর এসে পড়লেন; হঠাৎ ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ বেরিয়ে এল, আর সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল কালো ঘোড়ার পিঠে একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি—অসম্ভব লম্বা। ইকাবড্‌কে পিছু ফির্‌তে দেখেই মূর্ত্তিটি

ঘাড় থেকে নিজের কুম্‌ড়োর মত প্রকাণ্ড মাথাটি খুলে ফেল্‌ল; আর মাথাহীন ফাঁকা গলা হা হা কর্‌তে থাক্‌ল।

ইকাবড়ের মনে হল তাঁর প্রাণ এর আগেই বেরিয়ে গেছে; দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে তিনি ঘোড়া ছুটালেন; প্রেতমূর্ত্তিটিও তার ঘোড়ার গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে। এইবার সেই ভূতুড়ে রাস্তা; এই পথ কবরখানার পাশ দিয়ে গেছে। এমনি সময়ে ইকাবডের ঘোড়ার জিন ছিঁড়ে গেল; পড়্‌তে পড়্‌তে কোন মতে তিনি রেহাই পেলেন। দু'হাতে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে তিনি ছুট্‌তে লাগলেন। কবন্ধটা খুব কাছে এসে পড়েছে; কিন্তু আর বেশী দূর নয়; সাম্‌নেই সেই সাঁকো, সাঁকো পার হলে আর বোধ হয় ভয় থাক্‌বে না। তাঁর ঘোড়া এইবার সাঁকোর উপর উঠে পড়্‌ল; কোন মতে আর এক মিনিট! ইকাবডের মনে প্রাণের আশা ফিরে এল; ভয়ে ভয়ে তিনি একবার পিছন ফিরে তাকালেন। দেখ্‌লেন কবন্ধটি থেমে গেছে, সেই কাটা মুণ্ডুটি হাতে নিয়ে ইকাবডের মাথা লক্ষ্য কর্‌ছে—আর ভাব্‌বার সময় পেলেন না; মুহূর্ত্তের মধ্যেই মুণ্ডুটা এসে প্রবল বেগে তাঁর মাথায় এসে পড়্‌ল; জ্ঞান হারিয়ে ইকাবড্ মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন; ভূতটা ইকাবডের ঘোড়াকে ধাওয়া ক'রে সাম্‌নে ছুটে চল্‌তে থাক্‌ল।

* * * *

পর দিন ভোরে ঘোড়াটিকে পাওয়া গেল; কিন্তু আরোহীর কোন সন্ধান মিল্‌ল না। ঘোড়াটী বাড়ীওয়ালার বাড়ীর সাম্‌নে মাঠে নিশ্চিন্ত মনে চ'ড়ে বেড়াচ্ছিল; তার পিঠের জিন নেই মুখের লাগাম ছিঁড়ে গেছে। কবরখানার পাশে জিনটিকে গ্রামেরই একজন কুড়িয়ে পেয়েছিল; আরও কিছু দূরে পাওয়া গেল মাষ্টারের ধূলোকাদা মাখা টুপী। কিন্তু টুপীর ধারে কাছে মাষ্টারের খোঁজ পাওয়া গেল না; পাওয়া গেল একটা প্রকাণ্ড আধভাঙা কুম্‌ড়ো। কিন্তু মাষ্টার সত্যিসত্যিই গেল কোথায়? গ্রামের বিচক্ষণ লোকেরা বল্‌ল, "হ্যাঁ মাষ্টার, কবন্ধ কি তাঁকে আস্ত রেখেছে, ধরে নিয়ে চ'লে গেছে।"

গাঁয়ের লোকেরা স্কুলটিকে সেই ভূতুড়ে জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে বসাল। আর মাষ্টার সম্পর্কে ভয়ানক ভয়ানক গল্প সব শোনা যেতে লাগ্‌ল।

মাষ্টার উধাও হবার কিছুদিন পরেই বোন্সের সঙ্গে কাট্রিনার খুব ঘটা করে বিয়ে হ'ল। কাট্রিনা কোনই আপত্তি কর্‌ল না। একটা মজার ব্যাপার এই যে 'কুম্‌ড়ো' সম্বন্ধে কোন কথা উঠ্‌লেই বোন্স্ আর কাট্রিনার হাসি থামিয়ে রাখা অসম্ভব হ'ত। অথচ কথা তো ঐ এক কুম্‌ড়ো; এর মধ্যে স্বামি-স্ত্রী হাসির খোরাক কি পেলে তা বুঝবার জো ছিল না।

বছর দশ বার পরে গাঁয়ের একজন চাষা কি কাজে যেন নিউইয়র্ক সহরে বেড়াতে গেছ্‌ল; সহর থেকে এল সে আজগুবি এক খবর নিয়ে; মাষ্টার নাকি মারা যান্ নি। কাট্রিনার ব্যবহারে

বিরক্ত হ'য়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছেন। তিনি নাকি অন্য জায়গায় মাষ্টারি ক'রে বেশ দু'পয়সা জমিয়েছেন, এমন কি, কিছু দিন আদালতের হাকিমিও ক'রেছেন।

অবশ্য এই আজগুবি কাহিনী কারুই বিশ্বাস হ'বার কথা নয়। কবন্ধটিই ইকাবড্‌কে হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়েছে, গ্রামের লোকেদের, বিশেষ করে গিন্নীদের দৃঢ় ধারণা তাই। এখনও ঘুম্‌তিগাঁয়ে গেলে ইকাবড্ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য অত্যদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী শুন্‌তে পাওয়া যায়।

পশুর বাজার

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

বেবিরূসা, বিন্টুরং, একিড্‌না, ক্যাপিবারা, পাণ্ডা,—এ সব নাম শুনেছ কি কখনও? এঁ সব কিসের নাম তা'ও জান কি? এ গুলো হচ্ছে, কয়েকটি জন্তুর নামঃ—প্রথমটি শূয়োর-জাতীয়, দ্বিতীয়টি বেড়াল-জাতীয়, তৃতীয়টি সজারুর মত কাঁটাযুক্ত পিপীলিকাভুক্, চতুর্থটি গিনিপিগ্‌-জাতীয় (অর্থাৎ, ইঁদুর, খরগোস, এদের জাতভাই), পঞ্চমটি ভাল্লুক-জাতীয়। এ কয়টিই দুষ্প্রাপ্য জন্তু। পশু-ব্যবসায়ীরা ঐ রকমের নানা জাতের জন্তু ধ'রে এনে বিক্রী করেন। চিড়িয়াখানা, সার্কাস আর সখের পশুশালার মালিকেরা এই সব জন্তুর খরিদ্দার।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পশুপাখী পোষবার সখ অনেকেরই আছে। বল্‌তে গেলে, পশু-পোষার হুজুগ পড়েছে সে দেশে। পৃথিবীর চারিদিক্ থেকে শত শত ব্যবসায়ী আর দক্ষ শিকারী নানা জাতের পশুপাখী ধ'রে সে দেশে চালান দেয়। একজন ব্যবসায়ী পঁচাত্তরটি বিভিন্ন দেশে লোক পাঠিয়ে পশুপাখী সংগ্রহ করেন। তাঁর ব্যবসা পৃথিবীব্যাপী; অভিজ্ঞতাও অসাধারণ। তিনি একাধারে প্রাণিতত্ত্ববিৎ, পশু-চিকিৎসক এবং পশুর খাদ্যে বিশেষজ্ঞ।

তিনি বলেন, পশু-পাখী ধর্‌বার পরই তা'দের সম্বন্ধে বেশী ক'রে মাথা

ঘামাতে হয়—ধরা ব্যাপারটা তেমন কিছু কঠিন নয়। ধরার পর কেমন ক'রে তা'দের মেজাজ ঠিক রাখ্‌তে হয়, কেমন ক'রে তাদের ভয় দূর কর্‌তে হয়, কতখানি এবং কি রকমের খাওয়া তা'দের দিতে হয়, জঙ্গলে থাক্‌তে যে খাদ্য তা'রা খেত সে জিনিষ না পাওয়া গেলে তা'র পরিবর্ত্তে কোন্ খাদ্য দিতে হয়,—এ সব ভাবনাই বেশী।

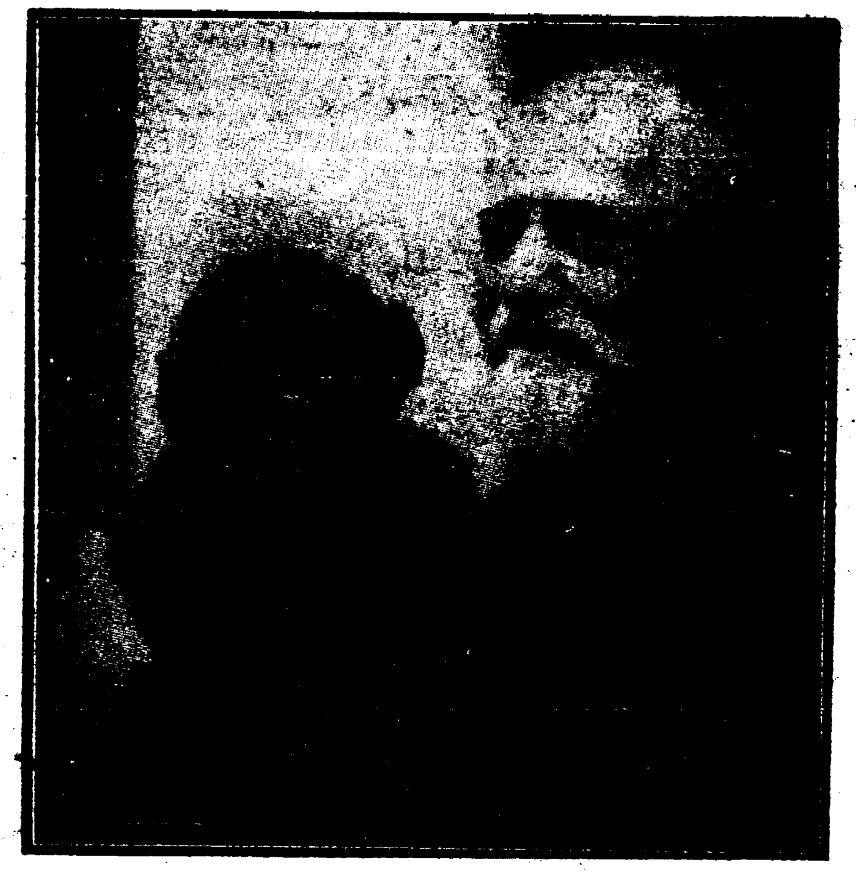

গরিলার বাচ্চা পালকের কোলে শান্তশিষ্ট ভাবে ব'সে।

গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে গরিলা বহুবার ধরা হ'য়েছে, কিন্তু, বাঁচান যায় নি বেশী দিন। এখন, বহু বৎসরের গবেষণার ফলে, গরিলার স্বভাব, খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়েছে এবং গরিলার বাচ্চা ধ'রে এনে তাদের বড় ক'রে 'মানুষ' করা সম্ভব হয়েছে।

পশুদের খাবারে 'খাদ্যপ্রাণ' যথেষ্ট পরিমাণে থাকা চাই। জঙ্গলে যে সব জিনিষ তা'রা খায় তা'র অধিকাংশই বিদেশে গিয়ে তা'রা খেতে পায় না। কিন্তু, তা'র পরিবর্ত্তে কৃত্রিম 'খাদ্যপ্রাণ'যুক্ত খাবার তা'দের খেতে দিতে হয়। এই সব খাবার বহু গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বন্য জন্তুদের ধ'রে আনার পর কিছুকাল তারা থাকে বিমর্ষ আর নিঝুম হয়ে; কোন কোন জন্তু বেজায় রাগী হ'য়ে ওঠে। উপযুক্ত খাবার আর ভালবাসা এবং যত্নের ফলে তা'রা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ভাব ধরে। জঙ্গলে দিনরাত ভাবনায় আর উত্তেজনায় দিন কাটে; তাই, নিশ্চিন্ত জীবন কিছুকাল যাপন কর্‌লে তা'রা ক্রমে হৃষ্টপুষ্ট হ'তে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রথমেই তা'দের মনের ভয় দূর করাটা দরকার; নইলে, অল্প দিনেই তা'রা না খেয়ে মারা যায়।

বড় বড় পশু-ব্যবসায়ীদের প্রতিদিন খাবারের ব্যবস্থা কিছু কম করতে হয় না। কয়েকটি পশুপাখীর দৈনিক খাবারের বহর শোন!

(১) আফ্রিকার হাতী—(ওজনে ১২৫ মণ)—সারা দিনে প্রায় ২ মণ খড়, প্রায় আধ মণ মূলো বা বিট-পালং আর ১৫টা পাঁউরুটি খায়; আধ মণ থেকে ত্রিশ সের জল প্রতিদিন পান করে।

হাতী-শীল—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য জন্তু, দিনে ২।০ মণ মাছ খায়।

(২) বানর—কমলা, কলা আর আপেল সকালের খাদ্য, তা'র পর দুধ আর ডিম মিশিয়ে 'সরবৎ'।

(৩) ঈগল—দিনে এক পাউণ্ড মাংস।

(৪) উটপাখী—লেটুস্‌পাতা আর ওটের গুঁড়ো।

(৫) অজগর সাপ (১৫ হাত লম্বা)—মাসে একবার সের পঁচিশেক ইঁদুর, মুর্গি, গিনিপিগ ইত্যাদি (জ্যান্ত চাই)।

(৬) সী-লায়ন (সীলজাতীয় জন্তু)—দিনে ৪ সের মাছ।

এ ছাড়া, ছোট-বড় নানা জন্তুর খাদ্য মাছি, পিঁপড়ে, ঘাস, মূল, ফল, মাংস, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি তো আছেই। যাক্ গে সে কথা!

পশুর বাজারে এ সব জন্তু বিক্রী হয় ব'লেই এত হাঙ্গামা ক'রে ধরে এনে এদের পোষা হয়। এদের চলাফেরা, খেলাধুলা, পছন্দ-অপছন্দ সবই পশু-

ব্যবসায়ীদের জানা আছে। এমন কি, এদের বুদ্ধির পরীক্ষাও হয়ে গেছে। পরীক্ষক ডাক্তার হর্ণাডে বলেন, "শিম্পাঞ্জি সব চেয়ে বুদ্ধিমান্ জীব; পরীক্ষায় সে ৯২৫ নম্বর পেয়েছে, ভারতীয় হাতী পেয়েছে ৮৫০ নম্বর, ঘোড়া পেয়েছে ৮৫০, সিংহ ৭২৫; গণ্ডার ১৭৫।" 'ফুল্-মার্ক' কত ছিল সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি।

কয়েকটি পশুপাখীর বাজার-দর (আমেরিকার যুক্তরাজ্যে) জানতে পেরেছি। দামগুলি ডলারে: (প্রায় ৩৲ টাকায় ডলার) দেওয়া আছে। কয়েকটি দাম নীচে দিলাম:

ক্ষুদে ক্যাপুচিন্ বানর—এও অতি দুষ্প্রাপ্য, উজ্জ্বল আলো দেখ্‌লেই হাত দিয়ে চোখ ঢাকে।

অজগর সাপ—৩০০ থেকে ৪০০ ডলার, হীরামণ পাখী—৩০০ থেকে ১২০০ ডলার, হাতী—বাচ্চা, ১২০০ ডলার, বড়, ২,০০০ থেকে ২,৫০০ ডলার, উটপাখী—বয়স অনুসারে ১২ থেকে ২৫০ ডলার, ঈগল আর শকুন—১০ থেকে ২০০ ডলার, স্বর্গের পাখী (Bird of Paradise)—২০০ থেকে ১০০০ ডলার, গণ্ডার—৮,০০০ ডলার, বামন হিপ্পো—৫০০০ ডলার, সিংহ—বাচ্চা, ২৫ ডলার, বড়, ১০০ থেকে ২০০ ডলার, গরিলা—১০০০ ডলার, জিরাফ—প্রায় গণ্ডারের মত।

উপরের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, গণ্ডার আর জিরাফের দামই পশুর বাজারে সব চেয়ে বেশী। গরিলা দুষ্প্রাপ্য হ'লেও তা'র বাজার-দর বেশী নয়, কারণ, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কোথাও তা'কে বাঁচান কঠিন;—অর্থাৎ, সেখানের আবহাওয়া তা'র পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

অনেক পশুর বাজার-দর পাওয়া যায় না ; অর্থাৎ, সে সব জন্তু অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং সচরাচর বাজারে বিক্রী হয় না। ক্রেতার গরজ অনুসারে সে সব জন্তুর দর হয়। 'ওকাপি'র মত দুষ্প্রাপ্য জন্তু ধ'রে আনার সাহস প্রায় কারো হয় না, কারণ, তা'কে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে, তবে তো বিক্রী ? মারা গেলে শুধু তা'র ছালটির দাম পাওয়া যাবে।

হিপ্পোর বাচ্চা ধরা সহজ ; কিন্তু তা'কে বাঁচিয়ে, জঙ্গল থেকে নিয়ে আস্‌তে হ'লে, প্রতিদিন ১০।১৫ সের ছাগল-দুধ খেতে দিতে হবে। গহন বনে ১০।১৫ সের ছাগল-দুধ সংগ্রহ কর্‌তে হ'লে অন্ততঃ ২০।৩০টি ছাগল চাই। নিজেদের নিয়েই টানাটানি, আবার ২০।৩০টি ছাগল ! কাজেই হিপ্পো এবং বাচ্চা এক সঙ্গে না ধর্‌লে আর উপায় নাই। দামটি লোভনীয় !

দুষ্প্রাপ্য কোডিয়াক ভাল্লুক—
সংএর মত খেলা ক'রে হাসাতে ওস্তাদ।

হিমালয়ের 'পাণ্ডা' ভাল্লুক, গোয়াডালুপ দ্বীপের হাতী-শীল, কোডিয়াক ভাল্লুক, ক্যাপুচিন বানর, এ সবও দুষ্প্রাপ্য জন্তুর মধ্যেই গণ্য। 'পাণ্ডা' ভাল্লুক আমেরিকায় নিয়ে পৌঁছা'তে পার্‌লে তা'র দাম অত্যন্ত বেশী হবে। বরফের দেশের জন্তু অতদূর নিয়ে যাওয়াই মুস্কিল। এক্‌বার একটি 'পাণ্ডা'কে বরফের উপর বসিয়ে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়েও সে বেশ ভালই ছিল কিছুকাল ; গ্রীষ্মের সময় বেচারা গরমে মারা গেল। হাতী-শীল বেচারা আকারে প্রকাণ্ড হ'লেও অতি নিরীহ গোবেচারা-গোছের জীব। দিনে ২।৩ মণ মাছ খাওয়া এর অভ্যাস। এই জন্তুও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। 'ক্যাপুচিন' বানর নামে এক জাতের ক্ষুদে বানর আছে। উজ্জ্বল আলো দেখ্‌লে এই বানর হাত দিয়ে

চোখ ঢাকে। এই বানরও দুষ্প্রাপ্য জন্তুর মধ্যে গণ্য। কোডিয়াক নামে এক জাতের ভাল্লুকও এই শ্রেণীর মধ্যেই। এরা সঙের মত নানা ঢঙে খেলা ক'রে লোক হাসাতে পা'রে।

বন্য জন্তুর বাজার দিন দিন বেড়ে চলেছে। চাহিদার অভাব নাই ; উপযুক্ত দামও পাওয়া যায়। জন্তু না হ'লে সার্কাস চলে না ; সখের পশুশালারও অভাব নাই। সাপ, ব্যাং, মাছ, কুমীর, বাঘ, সিংহ, ছুঁচো, পেঁচা, উল্লুক, ভাল্লুক, গণ্ডার, হুণ্ডার—কোনও জন্তুই এ সব পশুশালা থেকে বাদ যায় না। কাজেই বাজার যে চড়া হবে তা'র আর আশ্চর্য্য কি ?

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

(৩০)

বাস্তু কাৎ !

"**বা**ড়ী ফিরেই মনে মনে আমি আমার থিওরি খাড়া করে ফেল্লাম। সলিল বাবু তাঁর উড়ো চিঠিতে লিখেছিলেন—'সোনার হরিণ **যারা** ছিনিয়ে নিয়েছিল,' '**যে** ছিনিয়ে নিয়েছিল' নয়। 'যারা' শব্দটা বহুবচন, তার মানে দ্বারিক বাবুর মাথায় হাত বুলিয়েছিল অহিভূষণ চৌধুরী একা নয়, জনাকয়েক এক সঙ্গে জোট বেঁধে। তাদের মাথায় আবার হাত বুলালো রামদয়াল-কোম্পানী। এর পরেই দেখ্‌তে পাচ্ছি খুব চুপি চুপি সন্ত্রস্তভাবে রামদয়ালকে কল্‌কাতা ছেড়ে পালাতে সাহায্য কর্‌ছে অশনিকান্ত, আর অশনিকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা—ডায়মণ্ড্‌ কর্পোরেশনের মেম্বাররা—প্রতিহিংসা নিচ্ছে ওরই ওপর। তার পর যখন মনে পড়্‌ল সুদূর শ্রীপুর গাঁয়ে দ্বারিক বাবুর বাড়ীতে কালীচরণকে নিরিবিলি প্রশ্ন করবার সময় এই অশনিকান্তকেই আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছি, তখন সে ব্যাপারটাকে আর 'দৈবের ঘটনা' বলে ঠেলে ফেল্‌তে পারলাম না। মনে মনে বদ্ধ ধারণা জন্মাল যে সলিল বাবুর 'যারা' কথার অর্থ ডায়মণ্ড্‌ কর্পোরেশনের সভ্যেরা, আর সেই সভ্যদের মধ্যে একজনা আমাদের তথাকথিত 'অহিভূষণ চৌধুরী' আর

একজনা অশনিকান্ত মিত্র। অহিভূষণ বাটপারি করে সোনার হরিণ জোগাড় করেছে, খুব সম্ভব ডায়মণ্ড কর্পোরেশনটাকেই জাঁকিয়ে তোলবার জন্য, আর অশনিকান্ত লোভে পড়ে গুণ্ডার দল ডেকে এনেছে, মোটা নগদ টাকা ট্যাঁকে গুঁজবার উদ্দেশ্যে। এই ডায়মণ্ড কর্পোরেশনের কতখানি রহস্য সলিল বাবুর জানা আছে সেটা বার করবার জন্য ওঁকে আরও একটু নাড়াচাড়া দেবার দরকার বোধ করলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, রহস্য জানা তো দূরের কথা ও-নামে যে একটা কারবার আছে তাই উনি জানেন না। আপনার মনে পড়ে সলিল বাবু, এক দিন এন্‌গেজমেণ্ট করে সে এন্‌গেজমেণ্ট আমি আর রাখি নি। আপনারই পাশে বসে এক পার্শী ব্যবসাদার তিত-বিরক্ত কণ্ঠে বার বার জানাচ্ছিল যে হুকা-কাশির কথায় আর কাজে যে এমন গরমিল তা তার জানা ছিল না! তার পর আপনার সঙ্গে সে আলাপ সুরু করে দিলে। সে পার্শী ব্যবসাদারটি কিন্তু স্বয়ং আমি-ই। আমায় মাপ করবেন, নিতান্ত দায়ে পড়েই এ ছলনাটুকু আমায় করতে হয়েছিল—আপনারই দাদার কার্য্যোদ্ধারের জন্য।

"ঠিক এই ঘটনারই আগের দিনে মিষ্টার বাসু আমেরিকা থেকে কল্‌কাতায় ফিরে এসেছেন, জানলাম। আমি গুণ্ডা-দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বেনারস রওনা হচ্ছি শুনে তিনিও আমার সঙ্গ নিতে চাইলেন, আর আমিও খুসী হয়েই তাতে রাজী হয়ে পড়লাম। তখন ওঁর সত্যিকার মৎলব কিছুই টের পাই নি, বরং দাদার ওপর টান দেখে মনে মনে তাঁকে প্রশংসাই করেছি। এখন অবশ্যি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আসল উদ্দেশ্য ওঁর কী ছিল! অশনিকান্তকে যে অবস্থার ফেরে বেনারসে আসতে হবে তা তাঁর চিন্তায় আসে নি, ভেবেছিলেন অমন দামী জিনিষটা অদানে অব্রাহ্মণে যায় কেন, তার চাইতে সেটার উদ্ধার করে দ্বারিক বাবুর হাতে তুলে দিতে পারলে আখেরে হয়তো কাজ দেখ্‌বে। তার চাইতেও ওঁর বড় উদ্দেশ্য হল এই যে, পদে পদে আমার প্রত্যেকটি কাজের ওপর খরদৃষ্টি রাখবেন আর নিজের কুকীর্ত্তির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখলেই আড়াল থেকে সব ভেস্তে দেবেন।

"দু'জনা কাশী এসে পৌঁছালাম। আমি জানতাম রণজিৎ বাবুর ওপর যখন অশনিকান্তের দৃষ্টি পড়েছে তখন আমার সম্বন্ধেও সে আর উদাসীন নেই; নিশ্চয়ই আমার ওপরও কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা হবে যাতে কোনক্রমেই না আমি কাশী এসে পৌঁছাতে পারি। চালাকির আশ্রয় তাই আমাকেও নিতে হয়েছিল, কিন্তু কাশীর মাটীতে পা দিয়েই বুঝলাম সে সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমার আসার কথা অশনিকান্তের কাছে আর চাপা নেই। শুধু তাই নয়, 'সুমিত্র-নিকেতন' নামে ভেলুপুরার যে বোডিংহাউস্‌টায় আমরা আস্তানা গাড়ব বলে ঠিক করে এসেছিলাম সেটাও তারা এঁচে ফেল্ল। প্রথম চোটেই ধাক্কা খেয়ে মনটা একটু খিঁচড়ে গেছ্‌ল অস্বীকার করব না, কিন্তু তার পরেই ফের যে ধাক্কা খেলাম তার তুলনায় আগের ওটা কিছুই নয়, নগণ্য বল্লেই

চলে। রণজিৎ বাবু নাকি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেন নি, কোথায় রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এ ব্যাপারের মূলেও যে অশনিকান্তেরই হাত তা আন্দাজ করতে অবশ্য দেরী হল না; চলে এলাম গোধূলিয়ার মোড়ের সেই হোটেলটাতে যেখানে রণজিৎ বাবু প্রথম এসে উঠেছিলেন। ম্যানেজারের সঙ্গে দু'চার কথা কইতেই দেখি কিনা কল্‌কাতায় বসে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আমি যেমন-ধারা এঁচেছি ঠিক তেম্‌নিটিই ঘটেছে। সত্যিই রণজিৎ বাবু এখানে এসে ওঠার পর অশনিকান্তও নাকি এসে জোটে, তার পর কথার ফেরে ভালোমানুষ ম্যানেজারটির কাছ থেকে এই খবরটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে যায় যে সেদিন সন্ধ্যাবেলাই উনি, মানে রণজিৎ বাবু, দশাশ্বমেধঘাটে নৌকা ভাড়া করে জল-বেড়াতে বেরোবেন। অশনিকান্তের চেহারার একটু বর্ণনা দিতেই ম্যানেজার বলে উঠ্‌ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ রকমই বটে সে লোকটা দেখতে।'

"হোটেলে আসবার সময় রাস্তায় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম, যেটা আমার কাজে লাগ্‌ল ভাল; খুব ধূমধাড়াক্কা করে বাজনা বাজিয়ে বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপন বিলি হচ্ছিল—'মেঘপুষ্প' নামে বাংলা ছবিখানা সেদিনই নাকি প্রথম কাশীতে দেখান হবে। কিছুদিন আগে কলকাতায় ও ছবিখানা আমি দেখেছিলাম, কি একটা ভূমিকায় যেন অশনিকান্ত ওতে নেমেছিল। আজ সে কাশীতে সশরীরে উপস্থিত, কাজেই নিতান্ত অসুবিধা না ঘটলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আর একবার নিজের অভিনয় দেখতে সে বায়োস্কোপে উপস্থিত হবেই। হোটেল থেকে বেরিয়ে আমিও তাই রওনা দিলাম সেদিক্ পানেই। আধুনিক ভাষায় আপনারা যাকে 'প্রেক্ষাগৃহ' বলেন তার ভেতরে ঢোকবার আর প্রয়োজন হল না, দেখা গেল বাইরে দাঁড়িয়েই শ্রীমান্ অপর এক বন্ধুর সঙ্গে দিব্যি গল্পে মেতে গেছেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, তার এই প্রাণের বন্ধুটি রামদয়াল, যার ফটো আমায় নিজে-হাতে এন্‌লার্জ্জ করতে হয়েছিল। বন্ধুযুগলের আলাপও কিঞ্চিৎ কানে এল—আমার আর মিষ্টার বাসুর মধ্যে একজনকে তো তারা চেনে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে কাশী এসে পড়তে পারে প্রত্যাশাও করছিল, কিন্তু অপর জনা কে তাই নিয়েই গবেষণা চল্‌ছিল। তাড়াতাড়িতে তার মুখটা ভাল করে চিনে রাখা যায় নি বলে ওদের মনে দুঃখ হয়েছে, দেখলাম। রামদয়ালের কথায় আরও টের পাওয়া গেল যে কাশীতে সে যজমানী ব্যবসা করে, অর্থাৎ সোজা কথায় প্রকাশ্যে সে কাশীর পাণ্ডা।

"নাথ্‌নি নামে সুমিত্রনিকেতনের একটা চাকর রামদয়ালদের টাকা খেয়ে আমাদের ওপর বেজায় গোয়েন্দাগিরি সুরু করে দিয়েছিল। ব্যাটার টিকির গোছা মোটা হলেও বুদ্ধিটা যে সরু তা বলতেই হবে; একটা-না-একটা জিনিষ সর্ব্বদাই ওর হাতে থাকত, যাতে ধরা পড়লেই সেটা দেখিয়ে অনায়াসে বলতে পারে যে আমাদেরই কোন কাজে এদিক্ পানে এসেছিল। প্রথম যেদিন ধরা পড়ে সেদিন ওর হাতে দেখ্‌লাম একটা জাঁতিকল, বল্লে, ইঁদুর মারার জন্যে ওটা

নাকি আমাদের ঘরে পাৎতে হবে। ও কিন্তু সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে জাঁতিকলটা শেষ পর্য্যন্ত ওর কোন কাজে আস্‌বে না, আসবে আমারই কাজে, আর তাতে ইঁদুর ধরা পড়্‌বে না, ধরা পড়বেন সশরীরে মিষ্টার বাসু। ঘটনাটা এবারে খুলে বলি শুনুন—

"রণজিৎ বাবুর খোঁজে সেদিন আমি একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছিলাম, চা খাওয়া অবধি অপেক্ষা করি নি। পথে সেটা সেরে নেবার উদ্দেশ্যে এক চায়ের দোকানে ঢুকেই কিন্তু আমি একদম্ থম্‌কে গেলাম—আমার ঠিক সুমুখেই রামদয়াল আর অশনিকান্ত হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসে আছে। আমার দিকে তারা একবার ক্ষণিক দৃষ্টিতে চাইল বটে, কিন্তু আলাপ বন্ধ হ'ল না, নাথনি যে সে রাত্তিরেই ওদের সঙ্গে দেখা করবে সেই কথাই বলাবলি করতে করতে চা খেয়ে চল্ল। বুঝ্‌লাম, আমায় ওরা চিন্‌তে পারে নি। অবশ্য স্বাভাবিক চেহারায় কাশীধামে আমি নামি নি, কিন্তু তা হলেই বা কি, ষ্টেশনে নামামাত্রই তো ওরা আমায় এঁচে ফেলেছে, সেই চেহারাই এখন ওদের ভুলে যাওয়ার হেতু কি? তবে কি অশনিকান্ত ষ্টেশনে আমায় সেদিন মোটেই চিন্‌তে পারে নি, চিনেছিল মিষ্টার বাসুকে? আর তাঁকেই ওদের প্রধান শত্রু বলে ঠাউরে নিয়েছে আমার দিকে ততটা লক্ষ্য না রেখে? বায়োস্কোপে সেদিন এরা দু'জন যে 'অপর লোকটি' কে তাই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল আর তার চেহারাটা ভাল করে চিনে রাখা হয় নি বলে আফ্‌শোষ করছিল—আমিই কি সেই 'অপর লোকটি', বাসু নয়? নিশ্চয়ই তাই, নতুবা এ ব্যাপারের যে আর অন্য কোন মানেই হয় না!

"কিন্তু মিষ্টার বাসুকেই বা অশনিকান্ত কিভাবে চিন্‌তে পারে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না! অশনি মিত্তির বেনারস রওনা হয়ে আসার দু'তিন দিন পরে উনি প্রথম দেশে ফেরেন, পূরো দশ দশটি বচ্ছর আমেরিকায় কাটিয়ে। অথচ সেদিন বায়োস্কোপে ওদের কথাবার্ত্তায় বুঝতে পেরেছি উনি যে কোন মুহূর্ত্তে কাশী এসে পৌঁছোবেন বলে ওদের আতঙ্ক হচ্ছিল, এবং কড়া পাহারারও বন্দোবস্ত হয়েছিল সেইজন্যই। উনি যে কাশী আসবেন সে কথা আমি, সলিল বাবু আর সন্তোষ বাবু ছাড়া আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। এত লোককে বাদ দিয়ে যার ওপর সন্দেহ হওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না তারই ওপর সন্দেহই বা হল কেন, আর ষ্টেশনে নামামাত্র অশনিকান্তই বা তাকে চিনে ফেল্‌ল কি ভাবে? তবে কি—তবে কি মিষ্টার বাসু সবাইকে যা বল্‌ছেন তা ঠিক নয়, অর্থাৎ তাঁর লোক দেখানো আসার তারিখটা প্রকৃত আসার তারিখ নয়, ওর ঢের আগেই গোপনে তিনি দেশে ফিরেছিলেন, এবং ফেরার পরই অশনিকান্তের সঙ্গে কোন সূত্রে ওঁর আলাপ ঘটে গেছ্‌ল? এ ছাড়া এ ব্যাপারের আর কোন অর্থ করাই যে শক্ত! কিন্তু কেন? মিষ্টার বাসুর এ লুকোচুরি খেলার কারণ কি? সোনার হরিণ অথবা 'অহিভূষণ চৌধুরী'র সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তো?

মনের ভেতর এই ধরণের বিশ্রী একটা চিন্তা পুষে সুমিত্র-নিকেতনে ফিরে এলাম। ঠিক তার পরেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল; মিষ্টার বাসু নাথ্‌নির রেখে-যাওয়া জাঁতিকলটা নিয়ে আন্‌মনে নাড়াচাড়া করছিলেন, হঠাৎ ওঁর ডান হাতের তিনটে আঙুল কলের মধ্যে আট্‌কে গেল—একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমারও মাথায় চমৎকার একটা মৎলব ঢুক্‌ল; 'অহিভূষণ চৌধুরী' বাঁ হাতে লিখে লিখে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিল, মিষ্টার বাসু বাঁ হাতে লিখতে পোক্ত কিনা একবারি পরীক্ষা করতে ক্ষতি কি? মিষ্টার বাসুরই জবানীতে সন্তোষ বাবুর নামে এক চিঠি লিখে সই নেবার জন্যে ওঁর সামনে সেটা বাড়িয়ে দিলাম। যন্ত্রণায় ডান হাত উনি নাড়তে পারেন না, সই করতে হলে বাঁ হাতেই কর্‌তে হবে। কিন্তু শিকাগো-ফের্‌তা লোক, ধড়িবাজীতে ওঁর নাগাল পাওয়া শক্ত; ন্যাকামি করে এম্‌নি একখানা সইয়ের নমুনা দেখালেন যে বাঁ-হাতে লেখা কস্মিন্-কালেও যে ওঁর আসে, কারো মনেই সে সন্দেহ না জাগ্‌তে পারে। কিন্তু অতি চালাকেরও যে মাঝে মাঝে 'নাকে দড়ি' পড়ে সে সম্বন্ধে আপনাদের দেশেই প্রবচন আছে, এক্ষেত্রেও হ'ল তাই। চিঠিখানা ডাকঘরে না ফেলে সাম্‌নেরই একটা লেটার বক্সে ফেলে খুবই তাড়াতাড়ি আমি ফিরে এলাম। ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে দেখি কপাট ভেতর থেকে বন্ধ; তখন চাবির ফোকরে চোখ লাগিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার রহস্য ষোল আনাই ভেদ হয়ে গেল—যিনি বাঁ হাতে লিখতে পারেন না বলে মাত্র মিনিট দশেক আগেই ন্যাকামির চূড়ান্ত করছিলেন, এখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তিনিই দিব্যি তরতর করে বাঁ হাতেই একখানা চিঠি লিখে যাচ্ছেন নিবিষ্টমনে। এত দিনের চেষ্টায় তা হলে অহিভূষণ চৌধুরীর সাক্ষাৎ মিল্‌ল! আর সলিল বাবুও পাঁচজনের সন্দেহ-দৃষ্টি থেকে কাকে ঢেকে রাখ্‌বার চেষ্টা করে আসছেন তাও বোঝা গেল। মনে মনে হেসে আমি দরজায় বার কয়েক ঘা দিলাম, তার পরেই আবার ফোকরে চোখ রেখে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে ঘরের ভেতরটাতে। প্রথম পরিবর্ত্তন দেখা গেল মিষ্টার বাসুর মুখে, সাদা মুখ একেবারে কালো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল তাঁর ব্যবহারে, সেই মুহূর্ত্তে লেখা বন্ধ করে শেল্‌ফের কাছে এগিয়ে একটা বইয়ের ভেতর তিনি চিঠিখানা রেখে দিলেন, তার পর মুখখানাকে যতদূর সম্ভব সহজ অবস্থায় এনে তাড়াতাড়ি দোর খুল্‌লেন। আমিও বুঝলাম, অবিলম্বে ও চিঠিখানা আমার হস্তগত হওয়া চাই-ই, কেননা যে ব্যক্তি সোনার হরিণ সরিয়েছে এখন আবার কার কাছে তার গোপনীয় চিঠি পাঠাবার দরকার পড়্‌ল সেটা জান্‌তে হবে বৈকি! হঠাৎ যেন একটা বিশেষ জরুরী কাজ পড়ে গেছে এবং তারই জন্যে আমাদের দু'জনাকেই তৎক্ষণাৎ বাইরে কোথাও বেরিয়ে যাওয়া দরকার—এম্‌নি একটা ভাব দেখিয়ে মিষ্টার বাসুকে একেবারে রাস্তায় নিয়ে এলাম। তার পর 'দাঁড়ান, ম্যানেজারের ঘর থেকে আস্‌ছি' বলে আবার ভেতরে ঢুকে এমনি একটা জায়গা বেছে নিয়ে একটুকাল দাঁড়ালাম

যাতে আমার ওপর কারো নজরই না পড়তে পারে। যখন দেখ্‌লাম চারদিক্ একদম নিরিবিলি তখন আস্তে আস্তে পা টিপে ওপরে আস্‌তে আর কোন বাধা রইল না। আমাদের রুমটার সাম্‌নে গিয়েই দেখি কিনা নাথ্‌নি শেল্‌ফের কাছে দাঁড়িয়ে সেই বইখানা খুঁজ্‌ছে। আমায় দেখেই তো তার মূর্চ্ছা হওয়ার গতিক, আমিও তাকে পালাবার সুযোগ দিয়ে, বই খুলে চট্‌ করে চিঠিখানা দেখে নিলাম। ছোট্ট স্লিপের কাগজে লেখা, আর সে লেখাও সবে সুরু হয়েছিল, শেষ হয় নি। কাজেই খবর বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। তবে ওপক্ষের উদ্দেশ্যেই যে চিঠি পাঠান হচ্ছিল তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না, নইলে নাথনি এটার উদ্ধারে আস্‌বে কেন? চিঠি লিখ্‌বার সময় সে যে ঘরের ত্রিসীমানায়ও ছিল না সে তো নিজের চোখেই দেখেছি! সমস্ত মিলে এবার থিওরিটা দাঁড়াল এই—আমার অগোচরে ইতিমধ্যেই—খুব সম্ভব সেইদিনেই—মিষ্টার বাসুর সঙ্গে অশনিকান্তের দেখা হয়ে গেছে। অশনিকান্ত তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে সে চোরের ওপর বাটপারি করেছে এ কথা ঠিক, কিন্তু বাসু যদি তাকে ফাঁসাবার মৎলব করে থাকেন তবে তিনি নিজেও বাদ পড়বেন না। অর্থাৎ, মরবার আগে বাসুকেও তিনি মেরে যাবেন, অহিভূষণ চৌধুরীর আসল রহস্য ফাঁক করে দেবেন। তখন দু'জনার মধ্যে আপোসে রফা হয়ে গেল—ফিফ্‌টি, ফিফ্‌টি! ব্যস্, বাসু ওদলে চলে গেলেন, আমার সঙ্গে রইলেন শুধু পদে পদে প্রত্যেকটি কাজ ভণ্ডুল করে দেবার জন্য। এর পরই নাথ্‌নিকে শিখিয়ে দেওয়া হল মিষ্টার বাসুর প্রত্যেকটি হুকুম যথাযথ ভাবে তামিল করতে। আমি ম্যানেজারের ঘরের দিকে সরে যেতেই নাথনিকে ডেকে মিষ্টার বাসু কি উপদেশ দিয়েছিলেন তা বোধ করি আর আপনাদের বুঝিয়ে বল্‌বার দরকার নেই!

রহস্য তো ষোল আনাই ভেদ হল, কিন্তু এখনও যে বড় বড় দু'টো কাজই বাকী—রণজিৎ বাবুর উদ্ধার আর দ্বারিক বাবুর জিনিষ তাঁর নিজের হাতে সঁপে দেওয়া। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে নেমে পড়লাম ও দুটো কাজে। জানা ছিল রামদয়াল কাশীর পাণ্ডা, কাজেই তার 'আপিস্' খুঁজে বার করতে গোল হ'ল না; পরদিন সকালেই তসরের কাপড় পরে তীর্থযাত্রীর বেশে তার দোকানটিতে এসে হাজির হওয়া গেল। সে তখন দোকানে ছিল না, ছিল তার ছোট ভাই। দু'জনে কথা কইছি, হঠাৎ দোকানের ভেতরেই কেমন একটা কলিং-বেল যেন বেজে উঠ্‌ল, আর সেও অমনি আমায় একটু অপেক্ষা করতে বলে শশব্যস্তে চলে গেল সামনেরই একটা পানের দোকানে। একটু বাদেই স্পষ্ট বুঝে নিলাম যে এ দোকান দুটো আর কিছুই নয়, ওদেরই শিকার ধরবার ফাঁদ। কাশীতে কারা নতুন আস্‌ছে দু'কথাতেই ওরা বুঝে নেয়, তার পর কৌশলে কখন তারা কোথায় বেড়াতে যাবে জেনে নিয়ে লুঠের ব্যবস্থা করে। একাজের জন্য ওদের নিজস্ব টঙ্গা, গাড়োয়ান সবই ঠিক আছে। সম্প্রতি দুটি বাঙ্গালী ছোকরা শিকার জুটেছে, তাদের

'ব্যবস্থা' করবার জন্যই কলিং-বেলটি বেজেছিল। সব কথা বিস্তং দিয়ে বল্‌বার দরকার নেই, আপনাদের শুধু এটুকু জান্‌লেই যথেষ্ট হবে যে ওদের গাড়োয়ানটাকে সেদিন আমি কৌশলে সহরের বাইরে এনে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম; ছোকরা দুটিও রক্ষা পেল, আর ফেরবার সময় ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দেওয়ায় সেও তার আস্তাবলে ফিরে এল, অর্থাৎ আস্তাবলটি আমায় চিনিয়ে দিলে। ঠিক সেই সময়েই ওই গাড়োয়ানের এক ছোট্ট ন্যাংটা ছেলে পাশেরই একটা মেটে ঘর থেকে দৌড়ে এসে বল্লে 'বাবা এসে গেছে।' ব্যস্, গাড়োয়ানের বাড়ীটারও একটা হদিস্ মিল্‌ল। এ গাড়োয়ানটা আর কিছু রামদয়ালদের মত 'উচ্চশ্রেণীর জীব' নয়, কাজেই ওর অল্পবুদ্ধির সুযোগ নিয়ে অনায়াসেই ছুঁচ্ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোন সম্ভব হবে মনে করে আমি খুব খুসী মনেই ফির্‌ছিলাম, পথে একটা মজার ব্যাপার ঘটায় অতি অক্লেশেই রণজিৎ বাবুর উদ্ধার সম্ভব হয়ে গেল, সোনার হরিণও হাতে ফিরে এল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সহস্র-জীবের উপাখ্যান

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

সরকারের ডাক-বিভাগে চাকরী করি, বাংলা দেশের নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। সেই সূত্রে নানান্ জায়গার সঙ্গে পরিচয়ও যেমন ঘটেছে, তেম্‌নি লোকও দেখেছি বিচিত্র রকমের।

সেবার বদ্‌লীর হুকুম হ'ল নিশ্চিন্তপুরে। ঢাকা জেলার ভেতর নিশ্চিন্তপুর একটা গণ্ডগ্রাম; বাজার-হাট, ইস্কুল-পাঠশালা, থানা, পোষ্ট-অফিস্—এক কথায় বড় একটা গ্রামে যা যা থাকা দরকার সমস্তই প্রায় সেখানে আছে। সেখানকারই ডাক-ঘরের চার্জ্জ পেয়ে কাজে এসে যোগ দেওয়া গেল।

একেবারে প্রথম দিনেই সাক্ষাৎ মিল্‌ল অদ্ভুত একটি লোকের—তার চাইতেও ভাল হবে যদি বলি অদ্ভুত একটি পোষাকের। রবীন্দ্রনাথের আলখাল্লার মত পোষাকটির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে কি? অনেকটা সেই ধরণেরই পোষাক, তবে তফাৎ এই যে এ পোষাকটার গলা থেকে সুরু করে পা অবধি প্রায় শ'খানেক পকেট, আর প্রত্যেকটা পকেটের মুখই খুব হুঁসিয়ারির সঙ্গে শক্ত সূতা দিয়ে সেলাই করা। লোকটা ডাকঘরে ঢুকেছিল পোষ্টকার্ড্ কিন্‌তে,

লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম, শুধু বুকের কাছেই তার একটা মাত্র পকেটের মুখ-খোলা ; বোধ হয় খুচ্‌রা টাকা পয়সা ওখানেই থাকে ।

ব্যাপারটা যে বাস্তবিকই একটু অদ্ভুত তা বোধ হয় তোমরাও স্বীকার করবে, এবং এ লোকটা সম্বন্ধে আমার যদি একটু কৌতূহল জেগেই থাকে তো সেটাকেও বোধ হয় তোমরা অহেতুক, অন্যায় কৌতূহল বল্‌বে না। কাজেই থানার বড় দারোগা বাবু পরদিন যখন তাঁর নিজেরই কোন্ একটা কাজে পোষ্ট-অফিসে এলেন তখন তাঁকে বল্লাম, "মশাই, আপনার এলাকায় যে একজন মহা-মহাকবি আছেন সে খবর রাখেন ?"

সাক্ষাৎ মিল্‌ল·· ···অদ্ভুত একটি পোষাকের !

"মহা-মহাকবি ?" দারোগা অনাথ বাবু আশ্চর্য্য হলেন।

"তা ছাড়া আর কি বল্‌ব ? রবি ঠাকুরের গায়ে শুধু যে পোষাক দেখেছি, এঁর গায়ে সেই পোষাকেই আবার শ'খানেক পকেট ! যিনি মহাকবিরও ওপরে উঠে গেছেন তাঁকে মহা-মহাকবি ছাড়া আর কি বলা যায় ?"

অনাথ বাবু এইবার একেবারে অট্টহাসি হেসে উঠ্‌লেন, "ওঃ, আপনি সহস্র-জীবের কথা বল্‌ছেন ? এরই মধ্যে তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে নাকি ?"

এবার আশ্চর্য্য হবার পালা আমার, বল্লাম, "সহস্র-জীব ? এটা কোন্ দেশী ভাষা মশাই ?"

"খাঁটি দেশী, খাঁটি দেশী ! আমাদের এ অঞ্চলে পকেটকে চল্‌তি ভাষায় বলা হয় 'জেব'।

লোকটার গায়ে কমসে কম্ হাজার খানেক 'জেব', মানে পকেট আছে, তাই ইস্কুলের সেকেণ্ড্ পণ্ডিত মশাই ওর নাম দিয়েছিলেন সহস্র-জেব। সেটাকেই আবার একটু মোলায়েম করে আমরা করে নিয়েছি সহস্র-জীব—সহস্রাণি জেবাণি যস্য সঃ সহস্র-জেবঃ, বিকল্পে সহস্র-জীবঃ। এখন চোর তাড়িয়ে বেড়ালে হবে কি মশাই, কলেজে থাক্‌তে দস্তুরমত সংস্কৃত পড়া হয়েছিল !"

"লোকটা পাগল নাকি মশাই ? কিন্তু ব্যবহারে তো তা মনে হয় না, সিকি-দোয়ানিগুলো তো বেশ বার বার নানান্ ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিল !"

"না, না পাগল হবে কেন, একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সাবধানী। তবে বাড়াবাড়ি জিনিষটাকে যদি পাগ্‌লামিরই সামিল মনে করেন, তবে তা-ই বটে। ওর একটা ইতিহাস আছে—একেবারে একাধারে করুণ এবং হাস্যরসাত্মক—যাকে বলে ট্র্যাজিক্ এবং কমিক। ওর হাজার তিনেক টাকা কোন্ সময় নাকি কোন্ এক লোন-অফিসে জমা ছিল। কালক্রমে একদিন সে লোন-অফিস্‌টি পটল তুল্‌ল, আর বেচারার সব টাকা গেল মাঠে মারা। সেই থেকে ও সঙ্কল্প করেছে, টাকা-পয়সা আর ইহজন্মে পরের কাছে জমা রাখ্‌বে না, এক পয়সাও না ; স-ব নিজের কাছে। কিন্তু সেদিক্ দিয়েও আবার মুস্কিল বিস্তর। বাড়ীতে এমন একটি জনপ্রাণী নেই, যে অষ্টপ্রহর ওর টাকার বাণ্ডিল পাহারা দেয়—না ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী-পরিবার, না অন্য কেউ। থাকবার মধ্যে আছে এক উড়ে কম্বাইণ্ড্ হ্যাণ্ড্—চাকর বল্‌তেও সেই, ঠাকুর বল্‌তেও সে-ই। তার ওপর তো আর কিছু লোহার সিন্ধুক রক্ষার ভার দেওয়া চলে না, তাই ও সহরে গিয়ে সমস্ত টাকার বদলে নোট্ নিয়ে এসেছে—বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট্—তার পর ওর সহস্র জেবের ভেতর ওগুলোকে পূরে প্রত্যেকটার মুখ আচ্ছাসে সেলাই করে নিয়েছে। যেখানে যায় সমস্ত টাকা-কড়ি, এক কথায় সমস্ত সম্পত্তি সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বাড়ী ঢুঁড়ে চোর-ডাকাত বড় জোর পেতে পারে গোটাকতক কলাই-করা চায়ের সরঞ্জাম, এলুমিনিয়মের কিছু বাসনপত্র, আর একটা মান্ধাতার আমোলের ডেক্ চেয়ার : ওগুলোকে এখনও ওর জেবের ভেতর জায়গা দিতে পারে নি, তবে তা দেওয়াও সম্ভব কিনা শুন্‌তে পাই আজকাল সে বিষয়েও নাকি ও মাথা ঘামাচ্ছে। ভাল কথা, আপনিও কিন্তু সহস্র-জীব নামেই ডাকবেন ওকে। নইলে বিদেশ-বিভূঁয়ে একা-একা থাকেন, কোন্ দিন হয়তো রান্না চড়িয়ে দেখ্‌বেন চড়াৎ করে হাঁড়ি ফেটে গেছে। হাড়-কঞ্জুষ না হলে এমন ধারা শুনেছেন কখনও ?" অনাথ বাবু হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

আমি বল্লাম, "হাড়কঞ্জুষ তা বুঝ্‌তে কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু সম্পত্তিরক্ষার এ প্রণালীটা তো ঠিক বোধগম্য হল না অনাথ বাবু ! এমনও তো হতে পারে যে চোরডাকাতরা ওর আস্তানার দিকে নজর না দিয়ে দেহখানার ওপরেই বেশী মাত্রায় নজর দিতে থাক্‌বে !"

"দিতে পারে যদি তাদের প্রাণের মায়া একটুও না থাকে। তবে আমাদের ধারণা

সে মায়াটা সাধারণ লোকের যেমন আছে, চোর-ডাকাতদেরও ঠিক ততটাই আছে; তার চাইতে এক তিল কম নয়। কথা কি জানেন, সহস্র-জীব এককালে সরকারের চাকরী করত, অনেক হোমড়া-চোমড়া সাহেব-সুবোর সঙ্গে ওর জানাশোনা। তাদেরই সুপারিশে কালেক্টার সাহেবকে ধরে-পড়ে একটা পিস্তলের পাশ ও জোগাড় করে নিয়েছে। ওর সহস্র জেবেরই কোন একটা জেবে সে অস্ত্রটাও যে সর্ব্বদাই বিরাজমান এ তল্লাটে এমন একটি লোক পাবেন না যে সে খবরটুকু না জানে। কাজেই ওর সম্পত্তি কৃপ-অশ্বত্থামার মতই অমর-অক্ষয়। কচি ছেলে থেকে বুড়ো পর্য্যন্ত সবাই যেমন জানে যে লোকটার সমস্ত টাকা-কড়ি ওর সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে তেম্‌নি আবার এ-ও জানে যে টাকা রক্ষার ব্যবস্থাও আছে।"

তোমরা যাই বল, বর্ণনা শুনে লোকটার ওপর বাস্তবিকই আমার ভক্তির ভাব জেগে উঠেছিল, মনে মনে তাই ঠিক করলাম সুযোগ পেলেই একবার আলাপ জমাতে হবে। আর সে সুযোগ ঘট্‌তেও খুব বেশী দেরী হল না।

শাস্ত্রে বলে, মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ ষোল আনাই লাভের ব্যাপার। শাস্ত্রের বচন যে এতটুকু মিথ্যা নয় তা টের পেলাম সহস্র-জীবের সঙ্গে পরিচয় ঘট্‌বার পর প্রথম দিনই। আমার আয় বাড়াবার চমৎকার একটি পন্থা বাৎলে দিলে সে; প্রথম আলাপের পরই জিজ্ঞাসা কর্‌লে "আপনার বেতন কত?"

"আজ্ঞে আশীটি টাকা।"

"এখানে তো থাকেন আপনি একদম্ একা, মাত্র একটা চাকর নিয়ে। মাসে আপনার খরচা পড়ে কত?"

"তা টাকা-পঁচিশেক হবে বৈকি!"

"আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে দু'জনা লোকের দশ টাকাতেই চলে যায়, এ কথা মানেন আপনি?"

"তা, তেমন-তেমন লোকেদের তাইতেই চালাতে হয় বৈকি!"

"তাতে তাদের ক্ষিদে যে মরে, আর কাপড়টা-আশটাও তারা যে পরে থাকে, তা আপনি অস্বীকার করছেন না!"

"তা আর কই করছি!"

"তা হলেই দেখুন, আপনিও ঠিক তাদেরই মত মাস মাস দশটি মাত্র টাকা খরচ করে শরীরটাকে টিঁকিয়ে রাখ্‌তে পারেন! তবে তাই কেন কর্‌ছেন না? মাস-কাবারে দেখ্‌বেন আপনার আয় কত বেড়ে গেছে, আশী টাকা পঁচানব্বুই টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।"

একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম, সাধুসঙ্গের কী মহিমা! ঠিক সেই সময় সহস্র-জীবের উড়ে

চাকরটি এক ঝুড়ি আলুর আর কাঁচকলার খোসা নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল; অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "এ গুলোতে কি হবে?"

"দেখুন, দুনিয়ায় দু' রকমের লোক আসে—এক দল আসে ঠক্‌তে আর এক দল জিৎতে। আমাদের গাঁয়ের অধিকাংশই এই ঠকার দলে, আনাজ কুটে তারা আলুর খোসা, কাঁচকলার খোসা সবই ফেলে দেয়। আমার মত যারা জেতার দলে তারা আবার তা ই কুড়িয়ে আনে। আজ আমার বাড়ীতে ভাতের সঙ্গে রান্না হবে দু' দুটো পদ—আলুর খোসার চচ্চড়ি, আর কাঁচকলার ওপরটা দিয়ে কালিয়া। খেয়েছেন কখনও? খান্ নি? খেয়ে দেখ্‌বেন একদিন কী উপাদেয়! অবশ্য উপাদেয়ত্বটা নির্ভর করবে রান্নার ওপর; যে রাঁধবে তাকে বলে দেবেন তেলের ওপর জোর না দিয়ে জলের ওপরই যেন জোরটা দেয় বেশী। আর সেটাই নাকি স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়েও ভাল,—ডাক্তারেরা তো সেই রকমই বলে থাকে।"

এক দিনে এত বেশী শিখে ফেল্লে সমস্তই হয়তো ভুলে যাব, তাই সহস্র-জীবকে সহস্র নমস্কার জানিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

দিন পাঁচ-সাত পরের কথা, সরকারী কাজে দূরের একটা গাঁয়ে গিয়েছিলাম। গেঁয়ো পথ, গাড়ীঘোড়ার তো আর রেওয়াজ নেই; নির্ভর করতে হয়েছিল চরণ-রথের উপরেই, আর সেই জন্যই পরিশ্রমও হয়েছিল প্রচুর। ফেরবার সময় দেখতে পেলাম সহস্র-জীব তার ঘরের দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছে। হায় রে, এ সময় এক কাপ চা যদি আমার মুখের সাম্‌নে কেউ ধরত! কিন্তু সহস্র-জীবের কাছে ওটি আশা করাও যা সাহারা মরুভূমির কাছে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল প্রত্যাশা করাও তাই—ও একই কথা। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে গেলাম, সহস্র-জীব হাত তুলে আমায় ডাকৃছে—"মাষ্টার মশাই, ও মাষ্টার মশাই, এদিকে আসুন দেখি, এদিকে আসুন। (পোষ্ট-মাষ্টারকে অনেকে মাষ্টার-মশায় বলে ডেকে থাকে).

রুমালে মুখের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম; সহস্র-জীব বল্লে, "বড়ই মেহনৎ করে আস্‌ছেন দেখছি, দেবে নাকি এক কাপ এনে?"

আহ্লাদে গলে পড়ে বল্লাম, "সে আপনার দয়া!"

"না, না, দয়া-টয়া আবার কি, সে সব কিছু নয়—আরে ও নটবর, মাষ্টার বাবুর জন্য এক বাটী চা তৈরী করে আন্‌তো!"

চা খাবার পরই শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল, খানিকক্ষণ আমার চা-দাতার সঙ্গে গল্পে কাটিয়ে শেষে বিদায় নিলাম।

বিকাল বেলা ডাকঘর বন্ধ করে বার হব, দেখি কিনা সহস্র-জীব রিটার্ণ ভিজিট দিতে

এসেছে। একটু হেসে বল্লে, "বড্ড রোদ, দুপুর বেলা আর বেরোবার ইচ্ছা হল না। আজকের কথাই আমি বল্‌ছি না,—আজ হোক, কাল হোক, দশ দিন বাদে হোক, আপনার যখন্ সুবিধা, দেবেন ও পয়সা দেড়টা পাঠিয়ে। হিসাব করে দেখ্‌লাম, দুধ-চিনি-চা সবটাতে মিলিয়ে ওবেলা আপনার জন্য দেড় পয়সাই খরচ হয়েছিল, তার বেশী নয়। অবশ্য জল গরম করতে কাঠও কিছু পুড়েছে, কিন্তু তার দাম আর ভদ্রলোকের কাছে চাই কি করে—হাজার হোক, চোখের তো একটা পর্দ্দা আছে!"

বাস্তবিকই সে বস্তুটা আছে নাকি দেখবার জন্য আমি পূরো এক মিনিট্ লোকটার মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম, তার পর ধীরে ধীরে পকেট থেকে দুটো পয়সা বার করে বল্লাম, "তা ন্যায্য হিসাব করতে গেলে কাঠের দামটাই বা বাদ যাবে কেন, আপনি পূরো দু'পয়সাই নিন। তা ছাড়া খুচরো আধ্‌লাও তো আমার সঙ্গে নেই!"

"না, না, সে হয় না, কাঠের দাম সেধে আমায় আর লজ্জা দেবেন না, সে আমি কিছুতেই নিতে পারব না, চোখের একটা পর্দ্দা আছে তো! খুচরো আধ্‌লা নেই তো হয়েছে কি, আমি চেঞ্জ দিচ্ছি" বলে সে তার উপরের 'জেব' থেকে একটা আধ পয়সা বার করে আন্‌ল, আর আমার দেওয়া পয়সা দু'টি পকেটে ফেলে, 'জেবের' মুখে সেফ্‌টিপিন এঁটে দিল।

লোকটা চলে যেতে মনে মনে কেবল হাসিই এল না, দুঃখও হল। আজ যে ও খেয়ে-না-খেয়ে যথাসর্ব্বস্ব আলখাল্লার পকেটের মধ্যে পূরছে, ঈশ্বর না করুন, কাল যদি ওই আলখাল্লাটাই চুরি যায় তবে ওর দশা কি হবে!

ভগবান্ বোধ হয় মাঝে মাঝে মানুষের মনের ভিতর ভবিতব্যতার ছায়া ফেলেন। আমার এ কথা বলার কারণ এই যে, এই ঘটনারই দু'তিন দিন বাদে একদিন অনাথ বাবুকে খুবই ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে হন্ হন্ করে কোথায় ছুটে যেতে দেখ্‌লাম। কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বল্লেন, "আমাদের সহস্র-জীব নাকি শোকে উন্মাদ হয়ে গেছে—সবাই তাকে ডেক্-চেয়ারের ওপর বসে অনবরত হো হো করে হাস্‌তে দেখে এই মাত্র খবর দিয়ে গেল।"

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, হঠাৎ এ রকম হবার মানে?"

"হঠাৎ? ওঃ, আপনি দেখ্‌ছি তবে আজকের বড় খবরটাই রাখেন না! আজ দুপুর বেলা যে ওর সর্ব্বস্বধন আলখাল্লাটি চুরি হয়ে গেছে! বাজে খরচের মধ্যে জীবনে সহস্র-জীব করেছিল একটা চানের ঘর, দায়ে পড়েই করতে হয়েছিল—নইলে নাইবার সময় আলখাল্লাটি রাখ্‌বেন কোথা? পনেরো বছর ধরে যে ভুল কক্ষণো হয় নি, আজ নিমেষের জন্য সেই ভুলই হয়ে গেল—অন্যমনস্ক ভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে আলখাল্লাটা বাইরে রেখে চানের ঘরে ঢুকেছিল।

ব্যস্, পনেরো বচ্ছরের পুরোনো চাকর সেই ফুরসুতেই সেটি তুলে নিয়ে কোথায় চম্পট্ দিয়েছে। তার পরই এই অবস্থা।"

সত্যি বল্‌ছি, শুনে মনে বাস্তবিকই কষ্ট হল; দেড় পয়সার চা না হয় না-ই খাইয়েছে, তাই বলে একটা লোক তার সমস্ত জীবনের টাকা-কড়ি এই ভাবে খুইয়ে বস্‌ল এ কথা শুনলে

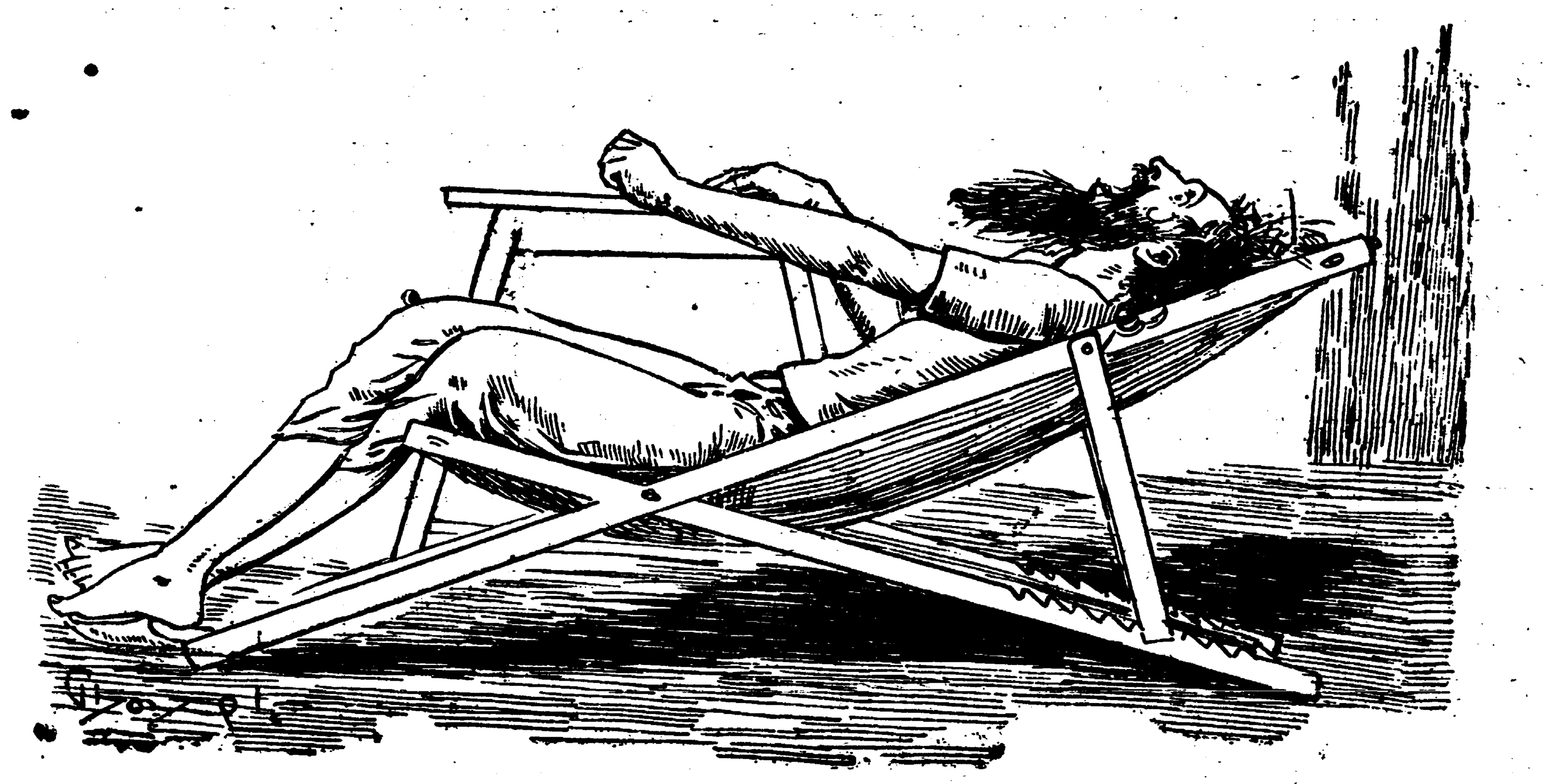

ডেক্ চেয়ারের ওপর বসে……

কার না মনে কষ্ট হয়? অনাথ বাবুর সঙ্গে আমিও তাই সহস্র-জীবের বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে পড়লাম।

ভিতরে ঢুকে দেখি আচ্ছন্নের মত সহস্র-জীব পড়ে আছে, সে যেন আর এ দুনিয়ার জীব নয়, বাইরে কোথাও ভেসে বেড়াচ্ছে। শুধু চোখ দুটো তার অসম্ভব রকম ছল্ ছল্ করছিল। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই আস্তে আস্তে সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "মাষ্টার মশাই, আপনি নাড়ি দেখ্‌তে জানেন? দেখুন তো আমার হাতখানা! আমার যেন সমস্ত শরীর অসাড় করে আন্‌ছে, মনে হচ্ছে আর বাঁচ্‌ব না।"

হাতখানা তুলে ধরতেই দেখি সমস্ত গা আগুনের মত গরম, যেন পুড়ে যাচ্ছে। ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত প্রায় বারটার সময় অনেক লোকের হাঁকডাকে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলতেই তাড়াতাড়ি একজন যা বল্‌লে তার মর্ম্ম এই যে, সহস্রজীবের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে আস্‌ছে—আমায় সে নাকি একবারটি ডেকে পাঠিয়েছে।

সেই অবস্থাতেই খালি গায়ে চটিজুতো পায়ে তার বাড়ী এসে উপস্থিত হলাম; দেখি গ্রামের মুরুব্বিগোছের সকলেই প্রায় ইতিমধ্যে এসে গেছেন, তা ছাড়া ডাক্তার বাবু আর অনাথ বাবুও রয়েছেন। সহস্র-জীবের পানে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, আর তার সময় বড় বাকী নেই।

আমি ঘরে ঢুকতেই সহস্র-জীব অনেক কষ্টে একবার আমার পানে চাইল, তার পর বল্লে, "এসেছেন, মাষ্টার মশাই? তবে আর দেরী নয়. চটপট্ আমার উইলটা লিখে নিন, এর পর হয়তো আর সময়ই হবে না। লিখুন,—আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব, ত্রিশ হাজার টাকা আমার গ্রামবাসীদের দিয়ে যাচ্ছি। এখানে আমার স্ত্রী-পুত্র আমারই চোখের সাম্নে কলেরায় মারা গেছে, আমি তার চিকিৎসার কিছুই ব্যবস্থা করতে পারি নি। তাই আমার ইচ্ছা, এ টাকাটাতে এখানে যেন একটা হাসপাতাল খোলা হয়। অনেক কষ্ট সয়ে, আত্মাকে নানান্ ভাবে বঞ্চিত করে এ টাকা আমাকে জমাতে হয়েছে···" একটি আধ্লাকে টাকা ভেবে খরচ করেছি···নইলে আমার মত লোক এত টাকা জমাতে পারে! সহস্র-জীব কথার মাঝখানেই থেমে পড়ল।

আমরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাউই করতে লাগলাম—লোকটা দেখ্ছি শোকের ধাক্কা আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্তে পার্ল না, একদম্ পাগল হয়ে গেছে! ত্রিশ হাজার টাকা ছেড়ে ত্রিশটি পয়সাও তো ওর সম্বল নেই, সবই তো আলখাল্লার সঙ্গে বিসর্জ্জন হয়ে গেছে। তবুও কথাটা এ অবস্থায় ওর সাম্নে উচ্চারণ করতে বাধ-বাধ ঠেকছিল। সবাই তাই চুপ করে বসে রইলাম।

হঠাৎ দেখি মরণোন্মুখ বৃদ্ধের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে, বল্লে, "আপনারা বোধ হয় ভাব্ছেন এত টাকা আমি পাব কোথা, সবই তো নটবর নিয়ে গেছে! না, সে তা নিতে পারে নি; নটবর পেয়েছে শুধু আনা দুই পয়সা আর গোটা তিনেক আধ্লা—বুক-পকেটের মধ্যে। বাকী সব কয়টা পকেটে সে পাবে শুধু কতকগুলো ভাঁজ করা পুরানো খবরের কাগজের টুকরো! আমার সমস্ত টাকা এই বিছানার তলায় সিন্ধুকে করে মাটীতে পোঁতা আছে। পাছে চোর-ডাকাতে সে সন্ধান পায়, আর সেই টাকা পাহারা দিতে দিতে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সেই ভয়ে আজ পনেরো বচ্ছর সব্বার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি। সবাই মনে করেছে আমার সমস্ত টাকা আমারই সঙ্গে আলখাল্লার পকেটে পকেটেই ফেরে। কিন্তু সে ধারণা একেবারে ভুল। কিন্তু ওতে আমার সুবিধাও বড় কম হয় নি, নির্ব্বিবাদে সময় কাটিয়েছি, দরজা খোলা রেখে যেখানে খুসী গিয়েছি, এসেছি, এতটুকু ঝঞ্ঝাট্ পোহাতে হয় নি।······আজ সকাল থেকেই সমস্ত শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করছিল, কেন জানি না কেবলই মনে হচ্ছিল, আর বুঝি বেশী দিন নেই! এই ভাবনাটাই মনের ভেতর সারাক্ষণ এম্নি ভাবে চেপে বসেছিল, যে

নাইবার সময় আলখাল্লার কথা এত দিন বাদে আজ প্রথম ভুলে গেলাম। যাক্, তাতে ভালোই হয়েছে, যাবার আগে দুনিয়াটাকে একটু বেশী করে চিনে গেলাম। নইলে পনেরো বচ্ছরের চাকর—সেই কিনা! বেচারা পকেট ঢুঁড়ে শেষ পর্য্যন্ত কি পাবে তাই ভেবে এত অসুখের মধ্যেও আমি আর হাসি চাপ্তে পারি নি!"

পর দিন শ্মশানে অনেক লোকের ভীড় হ'ল। এত দিন ধরে যারা তার নামে শুধু হেসেই এসেছে, সেদিন তাদের অনেকের চোখই বেশ যেন একটু ছল্-ছল্ দেখতে পাওয়া গেল।

পাহাড়ী মাকড়সার ছানা

(শ্রীসুকুমাররঞ্জন ঘোষ)

সেবার একরাশ কাঁচা পেয়ারা খেয়ে আমাদের বন্ধুদলের সবারই সুরু হয়ে গেল অসম্ভব পেটকামড়ানি; নিদান এক, কাজেই রোগের ধারও যে একই রকম হবে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? মহা মুস্কিল, তিষ্ঠানও যায় না, আবার বাড়ীতে জানালেও মহা বিপদ্। শেষে সবাই পরামর্শ করে আমাদের 'সরকারী' ঠাকুরদা'র কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। তিনি ভাল ডাক্তারি করতে পারেন, আর আমাদের ভালও বাসেন খুব।

সব কথা শুনে ঠাকুরদা' বল্লেন, "আচ্ছা, একটা গল্প শোন্, পাহাড়ী মাকড়সার ছানার গল্প। পেটের ব্যথা-ট্যথা এক্ষুণি সেরে যাবে।" কি জানি, হয়তো ঠাকুরদা'র গল্পের সঙ্গে ওষুধ মেশান আছে, তাই সবাই মনোযোগী হয়ে বস্লাম। ঠাকুরদা' গল্প সুরু করলেন—"সে অনেক দিনের কথা, তোরা তখন কেউ জন্মাস্ নি; তোরা কেন, তোদের বাবারাও হয় নি। আমি তখন তোদের চেয়েও ছোট। এখনকার মত মোটর, বাস, সাইকেল, ঘড়ি-টড়ির চলন তখন ছিল না। বড়লোকের কাছারি-ঘরে হয়তো এক-আধটা টাইম্‌পিস্-টিস্ দেখা যেত, কিন্তু গেঁয়ো লোকেরা সে সবের নাম-গন্ধও শোনে নি।

"এই রকমই একটা টাইম্‌পিস্ ছিল আমার বাবার কাছারি-ঘরে। বর্ষাকাল, বাবা তাঁর ঘরে বসে বসে কি সব হিজিবিজি হিসাব কর্ছেন, এমন সময়ে একটা লোক সেই ঘরে ঢুকে তাঁকে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। বাবা মুখ তুলে বল্লেন, 'কিরে পরাণ, এলি কখন?'

'আজ্ঞে এই আস্‌ছি।' পরাণ বাবার প্রজা, কি একটা কাজে সহরে এসেছে—দিন দুই থাক্‌বে।

আমাদের বাড়ীতে এক পণ্ডিত মশাই থাকতেন, কাজ ছিল আমাদের পড়ান। তাঁর একটা দোষ ছিল এই যে ঘুম থেকে কিছুতেই সাতটার আগে উঠ্তে পার্তেন না। পরদিন কি একটা কাজে তাঁকে কল্কাতায় যেতে হবে; অবশ্য বাবার কাজে। ভদ্রলোকের বড়ই ভাবনা হল, কি করে সকালের গাড়ী ধরবেন। শেষে অবশ্য সমস্যার আমিই সমাধান করে দিলাম, বল্লাম, 'বাবার ঘড়িটাতে এলার্ম্ দিয়ে রাখুন, সকালবেলা ঠিক ঘুম ভেঙ্গে যাবে।' পণ্ডিত মশাই ছাত্রের বুদ্ধি দেখে খুবই খুসী হয়ে গেলেন।

পণ্ডিত মশাই যে ঘরে শুতেন সেটা খুব বড় ঘর; পরাণের শোবার ব্যবস্থাও সেই ঘরেই হ'ল। রাত অনেক হয়েছে, যে যার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। পণ্ডিত মশাই বাবার ঘড়িটা কাছারি-ঘর থেকে এনে তাঁর ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

সকলেই ঘুমে অচেতন, শুধু ঘুম নেই পরাণের চোখে। মাথার কাছে ওটা যে কি পোকা টিক্টিক্ করে ডাক্ছে তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। কি পোকা ওটা? আর কি বেয়াড়া স্বভাব দেখছ, এক মুহূর্ত্তের জন্যও থামে না! ফস্ করে একবার দেশলাই জেলে পরাণ একটু ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা কর্‌ল—নাঃ, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না! এ রকম পোকা সে জন্মে দেখে নি। ভেবে ভেবে শেষটায় সে ঠিক কর্‌ল, ওটা নিশ্চয়ই পাহাড়ী মাকড়সার ছানা। সে শুনেছিল (দেখে নি) যে পাহাড়ী মকড়সা খুব বড় বড় দেখ্তে হয়, আর যাকে কামড়ায় সে বাঁচে না। এটা তো দেখ্তে অনেকটা মাকড়সারই মত, তবে খুব বড় নয়, বোধ হয় ছানাই হবে। ভয়ে পরাণের সারা গা ঘেমে উঠ্‌ল। কাছেই দরওয়ান রাম সিং সমুদ্রত্ব লাভের চেষ্টা করছিল, মানে নাসিকার গর্জ্জনে। পরাণ বার কয়েক তাকে জাগাবার বৃথা চেষ্টা করে শেষটায় লাঠিটা শক্ত করে ধরে শুয়ে রইল—কি কুক্ষণেই সে এ বাড়ীতে ঢুকেছিল!

সমস্ত রাত পরাণের ঘুম হ'ল না। ক্রমে ভোর হয়ে এল—হঠাৎ পণ্ডিত মশাইয়ের এলার্ম্ বেজে উঠ্‌ল। অম্‌নি পরাণ একেবারে পাগলের মত ঘড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কি লাঠির বাড়ি! মারছে তো মেরেই চলেছে। কাচ ভেঙ্গে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল, তবু পরাণের লাঠি থামে না! আর সঙ্গে সঙ্গে তার সে কি চীৎকার! রাম সিং বোধ হয় চোর-টোর মনে করেছিল, তাই এতক্ষণ সে ভেতরে ঢুক্‌তে সাহস করে নি, বাইরে থেকেই হম্বিতম্বি কর্‌ছিল; যেই শুন্‌ল চোর নয়, পোকা, অমনি বীরদর্পে সে লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে এল।

গণ্ডগোলে বাড়ীর সবাই উঠে পড়েছিল; বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বল্‌লেন, 'কি পরাণ, ব্যাপার কি, ঘড়িটাকে পিট্‌ছ কেন?' সে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্ল, 'উঃ, পাহাড়ী মাকড়সার ছানা! তবে দিয়েছি শেষ করে!'

ঠাকুরদা' ঠিক চিকিৎসাই করেছিলেন, বাস্তবিকই এ গল্প শুনে আমাদের পেটের ব্যথা একদম্ ভুলে গেছ্‌লাম।

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

[উত্তর শেষ পৃষ্ঠায় দেখ]

(১) বিখ্যাত খেলোয়াড় পেরি এই খেলাগুলোর মধ্যে কোন্‌টায় বিশেষজ্ঞ—ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, বেস্ বল, বুল্ ফাইটিং, টেনিস্, ব্যাড্‌মিণ্টন্?

(২) ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীবিখ্যাত কোন্ ঘটনা ঘটেছিল?

(৩) নিম্নলিখিত বইগুলির কোন্‌টা কার লেখা? (ক) হাসিখুসি, (খ) শিশু, (গ) কথামালা, (ঘ) সীতারাম, (ঙ) Robinson Crusoe (চ) Les Miserables

---

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

সংশয়

(শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়)

ফোটে ফুল, ভাবে অলি আমার লাগিয়া,
ভাবে পাখী মম কলতানে;—

আলো কয়, জাগরণ আমারে পাইয়া,
কেহ নাহি জানে কি কারণে।

কিশোর

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ)

আমরা কিশোর দল,
যুগে যুগে বাজাই বাঁশী, মাতাই জলস্থল।
কিশোর রামের সাথেতে ভাই কিশোর রামানুজ,
কোন সে যুগে কর্‌ল রে বধ তাড়কা দনুজ।
কিশোর লব ও কুশের কাছে রাবণ-জয়ী বীর,
বরণ করে পরাজয়ের কালিমা গভীর।

চিরকিশোর কোন্ সে যুগে বাজায় মোহন বেণু,
উতল করে বৃন্দাবনের আকাশ, বাতাস, ধেনু।
কিশোর নিষাদ একাগ্রতায় শিথ্‌ল ধনুক-বাণ,
গুরুর পায়ে হাস্যমুখে আঙ্গুল ক'রে দান।

আমরা সবাই ভারত-মায়ের কিশোর ছেলের দল,
বুকে মোদের অসীম সাহস, দেহে অসীম বল।
ভবিষ্যতের কতই স্বপন উঠছে মনে জাগি,
মানুষ হব—ভারত মা, তোর আশীষধারা মাগি'।

চিঠিপত্র

"চৈত্র মাসের রামধনুতে "বাঙ্গালী বীর কেদার রায়" প্রবন্ধে ঢোলসমুদ্র ও কেশার মা'র দীঘির কথা আছে। সেগুলি কি এখনও আছে ?"
—মাষ্টার জগন্নাথ বিশ্বাস

(উঃ—আছে; বিক্রমপুরে, যদিও একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। —প্র. লে.)

রামধনুতে প্রতি মাসে প্রত্যেকটি বিভাগ থাকে না বলে শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় অনুযোগ

করেছেন এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়াতে বলেছেন। আমরা আস্তে আস্তে রামধনুতে আরও কয়েকটি বিভাগ খুলতে চাই। কাজেই প্রতি মাসে প্রত্যেকটি বিভাগ না দিয়ে সেগুলি মাঝে মাঝে অদল-বদল করে দেওয়াই বোধ হয় সমীচীন হবে, নচেৎ গল্প-প্রবন্ধের সংখ্যা কমাতে হয়—অধিকাংশ গ্রাহকই সেটা পছন্দ করবেন না। অবশ্য আমরা পৃষ্ঠা-সংখ্যা কয়েকটা বাড়িয়েছি—এবং প্রয়োজন হলেই মাঝে মাঝে আরও বাড়িয়ে থাকি। তবে খুব বেশী পাতা বাড়াতে হ'লে পত্রিকার দামও কিছু বাড়াতে হয়—সেটাও আবার অধিকাংশ গ্রাহক পছন্দ করবেন না। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন কাগজের কর্ত্তৃপক্ষ এই মূল্যে আরও বেশী পৃষ্ঠার পত্রিকা বের করেছিলেন স্বীকার করি,—কিন্তু সে ভাবে চালিয়ে এ পর্য্যন্ত তাদের কোনটিই বেশী দিন স্থায়ী হতে পেরেছে কিনা তা গ্রাহকেরাই বলবেন। —ম্যাঃ সঃ

সন্দেশ

কলিকাতায় এ বছরকার হকি লীগ্ শেষ হইল। গত বারের মত এবারেও কাষ্টমস্ দল লীগ্ বিজয়ী হইয়াছে। লীগে দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছে রেঞ্জার্স, তৃতীয় স্থান পুলিশ ও চতুর্থ স্থান পাইয়াছে জেভেরিয়ান্‌স্। এবারকার খেলা খুব প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন্ দল চ্যাম্পিয়ন্ হইবে তাহা বুঝা যায় নাই। উপরের ৪টি দলই সমান পয়েণ্ট (১৭) পাইয়াছে। বি, জি, প্রেস, পোর্ট কমিশনার ১৬, এবং মোহনবাগান ও মিলিটারী মেডিক্যাল্‌স্ ১৪ পয়েণ্ট পাইয়াছে। ডালহৌসী এবার সব চেয়ে কম পয়েণ্ট (৪) পাইয়া দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া গেল। এবার বেইটন্ কাপের প্রতিযোগিতা। পৃথিবীবিখ্যাত খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ ও রূপসিং এবারেও ঝান্সি হইতে এ প্রতিযোগিতায় খেলিতে আসিবেন।

*   *   *

হকি খেলা প্রথম আবিষ্কার হয় পারস্য দেশে। প্রাচীন রোম, আথেন্স প্রভৃতি জায়গায়ও হকি খেলার চলন ছিল। তবে তখনকার খেলার নিয়ম-কানুনের সঙ্গে আজকালকার হকি খেলার নিয়ম-কানুনের অনেক তফাৎ, এই যা!

*   *   *

আমাদের ভারতবর্ষের আয়তন ১,৭০০,০০০ বর্গ মাইল। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্ এর মত ২৫টি দেশ একত্র করিলে তবে উহার সমান হইবে।

*   *   *

সুন্দরবনের আয়তন ৭৫৩২ বর্গ মাইল। এর কোন কোন অংশ লম্বায় ১৬৫ মাইল।

*   *   *

পঞ্জিকায় তোমরা 'সংবৎ' কথাটি দেখিতে পাও। এখন অব্দ, সন বা সাল বলিলে যেমন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বছর বুঝায় আগেকার দিনে তেমনি সংবৎ বা সংবৎসর বলিলেও সেই রকম এক-একটা বিভিন্ন বছর বুঝাইত। সাধারণতঃ সংবৎ বলিলে লোকে বিক্রম-সংবৎ

অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের প্রচলিত সংবৎ ধরে, কিন্তু আগে আরও নানা রকম সংবৎ ছিল। এখানে তার কয়েকটির নাম দিলাম—

সপ্তর্ষি কাল—	খৃষ্টপূর্ব্ব	৬৭৭৭ (?)	হইতে আরম্ভ
বার্হস্পত্য কাল	,,	৩১২৮ (?)	,,
বৌদ্ধ সংবৎ	,,	৫৪৩	,,
বীর বা মহাবীর সংবৎ		৫২৭	,,
মৌর্য্যাব্দ	,,	৩৭২	,,
শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ	৭৮	,,
গুপ্ত সংবৎ	,,	৩১৯	,,
শ্রীহর্ষ সংবৎ	,,	৬০৭	,,
চৈতন্যাব্দ	খৃষ্টাব্দ	১৪৮৬	হইতে আরম্ভ

বাংলা সন সুলতান হোসেন শাহের সময় হইতে প্রচলিত হয়।

* * *

কয়েকটি বড় বড় সাধারণতন্ত্রের বর্ত্তমান সভাপতিদের নাম নীচে দেওয়া গেল :—

অষ্ট্রিয়ায়—মিকলাস্, জার্ম্মেনীতে—হিট্‌লার, ফ্রান্সে—লেব্রুঁ, তুরস্কে—কামাল আতাতুর্ক, পোল্যাণ্ডে—মসিকি (Moscicki), স্পেনে—সিনর আজানা, চীনে—লিনসিন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে—রুজভেল্ট্।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

জ্ঞানের সন্ধান (২য় সং)—সাধারণ জ্ঞানের বই। প্রকাশক এইচ্, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড্ কোং ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ॥০

আজগুবি—ছোটদের কবিতার বই। শ্রীইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক হৃষীকেশ সাহিত্যমন্দির। মূল্য ॥০

স্বপ্ন না সত্য—ছোটদের গল্পের বই। শ্রীবিমল সেন প্রণীত। প্রকাশক গল্পদাদা-স্মৃতিমন্দির। মূল্য ।৶০

স্বপ্নাদ্য মাদুলী—ছোটদের মজার নাটক। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক সাহিত্যভবন প্রেস, ২১, হলওয়েল লেন। মূল্য ।০

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) শূকর (২) করকা (৩) করলা (৪) করবাল (৫) আকর (৬) চাকর (৭) নিকর (৮) তস্কর (৯) করদ (১০) নিষ্কর (১১) মকর (১২) করভ

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

মনোতোষ রায় (ভবানীপুর); সমরেন্দ্রকুমার সেন (খড়্গপুর); কল্যাণকুমার ও অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (পুরুলিয়া); শঙ্কর, ভাস্কর, ফুল মাসিমা (ভবানীপুর); কুমার অমল রায়, জয়দেব, মঞ্জু প্রভৃতি (সাভার—ঢাকা); সিতেন্দু, দীপ্তিকেন্দু, উষা প্রভৃতি (পাটনা); তুলু, বিজু, অঞ্জলি চৌধুরী প্রভৃতি (কলিকাতা); তরুণ, অরুণ, বেবী (পাতিহাল); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমসেদপুর); ব্রজগোপাল গোস্বামী, রাখাল, অনিল (বাণীগ্রাম); অশোক, গীতু, দীপু (কুমিল্লা); এ, কে, বাইন ও উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল (চণ্ডীপুর); সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য (ভাঙ্গা); রেবতী, মা, সুশীল বিশ্বাস (কুমিল্লা); অনিল, প্রীতি ও অরুণ (রাজসাহী); মায়া পাল, সুকুমার পাল (উল্লাপাড়া); জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); প্রফুল্ল, বিশ্বনারায়ণ, শিশির প্রভৃতি (যোগদাশ্রম-রাঁচি); অরুণা সেন (কলিকাতা); নারায়ণচন্দ্র গুহ, পরিতোষ, মধু (রেঙ্গুন); সুনীলকান্তি সেন, পল্টুদা, মন্টুদা (চাঁদপুর); যুথিকা চন্দ্র, বাবা, মা প্রভৃতি (পাটনা); শশাঙ্কভূষণ ও ফণীন্দ্রভূষণ দত্ত (ধলা); প্রমোদ, পরেশ, রমেশ প্রভৃতি (কালীকচ্ছ); মঞ্জুভূষণ, দীপ্তিভূষণ, শিবানী দত্ত (বালুরঘাট); রেখা, মাষ্টার সতু, অতুল সিংহ (রাজসাহী); মায়া, ধীরা, লক্ষ্মী দেবী (ফয়জাবাদ); ননীগোপাল ও মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (আলিপুর দুয়ার); রামেন্দু দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); শচীন, বংশী, সন্তোষ ঘোষ (ভাগলপুর); ধীরেন লাহিড়ী ও রুবী চাটার্জ্জি (ভাগলপুর); প্রফুল্ল হাজরা, অজিত হাজরা প্রভৃতি (মিনজান); প্রসিত ও প্রদ্যোতকুমার বাগছী (বালুভরা); প্রভাসরঞ্জন ব্যানার্জ্জি (বাঁকুড়া); মাষ্টার জগন্নাথ, কালু, বুধু প্রভৃতি (আলিপুর দুয়ার); গীতা চক্রবর্ত্তী (বারাকপুর); দেবপ্রসাদ পাল (চট্টগ্রাম); ভবরূপ ভট্টাচার্য্য (মাণিকপুর); হরিহর মজুমদার (ধুবড়ী); শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ি); সত্যানন্দ প্রামাণিক ও দাদা (চক্রধরপুর)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

বিমলেন্দুনারায়ণ বিশ্বাস, মা, সতী প্রভৃতি (ভবানীপুর); তাহিরপুর রাজ এম্.ই স্কুলের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (তাহিরপুর); শরৎচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, কল্পনা (বালীগঞ্জ); ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়া); রমেন্দ্রনাথ রক্ষিত (রাজসাহী); সুধীরচন্দ্র, রাসবিহারী, পুলিনবিহারী প্রভৃতি (মেলেকোলা); নরেশচন্দ্র গুহবক্সী, নৃপেন্দ্র, গিরিজা

প্রভৃতি (বাথুজানি) ; প্রসূন রায় (নলান্দা) ; তপন ও সবিতা (রেঙ্গুন) ; রামপ্রসাদ সিং কাইতু, কার্ত্তিক প্রভৃতি (বেহালা) ; পাঁচুগোপাল ঘোষ (নওপাড়া) ; অচলকুমার দত্ত (ভবানীপুর) ; দেবব্রত, সুব্রত, সত্যব্রত সেন (গোয়ালপাড়া) ; প্রতিমা দেবী, শাখী, বাদল প্রভৃতি (কিশোরগঞ্জ) ; মৃণালকান্তি গুহ, বিমলকান্তি গুহ (বৈটপুর) ; করুণা, খাঁতুদা, রেণু (ইকড়া) ; দীনেন, মা, ছোটদি (নলহাটী) ; নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী) ; আশা ও সেজ (ধুবড়ী) ; রণেন্দ্র, সমীন্দ্র, ভোলাদা (ধুবড়ী) ; শান্তি, বিলু, মীরা (বারুইপুর) ; রমাপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা) ; সান্ত্বনা ঘোষ ও সাধনা ঘোষ (যশোহর) ।

নূতন প্রাঁধা

রামের কথা

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

[প্রতি ছত্রে প্রথম ফাঁকটি যে দুইটি অক্ষরে পূরাইবে, তাহাকে উল্টাইয়া দ্বিতীয় ফাঁকটি পূরাইতে হইবে ।]

ব—— যা' বড় ——, ঠিকই বটে ; রামা
চ—— এক বড় গাছে —— জুতা-জামা ।
আমি বল্‌লাম, —— কথা জল্‌দি —— আয়,
পড়ে' —— —— যাবে গায়েতে বেজায় ।
ধরেছে এক পাখীর —— কিছুতে ——ড়ে,
ওরে —— —— যাবি এ বনে-বাদাড়ে ।
ধা——কে ঠোক্‌রাতেই নাম্‌ল তাড়া——,
শেষে —— —— সুরে কাঁদে এসে বাড়ী ।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(১) টেনিস্ (২) ওয়াটার্লুর যুদ্ধ—যা'তে নেপোলিয়ন্ পরাজিত হয়েছিলেন (৩) যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, Daniel Defoe, Victor Hugo ।

লক্ষ্মী মেয়ে

১০ম বর্ষ { জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ } ৫ম সংখ্যা

পরোপকার

(শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু)

মাষ্টার মশায় দিলেন ব'লে—
"প্রতিদিনই ভোর থেকেই
একটু পরোপকার-চেষ্টা
করবে তোমরা প্রত্যেকেই !"

যায় কিছুদিন, এক শনিবার
প্রশ্ন করলেন রামাকে,
"কি উপকার করেছ কার,
বলতে হবে আমাকে।"

রামা বল্‌লে, "ঘোষজা মশায়
পারেন না ত' চল্‌তে স্যার,
ভীষণ মোটা, ক'টায় গাড়ী
আমায় বল্‌লেন বল্‌তে স্যার!

আমি দেখলুম, দশটি মিনিট
আছে মোটে আপ্‌ ট্রেনের,
পৌঁছে দিতে,—খুলে দিলুম
নেলীর গলার ব্যাণ্ড চেনের।

লেলিয়ে দিলুম পিছনে তাঁর,
ঘোষজা ছোটেন তীরবেগে,
ছোটাতে তাঁর রাস্তা-ঘাটে
গেল ভীষণ ভিড় লেগে।

খুল্‌ল কাছা, ছিঁড়ল চটি,
ছুট্‌লেন নতুন ফ্যাশনেই,
দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু
পৌঁছে গেলেন ষ্টেশনেই!

বলুন ত' স্যার পরোপকার
কোপটি কেমন ঝোপ বুঝে?"
মাষ্টার মশায় অনুধাবন
করেন ব্যাপার চোখ বুজে।

ঘোড়ায় চড়ার ব্যায়াম!

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

আর কিছু না, একটু মোটা হতে সুরু করেছিলাম, অম্‌নি মামা আমার ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন। বল্লেন—"সর্ব্বনাশ! তোর খুড়্‌তুত দাদামশাই মোটা হয়েই মারা পড়্‌ল যে! তুইও আবার মোটা হচ্ছিস্‌! তোর জ্যেঠ্‌তুত দাদামশাই—কি সর্ব্বনাশ!"

কথাটা শেষ কর্‌বার দরকার হয় না। আমার মাতুলের খুড়ো আর জ্যেঠা স্থূলকায়তার সর্ব্বনাশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত! নামের উল্লেখেই আমরা বুঝ্‌তে পেরে যাই।

খুড়্‌তুত দাদামশায়ের বুকে এত চর্ব্বি জমেছিল যে হঠাৎ হার্ট্‌ফেল্‌ হয়েই তাঁকে মারা যেতে হ'ল, ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন হয় নি। জ্যেঠ্‌তুত দাদামশায়ের বেলা অবশ্য ডাক্তার ডাকার সুযোগ পাওয়া গেছ্‌ল, কিন্তু ডাক্তার ইন্‌জেকসন্‌ কর্‌তে এসে মাংসের স্তর ভেদ ক'রে

শিরা খুঁজে না পেয়ে, গোটা চারেক সিরিঞ্জ্‌ ভেঙে এবং গোটা তিনেক ছুঁচ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গচ্ছিত রেখে, রাগে-ক্ষোভে-হতাশায় ভিজিট্‌ না নিয়েই বেগে প্রস্থান করেছিলেন।

যে-বংশের দাদামশায়দের এরূপ মর্ম্মভেদী ইতিহাস, সে-বংশের নাতিদের মোটা হওয়ার মত ভয়াবহ আর কি হতে পারে? কাজেই বড় মামা বিচলিত হয়ে পড়েন।

প্রতিবাদের সুরে বলি—"কি করব! আমি কি ইচ্ছে ক'রে হচ্ছি?"

"উঁহুঁ, আর কোন অসুখে ভয় খাই না। কিন্তু মোটা হওয়া—বাপ্‌স্‌! অমন মারাত্মক ব্যাধি আর নেই! সব ব্যায়রামে পার আছে, চিকিচ্ছে চলে; কিন্তু ও-রোগের চিকিচ্ছেই নেই। ডাক্তার কব্‌রেজ্‌ হার মেনে যায়। হুঁ।"

অগত্যা আমাকে চেঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, রোগা হবার জন্য। গৌহাটিতে বড় মামার জানা একজন ভালো ডাক্তার থাকেন; সেখানেই যাই। তিনিই আমাকে রোগা করার ভার নেন।

প্রথমেই তাঁর প্রশ্ন হয়—"ব্যায়াম-টায়াম কর?"

"আজ্ঞে দু বেলা হাঁটি। দু মাইল্‌, দেড় মাইল্‌, আধ্‌মাইল্‌ পর্য্যন্ত—যেদিন যতটা পারি। রাস্তায় বেরুলেই হাঁট্‌তে হয়।"

"হ্যাঃ! হাঁটা আবার একটা ব্যায়াম! ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আছে?"

"না তো!" সসঙ্কোচে বলি।

"ঘোড়ায় চড়াই হ'ল গিয়ে ব্যায়াম। পুরুষ মানুষের ব্যায়াম। ব্যায়ামের মত ব্যায়াম! একটা ঘোড়া কিনে ফেলে চড়্‌তে শেখো—দুদিনে শুকিয়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়্‌বে।"

ডাক্তারের কথা শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়। গোরু থেকে ঘোড়ার পার্থক্য সহজেই আমি বুঝ্‌তে পার্‌তাম, যদিও রচনা লিখ্‌তে বসে আমার পক্ষে সে পার্থক্য বজায় রাখা খুব সহজ ছিল না। আমার 'এসে'তে ঘোড়া-গরু এক হয়ে এসে মিলে যেত, সেই একতার মধ্যে থেকে ওদের আলাদা করা ইস্কুলের পণ্ডিতের পক্ষে কষ্টকর ছিল। চতুষ্পদের দিক্‌ থেকে উভয়ে প্রায় এক জাতীয় হলেও, বিপদের দিক্‌ থেকে বিবেচনা করলে ঘোড়ার স্থানই কিছু উঁচুতে হবে হয় তো।

যাই হোক, গৌ-হাটির ডাক্তার হলেও, গোরুকে বাতিল ক'রে ঘোড়াকেই তিনি প্রথম আসন দিতে চাইলেন; অবশ্য আমার নীচেই। আমিও, ঘোড়ার উপরেই চড়্‌ব, এই স্থির-সংকল্প ক'রে ফেল্‌লাম। বাস্তবিক, ঘোড়ায় চড়া—সে কী দৃশ্য! সার্কাসে তো দেখেইছি, রাস্তাতেও মাঝে মাঝে চোখে প'ড়ে যায়।

আম্বালায় থাকৃতে ছোট বেলায় দেখেছি পাঞ্জাবীদের ঘোড়ায় চড়া। এখনও মনে পড়ে,

সেই পাগ্‌ড়ী উড়্‌ছে, পাবুপেণ্ডিকুলার থেকে ঈষৎ সাম্‌নে ঝুঁকে সওয়ারের কেমন সহজ আর 'খাতির-নাদারৎ' ভাব—দাড়িও উড়ছে সেই সঙ্গে! যেন তুনিয়ার কোন কিচ্ছুর ওপর কেয়ার্ মাত্রই নেই! সমস্ত পথিককে শশব্যস্ত ক'রে সহরের বুকের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে যাওয়া! পরমুহূর্ত্তে তুমি দেখ্‌বে কেবল ধুলোর ঝড়, আর কিছু দেখ্‌তে পাবে না।

হ্যাঁ, ঘোড়ায় আমায় চড়্‌তে হবেই। ঠিক তেম্‌নি করেই। তা না হলে বেঁচে থেকে লাভ নেই, মোটা হয়ে তো নেই-ই।

আশ্চর্য্য যোগাযোগ! ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনের পর বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি, দেখি, সদর রাস্তায় নীলামে ডেকে ঘোড়া বিক্রী হচ্ছে। বেশ নাতুস্-নুতুস্ কালোকোলো একটি ঘোড়া—পছন্দ ক'রে সহচর করববার মতই।

"বাইশ টাকা! বাইশ টাকায় যাচ্ছে—এক, তুই—"

"তেইশ!" রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে আমি হাঁকি।

"চব্বিশ টাকা আট আনা!" ভীড়ের ভেতর থেকে একজন যেন আমার কথারই জবাব দেয়।

"চব্বিশ টাকা আট আনা!" নীলামওয়ালা ডাকৃতে থাকে, "ঘোড়া, জিন্, লাগাম, মায় চাবুক্—সব সমেত মাত্র সাড়ে চব্বিশে যাচ্ছে! গেল—গেল—এক তুই—"

বলে ফেলি একেবারে—"সাতাশ!"

"আটাশ!" ভীড়ের ভেতর থেকে আবার কোন্ হতভাগার বাধা।

আমার পাশের একজন লোক আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়—"আমি ঘোড়া চিনি!" সে বলে, "অদ্ভুত ঘোড়া মশাই! এত সস্তায় যাচ্ছে, আশ্চর্য্য! ওর জিনের দামই আটাশ টাকা!"

"বলেন কি!" আমার চোখ বড় হয়ে ওঠে, "তা হলে আরো উঠ্‌তে পারি?"

"নিশ্চয়! ভাব্‌ছেন বুঝি দিশী ঘোড়া? মোটেই তা নয়, আসল ভুটানী টাট্টু!"

ভুটানী টাট্টু বল্‌তে কি বোঝায় তার কোন পরিচয়ই আমার জানা ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গীতে এটা বেশ বুঝ্‌তে পারলাম যে এ হেন একটা জানোয়ারের মালিক না হতে পারলে জীবনই বৃথা।

অকুতোভয়ে হাঁক দিই—"তেত্রিশ!"

"চৌৎ—" আমার পাশের এক ব্যক্তি ডাকার উদ্যম করে। উৎসাহের সূত্রপাতেই ওকে আমি দমিয়ে দিই—"সাঁইত্রিশ!" তার পর আমি হন্তে হয়ে উঠি—"উনচল্লিশ, তেতাল্লিশ, সাতচল্লিশ, উনপঞ্চাশ!"

পর পর এতগুলো ডাক আমি একাই ডেকে যাই। উনপঞ্চাশে গিয়ে ক্ষান্ত হই।

"উনপঞ্চাশ—উনপঞ্চাশ! এমন খাসা ঘোড়া উনপঞ্চাশে যায়! গেল—চলে গেল! এক—তুই—"

তার পর আর কেউ ডাকে না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিরস্ত হয়ে পড়েছে তখন।

"—এক, তুই, তিন!"

নগদ উনপঞ্চাশ টাকা গুণে দিয়ে ঘোড়া দখল ক'রে পুলকিত চিত্তে বাড়ী ফিরি। সেই পার্শ্ববর্ত্তী অশ্ব-সমঝ্‌দার ভদ্রলোক আমার এক উপকার করেন। একটা ভাড়াটে আস্তাবলে ঘোড়া রাখার ব্যবস্থা ক'রে দেন। তারাই ঘোড়ার খোরপোষের, সেবা-শুশ্রূষার যাবতীয় ভার নেবে; সময়ে-অসময়ে এক চড়া ছাড়া আর কোন হাঙ্গামাই আমাকে পোহাতে হবে না। অবশ্য কিছু দক্ষিণা দিতে হবে ওদের।

ভদ্রলোককে সন্দেশের দোকানে নেমন্তন্ন ক'রে ফেলি তক্ষুণি তক্ষুণি।

পরের দিন প্রাতঃকালে আমার অশ্বারোহণের পালা। ভাড়াটে সহিসরা ঘোড়াটাকে নিয়ে আসে। জন কতক ধরেছে ওর মুখের দিকে আর জন কতক ওর লেজের দিকে। মুখের দিকের যারা, তারা লাগাম, ঘোড়ার কান, ঘাড়ের চুল অনেক কিছুর সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু লেজের দিকে লেজটাই একমাত্র সম্বল! ও ছাড়া আর ধর্ত্তব্য কিছু নেই। আমি বিস্মিতই হই কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করি না, পাছে আনাড়ি ভাবে। ঘোড়া আনার ঐ নিয়ম হয়তো, কে জানে!

সেই ডাক্তার ভদ্রলোক বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে সেই সময়ে যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে থামেন। "এই যে! একটা ঘোড়া বাগিয়েছ দেখ্‌ছি! বেশ বেশ। কিন্‌লে বুঝি? কতয়? উনপঞ্চাশে? বাঃ, সস্তাই তো! দিব্যি ঘোড়া! খাসা! বাঃ!"

ঘোড়ার পিঠ চাপ্‌ড়ে নিজের প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্‌কেই রেকমেণ্ড্ করেন—"হ্যাঁ, হাঁটা ছাড়। হাঁ-টা ছাড়। হাঁটা ব্যায়াম নাকি আবার! মানুষে হাঁটে? ঘোড়ায় চড়্‌তে শেখো। অমন ব্যায়াম আছে আর? তু'দিনে চেহারা ফিরে যাবে। এত কাহিল হয়ে পড়্‌বে যে তোমার মামারাই তোমাকে চিন্‌তে পারবেন না। হুঁম্।"

তাঁর রুগী দেখার তাগাদা, অপেক্ষা করার অবসর নেই। ঘাড় নেড়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েই তিনি চলে যান। দর্শকের মধ্যে তাঁকে গণনা না করেই আমার অভিনব ব্যায়াম-পর্ব্ব সুরু হয়।

সহিসরা বেশ ক'ষে তাকে ধ'রে থাকে, আমি আস্তে আস্তে তার পিঠের জিনের উপর উঠে বসি। বেশ যুত্ করেই বসি; শ্রীযুত হয়ে।

কিন্তু যেমনি না তাদের ছেড়ে দেওয়া, ঘোড়াটা চারটে পা একসঙ্গে জড় করে, পিঠটা দুম্‌ড়ে ব্যাখারীর মতো বেঁকিয়ে আনে। এবং হঠাৎ করে কি, পিঠটা একটু নামিয়েই না, ওপরের দিকে এক দারুণ ঝাড়া দেয়—ধনুকে টঙ্কার দেওয়া যেন! সেই এক ঝাড়াতেই আমি একবারে স্বর্গে—ঘোড়ার পিঠ ছাড়িয়ে প্রায় চার পাঁচ হাত উঁচুতে আকাশের বায়ুস্তরে বিরাজমান!

আমি একেবারে স্বর্গে…

শূন্যমার্গে চলাচল আমার মতো স্থূল জীবের পক্ষে সম্ভব নয় বেশীক্ষণ, সুতরাং আমাকে নাম্‌তে হয়, ঘোড়ার পিঠেই। এবং সেই মুহূর্তেই আবার যথাস্থানে আমি প্রেরিত হই, কিন্তু পুনরায় আমার অধঃপতন! এবার জিনের মাথায়। আবার আকস্মিক উন্নতি! এবার নেমে আসি ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর। আবার আমাকে উপরে ছুঁড়ে দেয়; এবার যেখানে নামি সেখানে ঘোড়ার চিহ্নমাত্রও নেই। অশ্ববর আমার আড়াই হাত পেছনে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন, আমাকে লুফে নেবার জন্যই কি না কে জানে!

ঘোড়ার মৎলব মনে মনেই আমি টের পাই, ধর্‌বার আগেই আমি শুয়ে পড়ি। জানোয়ারটা ততক্ষণে আমাকে ফেলে, উন্মুক্ত গৌহাটি-পথ দিয়ে টেলিগ্রামের মত ছুটে চলেছে।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি, ঘোড়ায় চড়ার বিলাসিতা পোষাল না আমার! একটা হাত কপালে রাখি, আর একটা তলপেটে। মানুষের হাতের সংখ্যা যে প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, এ কথা এর আগে এমন ক'রে আমার ধারণাই হয় নি কখনও।

কারণ তখনও আরো কয়েকটা হাতের বিলক্ষণ অভাব অনুভব করি! ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে, পাঁজ্‌রায় এবং শরীরের আরো নানা স্থানে হাত বুলাবার দরকার বোধ করছিলাম।

কেবল যে বেহাতই হয়েছি তাই নয়, বিপদ্‌ আরো;—উঠ্‌তে গিয়েই সেটা টের পাই। দাঁড়াবার এবং দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে দুটো পাও মোটেই যথেষ্ট নয় তখন বুঝি। সহিসরা ধরে বেঁধে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়, কিন্তু যেম্‌নি না ছাড়ে অম্‌নি আমি সটান্‌! তখন সবাই মিলে, সহানুভূতিপরবশ হয়ে ধরাধরি ক'রে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেয়। বলা বাহুল্য, এ-ব্যাপারেও আমার নিজের হাত-পা নিজের কোনই কাজে লাগে না, এক ওদের হ্যাণ্ডেল্‌ হওয়া ছাড়া।

তার পর প্রায় একমাস আমি শয্যাগত। সবাই বলে ডাক্তার দেখাতে, কিন্তু ডাক্তার ডাকার সাহস হয় না আমার। আমার মামার বন্ধু—তিনিই তো? এই অবস্থাতেই আবার ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা দিয়ে বস্‌বেন কিনা কে জানে! অশ্ব-চিকিৎসা ছাড়া আর কিছু তো জানা নেই তাঁর! সেই পলাতক ভুটানী টাট্টুকে যদি খুঁজে নাও আর পাওয়া যায়, একটা নেপালী গাঁট্টা যোগাড় ক'রে আন্‌তে কতক্ষণ? ডাক্তার—? নাঃ! মাতৃ-পুরুষ-ক্রমে ও আমাদের ধাতে সয় না।

বিছানা ছেড়ে যেদিন প্রথম বেরুতে পারলাম সেদিন হোটেলের বড় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চম্‌কে যেতে হয়। য়্যাঁ? এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি? দেখে নিজেকে চেনাই যায় না যে! মুখের দিকে তাকাতেই ইচ্ছা করে না,—বিকৃতবদনে বাইরে বেরিয়ে আসি।

রাস্তায় পা দিয়েই আস্তাবলের বড় সহিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ। "হুজুর, আপনার কাছে আমাদের কিছু পাওনা আছে।"

"পাওনা?" দ্বিতীয়বার আমাকে চম্‌কাতে হয়—"পাওনা কিসের?"

"আজ্ঞে, সেই ঘোড়ার দরুণ।"

"কেন, তার দাম তো চুকিয়ে দিয়েছি। উনপঞ্চাশ টাকা আর চাবুকের দরুণ ক'-আনা? হ্যাঁ, চাবুকের দামটা পাবে বটে তোমরা! তা, চাবুক তো আমার কাজে লাগে নি, ব্যবহারই করতে হয় নি আমার। ও ক' আনাও কি দিতেই হবে?"

"আজ্ঞে কেবল ক'-আনা নয় তো, বাহাত্তর টাকা সাড়ে বারো আনা মোট। এই দেখুন বিল্‌।"

"বাহাত্তর টাকা সাড়ে বারো আনা?" আমার চোখ কপালে ওঠে। "কেন, আমার অপরাধ?"

"আজ্ঞে, আপনার ঘোড়ায় খেয়েছে এই একমাসে। সাড়ে বাইশ টাকার ছোলা, সওয়া পাঁচ টাকার ঘাস—"

আমি বাধা দিয়ে বলি—"কেন, সে তো পালিয়ে গেছে!"

"আপনার ঘোড়া? মোটেই না। খাবার সময়েই ফিরে এসেছিল আর তার পর থেকে ঠিক রয়েছে।" এই বলে ছোট সহিসকে হুকুম দেয়—"নিয়ে আয় তো ভুটানী টাট্টুকে হুজুরের সামনে।"

বল্‌তে বল্‌তে সহিস্‌টা ঘোড়াকে এনে হাজির করে। ঘোড়াটা যে ভালোই খেয়েছে-দেয়েছে তাতে ভুল নেই, বেশ একটু মোটাসোটাই ব'লে আমার মনে হ'ল।

"আমরা তো তবু ওকে কম খেতে দিয়েছি, দিতে পারলে ওর ডবল, চারগুণ, আটগুণ খেতে পারত। কিন্তু সাহস ক'রে খাওয়াতে পারিনি আমরা, আপনি বেঁচে উঠ্‌বেন কিনা ঠিক ছিল না তো! এর আগে—" সহিসটা হঠাৎ থেমে যায়, আর কিছু বল্‌তে চায় না।

পরবর্ত্তী বাক্যটি প্রকাশ করার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করি। ছোট সহিসটা বলে ফেলে—"ওতে চেপে এর আগে আর কেউ বাঁচে নি।"

বড় সহিসটা বলে—"এই তো ঘাস আর ছোলাতেই গেল সওয়া পাঁচ আর সাড়ে বাইশ। একুনে সাতাশ টাকা বারো আনা। ভুট্টা খেয়েছে দশ টাকার। ভুটানী টাট্টু কিনা, ভুট্টা ছাড়া ওদের চলে না। এই গেল সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা—"

"বিল্ এনেছ, আমার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাও।" মনে মনে বলি।

এবার ছোট সহিসটা সুরু করে—"তার পর ঘোড়ার বাড়ীভাড়া বাবদে গেল দশ টাকা—"

"ঘোড়ার জন্যে একটা বাড়ী?" আমি অবাক্ হয়ে যাই।

"আজ্ঞে একটা গোটা বাড়ী কি দশ টাকায় পাওয়া যায় কখনও? আর গোটা বাড়ী নিয়ে একটা ঘোড়া করবেই বা কি? ওদের তো খাবার ঘর কি শোবার ঘর, বৈঠকখানা কি পায়খানা আলাদা আলাদা লাগে না। এক জায়গাতেই ওদের সব কাজ—কিন্তু হুজুর, ঐ জায়গাটুকুর ভাড়াই হচ্ছে দশ টাকা।"

আমার কথা বেরোয় না। সহিসটা স্বর মোলায়েম করে—"তার পর হুজুরের ঘোড়ার খিদ্‌মৎ খেটেছি, আমাদের মজুরি আছে। আমরাই কি পনর টাকা না আশা করি হুজুরের কাছে?"

হুজুরের অবস্থা তখন মজুরের চেয়েও কাহিল। তবু মনে মনে হিসাব ক'রে অঙ্ক খাড়া করি—"তা হ'লেও সব মিলিয়ে বাষট্টি টাকা বারো আনা হয়। আর দশ টাকা দু পয়সা কিসের?"

ছোট সহিসটা চট্‌পটে হয়—"আজ্ঞে ও দু' পয়সা আমাকে দেবেন। খৈনির জন্যে।"

"ঘোড়ায় খৈনি খায়? আশ্চর্য্য!"

"আজ্ঞে ঘোড়ায় খায় নি। আমিই খাবার জন্য ডল্‌ছিলাম। ঘোড়ার মুখের কাছেই। কিন্তু যেম্‌নি না ফট্‌ফটিয়েছি অম্‌নি হারামীটা হেঁচে দিয়েছে—সমস্ত খৈনিটাই আমার বর্‌বাদ্।"

তখনি পকেট থেকে পয়সা দুটো বের ক'রে ওকে দিয়ে দিই। যতটা পাৎলা হওয়া যায়! দেনা আর শত্রু কখনও বাড়াতে নেই।

বড় সহিস বলে—"আর বাকী দশ টাকার হিসাব? জানোয়ার এমন পাজী আর বল্‌ব কি হুজুর! একদিন কর্ত্তার পাকিটের মধ্যে নাক সেঁধিয়ে একখানা দশ টাকার নোট্ বেমালুম মেরে দিয়েছে। একদম হজম্!—"

"য়্যা, বল কি?" আমি বিচলিত হই—"একেবারে খেয়ে ফেল্‌ল নোট্‌খানা? দশ-দশটা টাকা?"

"একেবারে। আমরা আশা কর্‌লাম পরে বেরুবে। কিন্তু নাঃ, পরে অনেক আস্ত ছোলা পেলাম, সেগুলো ঘুগ্‌নিওলাদের দিয়েছি, কিন্তু নোট্? একেবারে গায়েব্। এ-টাকাটাও ঘোড়ার খোরাকীর মধ্যেই ধ'রে নেবেন হুজুর।"

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। এ রকম অবস্থায় একটা হাতই অপর্য্যাপ্ত, আর একটার সহযোগিতা না হলেও চলে।

সহিসটা আশ্বাস দেয়—"চাবুকের দামটা তো ধরা হয় নি হুজুর, যদি মর্‌জি করেন তা হ'লে ওটার কয় আনা জুড়ে পূরো তেহাত্তর টাকাই দিয়ে দিবেন। আর আমাদের দু'জনকে দুটো টাকা," বিনয়ের বাড়াবাড়িতে জড়ীভূত হয়ে পড়ে সে—"আপনাদের মতো আমীর লোকের কাছেই তো আমাদের বক্‌সিসের আশা হুজুর!"

প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে সহিস-বিদায় করি। মামার দেওয়া টাকার যা উপ-সংহার থাকে তার থেকে হোটেলের দেনা চুকিয়ে, হয়তো মালগাড়ীতেই বামাল হয়ে বাড়ী ফির্‌তে হবে। যাই হোক্, ঘোড়াকে আর আস্তাবলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দিই না। সাম্‌নেই একটা খুটোয় বেঁধে রাখ্‌তে বলি, রাস্তাই আমার ঘোড়ার আস্তাবল এখন থেকে। সেই উপকারী ভদ্রলোককে সহিসদের ডেকে দিতে বলি যিনি কেবল ঘোড়া চিনিয়েই নিরস্ত হন্ নি, আস্তাবলও দেখিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোককেই ঘোড়াটা উপহার দিয়ে তাঁর উপকারের ঋণ শোধ কর্‌ব।

অভিলাষ প্রকাশ করতেই বড় সহিসটা বলে—"ওঁকে আর কি দেবেন হুজুর! ওঁর ভগ্নীপতিরই তো ঘোড়া!"

আমার দম ফেল্‌তে দেরি হয়। সেই নীলামওলা ওর ভগ্নীপতি? সেই ধাক্কা সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতেই ছোটটা যোগ করে—"আর ওঁরই তো আস্তাবল!"

আমি আর কিছু বলি না, কেবল এই সংকল্প স্থির করি, যদি আমি গৌহাটিতে থাক্‌তুম

থাক্‌তেই সেই উপকারী ভদ্রলোকটি মারা যান্‌, তা হলে আমার যাবতীয় কাজকর্ম্ম—গল্পের বই পড়া, বায়স্কোপ্‌ দেখা এবং আর যা কিছু সব স্থগিত রেখে ওঁর শবযাত্রায় সাগ্রহে যোগ দেব। সব আমোদপ্রমোদ ফেলে প্রথমে ঐ কাজ!

সহিসরা চলে যায়। আমি ঘোড়ার দিকে তাকাই আর মাথা ঘামাই—কি গতি কর্‌ব ওর? কিংবা ওই আমার কি গতি করে? এমন সময়ে সেই ডাক্তারের আবির্ভাব হয় সেই পথে। আমাকে দেখে এক গাল হাসি নিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন—"এই যে! বেশ জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে এসেছ। একমাসেই, দেখ্‌লে তো? তখনই বলেছিলাম! ঘোড়ায় চড়ার মত ব্যায়াম আছে আর? পায়ে হেঁটে কি এত হাল্‌কা হতে পারতে? আরও মুটিয়েই যেতে বরং! যাক্‌, খুসী হলাম তোমার চেহারা দেখে। বাড়ী ফিরে মামাকে ব'লো মোটা রকম ভিজিট্‌ পাঠিয়ে দিতে।"

"মামা কেন, আমিই দিয়ে যাচ্ছি।" আমি সবিনয়ে বলি, "যদি আপনি দয়া ক'রে নেন্‌, এই ঘোড়াটাই আপনার ভিজিট্‌।"

"খুসী হলাম, আরো খুসী হলাম!" ডাক্তার বাবু সত্যিই পুলকিত হয়ে ওঠেন, "তা হলে এবার থেকে আমার রুগী দেখার কাজও হবে, ব্যায়াম করাও হবে। বেশ বেশ! এখুনি আমার একটা কল্‌ আছে দু মাইল্‌ দূরে রুগী দেখার। ভালোই হ'ল।"

ডাক্তার বাবু লাফিয়ে চাপেন ঘোড়ার পিঠে; ওঠার কায়দা দেখেই বুঝ্‌তে পারি এক কালে ওই বদ্‌-অভ্যাস ওঁর দস্তরমতই ছিল। পর মুহূর্ত্তেই তাঁকে আর দেখ্‌তে পাই না। দেখ্‌তে পাই একেবারে বিকালে। হোটেলের সাম্‌নেই আস্তে আস্তে পায়চারি করছি, দেখি, তিনি মুহ্যমানের মত ফিরছেন। সটান হেঁটেই।

"আপনার ঘোড়া কি হ'ল?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি। আমার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃক্‌পাৎ করেন তিনি। "এই, হেঁটেই ফির্‌লাম! কতটুকুই আর পথ! দু মাইল্‌ তো! ঘোড়ায় চড়া ভালো ব্যায়াম বটে, কিন্তু বেশী ব্যায়াম কি ভালো? অতিরিক্ত ব্যায়ামে অপকারই করে। মাঝে মাঝে হাঁট্‌তেও হয়।"

তিনি আর দাঁড়ান না।

খানিক বাদে ডাক্তার বাবুর চাকর এসে বলে—"গিন্নীমা আপনার ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন।"

"কিন্তু ঘোড়া কই? ঘোড়াকে তোমার সঙ্গে দেখ্‌ছি না তো!"

ঘোড়া যে কোথায় তা চাকর জানে না, ডাক্তার বাবুও জানেন না, তবে তাঁর কাছ থেকে যা জানা গেছে তাই জেনেই কর্ত্তার অজ্ঞাতসারেই গিন্নী এই মোটা ভিজিট্‌ প্রত্যর্পণ কর্‌তে বিলম্ব করা সমীচীন মনে করছেন না। কর্ত্তৃ-বাচ্যের কাছ থেকে গিন্নী যা জেনেছেন তা আমি কর্ম্ম-বাচ্যের কাছ থেকে জান্‌বার চেষ্টা করি। যা পুনরুদ্ধার হয় সংক্ষেপে তা এই,—অশ্বপৃষ্ঠে যত সহজে ডাক্তার বাবু উঠ্‌তে পেরেছিলেন নামাটা তাঁর তত সহজসাধ্য হয় নি, যথাস্থানে তো নয়ই। দু মাইলের কথাই না, পাক্কা পনের মাইল গিয়ে ঘোড়াটা তাঁকে নামিয়ে দিয়েছে। নামিয়ে দিয়েছে বল্লেও ভুল বলা হয়, ভূমিসাৎ ক'রে পালিয়েছে। কোথায় গেছে বলা কঠিন, এতক্ষণে একশ' মাইল, দেড়শ' মাইল্‌, কি এক হাজার মাইল্‌ চলে যাওয়াও সম্ভব। কর্ত্তা বলেন একশ', গিন্নীর মতে দেড়শ'; এক হাজার হচ্ছে চাকরের ধারণার মধ্যে।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি, তৎক্ষণাৎ গাড়ী ধ'রে বাড়ী ফেরার জন্য। খাবার সময় প্রায় তো হয়ে এল, যে এক হাজার মাইল্‌ সে এক নিঃশ্বাসে গেছে ক্ষিদের ঝোঁকে তা পেরিয়ে আস্‌তে তার কতক্ষণ? আধ নিঃশ্বাসও লাগ্‌বে না হয়তো। ঘাড় থেকে ঘোড়া না নামিয়ে গৌহাটিতে বাস করা বিপজ্জনক।

* * *

পুনশ্চ: এই গল্পের হেডিং যদি কম্পোজিটারের নিজগুণে "ঘোড়ায় চড়ার ব্যারাম" ছাপা হয়ে যায় তা হ'লে সে-ভুল না শোধ্‌রাবার জন্যই সম্পাদক মশাইকে আমার অনুরোধ।

চকোলেটের জীবন-চরিত

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এস্‌-সি)

জীবন-চরিত লিখিতে বসিলে লোকে সাধারণতঃ মহাপুরুষদেরই জীবন-চরিত লেখে, কিন্তু 'চকোলেট্‌' মহাশয় তো আর কোন মহাপুরুষ-টুরুষ নন, মহাপুরুষ কেন, কোন পুরুষের মধ্যেই তাকে ফেলা চলে না,—নিতান্তই একটি নির্জীব পদার্থ। তবে আমি তার জীবন-চরিত লিখিতে বসিয়াছি কোন্‌ ভরসায়? ভরসা শুধু এইটুকু যে চকোলেট নিজে মহাপুরুষ না হইলেও আর সমস্ত পুরুষই চকোলেটকে ভারী খাতির করে—এমনই জনপ্রিয় সে। এই ধর আমি—উত্তম পুরুষ, চকোলেটের নামে এই বয়সেও একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। তুমি—অর্থাৎ মধ্যম পুরুষও চকোলেটের নামে আনন্দে নাচিতে থাক (অন্ততঃ যখন ঘরে আর কেউ থাকে না,

অস্বীকার করিলে বিশ্বাস করিব না) বাকী রহিল প্রথম পুরুষ অর্থাৎ আর সকলে। চকোলেটের স্বাদ পাইয়াছে অথচ তার ভক্ত হয় নাই এমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নাই, যদি থাকে তবে সে নিতান্তই দুর্ভাগা।

আচ্ছা, বল দেখি চকোলেটের আবিষ্কারক কে? পৃথিবীর বড় বড় আবিষ্কারকদের নামের হিসাব করিতে গেলে গোড়ার দিকেই করিতে হয় কলম্বসের নাম। কলম্বস্ কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন নিশ্চয়ই জান—হ্যাঁ, আমেরিকা; নির্ভুল উত্তর। কিন্তু তার চেয়েও তাঁর বড় আবিষ্কার কি তার তো কোন খোঁজ রাখ না! মাথা চুলকাইলে কি হইবে? জান না, জান না, জান না। ব্যস্। অথচ জানা তোমাদের খুবই উচিত ছিল, কারণ আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে এ আবিষ্কারটি কোন অংশেই খাটো নয়। হ্যাঁ, এবার তোমাদের আন্দাজ ঠিক হইয়াছে, আমেরিকার মত চকোলেট্ও ধরিতে গেলে কলম্বসেরই আবিষ্কার।

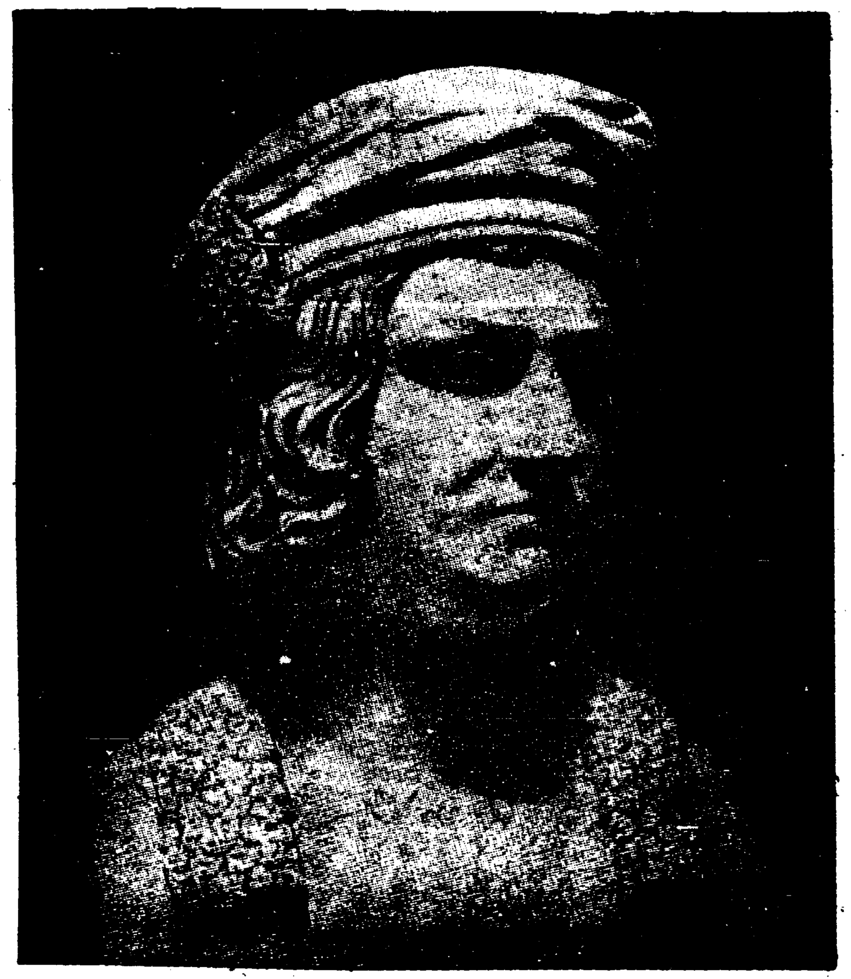

কলম্বস্
(ইনি শুধু আমেরিকাই আবিষ্কার করেন নাই, ধরিতে গেলে চকোলেটও ইঁহারই আবিষ্কার)

চকোলেট্ পাওয়া যায় কোকো-গাছ হইতে—আর এই কোকো-গাছ হইতেছে আমেরিকার জিনিষ। কোকো-গাছ জন্মাইতে হইলে দরকার গরম জায়গা, নরম, ভাল মাটী আর প্রচুর জলো আবহাওয়া; আমেরিকায় এই তিনটি জিনিষই আছে। সেখানকার আদিম বাসিন্দারা বহু দিন হইতেই কোকো-গাছের সঙ্গে পরিচিত ছিল। কোকো-গাছের সুঁটি হইতে চকোলেট্ পাওয়া যায়, তারা ঐ সুঁটি সংগ্রহ

করিয়া তার ভিতরকার মটর (বীজ) বাহির করিয়া লইত, তার পর সেগুলিকে রোদে শুকাইয়া আরাম করিয়া খাইত।

কলম্বস্ যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন তখন এই সব লোকদের সঙ্গেও তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের পরিচয় হইল, ইহাদের চালচলনও তাঁদের শিখিয়া লইতে বাকী রহিল না—এবং সেই সূত্রে কোকো-গাছের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় হইল। বলা বাহুল্য জিনিষটি তাঁদের ভারী ভাল লাগিয়া গেল। দেশে ফিরিবার সময়ে তাঁরা সঙ্গে করিয়া প্রচুর কোকোর সুঁটি লইয়া চলিলেন। ইয়োরোপের লোকেরা তখন পর্য্যন্ত চকোলেটের নাম শুনে নাই; কলম্বসেরই কল্যাণে স্পেনে প্রথম জিনিষটির চলন হইল। তার পর আস্তে আস্তে অন্যান্য দেশে ছড়াইতে লাগিল।

ইংরাজী ১৬৫৭ সনটা ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েদের কাছে নিশ্চয়ই একটা স্মরণীয় বছর। ঐ বছর ইংলণ্ডের "পাব্লিক্ এড্ভার্টাইজার" নামে একখানা খবরের কাগজে এই ধরণের একটা বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল—

"বিশপ্স্ গেট্ ষ্ট্রীটে এক ফরসী ভদ্রলোকের বাড়ীতে চকোলেট্ নামে এক রকম আশ্চর্য্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান্ পানীয় বিক্রী হইতেছে। যে কোন সময় আসিলেই তৈরী কিংবা বিনা তৈরী অবস্থায় আপনি জিনিষটি পাইতে পারেন। দাম তেমন বেশী নয়।"

ইহাই বোধ হয় ইংলণ্ডে চকোলেটের প্রথম আবির্ভাব। অমন সুন্দর জিনিষের আদর হইবেই। ইহার পরই দেখিতে দেখিতে গোটা ইয়োরোপে চকোলেট খাওয়ার ধূম পড়িয়া গেল। 'পেয়' হিসাবে কোকো আকারে, 'চর্ব্ব্য', 'চোষ্য' এবং 'লেহ্য' হিসাবে চকোলেট ষ্টিক, ক্যাণ্ডি, ক্যারামেল প্রভৃতি আকারে—নানা ভাবে চকোলেট্ তৈরী হইতে লাগিল; চকোলেটের ব্যবসা করিয়া অনেকে একেবারে 'লাল' হইয়া গেলেন। সে দেশের রাজা-মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত গরীবের ঘরের লোকেরাও জিনিষটির কদর করিতে ভুলিল না। ক্রমে সাহেবদের দৌলতে আমাদের দেশেও কোকো, চকোলেটের আমদানী হইল। অবশ্য দাম বেশী বলিয়া পাড়াগাঁয়ে এখনও জিনিষটির চল হয় নাই, কিন্তু সহরের একটু অবস্থাপন্ন ঘরেই কোকো-চকোলেটের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে।

এই তো গেল চকোলেটের ইতিহাস। এবার চকোলেট তৈরী সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলি। আগেই বলিয়াছি চকোলেট তৈরী হয় কোকো-গাছ হইতে, আর এই কোকো-গাছের জন্মভূমি হইতেছে আমেরিকা—ক্যানাডা, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশ। কিন্তু শুধু আমেরিকাতেই আজকাল কোকোর চাষ হয় না; আফ্রিকার নানা অঞ্চলে, সিংহলে, মালয়ে, জাভায়—অনেক জায়গায়ই কোকোর চাষ হয়। মটর গাছে যেমন সুঁটি হয় এই সব গাছেও তেমনি সুঁটি হয়—সুঁটিগুলি দেখিতে অনেকটা হরতকীর মত, তবে তার চেয়ে অনেক বড়। সুঁটিগুলি গাছের ডালে, এমন কি কাণ্ডেও খাড়া হইয়া থাকে। সুঁটি পাড়িবার মত হইলে সেগুলিকে আঁকশি দিয়া পাড়িয়া একত্র করা হয়। তার পরের কাজ হইতেছে সুঁটিগুলির খোলা ভাঙ্গা। সুঁটির ভিতর মটর (বীজ) থাকে, খোলা ভাঙ্গিয়া সেগুলিকে বাহির করা হয়, তার পর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রেতে করিয়া প্রখর রৌদ্রের মধ্যে শুকাইতে হয়। এ যাবৎ মটরগুলি তেলতেলে থাকে, আর স্বাদও থাকে তাদের তিত—বিস্বাদ। রোদে শুকাইলে সে ভাবটা দূর হয়। ঠিক মত শুকানো হইলে মটরগুলিকে বস্তাবন্দী করিয়া পাঠান হয় কারখানায়। বাগান বা ক্ষেতের কাজ ঐ যাত্রায় এখানেই শেষ।

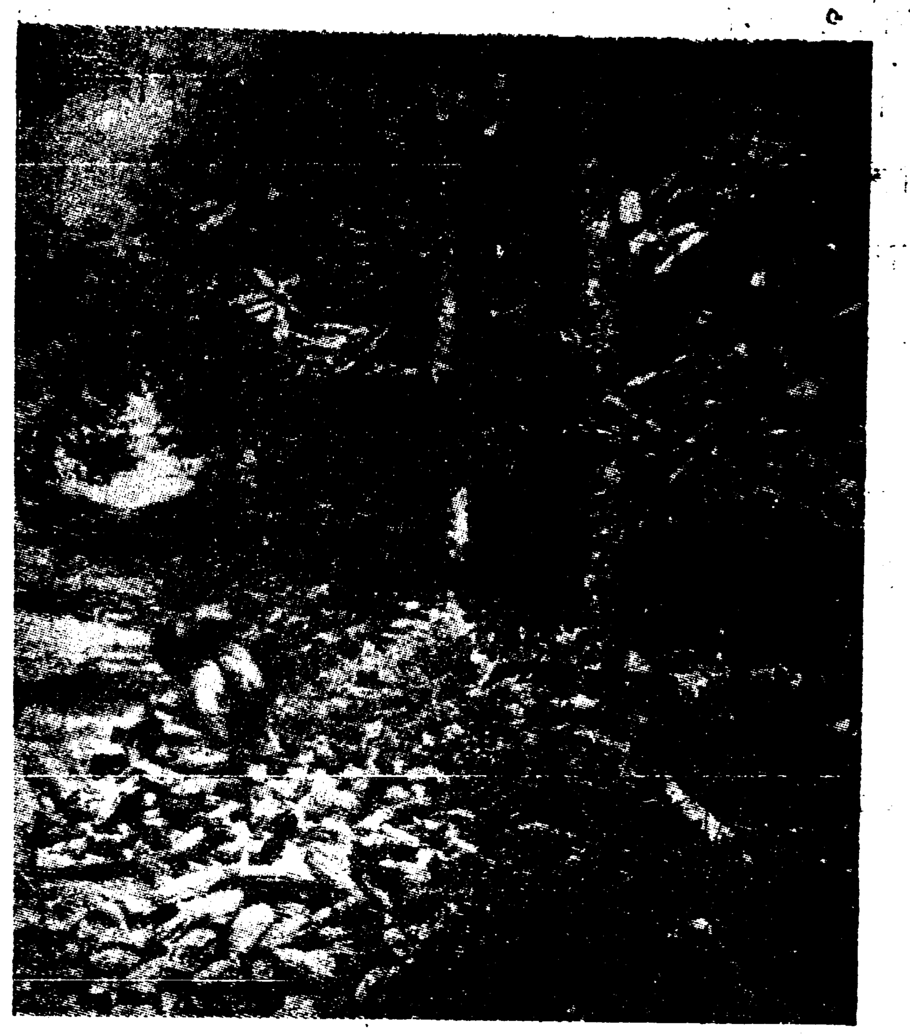

কোকো-গাছ ও গাছের তলায় জড় করা সুঁটি

কিন্তু কারখানায় কাজ থাকে 'বহুৎ'। সম্পূর্ণ শুকাইবার ভার সূর্য্যদেবের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না, এইবার সুরু হয় কৃত্রিম উপায়। মটরগুলিকে

আবার বড় বড় ট্রেতে ঢালিয়া বাষ্পের তাপে সেগুলিকে সেঁকা (বা ঝলসানো—যা খুসী বল) হয়, এবার জিনিষটা বেশ মচ্‌মচে হয়। তার পর সেগুলিকে লইয়া যাওয়া হয় গুঁড়াইবার ঘরে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোকো আর চকোলেট তৈরী করিবার নিয়ম এক কিন্তু এখন হইতে দু'টি দু' উপায়ে করিতে হইবে—কোকো হইবে গুঁড়া গুঁড়া—তরল পানীয় হিসাবে তার ব্যবহার কিন্তু চকোলেট হইবে নানা রকমের— কাদা কাদা, শক্ত শক্ত কত কি! চেহারাও হইবে তার কত রকমের! কোকোর কথা ছাড়িয়া এখন হইতে চকোলেটের কথাই বলি।

গুঁড়াইবার ঘরে লইয়া মটরগুলিকে রোলার দিয়া খুব মিহি করিয়া গুঁড়ান হয়, তার পর তার সঙ্গে পরিমাণ মত চিনি মিশান হয়—শুধু চকোলেট তো আর মিষ্টি নয়! চকোলেট ও চিনি ভাল করিয়া মিশান হইলে সেগুলি গলাইয়া ফেলা হয়। শক্ত চকোলেট তৈরী করিতে হইলে এবার এই তরল চকোলেটকে ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে। ছাঁচ সাধারণতঃ শ্বেতসার দিয়া তৈরী করা হয়। এক সঙ্গে পাশাপাশি বিস্তর ছাঁচ সাজান থাকে—উপর হইতে তরল চকোলেট ছাঁচে পড়িতে থাকে, আর ছাঁচ ভর্ত্তি হইলেই সেগুলি সরিয়া যায়, তার জায়গায় নতুন ছাঁচ আসে। এ সমস্ত ব্যাপারই আপনা-আপনি কলের সাহায্যে হয়, কারিগরের দরকার হয় শুধু কল চালাইবার জন্য। ছাঁচে চকোলেট জমাট বাঁধে, ঠিক মত জমাট বাঁধিলে তুলিয়া ফেলা হয়। শক্ত চকোলেট

চকোলেট-কারখানার একটি দৃশ্য

ছাড়া অন্য রকম চকোলেট করিতে হইলে অবশ্য পৃথক্ ব্যবস্থা। যেমন ধর, বাদাম গুঁড়া করিয়া তার মধ্যে নানা রকম মশলা মাখিয়া গোলা পাকান হইল, এখন এই গোলা তরল চকোলেটে ডুবাইয়া লইলেই তার চারদিকে চকোলেটের একটা আস্তর পড়িয়া যাইবে। জমিয়া শক্ত হইলে জিনিষটি খুবই লোভনীয় একটি খাবারে দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। এমনি ধারা চকোলেট দিয়া আরও নানা জিনিষ করা যায়—তার সবগুলির বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, তবে সবই তৈরী হয় ঐ তরল চকোলেট দিয়া।

চকোলেট তো তৈরী হইল, কিন্তু কারখানার কাজ এখনও অনেক বাকী। চকোলেট সাধারণতঃ ছেলেমেয়েদের খাবার, কাজেই চেহারায় সেগুলিকে এমন করিতে হইবে যা'তে ছেলেমেয়েরা দেখিলে আর লোভ সামলাইতে না পারে। এজন্য চকোলেট তৈরী হইলে সেগুলির উপর চিনির গোলা বা ঐ ধরণের অন্য মশলা দিয়া নানা রকম কারিকুরী আঁকা হয়। তার পর সেগুলিকে সোনালী, রূপালী প্রভৃতি রং-বেরংএর রাংতা বা কাগজ দিয়া মোড়া হয়—এগুলিও হাতে করা হয় না—করা হয় কলের সাহায্যে। ভারী আশ্চর্য্য নয় কি? কিন্তু সে কল দেখিলে তোমরা আর আশ্চর্য্য হইবে না।

রাংতায় মুড়িবার পর চকোলেটগুলিকে সুদৃশ্য বাক্সে ভরিয়া, রঙ্গিন ফিতা দিয়া বাঁধিয়া ফেলা হয়। তার পর?

তার পর সেগুলি যায় দোকানে, দোকান হইতে তোমাদের পকেটে, আর পকেট হইতে তোমাদের মুখে। সেখান হইতে সেগুলি কোথায় অদৃশ্য হয় তা' আমার চেয়ে তোমরাই ভাল জান।

গুরুশিষ্য-সংবাদ

(শ্রীশকুন্তলা দেবী)

মাষ্টার মশাই—টাইগ্রিস্টা কি এবং কোথায়?

ছাত্র—আজ্ঞে, একটা হিংস্র চতুষ্পদ জন্তু,—বাংলায় বলে বাঘিনী, থাকে চিড়িয়াখানায়।

নিশির ডাক

(শ্রীবিনয়কুমার গোস্বামী)

পাড়ার অবনী বাবু তখন সবেমাত্র প্রাতরাশ শেষ করে গত রবিবারের আনন্দবাজার খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন বেশ নিশ্চিন্ত মনেই, কিন্তু যত গণ্ডগোল বাধিয়ে বসল তাঁর উড়ে চাকর গদাধরটা এসে। সে ঘন ঘন বুক চাপড়ে মনিবের পায়ের ওপর আঁছড়ে পড়ে, ডুকরে কেঁদে উঠে বলে বসল, তাকে এ আসন্ন বিপদ্ থেকে উদ্ধার করতেই হবে। নইলে, দেশে যে তার স্ত্রী আর তিন তিনটে মেয়ে তার মুখাপেক্ষী হয়ে বসে আছে, সে মরে গেলে তাদের দুটী অন্ন যোগাবে কে?

খবরের কাগজ পড়বার সময় অবনী বাবু গণ্ডগোল বরদাস্ত করতে পারেন না, এটা তাঁর বরাবরকার স্বভাব। গদাধরের বক্তৃতা-স্রোতে বাধা দিয়ে তাই তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, তোর হয়েছে কি?"

"বাবু, জগড়নাথো গুটে পুত্রো দিলে সে তঙ্কা আনি কিরি..."

এবার কর্ত্তার সত্যিই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌ল; চারদিক্ তাকিয়ে কোন সামগ্রীই হাতের কাছে দেখ্‌তে না পেয়ে অবশেষে তিনি তাকিয়াটাই তুলে ধরলেন, বল্‌লেন, "ভণিতা ছেড়ে শীগ্‌গির বল্ ব্যাটা কি হয়েছে, নইলে আজ তাকিয়ার বাড়িতেই তোর মাথা ছাতু করব।"

কর্ত্তার রুদ্রমূর্ত্তি দেখে গদাধরের বক্তৃতা রাশ-টানা ঘোড়ার মতই থেমে গেল; বার দুই ঢোঁক গিলে সে যা বল্লে তার মর্ম্ম এই—সে ঘাটে স্নান করতে গিয়ে শুনে এসেছে যে গাঁয়ের জমীদারের ছেলেটীর বড় অসুখ, ডাক্তার-বদ্যি হাল ছেড়ে দেওয়ায় তিনি নিশি-ডাকানোর ব্যবস্থা করেছেন।

এক মুহূর্ত্তে অবনী বাবুর মুখের চেহারা ঠিক তাঁর ছেলের মত হয়ে গেল—মানে, দু' মাস আগে প্রমোশন না পেয়ে বাড়ী ফেরার সময়ে তার চেহারা যেমনটি হয়েছিল ঠিক সেই রকম। ভৃত্যের অনুকরণে তিনিও বার দুই ঢোঁক গিলে শেষে

বল্লেন, "নিশি-ডাকানোর ব্যবস্থা হয়েছে? তা তোর কিরে ব্যাটা? যা, নিজের কাজে যা। হ্যাঁ দেখ্, আমায় এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাবি তো!"

জল এল, কর্ত্তা বেশ ক'রে তাঁর শুষ্ক কণ্ঠটি ভিজিয়ে নিয়ে আবার কাগজ খুলে বস্‌লেন, কিন্তু মন যে তাঁর ঠিক তখন খবরের কাগজেই নিবদ্ধ ছিল এ কথা আমি হলফ্ করে বল্‌তে পারব না।

সন্ধ্যার পর আহারে বসে অবনী বাবু স্ত্রীর কাছে ব্যাপারটি খুলে বল্‌তেই তাঁর স্ত্রীর চোখ কপালে উঠে গেল, "ওমা, কি হবে তা হ'লে! ছেলেপেলে নিয়ে আমি যাব কোথা? এ সব হ'ল তোমারই জন্য। বাড়ী করবার সময় থেকে আমি বারবার বলে আস্‌ছি, 'দোতালা কর, দোতালা কর,' তা না করলে একতালা; তার ওপর শোবার ঘরটা হল আবার রাস্তার ধারে। সেখান থেকে যদি কেউ ছেলেপেলের নাম ধরে ডাকে তা হলেই তো চিত্তির!"

অবনী বাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন; বিপদ্-আপদের সময় তাঁর মাথাটা যেন কিছুতেই ঠিক থাকে না, সমস্ত তালগোল পাকিয়ে গুলিয়ে যায়। বার কয়েক চিবুক চুল্‌কে তিনি বল্লেন, "আচ্ছা, আজকের দিনটা না হয় যেন তেন প্রকারেণ রান্নাঘরেই তোমরা সবশুদ্ধু কাটিয়ে দাও, ওখানে যা জঙ্গল, বাছাধনকে আর ঢুকতে হবে না।" কথা কয়টি বল্‌তে বলতেই তিনি লাঠিগাছার দিকে হাত বাড়ালেন,—না না, কারুর পিঠে বসাবার অসদভিপ্রায়ে নয়,—নিত্যিকার মত দাবা খেল্‌তে যাবেন বলে। ওটি তাঁর বরাবরকার অভ্যাস, দু' চারটা দাবার চাল দিলেই নাকি মাথা সাফ হয়ে যায়, নানা রকম বুদ্ধি মনের দরজায় উঁকি মারতে থাকে।

তার পর ছেলেপেলেদের খাওয়ার পালা শেষ হয়ে গিয়ে শোবার পালা এল। রান্নাঘরে শোবার বিছানা হবে শুনে তারা অবাক্ হয়ে তাদের মাকে এই অভিনব ব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, মা-ও সবিস্তারে কারণ খুলে বল্লেন। যার পর নাই বিস্মিত হয়ে তারা প্রশ্ন কর্‌লে, "নিশির ডাক কি মা?"

"তাও জানিস্ না বোকারা! লোকের মারাত্মক অসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যিরা হাল ছেড়ে দেওয়ার পর একজন কাপালিক ডেকে আনা হয়। সে উপোসী থেকে মায়ের পুজো কর্‌তে থাকে; তার পর এক অমাবস্যার রাতে একটা মুখ-কাটা

ডাব আর কাটা ছাগলের মাথা নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরে, আর যে ছেলে অথবা মেয়েকে ডাকা হবে তারই কোন আত্মীয়-স্বজনের গলার স্বর নকল করে ডাকতে থাকে। সে উত্তর দিলেই রক্তবমি করতে করতে মরে যায়, আর যার জন্য এত কাণ্ড সে ওঠে বেঁচে।"

গোবর্দ্ধন আর পুঁটি—অবনী বাবুর ছেলে আর মেয়ে—ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। গোবর্দ্ধন কোনমতে একটু সাহস সঞ্চয় করে বল্‌লে, "কে ডাকে মা, কাপালিকটা নাকি?"

"না, কাটা ছাগলের মাথাটা।"

ভয়ে চীৎকার ক'রে ভাইবোনে এইবার এক সঙ্গে মাকে জড়িয়ে ধরল।

বিছানায় সবাই গিয়ে শু'ল বটে, কিন্তু ঘুমের ছায়াও সেদিন সেদিকে মাড়াল না। বাইরে সামান্য একটু খস্ খস্ শব্দ হয়, আর দু' পাশ থেকে দুই ভাইবোনে শক্ত করে মাকে আঁকড়ে ধরে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক্ নিঝুম হয়ে আস্‌ছে—হয়তো পথচারী কোন লোকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ক'টি প্রাণীর বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আস্‌ছে। কে একজন রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে গাইতে গাইতে চলেছিল, 'গোকুল গিরি-গোবর্দ্ধন ..' অমনি আমাদের গোবর্দ্ধন এক চীৎকার দিয়ে উঠেছিল আর কি, তার মা সেই মুহূর্ত্তে দু' হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন, "খবরদার গোবরা, মুখ বুঁজে পড়ে থাক, কাপালিকের বেরোবার সময় হয়েছে। ডাক শুনে উত্তর দিয়েছিস কি গিয়েছিস্।" গোবর্দ্ধন আর পুঁটি দস্তুরমত কাঁপ্‌তে থাকে।

আরও মিনিট পনেরো কুড়ি কেটে গেল, তার পর যে কাণ্ড ঘট্‌ল তা বাস্তবিকই বড় ভয়াবহ—পরিষ্কার কণ্ঠে বাইরে থেকে কে ডেকে উঠ্‌ল "গোবর্দ্ধন!"

স্পষ্ট আওয়াজ, না শুন্‌তে পাওয়ার কোন কারণ নেই,—তিনজনেরই মনে হ'ল এ যেন স্বয়ং যমরাজের কণ্ঠধ্বনি! নাক মুখ গুঁজে তিনজনাই বিছানায় পড়ে রইল, অবনী বাবুর স্ত্রী মনে মনে অনবরত বল্‌তে লাগ্‌লেন, "মা দুর্গা, মা দুর্গা, বাঁচাও মা, বাঁচাও, আমি জোড়া পাঁঠা দেব।"

কিন্তু আওয়াজ তবু থামে না, "গোবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধ-ন, গোবরা !"

ভিতর থেকে তিন জন নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুন্‌তে লাগ্‌ল,—আহ্বান চলেইছে, "গোবরা, উঠে আয়,—পুঁটি ও পুঁটি !"

নাঃ, কাপালিক 'মরিয়া' হয়ে লেগেছে, কাউকেই সে রেহাই দেবে না ; ক্রমাগত ডাক চলেছে। পুঁটি ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, "এ তো বাবার গলার আওয়াজ শুন্‌ছি মা !" এতক্ষণে তার কান অনেকটা স্বাভাবিকে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তার মা তাকে অম্‌নি শাসিয়ে উঠলেন, "থাম্ থাম, ও তোর বাবার গলার আওয়াজ নয়, কাটা পাঁঠাটা ডাকছে। উত্তর দিস্ নি—খবর্দ্দার।"

ছেলেপেলেদের ছেড়ে এবার কাপালিকের আক্রোশটা পড়ল গিয়ে চাকর গদাধরের উপর—"গদা, এই ব্যাটা গদা, শীগ্‌গির দোর খোল্, নইলে তোর মাথাই আজ চৌচির করব।" সঙ্গে সঙ্গে দরজার গায়ে দমাদ্দম্ লাথির শব্দ শোনা গেল ; পুরোনো খিল বেশী উপদ্রব সইতে না পেরে শীগ্‌গিরই পরাজয়ে মাথা নত করে ফেল্লে। রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে অবনী বাবু বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লেন ; গিন্নীকে উদ্দেশ করে বল্লেন, "তোমাদের আক্কেলটা কি একবার শুনি ! এক ঘণ্টা ধরে আমি চেঁচাচ্ছি, অথচ কোন সাড়া শব্দই নেই !"

গিন্নীর ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল, তার জায়গায় দেখা দিল ক্রোধ ; ঝাঁঝাল স্বরে বল্লেন, "আর তোমারই বা আক্কেলটা কি রকম শুনি ? নিজেই যখন বল্লে নিশি-ডাকানোর বন্দোবস্ত হচ্ছে, তখন এক রাত্তির দাবাটা বাদ দিলে কোন্ মহাভারত তোমার অশুদ্ধ হ'ত ? কি করে আমরা বুঝব যে ওটা পাঁঠার গলার আওয়াজ নয়, তোমার আওয়াজ ?"

কর্ত্তা থতমত খেয়ে বল্লেন, "তা বটে, তা বটে ! তবে কি জান, মাথা যখন গুলিয়ে আসে তখন দাবা খেলার মত অমন আর ওষুধ নেই—খাসা বুদ্ধি খুলে যায়।

গিন্নী বল্লেন, "হুঁ, যেমন এই মাত্র তার নমুনা দেখালে !"

পর দিন প্রাতে পুঁটির মা দালানে বসে কুটনো কুটছিলেন, অবনী বাবু

দুঃখের স্বরে এসে বল্লেন, "শুন্‌ছ, আজ ভোরে জমীদারের ছেলেটি মারা গেল। আহা !"

গিন্নী ভেবেছিলেন কথাটা শুনে বোধ হয় তাঁর আরামের নিঃশ্বাসই পড়বে, কিন্তু আসলে পড়ল একটা দুঃখের নিঃশ্বাস—খুব ভারী হয়ে।

দস্যুর দলে ভোমরা

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

৫

একটি জানালা ও একটি চিঠি

একটু চুপ ক'রে থেকে মাণ্‌কে বললে, 'পাণ্ডাজি, বেলা হ'লো।'

'হ্যাঁ, বেলা হ'লো। তা হ'লে, ভোমরা, তুমি ঐ দুধটুকু আর কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত ব'সে থাকো, আমি যাই কাজে।'

ভোমরা বললে, 'তোমার আবার কাজ কী ? আপিস করতে হয় ? পরীক্ষা পাশ করতে হয় ?'

'এবারে সুরু করবো পাশ-টাস করতে—ম্যাট্রিকুলেশন থেকে সুরু। তুমি আমাকে পড়াবে ?'

গম্ভীর মুখে বললে ভোমরা, 'মাইনে দেবে কত ?'

'সে-কথা পরে হবে', ব'লে পাণ্ডাজি উঠে দাঁড়ালো। 'তুমি খেয়ো কিন্তু—তার পর আর ভাবনা কী—একেবারে ছুটি !'

খাবারগুলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে ভোমরা বললে, 'ওরে বাবা ! এতগুলো আমি খাবো নাকি ? আমি কি রাক্ষস !'

এই ছোট ছেলেটার তাঁবেদারি করতে-করতে মাণ্‌কের মেজাজ প্রথম

থেকেই খারাপ হ'য়ে ছিলো—এবারে আর সামলাতে না পেরে ব'লে উঠলো, 'রাক্ষস তুমি হবে কেন, রাক্ষস আমরা—আর তুমি হচ্ছো অশোকবনে সীতা।'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো ভোমরা।—'আমি পুরুষমানুষ, আমি সীতা হ'বো কেমন ক'রে!'

শিবু সর্দার বললে, 'সে সত্যি কথা। তবে তুমি হনুমান্—কি বলো?'

ভোমরা আর শিবু সর্দার এক সঙ্গে হেসে উঠলো।

মাণ্কে বললে, 'পাণ্ডাজি, আলতাফ অনেকক্ষণ থেকে ব'সে আছে। শ্যাওড়াপুলি থেকে খবর এসেছে।'

'চলো, শুনি গিয়ে কী বলে আলতাফ।'

গেলো ওরা চলে! ওদের পিছনে দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো, ঠুন ক'রে ছোট্ট একটু শব্দ হ'লো। ভোমরা দৌড়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে। যা ভেবেছিলো তা-ই, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। ওরা ওকে এই ছোট্ট কুঠুরিতে বন্ধ ক'রে চলে গেছে।

ছোট্ট শরীরে ওর যতটুকু জোর, ভোমরা দমাদম্ ঘা দিতে লাগলো দরজায় আর প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলো—'পাণ্ডাজি, ও পাণ্ডাজি, ও মাম্বু-জাম্বু, এই মাণ্কে, গণশা, পাণ্ডাজি—' কিন্তু এই সকালবেলাতেই চারদিকে যেন পাথরের মত ভারি ও জমাট নীরবতা, ভোমরার চীৎকার ঐ ছোট্ট ঘরের দেয়ালে লেগে-লেগে বাতাসে মিলিয়ে গেলো।

সত্যি, কত আর চেঁচানো যায়। এদিকে হাতটাও ব্যথা হ'য়ে গেছে। ভোমরার গলা ছেড়ে ডুকরিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু কাঁদলেই বা শুনবে কে? চোখে পড়লো খাবারের ঠোঙা আর দুধের খুরি—এক লাথি মেরে খাবারগুলো সমস্ত ঘরে ছিটিয়ে দিলে; চালাকি! ওরা যেন ওকে পোষা জানোয়ার পেয়েছে—খাবার দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে গেছে। মাটির খুরিটা কারো মাথায় ভাঙতে পারতো তো খুসী হতো। খাবে না সে, কিচ্ছু খাবে না—ভারী! ছেলেমানুষ ব'লে না-খেয়ে থাকতে পারবে না ভেবেছে নাকি ওরা?

ঘরটি একেবারেই বন্ধ, শুধু পিছনের দেয়ালে ছোট্ট একটা জানলা।

জানালাটা এত উঁচুতে যে ভোমরা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও কিছু দেখতে পায় না। দু'বার তিনবার সে লাফ দিলে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট উঁচু লাফই দিলে—পলকের জন্য খানিকটা ফাঁকা তার চোখের সামনে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো। ঘরে একটা টুল, বেঞ্চি কি চেয়ার কিচ্ছু নেই—কাল রাত্রে সে যে কম্বলটায় শুয়েছিল সেটা শুধু আছে। ইস—ঐ জানলা দিয়ে যদি সে তাকাতে পারতো! হয়তো দেখতে পেত রাস্তা, ট্র্যাম চলেছে ঘণ্টা বাজিয়ে, ফুটপাথে সারি-সারি লোক, তার মধ্যে একজনও কি আর চেনা না বেরুতো! ডাকতো চীৎকার ক'রে, চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতো—তার পর দেখা যেত পাণ্ডাজির ক্যারদানি কত!

তার পর সে এক কাজ করলো। জানলার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে এমন এক লাফ দিলে যেমন লাফ সে কখনো দেয় নি। জানলার শিক উঠে এলো তার হাতের কাছে। খপ্ ক'রে হাত বাড়িয়ে সে আঁকড়ে ধরলো একটা শিক, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর তাকে নীচে টানলো না, রইলো সে ঝুলে পা ছড়িয়ে।

'বাঃ, এই তো বেশ,' নিজেকে শুনিয়েই সে বললে।

আবার বললে, 'ঠিক যেন হনুমান। পাণ্ডাজি নেহাৎ মিথ্যে বলে নি।'

জানলার তাকটা অতি সরু; অতি কষ্টে আধখানা শরীর নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক ধ'রে সে একটু আশ্রয় ক'রে নিলে। তার পর তাকালো জানলা দিয়ে বাইরে।

হায়রে! এইজন্যেই কি সে এত কষ্ট করেছিলো! জানলার বাইরে কিছু নেই, প্রকাণ্ড একটা বাড়ি তার দৃষ্টির সমস্ত সীমা জুড়ে রয়েছে, আর মাঝখান দিয়ে একটা খোলা নরদমায় তির তির ক'রে ব'য়ে চলেছে সবুজ রঙের জল। দু' বাড়ির মাঝখান দিয়ে চোখে পড়ে সরু একটু আকাশের ফালি—যেন স্বর্গের নরদমায় স্বর্গীয় নীল নোঙরা জলের স্রোত!

ভোমরা বুঝতে পারলে এ ঘরটা বাড়ির একেবারে পিছন দিকে, রাস্তা থেকে অনেক দূরে। পাশের বাড়িটা প্রকাণ্ড, জানলাগুলো বন্ধ, লোক আছে কি নেই বোঝা যায় না। ওখানে ব'সে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও যে কেউ উদ্ধার করতে আসবে এমন আশা হয় না। কোন্ দিকে রাস্তা, সে রাস্তা দিয়ে কোথায় যাওয়া

যায়, এই গলিঘুঁজিওয়ালা এলোমেলো বিরাট্ বাড়ি থেকেই বা বেরোয় কী ক'রে—ভোমরা সে বিষয়ে কোনও রকম ধারণাই অবিশ্যি করতে পারলে না। পকেটে হাত দিয়ে একটা চীনেবাদামের খোসা পেলো, ছুঁড়ে ফেললো সেটা নরদমা সই ক'রে। হালকা জিনিস ভাসতে-ভাসতে অনেকক্ষণ পরে সবুজ জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো—ভোমরা দেখতে লাগলো চোখ নীচু ক'রে।

যদি পালাতে হয়, এই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়াই তো উপায়। কথাটা ভাবতে ভোমরার রীতিমত একটু থ্রিল হ'লো প্রথমটায়। ওঃ, গভীর অন্ধকার রাত্রে এই জানলার সঙ্গে দড়ি বেঁধে···কিন্তু দড়ি পাবে কোথায়? তা ছাড়া শিকের ভিতর দিয়ে তার শরীর গলবে তো? ভোমরা পরীক্ষা করতে গেলো, দুই শিকে মাথাটা গেলো ঠুকে। বেশ মোটা-মোটা শক্ত শিক—এ সে বাঁকাবেই বা কী ক'রে, ভাঙবেই বা কী ক'রে? শুনেছিলো, করাত দিয়ে একটু-একটু ক'রে কেটে ফেলতে হয়—রোমাঞ্চকর য়্যাডভেঞ্চারের বইয়ে সবাই তা-ই করে। তাদের পকেটে থাকে ছোট্ট করাত—কিন্তু তার পকেটে তো পেন্সিল-কাটা ছুরিটা পর্য্যন্ত নেই। তবে কী হবে? মাম্বু-জাম্বুর কাছে একটা করাত ধার চাইবে নাকি? দূর বোকা, করাতই যদি দেবে, তবে তো ছেড়েও দিতে পারে।

ও রকম ভাবে ঝুলে থাকতে তার মোটেও আরাম লাগছিলো না, ঝুপ ক'রে সে ফের লাফিয়ে পড়লো। কত বেলা হয়েছে কে জানে—কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই। এতক্ষণে হয়তো তাদের ইস্কুল বসেছে—কে জানে কত দিনে বন্ধুদের সঙ্গে তার দেখা হবে! যাক্‌গে, এমন কপাল তো সকলের হয় না—আস্ত গুণ্ডার হাতে পড়া। ফিরে যখন যাবে, কী কাণ্ডটা হবে ভাবো তো! একেবারে লোফালুফি তাকে নিয়ে! একমাস অনর্গল বকলেও তো গল্প ফুরুবে না। 'হ্যাঁ ভাই ভোমরা, তার পর কী হ'লো? তার পর?'

কান পেতে সে কোনও রকম একটু শব্দ শুনতে পেলো না। সব চুপচাপ, দিনটা যেন সুরু হ'তেই একেবারে ফুরিয়ে গেছে। কী আর করে ভোমরা, সেই কম্বলের উপরেই গিয়ে শুয়ে পড়লো। ভাগ্যিস এই বই ক'টা আছে সঙ্গে। ইস্কুল থেকে ফিরছিলো তো—হাতে ছিলো বইয়ের তাড়া, সেগুলো এ পর্য্যন্ত এসে

পৌঁচেছে ঠিক। ইস্কুলের বই-ই বেশি, কিন্তু দু'খানা তার মধ্যে গল্পের বই। ঐ বই দুটো হঠাৎ দেখে কী যে খুসী লাগলো তার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের বইখানা তুলে নিয়ে প্রথমে সে অনেকক্ষণ নেড়ে-চেড়ে দেখলো, একটা পাতার সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে লম্বা নিঃশ্বাস টানলো অনেকক্ষণ—বাঃ, বেশ গন্ধ। আরম্ভ করলেই তো ফুরিয়ে যাবে—তার পর আবার কোথায় পাবে এখানে?

বই খুলে সে পড়া আরম্ভ করলো, আর তখনকার মত সব ভুলে গেলো—কোথায় সে এসেছে, এসেছে কোথা থেকে, আশে-পাশে কে আছে কি নেই—গল্পের হাওয়ায় উড়ে চললো তার মন। এমনি গল্প পড়তে পড়তে ঐ ছোট্ট বদ্ধ কুঠুরিতে কম্বলে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

জাগলো যখন, তার পিঠ ঘেমে গেছে। বেজায় গরম, বেলা বোধ হয় অনেক হয়েছে। জেগে উঠেই তার সব মনে পড়লো, আবার তার কান্না পেলো। সকাল থেকে কিন্তু সে খায়নি, এতক্ষণে নাওয়ার কথাও মনে হ'লো। সমস্ত বাড়িটা তেমনি থমথমে চুপ—কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

পকেট হাতড়ে সে তার পেন্সিলটা খুঁজে পেলো। বইয়ের মধ্যে ছিল তার ইস্কুলের রাফ্ খাতা, তারই একটা পাতা ছিঁড়ে সে একটা চিঠি লিখলো—

'মাগো, আমি তো আর পারি না। কাকাবাবুকে ব'লে শীগ্‌গির আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ঠিকানা দিতে পারলুম না, কোথায় আছি জানিনে। এ ঘর থেকে কোনদিকে কোন রাস্তা চোখে পড়ে না। তবে আমাদের বাড়ি থেকে ঢের দূর। তা হোক্, কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুঁজে বা'র করতে পারবেন। মাগো, তুমি কিচ্ছু ভেবো না, এরা আমাকে মারেও নি, কোন কষ্টও দেয় নি। তবে একলা একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছে, আমার আর ভালো লাগছে না। বিরিঞ্চি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আসে, তাকে আমার কথা বোলো। কাকাবাবু কালকেই যেন আসেন।

ভোমরা।'

চিঠিখানা লিখে সে আর একটা সাদা কাগজে ভাঁজ ক'রে মুড়লো, তার পর প্রচুর থুতু দিয়ে কোনরকমে আটকালো খামের মত ক'রে। উপরে লিখলো নাম ঠিকানা, তার পর চিঠিটা সযত্নে পকেটে ভরে ভাবতে লাগলো কী ক'রে এটা

পাঠানো যেতে পারে! এমন সময় ঝনাৎ ক'রে শিকল খোলার শব্দ হ'লো, আর দরজায় যে মূর্ত্তি দেখা গেলো, তার দিকে তাকিয়ে ভোমরা প্রথমটায় চমকেই উঠলো। (ক্রমশঃ)

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

[উত্তর শেষ পৃষ্ঠায় দেখ]

১নং

(১) নীচের ছবিগুলি (১, ২, ও ৩নং) দেখে বল কোন্‌টা কার বা কিসের ছবি?

(২) বর্ত্তমান ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলা হয়—

মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে, লালা লাজপৎ রায়—এঁদের কাকে?

(৩) নীচে যা যা ভুল আছে তা শুদ্ধ কর—

(ক) আমেরিকার রাজধানী নিউইয়র্ক (খ) সাপ, বেঙ, টিকটিকি—এদের সরীসৃপ বলে (গ) নরওয়ের বর্ত্তমান রাজধানী ক্রিশ্চিয়ানা অত্যন্ত

গরম জায়গা, (ঘ) ভারতবর্ষের মধ্যে বড় বন্দর বলতে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ আর রেঙ্গুনকেই বোঝায় (ঙ) ভাল আলপাকার জামা বিশেষ এক জাতের গুটিপোকার শরীর থেকে তৈরী হয় (চ) এরিষ্টটল, টলষ্টয় ও বার্ক—ইংল্যাণ্ডের বড় বক্তা হিসাবে এঁদেরই সব চেয়ে নাম।

২নং

৩নং

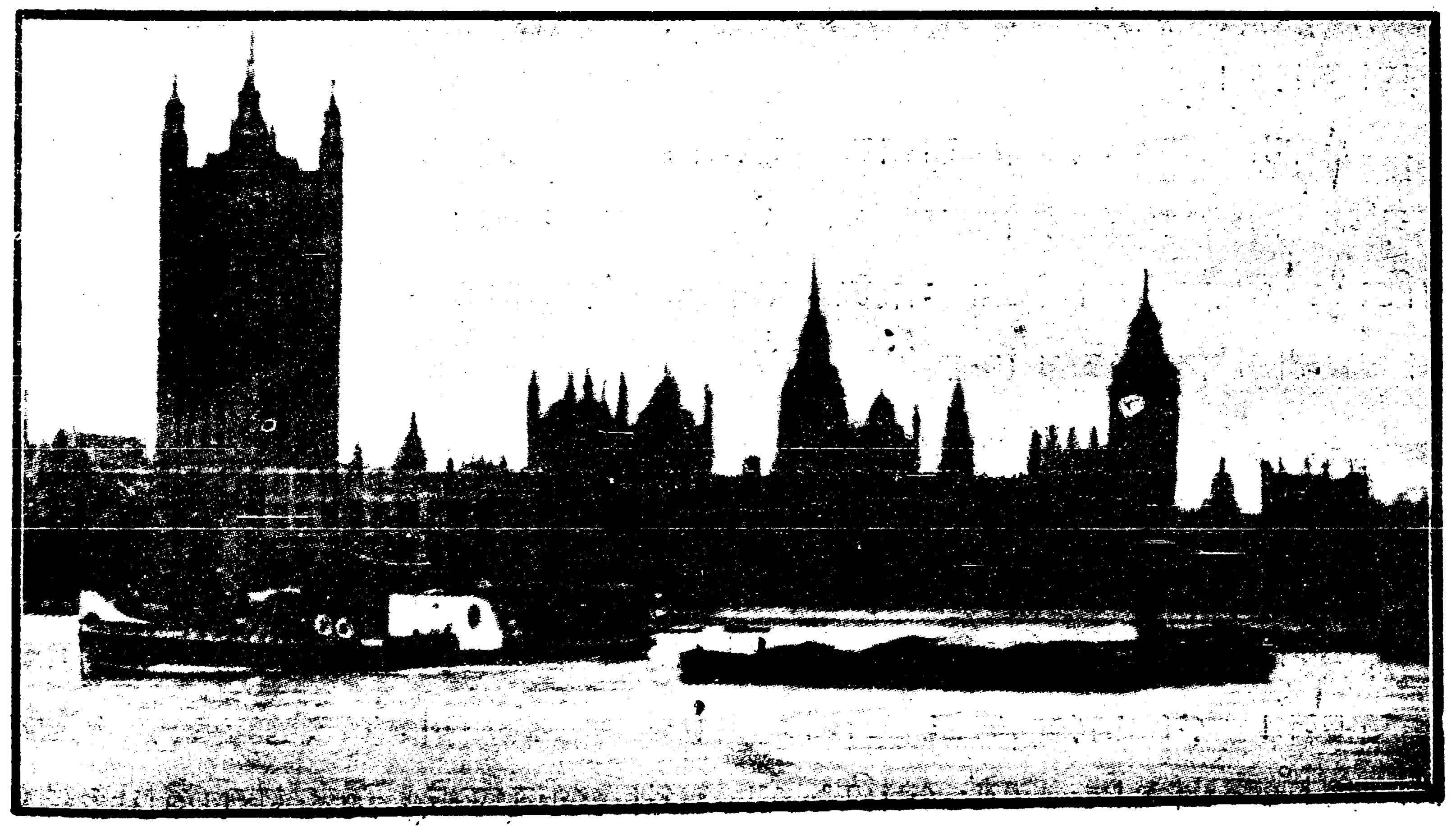

ছাত্রাবাস

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী)

অনেক আলোচনা এবং কথা কাটাকাটির পর তপনের বোর্ডিং-এ থাকাই স্থির হইল। বোর্ডিং-এ শাসনের ব্যবস্থা আছে। যখন তখন না বলিয়া কহিয়া সাইকেল লইয়া অথবা তালডিঙ্গীতে চড়িয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবার কোনও উপায়ই নাই।

বড় বড় চোখ বাহির করিয়া তপন একবার বোর্ডিং-এর চারিদিক্ ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। দোতলা বাড়ী—সম্মুখে কয়েকটি কামিনী ফুলের গাছ—বড় ছোট এবং মাঝারি ছেলেরা ক্রমাগত আসা-যাওয়া করিতেছে। কোট গায়ে একজন খুব রোগা লিক্‌লিকে চেহারার ভদ্রলোক বারান্দায় ইজি-চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছেন; মাঝে মাঝে চাকরদের ডাকিয়া নানা কাজের ফরমাস দিতেছেন। তপন তাঁহার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে লাগেজ পড়িয়া আছে।

রোগা লিক্‌লিকে চেহারার ভদ্রলোক চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই ছেলেটির বিছানাপত্র দোতলার হল ঘরে নিয়ে যাও। মনে হ'চ্ছে, এ কখনও বোর্ডিং-এ থাকে নি। এর সীটের ব্যবস্থা ক'রে দাও—বিছানাপত্র বই-কেতাব বেশ ভালো ক'রে গুছিয়ে দিয়ো।'

তপন অতি স্থির শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বয়সের অনুপাতে সে দেখিতে খুব বড় হয় নাই—অকস্মাৎ মাষ্টার মহাশয়দের তাহাকে দেখিলে যে করুণা হইবে—ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

একটি ছেলে কামিনী ফুলের ঝোপের নিকট হইতে আগন্তুককে লক্ষ্য করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া তাহার কানে কানে বলিল, 'ইনি যে প্রকাশ বাবু—এই বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট্, ইস্কুলেও ইনি হায়ার ক্লাসে পড়ান্, তুমি ভাই এঁকে নমস্কার কর্‌লে না?'

তপন কিছু বিব্রত হইয়া নমস্কার করিতে যাইবে এমন সময় প্রকাশ বাবু তাড়াতাড়ি ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া তাঁহার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন!

* * *

দোতলার একটি ঘরে তপনের সীট্ নির্দ্দিষ্ট হইল। আরও কয়েক জনের সীট্ সেই ঘরে আছে—তাহাদের সঙ্গে ক্রমশঃ তপনের পরিচয় হইল। তপন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বোর্ডিং-এ শাসনের ব্যবস্থা আছে—কড়াকড়ি নিয়ম-কানুন সবই আছে—অথচ তাহারই ফাঁকে ফাঁকে এক-আধটুকু দুষ্টামির হাওয়া যে নাই এমন নহে। যেন আবদ্ধ পঙ্কিল জলের মধ্যে বন্যার স্রোত—নিমেষমধ্যে প্রাণের সজীব স্পর্শে সমস্ত চূরমার হইয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া ভালো-লাগা। তপন সেদিন ইহা বেশ ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিল।

কামিনী ফুলের ঝোপের পাশ দিয়া সম্মুখ দিকে খানিকটা হাঁটিয়া গেলে ছেলেদের খেলিবার মাঠ, সেই মাঠের চারিদিক্ পাঁচীল দিয়া ঘেরা—ঠিক পাঁচীলের গা ঘেঁষিয়া সারি সারি নারিকেল গাছ। মাঝে মাঝে দুই একটা শুক্‌না ঝুনা নারিকেল ধুপ্‌ধাপ্ করিয়া মাটিতে পড়িত। বোর্ডিং-এর চাকর সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া বোর্ডিং-এর ভাঁড়ার ঘরে জমাইয়া রাখিত। মাঝে মাঝে বোর্ডিং-এর ঠাকুর সেই নারিকেল কুরিয়া তরকারীতে দিত, অথবা তাহা কাটিয়া ভাজিত—ঝুনা নারিকেল এইভাবে কাজে লাগিত। তপন শুনিয়াছিল, ঋষিরা ফল পাড়িয়া খাইতেন না; গাছের ফল পাকিয়া টুপ্‌টাপ্ করিয়া মাটিতে পড়িলে তাঁহারা সেই সুপক্ক ফল খাইতেন। ঝুনা নারিকেলের সদ্‌ব্যবহার দেখিয়া তপনের সেই কথা মনে পড়িয়া গেল।

* * *

গভীর রাত্রে লণ্ঠনের আলোর চারিদিকে মাঝারি ছেলেদের আসর বসিত, সাধারণতঃ ক্যারম্ খেলা চলিত—কখনও বা কাহারও সীটের বিছানাপত্র সরাইয়া ফেলিয়া তাহারই উপর ছোট নেট্ খাটাইয়া পিং-পং খেলা চলিত। সেদিনও তাহাই আরম্ভ হইয়াছে। তপন কি মনে করিয়া খেলায় যোগ না দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া দোতলার ছাদে বেড়াইতে গেল। ছাদের উপরে পুরানো ট্যাঙ্ক—ভাঙিয়া

থুব্‌ড়াইয়া গিয়াছে। তপন তাহারই পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ ট্যাঙ্কের পাশে ঠুক্ করিয়া কিসের যেন শব্দ শোনা গেল। তপন চম্‌কাইয়া উঠিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল—কিছুই দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ। তপনের অন্যমনস্কতা কাটিয়া গেল। ম্লান চাঁদের আলোয় সে ট্যাঙ্কের পাশে ঝুঁকিয়া দেখিল; দেখিল, মালকোঁচা দিয়া কে একজন কালো মত চেহারা একটি প্রকাণ্ড ডাব বড় ছুরি দিয়া কাটিতেছে। তপন ভয়ে ভয়ে বলিল, 'কে?'

ছুরি দিয়া ডাব কাটিতে কাটিতে কালোমত চেহারা বলিল, 'বেশী চেঁচিয়ো না, আমি হরষিত।'

'হরষিত? কি কর্‌ছ ভাই?'

'ডাব খাচ্ছি।'

'এই দু'পর রাতে?'

'তা'তে কি হয়েছে?'

'দেখি, কেমন ডাব?'

'বেশী চেঁচিয়ো না, আমি হরষিত।'

'অর্থাৎ ডাব নিতে গেলে তুমি আমাকে মেরে ফেল্‌বে—এই তো!'

'হ্যাঁ—তা' তো ফেলবই।'

'লক্ষ্মী ভাই, খানিকটা জল আমায় দাও—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

কালো চেহারা হরষিত মালকোঁচা খুলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তপন চাহিয়া দেখিল, তাহার সমস্ত বুক ডাবের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। তপন আস্তে আস্তে তাহার হাত হইতে ডাবটি লইয়া চোঁ-চোঁ করিয়া বাকী জলটুকু খাইয়া ফেলিল। তাহার পর ট্যাঙ্কের মধ্যে ধুপ্ করিয়া ডাবটি ফেলিয়া দিয়া হরষিতকে বলিল, 'ভাই, আমি কাউকে বল্‌ব না—কোথায় পেলে ভাই ডাব?' হরষিত বুক-মুখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমরা রোজই খাই ডাব—পালা ক'রে।' তপন অবাক্ হইয়া গেল। এত ডাব ইহারা পায় কোথায়? ট্যাঙ্কের ভিতরটা ডাবের খোলায় ভর্ত্তি।

হরষিত তপনের একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'ব্যবস্থা আছে ডাব জোগাড় কর্‌বার—তুমি তো সবে নতুন এসেছ, ক্রমশঃ জান্‌তে পার্‌বে।'

* * *

দুইজনে নীচে নামিয়া আসিল। তখনও ক্যারম্ খেলা চলিতেছে। লণ্ঠনের চারিদিকে তখনও ছেলেরা উপুড় হইয়া বসিয়া বসিয়া ক্যারম্ খেলা দেখিতেছে। হল-ঘরের জানালার পাশে আরও কয়েকজন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় তপন চাহিয়া দেখিল, তাহাদের চোখে-মুখে একটা নিদারুণ উত্তেজনার ভাব। সে নূতন আসিয়াছে, কাজেই ঘটনা যে কি তাহা সে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? জানালার পাশ হইতে একজন দীর্ঘাকৃতি বড় ছেলে তাহার দিকে আগাইয়া আসিল।

ক্যারম্ যাহারা খেলিতেছে, তাহারা কিন্তু অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ক্যারমই খেলিতেছে। তাহাদের কোনও সাড়াশব্দ নাই—মাঝে মাঝে ক্যারমের গুটির ঠক্‌ঠাক্ শব্দ আসিতেছে মাত্র।

তপনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সেই জোয়ান্ ছেলেটি হল-ঘরের তাহাকে জানালার কাছে লইয়া গেল। তপনের ভীত মুখের সম্মুখে তর্জ্জনী তুলিয়া বলিল, 'তুমি তো নতুন এসেছ, না?' তপন কোনও উত্তর দিল না। ভয়ে এবং রাগে তাহার ভিতরটা তখন ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

হরষিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, 'ভয় কি তোমার? ও আমাদের কেষ্ট—তবে বেশী চেঁচিয়ে কথা ব'ল না।'

হঠাৎ নীচের ঘরে খড়মের ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। ক্যারম্ যাহারা খেলিতেছিল তাহারা শুধু স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। জানালার কাছে যাহারা ছিল তাহারা তপনকে সেইখানে একা ফেলিয়া দৌড়াইয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল।

তপন তখনও সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বোর্ডিং সম্বন্ধে নানা কথা সে ভাবিতে লাগিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তপন শুইতে যাইবে কিনা ভাবিতেছে—এমন সময়ে আর একটি ছেলে তপনের

কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, চুপিচুপি বলিল, 'তোমায় ওরা তুলোধুনো করবে, পালাও।'

বলা নাই, কহা নাই, এত রাত্রে হঠাৎ মারামারির কথা আসিতেই পারে না। আর সে করিয়াছেই বা কি? সে এমন তো কোন দোষ করে নাই যে তাহাকে সবাই ধরিয়া ধরিয়া মারিবে! যে ছেলেটি ঐ কথা তপনকে আসিয়া বলিল তাহার নাম শশী—সে তপনকে ঐ কথা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। কাহাকেও কোনও দিকে দেখিতে না পাইয়া একটা অজানা আতঙ্কে তপনের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। সে কত দলের 'লীডার' হইয়া কত শক্ত শক্ত কাজ করিয়াছে, কিন্তু হইলে কি হয়, এখানে সে যে একা আসিয়া পড়িয়াছে—একা থাকিলে ভয় হইবার কথাই বটে!

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার নিজের ঘরে যাইতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল বিদ্যুৎবেগে মালকোঁচা মারিয়া কে একজন তাহার সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে দমিল না—কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া যে পথে সেই মালকোঁচা গিয়াছে, সেই পথে অন্ধকারের মধ্যে চলিতে লাগিল। ছোট্ট একটি ঘরের পাশ দিয়া অন্ধকার সিঁড়ি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে; দেখিতে দেখিতে তপন সেই সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ির দরজার কাছে আসিতেই হঠাৎ তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল, চোখ অন্ধকার হইয়া গেল এবং সে যাহার অনুসরণ করিতে চলিয়াছিল তাহার পায়ের শব্দ অন্ধকার সিঁড়ির মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। তপন স্থির হইয়া সেখানে বসিল—একটা বড় ইটের টুক্‌রা দিয়া কে একজন কোথা হইতে তাহাকে মারিয়াছে। ইট্ জামার উপরে পিঠে আসিয়া লাগিয়াছে বলিয়াই রক্ষা—নহিলে কি হইত বলা যায় না। তপন উঠিতে যাইবে এমন সময় আর একখানি বড় ইট ঝন্‌ঝন্ করিয়া কাচের সার্শির উপর আসিয়া পড়িল। দরজার কাছটা টুক্‌রা কাচে ভর্ত্তি হইয়া গেল। এখন উপায় কি? অতর্কিত ভাবে, কোথা হইতে ইট আসিয়া পড়িতেছে জানিবার উপায় নাই। যে ছেলেটি সাবধান করিয়া দিয়াছিল, তাহার দেখা পাইলেও হইত।

তপন ছুটিয়া সিঁড়ির কাছের ছোট্ট ঘরের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। তার পর দরজা বন্ধ করিয়া খিল লাগাইয়া দিল।

তপন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; কতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে ঠিক নাই, হঠাৎ মনে হইল বন্ধ দরজার উপরে কে ঠুক্-ঠুক্ করিয়া ঘা দিতেছে—তপন আধ-ঘুমের মধ্যেও শুনিতে পাইল। তাড়াতাড়ি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চোখ রগ্‌ড়াইয়া সে উঠিয়া বসিল। এবার যে ঘা দিতেছিল তাহার গলা শুনিতে পাওয়া গেল—সে বলিল, 'আমার নাম শশী—ভয় নেই, দরজা খোলো।'

শশীকে সে চেনে না, তবু সে মরিয়া হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। দেখিল, যে ছেলেটি তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, এ সেই।

সে বলিল, 'রাত আর বেশী নেই, এদিকে এসো, কিন্তু বেশী জোরে কথা ব'লো না।' সে তাহাকে ছাদের আলিসার পাশে লইয়া গেল। বলিল, 'চুপ ক'রে ঐদিকে তাকিয়ে থাকো।' তপন সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,—দেখিল বোর্ডিংএর অন্ধকার মাঠে পাঁচীলের দিকে একটি দীর্ঘ আলোর রেখা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তপন বলিল 'ও তো টর্চ্চ-এর আলো!'

শশী বলিল, 'উঁহুঁ, ইটের ঝন্‌ঝনানি শুনেছ?'

তপন হাসিয়া বলিল, 'শুধু ঝন্‌ঝনানি? একখানা ইটে আমার পিঠের চামড়া কেটে বোধ হয় রক্ত বেরিয়ে পড়েছে।'

শশী বলিল, 'বটে! রক্তও বেরিয়েছে?'

তপন জামা খুলিয়া ফেলিয়া পিঠ দেখাইল।

শশী বলিল, 'উঃ, খুব লেগেছে তো! কিন্তু শোনো তপন, আলো দেখ্‌ছিলে তো? দেখ, আলো আর নেই। এ সমস্তই ভূতুড়ে ব্যাপার—আমারও ও-রকম হ'য়েছিল।'

তপন ঘাড় কাৎ করিয়া বলিল, 'কি—তোমারও?'

'কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁত বা'র ক'রে হাস্‌ছ যে?'

তার পর একটু থামিয়া মাথায় একবার হাত বুলাইয়া সে বলিল, 'দেখ

তপন, সম্মুখের ঐ তেঁতুল গাছটা দেখ্‌ছ তো? ঐখানে একজন লোক গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল।'

তপন বলিল, 'আমার কিন্তু কিছুই ভয় লাগ্‌ছে না ভাই, তুমি যা-ই বলো!'

শশী এই কথায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল, 'এসো ঘুমোই গে, রাত অনেক হ'য়েছে। দেখ, দেখ—আলো আবার জ্বল্‌ছে।'

ইট খাইয়া তপনের ভয় ভাঙিয়া গিয়াছে—সে বলিল, 'তুমি যাও ভাই, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি।'

শশী একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পর বলিল, 'আচ্ছা, থাকো। আমি চল্‌লাম।'—এই বলিয়া শশী বোর্ডিংএর ঘরগুলির মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

*　　　*　　　*

তপন সেই ছাদের আলিসার পাশে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকারের মধ্যে কে যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—'বাঁবু, ওঁ বাঁবু!'

তপন চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—'কে রে?'

'আজ্ঞে, আমি ফটিকচাঁদ!'

তপন বুঝিতে পারিল না; ফটিকচাঁদ বলিয়া কাহাকেও সে চেনে না। চিনিবার কথাও নহে—কেননা সে নূতন আসিয়াছে। বলিল, 'কে ফটিকচাঁদ!—কি চাও।'

অন্ধকারের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, 'আজ্ঞে দয়া ক'রে একবার আমার কাছে আসুন।'

'আচ্ছা, যাচ্ছি'—বলিয়া তপন পথ ছাড়িয়া পাশের ফুলবাগানে নামিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া সে দেখে তাহাদের বোর্ডিংএর চাকর ফটিকচাঁদ—সে তাহাকে চেনে কিন্তু নাম জানে না। তপনের ভয় ভাঙিয়া গেল—সে বলিল, 'তুই এখানে?'

'আজ্ঞে বাবু, আগিয়ে এসে দেখুন।'

তপন একেবারে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, একখানি বাঁশের সঙ্গে

কাপড় দিয়া তাহার হাত-পা খুব শক্ত করিয়া বাঁধা। যেন তাহাকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তপন নীচু হইয়া বসিয়া তাহার হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল। লোকটি গা-হাত ঝাড়িয়া উঠিয়া তপনের পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিল, বলিল, 'বাবু, দুঃখের কথা কি বল্‌ব? ওনারা নিত্যি নিত্যি নারকেল পাড়্‌বে—আর আমাকে নিত্যি নিত্যি ভয় দেখাবে, মার্‌বে, বেঁধে রাখ্‌বে। কেন রে বাপু! আমি গরীব লোক, খেটে খাই—আমি আর এখানে কাজ কর্‌তে পার্‌ব নি বাপু!'

তপনের কাছে এইবার সমস্ত রহস্য স্পষ্ট হইয়া গেল। সে বলিল, 'যা, তুই পালিয়ে তোর ঘরে যা'—এখন আর বেশী কেঁউমেঁউ করিস্ নে।'

লোকটি ঘাড় কাৎ করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল যে সে সব কথা এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিল—এইবার সব সে প্রকাশ বাবুকে বলিয়া দিবে।

*　　　*　　　*

ফটিকচাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া তপন আগাইয়া চলিল। বাহিরের বাগানে যাইবার গেট—দেখিল গেটে তালা লাগানো। নিশ্চয়ই ইহারা পাঁচীল টপ্‌কাইয়া গিয়াছে। পাঁচীলের খাঁজের উপর পা রাখিয়া তপন যেমনি উঠিতে যাইবে, অমনি আবার একখানি ইট বোঁ করিয়া তাহার কানের পাশ দিয়া আসিয়া পাঁচীলে লাগিল। তপন ভীত হইল না, পাঁচীলের খাঁজে পা দিয়া পাঁচীল টপ্‌কাইয়া বাহিরের বাগানের মাঠে আসিয়া পড়িল। বিপদের শেষ নাই—মাঠে আসিয়া পড়িতে না পড়িতেই আচম্‌কা কে যেন কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে ছোট্ট একটু ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। তপন নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার আগেই সে একেবারে তপনের বুকের উপর উঠিয়া বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। তপন চক্ষের নিমেষে যাহা দেখিয়া লইল, তাহাতে সে একটুও অপ্রস্তুত হইল না; দেখিল, যে গলা চাপিয়া ধরিয়াছে সে শশী—যে শশী তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে—বন্ধুত্ব দেখাইয়াছে, তাহারই এই কাণ্ড! তপন কৌশলে তাহার গলা ছাড়াইয়া লইয়া শশীর মাথা লক্ষ্য করিয়া একটি প্রকাণ্ড ঘুঁসি লাগাইতেই শশী

তপন, সম্মুখের ঐ তেঁতুল গাছটা দেখ্‌ছ তো? ঐখানে একজন লোক গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল।'

তপন বলিল, 'আমার কিন্তু কিছুই ভয় লাগ্‌ছে না ভাই, তুমি যা-ই বলো!'

শশী এই কথায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল, 'এসো ঘুমোই গে, রাত অনেক হ'য়েছে। দেখ, দেখ—আলো আবার জ্বল্‌ছে।'

ইট খাইয়া তপনের ভয় ভাঙিয়া গিয়াছে—সে বলিল, 'তুমি যাও ভাই, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি।'

শশী একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পর বলিল, 'আচ্ছা, থাকো। আমি চল্‌লাম।'—এই বলিয়া শশী বোর্ডিংএর ঘরগুলির মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

* * *

তপন সেই ছাদের আলিসার পাশে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকারের মধ্যে কে যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—'বাঁবু, ওঁ বাঁবু!'

তপন চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—'কে রে?'

'আজ্ঞে, আমি ফটিকচাঁদ!'

তপন বুঝিতে পারিল না; ফটিকচাঁদ বলিয়া কাহাকেও সে চেনে না। চিনিবার কথাও নহে—কেননা সে নূতন আসিয়াছে। বলিল, 'কে ফটিকচাঁদ!—কি চাও।'

অন্ধকারের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, 'আজ্ঞে দয়া ক'রে একবার আমার কাছে আসুন।'

'আচ্ছা, যাচ্ছি'—বলিয়া তপন পথ ছাড়িয়া পাশের ফুলবাগানে নামিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া সে দেখে তাহাদের বোর্ডিংএর চাকর ফটিকচাঁদ—সে তাহাকে চেনে কিন্তু নাম জানে না। তপনের ভয় ভাঙিয়া গেল—সে বলিল, 'তুই এখানে?'

'আজ্ঞে বাবু, আগিয়ে এসে দেখুন।'

তপন একেবারে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, একখানি বাঁশের সঙ্গে

কাপড় দিয়া তাহার হাত-পা খুব শক্ত করিয়া বাঁধা। যেন তাহাকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তপন নীচু হইয়া বসিয়া তাহার হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল। লোকটি গা-হাত ঝাড়িয়া উঠিয়া তপনের পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিল, বলিল, 'বাবু, দুঃখের কথা কি বল্‌ব? ওনারা নিত্যি নিত্যি নারকেল পাড়্‌বে—আর আমাকে নিত্যি নিত্যি ভয় দেখাবে, মার্‌বে, বেঁধে রাখ্‌বে। কেন রে বাপু! আমি গরীব লোক, খেটে খাই—আমি আর এখানে কাজ কর্‌তে পার্‌ব নি বাপু!'

তপনের কাছে এইবার সমস্ত রহস্য স্পষ্ট হইয়া গেল। সে বলিল, 'যা, তুই পালিয়ে তোর ঘরে যা'—এখন আর বেশী কেঁউমেঁউ করিস্‌ নে।'

লোকটি ঘাড় কাৎ করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল যে সে সব কথা এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিল—এইবার সব সে প্রকাশ বাবুকে বলিয়া দিবে।

* * *

ফটিকচাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া তপন আগাইয়া চলিল। বাহিরের বাগানে যাইবার গেট—দেখিল গেটে তালা লাগানো। নিশ্চয়ই ইহারা পাঁচীল টপ্‌কাইয়া গিয়াছে। পাঁচীলের খাঁজের উপর পা রাখিয়া তপন যেমনি উঠিতে যাইবে, অমনি আবার একখানি ইট বোঁ করিয়া তাহার কানের পাশ দিয়া আসিয়া পাঁচীলে লাগিল। তপন ভীত হইল না, পাঁচীলের খাঁজে পা দিয়া পাঁচীল টপ্‌কাইয়া বাহিরের বাগানের মাঠে আসিয়া পড়িল। বিপদের শেষ নাই—মাঠে আসিয়া পড়িতে না পড়িতেই আচম্‌কা কে যেন কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে ছোট্ট একটু ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। তপন নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার আগেই সে একেবারে তপনের বুকের উপর উঠিয়া বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। তপন চক্ষের নিমেষে যাহা দেখিয়া লইল, তাহাতে সে একটুও অপ্রস্তুত হইল না; দেখিল, যে গলা চাপিয়া ধরিয়াছে সে শশী—যে শশী তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে—বন্ধুত্ব দেখাইয়াছে, তাহারই এই কাণ্ড! তপন কৌশলে তাহার গলা ছাড়াইয়া লইয়া শশীর মাথা লক্ষ্য করিয়া একটি প্রকাণ্ড ঘুঁসি লাগাইতেই শশী

মাটিতে পড়িয়া গেল; তাহার পর সে আর উচ্চবাচ্য করিল না, কারণ সে বুঝিতে পারিল যে তপনের শরীর আয়তনে ছোট হইলেও, শক্তি তাহার চেয়ে অনেক বেশী।

শশী তাহার জামার ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, 'এইবার এস—এত দিনে তুমি আমাদের একজন হ'লে।'

তপন আগেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, 'না আমি তোমাদের কেউ হ'তে চাইনে, তোমরা ইতর।'

শশী হাসিল, বলিল, 'আমাদের একজন না হ'লে তোমার উপায় থাক্‌বে না। এই বোর্ডিংএ টিক্‌তে পার্‌বে না কিছুতেই।'

তাহার পর গম্ভীর হইয়া শশী বলিল, 'রাগ ক'রো না—রাগ কর্‌বার সময় এ নয়। আর বেশী রাত নেই। ছাদের উপরে সেদিন হরষিতকে ডাব খেতে দেখ নি! তুমিও তো সে ডাব খেয়েছ। কাজেই এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ তো!'

তপন হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'তোমাদের নারকেল পাড়ার বোধ হয় আজই ইতি। চাকরটার কি অবস্থা ক'রে এসেছিলে—তোমরা যে এত নিষ্ঠুর হ'তে পার এ ভাবতেই পারা যায় না।'

শশী বলিল, 'বেশী চেঁচিয়ো না, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো।'

শশীর সঙ্গে তপন মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। এতক্ষণ ধরিয়া যে সব ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহা যেন উভয়ের মধ্যে কেহই মনে রাখে নাই। এমনি ভাবে তাহারা পথ চলিতে লাগিল।

* * *

কোমরে একগাছি দড়ি বাঁধিয়া জোয়ান কৃষ্ণকুমার নারকেল গাছে উঠিয়া পড়িয়াছে। নীচে অনেক ডাব পাড়া হইয়াছে—হরষিত ঠিক ভূতের মত তাহার মধ্য হইতে কতক বা খাইয়াছে আর কতকগুলি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেছে। কৃষ্ণকুমার খুব সাবধানে দা দিয়া ডালসমেত কাঁদি কাটিয়া দড়িতে বাঁধিয়া বাখ্‌ড়ার উপর দিয়া ঝুলাইয়া নীচে নামাইয়া দিতেছে—তাহারই অসাবধানতায় মাঝে মাঝে দুই একটি ডাব ধুপ্‌ধাপ্‌ করিয়া নীচে আসিয়া পড়িতেছে। হরষিত সাম্‌লাইতে

পারিতেছে না—সে একবার ছুটিয়া এদিকে যায়, আবার ছুটিয়া ওদিকে যায়, আবার ছুটিয়া এদিকে আসে। তবু যতটুকু সে পারে চেষ্টা করিতেছে।

হরষিত শশী আর তপনকে আসিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আরে, এই যে তপনও এসে পড়েছে দেখ্‌ছি—কাল তোমার ডাব খা'বার পালা, কেমন?'

হরষিত এত হাসিতেছে দেখিয়া তপন অবাক্ হইয়া গেল। তাহা হইলে সে কি এই সব ডাকাতী ব্যাপারের কিছুই জানে না!

শশী বলিল, 'হরষে, তপনকে আমাদের দলে ভর্ত্তি ক'রে নিলাম।'

হরষিত খচ্‌ করিয়া একটি ডাব কাটিয়া শশীকে দিল, বলিল, 'খাও।'

শশী তপনকে আট্‌কাইতে গিয়া অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াইয়াছে—বলিল, 'দে, খেয়ে ফেলি, তার পর অদৃষ্টে তো মার আছেই'—এই বলিয়া শশী ডাব ঢক্-ঢক্ করিয়া খাইয়া খোলাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিল।

ধুপধাপ করিয়া নীচে পড়িতেছে

হরষিত সদাপ্রফুল্ল, সে তপনকে বলিল, 'তুমি খাবে?'

তপন বলিল, 'দাও খেয়ে ফেলি, মার তো খেয়েইছি—না হয় আরও মার খা'ব।' তপনও ঢক্ ঢক্ করিয়া একটি ডাব খাইয়া ফেলিল।

তখন, কেষ্ট, তপন, শশী ও হরষিত এই চারজনে মিলিয়া ডাবের কাঁদি ঘাড়ে করিয়া বোর্ডিংএর দিকে চলিতে লাগিল। ফটিকচাঁদ আর ঘরে যায় নাই। সেই ভোরবেলায় প্রকাশ বাবুর ঘরের সম্মুখে বসিয়া ছিল। কেষ্ট ভাঙা গলায় বলিল, 'কে ফট্‌কে, তুই এখানে?'

'আজ্ঞে, আপনারা আমাকে আজ যে কষ্ট দিয়েছ, তা আমার ছিরটা কাল মনে থাক্‌বে।'

হরষিত বলিল, 'কষ্ট কিসের? নে ডাব খা'—বলিয়া খচ্‌ করিয়া তাহাকেও একটি ডাব কাটিয়া দিল।

মাথা চুলকাইয়া ফটিকচাঁদ বলিল, 'আজ্ঞে বাবু, ডাব? মাষ্টার বাবুকে—'

শশী বলিল, 'ধেৎ, তোর নিকুচি—ডাব খেয়ে ফেল, সব ভুলে যাবি।'

তখন ফটিকচাঁদ ব্যাকুল হইয়া ডাব খাইয়া ফেলিল। আহা, তাহাকে দেখিলে সত্যই কষ্ট হয়! তপন বলিল, 'তোমরা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায় করেছ।'

সকলে সমস্বরে বলিল, 'কেন?'

'ওকে রাত্রে ঠাণ্ডায় হাত-পা বেঁধে ও অবস্থায় ফেলে রাখা তোমাদের খুবই অন্যায় হ'য়েছে।'

সত্যই অন্যায় তাহাদের হইয়াছে—তাহারা আর কি বলিবে, চুপ্‌ করিয়া রহিল। শুধু কেষ্ট মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, ওকে আর একটা ডাব?'

ফটিকচাঁদ বলিল, 'থাক্‌ বাবু, আর দরকার নেই। আপনারা খেয়ো।'

* * *

এমন সময়ে প্রকাশ বাবু খড়ম পায়ে দিয়া ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। তিনি রোজ ভোরবেলাতেই উঠেন। বাহিরে আসিয়া ছেলেদের ও চাকরের মাঝখানে ডাবের কাঁদি দেখিয়া বলিলেন, 'কিরে, ব্যাপার কি?'

সকলেই মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, 'আজ্ঞে স্যার!'

তপনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রকাশ বাবু বলিলেন, 'তুমিও?'

তপন মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফটিকের হাতে তখনও ডাবের খোলা—সে এমন লোভী, যে খোলার একদিক্‌ ভাঙিয়া তাহাই দিয়া শাঁস বাহির করিয়া খাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রকাশ বাবু হাসিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, 'ফট্‌কেও ছিল না কি এর মধ্যে?'

কেহ-ই হাঁ কি না—কিছুই বলিল না।

মুখ গম্ভীর করিয়া প্রকাশ বাবু বলিলেন, 'ডাবগুলো ভাঁড়ার-ঘরে নিয়ে যা রে! আর, তোমরা উপরে যাও! এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হ'বে?'

সকলে একে একে উপরে চলিয়া গেল।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

"ব্যাপারটা এই: অন্ধকারে গলিপথে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি একদল লোক সাম্‌নের ছোট্ট আর একদল লোককে তেড়ে চলেছে, আর পেছনের দলে রয়েছে আমাদের এই তারকেশ্বর ভায়া—আমার বহুকালের চেনা বন্ধু। অবাক্‌ হয়ে গেলাম—তারকেশ্বর এখানে কেন? তার পরেই মনে পড়ল—ওঃ হো, ওই তো 'মেঘপুষ্প' ছবিখানার ডিরেক্টার, নিশ্চয়ই ফিল্‌মের কাজে কাশী এসেছে। কিন্তু বায়োস্কোপের আর্ট্‌ ছেড়ে সত্যিকারের বীরের পার্ট্‌ ও কেন নিলে সেটা জানবার ইচ্ছা থাকলেও তখন আর জানা গেল না, বাবা বিশ্বনাথের একটি সুপুষ্ট বাহনের কৃপায়।

"বাড়ী ফিরে এলাম; ঠিক জানতাম আজ যে সব কাণ্ড করে এসেছি তার পর রামদয়াল, অশনিকান্ত এবং বাসুর দল আর সহজে আমায় নিষ্কৃতি দিচ্ছে না। বাসুর সঙ্গে এর পর থেকে এক ঘরে রাত কাটানো আমার পক্ষে 'সসর্পে চ গৃহে বাসের'ই সামিল হবে তাই সেই রাত্রেই ওঁকে ডাকবাংলায় চালান করে, নিজেও গোপনে চলে এলাম ম্যানেজারের কামরায়। আপনারা শুনে হয়তো আশ্চর্য্য হবেন, সেই রাত্রেই আমার 'জাপানী-লীলা' ঘোচাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল! কিন্তু যাক্‌—সে অন্য কথা।

"পরদিনই সিনেমা-হাউসে খবর নিয়ে তারকেশ্বরের সঙ্গে তার হোটেলে গিয়ে দেখা করা গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাল সন্ধ্যার পর জনা কয়েক লোককে খুব জোরসে তাড়া করে যাচ্ছ দেখ্‌তে পেলাম। কেন হে?'

"তারকেশ্বর বল্‌লে, 'ওঃ, দেখেছেন নাকি আপনি? একটা পুরানো অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার ছিল, তাই!'

"উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রকম? প্রতিশোধটা কিসের?'

"'আরে মশাই, সে আজ কিছুদিন আগেকার ঘটনা, জীবনে সেই প্রথম কাশী এসেছি; একটা পানের দোকানের সাম্‌নে আমি আর আমার দুই বন্ধু পান কিনতে কিনতে আলাপ করছি—আজ অমুক অমুক জায়গা দেখ্‌তে হবে—রামকৃষ্ণ মিশন, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে এক টঙ্গাওয়ালা পাকড়াও করল, আমাদের সোয়ারী করে সে সব কিছু দেখিয়ে দেবে। লোকটার হাবভাব কেমন সুবিধার ঠেকল না, তবু তিন তিন জন জোয়ান মরদ, ভয় খাব কেন, ওরই গাড়ী ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। ইউনিভার্সিটি ঘুরে ঘুরে দেখবার পর মনে হল গাড়োয়ানটা যেন ইচ্ছা করেই শুধু শুধু দেরী করছে, অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে না আসা পর্য্যন্ত ওর যেন বাড়ীমুখো হবার মৎলবই নেই।

"'দিব্যি রাত হয়েছে; নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে আমরা টঙ্গা চড়ে বাড়ী ফিরে আসছি—আমি আর আমার সেই দুই বন্ধু। মেঘপুষ্প ছবিখানা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে এগোচ্ছি, অশনি বাবুর অভিনয় কেমন সুন্দর হয়েছে সেই কথাই বলছি, হঠাৎ কে একজন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ার রাশ চেপে ধরল, আর সেই মুহূর্ত্তেই চেয়ে দেখি অনেকগুলো লোক ছোরা হাতে আমাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। যে লোকটা ঘোড়ার রাশ চেপে ধরেছিল, দেখা গেল সে আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা নয়—সকালে আমাদের পান কেনবার সময় হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে দোকানীর সঙ্গে ভেতরে একত্র কিছুটা সময় কাটিয়ে গেছ্‌ল। আর আমাদের গাড়োয়ানটার ব্যবহারেও মনে হল, এই ঘটনাটির জন্য এতক্ষণ সে শুধু প্রস্তুত নয়, একেবারে যেন উদ্‌গ্রীবই হয়ে রয়েছিল। বুঝ্‌লাম সমস্ত জিনিষটাই একটা প্রকাণ্ড চক্রান্তের ফল, আর সেই চক্রান্তের হেড-অপিস হচ্ছে গোধুলিয়ার ওই পানের দোকানটি।...সাবাড় আমরা তক্ষুণি হয়ে যেতাম, কিন্তু রাখে হরি মারে কে? জানেন বোধ হয় যে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে বহু বাঙ্গালী ছাত্র পড়ে—আর তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। হপ্তায় একদিন তারা বায়োস্কোপ দেখ্‌তে সহরে আসে, এক-এক দলে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন ছেলে—সব বাইকে চড়ে। সেদিন ছিল এমনই একটা দিন, বায়োস্কোপ দেখে ওরা হোষ্টেলে ফিরে আস্‌ছিল, পথে গুণ্ডার অত্যাচার দেখে একসঙ্গে সবাই নেমে পড়ল। তার পর মশাই, বাইক থেকে পাম্প্‌ খুলে নিয়ে ব্যাটাদের যা পিটুনি! এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হাতুড়ি-পেটা শরীর, দু' মিনিটে বাছাধনদের সর্ষে ফুল দেখিয়ে তবে ছাড়লে!

"'ওঃ, এই অত্যাচারেরই প্রতিশোধ? তাই বুঝি কাল ওদের ফাঁদে ফেল্‌বার মৎলবে আগে হতে সব আটঘাট বেঁধে দু'টি সাকরেদকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে পান কিন্‌তে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"তারকেশ্বর হেসে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কিন্তু ফল বড় বেশী পাওয়া গেল না। তাড়া খেয়ে

ওরা একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু তার পরই যেন কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাস্তার ধারে সদর দরজাটা ভিন্ন সে ঘরে আর দ্বিতীয় জানলা-দরজা যে ছিল না তা আমরা বেশ করে লক্ষ্য করেছি।'

"'হুঁ; আচ্ছা অশনি মিত্তির কাশী এসেছে জানি, সে কোথায় আছে বল্‌তে পার?'

"'শুনেছি তার দেশের কে একজন এখানে নাকি পাণ্ডাগিরি করে, তারই বাড়ীতে অতিথি আছে। তবে সেটা কোথায় তা বল্‌তে পারি না, পাণ্ডা মহারাজের সঙ্গে আমার তো আর কোন দিন সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নি!'

"বাড়ী ফিরে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে ভাব্‌তে বসলাম। রাস্তার দিক্‌কার সদর দরজাটা ছাড়া ঘরে আর কোন দোর জান্‌লা নেই, তারকেশ্বর বলেছে। তা হ'লে লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল কোন্‌ পথে? হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি অবশ্যই। নিশ্চয়ই তা হ'লে ঘর থেকে গোপনে সরে পড়বার কোন একটা গুপ্ত ব্যবস্থা আছেই। বাইরের কোন লোকের তা ধরবার উপায় নেই, আর সে সঙ্কেত জানাও বাইরের কারো পক্ষে অসম্ভব। সমস্ত রহস্যটার শুধু এই একমাত্র সমাধানই হতে পারে। আর সব দিক্‌ ভেবে দেখতে গেলে এ ধরণের একটা ব্যবস্থা থাকার কথাও বটে! যে সাধু ব্যবসা এতদিন ধরে সহরের বুকে ওরা চালিয়ে আস্‌ছে তাতে, যে কোন দিন যে কোন মুহূর্ত্তে পুলিসের লোকের পক্ষে বাড়ী ঘেরাও করা সম্ভব এটা কি আর ওরা ভেবে দেখে নি? সেক্ষেত্রে পলায়নের একটা ব্যবস্থাও কি আর করে রাখে নি? নিশ্চয়ই তা হলে অন্য কোন গলির সঙ্গে এ ঘরটার সংযোগ আছে; আমার উচিত হবে সেদিকেই নজর রাখা।

"গাড়োয়ানটার আস্তানার সন্ধান নিয়ে বাস্তবিকই কাজ আমি অনেক খানি এগিয়ে রেখেছিলাম। তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতেই টের পেলাম, রোজই সন্ধ্যার পর গঙ্গার ধারে একটা পানের দোকানে সে এসে উপস্থিত হয়, তার পর আর একজনার কাছ থেকে দোকানের জিম্মা নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে। রাত বারটা-একটার সময় আবার তাকে ছুটি দিয়ে দোকানে বসে এসে আর একজন। অত রাত্রে ও তল্লাটে একটি খদ্দেরকেও দোকানের দিকে ঘেঁষতে দেখি নি; দু' পয়সা দামের দোকান, চুরীর ভাবনাও নেই, অথচ তা সত্ত্বেও কেউ-না-কেউ অষ্ট প্রহরই সেখানে পাহারা রয়েছে। মনে মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগ্‌ল—এটা কি ঘাঁটি আগ্‌লাবার বন্দোবস্ত, অর্থাৎ প্রধান আড্ডা থেকে রাস্তায় বেরোবার এটাই কি গুপ্ত দরজা? দু'দিন বাদেই আমার সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে গেল; আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দোকানটির দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখি ভেতরে দ্বিতীয় একটি লোকের আবির্ভাব হয়েছে। আমার সুমুখ দিয়ে সে ভেতরে ঢোকে নি, তবে এল কোথেকে? অনেকটা কাছে এগিয়ে দেখি, মেঝের উপর

একটা মাদুর বিছানো, আর তার এক পাশ দিয়ে ম্যান্‌-হোলের ঢাকনির একটা অংশ উঁকি মারছে। সমস্ত রহস্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

"সেদিনই তারকেশ্বরের হোটেলে গিয়ে আমি আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা করলাম। একখানা চিঠি তৈরী করা হ'ল—আসান-সরাইএর 'নীলকুঠি' থেকে কেউ যেন আমায় খবর দিচ্ছে যে, তার জিম্মায় যে বিশেষ দামী জহরৎটা আছে সেটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার; কেননা যে কোন মুহূর্ত্তে সেটা লুঠ হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা দাঁড়িয়েছে। আসলে কিন্তু এ সমস্তই একেবারে ভুয়ো—আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটা ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। ডাকে এ চিঠিখানা যখন আমার নামে সুমিত্র-নিকেতনের ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছুবে তখন নাথ্‌নি নিশ্চয়ই ওখানা করায়ত্ত করতে ভুলবে না; তাকে ওঁই রকমই শিখিয়ে দেওয়া আছে কিনা! আর চিঠি নাথ্‌নির হাতে পড়ার মানেই রামদয়ালদের হাতে পড়া; তারা আলগোছে ওখানা খুলে খবরটুকু জেনে নেবে, আমার হাতে চিঠি এসে পৌঁছোবার অনেক আগেই। ওদের চরিত্র আমার খুব ভাল-মতই জানা আছে; এ লোভ সম্বরণ অসম্ভব—চিঠি পড়বার পর যত শীগ্‌গির সম্ভব দলবল নিয়ে ওরা নির্ঘাৎ আসান-সরাই রওনা হয়ে যাবে 'নীলকুঠি' লুঠ করে জহরৎটি ট্যাকস্থ করবার সদভিপ্রায়ে। যে ক'টি লোককে আড্ডা পাহারার জন্য এখানে না রেখে গেলেই নয়, তারাই শুধু থেকে যাবে কাশীতে। সেই সুযোগে পেছন দিক্‌কার গুপ্ত পথে, অর্থাৎ পানের দোকান দিয়ে, ওদের আস্তানায় গিয়ে পৌঁছুতে আমাদেরও আর কোন বেগ পেতে হবে না। বাস্তবিকই যে বেগ বেশী পেতে হয় নি তা আপনারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছেন।"

হুকা-কাশি থামিলেন। তারকেশ্বর একটু চোখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনি ওদের বলেন ধড়িবাজ, কিন্তু সত্যিকার ধড়িবাজীতে আপনি যে ওদের শ্রীগুরুদেব!"

হুকা-কাশি হাসিলেন, বলিলেন, "শেষ দিক্‌টায় কিন্তু শ্রীগুরুদেবও প্রায় ফেল মেরেছিলেন আর কি! ভালুক দেখে বাস্তবিকই আমি ভড়কে গেছ্‌লাম, রণজিৎ বাবু বলে গোড়াতে চিন্‌তেই পারি নি; মানে, মানুষ যে মানুষকে অমন পিশাচের মত যন্ত্রণা দিতে পারে তা ভাবতে পারি নি। মাত্র দু'হাত দূরে ও মূর্ত্তি দেখে সত্যিই স্বীকার করছি আমার বুকের ভেতরটা একদম বসে গিয়েছিল। শুনেছিলাম—অবশ্য কখনও পরীক্ষা করি নি—যে বুনো জানোয়ারের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাইতে পারলে ওরাও বেশ একটু ঘাবড়ে যায়। সে চেষ্টা করতে গিয়েই একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম—ভালুকের চোখ দুটোতে পলক বলে কোন জিনিষ নেই, তারা দুটো একেবারে স্থির, কোন দিকেই তাদের গতি নেই—ঠিক যেন কাচের চোখ! আস্তে আস্তে হাত দুটোর পানে তাকিয়ে দেখি, নিতান্ত অসাড়ের মত সে দুটো ঝুল্‌ছে, এদিক্ ওদিক্ কোনদিকেই তিলমাত্র নড়্‌ছে না। হাত দিতেই বোঝা গেল এও কৃত্রিম হাত! কেবল পা দু'টো বাস্তবিকই ঠিক

আছে। তৎক্ষণাৎ আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল—নকল ভালুকের কাঠামোর ভেতর একটি আস্ত মানুষকে পূরে রাখা হয়েছে। তার চোখ বন্ধ, কান বন্ধ, মুখ বন্ধ, এবং যত দূর মনে হয় হাত দুটোও দড়িতে বাঁধা। দিনের পর দিন এই ভাবে চলেছে—ভাবুন দেখি কি ভীষণ শাস্তি! বুঝ্‌লাম এই আমাদের রণজিৎ বাবু। শয়তানগুলোর মাথা আছে স্বীকার করতেই হবে, দরকার মাফিক্ ওঁকে আর কোথাও পাঠাতে হলে এই তো সেরা ব্যবস্থা—গোলমাল, চেঁচামেচির এতটুকু আশঙ্কা নেই, বাইরের কারো মনে এতটুকু সন্দেহ ঘটবার হেতু নেই, কেননা ব্যবসার খাতিরে, নাচ দেখিয়ে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে ভালুক তো লোকে হরদমই পুষে থাকে! তাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নেওয়া হবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে। কী পাষণ্ডের কবলেই না আপনি পড়েছিলেন রণজিৎ বাবু!··· ···ভাল কথা, সলিল বাবু, সন্তোষ বাবু, আপনারা তো শ্রীপুরে ফিরে যাচ্ছেন, সোনার হরিণটা আপনাদের সঙ্গেই দিয়ে দিই না কেন?"

ঠিক যেন কাচের চোখ!

"না না না, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে; কর্ত্তা আপনাকে দেখবার জন্য কাল থেকে আকুলি-বিকুলি করছেন।" সন্তোষ জবাব দিল।

"ওঃ, মিষ্টার বাসুর কথা তাঁকে বলেছেন নাকি?"

"না, এখনও তা বলা হয় নি।"

হুকা-কাশি একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আর বলেই বা কি হবে, বাসুকে কি আর দেখ্‌তে পাবেন বলে আশা করেন? একে শিকাগো-ফেরৎ লোক, তাতে আবার নাকি হলিউডে

থেকে পাকা ওস্তাদ্‌দের কাছে ছদ্মবেশ ধরার আর্ট্ শিখে এসেছে ; শেষ রাত্রে ওদের কাছে যেই সমস্ত ব্যাপার শুন্‌তে পাবে অম্‌নি হয়তো এক লোটা-কম্বল নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে কোথাও সরে পড়বে—তাকে চেনে কার সাধ্যি ! তার পর হয়তো কিছুদিন বাদে আবার আমেরিকা—আবার ভাগ্যান্বেষণ !”

“আর বাদ বাকী গুণ্ডাগুলো ? অশনিকান্ত ?” সন্তোষ সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল্।

“বেনারস-পুলিশের কাছে তো তার করে দিয়েছি, দেখা যাক্ কদ্দূর কি হয় ? কে ও অমৃত নাকি ? বাবুদের খাওয়ার বন্দোবস্ত কর্‌ছ তো ! এঁরা কিন্তু এ-বেলা এখানেই খেয়ে যাবেন !”

সমাপ্ত

প্রাথমিক সাহায্য বা ‘ফার্ষ্ট্ এড্’

[অগ্নিকাণ্ডে]

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ., বি. এস্-সি, বি. ই. এস্)

বাড়িতে একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।

ছেলেরা ফুলঝুরি পোড়াচ্ছিল। চার বছরের রুণু তার ফুলঝুরিটা নমিতার (দশ বছরের) সাড়ীর ঠিক পেছনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল ; ফলে হঠাৎ সাড়ীটা ধরে উঠে। ছেলেরা তো হাউ-মাউ চীৎকার স্বুরু করে দেয়। ভাগ্যিস্ পাশের ঘরে অম্বিকা দাদা ছিল ; সে তাড়াতাড়ি এসে নমিতাকে মাটিতে ফেলে দেয় (আগুন উপরে রেখে), এবং একটা বালিস চাপা দিয়ে আগুনটাকে নিভিয়ে ফেলে। সাড়ীটা একটু. পোড়া ছাড়া শেষ পর্য্যন্ত বেশী কিছু ক্ষতি হয় নি। তার পরেই ঘোরতর জটলা চলছিল।

অমি বললে, ‘অম্বিকা দা’র কিন্তু ভাই, খুব প্রত্যুৎপন্নমতি’ !

শিবু জিজ্ঞাসা করলে, ‘প্রত্যুৎপন্নমতি জিনিষটা কি রে ?’

অমি বোঝাল, ‘এই যে তাড়াতাড়ি একটা বালিস চাপা দিয়ে আগুন নিভান—এটাই হচ্ছে একটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দৃষ্টান্ত। এই যে আমরা এত জন

এখানে ছিলুম এবং বালিসও কাছে ছিল, কিন্তু কই, কারও তো ঘটে এ বুদ্ধিটুকু আসে নি !’

একজন জিজ্ঞাসা করলে, ‘আচ্ছা, অম্বিকা দা’, তোমার এত প্রত্যুৎ—কি বল্লে ?’

‘প্রত্যুৎপন্নমতি’

‘হ্যাঁ, প্রত্যুৎপন্নমতি কি ক’রে হ’ল ?’

অম্বিকা দা’ হাসতে হাসতে বল্লে, “প্রত্যুৎপন্নমতি—সহজ বুদ্ধি, যাকে ইংরেজীতে বলে ‘কমন্ সেন্স’ কারও কারও সহজেই আসে, কারও চর্চ্চা করে শিখতে হয়। এই যে আজ আগুন নিভানর একটা পদ্ধতি তোমরা দেখলে এটা তোমাদের মনে গেঁথে গেল, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা হ’লে তোমরাও এর অনুকরণে কাজ করতে পারবে।’

নবীন অম্বিকা দা’র প্রায় সমবয়সী, একটু ভীতু আর অতিরিক্ত হিসাবী ছেলে। অম্বিকা দা’র এত খাতিরে তার একটু যে হিংসাও না হচ্ছিল এমন নয়। সে বল্‌লে, ‘এই দেখ, বালিসটা পুড়ে গেছে ; এক টাকা দেড় টাকা লোকসান গেল !’

অম্বিকা দা’ এবার চটে উঠে বলল, ‘তুই-আহাম্মকের একটুও গণিত-বুদ্ধি নেই। মেয়েটা যদি বেশী পুড়ে যেত তা হ’লে ডাক্তার আর ওষুধের পেছনে কত খরচা হ’ত বল্ দেখি ! আর তার জীবনটার চেয়ে তোর ঐ দেড় টাকা দামের বালিসটাই হ’ল বেশী ?’

তার পর অম্বিকা দা’ বলে চল্‌ল, ‘আগুন জিনিসটা প্রথম মুহূর্ত্তে থাকে একটা কড়ে আঙ্গুলের মাথার মত ছোট ; দ্বিতীয় মুহূর্ত্তেই সে হয়ে যায় একটা হাতের মুঠোর মত ; তৃতীয় মুহূর্ত্তে সে একটা লোকের মাথার মত বড় হয়, এবং অবশেষে সুযোগ পেলে প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর মত বড় হয়ে উঠতে পারে। বহুকাল হ’ল কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা কাঠের গোলায় আগুন লেগেছিল। আমার মনে আছে তার শিখা উঠেছিল তেতালা বাড়ীর মত উঁচু হয়ে। নিমতলার আগুন তার চেয়েও বড় হয়েছিল।

‘আগুন যখন ছোট থাকে তখন তাকে নিভান সোজা। দীপশিখা ফুঁ দিয়েই নিভান যায়। তার চেয়ে বড় আগুনকে হাত দিয়ে চড় মেরে নিভাতে হয়।’

অনু বললে, 'হ্যাঁ, সেদিন কুটুর কাপড়ে আগুন লেগেছিল, মা তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চেপে সে আগুনটাকে নিভিয়ে দিলেন। মায়ের হাত অবশ্য একটু ঝলসে গিয়েছিল'।

অম্বিকা দা' বললে, 'মায়ের এই কাজটাকেও প্রত্যুৎপন্নমতির ভাল উদাহরণ বলা যেতে পারে। লোকের সব চেয়ে কাছে থাকে তার নিজের হাত; মা যদি এক মিনিট বালিস খুঁজতে দেরী করতেন তা হ'লে মস্ত বিপদ্ ঘটে যেতে পারত। তিনি দেখলেন আগুনটা ছোট ; তাই হাত দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি শেষ করলেন। তাঁর কিছু কষ্ট হ'ল বটে কিন্তু কুটু একটা গুরুতর বিপদ্ থেকে অব্যাহতি পেল। দু'টো বিপদের মধ্যে ছোটটাকে নিয়ে যদি বড়টার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় তা হ'লে বুদ্ধিমান্ লোক ছোটটাই বেছে নেয়।

'আগুনটা যখন ছোট থাকে তখন হাতের কাছে যা জিনিস পাওয়া যায় তাই দিয়ে আগুন নিভাতে হবে। নিজের হাত, পা ও গা, খবরের কাগজ, বই, শতরঞ্চ মাদুর, কম্বল, লেপ, তোষক, বালিস, এ সবই ছোটখাট আগুন নিভাবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

'যদি কারুর কাপড়ে আগুন লাগে তা হ'লে তাকে, আগুন ওপরে থাকে এমন ভাবে মাটিতে শুইয়ে দিতে হবে। জ্বলন্ত আগুন উপরের দিকে শিখা বিস্তার করে। আগুনকে নীচে রেখে শুলে তার শিখা শরীরকেই দগ্ধ করবে। কাপড়ে আগুন লাগ্‌লে ছুটোছুটি করলে অতিরিক্ত বাতাস পেয়ে আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।'

একজন বল্লে, 'আচ্ছা, কেউ আগুনে পুড়ে গেলে কি করতে হবে ?'

একজন জবাব দিলে, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে হবে।'

একজন বললে, 'একটা গাড়ি করে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

আর একজন বললে, 'তাড়াতাড়ি য়্যাম্বুল্যান্সকে (ambulance) ফোন্ করতে হবে'।

অম্বিকা দা' বল্‌ল, 'এগুলো যা বল্‌ছ, কলকাতার মতন সহরে খাটে। এখানে

বাড়িতে দুর্ঘটনা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে ভাল সাহায্য পাওয়া যায়। পাড়ায় কোথায় কোথায় ডাক্তার ও ডাক্তারখানা আছে, কোথায় কোন হাসপাতাল আছে, কাছে কার বাড়িতে টেলিফোন্ আছে—এ সব খবর আগে থাকতে জেনে রাখলে দুর্ঘটনার সময়ে আর বাজে সময় নষ্ট হয় না। কিন্তু অনেক জায়গায় এ সুবিধা নেই। ধর তুমি বোধনায়' বেড়াতে গিয়েছ ; ঝাড়গ্রাম থেকে ৫।৬ মাইল দূরে শালবনের মধ্যে অল্প কয়েক ঘর লোক বাস করে। রাত্রে কেউ পুড়ে গিয়েছে, কাছে ডাক্তার বা ডাক্তারখানা নেই। সে-দেশী চাকররা বাড়ি থেকে রাত্রে নড়বে না—ভূত আছে ; বাঘ-ভালুক আছে, সাপ আছে। এমন অবস্থায় কি করবে? শুধু বসে থাকবারও উপায় নেই। চোখের সামনে ও দৃশ্য দেখলে যা-তা করতে ইচ্ছা হয় ; আর তুমি কিছু না করলেও আর পাঁচজনে নানান্ ব্যবস্থা করবে। এই সেদিন দেখি এক বাড়িতে একটি মেয়ে পুড়ে গেছে। বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। মেয়েটি ভীষণ কাঁদছে। চার-পাঁচজন মাতব্বর নানান্ ওষুধের ব্যবস্থা করছেন। একজন জোর গলাওয়ালা লোকের পরামর্শ মত এক তাল ডোবার কাদা যোগাড় করে মেয়েটির পোড়া জায়গার উপর প্রলেপ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে ; এমন সময় আমি গিয়ে থামালুম। অল্পস্বল্প পোড়ায় ডোবার কাদা লাগিয়ে হয়তো কোথাও বিশেষ কিছু অপকার না হ'য়েও থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষতটা বেশী উগ্র হ'লে তার মধ্যে দিয়ে ডোবার কাদার নানা রকম বীজাণু শরীরে ঢুকে বিশেষ অনিষ্ট ঘটাতে পারে।'

সবাই জিজ্ঞাসা করল, 'এমন অবস্থায় তবে কি করতে হবে ?'

'পোড়া ঘায়ে যাতে বাতাস না লাগে তার জন্য আহত স্থানকে তাড়াতাড়ি ঢাকতে হবে। যদি চামড়ার উপরটা আগুনের আঁচে শুধু লাল হয়ে যায় তবে ঐ জায়গার উপর ময়দা, খড়ির গুঁড়া, বার্লি বা পাউডারের গুঁড়া ছিটিয়ে দিয়ে তার উপর তূলা (Boric Cotton হ'লে ভাল হয়) চাপা দিয়ে নেকড়ার পটি আলগা ভাবে বেঁধে দিতে হবে এবং আহত লোকটিকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দজনক অবস্থায় রাখতে হবে। পুড়ে ফোস্কা পড়লে বা চামড়া পুড়ে কয়লার মত কালো হয়ে গেলে টুক্‌রো টুক্‌রো নেকড়া অলিভ, বাদাম, তিল, নারকেল, তিসি বা কড্‌লিভার তেলে বা ভ্যাসিলিনে ভিজিয়ে আহত জায়গার উপর প্রলেপের আকারে

প্রয়োগ করতে হবে। অন্য তেল না মিললে সর্ষে বা রেড়ীর তেল কড়াইতে করে আগুনে ফুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করে লাগান যেতে পারে। সমান ভাগ তিসির তেল এবং চূণের জল কিংবা নারকেল তেল ও চূণের জল একত্র ফেটিয়ে নেকড়ায় মাখিয়েও প্রলেপ দেওয়া যেতে পারে। ঐ প্রলেপের উপর তূলা চাপা দিয়ে নেকড়ার ফালি দিয়ে আলগা বাণ্ডেজ বাঁধতে হবে। এরূপ রোগীর যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে ভাবে গরম কাপড় চাপা দিতে হবে, এবং আবশ্যক হলে গরম জলের বোতলের সেঁক দিতে হবে। খেতেও দিতে হবে তাকে গরম তরল জিনিষ। এর পরের যা কিছু চিকিৎসা তা ডাক্তারকে দিয়ে করাতে হবে।

ছোটদের চিত্রশালা

সাপুড়ে

আলোকচিত্রশিল্পী : শ্রীনিত্যানন্দ প্রামাণিক

সাঁঝের খেয়া

শিল্পী : শ্রীপাচুগোপাল ঘোষ

সম্রাটের রাজ্যাভিষেক

গত ১২ই মে সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উৎসব খুব জাঁকজমকের সঙ্গে লণ্ডনের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার য়্যাবিতে সম্পন্ন হয়ে গেছে। এ উপলক্ষে সারা বৃটীশ সাম্রাজ্যে খুব ঘটা পড়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে প্রতিনিধিরা লণ্ডনে এসে অভিষেক-উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জ

বিরাট্ শোভাযাত্রা ক'রে রাজকীয় শকটে রাজদম্পতি য়্যাবিতে যান। শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিল হাজার হাজার লোক—নানা দেশের প্রতিনিধিবর্গ, এবং বিলাতের সম্ভ্রান্ত লোকেরা। মিছিল প্রায় দু' মাইল লম্বা হয়ে ছিল। রাস্তাঘাট খুব ঘটা করে এবং রাত্রে আলো দিয়ে সাজান হয়েছিল। লোকে যাতে ভাল করে উৎসব দেখতে পায় রাস্তায় রাস্তায় গ্যালারী তৈরী করে তার সুব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাজারাণী য়্যাবিতে উপস্থিত হলে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যে সিংহাসনে অভিষেক হয় সেটা বহু দিনের পুরানো—প্রথম এডোয়ার্ডের সময় থেকে চলে আসছে। সিংহাসনের নীচে একটা বড় পাথর আছে, তার নাম 'ভাগ্য-প্রস্তর।' এটার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে বাইবেলে বর্ণিত জেকব এই পাথরটা মাথায় দিয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। অভিষেকের পূর্ব্বে 'পুরোহিত' উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মতি নিয়ে রাজাকে শপথ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তার পর তাঁকে রাজবেশ পরিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর মাথায়, বুকে পবিত্র তেল স্পর্শ করিয়ে, হাতে একে একে রাজচিহ্নগুলি দেওয়া হয়। ঈগল পাখীর আকারের বড় একটা সোনার পাত্রে এই পবিত্র তেল থাকে। রাজচিহ্নগুলির মধ্যে ক্রুশ-চিহ্নিত রাজদণ্ড, হীরার আংটি, সোনার গোলক, তলোয়ার, সোনার স্পার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তার পর কয়েকজন 'পুরোহিত' ধরাধরি করে রাজার মাথায় অভিষেকের মুকুট পরিয়ে দেন; সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বিপুল জয়ধ্বনি হ'তে থাকে এবং লণ্ডন টাওয়ার থেকে তোপ পড়তে থাকে।

সম্রাটের অভিষেকের পর সম্রাজ্ঞীরও অভিষেক হয়। তাঁর হাতেও অনুরূপ পৃথক্ রাজচিহ্ন দেওয়া হয়, মাথায় দেওয়া হয় রাণীর মুকুট। এই মুকুটের মাঝখানে আছে বিখ্যাত কোহিনূর হীরা।

অভিষেকের পর আবার তেমনি শোভাযাত্রা করে রাজদম্পতি প্রাসাদে ফিরে আসেন। নানা জায়গা থেকে তাঁদের কাছে অভিনন্দন আসতে থাকে।

সম্রাট্ জর্জ্জের বয়স এখন প্রায় ৪২ বছর ; ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ অষ্টম এডোয়ার্ডের চেয়ে তিনি মাত্র দেড় বছরের ছোট। দু' ভাই একসঙ্গেই রাজোচিত শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যেমন জনপ্রিয় ছিলেন ইনিও যে তেমনই হবেন সে সম্বন্ধে কারও মনেই সন্দেহ নেই।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

বাঙ্গালী ব্যবসা বোঝে না বলে একটা বদ্‌নাম আছে। কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় থাকলে যে এ বদ্‌নাম অনায়াসে দূর করা যায় তার একটা উদাহরণ আজ তোমাদের দেব।

কে, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর বিস্কুট এবং বার্লির কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। এ ব্যবসায়ে এখন এঁদের দেশ-যোড়া নাম হয়েছে। অথচ এ কাজে কে, সি, বসু যখন প্রথম হাত দেন তখন এ ব্যবসার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। কে, সি, বসু জন্মেছিলেন আজ প্রায় ৭৫ বছর আগে—এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। অল্প বয়সেই পিতৃহীন হয়ে তাঁকে নানা অভাব-অনটনের মধ্যে মানুষ হ'তে হয়েছিল এবং অল্প বয়সেই চাকরীতে ঢুকতে হয়েছিল। কিন্তু বেশী দিন চাকরী করা তাঁর ধাতে সইল না, তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে অতি সামান্য টাকা নিয়ে ব্যবসায়ে নামলেন। প্রথম প্রথম অবশ্য তিনি সফল হ'তে পারেন নি, কিন্তু, তাঁর ছিল অসাধারণ অধ্যবসায় আর অবিচলিত মনের জোর। ব্যবসা তিনি ছাড়লেন না, এবং অবশেষে বার্লি-বিস্কুটের ব্যবসা সুরু করলেন।

ছেলেবেলায় তিনি দেখেছিলেন দেশী মতে যবের মণ্ড রোগীকে পথ্য হিসাবে দেওয়া হয়। আবার ঐ জিনিষই যখন সুদৃশ্য চেহারা নিয়ে সুদৃশ্য টিনে করে বিলাত থেকে আসে তখন আমরা বেশ চড়া দামেই তা কিনে নিই। বিলাতের মত আমাদের দেশেও কি ও জিনিষ ও ভাবে তৈরী হতে পারে না? তার পর বহু পরিশ্রম করে বিদেশী বই-টই ঘেঁটে তিনি তাদের প্রথা আয়ত্ত করলেন এবং তদনুযায়ী যন্ত্রপাতি তৈরী করিয়ে ফেললেন ; শ্যামবাজারে তাঁর ফ্যাক্টরী খোলা হ'ল। সে আজ ৫০ বছর আগেকার কথা। তাঁর তৈরী যন্ত্র এত চমৎকার হয়েছিল যে পরে বিলাত থেকে আনা যন্ত্রের তুলনায় তা একটুও খাটো বলে মনে হয় নি।

কে, সি, বসুর কারখানার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় তাঁর জিনিষের কাটতি আরও বেড়ে গেল, সর্ব্বত্রই তাঁর প্রশংসা হতে লাগ্‌ল। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আরও উন্নত ধরণের জিনিষ তৈরী করতে লাগলেন।

কে, সি, বসু আর একটা বড় কাজ করে গেছেন, শুধু বিস্কুট আর বার্লি তৈরী করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। আমাদের একটা ভুল ধারণা ছিল যে বার্লি বুঝি শুধু রোগীদেরই পথ্য। কিন্তু তাঁরই চেষ্টায় লোকে উপলব্ধি কর্‌ল যে শুধু রোগীদের পথ্য হিসাবেই বার্লির একমাত্র ব্যবহার নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এবং ছাত্রদের এ একটা আদর্শ পুষ্টিকর খাদ্য, প্রসূতির পক্ষেও ঠিক তাই। বস্তুতঃ ঠিক মত তৈরী করতে পারলে বার্লিকে বেশ একটা সুস্বাদু পানীয় বলা যেতে পারে। অনেকক্ষণ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর ক্লান্তি বা অবসাদ দূর করার পক্ষে এর আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। শুধু বিজ্ঞাপনের জোরে তিনি একথা প্রমাণ করেন নি, অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও একথায় সায় দিয়েছেন।

কে, সি, বসুর বার্লি জিনিষ হিসাবে সর্ব্বত্র সমাদর পেয়েছে—বহু শিল্পপ্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পেয়েছে। খাবার জিনিষ তৈরী করতে হ'লে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটা বড় জিনিষ। তাঁর কারখানায় কোন জিনিষ কাউকে হাত দিয়ে ছুঁতে দেওয়া হয় না। এটাও কম প্রশংসার কথা নয়।

সন্দেশ

কলিকাতার হকি খেলা এ বছরকার মত শেষ হইয়াছে, এখন ফুটবলের মরশুম পড়িয়াছে। হকির বড় খেলা 'বেইটন্ কাপ্ প্রতিযোগিতা' এবার বেশ জমকালো হইয়াছিল—ভারতের নানা জায়গা হইতে বিভিন্ন দল ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। 'ঝান্সী হীরোজ্' দলে পৃথিবী-বিখ্যাত ধ্যানচাঁদ ও রূপসিং খেলিতে আসিয়াছিলেন। তাঁরা ঢাকার আর্ম্মানীটোলাকে ১২ গোলে এবং কলিকাতার আর্ম্মেনিয়ান্‌কে ৩ গোলে হারাইয়া সেমিফাইনালে ২—১ গোলে ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স্ দলের কাছে হারিয়া যান। ফাইনালে বি-এন্-আর ভূপালকে হারাইয়া কাপ্ জয় করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় এবার একটা বড়দরের খেলা হইয়াছিল—একদিকে ছিলেন অলিম্পিক্ দল অর্থাৎ যে দল গেল বছর বার্লিনে অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া 'ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ন্' হইয়াছেন, আর একদিকে ছিলেন সারা ভারতের বাছাই-করা দল। খেলায় অলিম্পিক্ দল ৩—২ গোলে জয়লাভ করেন, কৃতিত্বটা অবশ্য ধরিতে গেলে ধ্যানচাঁদেরই। অলিম্পিক্ দলের চেয়ে অপর দলই কিন্তু ভাল খেলিয়াছিলেন।

এরোপ্লেনের একটা রেকর্ডের কথা বলি। মাসাকি ইনুমা এবং কেঞ্জি টুসুকাগোশি নামে দু'জন জাপানী টোকিও হইতে সম্প্রতি লণ্ডনে উড়িয়া গিয়াছেন। পথে কলিকাতার দম্‌দম্‌ ঘাঁটিতে তাঁরা নামিয়াছিলেন, তখন জাপানীরা সেখানে তাঁদের খুব ঘটা করিয়া অভ্যর্থনা করে। টোকিও হইতে ক্রয়ডন ঘাঁটি প্রায় ৯৯০০ মাইল; তাঁদের সময় লাগিয়াছে মাত্র ৯৪ ঘণ্টা ১৪ মিনিট। জাপানী খবরের কাগজ 'পাসাহি' ইহাদের খরচপত্র দিয়াছেন। প্লেনখানার নাম 'কামিকাজে' অর্থাৎ দৈব-বায়ু। জাপানে তৈরী জিনিষকে আর খেলো বলা চলিবে না, কারণ এখানা জাপানেই তৈরী।

* * *

গত ৬ই মে সন্ধ্যাবেলা পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জেপেলীন (উড়োজাহাজ) 'হিণ্ডেনবুর্গ' জার্ম্মানীর ফ্রিড্‌রিখ্‌সহাফেন হইতে আমেরিকার লেক্‌হার্ষ্ট ঘাঁটিতে আসিয়া পৌঁছান মাত্র তা'তে কোনও অজ্ঞাত কারণে আগুন লাগিয়া যায়। ৯৯ জন যাত্রীর মধ্যে অনেকেই মারা গিয়াছেন, কেউ কেউ মাটীতে পড়িবার কিছু আগে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণে বাঁচিয়াছেন—জেপেলীনখানাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই উড়োজাহাজখানা জার্ম্মানী হইতে আমেরিকায় যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিত। লম্বায় ছিল এটি ৮১৩ ফুট এবং সব চেয়ে চওড়া অংশে এর ব্যাস ছিল ১৩৫ ফুট।

* * *

আমরা যখন হাসি তখন আমাদের ১৩টি পেশী সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু যখন ভ্রূকুটি করি তখন সঙ্কুচিত হয় ৫০টি পেশী।

* * *

একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক লোকের শরীরে গড়ে প্রায় সাড়ে তিন সের রক্ত থাকে।

* * *

আমাদের যেমন ঘাম হয় গাছেদের শরীর হইতেও তেমনি জল বাহির হইয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এক-একটা বড় বট বা অশ্বত্থ গাছ প্রতিদিন প্রায় ২০।২৫ গ্যালন্‌ জল এইভাবে বাহির করিয়া দেয়।

* * *

৭১৪ খৃষ্টাব্দে পিকিং (তখনকার নাম) সহরে একখানি খবরের কাগজ বাহির হইয়াছিল। ইহাই বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র।

* * *

ফরাসীর ডিজন প্রদেশে মণ্ট এফ্রিকের উপর একটা আলোকস্তম্ভ আছে। পৃথিবীর মধ্যেই এইটিই বোধ হয় সব চেয়ে বড় আলোকস্তম্ভ। ৩০০ মাইল্‌ দূর হইতে এর আলো দেখা যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

লেছে, ছেলে ; ড়েছে, ছেড়ে ; মেনে, নেমে ; গেলে, লেগে ;
ছানা, নাছা ; রামা, মারা ; ড়িতা, তাড়ি ; কিনা, নাকি।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

রামেন্দু, দিব্যেন্দু, সুনন্দা দাশগুপ্তা (ভবানীপুর); সিতেন্দু সুনীলেন্দু, কন্দ গুপ্তা (স্বর্ণাসন—পাটনা); দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিখিল (জলপাইগুড়ি); বালুরঘাট বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ; নীলা মুস্তাফী (সারা); অরুণিমা রায় (ঢাকা, ফার্ম্ম); অনিল ও নির্ম্মলবরণ রায় (সাটীরপাড়া); সত্যানন্দ প্রামাণিক ও অচুন (চক্রধরপুর); দুর্গাপদ পাল, ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুগণ (বড়া); সুলতিকা, সুজাতা, সুপ্রিয়া পাল (করিমগঞ্জ); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমসেদপুর); কুমার বিমলেন্দু নারায়ণ ও কুমার শৈলেন্দু (জেমো—রাজবাটী); যুগলকিশোর মণ্ডল (নামকুম); আভা, অরুণ, বিমান (হাসনাবাদ); পুণ্যব্রত ঘোষ, পুর্ণিমা ঘোষ, রাণী প্রভৃতি (শিলচর); প্রশান্ত রায় ও জ্যোৎস্না রায় (কলিকাতা); ভাস্কর, গীতা, তুলো (যশোহর); প্রসূন রায় (নালন্দা); কুমার শক্তিপ্রসাদ গর্গ (মহিষাদল); দি ভৌমিকস্ (এল্‌গিন রোড্, কলিকাতা); অরুণ সেন (চট্টগ্রাম); রামানুজ সেন (লক্ষ্ণৌ); তারণ, তপেন, অনিকা প্রভৃতি (নিউ দিল্লী); শঙ্কর, ভাস্কর ফুলমাসিমা (ভবানীপুর); প্রভাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া); মাষ্টার পাঁচুগোপাল ঘোষ ও যামিনীকান্ত মণ্ডল (শ্যামনগর—নওয়াপাড়া); অশোক সিংহ রায়, মা ও ছোট খুড়িমা; নমিতা গাঙ্গুলী (কলিকাতা); দেবব্রত সেন, সুব্রত সেন, সত্যব্রত সেন (গোয়ালপাড়া); রণেন্দ্র, অমল ও কমল (ধুবড়ী); মানবেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা); অনামী (খড়দহ); মাষ্টার নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী); প্রফুল্ল, বিশ্বনারায়ণ, শিশির গুহ (যোগদাসঙ্গ—রাঁচি); অসিতকুমার সরকার (পুরুলিয়া); ভবানী, শিবানী, কল্যাণী সরকার প্রভৃতি (ধুবড়ী); রামপ্রসাদ সিং, কাটু, সুধীর প্রভৃতি (বেহালা); কল্যাণী, মিনাক্ষী, আমেনা প্রভৃতি (কলিকাতা); কালিদাস, শরৎচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর); সোনু, মোনু, মোহন প্রভৃতি (কলিকাতা); মায়া পাল, সুকুমার পাল, ক্ষিতীশ (উল্লাপাড়া—পাবনা); সমরেন্দ্রকুমার সেন (খড়্গপুর); দ্রৌপদী ওঝা, দীপ্তিভূষণ, মঞ্জুভূষণ দত্ত (বালুরঘাট); অনিল, অরুণ ও প্রীতি (রাজসাহী); মাষ্টার আব্দুল করিম (আলিপুরদুয়ার হাই স্কুল); জগন্নাথ বিশ্বাস (আলিপুরদুয়ার); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় ও কাজল মুখোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা); কুমার ব্রাদার্স এণ্ড সিস্‌টার্স (ভাট্টা—পূর্ণিয়া); ছায়া দেবী (রতনপুর); বিষ্ণুপদ স্মৃতিপাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা); সবিতা রায় (কুমিল্লা); যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র, সুধা, লতি প্রভৃতি

(পাটনা); লীলা দাস (কুমিল্লা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); মঞ্জু, সুটু, অশোক (ভবানীপুর); তরুণ, পীতু, মায়া (এল্‌গিন রোড্); হরিহর, গৌরী ও পুষ্প মজুমদার (ধুবড়ী); সমর, মণ্টু, লিলি প্রভৃতি (কলিকাতা); রমেন্দ্রনাথ রক্ষিত (রাজসাহী); সমীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি (জামসেদপুর); বিভূতি সরকার ও সুধাংশু পোদ্দার (মালদহ); রত্না দেবী (পাটনা); প্রমথ, বৌদি, ভূতু (মিথানী কোলিয়ারী); সুললিতরঞ্জন সেন ও প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় (মুড়াগাছা); দীনেন, ঝুনু, রুণু (নলহাটী); রিণা রায় (কালীঘাট); শম্ভু, বাবা ও রেজা (আজিমগঞ্জ সিটি); বেলা, সতী, তরুণ মজুমদার প্রভৃতি (পাতিহাল); পরমকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি (বাঁকুড়া); সান্ত্বনা ঘোষ, সাধনা ঘোষ ও মলয় (যশোহর); রমাপ্রসাদ মিত্র, দামু ও ছোট (কলিকাতা); অঞ্জলি চৌধুরী, শ্যামল, রিজু (কলিকাতা); বাণী চৌধুরী, কল্যাণ, জ্যোৎস্না (চট্টগ্রাম); সুশীল বিশ্বাস, বাবা, ফুল্লরা (কুমিল্লা); বাণী বোস, উমা, বুলী প্রভৃতি (চাইবাসা); কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); সুভাষকুমার রায় (বহরমপুর); অস্থিচক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ; রবীন্দ্র, বীরেন্দ্র, অমিয় প্রভৃতি (ঢাকা); মঞ্জিমমুকুল দত্ত (মেদিনীপুর); মনু ও গণেশ (লাহেরিয়াসরাই); শোভনাদি, আভাদি, সুনীল (চাঁদপুর); আশা নন্দী ও ডলি দত্ত (ধুবড়ী); শিবসাধন, নসু দুলু (বারদি); নরেশচন্দ্র গুহ বক্সী, মণীন্দ্র, মা-বাবা (বাথুয়াজানী); প্রতিমা, রঞ্জু, মীরা প্রভৃতি (কিশোরগঞ্জ); অনিল দাস ও সুধীর দাস (ভবানীপুর); তপন, বাচ্চু ও কালুদা (রেঙ্গুন); অরবিন্দ ঘোষ (কলিকাতা); অচলকুমার দত্ত (ভবানীপুর); মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা); সুনীল, সবিতা ও শোভা মজুমদার (চট্টগ্রাম); প্রমোদ ভট্টাচার্য্য, অনিল, অন্নদা প্রভৃতি (কালীকচ্ছ); করুণা, ভুতুমাষ্টার ও পেঁচু দা' (ওকড়া);

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

এ, কে, বাইন, মনোরঞ্জন, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি (চাঁদপুর); প্রসিত ও প্রদ্যোতকুমার বাগচী (বালুভরা)।

(আমরা কেবল মাত্র গ্রাহকদের নামই প্রকাশিত করি। গ্রাহকেরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁদের নামের সহিত অন্যান্য আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের নাম পাঠাইবেন না, এবং পাঠাইলে, সে নাম বাহির না হইলে, দুঃখিত হইবেন না।)

নুতন প্রাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

'সর' এবং 'মর' এই ছুটি কথার আগে এবং পরে অক্ষর বসিয়ে অনেক কথা বানান যায়। এই রকমের কয়েকটি কথার মানে অথবা কথাটি বল্‌লে কি বুঝায় সেই ভাবার্থটি দেওয়া হ'লো। কথাগুলি তোমরা বার করতে পার কি ?

(ক) **সর**—(১) বস্‌বার সর (২) শুক্‌না নয় সর (৩) বার সর (৪) কাজ নাই সর (৫) সোজা সর (৬) বাজাবার সর (৭) সঙ্কোচ বোধ সর।

(খ) **মর**—(১) শরীরের মাঝে মর (২) দোলাবার মর (৩) এর কথা নিজেই জানি মর (৪) নীচ মর (৫) বেঁচেই থাকে মর (৬) জীবের অবশ্যম্ভাবী মর (৭) কাটাকাটি মর।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(১) ১নং তুরস্কের কামাল আতা তুর্ক ; ২নং—ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ; ৩নং—লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ।

(২) সুরেন্দ্রনাথ

(৩) (ক) আমেরিকা মহাদেশ, তার রাজধানী নেই ; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নিউইয়র্ক নয়, ওয়াশিংটন। (খ) বেঙ সরীসৃপ নয়, উভচর। (গ) নরওয়ের রাজধানীর বর্ত্তমান নাম অস্‌লো—জায়গাটি গরম নয়, অত্যন্ত ঠাণ্ডা। (ঘ) রেঙ্গুনকে এখন আর ভারতের বন্দর বলা চলবে না, কারণ ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। করাচীর নাম উল্লেখযোগ্য। (ঙ) আলপাকা রেশমের মত গুটিপোকার শরীর থেকে তৈরী হয় না, হয় আলপাকা নামেরই এক চতুষ্পদ জন্তুর লোম থেকে। (চ) এরিষ্টট্‌ল ও টলষ্টয় ইংল্যাণ্ডের লোক নন, এবং তাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন বক্তা বলে নয়, অন্য গুণে।

(গত বারে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তরে একটা বাদ ছিল। "'সীতারামে'র রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র"—এই কথাটি বসবে।)

নুতন ধাঁধা

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

'সর' এবং 'মর' এই ছুটি কথার আগে এবং পরে অক্ষর বসিয়ে অনেক কথা বানান যায়। এই রকমের কয়েকটি কথার মানে অথবা কথাটি বল্‌লে কি বুঝায় সেই ভাবার্থটি দেওয়া হ'লো। কথাগুলি তোমরা বার কর্‌তে পার কি ?

(ক) **সর**—(১) বস্‌বার সর (২) শুক্‌না নয় সর (৩) বার সর (৪) কাজ নাই সর (৫) সোজা সর (৬) বাজাবার সর (৭) সঙ্কোচ বোধ সর।

(খ) **মর**—(১) শরীরের মাঝে মর (২) দোলাবার মর (৩) এর কথা নিজেই জানি মর (৪) নীচ মর (৫) বেঁচেই থাকে মর (৬) জীবের অবশ্যম্ভাবী মর (৭) কাটাকাটি মর।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(১) ১নং তুরস্কের কামাল আতা তুর্ক ; ২নং—ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ; ৩নং—লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ।

(২) সুরেন্দ্রনাথ

(৩) (ক) আমেরিকা মহাদেশ, তার রাজধানী নেই ; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নিউইয়র্ক নয়, ওয়াশিংটন। (খ) বেঙ সরীসৃপ নয়, উভচর। (গ) নরওয়ের রাজধানীর বর্ত্তমান নাম অস্‌লো—জায়গাটি গরম নয়, অত্যন্ত ঠাণ্ডা। (ঘ) রেঙ্গুনকে এখন আর ভারতের বন্দর বলা চলবে না, কারণ ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। করাচীর নাম উল্লেখযোগ্য। (ঙ) আলপাকা রেশমের মত গুটিপোকার শরীর থেকে তৈরী হয় না, হয় আলপাকা নামেরই এক চতুষ্পদ জন্তুর লোম থেকে। (চ) এরিষ্টট্‌ল ও টলষ্টয় ইংল্যাণ্ডের লোক নন, এবং তাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন বক্তা বলে নয়, অন্য গুণে।

(গত বারে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তরে একটা বাদ ছিল। "'সীতারামে'র রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র"—এই কথাটি বসবে।)

মেঘ ও রৌদ্র

আলোকচিত্রশিল্পী :—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রামধনু

১০ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্মৃতিকণা

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ)

"কাল নিশিশেষে
স্বপনের দেশে
গিয়েছিনু বাবা আমি ;
সোনার পাহাড়
হইতে তাহার
নদীটি আসিছে নামি ;
মায়েরে হেরিনু তাহার তীরে,
ফুলদল মাঝে ভ্রমিছে ধীরে।"

"বাছা, আমিও ছিলাম সেথা,
সারা রাত শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
শ্রান্ত ক্লান্ত রহিনু বসিয়া,
এপারে আঁধার রয়েছে যেথা ;
তার পানে শুধু চাই :
নদী ব্যবধান, কেমনে যাই।"

পাখীর ডিম

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

শিকারীদের মধ্যে পাখী শিকারের রেওয়াজটা খুবই দেখা যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, পাখী শিকারে হাঙ্গামা অনেক কম ; গভীর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে হয় না, বিপদের আশঙ্কাও নাই বলিলেই চলে। খোঁজ করিয়া জলার ধারে যাও, আর ঝাঁক দেখিয়া মার। কিন্তু পাখীর বদলে পাখীর 'ডিম শিকার' (অর্থাৎ সংগ্রহ) বোধ হয় অতটা সহজ নয়, এবং আমাদের দেশে তার রেওয়াজও নাই বলিলেই চলে। অবশ্য যে সব দুষ্টু ছেলে গাছে উঠিয়া ডিম বা ছানা পাড়িয়া আনে তাদের কথা আমি বলিতেছি না, সত্যি সত্যি ডিম জমাইবার উদ্দেশ্যে বা বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে ডিম 'শিকারের' কথাই আমি বলিতেছি। বিলাতে এবং বিশেষ করিয়া আমেরিকার নানা অঞ্চলে এই ধরণের ডিম 'শিকারের' খুব রেওয়াজ আছে। সেখানে অনেক বড় বড় লোক সখ করিয়া ডিম সংগ্রহ করেন, সেজন্য বহু পরিশ্রম এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। তা ছাড়া এক-একটা বড় বড় মিউজিয়াম্ হইতেও এই উদ্দেশ্যে অকাতরে পয়সা খরচ করা হয়। বলা বাহুল্য সে-ক্ষেত্রে প্রাণিবিজ্ঞান এবং পক্ষিতত্ত্বের খাতিরেই উহা করা হয়। কয়েক বছর আগে এক ভদ্রলোক হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বছর অন্ততঃ তিন হাজার লোক এই পাখীর ডিম 'শিকারের' উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সময়ে তিনি এই হিসাব করিয়াছিলেন সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নানা

জায়গায় ৭৮০ রকমের পাখীর প্রায় এক কোটি ডিম সংগ্রহ করা ছিল। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই উড়াইয়া দিবার মত নয়।

পাখী শিকারের চেয়ে পাখীর ডিম সংগ্রহ করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পাখী আমাদের চোখে রাতদিনই পড়ে কিন্তু পাখীর বাসা অত হামেশা দেখা যায় না। তা ছাড়া যে সব পাখী লোকালয়ের কাছে থাকে এবং সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে তাদের ডিম সংগ্রহ করিবার জন্য তো আর এই সব সংগ্রাহকেরা মাথা ঘামান না, ইঁহাদের কাজ হইতেছে দুষ্প্রাপ্য ডিম সংগ্রহ করা। সে ডিম যত দুষ্প্রাপ্য হইবে তার দাম এবং কদর তত বেশী হইবে। এজন্য ইঁহাদের অনেক

ডিম সংগ্রহ—ব্যাপারটি বড় সুখকর নয়।

ভয়াবহ, বিপদ্সঙ্কুল জায়গায় ঘুরিতে হয়। গহন অরণ্যের মধ্যে, অত্যুচ্চ খাড়া পাহাড়ের চূড়ায়, জনহীন ধূধূ-করা মরুপ্রান্তরের মধ্যে, নির্জ্জন দ্বীপে সমুদ্রের ধারে, স্যাঁৎসেঁতে জলাভূমির মধ্যে, অসম্ভব রকম উঁচু গাছের মগডালে—এমন জায়গা নাই যেখানে ইঁহাদের ঘোরাঘুরি করিতে না হয়। এই সব জায়গায় যাওয়াই তো অত্যন্ত বিপজ্জনক, তা ছাড়া অনেক পাখী আবার মোটেই নিরীহ স্বভাবের নয়—যেমন ধর ঈগল, কণ্ডর প্রভৃতি পাখী। অত্যন্ত গোপনে, পক্ষিমাতার অসাক্ষাতে এই সব পাখীর ডিম যোগাড় করিতে হয়। তা সত্ত্বেও অনেক সময় ধরা পড়িয়া যাইতে

হয় এবং এই সব পাখীর (যারা হরিণ-ভেড়া মারিয়া খাইতে কসুর করে না) সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ যে শিকারীর পক্ষে মোটেই লোভনীয় হয় না তা তো বুঝিতেই পার। বেশীর ভাগ পাখীই আবার এমন গোপনীয় জায়গায় বাসা বাঁধে যে পাখীর দেখা পাইলেও তাদের বাসা খুঁজিয়া পাওয়া দায় হয়।

শুধু ডিম সংগ্রহ করিয়া আনিলে তবুও বা হইত, কিন্তু বেশীর ভাগ সংগ্রাহক এবং মিউজিয়ামের কর্ত্তারাই শুধু ডিম লইয়া সন্তুষ্ট নন, তাঁরা চান একেবারে বাসা সমেত ডিম,—ঠিক যে ভাবে বাসার মধ্যে ডিম থাকে সেই ভাবেই তাঁরা তা লোককে দেখাইবেন। কাজেই হাঙ্গামা পোহাইতে হয় আরও বেশী। ধর, একটা ঈগল পাখীর বাসা সমেত ডিম আনিতে হইবে। ঈগলের চোখে ধূলা দিয়া হয়তো সেখানে হাজির হওয়া গেল কিন্তু ঐ সওয়া মণ দেড় মণ ওজনের একটা বাসা না ভাঙ্গিয়া উঁচু পাহাড়ের চূড়া হইতে নামানও তো নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়! আগে দস্তুরমত সেলাই করিয়া, দৃঢ় ভাবে বাঁধিয়া তবে তা নামাইতে হইবে। বাসা সমেত ডিম আনিতে হামেসাই এই ধরণের নানা রকম ফন্দী-ফিকির খাটাইতে হয়, অনেক সময় শিকারী দস্তুরমত গোলেই পড়িয়া যান। গাছের উপর যে সব পাখী বড় বড় বাসা বাঁধে তাদের অনেকেরই বাসা ডাল শুদ্ধ কাটিয়া আনা হয়। কাঠ-ঠোকরা জাতের পাখীরা বড় বড় গাছের গুঁড়িতে বা মোটা মোটা ডালের ভিতর গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়ে। তাদের বাসা আনিতে হইলে গাছের আস্ত গুঁড়িটাই করাত দিয়া কাটিয়া আনিতে হয়। (ঘরে আনিয়া

এই গাছের ফোকরে অনেক পাখীর বাসা—করাত দিয়া গুঁড়ি কাটা ছাড়া আর উপায় কি ?

সেগুলির আবার পিছন দিকে দরজা বসাইতে হয়, না হইলে ভিতরকার ডিমের দেখা পাওয়া সহজ নয়)।

অনেক সামুদ্রিক পাখী আছে, তাদের বাসা বলিতে সমুদ্রের তীরে এক-একটা গর্ত্ত বোঝায়। এই গর্ত্তের চার পাশে হয়তো কিছু সামুদ্রিক শ্যাওলা বা পালক-টালক জড় করা থাকে। এদের ডিমও বাসা সমেত আনিতে বলিলে চলিবে কেন? কিন্তু মিউজিয়ামের কর্ত্তারা এরূপ অদ্ভুত অনুরোধ করিতেও ছাড়েন না। অগত্যা ডিম সংগ্রাহকেরা মাথা খাটাইয়া এক অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছেন। তাঁরা কি করেন জান? প্রথমে গর্ত্তের চারদিকে বালির উপর কাঠি দিয়া একটা চারকোণা ঘর আঁকেন। তার পর ডিমগুলি বাহির করিয়া লইয়া সেই চারকোণা ঘর যুড়িয়া তার মধ্যে এক রকম পাৎলা স্বচ্ছ গালা ঢালিয়া দেন। মাঝখানে গর্ত্তটার উপর অবশ্য একটা চিহ্ন রাখা হয়। ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যে গালা আর বালি জমিয়া একটা শক্ত চাপ বাঁধিয়া যায়, তখন দেখিতে জিনিষটা হয় অনেকটা নকল বেলে পাথরের মত। এইবার শক্ত চাপটি তুলিয়া লইলেই তার ভিতরকার গর্ত্ত অর্থাৎ পাখীর বাসাও চমৎকার ভাবে উঠিয়া আসে। সে বাসা ঘরে আনিয়া ডিমগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেই হইল।

ডিম সংগ্রহ করিবার জন্য যন্ত্রপাতি এবং আসবাব-পত্র নেহাৎ কম দরকার হয় না। করাত, হাতুড়ি, কুড়াল, দড়ি, সূতা, ওষুধপত্র সবই সঙ্গে রাখিতে হয়, আর রাখিতে হয় মই। মই আবার নেহাৎ ছোটখাট হইলে চলে না। মিঃ ইঙ্গারসল্ নামে এক ভদ্রলোকের ডিম সংগ্রহের খুব সখ আছে। সেজন্য ইনি মাথা খাটাইয়া অনেক সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করাইয়াছেন। এঁর একটি ইস্পাতের মই আছে, সেটিকে খুলিলে ষাট ফুট উঁচু হয়, দরকার না হইলে সেটা আবার গুটাইয়া ছোট করিয়া রাখা যায়। এঁর আর একটা দড়ির মইও আছে সেটি ৯০ ফুট লম্বা। অনেক সময়ে উঁচু গাছে উঠিতে গিয়া ইহাতেও তাঁহার কুলায় না।

পাখীর বাসা আর ডিম কিন্তু শুধু সংগ্রহ করিয়া আনিলেই কাজ ফুরাইল না, তার পেছনে অনেক খাটিতে হয়। ডিম আনিয়া তার মধ্যে সাধারণতঃ খুব ছোট একটা গর্ত্ত করা হয়, আর একটা বাঁকা ব্লো-পাইপের সাহায্যে ভিতরকার জিনিষ

বাহির করিয়া ফেলা হয়। তার পর ডিম ধুইয়া, পরিষ্কার করিয়া, চিহ্ন দিয়া তুলায় জড়াইয়া বাক্সের খোপে (সাধারণতঃ কাচে ঢাকা) সাজাইয়া রাখা হয়। বাক্সের মধ্যে কিছু ওষুধও ছড়াইয়া দিতে হয় যাহাতে ডিমে পোকা না ধরে। যেখানে বাসা-সমেত ডিম আনা হয় সেখানে বাক্সের বদলে বাসার মধ্যেই ডিম রাখা হয়, তবে বাসাটাতেও ভাল করিয়া ওষুধ মাখাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে তার মধ্যেও পোকা না ধরে। সাধারণতঃ এই বাসাও আবার কাচের বাক্সে পোরা হয়।

মিউজিয়ামে সংগৃহীত এই সব নানা জাতের পাখীর ডিম হইতে অনেক কিছু শিখিবার আছে—অন্ততঃ প্রাণি-তত্ত্বের দিক্ দিয়া। আমাদের কলিকাতার মিউজিয়ামেও এই ধরণের ডিমের সংগ্রহ আছে, তোমরা ভাল করিয়া দেখিয়াছ কি? না দেখিয়া থাকিলে যখন কলিকাতায় আসিবে তখন একদিন ভাল করিয়া দেখিয়া যাইও। যারা কলিকাতায় থাক তারা তো যখনই খুসী দেখিতে পার। ভাল ভাল মিউজিয়াম্ মাত্রেই কম-বেশী ডিমের সংগ্রহ পাইবে।

পক্ষি-মাতা—চিড়িয়াখানায়
এদের জীবনযাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিতে পার

ডিম সংগ্রাহকেরা পাখীর ডিম বা বাসা সংগ্রহ করিবার সময়ে ঐ সব পাখীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধেও অনেক নতুন নতুন কৌতূহল-জনক তথ্য সংগ্রহ করেন। কোন্ পাখী কোন্ বিশেষ গাছে বাসা বাঁধিতে ভালবাসে, কোন্ পাখী সাপের খোলস সংগ্রহ করিয়া বাসায় জমায়, কোন্ পাখী রঙ্গিন কাচ, পাথর, ঝিনুক, নেকড়া এমন কি মানুষের অনেক সখের জিনিষ পর্য্যন্ত চুরি করিয়া

বাসা সাজাইতে কসুর করে না, কোন্ পাখী বাসার উপরে ঘাসের ছাউনী তৈরী করে, কোন্ পাখী এক সঙ্গে ক'টা করিয়া ডিম পাড়ে, ইত্যাদি নানা খবর।

দুষ্প্রাপ্য ডিমগুলির দাম কি রকম হয় তারও বোধ হয় তোমাদের কোন ধারণা নাই। কালিফোর্ণিয়ায় এক রকম শকুন আছে, তাদের নাম কণ্ডর। ইহাদের ডিম সংগ্রহ করা ভয়ানক কঠিন, দামও তাই অসম্ভব রকম চড়া—এক-একটি ডিম প্রায় তিন হাজার টাকা। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া দ্বীপের তালচোঁচ, নিউজিল্যাণ্ডের কিউই (কিউই-মার্কা জুতার কালীতে যার ছবি দেখ), চীনের হুতোম পেঁচা—এদের ডিমেরও বেশ দাম আছে। শেষেরটি অবশ্য চীনাদের একটা অতিবড় সুখাদ্য বলিয়াই তার এত দাম। উত্তর আমেরিকায় অক্ পাখী নামে এক রকম পাখী ছিল, এই মাত্র শ' খানেক বছর হইল ইহাদের বংশ পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছে—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দেও অক্ পাখী দেখা গিয়াছে। কাজেই আজকাল অক্ পাখীর ডিম পাওয়া কি রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার তা তো বুঝিতেই পার। সেই পুরানো ডিম যা ২।১টা আছে পাইতে হইলে তাহাই যোগাড় করিতে হইবে। এখন একটা অক্ পাখীর ডিমের দাম অন্ততঃ ৩০।৪০ হাজার টাকা। তাও পাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এক সাহেব মাত্র ৩৩০ টাকায় একটা অক্ পাখীর ডিম কিনিয়াছিলেন।

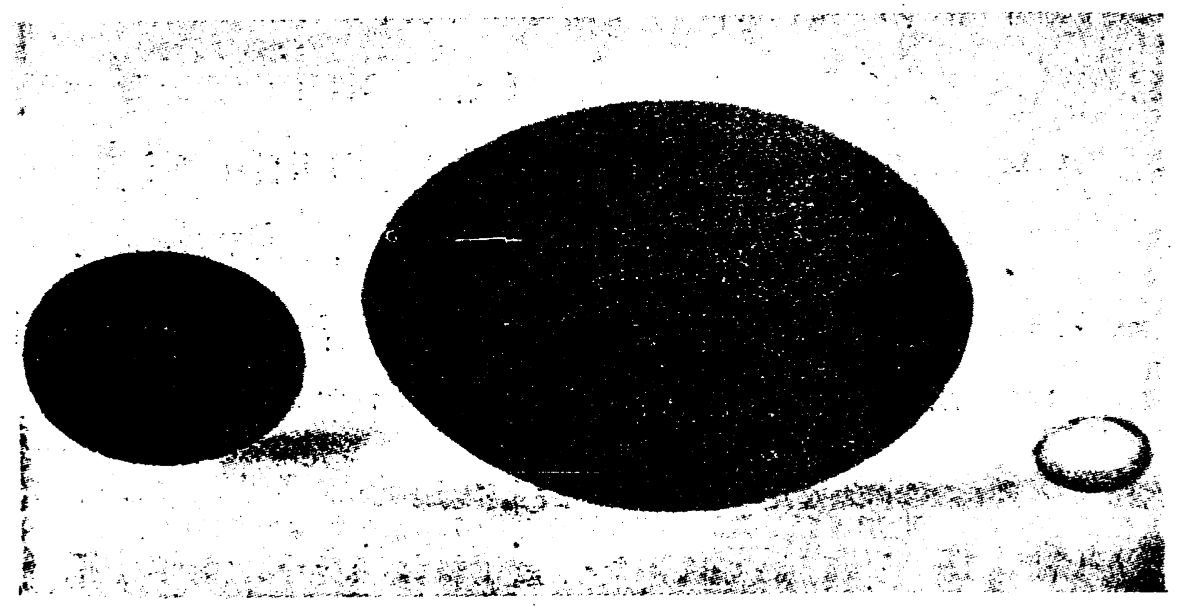

মাঝেরটি ইপিয়র্ণিস্ পাখীর ডিম, ডান দিকেরটি হাঁসের ডিম, বাঁয়েরটি উটপাখীর ডিম; আকারেরও তুলনা কর।

মাডাগাস্কার দ্বীপে ইপিয়র্ণিস্ পাখী নামে আর এক রকম পাখী ছিল, ইহারাও কয়েক শ' বছর হইল পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। ইহাদের এক-একটা ডিমের দাম অক্ পাখীর ডিমের চেয়েও বেশী—পাওয়া যায় কিনা তাহাই সন্দেহ।

তুমি যদি তার একটা যোগাড় করিতে পার তবে একদিনে বড়লোক হইয়া যাইবে। আজকাল পৃথিবীতে যত রকম পাখী আছে তার মধ্যে উটপাখীই সব চেয়ে বড়, পাখীর ডিমের মধ্যেও তাদের ডিমই সব চেয়ে বড় হয়। ইপিয়র্ণিসের ডিম কিন্তু উটপাখীর ডিমের চেয়েও অনেক গুণ বড় ছিল। সঙ্গের ছবিটা দেখিলেই আমার কথা বুঝিবে। ছবির বাঁ দিক্ হইতে প্রথম ডিমটা একটা উটপাখীর, দ্বিতীয়টা ইপিয়র্ণিসের, তৃতীয় ডিমটি একটি হাঁসের।

একটী গানের আসর

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়)

রবিবারের দিনটা আমাদের জমে ভাল। সকালে প্রমথদের বাড়ী জমাটী গল্পের আসর, ত্বপুরে মণীশদের বাড়ী তাসের আড্ডা, সন্ধ্যায় সদলবলে কোন সিনেমায়। সেদিনও ছিল রবিবার, প্রমথদের বাড়ী গল্পের আসর ভেঙ্গে বাড়ী ফিরছি—আমি, প্রতুল, সমীর আর প্রণব। রাস্তায় প্রকাণ্ড একখানি গাড়ী করে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে গাড়ী থামালেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্‌লেন, “আরে প্রতুল বাবু, সমীর বাবু, প্রণব বাবু যে! কি খবর? বহুকাল দেখা নেই—সেই গিরিডিতে আলাপ, তার পর আর দেখা নেই কারো সঙ্গে কারো। কি রকম জমেছিল সেবার! উশ্রীতে কি আমোদই করা গিয়েছিল, আর পরেশনাথ হিলে—” বুঝলাম, এরা সেবার যে গিরিডি গিয়েছিল, সেখানেই ওদের আলাপ। খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক বল্লেন, “আজ বৈকালে আমাদের বাড়ী আসুন না? গানের জলসা আছে, সন্দীপ বাবুও গাইবেন। অবশ্য আজ বৈকালে আমি বাড়ী থাকতে পার্‌ব না, বিশেষ কাজ। কিছু মনে কর্‌বেন না।” এবার ভদ্রলোকের আমার দিকে নজর পড়ল, বল্লেন, “এ ভদ্রলোকটীকে চিনি না তো?”

পরিচয় হ’লো, প্রতুলকে বল্লেন, “এঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন;” আমাকে বল্লেন “আসবেন কিন্তু”—বলে গাড়ী ছেড়ে দিলেন।

শুনলাম উনি প্রকাণ্ড বড়লোক শেয়ারমার্কেটের রাজা সন্তোষ চৌধুরীর ছেলে, প্রভাত চৌধুরী।

যাই হোক, ঠিক হ’ল যে ঠিক বৈকাল ছটায় প্রতুলের ওখানে জড় হ’ব। আর আমার উপর ভার পড়ল প্রতুলকে তাড়া দিয়ে ঠিক করে নিতে।

প্রতুলকে ঠিক করা সোজা নয়; ওর পোষাক পরা সে একটা মহামারী কাণ্ড! প্রত্যেকটী জিনিষ পরবার আগে দশ মিনিট ভাবে। ওর জামা জুতো কাপড় নানা রকমের—অতি-সাধারণ মিলের ধুতি থেকে, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরে ধুতি পর্য্যন্ত আছে, খাঁকি হাফ শার্ট থেকে বাইশ টাকা দামের সিল্কের পাঞ্জাবী পর্য্যন্ত আছে, দেড় টাকার স্যাণ্ডেল থেকে পঁচিশ টাকার পাম্প-শু পর্য্যন্ত আছে। প্রত্যেকটী জুতো, জামা, কাপড় হিসাব করে পরে। ম্যাচ দেখ্‌তে যাওয়ার এক জুতো, জামা-কাপড়, বায়স্কোপের আর এক জুতো, জামা-কাপড়, বরযাত্রী যেতে হ’লে এক রকম, বৌভাতে যেতে হ’লে আর এক রকম—চায়ের নিমন্ত্রণে যেতে হ’লে এক রকম, গানের আসরে যেতে হ’লে আর এক রকম। শুধু তাই? কি রকম লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ সেই অনুসারে আবার জামা-কাপড় জুতো পরে। এর উপরও আছে—একটু গরম বেশী থাক্‌লে ঘামে ভিজে যাওয়ার ভয়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে না, আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি হবে কিনা ঠিক করে সেই রকম জুতো পরে। বাসে যেতে হ’বে ভেবে ভাল কাপড় পরে না—বাসের সিটের রং লেগে যেতে পারে। এমনি কত কি!

এ-হেন প্রতুলকে সেদিন তাড়াতাড়ি ঠিক কর্‌বার ভার আমার উপর। বৈকালে সাড়ে চারটার সময় ওর বাড়ী গেলাম; সুরু কর্‌লাম তাড়া দিতে। ও বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে সুরু কর্‌ল ড্রেস কর্‌তে।

প্রতুল আলমারী খুলে একখানা চমৎকার মিহি ধুতি বার কর্‌ল। ধুতিটা হাতে করে কি একটু ভাব্‌ল, তার পর আবার সেটা যথাস্থানে রেখে দিল। এবার একটা শান্তিপুরের খুব পাতলা সুন্দর একখানি ধুতি বা’র কর্‌লে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, “ও ধুতিটা কি হ’লো, ওটাও তো বেশ সুন্দর?”

আমার কথায় বাধা দিয়ে প্রতুল বল্লে, “ওটা সুন্দর হ’তে পারে, কিন্তু মিলের; ও পরে সন্তোষ চৌধুরীর মত লোকের বাড়ী যাওয়া চলে না। ফাইন্ মিলের ধুতি পরে যাওয়া চলে তাদেরই বাড়ী যাদের কেবল একখানা মোটর আছে। সন্তোষ চৌধুরীর মত লোক—যা’র একখানা ডেমলার, একখানা ক্যাডিলাক, একখান উল্‌সলে আছে—তার বাড়ীতে গানের আসরে যত ফাইনই হোক না কেন, মিলের ধুতি পরে যাওয়া চলে না, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা দরকার।”

মনে মনে নার্ভাস হ’য়ে পড়লাম, আমার পরনে যে স্রেফ দু’টাকা জোড়ার নির্জ্জলা কটন মিল! আমার কাপড়ের দিকে নজর পড়্লে হয়তো ও আমাকে ওর সঙ্গে যেতেই দেবে না।

ধুতির পর এবার বার হ’ল কীপ্ কুলের গেঞ্জি—

তার পর সে একটী চামড়ার সুটকেশ খুলল, দেখলাম তার মধ্যে আছে কয়েকটী সুন্দর সুন্দর সিল্কের আর মটকার পাঞ্জাবী—প্রত্যেকটীর সঙ্গে প্রত্যেকটী কাগজ দিয়ে আলাদা করা। তার মধ্যে থেকে একটা সিল্কের পাঞ্জাবী বার কর্‌ল, অতি সন্তর্পণে। চিক্ চিক্ কর্‌ছে পাঞ্জাবীটা, বুঝলাম এত ভাল পাঞ্জাবী, এও ঐ তিনখান মোটর-ওয়ালাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, “এ পাঞ্জাবীটা কবে করালি? দেখিনি তো!”

ও বল্লে, “কবে মানে? এটা তো প্রায় পাঁচ বছর হ’লো করিয়েছি!” আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, পাঁচ বছর? বল্লাম, “পাঁচ বছর হ’লো করিয়েছিস, এ পর্য্যন্ত কোনও দিন তোকে পরতে দেখিনি তো!”

সে একটু বিরক্ত হয়েই বল্লে, “পরতে দেখ্‌বি কিরে, এ কি আড়াই টাকা দামের চাইনীজ সিল্কের জামা? এটা তৈরী কর্‌তে আমার বাইশ টাকা ছ’ আনা খরচ পড়েছিল—বুঝলি? এটা আর একদিন পড়েছিলাম; গজেন ঘোষ—ব্যাঙ্কে যার প্রায় এক কোটী টাকা গচ্ছিত আছে—তার বাড়ী চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। এই তো দু’ বৎসর আগে ১৯৩২ সাল জুলাই মাসে, বোধ হয় তের তারিখ হবে।”

যাক্ গে, এর পর জুতোর পালা; প্রতুল আলমারীর মাথার উপর থেকে একটা কাগজের বাক্স পেড়ে আন্‌লে। চমৎকার এক জোড়া ‘পাম্প-শু’—ঐ জুতোটা

সে চব্বিশ টাকা দাম দিয়ে কিনেছিল জানতাম। ঐ জুতো জোড়া তা’র বুকের পাঁজরারও বাড়া, প্রতি সপ্তাহে একবার করে আলমারীর মাথা থেকে নামিয়ে অতি সন্তর্পণে মুছে পরিষ্কার করে আবার তুলে রাখে। পরিষ্কার করার জন্য তিন টুকরা ন্যাকড়া আছে। প্রথমে একটা দিয়ে মোছে, তার পর তার চেয়ে আরও একটা পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে মোছে, তার পর সব শেষে এক টুকরা ভাল মস্‌লীন দিয়ে মোছে। ও জুতোটার জন্য ও বোধ হয় প্রাণ দিতে পারে। আজ যখন সেই জুতো শুধু পরিষ্কার করে রাখবার জন্য নয়, পরবার জন্য নামাল তখন আমি সত্যিই অবাক্ হ’লাম—ভাবলাম, হ্যাঁ, আজ প্রতুল একচোট ড্রেস কর্‌ছে বটে—শান্তিপুরে ধুতি, বাইশ টাকা ছ’ আনা দামের পাঞ্জাবী,তার উপর এই চব্বিশ টাকা দামের ‘পাম্প’—সত্যিই দেখবার মত ব্যাপার। প্রতুলটার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এই প্রতুল আর ঘণ্টা দু’য়েক আগে একটা টুইলের হাফশার্ট আর দু’টাকা জোড়ার ধুতি পরে, পায়ে একটা পাঁচ সিকা দামের স্যাণ্ডেল দিয়ে মণীশদের বাড়ী থেকে ‘ব্রিজ’ খেলে এল? আর এখন? কে বল্‌বে যে সে কোন একটা রাজ-রাজড়ার ছেলে নয়! চেহারাটা অবশ্য ওকে ভগবান্ দিয়েছেন—টক্‌টক্ কর্‌ছে রং, চমৎকার শরীরের গড়ন; তা হ’লেও পোষাকে মানুষকে কতখানি বদলে দেয়! দু’ঘণ্টা আগের প্রতুল আর দু’ঘণ্টা পরের প্রতুলে আকাশ পাতাল তফাৎ—মনে মনে প্রতুলকে শ্রদ্ধা জানালাম।

যাই হোক্ সেই জুতোটা তিনবার চারবার মুছে আস্তে আস্তে সে পায়ে পর্‌ল। প্রতুলের পা দুটোর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ’ল, পণ্ডিতেরা ঠিকই বলেন, “চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখাণি চ সুখানি চ”—সত্যিই, এই একটু আগে প্রতুলের ঐ চরণযুগলকে কাঁটা ওঠা স্যাণ্ডেল জোড়াটাকে টান্‌তে টান্‌তে বাড়ী ফির্‌তে হয়েছে, আর এখন সেই পদদ্বয় স্রেফ্ চব্বিশ টাকা দামের তুলতুলে চামড়ার জুতোর মধ্যে আরামে বিশ্রাম লাভ কর্‌ছে।

এর পর আর একটা সুটকেশ খুলে চমৎকার একটী পাতলা চাদর বার করে ঐ সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর অল্প একটু জড়িয়ে নিয়ে, আর চুলটা আর একবার একটু ঠিক করে নিয়ে প্রতুল বার হ’য়ে পড়ল।

TIGHT BINDING

রাস্তায় বা'র হ'তেই দেখি, সমীর আর প্রণব আস্‌ছে। সমীর বল্‌লে, "আরে ঠিক সময় এসেছি। প্রতুল দেখ, আমাদেরও দেরী হয়নি মোটেই তা হ'লে!"

প্রতুল একটু হেসে বল্লে, "থ্যাঙ্কস্‌,"—বলে সে ট্রাম রাস্তার দিকে পা বাড়াল। খানিকটা দূর এসে হঠাৎ প্রতুল বল্লে, "ওহে তোমরা এগোও, আমি আস্‌ছি। তোমরা ঐ মোড়ের মাথায় অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি।"

প্রতুল গেল চলে; আমি, সমীর আর প্রণব বালীগঞ্জের ট্রামের প্রত্যাশায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। 'কালীঘাট' গেল, তার পর তু' মিনিট, তার পর 'টালিগঞ্জ'; ফের তিন মিনিট, তার পর আবার 'কালীঘাট'—বিরক্ত হয়ে যেতে হয়, এত দেরীতে বালীগঞ্জের ট্রাম আসে। তাও হয়তো এবার আস্‌বে একখান বালীগঞ্জের ট্রাম, আর প্রতুল তখনও হয়তো হাজির হ'বে না। ঐ তো প্রতুল আস্‌ছে, আর এদিকে বালীগঞ্জের ট্রামও যে একটা আস্‌ছে! সর্ব্বনাশ কর্‌লে, প্রতুলটা হয়তো ট্রামের আগে আস্‌তে পার্‌বে না, এ খানাও 'মিস্‌' কর্‌তে হ'বে আবার আট-দশ মিনিট। ওদিকে সন্দীপ বাবুর গান হয়তো হয়ে যাবে ততক্ষণ—ছিঃ ছিঃ, প্রতুলটার জন্য সব মাটী! সমীর যা কখনও করে না—মানে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে চেঁচান—তাই করে ফেল্‌ল, চীৎকার করে উঠ্‌ল, "প্রতুল শীগ্‌গির, শীগ্‌গির, বালীগঞ্জের ট্রাম এসে গেছে।" প্রতুল তাড়াতাড়িই এল, অবশ্য ছুটল না। যাই হোক, এ ট্রামখানা পাওয়া গেল।

পৌঁছুলাম বালীগঞ্জে—নামলাম ট্রাম থেকে, এবং শেষ পর্য্যন্ত হাজির হলাম সন্তোষ চৌধুরীর বাড়ীর সামনে। ওরে বাবা কি মোটার রে! ভাবলাম আমার ছোট ভাইটা সঙ্গে থাক্‌লে মোটারের সংখ্যা গুণিয়ে ষট্‌কে শিখিয়ে ফেল্‌তে পারতাম—প্রায় তু'শো তের খান মোটার। মোটারের ফাঁক দিয়ে দিয়ে ঢুকলাম। হঠাৎ আমার কি রকম ভয় হ'লো, প্রতুলকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "হ্যাঁরে মার্‌বে না তো এরা?"

প্রতুল অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "মার্‌বে কেন!"

আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম, "ওদের বাড়ীতে ঢুকেছি বলে!"

সমীর একটু চটে গিয়ে বল্ল, "আমরা কি এমনি ঢুক্‌ছি নাকি, রেগুলার নিমন্ত্রণ করেছে সন্তোষ বাবুর ছেলে প্রভাত।"

আমি বল্লাম, "নেমন্তন্ন কর্‌লে কি হ'বে, আমরা যে মোটারে আসি নি; তার উপর আমার গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। আবার প্রভাত বাবুও তো নেই বাড়ীতে।"

প্রণব বল্লে, "চ', চ', বাজে বকিস না, ওদিকে হয়তো সন্দীপ বাবুর গান হ'য়ে গেল।"

প্রকাণ্ড হল, লোকে গিস্‌ গিস্‌ কর্‌ছে—একদিকে মেয়েরা, একদিকে ছেলেরা। আমরা ক'জন ঢুকলাম; আমাদের ক'জনের দিকে কেউ বিশেষ তাকাল না, কিন্তু প্রতুলের দিকে সকলে একেবারে একসঙ্গে তু' এক মিনিটের জন্য তাকিয়ে রইল। স্বার্থক, স্বার্থক জন্ম প্রতুলের!

সন্দীপ বাবু চমৎকার একটী পূরীয়া আর একটী ভজন গেয়ে উঠে পড়লেন; শুনলাম তাঁকে আবার কোথায় যেতে হবে, অনেক লোক তাঁর আশায় সেখানে বসে আছে।

এর পর একটী ছোট মেয়ে হারমনিয়ামের কাছে এগিয়ে এল; শুনলাম খেয়াল গাইবেন। একটু পরে বুঝলাম মেয়েটী এবার গাইছে। বুঝলাম, মানে শুন্‌তে পাচ্ছিলাম না কিছুই হাত দশ বারো দূর থেকেও—খালি মেয়েটী মুখ নাড়ছে দেখে বুঝলাম গাইছে। সকলে দেখি মাথা নাড়ছে, হাত নাড়ছে, দেহ দোলাচ্ছে, মাঝে মাঝে 'বাহবা'ও দিচ্ছে। একি প্রতুল, সমীর প্রণব—ওরাও যে আমার পাশে বসেই মাথা নাড়াচ্ছে! কি সর্ব্বনাশ, ওরা তো তা হ'লে শুন্‌তে পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না কেন? তবে কি কালা হয়ে গেলাম—য়্যাঁ? আমার ঠাকুর্দ্দা না কে একজন বংশে কালা ছিলেন শুনেছি; ওরে বাবা, শুনেছি ওটা বংশগত রোগ। কিন্তু কই, আর কারো তো হয় নি! বাবা তো বেশ শুন্‌তে পান, ছোটকা মেজকা সকলে—বড়দা, মেজদা, হ্যাঁ, সকলে শুন্‌তে পান। তবে কি শুধু আমিই মলাম! কিন্তু একটু আগে তো অনেক দূর থেকে ট্রামের ঘণ্টা শুন্‌তে পেলাম; ট্রামের কণ্ডাক্‌টার আমার ছোট সিকিটা বাজিয়ে নিল টুং করে, তাও শুন্‌তে পেলাম—

TIGHT BINDING

চোখ দিয়ে আমার জল বার হয়ে এল। প্রতুলের দিকে তাকিয়ে দেখি সে গায়ের চাদরখান বেশ করে কাঁধের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বসে চোখ বুঁজে ধীরে ধীরে তুল্‌ছে। আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না, প্রতুলকে ধাক্কা দিলাম—ডাকলাম "প্রতুল !" প্রতুলের যেন ধ্যান ভেঙ্গে গেল, সে একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "কি ?"

আমি কাতর ভাবে বল্লাম, "ঐ মেয়েটীর গান শুন্‌তে পাচ্ছিস্ ?"

প্রতুল বল্লে, "না।"

আমার ধড়ে প্রাণ এল—তা হ'লে আমি কালা হই নি—জয় মা কালী! অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "গান শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না, তবে ঘাড় নাড়ছিস্ কেন ?"

প্রতুল বল্লে, "নাড়ব না ? কে গাইছে জানিস্ ?"

আমি অতি অপরাধীর মত বল্লাম, "না।"

"তা জানবি কেন—সার এ. সি. পালের মেয়ে, 'রোল্‌সে' চড়ে এসেছে, বাড়ীতে এখনও তু'খান আছে।" বলেই সে আবার চোখ বুঁজে ঘাড় নাড়তে লাগল। একটু পরেই আবার তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুই ঘাড় নাড়ছিস না ?"

আমি বল্লাম "না।"

সে চাপা সুরে একটু বিরক্ত ভাবেই বল্লে, "ঘাড় নাড়্, নয় তো মাথা দোলা।" আমি বেকুবের মত বল্লাম, "কি করে দোলাব, শুন্‌তে পাচ্ছি না যে !"

প্রতুল এবার একটু ধমক দিয়েই বল্লে, "যে রকম ভাবে হয় দোলা, শোনার দরকার নেই।"

আমি চোখ বুজে ঘাড় দোলাতে লাগলাম—কতক্ষণ তুলিয়েছি জানি না—খানিক পরে দেখি প্রতুল ধাক্কা দিচ্ছে, বল্‌ছে "এই, আর দোলাতে হ'বে না ঘাড়, গান থেমে গেছে।" তাকিয়ে দেখি, মেয়েটী আর মুখ নাড়ছে না, বুঝলাম তা হ'লে থেমেছে।

এর পর দেখি এক ভদ্রলোক বয়েস বোধ হয় বছর ত্রিশ। একটী তানপুরো নিয়ে বস্‌লেন, সঙ্গে বাঁয়া-তবলা। ভদ্রলোক তানপুরোটা একটু বেঁধে নিয়ে একটী সুর দিলেন গলায়—আহা, কি ভরাট জোয়াবী গলা! একখানি খাম্বাজ রাগ

আলাপ শুরু কর্‌লেন। কিন্তু একি, সবাই গল্প করে যে! আরে, একে একে দেখি সবাই উঠ্‌ছে—বাইরে অনবরত নানা জাতীয় মোটারের হর্ণ শোনা যাচ্ছে। মোটারের হর্ণ, মোটারের ষ্টার্টের শব্দ, চলে যাওয়ার সময় আলাপ ইত্যাদিতে চারিদিক্ জমে উঠ্‌ল। প্রতুলটাও দেখি উঠবার মতলব কর্‌ছে, মরীয়া হয়ে চেপে ধর্‌লাম ওর শান্তিপুরে ধুতি—বল্লাম, "এ গান না শুনে যাব না কিছুতেই।" প্রতুল বিরক্ত হয়ে বস্‌ল।

খানিক পরে গান যখন শেষ হয়ে গেল তখন মাত্র জন পনেরো লোক বাকী আছে। আমরা উঠলাম; মিঃ সন্তোষ চৌধুরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রতুল গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌লে। কি রকম এঁকে বেঁকে লতিয়ে লতিয়ে বল্লে, "কি ভাল লাগ্‌ল, সত্যি এ রকম গান……সার এ সি.র মেয়ে কি গান! আচ্ছা, নমস্কার !" বলে তু'হাত মাথায় ঠেকাল।

সন্তোষ বাবু উত্তরে একটু হেসে নমস্কার কর্‌লেন।

উঃ, ঐ কাঠমেজাজী প্রতুল এত বিনয়ী, স্রেফ গলে যাচ্ছে মনে হ'ল।

যাই হোক, যে যার জুতো পরে নিলাম। প্রত্যেকের জুতোর কি অবস্থা হয়েছে—তুশো লোকের পায়ের চাপে-চাপে। চিনবার যো নেই কারো জুতো। আমার নাগরাটা চেপ্টে স্যাণ্ডেলের মত হয়ে গিয়েছে, পায়ে দিয়ে দেখলাম ভয়নক বড় হচ্ছে, ভাবলাম যে ওটা আমার নয়; কিন্তু, না, ঐ তো সেই হলদে তালি যা নিয়ে মুচিটার সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে গেল—লাল নাগরায় হলদে তালি দিয়েছে বলে। কি করি, সেইটা কোন রকমে পায় দিলাম, মনে মনে ঠিক কর্‌লাম যে রাস্তায় গিয়ে এ জুতো হাতে কর্‌তে হ'বে।

আমি নিজের জুতো নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ দেখি প্রতুল স্রেফ্ ক্ষেপে উঠেছে, একেবারে চীৎকার শুরু করে দিয়েছে—"আমার জুতো, জুতো কোথায় গেল ?"

তা'র চীৎকারে সন্তোষ বাবু, তাঁর স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সকলে হাঁজির।

সন্তোষ বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি, ব্যাপার কি ?"

প্রতুল এখন আর সে দশ মিনিট আগের নেতিয়ে-পড়া প্রতুল নেই; মুসোলিনি বা হিট্‌লার তার কাছে কোথায় লাগে !

সন্তোষ বাবুর কথার উত্তরে সে বেশ কড়া সুরেই বল্লে, "আমার জুতো পাচ্ছি না, জুতো গেল কোথায় ?"

সন্তোষ বাবু বল্লেন, "আপনার জুতো পাচ্ছেন না ? এখানেই খুলেছিলেন তো ?"

প্রতুল বল্লে, "এখানে ছাড়া আর কোথায় খুল্‌ব ?"

সন্তোষ বাবু বল্লেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার, জুতো যাবে কোথায় ?"

প্রতুল একটু বেশ চটে উঠেই বল্লে, "যাবে কোথায় তা আমি কি জানি ? আপনার বাড়ীতেই কোনও চাকর-বাকর—"

আমার জুতো, জুতো কোথায় গেল ?

সন্তোষ বাবু এবার একটু বিরক্ত হয়েছেন, বল্লেন, "আমার বাড়ীর চাকর-বাকর চোর নয়।"

প্রতুল ক্ষেপে গেছে—বল্লে, "চাকর-বাকর যদি না চোর হয় তা হ'লে যাদের গান শুন্‌তে নেমন্তন্ন করেছিলেন, আপনার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব কেউ নিশ্চয় চোর—নইলে আমার জুতো যাবে কোথায় ?"

সন্তোষ বাবুও এবার বেশ রেগে উত্তর দিলেন, "দেখুন, আপনি কি ভদ্রলোক ন'ন ? ভদ্রলোক হ'লে ওরকম অভদ্র কথা বল্‌তে পার্‌তেন না।"

প্রতুলও 'মরীয়া' হয়ে উঠ্‌ল—বল্লে, "ভদ্রলোক কে নয় তা বোঝা যাচ্ছে। খানকয়েক মোটার থাক্‌লেই ভদ্রলোক হয় না। এম্‌নি ভদ্রলোক—যাঁর আত্মীয়-স্বজনের, বন্ধু-বান্ধবের জুতো চুরী ব্যবসা—" কি সর্ব্বনাশ ! সন্তোষ বাবুর তিনখান মোটার আছে বলেই প্রতুলের আজ এত সাজ, ঐ চব্বিশ টাকা দামের জুতো—আর জুতো হারানোর জন্যে মোটার গেল উড়ে ! হ'বেও বা—মোটারওয়ালার জন্য জুতো হ'তে পারে, কিন্তু জুতোর জন্য সে মোটারওয়ালাকেও ত্যাগ কর্‌তে পারে।

সন্তোষ বাবু জীবনে বোধ হয় এত অপমানিত কখনও হ'ন নি। তাঁরই বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তাঁকে এত বড় অপমান—রাগে তাঁর মুখ দিয়ে তখন কথা বার হ'চ্ছে না। তাঁর পাশ থেকে কে একজন বল্লে, "ভারী তো জুতো, চুরী কর্‌বার জন্য লোকের দায় পড়েছে।"

প্রতুল দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লে, "ভারী তো জুতো নয়, চব্বিশটী টাকা দামের 'পাম্প' বুঝলে ছোকরা, এখনও ক্যাশ-মেমো আছে। লাইফে অত দামী জুতো পড় নি গোপাল।"

সন্তোষ বাবু একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্‌লেন, "চব্বিশ টাকা ? আচ্ছা চব্বিশ টাকা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, চলে যান টাকা নিয়ে।"

প্রতুলকে তখন সমীর টান্‌ছে—বল্‌ছে, "প্রতুল বাড়ী চল, কি কেলেঙ্কারী কর্‌ছ ?"

প্রতুল তখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, সন্তোষ বাবুকে বল্‌লে, "টাকাই আছে—আর তো কিছুই নেই। দালালী করে টাকা করেছেন—এক পুরুষে বড়লোক ! ঠাকুর্দ্দা তো পান বেচ্‌ত, কত আর হ'বে ?"

সন্তোষ বাবু পাগলের মত চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "দরোয়ান, নিকাল দেও, নিকাল দেও উস্‌কো !" আমরা ততক্ষণে প্রতুলকে জোর করে ধরে নিয়ে রাস্তায় চলে এসেছি।

প্রতুল রাস্তায় এসে খানিকটা গুম্ হয়ে থেকে হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল, "উঃ, আমার চব্বিশ টাকা দামের জুতো !"

আমার ঠিক এমনি একটা দৃশ্য মনে পড়ল। ন'কাকার যখন একমাত্র ছেলে ভূতো টাইফয়েডে মারা যায়, তখন তাকে পুড়িয়ে ফির্‌বার সময় ন'কাকা রাস্তায় এসে হঠাৎ ঠিক এমনি ভাবে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, "উঃ, আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক ভূতো—" আর তখন ন'কাকারও খালি পা, আর আজ প্রতুলেরও খালি পা।

সারা রাস্তা বেচারা চোখের জল মুছেছে—আর আমরা সান্ত্বনা দিয়েছি। কোন রকমে যখন ওর বাড়ী এসে পৌঁছান গেল, রাত তখন সাড়ে দশটা। ভাবলাম বেচারাকে আর একটু ঠাণ্ডা করে তবে আমরা বাড়ী যাব। প্রতুলের মা, দিদি প্রতুলের শুধু পা আর মুখচোখের অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লেন।

আমি বল্লাম, "আপনারা যান, সব পরে বল্‌ছি—বিশেষ কিছু হয় নি।"

তার নিজের ঘরে ঢুকেই সে সেই আলমারীর উপর কাগজের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আবার চীৎকার করে কেঁদে উঠল ; ন'কাকাও ঠিক ভূতোকে পুড়িয়ে ফিরে ভূতোর খালি বিছানার দিকে তাকিয়ে এমনি করেই কেঁদে উঠেছিলেন। তা হ'লে প্রতুলের জুতোর শোকটা ঠিক পুত্রশোকের মতই হয়েছে। হ'বেও বা, চব্বিশ টাকার জুতো হারালে আমারও হয়তো ঐ রকম পুত্রশোকই হ'ত !

একটু পরেই সে উঠে গিয়ে পাগলের মত সেই কাগজের বাক্সটা পেড়ে বুকে জড়িয়ে ধর্‌তে গেল।

কিন্তু প্রতুলের মুখের ভাবটা বদলে গেল কি রকম। সে বাক্সর ঢাকাটা খুলে ফেল্‌ল তাড়াতাড়ি। ওকি প্রতুল কি ভূত দেখ্‌ল নাকি ?

আমরা একসঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কিরে, কি হ'ল ?"

প্রতুল প্রথমটা কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল, তার পর বোকার মত হেসে ফেল্‌ল—তার পর হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌ল, "আমার জুতো, আমার পাম্প শু—ওরে আমার পাম্প শু হারায় নি !"

উঃ, কি তার আনন্দ ! আমাদের পাড়ায় গোয়ালাটার একমাত্র গরু একবার

হারিয়ে গিয়েছিল সেটা সাত দিন পরে ফিরে পাওয়ায় সে অনেকটা ঐ রকম আনন্দই করেছিল।

যাই হোক, ব্যাপারটা ভৌতিক না কি—কিছুই বোঝা গেল না।

প্রতুল ঐ জুতো পায়ে দিয়েছে তার বেশ মনে আছে, আমরাও সকলে দেখেছি।

হঠাৎ প্রতুল চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "হয়েছে, হয়েছে—"

সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কি হয়েছে ?"

প্রতুল বল্লে, "ঐ জুতো পরেছিলাম কিন্তু তখন রাস্তায় গিয়ে মনে হ'ল আসরে তো জুতো পরে ঢুকব না—জুতো খুলেই ঢুকব, জুতো কেউ দেখ্‌বে না তো ! কাজেই ভাল জুতো পরে যাওয়ায় লাভ নেই। আর দ্বিতীয় কথা মনে হ'ল যে সেবার বিনয় মজুমদারের বাড়ীতে ঐ রকম গানের আসরে আট জোড়া জুতো চুরী যায়, তাই ঠিক কর্‌লাম যে এত দামী জুতো পরে যাওয়া উচিত নয়। তাই রাস্তা থেকে বাড়ী ফিরে এসে এ জুতোটা বদলে—সেই তিন টাকা দশ আনার নিউকাট সেলিমটা পরে গেলাম।"

মনে মনে ভাবলাম, আশ্চর্য্য কিছুই নয় ; প্রতুলের হিসেব রাস্তায় বার হয়েও থামে না।

সমীর বল্‌লে, "ও তাই তখন ফিরে এলি ?"

প্রতুল বল্লে, "হ্যাঁ।"

প্রণব বল্লে, "তা' হয় তো হ'বে—আমরা তখন ট্রামের জন্য ব্যস্ত ; লক্ষ্যই করি নি।"

প্রতুলের আনন্দের বেগটা এতক্ষণে একটু কমেছে, আর তার জায়গায় দ্বিগুণ লজ্জা ও শতগুণ অনুশোচনা এসে তার মন অধিকার করেছে—

ছিঃ ছিঃ সন্তোষ বাবুর সঙ্গে কি অভদ্র ব্যবহার সে করেছে ! অতি বড় ছোটলোকও ওরকম করে না। লজ্জায় সে আধমরা হয়ে যেতে লাগল ; তার উপর অনুশোচনা,—তিনখান মোটার তার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ কর্‌তে লাগল। হায়, হায়, সন্তোষ চৌধুরীর মত লোকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচে গেল !

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তা হলে তোর নিউকাট সেলিমটাই বা গেল কোথায় ?"

সে অতি কাতর ভাবে বল্লে, "ছিলরে ছিল, দরজার কোণে একটা ঐ রকম জুতো উল্‌টে পড়ে ছিল—ধূলো মাখামাখি হয়ে। এখন বেশ মনে পড়ছে—তখন যে আমার মনের মধ্যে বেশ ধারণা 'পাম্প শু' পরেই গিয়েছি—আমি যে রাস্তা থেকে ফিরে এসে জুতো বদলে যাওয়ার কথা এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ! উঃ এত বড় ভুল, এত বড় ভুল !"

* * *

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। সন্তোষ চৌধুরীর বাড়ীর ফোন বেজে উঠল। সন্তোষ বাবু তখন সবে শুতে যাচ্ছেন—এসে ফোন ধর্‌লেন।

প্রতুল ক্ষমা চাইছে, সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক জানিয়ে অতি কাতর ভাবে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইছে।

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

[শেষ পৃষ্ঠায় উত্তর দেখ]

১। (ক) ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা 'ষ্টার্লিং' কথাটা কি ভাবে এল ? (খ) ফ্রান্সের 'গিলোটিন' কথাটার কি ভাবে উদ্ভব হয় ?

২। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নীচের এই তারিখগুলি কি জন্য বিখ্যাত ১৭৬১, ১৮৫৮, ১৯১৯, ১৯৩৫ ?

৩। নীচে যে বইগুলোর নাম দেওয়া হ'ল সেগুলি কে কে রচনা করেছেন পর পর বলে যাও—

Rob Roy, Notre Dame, Alice in Wonderland, রাজতরঙ্গিণী, মালবিকাগ্নিমিত্র, শর্ম্মিষ্ঠানাটক, বৃত্রসংহার।

৪। নীচের কথাগুলোর মধ্যে যে যে ভুল আছে বার কর—

(ক) ইটালীর প্রেসিডেন্ট মুসোলিনি এবং তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মোস্তাফা কামাল পাশা প্রায় একই সময়ে ক্ষমতাপন্ন হয়ে ওঠেন। মোস্তাফা কামাল পাশা আজকাল প্রায়ই তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে বাস করেন। (খ) ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ বলড্‌উইন্ অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিড্‌নিতে বেড়াতে যাবেন।

৫। পাশের (১নং) এবং পর পৃষ্ঠার (২নং) ছবি দু'টি দেখে কার বা কিসের ছবি বলতে হবে।

১নং

দস্যুর দলে ভোমরা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

৬

হাত-কাটা ছেলেটা

এমন খাপছাড়া বিদঘুটে চেহারা জন্মেও দেখেনি ভোমরা। দেখতে সে ছোট, ছোট ছেলেরই মত ; পিছন থেকে দেখলে ভোমরারই মত একজন ব'লে ভুল হয় হয়তো। কিন্তু

মুখটা বেজায় বুড়োটে, গাল দুটো একেবারে গর্ত্তে বসা, একটা পোড়া-পোড়া তামাটে গায়ের রঙ, তার চেয়ে কালো ঢের ভালো। মুখটা কুৎসিত বললে কিছু বলা হয় না; তা যেন সুন্দর-কুৎসিতের বাইরে, যেন মুখের ছাঁদটা ভালো ক'রে তৈরিই হয় নি। আর সব চেয়ে যা ভয়ানক তা হচ্ছে এই যে তার দু'খানা হাত কনুইতে এসেই শেষ হয়েছে, তার পর আর নেই; এবং সেই দু' হাতেই সে নিয়ে এসেছে ভোমরার জন্য ভাতের থালা। তাকে দেখামাত্র ভোমরা প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো: ঠিক ভয়ে নয়—কেমন একটা বিশ্রী স্যাঁৎসেঁতে ভাবে তার শরীরটা যেন শিউরে উঠলো, ভালো ক'রে ঐ মূর্ত্তির দিকে সে তাকাতে পারছিলো না।

(সাধারণ জ্ঞানের ছবি ২নং)

মূর্ত্তিটি কিন্তু দিব্যি কেজো লোকের মত ভাতের থালা মেঝেতে নামিয়ে রেখে বললে: 'ভাত।' গলার স্বরটা তার ছেলেমানুষেরই মত; ঐ রকম একটা মুখের ভিতর থেকে অমন মিহি আওয়াজ বেরুবে ভোমরা তা ভাবতেও পারে নি। একটু যেন স্বস্তি পেলো সে।

'খাও,' মূর্ত্তিটি আদেশ করলে। তার পর, ভোমরার তরফ থেকে কোন জবাব না পেয়ে হুকুমের সুরে: 'খেয়ে নাও না চটপট! তোমার খাওয়া হ'লে তোমাকে আবার বন্ধ ক'রে রেখে যেতে হবে তো!'

বন্ধ করার কথায় হঠাৎ চ'টে গিয়ে ভোমরা ব'লে উঠলো: 'খাও বললেই খাওয়া যায়—না? চান করতে হয় না! আমি কি কুকুর না বেড়াল যে সামনে কতগুলো ভাত ফেলে গেলেই হ'লো। দু' দিন যে এই একই জামা-কাপড় প'রে আছি—গা ঘিনঘিন করে না!'

ছেলেটা—ছেলেটা বলাই ভালো—হঠাৎ হেসে ফেলে বললে, 'অত সুখ-সুবিধে এখানে কোথায় পাবে ভাই! ক্ষিদেয় ট্যাঁ-ট্যাঁ ক'রে লাভ কী—ব'সে যাও।'

ভোমরার মনে-মনে খুব রাগ হ'লো, কিন্তু কথাটাও মিথ্যে নয়। তার যে কী প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে, কথাটা শুনেই সে টের পেলো। পাবেই বা না কেন—সকাল থেকে কিছু তো খায় নি। সামনে ভাতের থালা যেই দেখা, অমনি তার পেটের ভিতরকার নাড়ি-ভুঁড়িগুলো যেন মুচড়ে উঠলো।

হাত-কাটা ছেলেটা গায়ে প'ড়েই বললে: 'তা চান করতে চাও, চানের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি—কিন্তু ধোপ-দুরস্ত সাটিনের জামা পাবো কোথায়?'

ভোমরা হেসে উঠে বললে: 'ও হরি! তুমি কি ভেবেছো আমি এখনো সাটিনের জামা পরি! ও তো পরে খোকাখুকুরা—যারা পেরাম্বুলেটরে চ'ড়ে বিকেলবেলা পার্কে বেড়ায়। হাঃ-হাঃ!'

হাত-কাটা বললে গম্ভীর ভাবে: 'চান করতে হ'লে এসো আমার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি কর—আমার ঢের কাজ।'

পাহারাওলার সঙ্গে কয়েদীর মত, ভোমরা তার ছোট্ট কুঠুরি থেকে বেরুলো। বরাবর একটা লম্বা বারান্দা চ'লে গেছে, অনেকগুলি ঘর পাশাপাশি, কিন্তু একটাতেও কেউ আছে ব'লে মনে হয় না। সমস্ত বাড়িটা এই দুপুরবেলায় চুপচাপ নিঃঝুম—যেন কেউ নেই। এখন যদি সে কোনোরকমে একবার রাস্তায় বেরুতে পারে—কে-ই বা টের পাবে আর কে-ই বা ধরবে! দে ছুট্ ভোঁ-ভোঁ!

বারান্দা দিয়ে একটু গিয়ে একটা স্নানের ঘর। চৌবাচ্চার জল অনেকটা তলায়, তেল-সাবান দূরে থাক্, একটা তোয়ালে পর্য্যন্ত নেই। তবু ঐ স্নানের শেষে ভোমরার এমন চমৎকার লাগলো যেমন তার শীগ্‌গির লাগে নি।

বেরিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করলে: 'কেউ নেই নাকি বাড়িতে? একেবারে চুপ?'

সংক্ষেপে জবাব দিলে হাত-কাটা: 'কাজে বেরিয়েছে সবাই।'

'মাণ্‌কে, গণ্‌শা—ওরা কোথায়?'

'তোমাকে পাহারা দেয়া তো ওদের কাজ নয়—এখন থেকে ওদের দেখাও পাবে না। তুমি এখন আমার চার্জে।'

ঐ গালভাঙা, হাতকাটা বুড়োটে ছেলেটা এমন জমকালো ধরণে কথাটা বললে যে ভোমরার হাসিও পেলো আবার ওর উপর দয়াও হ'লো। জিজ্ঞেস করলে, 'এ রকম আরো কয়েদী আছে নাকি তোমাদের?'

'ও-সব বলা বারণ', আরো বেশী গম্ভীর স্বরে জবাব হ'লো।

ভোমরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'দেখো, তোমার এত সব কাজকর্ম্ম করতে অসুবিধে হয় না?'

'অসুবিধে! অসুবিধে কেন হবে? হাত নেই ব'লে বলছো? এই শুঁড়দুটো দিয়ে আমি যত কাজ করতে পারি, তোমার মত দশজন হাতওয়ালা তার আদ্ধেকও পারবে না।'

বেশ জাঁক ক'রেই বললে সে কথাটা; আর ভোমরা ভেবে দেখলো যে সে যে তার দুই 'শুঁড়ে'র মধ্যে চেপে ভাতের থালা নিয়ে এলো সত্যি তার বাহাদুরিটা কম নয়।

'আচ্ছা, তুমি তালা খুললে কেমন ক'রে?'

'এই দেখো!' নাক কুঁচকে, ঠোঁট উল্‌টিয়ে হঠাৎ সে বার করলো বিশ্রী নোঙরা একপাটি দাঁত। 'হাত না থাকলে কী হয়, দাঁত তো আছে।'

ভোমরা তো অবাক্।—'দাঁত দিয়ে তুমি তালা খোল!'

'যদি ভেবে থাকো ঐ লুলোটার মাথায় এক চাঁটি মেরে এক ছুটে পালিয়ে যাবে—' বিশ্রী ফ্যা-ফ্যা ক'রে হাত-কাটা হেসে উঠলো। 'দেখো চেষ্টা ক'রে।'

ওর হাসি আর কথার ঢঙে ভোমরা কেমন একটু হিমসিম খেয়ে গেলো। সত্যি-সত্যি সে ভাবছিলো যে এই দুপুরবেলায় খালি বাড়িতে তো পালিয়ে গেলেই হয়! ঘরের বাইরে যখন এসেছে, দৌড় দিলেই হ'লো। কিন্তু হাত-কাটা ছেলেটা এমন ভাবে তার দিকে তাকালো যে সে সুড়সুড় ক'রে ঘরে গিয়ে ঢুকলো—এবং ভাতের থালার সামনে ব'সেও পড়লো।

খাওয়াটা নেহাৎ মন্দ নয়—ডাল, ভাজা, মাছের ঝোল, আবার একটু দই-ও, কিন্তু ভাতটা বেজায় ঠাণ্ডা। ভাত মুখে দিয়ে নিজের মনেই সে ব'লে উঠলো: 'ইস্, কী ঠাণ্ডা!'

ব'লে উঠলো হাত-কাটা সেপাই: 'মামাবাড়িতে বেড়াতে আসো নি সেটা মনে রেখো।'

'ওঃ, ও-কথা শুনতে-শুনতে ঘেন্না ধ'রে গেছে। কতই যেন আদরে রেখেছো তোমরা! পাণ্ডাজি টাকা চায়—কিছু টাকা নিয়ে এবারে ছেড়ে দিলেই পারে। আর ভালো লাগে না।'

'নাও, নাও, লক্ষী ছেলের মত চুপটি ক'রে খেয়ে ওঠো তো! আমার অনেক কাজ।'

'কী এমন কাজ তোমার? বাড়িতে কেউ তো নেই-ই বললে।'

'তোমার মত বসিয়ে বসিয়ে শিবু সর্দ্দার তো আর কাউকে খাওয়ায় না। দিন-রাত খাটো, তার উপর মারপিট—'

'মারপিট করে নাকি?'

'সর্দ্দার যত নয়, ঐ মাণ্‌কে আর গণ্‌শা তার দ্বিগুণ! জানো, মাণকে একদিন আমার পিঠে ছোরা বসিয়েছিলো।'

ভোমরা আঁৎকে উঠে বললে: 'বলো কী?'

'ভাগ্যিস ভালো রকম বসে নি—তবে তো অক্কাই পেতাম। তা পাণ্ডাজি মাণকেটাকে ধ'রেও চাবকেছিলেন খুব। তবু কি আমার রাগ পড়েছে ভাবো! ঐ ডাকাতটাকে মা-কালীর কাছে বলি দেব, তবে আমার নাম অর্জ্জুন।'

'তোমার নাম অর্জ্জুন নাকি?'

'অর্জ্জুন আমার নাম, অর্জ্জুন আমার নাম, যথা যুদ্ধ তথা নয়, নাহিকো বিরাম!'

'বাঃ, বেশ তো!' পদ্যের আবৃত্তি শুনে নিজের অজান্তেই ব'লে ফেললো ভোমরা।

'যদি খুব লক্ষ্মী ছেলে হ'য়ে থাকো, তা হ'লে এ রকম তোমাকে আরো শোনাবো। আমি যাত্রা-পার্টিতে ছিলুম কিনা!'

সঙ্গে সঙ্গে ভোমরা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো: 'তুমি যাত্রায় পার্ট করতে? সত্যি? কিসের পার্ট করতে?'

'রাণী সাজতুম, কেষ্ট সাজতুম, সখি সাজতুম—আর বিজয়বসন্ত পালায় বসন্ত যা করতুম—!'

মনে-মনে ঐ চেহারার রাণী কল্পনা ক'রে ভোমরার বেজায় হাসি পেলো, কিন্তু হাসি চেপে গিয়ে বল্‌লে: 'তা হ'লে যাত্রার দল তুমি ছাড়লে কেন?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে অর্জ্জুন বল্‌লে: 'সন্ধ্যেবেলা এসে তোমাকে গান শোনাবো—কত গান জানি আমি—' বলতে বলতেই সে গুণ্ গুণ্ ক'রে গেয়ে উঠলো:

'হ'লো নিশান্ত, এলো বসন্ত
বায়ু অশান্ত যমুনায়—'

অর্জ্জুনের মিহি মাজা গলার গুণ্ গুণ্ গান বড় ভালো লাগলো ভোমরার কানে। বললে—'বাঃ, বাঃ! থামলে কেন?'

অর্জ্জুন বোঁ ক'রে মেঝের উপর একপাক ঘুরে বললে: 'না ভাই, এখন যাই; পাণ্ডাজি টের পেলে খেয়ে ফেলবে। সন্ধ্যেবেলা এসে তোমাকে গান শোনাবো।'

ভোমরা বললে: 'তোমার তো অনেক গুণ আছে দেখছি—এই ডাকাতদের দলে তুমি ভিড়েছো কেন?'

কথাটা যেন শুনতেই পায় নি, এইভাবে অর্জ্জুন বল্‌লে: 'কী, এখনো তোমার খাওয়া হ'লো না? কতক্ষণ আমি ব'সে থাকবো তোমার পাহারায়?'

ভোমরার খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিলো, কিন্তু খাওয়া হ'লেই হাত-কাটা ছেলেটা চ'লে যাবে এ কথা ভেবে তার পাত থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিলো না। একেবারে একা ব'সে ব'সে দিন কাটানো কী কষ্ট। হাত-কাটাকে দেখে প্রথমটায় আঁৎকে উঠলেও তার কথাবার্ত্তা

শুনে এখন সে ভাব তো কেটেই গেছে, বরং বেশ ভালোই লাগছে। কী ক'রে তার হাত-কাটা গেলো, কী ক'রে সে যাত্রার দল ছেড়ে এখানে এলো, এত মারপিট খেয়েও এখানে প'ড়ে আছে কেন—ভোমরার খুব ইচ্ছে করছিলো এ সব জানতে, কিন্তু কী ভাবে জিজ্ঞেস করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। কোন কথারই তো জবাব দেয় না অর্জ্জুন!

অগত্যা সে জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁ ভাই, তোমার বয়েস কত?'

'সাত বছর', গম্ভীর ভাবে বললে অর্জ্জুন।

'সাত!' হী হী ক'রে হেসে উঠলো ভোমরা। 'দেড় বছর বললে না কেন? হ্যাঁ খোকা, তোমার দাঁত উঠেছে? হাঁটতে শিখেছো?'

অর্জ্জুন মুচকি হেসে বললে, 'তা সতেরোও হ'তে পারে।'

'সাতচল্লিশও হ'তে পারে!' ভোমরা হাসতে-হাসতে কুটি-কুটি।

'কী জানি ভাই', অর্জ্জুন ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে, 'বয়েস তো একটা হ'লেই হ'লো; তা নিয়ে অত মাথা-ব্যথা কেন!'

খাওয়া শেষ ক'রে মুখ ধুয়ে ভোমরা উঠে দাঁড়ালো। একটু করুণ সুরেই বললে, 'তুমি ভাই এক্ষুণি চ'লে যাবে?'

'পেট তো ভরলো, এখন চিৎপাত হ'য়ে আকাশ-পাতাল ভাবো। কী আর করবে?' ব'লে অর্জ্জুন মেঝের সঙ্গে হাঁটু ঠেকিয়ে এঁটো বাসন এমন সহজ নিপুণভাবে তার দুই শুঁড়ের মধ্যে তুলে নিয়ে দাঁড়ালো যে ভোমরার মনে হ'লো যেন সার্কাসের একটা কসরৎ দেখছে। সত্যি-সত্যি সে চ'লে যাচ্ছে দেখে ভোমরা বল্‌লে, 'আমার একটা উপকার করবে?'

'তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো—এ-ই তো?'

'অন্ততঃ আমার একটা চিঠি যদি ডাকে ফেলে দাও।'

'কই, দেখি।'

ভোমরা তার পকেটের মধ্যে চিঠিটা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে বললে, 'সত্যি দেবে ডাকে?'

'দেখি না!'

'না—তুমি দেবে না।'

'তবে আর জিজ্ঞেস করলে কেন?'

'আমাকে ভুলিয়ে চিঠিটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে—এই তো তোমার মৎলব?'

'কাকে লিখেছো চিঠি?'

'মা-কে। এ চিঠি পেলেই তিনি টাকা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।'

'সত্যি? দাও আমাকে, আমি তোমার চিঠি পৌঁছিয়ে দেবো।'

'সত্যি দেবে তো?'

'বিশ্বাস না হয় না দিলে।'

ভোমরা ভেবে দেখলো এমনিতে তো সে চিঠি পৌঁছতে পারবে না, ওর হাতে দিতেই বা দোষ কী? পকেট থেকে চিঠিটা বা'র ক'রে আর একবার পড়লো।

অর্জ্জুন হাঁ ক'রে বললে, 'দাও।'

ভোমরা চিঠিটা তার মুখের মধ্যে দিতেই দাঁত দিয়ে সেটা সে চেপে ধরলো। তার পর আর কোন কথা না ব'লে বেরিয়ে গেলো। একটু পরেই দরজায় তালা লাগাবার শব্দ হ'লো।

আবার একা! সময় যেন এখানে আর ফুরোয় না। শুয়ে-শুয়ে ভোমরার মনে হ'তে লাগলো, এই ঘরে বন্ধ হ'য়েই তার দিনগুলো কাটবে, মাঝে-মাঝে অর্জ্জুন তার খাবার দিয়ে যাবে—তা ছাড়া আর কিছু কোনদিন ঘটবে না। তার চিঠি কখনো পৌঁছবে কিনা কে জানে!

(ক্রমশঃ)

কোহিনূরের ইতিকথা

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

গোলকুণ্ডার হীরার খনির নাম অনেকেই শুনেছ আশা করি। বোধ হয় ছ'শো বছর আগে এই খনিতে একখানা প্রকাণ্ড হীরা পাওয়া যায়, তার ওজন ছিল প্রায় চৌদ্দ তোলা। গোলকুণ্ডারাজ্যের মন্ত্রী মীরজুমেলা সেখানা সম্রাট শাহ্‌জাহানকে দেন। এই হীরাখানা এখন 'গ্রেট্ মোগল' নামে পরিচিত, যদিও এর আর অস্তিত্ব নেই। হীরাকে বিশেষ একভাবে কেটে পালিশ না করলে তার উজ্জ্বলতা বাড়ে না, তাই 'গ্রেট্ মোগল'কে কেটে দু'খানা করা হয়। এক টুক্‌রো এখন 'অর্লফ্' নামে পরিচিত, সেখানা নানা হাত ঘুরে গিয়ে রুষসম্রাটের রাজদণ্ডে স্থান পেয়েছিল। অপর টুক্‌রোটাই কোহিনূর। কেউ কেউ বলেন যে তা নয়, কোহিনূর একখানা সম্পূর্ণ আলাদা হীরা, আসলে ১৬ তোলা ওজন ছিল, কিন্তু খারাপ জহুরীর হাতে প'ড়ে কাটবার দোষে তার প্রায় ১৪ তোলাই নষ্ট হ'য়ে এই বাকীটুকু আন্দাজ ২ তোলা রয়েছে, তাকেই কোহিনূর বলা হয়।

সে যাই হ'ক্, মোগল বাদশাহদের হাতেই এই কোহিনূরখানা যে এসে পড়ে তা'তে কোনও সন্দেহ নেই। শাহ্‌জাহানের নাতির নাতি মহম্মদ শাহ্ যখন দিল্লীর সম্রাট্ তখন পারশ্যদেশের রাজা নাদির শাহ্ এসে দিল্লী আক্রমণ করেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার হয়। মোগলসাম্রাজ্য তখন ভেঙ্গে পড়ছে, নাদির সহজেই দিল্লী দখল করেন। তার পর আরম্ভ হয় খুন আর লুঠ। এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোককে কেটে ফেলা হয়, চার কোটী টাকা লুঠ করা হয়, কিন্তু কোহিনূর-খানাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেউ জান্‌ত না এই মণিটী কোথায় গেল, জান্‌তেন কেবল বাদশাহের এক বেগম। শেষে তাঁরই কাছ থেকে খবর বার হ'ল যে বাদশাহ্ দিল্লী লুঠ হবার আগেই কোহিনূরখানাকে তাঁর মাথার পাগড়ীর ভিতরে সরিয়ে রেখেছেন। নাদিরশাহ্ তখন কি করলেন, জান? তিনি মারধোর ক'রে ওটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা না ক'রে একটু চালাকী করলেন। বাদশাহ্‌কে ডাকিয়ে এনে খুব আদর-যত্ন করলেন, খাওয়ালেন, তার পর বললেন যে তিনি তো এখন দেশে ফিরে যাবেন, যাবার আগে বাদশাহ্‌এর সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার ক'রেছেন তার বদলে বন্ধুত্ব ক'রে যেতে চান। বাদশাহ্ তো শুনে তখনই রাজী। নাদিরশাহ্ তখন করলেন কি, নিজের মাথার পাগড়ী খুলে বাদশাহ্‌কে উপহার দিলেন। মুসলমান রাজাদের নিয়ম হ'ল এই যে পাগড়ী বদল করা সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্বের লক্ষণ। বাদশাহের তো চক্ষুস্থির! কিন্তু নিজের মাথার পাগড়ীটী খুলে নাদিরশাহের হাতে না দিয়ে আর উপায় কি? তিনি একটী দামী পাগড়ী পেলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাধারণ চেহারার পাগড়ীর সঙ্গে অমূল্য মণি কোহিনূরও ভারতবর্ষ ছেড়ে চ'লে গেল। নাদিরশাহ্ যখন পাগড়ীটী খুলে প্রথম এই হীরাখানা দেখেন তখন তিনি আশ্চর্য্য হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন "কোহ্-ই-নূর!" মানে এ যে আলোর পাহাড়! তাইতে এই হীরাখানার নাম হ'ল কোহিনূর।

নাদির শাহ্

কিন্তু কোহিনূর সম্বন্ধে লোকের একটা সংস্কার, ওখানা নাকি বড় অপয়া। বেশী দিন যেতে না যেতেই নাদিরশাহ্ তাঁর এক সেনাপতি আহ্‌মদ শাহ্-এর হাতে খুন হ'ন। কোহিনূর নিয়ে তিনি আফগানিস্থানে নিজের দেশে পালিয়ে আসেন। নাদির শাহের আনা আর একটী বিখ্যাত জিনিষ পারশ্য দেশেই থেকে যায়; সেখানা হ'চ্ছে শাহজাহানের ময়ুর-সিংহাসন (তখ্‌ৎ-ই-তাউস্), কেননা নাদির শাহ্ তাকে গালিয়ে ফেলে নিজের জন্য নতুন সিংহাসন গড়েন (তখ্‌ৎ-ই-নাদিরি)। শোনা যায় এর কিছু ভাঙ্গা অংশ এখনও তেহেরান্ সহরে রাজভাণ্ডারে আছে।

আহ্‌মদ শাহের কোনও অনিষ্ট কোহিনূর বোধ হয় করে নি, কিন্তু তাঁর ছেলে শাহ্-সুজাকে রাজ্যচ্যুত হ'য়ে পালাতে হয়। তিনি তখন এই কোহিনূর এনে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহকে দিয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেন, এবং সেখানেই তাঁর থাকা ঠিক হয়। ভারতের মণি এইভাবে লাহোরের দুর্গে ফিরে

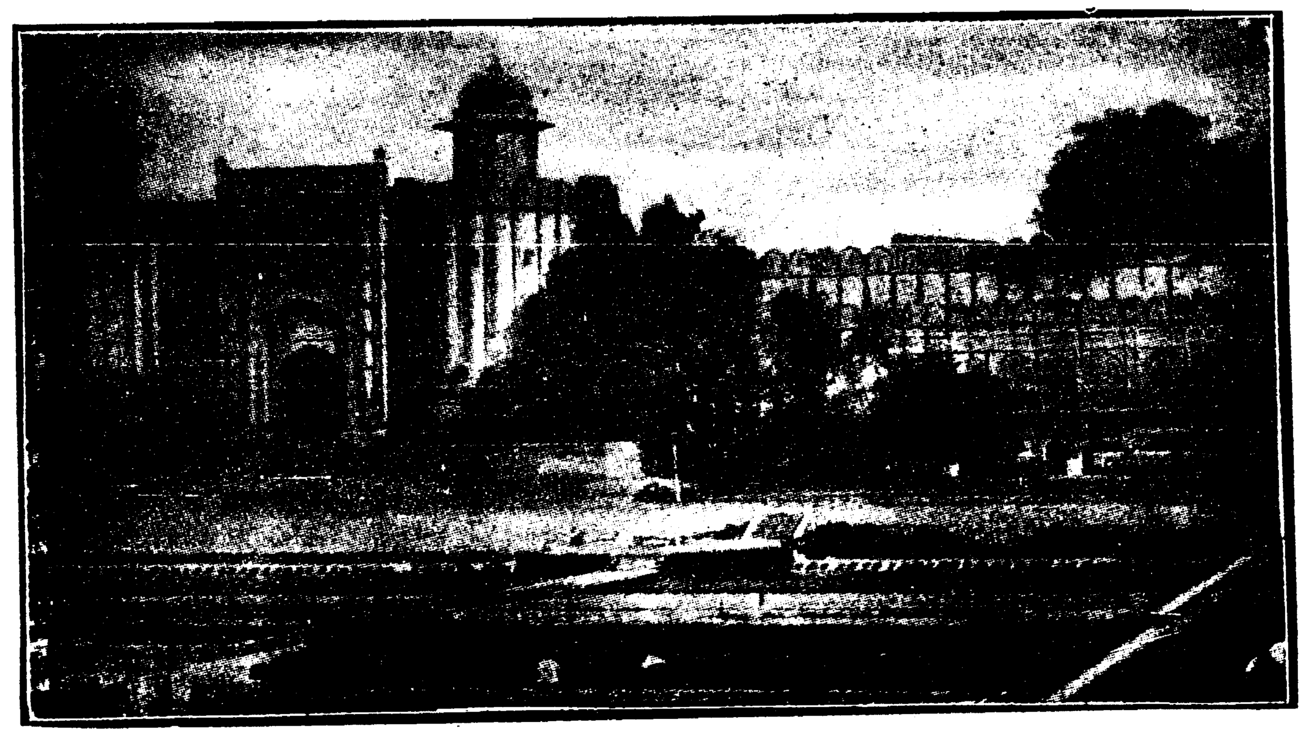

লাহোরের দুর্গ—রণজিৎ সিংহের আবাস

আসে। এর পরে ইংরাজেরা কোহিনূরের কথা শোনেন। তাঁরা রণজিৎ সিংহের কাছে ওখানা কেনবার কথা তোলেন, কিন্তু প্রবাদ, তিনি নাকি বলেন যে এর দাম "পাঁচ জুতি", মানে, যে জুতো মেরে কেড়ে নিতে পারবে এ জিনিষ তারই। দাম দিয়ে একে পাওয়া যায় না। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সত্যিই কখনও

কোহিনূর কেউ কারু থেকে দাম দিয়ে কেনে নি, এর দাম কখনও তাই টাকায় ঠিক হয় নি।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইংরাজদের বন্ধু ছিলেন, তাই মারামারি বা যুদ্ধের কথা আর ওঠে নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে যখন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা পাঞ্জাব দখল করেন, তখন কোহিনূর তাঁদের হাতে আসে। আবার কোহিনূরের অপয়া-দোষের প্রমাণ হ'ল, রণজিৎ সিংহের গড়া শিখরাজ্য ভেঙ্গে গেল।

এখন সমস্যা হ'ল, কোহিনূর নিয়ে কি করা? বিলাতে কর্ত্তাদের অনুমতি চেয়ে চিঠি গেল। এদিকে কোহিনূর প'ড়ে রইল লাটসাহেবের টেবিলে, এক টুক্‌রো কাগজে মোড়া হ'য়ে। দেড় মাস পরে হুকুম এল যে ওটা বিলেতে পাঠিয়ে দাও, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হ'বে। তখন আর কোহিনূর পাওয়া যায় না। শেষটায় অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন চাপরাসী বল্‌লে যে সে

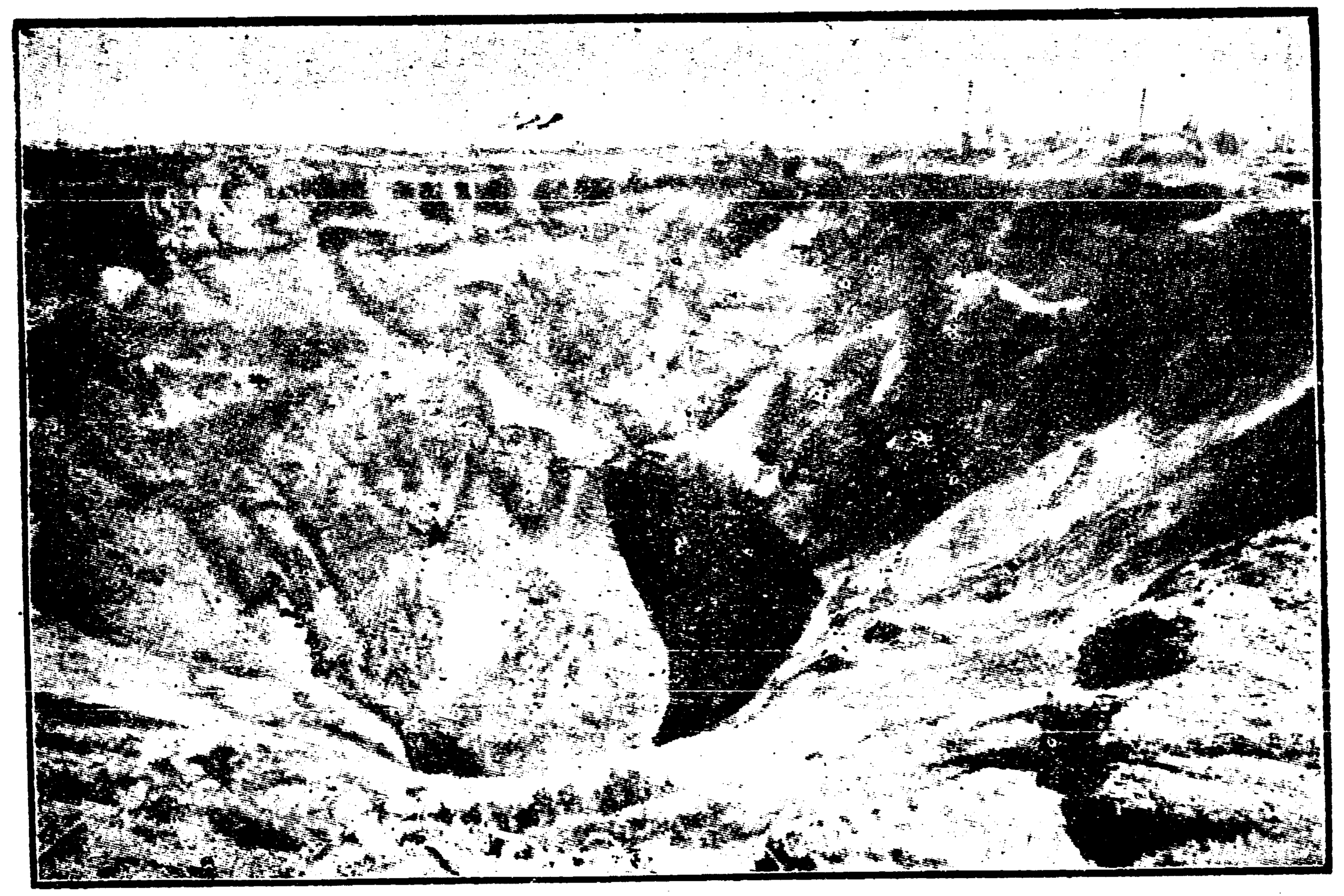

'পোড়া কয়লার' আকর এ জায়গাটির দাম কষতে পার কি? (৩১১ পৃঃ দেখ)

এক টুক্‌রো কাচ লাটসাহেবের ঘরে থাকতে দেখে কুড়িয়ে তুলে রেখেছে। তখন

সেই "কাচ"-খানাকে সযত্নে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ পর্য্যন্ত কোহিনূরের ওজন ছিল ৩২ তোলা, কিন্তু আবার তাকে পালিশ ক'রে পল-তোলায় এর ওজন ক'মে ছ' তোলায় দাঁড়ায়। তার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটের সামনের দিকে এই হীরাখানা বসান হয়। এখনও কোহিনূর রাণীর মুকুটেই আছে। কেননা, কোহিনূর পর্‌লে পুরুষমানুষের অনিষ্ট হয় দেখা গিয়েছে। এত কাণ্ড এই কোহিনূর নিয়ে, অথচ ভেবে দেখ যে এটা কি! আর কিছুই না, কয়েকটা বিশেষ কারণে শক্ত ও স্বচ্ছ-হ'য়ে-যাওয়া মাত্র এক টুক্‌রো কয়লা, যা' মানুষের কোনও উপকার করতে পারে না।

নাতুরাম বাবুর মহানুভবতা

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

ওদের পাড়ার সকলেই জানে বড়লোক বলে। মাস দুই হ'ল এ পাড়াতে ওরা এসেছে। বাবা সেদিন ওদের কর্ত্তা নাতুরাম বাবুর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে গিয়েছিলেন। নাতুরাম বাবু যে ভয়ানক বড়লোক তা তিনি জানতেন এবং আমিও জানতাম। তবুও তিনি আমাকে বাড়ী এসে বল্লেন, "বেণু, কি রকম বড়লোক জানিস?" যদিও জানতাম তবুও বলি ··"না তো!"

বাবা বলেন, "তিন্‌টে ছোট ছোট মেয়ে কাছে এসে বসেছিল, প্রত্যেকটির সমস্ত গা বোঝাই সোনার গয়নাতে!"

"তাই নাকি?"—আমি অবাক্ হয়ে বলি···"ভয়ানক বড়লোক তো!"

নাতুরাম বাবুর নাকি সর্ব্বনাশ হয়েছে—প্রায় বিশ হাজার টাকার গয়না চুরি গেছে। চুরিটা কাল রাত্রে হয়েছে। পাড়ার লোকেদের মধ্যে বাবার-ই সব চেয়ে বেশী আলাপ নাতুরাম বাবুর সঙ্গে। বাবা সমবেদনা কিংবা বন্ধুবাৎসল্য দেখাবার জন্য খালি গায়েই নাতুরাম বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত। আমি ও আমার

মতন দশ বারোটা ছেলে তাঁর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গত রাত্রের চুরির আলোচনা করতে তখন ব্যস্ত। বাবা বাড়ীর ভিতর ঢুকে নাতুরাম বাবুকে প্রশান্ত মনে বৈঠকখানায় তামাক খেতে দেখে একটু অবাক্ হয়েই গেলেন। যাঁর বাড়ীতে কাল বিশ হাজার টাকার গয়না চুরি হয়ে গেছে তিনিই কিনা নিশ্চিন্ত মনে বসে!

বাবা চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাস করেন—"পুলিশে খবর দিয়েছেন তো! আমার মনে হয় আপনার নতুন চাকর গণেশের-ই এ কাজ। সত্যিই দুঃখ করবার কথা—এক নয়, দুই নয়, এমন কি তিন নয় একেবারে বিশ হাজার!"

নাতুরাম বাবু হেসেই উত্তর দিলেন, "কি হয়েছে আজ গেছে কাল হবে। ও নিয়ে আর পুলিশ ডেকে কি হবে!" বাবা অবাক্, বাকহীন।

ক্রমে আস্তে আস্তে আরও অনেকে সাক্ষাৎ করতে এলেন। রামঅক্ষয় বাবু বেজায় মরালিষ্ট, তিনি বল্লেন, "সে হয় না নাতুরাম বাবু, আমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে সমাজের প্রতি, জেনেশুনে চুরির প্রশ্রয় আমরা দেব না; আপনি না পারেন, আমরা পুলিশে খবর পাঠাচ্ছি।"

নাতুরাম বাবু খানিক ভেবে বল্লেন, "তা, ওই যে চুরি করেছে তার তো কোন প্রমাণ নেই, শুধু একমাত্র আপনাদের সন্দেহ ছাড়া। বিনি প্রমাণে কেন অনর্থক লোকটাকে কষ্ট দেবেন?"

"আলবৎ ও ওরই কাণ্ড" রামঅক্ষয় বাবু গর্জ্জে উঠলেন, "দিন না ওকে পুলিশে পাঠিয়ে, ভেতরের সব খবর আপনি বেরিয়ে আসবে।"

নাতুরাম বাবু করুণ ভাবে একবার গণেশের দিকে চাইলেন; তার মুখে "শোচনীয়" কি ছিল জানি না, হঠাৎ কিন্তু নাতুরাম বাবু করুণায় একেবারে দ্রব হয়ে গেলেন, ছল ছল চোখে বলে উঠলেন, "না না, রামঅক্ষয় বাবু, যেতে দিন, যেতে দিন। ছোকরার বয়স অল্প, জেলে দিলে জীবনটাই মাটী হয়ে যাবে। আমার বরাতে বিশ হাজার টাকা লোকসান ছিল, তা আর কে খণ্ডাবে বলুন!"

বাবা বল্লেন, "কিচ্ছু না, স-ব আপনি ফিরে পাবেন। অবশ্যি মজুরীটা তো যাবেই তার আর করা কি? ও ব্যাটা কি আর গয়নাগুলো গয়নার অবস্থাতে রেখেছে? নিশ্চয়ই গালিয়ে সোনার তাল করে ফেলেছে।"

নাতুরাম বাবু এইবারে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন; তিনি মন বেঁধে ফেলেছেন, দৃঢ়ভাবে বল্লেন, "নাঃ, ছোঁড়াকে আমি কিছুতেই পুলিশে দেব না। আমায় মাপ করবেন আপনারা।"

নাতুরাম বাবুর অসাধারণ মহানুভবতার কথা ভাবছি, ঠিক এমনি সময় তাঁর ছোট মেয়ে এসে বল্লে, "বাবা, মা ডাকছেন, ভেতরে এস।"

পর্দ্দার আড়াল থেকে ওঁদের কথাবার্ত্তা শুনতে পেলুম; নাতুরাম বাবুর স্ত্রী বলছেন, "তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি, এতগুলো ভদ্রলোক বলছেন......আর কিছু না হোক সোনাটাও তো ফেরৎ পাওয়া যাবে!"

নাতুরাম বাবু বোঝাতে চেষ্টা করেন, "আহা-হা তুমি বুঝছ না..."

"চাইনে আমি বুঝতে। তুমি পুলিশে না পাঠালে তো বয়েই গেল, আমি ন'দাকে খবর পাঠাচ্ছি।" ওঁর ন'দা পুলিশ-কোর্টের উকীল, আমরা জানি।

ঘণ্টা দুই বাদে ইস্কুলে যাওয়ার জন্য চড়কডাঙ্গার মোড় পার হচ্ছি, দেখি গণেশ প্রশান্ত ভাবে এক গাল পান চিবুতে চিবুতে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে—দেশে যাবে বলে, সঙ্গে গাঁটরি-বোঁচকাও রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কিরে ব্যাটা, পালাচ্ছিস্ যে বড়?"

গণেশ ছপ্ করে খানিকটা পানের পিক ফেলে, ঢোঁক গিলে বল্লে, "পালাব কেন, বাবু একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলেছেন, 'গণেশ, তুই এবার বাড়ী চলে যা।' আসলে হয়েছে কি জানেন দাদা বাবু, ও গয়নাগুলো সব পেতলের, স্যাকরার দোকানে ভাঙ্গাতেই কাল আমি তা টের পেয়ে গেছি। পেতলের ওপর গিল্টি করা গয়না এনে বাবু তাই গিন্নীমাকে দিতেন, গিন্নীমা ভাবতেন খুব সোনাদানা গায়ে তুলছি। আমায় পুলিশে দিলেই ভেতরকার সব কথা বেরিয়ে পড়বে, তাই বাবু আমায় বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

বিকেলে বাড়ী ফিরে দেখি নাতুরাম বাবুর বেজায় নাম রটে গেছে। এত টাকার গহনা চুরি গেছে অথচ মুখের হাঁসিটি একটুও নেভে নি! কী বড়লোক! আর মহানুভবও খুব!

"ডুয়েল্"

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

"জুয়েল" ছুটো "ডুয়েল" লড়ে,
"ফিউয়েল্" জোগায় মদ্‌না,
খক্‌খকিয়ে খগেন খুড়ো
বল্‌লো, "এরা সৎ না !
"দারুণ রোদে কারণ কি হে
কও তো বাপু পষ্ট—

"আঁচড় কামড় কীল ঘুঁষিতে
পাচ্ছ কেন কষ্ট ?
"কি হয়েছে—কি হয়েছে—
কি হ'য়েছে বন্ধু ?
"রাম-রাবণে যুদ্ধ—শেষে
ছিঁড়্‌বে শিরা-তন্তু !

"আওরা বুলোয় পাগ্‌লা হাওয়া
কাপড় ছিঁড়ে বাগ্‌লা
"ধুলোয় ধুলো হ'চ্ছে যে ভাই
কচি আমের চাক্‌লা !
"ঝগড়া-ঝাঁটি আর না বাপু,
আর না বাপু কুস্তি—
"এই দেখেছ, এদিক্ এস,
চাটিম কলা ঘুষ দি' !
"থামলে যখন আর লেগ না—
কিন্তু বড় দুঃখু
"কলা—এ তো মাটীর কলা
বুঝ্‌লে কিনা মূখ্যু !"

বিনুর মাষ্টারী

(শ্রীবিনোদগোপাল লাহিড়ী)

বিনু এইবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে। ফলটা যে কী রকম দাঁড়াবে তা সে নিজও ঠিক কর্‌তে পারে না। প্রথমে ভাবে ষ্টার মার্ক থাক্‌বে ; তার পর ভাবে, ফাষ্ট ডিভিশানে পাশ কর্‌বে। তার পর হঠাৎ ভাব্‌তে বসে, সংস্কৃততে কি হবে ? পাশ, না—পরেরটা আর ভাব্‌তেই পারে না। তবে ইংরেজীতে পাশ করলে আর কারও সাধ্যি নেই তাকে আটকায়। তাই কেউ ফলের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর্‌লে বলে, 'সম্ভব'। মতলবটা বোধ হয় দু'কূলই বজায় রাখা। পাশ করাও 'সম্ভব' আবার ফেল করাও বোধ হয় 'সম্ভব'।

যাই হোক পরীক্ষা অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন সে চুপচাপ্ বসে থাকে। মাঝে মাঝে তার খেয়াল চাপে মাষ্টারী কর্‌তে। তাই একদিন গেল সে এক মাষ্টারীর খোঁজে।

ছেলে বল্‌লে সেখানে, 'বাবা, মাষ্টারের গোঁফ বেরোয় নি। এঁর কাছে কী পড়ব?' কথাটা শুনেই বিনুর হয়ে গেল রাগ—সে এল ফিরে।

এর পরে একদিন বিনু শেয়ালদা থেকে হাঁটতে হাঁটতে গেল টালীগঞ্জে আর এক মাষ্টারীর তল্লাসে। গিয়ে শুন্‌ল, এক বুড়ী মেম পড়্‌বে বাংলা। তাতেও বিনু দম্‌ল না। কিন্তু যখন মেম হেল্‌তে-তুল্‌তে এলেন—বিনু কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লে দৌড় দিল এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম ধরতে। দোষের মধ্যে, মেমটি ছিল একটু বেশী মোটা। তার ওপর সামনের তুটো দাঁত যেন 'সূর্য্যমুখী'। শুধু তাই নয়, আবার ভীষণ ট্যারা। সেদিকে বিনু যত বার তাকিয়েছে তত বারই তার হৃৎপিণ্ডটা দ্বিগুণ জোরে ঢিব্‌ঢিব্ করেছে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে এত জোরে কাজ করতে হ'লে সে যদি হঠাৎ একদিন ষ্ট্রাইক্ করে বসে,—ঢিব্‌ঢিব্ একদম বন্ধ করে দেয়! সে তো ভয়েরই কথা!

কিন্তু মাষ্টারী বিনুর চাই—ই। আবার কিছুদিন বাদে খুঁজে খুঁজে বিনু গেল এক মুদীর বাড়ীতে। শুন্‌ল, তু'টী থার্ড ক্লাসের ছেলে, একটী ফোর্থ ক্লাসের। সেভেন্থ্ ক্লাসে পড়ে এই রকম তিনটি মেয়ে। পড়াতে হবে তু'বেলাই, আর রবিবারের দিন বাদ দিলে চল্‌বে না। মাইনে গোড়ায় তিন টাকা—তার পরে ভাল পড়ালে তু' বৎসর পরে হবে সাড়ে তিন টাকা। এবারে হৃৎপিণ্ড নয়, বিনুর পিলে চম্‌কে উঠ্‌ল। হৃৎপিণ্ডের মত অতটা জরুরী না হ'লেও সেটাকে চম্‌কাতে দেওয়াও নাকি ডাক্তারী-শাস্ত্রে বারণ, অগত্যা বিনুকে সেখান থেকেও ফিরতে হ'ল। এত দিন তোতা পাখীর মতই সে ভূগোল আউড়ে এসেছে, মর্ম্মে পৌঁছুতে পারে নি। আজ তার গোড়ার কথাটা সত্যিসত্যিই চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল—জগৎটা বাস্তবিকই গোল।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে অনেক হাঁটাহাঁটি করে ঠিক হ'ল, বিনু ইংরাজি পড়াবে বড়বাজারের এক কাপড়ওয়ালাকে। মাইনে দেবে না বটে কিন্তু তু'বেলা

খেতে দেবে। তাতেই রাজী হয়ে বিনু কাজে লেগে গেল। মনে মনে ধারণা, হাজার হোক এত বড় ব্যবসাদারের সংসর্গ। বলা যায় না কখন চাকা ঘোরে। যদি বা পুষ্যিপুত্তরই নিয়ে নেয়!

প্রথম প্রথম বেশ সরু চালের ভাত, ডাল, তরকারী-মাছ-টক্-দৈ-মিষ্টি এমন কি পান-সুপারীও জুট্‌তে লাগ্‌ল। বিনু ভাব্‌ল, এত দিন বাদে বুঝি বা চাকা ঘুরল। কিন্তু ক্রমে ঘাড়ে চাপ্‌ল পড়িয়ে উঠে বাজারে যাওয়া; তার পর ধোপার হিসেব রাখা; ক্রমে বাড়ীর প্রায় সব কাজই এসে তার ঘাড়ে বাসা বাঁধ্‌ল। ওদিকে সরু চাল হয়ে উঠ্‌ল দাঁতের মত মোটা, মাছ-দৈ-মিষ্টি আর পড়ে না। আবার ক্রমে এই ভাত-ডাল-তরকারীর জন্যেও তা'র আর রোজ ডাক আসে না—নিজে চেয়ে চেয়ে খেতে হয়। অগত্যা বিনুকে পুষ্যিপুত্তরের আশা ছেড়ে ফিরতে হ'ল বাড়ী।

এবার সে ঠিক কর্‌ল—ভদ্রলোকের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও মাষ্টারী করবে না। সকালবেলা খুলে বসে 'আনন্দবাজারটা।' চোখ পড়ে 'আবশ্যকের' কলমে। দেখ্‌তে পায় কোথাকার এক রাণী চান তাঁর ছোট ছেলের জন্য একজন গভর্ণেস্।

বিনু হয়তো কর্‌তে পারত, কিন্তু গভর্ণেস কথাটাই সব গণ্ডগোল বাধিয়ে দেয়। তার পর—উচ্চ কমিশনে একজন এজেণ্ট চাই। তার পর—চাই একজন শিক্ষিত, উত্তম শ্যামবর্ণ, অল্পবয়স্ক, সুশ্রী, অন্ততঃ ম্যাট্রিক্ পাশ, শাণ্ডিল্য গোত্র, উপার্জ্জনক্ষম পাত্র। সব বাজে!

হঠাৎ কিন্তু এরই মধ্যে সত্যিই একদিন তার চাকা ঘুরে গেল।

'চিত্রা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক মনে সে কি একটা বিজ্ঞাপন পড়ছিল, হঠাৎ পেছন থেকে কে তার ঘাড়ের ওপর সশব্দে হাত রেখে বলে উঠ্‌ল, "হ্যাল্লো, বিনু ডিয়ার!" বিনু চম্‌কে ফিরে চাইল; মফঃস্বলের ছেলে সে, এখানে কে তাকে এমন পরিচিতের মত আপ্যায়িত করছে! ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে—আঃ রে, এ যে তাদের সেই সুনীল চালিয়াৎ! সে তো জান্‌ত ও এখন বিলাতে! কৃষ্ণনগরে বিনুদের সঙ্গেই পড়্‌ত, চালিয়াৎ ছাড়া ওখানে অন্য নামে কেউ কখনও তাকে

ডাকে নি। ফেল করে কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় বলে এসেছিল, "কি করি, বাবার ইচ্ছা বিলাত গিয়ে পড়ি"। তার সেই চার আনা-বার আনা চুল আজকাল ছ' আনা-চোদ্দ আনায় প্রমোশন পেয়েছে, আর গলার সঙ্গে কালো ফিতেয় ঝোলান একটা চশমাও রয়েছে, বিনু লক্ষ্য করল।

"তার পর বিনু, কি করছিস্ আজকাল?" সুনীল জিজ্ঞাসা করল।

বিনু তাকে তার প্রাইভেট্ ট্যুইশনির করুণ ইতিহাস আদ্যোপান্ত শুনিয়ে দিল। শুনে সুনীল বল্লে, "তুই একটা ক্যাড্! ম্যাট্রিক্ দিয়েছিস শুন্‌লে কে তোকে ট্যুইশানি দেবে শুনি? আর যদিও বা দেয় তো ওই মুদীর মতই তিন টাকা মাইনে বরাদ্দ কর্‌বে। বল্‌বি আই-এ পাশ, থার্ড ইয়ারে পড়ি।"

বিনু চম্‌কে উঠ্‌ল, "বলিস্ কি, জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বল্‌ব?"

"তবে ব'ল না। যাও, ভ্যারাণ্ডা ফ্রাই কর গে!" সুনীল ছ' হাতের বুড়ো আঙ্গুল দুটো একত্র করে বিনুর মুখের সাম্‌নে বার দুই নাচিয়ে নিল। তার পর গলা খাটো করে আবার বল্ল, "আরে, কল্‌কাতায় এসেছিস্, এখনও চালের মর্ম্ম বুঝ্‌লি নি! সমস্ত কল্‌কাতা সহরটাই চল্‌ছে কেবল চালের ওপর। চাল দিতে পার, টিঁকে গেলে, চাল দিতে না পার, নিভে গেলে……আচ্ছা, আমি এখন চলি, এইবার শো আরম্ভ হবে" বলে সুনীল চিত্রায় ঢুকে পড়্‌ল।

আবার দিন কতক ধরে চল্ল বিনুর চেষ্টা। কিন্তু সবই যায় ভেস্তে; ম্যাট্রিক্ দিয়েছে শুনে কেউ বা দ্বিতীয় বার বাক্য ব্যয় করাই অনাবশ্যক বোধ করে, কেউ বা সেই মুদীর মতই দর হেঁকে বসে তিন টাকা। বিনু প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ তখন তার নজরে এল ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন—অমৃতবাজার পত্রিকায়—

"সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রকে পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষক চাই। বেতন যোগ্যতা অনুসারে।"

বিনুর তখন এস্পার কি ওস্পার অবস্থা। তাড়াতাড়ি ঠিকানাটা একটা কাগজে টুকে নিয়ে, চুলটাকে একটু ব্যাক্ ব্রাস্ করেই সে বেরিয়ে পড়্‌ল সেই ঠিকানাটার উদ্দেশ্যে।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, বার কয়েক কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে

এক-চোখ-কানা একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকে চাই আপনার?" বিনু বিরক্ত হয়ে বল্লে, "তোমার চেয়ে বড় কাউকে ডেকে দাও।"

"আচ্ছা দিচ্ছি, দাঁড়ান" বলেই মেয়েটি অন্তর্হিত হয়ে গেল। একটু বাদেই যেম্‌নি কালো তেম্‌নি মোটা, তার উপর খুব বড় বড় গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক প্যাণ্টে বেল্‌ট্ আঁট্‌তে আঁট্‌তে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে চাও?"

কি বিশ্রী কর্কশ গলা রে বাবা! একেবারে যেন গরম কালের শুক্‌নো নদীর পাড়। সব কাঠ হয়ে আছে। বিনু কোনমতে জবাব দিল, "আজ্ঞে—কাগজে দেখলাম, আপনার একজন মাষ্টার চাই। তাই—"

হঠাৎ সেই কুইনিনের পিলটা একটু হেসে বল্‌লে, "মাষ্টার আমার জন্য চাই নে—আমার ছেলের জন্যে চাই। ভেতরে এস।" বলেই একটা সাজানো-গোছান ঘরে নিয়ে গিয়ে বিনুকে বসালেন। তার পরেই আরম্ভ করলেন:

"দেখ, আমি অল্প কথার মানুষ, বেশী কথা বা বাজে কথা পছন্দ করি না। যা বল্‌ব তার সোজা উত্তর চাই।"

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করুন। যথাযথ উত্তরই ধরুন আমি দেব।"

"ধরুন-টরুন নয়, একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বল্‌তে হবে।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

"এখন কি কর?"

"আজ্ঞে, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি।"

"ম্যাট্রিক্ কোন্ ডিভিশানে পাশ করেছ?"

"আজ্ঞে, তা' আপনাদের আশীর্ব্বাদে ফার্ষ্ট ডিভিশানে।"

"কোনও বিষয়ে—কি বলে—লেটার-টেটার পেয়েছিলে?"

"আজ্ঞে, চারটে লেটার পেয়েছিলাম। সংস্কৃততে, বাংলাতে, অঙ্কতে, মেকানিক্‌স্‌এ।"

"ও, তা হ'লে তুমি ভাল ভাবেই পাশ করেছ বল?"

"তা' আপনাদের আশীর্ব্বাদে একটা স্কলারশিপ্‌ও পেয়েছিলাম।"

ভদ্রলোক সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্কলার্‌শিপ্? কত টাকার হে?"

"আজ্ঞে—পনেরো টাকার।"

"প—নে—রো—টা—কা! বাঃ, বেশ ছেলে তো তুমি।" ভদ্রলোক যেন বেশ একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, "তুমিই পারবে। তবে ছেলেটা আমার একটু ডাল্‌, গড়ে-পিটে নিতে হবে—বুঝেছ না?"

"সে আর বল্‌তে হবে না। তবে তার কমবিনেশন্‌টা কি?"

"তা তো ঠিক বল্‌তে পারি নে—দাঁড়াও তোমার ছাত্রকেই ডাকি—" বলেই ভদ্রলোক ডাক দিলেন, 'ও পচা, পচা—!"

সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ পচা বেরিয়ে এল; গুরুশিষ্যের চারি চক্ষের মিলন হ'ল। গুরু দেখ্‌ল শিষ্যরূপে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে শ্রীমান্‌ সুনীলচন্দ্র চালিয়াৎ, আর শিষ্য দেখ্‌ল মাষ্টাররূপে তার সাম্‌নে শ্রীমান্‌ বিনু। ভদ্রলোক দাঁতের আগে একটু মিষ্টি হাসি টানবার চেষ্টা করে বল্লেন, "এই আপনার ছাত্র।...তোর মাষ্টার মশাইকে প্রণাম কর্‌লি না পচা? দিনকের দিন তুই কি জানোয়ার বনে যাচ্ছিস্‌ বল্‌ দেখি! এ সব কথাও কি শিখিয়ে দিতে হবে?"

"থাক্‌, থাক্‌, আমি এম্‌নিই আশীর্ব্বাদ করছি।...তোমার নাম বুঝি পচা?"

ভদ্রলোক আর একবার হাসবার চেষ্টা করে বল্‌লেন, "পচা ওর ডাক নাম, ভাল নাম সুনীল—সুনীলচন্দ্র দস্তিদার। আচ্ছা, তোমরা এখন পড়ার বিষয় আলোচনা কর, আমি আস্‌ছি।"

মণি-মঞ্জুষা

(শ্রীহেমলতা দেবী)

ডাক্তার জেকিল ও মিষ্টার হাইড্‌

('ডাক্তার জেকিল ও মিষ্টার হাইড্‌' বইখানি রবার্ট্‌ লুই ষ্টিভেন্‌সনের লেখা। ইনি একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় এক শিক্ষিত পরিবারে এঁর জন্ম হয়।

সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কাজ এঁর বড় ভাল লাগ্‌ত না। জীবনের বেশীর ভাগই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ইনি সাহিত্যচর্চ্চা করে গেছেন। এঁর অনেক বই-ই রোগশয্যায় শুয়ে লেখা, তা সত্ত্বেও সমালোচকদের মতে সে সব বইএর যুড়ি নেই। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' বইখানাও এঁরই লেখা। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।)

দুই বন্ধু লণ্ডনের এক রাস্তা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ পথের ধারে একটা জানলাহীন, 'পোড়ো' চেহারার দোতলা বাড়ী দেখিয়ে একজন আর একজনকে বল্লেন, "সেদিন এখানে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। আমি রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, দেখি, একটা বিশ্রী চেহারার লোক ছোট্ট একটি মেয়েকে ধাক্কা মেরে ফেলে তার গায়ের ওপর দিয়েই হেঁটে চলে যাচ্ছে। আমি গিয়ে তাকে থামাতেই সে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে আমার দিকে তাকাল। আমিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে সে বল্লে, বেশ, সে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে, বলে এই বাড়ীটার মধ্যে ঢুকল; আর খানিক বাদে একটা চেক্‌ এনে দিল। চেকের সইটা আমার খুবই চেনা, অথচ চেক্‌টা জালও নয় সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

অপর বন্ধুটি (তিনি একজন আইন-ব্যবসায়ী—তাঁর নাম মিষ্টার আটারসন্‌) একটু অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, লোকটার নাম কি জান?"

"তার নাম হাইড্‌", বন্ধু একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিলেন।

সেই রাত্রে দেখা গেল, আটারসন্‌ তাঁর আলমারী থেকে একটা উইল্‌ বার করে ভাল করে পরীক্ষা করছেন। উইলখানা তাঁর বন্ধু ডাক্তার জেকিলের। ডাক্তার জেকিলকে অনেকেই চেনে—পণ্ডিত, সৎ স্বভাবের লোকটি। উইলে লেখা আছে—ডাক্তার জেকিলের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি এডোয়ার্ড্‌ হাইড্‌ নামে একজন লোক পাবে। আর ইতিমধ্যে যদি ডাক্তার জেকিল অকারণে নিরুদ্দেশও হন তা হ'লেও তিন মাস পরে তাঁর সম্পত্তি হাইড্‌ দখল করবে। আটারসন্‌ ব্যাপারটাকে গোড়ায় পাগলামী বলে মনে করেছিলেন, এখন হাইডের স্বভাবের পরিচয় পেয়ে দস্তুরমত হতভম্ব হয়ে গেলেন।

ডাক্তার জেকিলের পরম বন্ধু ছিলেন ডাক্তার ল্যানিয়ন্‌। আটারসন্‌ ল্যানিয়নের কাছে হাইডের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ল্যানিয়ন্‌ জানালেন, তিনি

TIGHT BINDING

ইতিপূর্ব্বে হাইডের নাম শোনেন নি, আর বছর দশেক থেকে ডাক্তার জেকিলের মতিগতিও তাঁর কাছে ভাল ঠেকছে না; আজকাল তো তাঁর দেখা পাওয়াই ভার।

সেদিন থেকে আটারসন্ সেই দোতলা বাড়ীটার দিকে নজর রাখলেন, বাড়ীটা নাকি জেকিলেরই—ল্যাবরেটরী। তার পর একদিন হাইডের দেখাও পেয়ে গেলেন। বেঁটে, অত্যন্ত রুক্ষ চেহারার লোকটা, হঠাৎ দেখলে মনে হয় বিকলাঙ্গ। পকেট থেকে চাবি বার করে সে সেই দোতলা বাড়ীর দরজা খুলছিল, আটারসন্ গিয়ে তাকে পাকড়াও করলেন। হাইড্ বল্ল, সে ডাক্তার জেকিলকে চেনে, এবং নিজের একটা ঠিকানাও দিল; তার পর সে সেই বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আটারসন্ বুঝতে পারলেন এই হাইড্ কোন রকমে ডাক্তার জেকিলকে নিজের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, এবং তাঁকে দিয়ে যা খুসী করিয়ে নিচ্ছে। কারণটি অজ্ঞাত, কিন্তু নিশ্চয়ই খুব রহস্যপূর্ণ। নচেৎ জেকিলের মত একজন সৎ লোক এ ভাবে এই নিষ্ঠুর চরিত্রের সয়তান লোকটার খপ্পরে কি করে পড়লেন? জেকিলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আটারসন্ দেখা পেলেন না, তবে তাঁর বাট্লারের কাছে খবর পেলেন জেকিলের অনুপস্থিতিতে হাইড্ ল্যাবরেটরীতে ঢোকে, তার কাছে একটা চাবিও আছে, এবং জেকিল তা' জানেন।

এর কিছু দিন পরে লণ্ডন সহরে একটা অদ্ভুত এবং পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হ'ল। স্যর ড্যান্ভারস্ ক্যারু নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাস্তায় বেরিয়েছিলেন, এমন সময়ে ঠিক হাইডের মত চেহারার একজন লোক কোথা থেকে এসে তাঁকে লাঠি মেরে মাটিতে ফেলে পশুর মত পা দিয়ে পিষে হত্যা কর্‌ল; নিহত ভদ্রলোকের দাসী জানলা দিয়ে ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু সে চীৎকার ক'রে লোকজন ডেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগেই হাইড্ অদৃশ্য হ'ল, এবং তার পর আর তার খোঁজ পাওয়া গেল না।

এই কেস্‌টা তদারক করবার ভার পড়্‌ল আটারসনের উপর। হাইড্ পালাবার সময়ে লাঠিগাছটা ফেলে গিয়েছিল, আটারসন্ সেটা দেখেই চিনতে পারলেন। লাঠিটা জেকিলের, তিনিই তাঁকে কিছু দিন আগে সেটা উপহার দিয়েছিলেন।

হাইডের দেওয়া ঠিকানায় খোঁজ ক'রে তাকে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল কতকগুলি পোড়া কাগজ, আর একখানা আধ-পোড়া চেক্ বই। চেক্ বই ধরে ব্যাঙ্কে গিয়েও কোন লাভ হ'ল না, হাইড্ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলাও আবশ্যক বোধ করে নি।

অবশেষে আটারসন্ সেই দোতলা বাড়ী—ডাক্তার জেকিলের ল্যাবরেটরীতে হাজির হলেন। সেখানে জেকিলের দেখা পাওয়া গেল—কিন্তু এ কি! তাঁর চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? ঠিক যেন মৃত্যুপথযাত্রী রোগী!

আটারসন্ জেকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি এই হত্যার কথা শুনেছেন কিনা। জেকিল জানালেন তিনি শুনেছেন।

"তবে, তবে কি তুমি সমস্ত জেনে-শুনে হাইড্‌কে—একটা খুনী আসামীকে লুকিয়ে রেখেছ?"

জেকিল অস্বীকার করলেন, তার পর বল্লেন, "হাইড্ নিরাপদে আছে, আর তাকে কেউ দেখতে পাবে না, এই দেখ তার একটা চিঠি"। আটারসন্ চিঠিখানা নিলেন, চিঠিখানা সোজা সোজা—একটু অদ্ভুত হরফে লেখা। তিনি জেকিলের বাট্‌লারকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন এ চিঠি কে নিয়ে এসেছে। বাট্‌লার জানাল যে সে কাউকে এখানে ঢুকতে দেখে নি। আটারসনের মুহুরী হাতের লেখা বিচারে বেশ ওস্তাদ্ ছিল, সে চিঠিখানা পরীক্ষা করে বল্‌ল, এ আর কারও হাতের লেখা নয়, লেখা স্বয়ং জেকিলেরই হাতের, ইচ্ছা করে একটু বিকৃত করা হয়েছে মাত্র। আটারসনের মাথায় গোল বেধে গেল। এ কি ব্যাপার! জেকিলের মত নির্ম্মল চরিত্রের লোক শেষে কিনা একটা খুনীর হয়ে জাল করতে সুরু করলেন!

ইতিমধ্যে একদিন ডাক্তার ল্যানিয়ন্ এসে হাজির। মুখ তাঁর অসম্ভব রকম গম্ভীর। জেকিলের কথা তুলতেই তিনি বল্লেন, "ও নাম আমার কাছে তুল না। আমার কাছে জেকিল এখন মৃত।"

এর কিছু দিন পরেই ডাক্তার ল্যানিয়ন্ শয্যা নিলেন এবং কয়েক দিনের

TIGHT BINDING

মধ্যেই মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর একজন লোক এসে আটারসন্‌কে খামে মোড়া একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে লেখা ছিল "প্রাইভেট; জেকিলের মৃত্যু না ঘটলে বা তিনি নিরুদ্দেশ না হ'লে যেন খোলা না হয়।" মৃতের অনুরোধ আটারসন্ রক্ষা না করে পারলেন না, তিনি সে চিঠি আর খুললেন না। তিনি গেলেন জেকিলের বাড়ী। জেকিলের দেখা পাওয়া গেল না। তাঁর বাট্‌লার বল্ল, তার মনিব আজকাল ল্যাবরেটরীর বাইরে বড় একটা বেরোন না, আর তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

এর কিছু দিন পরে একদিন আটারসন্ তাঁর সেই পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সেই দোতলা বাড়ীর নীচে এসে দেখলেন ওপরে জানলার ধারে ডাক্তার জেকিল চুপটি করে বসে আছেন, অত্যন্ত বিমর্ষ মুখ—ঠিক যেন দীর্ঘ কারাবাসে দণ্ডিত বন্দী। আটারসনের শত অনুরোধেও জেকিল নীচে নামলেন না। হঠাৎ দেখা গেল তিনি যেন ভয়ে থর থর করে কাঁপছেন, সারা মুখ-চোখে সে কী কাতরতার ভাব! পরক্ষণেই সশব্দে জানলা বন্ধ হয়ে গেল।

তার পর একদিন রাত্রে জেকিলের বাট্‌লার এসে খবর দিল, "আমার মনিব প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তাঁর ঘরে বন্ধ হয়ে আছেন এবং অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। আপনি একবার আসুন।"

আটারসন্ গিয়ে জেকিলের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভেতর থেকে জবাব এল, "আমি এখন কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই না।" একি! এ গলার স্বর তো জেকিলের মত নয়! বাট্‌লারও বল্লে, "না, এ স্বর আমার মনিবের মত নয়—আমার সন্দেহ হচ্ছে ঘরে আর কেউ আছে। যেই থাক্ লোকটি রাতদিন সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে আর কতকগুলি কাগজে কয়েকটা ওষুধের নাম লিখে সেগুলি এনে দেবার জন্য বার বার অনুরোধ করছে। হাতের লেখাগুলি অবশ্য আমার মনিবেরই মত, কিন্তু ভিতরের লোকটিকে আমি একবার দেখতে পেয়েছিলাম—উনি কিছুতেই আমার মনিব নন। আমার মনিব কেমন লম্বা, আর এ লোকটা বেঁটে, চেহারাও অত্যন্ত রুক্ষ।" বাট্‌লার আরও জানাল যে সে ভিতর থেকে মাঝে মাঝে কান্নার শব্দও শুনতে পায়।

তখন সবাই মিলে ঠিক করলেন, দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হবে।

দরজা ভাঙ্গবার চেষ্টা করতেই ভেতর থেকে করুণ মিনতি শোনা গেল, "ঈশ্বরের দোহাই, দরজা খুল না।"

আটারসন্ চিনতে পারলেন, এ যে হাইডের গলা! আর দেরী না ক'রে দরজা ভেঙ্গে ফেলা হ'ল।

ঘরে ঢুকে দেখা গেল, মেঝেতে একজন লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে, লোকটা যেন দাপাচ্ছে। পাশে একটা খালি বোতল পড়ে। লোকটিকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে দেখা গেল লোকটি ততক্ষণে মারা গেছে। চিনতে কষ্ট হ'ল না, সে আর কেউ নয়, এডোয়ার্ড্ হাইড্। জেকিলের দেখা পাওয়া গেল না, শুধু দেখা গেল তাঁর পোষাকটা হাইডের পরনে। ঘরের কোণে টেবিলের উপর একখানা উইল পাওয়া গেল—আটারসনের নামে।

এইবার আটারসন্ ঘরে গিয়ে ডাক্তার ল্যানিয়নের চিঠিখানা খুললেন। সমস্ত রহস্য তাতেই বেরিয়ে পড়্‌ল। ল্যানিয়ন্ লিখেছেন, জেকিল তাঁকে একটা ওষুধের গুঁড়ো দিয়ে বলে যান যে যদি কখনও হাইড্ তাঁর কাছে এসে সেটা চায় তবে যেন তা তাকে দেওয়া হয়। এক দিন রাত্রে সত্যিসত্যিই হাইড্ এল, বেঁটে, রুক্ষ চেহারার লোকটা—একটু কেমন যেন বিমর্ষ, তার গায়ের চেয়ে অনেক বড় মাপের একটা পোষাক পরে এসে সে সেই গুঁড়ো চাইল। গুঁড়ো পেয়েই সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আর একটা তরল পদার্থের সঙ্গে সেটা মিশিয়ে ফেল্‌ল, তরল পদার্থ টার রং বদলে গেল, হাইড্ সেটা এক চুমুকে খেয়ে ফেল্‌ল। তার পর লোকটা কাঁপতে লাগ্‌ল, সে যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সমস্ত শরীরটা ফুলতে লাগ্‌ল, মুখ-চোখের অদ্ভুত রকম পরিবর্ত্তন হতে লাগ্‌ল। ল্যানিয়ন্ অবাক্ হয়ে দেখলেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ডাক্তার জেকিল। অর্থাৎ ডাক্তার জেকিল ও মিষ্টার হাইড্ একই লোক।

আসল ব্যাপারটা হয়েছিল এই :—মানুষের মধ্যে দুটো সত্তা আছে—একটা ভাল, একটা মন্দ। ডাক্তার জেকিল দীর্ঘ পরিশ্রমের পর এমন একটা ওষুধ বার করেছিলেন যার সাহায্যে তিনি এই দুই সত্তাকে পৃথক্ মানুষে পরিবর্ত্তিত করতে

পারতেন—ভালটি হচ্ছে জেকিল এবং খারাপটি হচ্ছে হাইড্। ক্রমে হাইডেরই প্রতিপত্তি বাড়তে লাগ্ল, তার প্রভাব থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন হয়ে উঠ্ল। হাইডের দুষ্কর্ম্মও দিন দিন বেড়ে চল্ল। অবশেষে যে বিশেষ কোম্পানীর ওষুধ দিয়ে ডাক্তার জেকিল তাঁর সেই অদ্ভুত ওষুধটা তৈরী করেছিলেন সেটা আর তিনি সংগ্রহ করতে পারলেন না। হাইড্ হয়ে তাঁকে ল্যাবরেটরীর মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকতে হ'ল। ওষুধটা সংগ্রহের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, শেষ মুহূর্ত্তে অনেক ব্যাকুলতা দেখালেন, কিন্তু খুনী আসামী হাইড্ তো আর ইচ্ছামত বাইরে ঘুরতে পারে না। সে ওষুধ আর যোগাড় করা সম্ভব হ'ল না,—হাইড্ আর জেকিল হ'তে পারলেন না। ফলে তাঁকে অসময়ে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হ'ল।

ছোটদের চিত্রশালা

পল্লীশ্রী

শিল্পী—শ্রীহরিহর মজুমদার

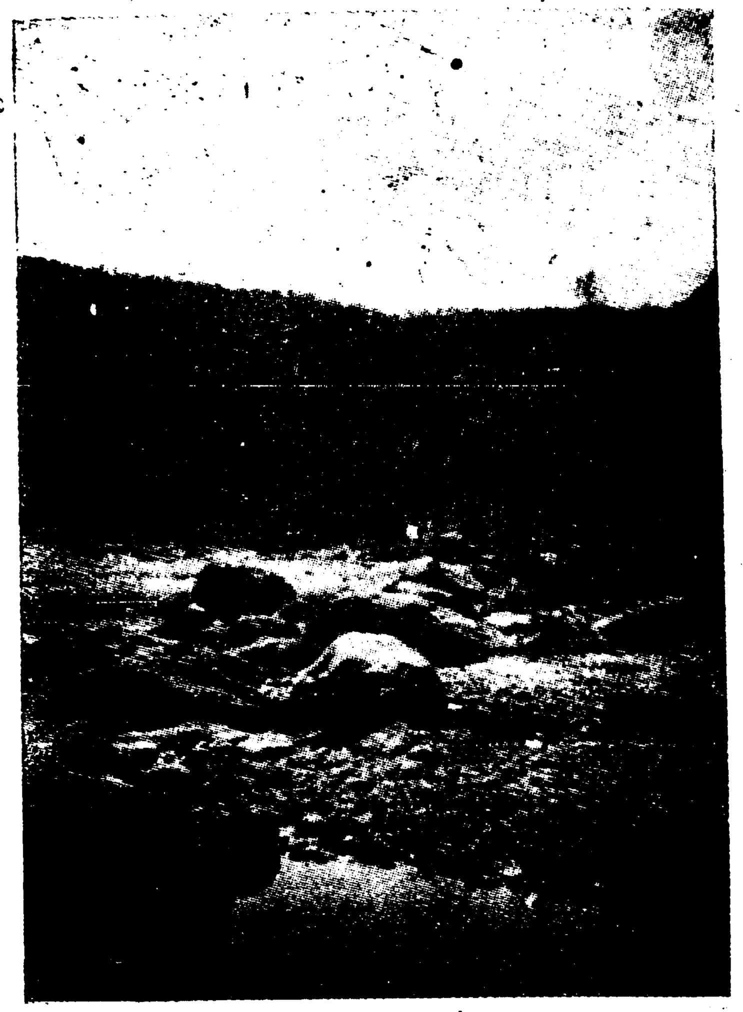

অজন্তার পথে প্রকৃতির খেলা

আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীসুনীলকুমার গোস্বামী

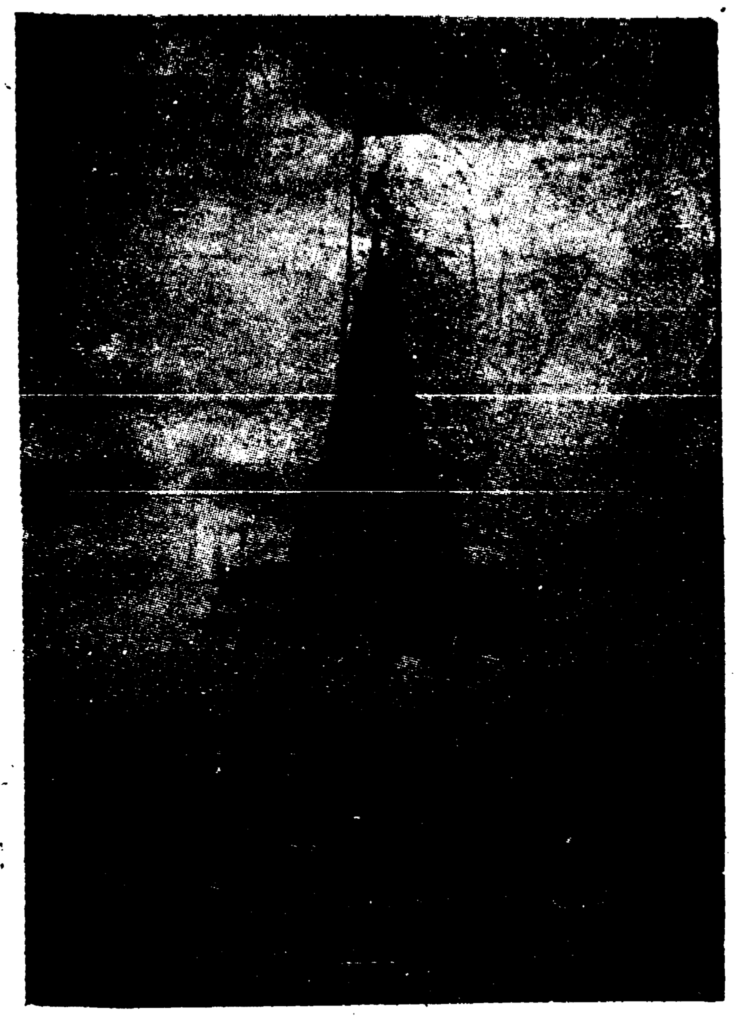

মোরাবাদি পাহাড়ের উপাসনা-মন্দির, রাঁচি

আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আসছে মাস থেকে আর একখানি নতুন

ধারাবাহিক উপন্যাস

রামধনুতে বার হবে।

আর সেই সঙ্গে আসছে মাসে থাকবে

হুকাকাশির আর একটি চমকপ্রদ নতুন ছোটগল্প

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বাদ্‌লা হাওয়া

(কুমারী সুজাতা গুপ্ত)

(১)

বাদ্‌লা হাওয়া,
বাদ্‌লা হাওয়া,
ওরে ও চঞ্চল !

কোন্ দেশেতে
ঘর-বাড়ী তোর,
কোথায় থাকিস্ বল্ ?
বন্দী যেথায় রাজার মেয়ে
কাহার লাগি' পথটি চেয়ে
দিবানিশি অঝোর ঝরে
ফেল্‌ছে আঁখি জল।
বল্ না রে চঞ্চল !

(২)

বাদ্‌লা হাওয়া,
বাদ্‌লা হাওয়া,
ওরে ও সুন্দর !

বাদ্‌লা ছাড়া
সারা বরষ
কোথায় বাঁধিস্ ঘর ?
রূপ সদাগর মনের সুখে
চল্‌ছে যেথা নদীর বুকে
তারই না'য়ের পানে কি তুই
ঘুরিস্ নিরন্তর ?
ওরে ও সুন্দর !

(৩)

বাদ্‌লা হাওয়া,
বাদ্‌লা হাওয়া,
ওরে বাদল-রাজ !

আজ ভোরে তুই
দোল্ দিয়েছিস্
কেয়া-বনের মাঝ।

সেই দোলারই পরশ লেগে
কদম-কুঁড়ি উঠল জেগে
সারা ধরা পড়ল আজি
নীলাম্বরী সাজ।
ওরে বাদল-রাজ !

(৪)

বাদ্‌লা হাওয়া,
বাদ্‌লা হাওয়া,
ও মোর পরম সাথী !

তোমার তরে
বরষ ধরে
কথার মালা গাঁথি।

আজকে তোমার দেখা পেয়ে
মনটি ওঠে আপনি গেয়ে,
ছন্দ দিয়ে সাজিয়ে ডালা
আছি দিবস-রাতি।
ওগো বাদল সাথী !

বশিষ্ঠাশ্রম

(শ্রীআশালতা নন্দী)

সেবার কল্‌কাতা থেকে মাসীমারা গৌহাটীতে আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তাই সে দিনগুলো খুব আনন্দেই কাটছিল। হঠাৎ একদিন ঠিক হ'ল আমরা সকলে বশিষ্ঠাশ্রমে বেড়াতে যাব। আমি ও সেজমাসীমা সেদিন সাড়ে বারোটার সময় স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলুম। গৌহাটী থেকে ৭ মাইল দূরে মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রম। আমরা স্কুল থেকে এসে দেখি শঙ্কুদা' দোকান থেকে খাবার আন্‌তে গেছে ও মা রান্নাঘরে কেক্ তৈরী করছেন। আমরা সকলে কাপড়-চোপড় পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ২টার সময় মোটরে রওনা হলুম। কি মজাই যে লাগছিল কি বল্‌ব ! ওখানে গিয়ে বনভোজন বড়ই আনন্দদায়ক কিন্তু সময়ের অভাবে আমাদের তা আর হ'ল না, আমরা চায়ের সরঞ্জামই সঙ্গে নিলুম। তার পর ছোট ছোট ঘর, নানা রকম গাছ, সবুজ মাঠ দেখতে দেখতে এগিয়ে চল্‌লুম। কোন কোন জায়গায় মোটরের শব্দ শুনে পল্লী-বালকেরা গাড়ী দেখতে ছুটে আসতে লাগ্‌ল। তার পর আরম্ভ হ'ল চা গাছ। সেগুলো সব সমান করে ছেঁটে দেওয়া। অবশেষে আমাদের গাড়ী যে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল তার দু'ধারেই উঁচু পাহাড়। রাস্তায় টুক্‌টুক্ বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছিল—

'কেয়া মজারে
বুবুল্‌ভাজারে !'

বুবুল্ ওরই নাম। কিছুক্ষণ পরেই আমরা বশিষ্ঠাশ্রমে এসে পৌঁছলুম। সবাই আশ্রম দেখার আনন্দে হুড়মুড় করে নেমে পড়লুম গাড়ী থেকে।

এমন সুন্দর জায়গা বোধ করি খুব অল্পই দেখা যায়। সিঁড়িতে ওঠার মুখেই বশিষ্ঠ-

মন্দিরের শান্ত শ্রী চোখে পড়ে। মন্দিরের আশ-পাশে সবই যেন শান্ত ভাব ধারণ করেছে। তাদের শান্ত, নিস্তব্ধ ভাব দেখলেই মুগ্ধ হ'তে হয়। মন্দিরে দু'-তিন জন সাধুও বাস করেন। তাঁরা অভ্যাগত অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য মন্দিরের দাওয়ায় বসে ছিলেন। মন্দিরের আশ-পাশে অনেকগুলি আম-কাঁঠালের গাছ আছে। তার পেছনে একটা ঝরণা, তার শীতল জল বড় বড় পাথরের গা বেয়ে তরতর বেগে অবিরাম ছুটে চলেছে। তার মধ্যে ছোট-বড় অনেক পাথর। সেগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে তারা কত যুগ-যুগান্তর ধরে সেখানে ঘুমিয়ে আছে। ঝরণার পরপারের গাছপালাগুলি এ দৃশ্যকে আরও সুন্দর ক'রে তুল্‌ছিল।

আমরা প্রথমেই গিয়ে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লুম। তার পর সুরু হ'ল আম খাওয়া; তার পর সেখানকার চক্‌চকে পরিষ্কার জল দেখে সকলেরই স্নান করার খুব ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু স্নানের জন্য কাপড়-চোপড় আনা হয় নি তো! সমস্যার সমাধান সহজেই হ'ল। ঠিক হ'ল যে কাপড়গুলো দিয়ে ঝুড়ি ঢাকা রয়েছে সেগুলো পরেই কয়েক দফায় স্নান করা যাবে। স্নান ক'রে সারা গা শীতল হয়ে গেল। তার পর চা-খাওয়া-পর্ব্ব শেষ ক'রে আমরা গল্প করতে বসলুম।

এই ভাবে খানিক হৈ-হৈ করে মন্দিরের ভিতরে গেলুম। যা অন্ধকার কি বল্‌ব, কিছুই দেখা যায় না। তখন পাণ্ডা ঠাকুর এসে একটা মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে আগে আগে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌লেন। পাণ্ডাজী বললেন, এইখানে মহামুনি বশিষ্ঠ ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। এ রকম অনেক জায়গায়ই দেখালেন। সবগুলি জায়গাই অসংখ্য ফুল দিয়ে সাজান। সেখানে প্রণাম করে বেরিয়ে এলুম। এসেই গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লুম। তার পর যে রাস্তা দিয়ে দু'টার সময় প্রখর রোদের মধ্যে এসেছিলুম সেই রাস্তা দিয়েই ছ'টার সময় আবছা অন্ধকারে বনপথ সচকিত ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

বর্ষা-সন্ধ্যায়

(শ্রীহরেকৃষ্ণ শী)

দিনের আলো যায় নি চলে,
নাম্‌ছে আঁধার গগন-তলে,
বাদল এল ঘনিয়ে দূরে
ঐ যে নভ-গায়;
পাখীগুলি আকাশ-পথে
কুলায় ফিরে যায়।

পথিক ব্যস্ত পথের মাঝে,
মন্দিরেতে শঙ্খ বাজে,
প্রদীপ হাতে পল্লীবালা
সন্ধ্যা দিয়ে যায়;
ফির্‌ছে গৃহে দলে দলে
যে ছিল যেথায়।

মেঘের ঘন গভীর রোলে
কাঁপে ধরা আঁধার-তলে,
ভয় পেয়ে ওই খোকনমণি
মায়ের কোলে ধায়;
বৃষ্টি এল মুষলধারে—
কাঁপিয়ে সজল বায়।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

খেলাধূলা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, প্রবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹

প্রবীণ সাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের রচনার সঙ্গে রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের ভাল রকমই পরিচয় আছে। বিভিন্ন শিশুমাসিকে প্রকাশিত অনেকগুলি রচনা একত্র করিয়া এই বইটি বাহির করা হইয়াছে। ভাল কাগজে ছাপা, অনেক ছবিও আছে। ছেলেরা এ বই কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িবে।

শিশুসাথী—করোনেশন সংখ্যা। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৵১০। শিশুসাথীর করোনেশন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহাতে সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীর জীবনের অনেক কথা আছে এবং বহু ছবি আছে।

চিঠিপত্র

রামধনুর পাঠকপাঠিকা ভাইবোনেরা,

এই সংখ্যায় রামধনুর দশ বছরের প্রথমার্দ্ধ শেষ হ'ল, শ্রাবণ থেকে দ্বিতীয়ার্দ্ধ সুরু হবে; তাই আমরা আগামী মাস থেকেই নতুন ধারাবাহিক উপন্যাসখানা সুরু কর্‌ব ঠিক করেছি।

কুমারী মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি বিষয়ের উপর ঝোঁক দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। (১) রামধনুতে দেশের এবং বিদেশের বর্ত্তমান ঘটনাবলীর পরিচয় বের করা, (২) দেশ-বিদেশের চিন্তাশীল মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে রামধনুর পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া (৩) আমাদের দেশের ভাল ভাল বইএর সার-বস্তুকে আশ্রয় ক'রে ছোট বই বা রচনা রামধনুতে লেখা (যেমন **Lamb's Tales from Shakespeare** আছে) এবং (৪) রামধনুতে নানা দেশের ভাল ভাল শিশু-সাহিত্যের অনুবাদ বের করা। প্রস্তাবগুলো

সব ক'টাই ভাল, আমরা মাঝে মাঝে এর কিছু কিছু দেবার চেষ্টা করব।

শ্রীমান্ জয়ন্ত রায়, শ্রীমতী শান্তা দত্ত এবং ইতিপূর্ব্বে আরও কেউ কেউ জানিয়েছেন, বুদ্ধদেব বাবুর "দস্যুর দলে ভোমরা" তাঁদের ভালই লাগছে, তবে গল্পটায় আর একটু ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকলে ভাল হয়। বুদ্ধদেব বাবুর পাকা হাত, তাঁকে এ বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কিছুমাত্র দরকার নেই। কি করলে বইখানা ছেলেদের মনের মত হবে তা' তিনি ভালমতই জানেন এবং সেই ভাবেই তিনি তা পরিবেশন করবেন, আমরা জানি।

'ধাঁধার উত্তর পাঠালে কেবল মাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকার নামই প্রকাশিত হবে' লেখায় অনেক গ্রাহক অনুরোধ করেছেন—সেই সঙ্গে তাঁদের ভাইবোনদের নামও যেন প্রকাশ করা হয়। গ্রাহকদের নামের সঙ্গে আরও ২।১টা নাম বের করতে আমরা আপত্তি করি না কিন্তু অনেকে দশ, বারো, পনের, কুড়ি এমন কি আরও বেশী নাম পাঠান। একজন তো ৪৩টা নাম পাঠিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে গ্রাহকেরা ভাই-বোনদের নাম ২।১টি পাঠাতে পারেন কিন্তু বেশী নয়। পূরো নাম না দিয়ে সংক্ষিপ্ত নাম দিলেই ভাল হয়। গ্রাহকেরা মনে রাখবেন যাঁরা খেটে, মাথা ঘামিয়ে নিজে নিজে (কারও সঙ্গে পরামর্শ করে নয়) ধাঁধার উত্তর বের করতে পারবেন পত্রিকায় শুধু তাঁদেরই নাম ওঠা উচিত, নচেৎ শুধু ছাপার অক্ষরে নাম দেখার জন্য বাড়ীশুদ্ধ সকলের নাম পাঠান সমীচীন নয়।

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

—রাঃ সঃ

সন্দেশ

পৃথিবীর অন্যতম ধনকুবের জন্, ডি, রক্‌ফেলারের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। কেরোসিন তেলের ব্যবসা করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে ইনি কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করেন, এবং এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া পরিচিত হন। রক্‌ফেলার জীবনে দানও নেহাৎ কম করিয়া যান নাই। বিখ্যাত রক্‌ফেলার ইন্‌ষ্টিটিউট্—যেখানে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক বড় বড় আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে—তা' ইঁহারই অমর কীর্ত্তি। এই রক্‌ফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটের একটি শাখা আমাদের কলিকাতায়ও স্থাপিত হইয়াছে—বলা বাহুল্য ইঁহারই অর্থে। মৃত্যুকালে রক্‌ফেলার সাহেবের বয়স প্রায় এক শ' বছর হইয়াছিল।

* * *

কলিকাতার ফুট্‌বল্ লীগ্ প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে, এবং প্রথমার্দ্ধ শেষ হইয়াছে। বরাবরকার মত এবারেও মহামেডান্ স্পোর্টিং এখন পর্য্যন্ত লীগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। সৈনিক টীম্ ক্যামেরোনিয়ান্‌স্ তাদের সহিত পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। অন্যান্য ভারতীয় দলের মধ্যে ভবানীপুর এখন তৃতীয় স্থানে আছে; এই ভবানীপুর প্রথম বিভাগে এইবারই

প্রথম খেলিতেছে। সেই দুর্দ্ধর্ষ মোহনবাগান দলের অবস্থা এবার আর তেমন সুবিধার নয়, মাঝে মাঝে বড় টীমের সহিত ভাল খেলিলেও মোহনবাগানের নাম দেখিতে হইলে এখন তালিকার নীচের দিকেই খুঁজিতে হইবে। ইষ্টবেঙ্গল প্রথম দিকে কিছু করিতে না পারিলেও দ্বিতীয়ার্দ্ধে খুব ভাল খেলিতেছে এবং মহামেডান্ স্পোর্টিংকে ৪-২ গোলে ও ক্যালকাটাকে ৫ গোলে হারাইয়াছে। লীগের তালিকায় সকলের নীচে আছে এখন ডালহৌসী। ভারতীয়দের সহিত ইয়োরোপীয়দের বাৎসরিক ইণ্টার-ন্যাশানাল্ ম্যাচ্‌ও হইয়া গিয়াছে। উহাতে ভারতীয় দল এক গোলে জয়লাভ করিয়াছে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন মোহনবাগান দলের কে. ভট্টাচার্য্য। জয়নির্দ্দেশক গোলটি দিয়াছিলেন মহামেডান্ স্পোর্টিংএর রহমৎ।

* * *

ইংল্যাণ্ডের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট্ ম্যাচ্ ১৮৭৬ সনে আরম্ভ হয়। ইংল্যাণ্ডে যতগুলি খেলা হইয়াছে তার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ২০টি খেলায় জিতিয়াছে, ১৫টিতে হারিয়াছে এবং ২৭টি ড্র করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় যতগুলি খেলা হইয়াছে তার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ৩৪টি খেলায় জিতিয়াছে, ৪০টি খেলায় হারিয়াছে এবং ২টি খেলায় ড্র করিয়াছে।

* * *

ম্যারাথন্ রেসের কথা তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। ম্যারাথন্ রেসের উৎপত্তির ইতিহাস জান কি? খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ অব্দে ফাইডিপ্পাইড্‌স্ নামে এক গ্রীক্ যোদ্ধা ২৪ মাইল্ দৌড়াইয়া ম্যারাথন্ হইতে এথেন্সে যুদ্ধজয়ের সংবাদ লইয়া যান এবং তার পরেই মারা যান। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্যই ম্যারাথন্ রেসের উৎপত্তি।

* * *

বাংলা দেশে প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ৬৪৬ জন লোক বাস করে; যুক্তপ্রদেশে ৪৫৬, বোম্বাইএ ১৭৭, মান্দ্রাজে ৩২৯ ও পাঞ্জাবে ২৩৮ জন লোক বাস করে।

* * *

ভারতবর্ষের কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে শত করা ক'জন লিখিতে পড়িতে পারে তার হিসাব দেখ—

পার্শী—শত করা ৭৯ জন, খৃষ্টান—শত করা ২৮ জন, শিখ—শত করা ৯ জন, হিন্দু—শত করা ৮ জন, মুসলমান—শত করা ৬ জন।

* * *

ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতায় ও বোম্বাইএ টাঁকশাল আছে, সেখানে টাকা-পয়সা তৈরী হয়। নোট, ডাকটিকেট ও অন্যান্য ষ্ট্যাম্প ছাপা হয় নাসিকে।

* * *

ভারতে সব শুদ্ধ ২৪১৭৫টি ডাকঘর আছে।

* * *

আমেরিকার ওয়াশিংটন্ সহরে যে কংগ্রেস লাইব্রেরী আছে তার শেল্‌ফ্‌গুলি খুলিয়া পাশাপাশি সাজাইলে ৮৪ মাইল লম্বা হইবে। ভাবিয়া দেখ সেখানে কত বই! দেশের সমস্ত লাইব্রেরীগুলিকে একত্র ধরিলে কিন্তু সব চেয়ে বেশী বই পাওয়া যাইবে জার্ম্মেনীতে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(ক) (১) আসর (২) সরস (৩) বাসর (৪) অবসর (৫) সরল (৬) কাঁসর (৭) সরম।
(খ) (১) কোমর (২) চামর (৩) মরম (৪) পামর (৫) অমর (৬) মরণ (৭) সমর।

উত্তরদাতাদের নাম

কুমার ভাই-ভগিনীগণ (ভাট্টা—পূর্ণিয়া) নমিতা গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা); সুলতিকা পাল (করিমগঞ্জ); মাষ্টার আব্দুল করিম (আলিপুর তুয়ার); কোকঁডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); শিবানী, কল্যাণী, রেবা সরকার (ধুবড়ী); পাঁচুগোপাল ঘোষ (নওয়াপাড়া); বিষ্ণুপদস্মৃতিপাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা, হাওড়া); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা, হাওড়া); শ্রীলেখা গুপ্ত (কলিকাতা); গীতা চক্রবর্ত্তী (বারাকপুর); সিতেন্দু গুপ্ত (স্বর্ণাসম—পাটনা); রণেন্দ্র, রমেন্দ্র, গীতা দত্ত (ধুবড়ী); প্রসূন রায় (নালান্দা); শঙ্কর, প্রফুল্ল, বিশ্বনারায়ণ (যগোদা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম—রাঁচি); রমা নিয়োগী (কলিকাতা); জগন্নাথ বিশ্বাস (আলিপুর তুয়ার); মাষ্টার নিখিল চৌধুরী (কাশিমপুর, রাজসাহী); রেণু, রঞ্জিং, সুজিং (বেলেঘাটা); দেবব্রত, সুব্রত, সত্যব্রত সেন (গোয়ালপাড়া); শক্তিপ্রসাদ গর্গ (নৈনীতাল); শোভা মজুমদার ও সুনীল মজুমদার (চট্টগ্রাম); উমা ও অমলচন্দ্র মুস্তফী (মেকলিগঞ্জ); প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কালীকচ্ছ); দীনেন মুখার্জ্জি (নলহাটী); রত্না দেবী (পাটনা); রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); রিণা রায় (কালীঘাট); স্থাণুবালা কর (কলিকাতা); কে. সি. এইচ. ই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (শ্যামনগর); বিজু, শ্যামল, অঞ্জলি চৌধুরী (বৌবাজার—কলিকাতা); যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা); রেবতী ও সুশীলকান্ত বিশ্বাস (কুমিল্লা); হরিহর, পুষ্প, গৌরী মজুমদার (ধুবড়ী); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (কালীঘাট); অচলকুমার দত্ত (ভবানীপুর); রমাপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমশেদপুর); সুভাষকুমার রায় (বহরমপুর); অরুণা সেন (কলিকাতা); অমলবরণ রায় (সাটীরপাড়া); পুণ্যব্রত ঘোষ, পূর্ণিমা ঘোষ ও রমা ঘোষ (শিলচর); সন্ধি ও মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা); ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুগণ (বড়া, হুগলী); জয়দেব মিত্র, অমল রায় প্রভৃতি রয়েজ্ লাইব্রেরীর সভ্যগণ (সাভার); প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য্য (বাগেরহাট); হিমাংশু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); বি. জি. গোস্বামী ও আর. কে. গোস্বামী (বাণীগ্রাম); সুপ্রভা,

বিশ্বেশ্বর, রাইমোহন প্রভৃতি (মধ্যনগর); আশালতা নন্দী (তিনসুকিয়া); তপন ও সবিতা (রেঙ্গুন); করুণা, শান্তি ও ভুজঙ্গভূষণ (ইকড়া); প্রসিত ও প্রদ্যোতকুমার বাগচী (বালুভরা); শৈলেশ, অনিল, নিরু (জলপাইগুড়ি); প্রভা ও বিভা (জলপাইগুড়ি); ঘুটু (সিমডেগা); সত্যানন্দ প্রামাণিক; প্রীতি, অনিল, অরুণ (রজসাহী)।

নূতন ধাঁধা

[আঁকাবাঁকা (Zigzag) ধাঁধা]

সঙ্কেত :—

নীচে কতকগুলি শব্দ পর পর সাজান আছে। তার মধ্যে কতগুলি অক্ষর বড়। এই বড় অক্ষরগুলি সাপের মত আঁকাবাঁকা ভাবে বসান আছে, আর উপরে নীচে পড়িলে হয় একজন লোকের নাম :— হরিনন্দন

হ রি ণ
স **রি** ষা
ব স **ন**
সু **ন্দ** র
ন র ম

নীচে এই রকম আরও ৩টি ধাঁধা দেওয়া হইল। ধাঁধার কথাগুলির এক-একটা প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ বসাইয়া এই রকম আঁকাবাঁকা ভাবে উপরে নীচে পড়িলে তিনজন বিখ্যাত বাঙ্গালীর নাম পাইবে।

(১)	(২)	(৩)
দোতলা	কেশপাশ	নিজের অধীন
যে জয় করে	মিশ্র ধাতুবিশেষ	বাতাস
দেবরাজ	সমুদ্র	একটি প্রাচীন রাজবংশ
চতুর	কাজল	দেবরাজ
স্ত্রীলোক	চক্ষু	বন
বিশাল	দেওয়া	মুখ
বাড়ী	বিকাশ	আহ্লাদ

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

১। (ক) বিখ্যাত হ্যান্‌সিয়াটিক লীগের সহরগুলোর সঙ্গে যখন ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু হ'ল তখন দেখা গেল, ওদের স্বর্ণমুদ্রাগুলি বড় ভাল—ওজনেও ঠিক, খাদও নেই বল্লেই চলে। এই সহরগুলি ইংল্যাণ্ডের পূবে, তাই এখানকার ব্যবসাদারদের ইংরাজরা বল্‌ত ইষ্টারলিং। ইষ্টারলিংদের 'টাকা' সবাই চাইত, সেগুলির ভারী কদর হয়। কাজেই ভাল মুদ্রার নাম প্রথমে ইষ্টার্লিং এবং পড়ে ষ্টার্লিং হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) আগে ফরাসী দেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের তরোয়াল অথবা অন্য অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে ফেলা হ'ত। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ডক্টর গিলোটিন নামে এক ভদ্রলোক শিরশ্ছেদের এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সেইটিই ফ্রান্সে চলিত হয় আর আবিষ্কারকের নামানুযায়ী তার নাম দেওয়া হয় গিলোটিন।

২। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া (ক্রাউন) স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন; মণ্টেগো-চেম্‌স্‌ফোর্ড্ প্রবর্ত্তিত শাসনসংস্কার পাশ হয়; নতুন শাসন-সংস্কার আইন পাশ হয়।

৩। স্যর ওয়াল্টার স্কট্, ভিক্টর হুগো, লিউইস্ ক্যারোল (এটি ছদ্মনাম, আসল নাম Rev. C. Luturidge Dodgson), কহ্লন, কালিদাস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। (ক) মুসোলিনি ইটালীর প্রেসিডেণ্ট্ নন, প্রধান মন্ত্রী—ইটালিতে প্রেসিডেণ্ট্ বলে কেউ নেই, আছেন রাজা। কামাল তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী নন, প্রেসিডেণ্ট। আজকাল তাঁর নাম মোস্তাফা কামাল পাশা নয়, কামাল আতাতুর্ক। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল এখন আর তুরস্কের রাজধানী নেই, তুরস্কের বর্ত্তমান রাজধানী এঙ্গোরা।

(খ) বিঃ বল্‌ড্‌উইন সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁর জায়গায় ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন মিঃ নেভিল্ চেম্বারলেন। আর অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান রাজধানী ক্যান্‌বেরা, সিড্‌নি নয়।

৫। ১নং—রসরাজ অমৃতলাল বসু; ২নং—বুদ্ধগয়ার মন্দির।

ভ্রম সংশোধন—গত মাসের চিত্রশালায় প্রকাশিত 'সাপুড়ে' ছবিটির শিল্পীর নাম শ্রীসত্যানন্দ প্রামাণিক।

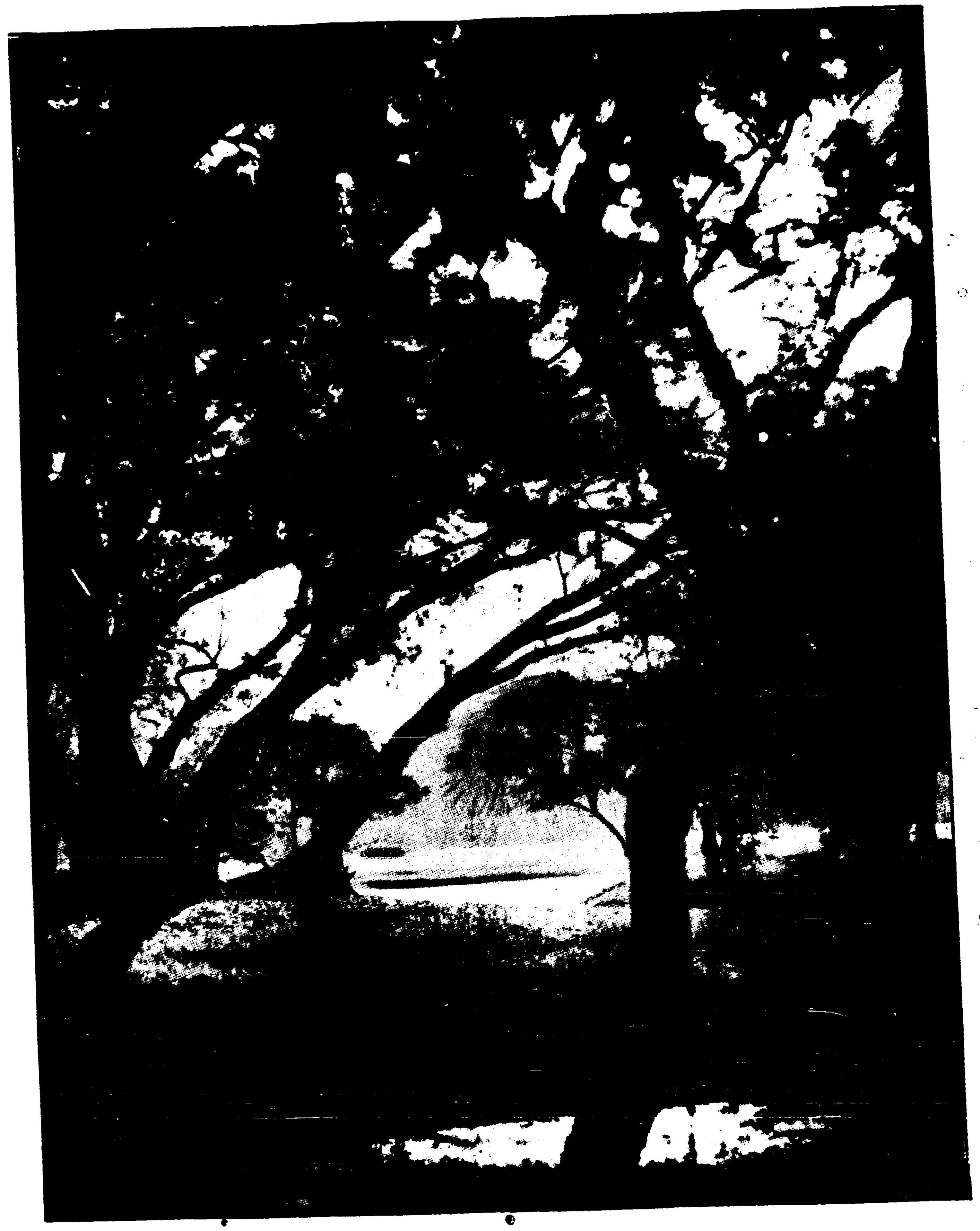

বৃষ্টির পথে

আলোকচিত্রশিল্পী :—শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি

১০ম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৪ } ৭ম সংখ্যা

শিশির-পরী

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

এক যে আছে শিশির-পরী
নীল আকাশের দেশে
রূপকথা সে ফুলকে বলে
ভোরের বেলায় এসে।
অপরাজিতা অবাক্ হ'য়ে
মেলে ডাগর আঁখি
গান ভুলে যায় গলা শুনে
কম্‌লা-বনের পাখী।

শিশির-পরী, সেই দেশেতে
আমায় চল নিয়া—
রূপার গাছে আছে যেথায়
সোনার বরণ টিয়া ;
ফুল ফুটলে যেখানে আর
পড়ে না তা ঝ'রে—
শিশির-পরী স্নেহ দিয়ে
রাখে তারে ভ'রে।

শিশির-পরী বলে 'আমি
জানি জানি জানি,
এই ভুবনের মাঝে আছে
এক যে সবুজ রাণী,
তার হাসিটী দেখি আমি
সাঁঝাই মেঘে মেঘে
তার মরমের-বেদনা মোর
চিত্তে আছে জেগে।

তাকে ভালবেসে আমার
ঝর্‌ল চোখে জল
ঝিলমিলিয়ে উঠ্‌ল ভোরে
তাই যে তৃণ দল।
বনের পথে পথে সে রোজ
ফুল তুল্‌তে যায়—
আমি থাকি ঘাসে ঘাসে
দেখ্‌তে সে না পায়।

ঘরের পাশে যায় সে ফিরে
আঁচল নিয়ে ভ'রে—
আমার পানে চায় না, দুখে
তাই যে পড়ি ঝ'রে।
সবুজ ধরার সোনার রাণী
কোন গাঁয়েরি মেয়ে—
তারি সাথী হ'তে আসি
ভুবন মাঝে ধেয়ে।'

শিশির-পরী রূপকথাটী
বলে ফুলের কানে,
সে মেয়েটী কোথায় থাকে
কেউ তারে না জানে।

'টকি' জিনিষটা কি

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

প্রায় বছর দশেক আগে প্রথম বছরের রামধনুতে বায়স্কোপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তার শেষটা আমার বেশ মনে আছে, তা'তে একটা আশ্চর্য্য খবর দেওয়া হইয়াছিল। খবরটি এই—'আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা ছবিকে দিয়া শুধু হাত-পা নাড়াইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁরা ছবিকে দিয়া কথাও বলাইতেছেন'। ছবি যে পর্দ্দার উপর হাত-মুখ নাড়িয়া তোমার-আমার মত কথাও বলিতে পারে তা আমরা তখন পর্য্যন্ত দেখি নাই, কল্পনাও করিতে পারি নাই, কাজেই ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত মনে হইয়াছিল।

চার্লি চ্যাপ্‌লিন

তার পর আর মাত্র দশটি বছর গিয়াছে—ঠিক দশ বছরও পূরা নয়, ইহারই মধ্যে বায়স্কোপ-জগতে কি পরিবর্ত্তনটাই না হইয়াছে! নির্ব্বাক্ ছবি (সাইলেণ্ট্ ফিল্ম্) এখন এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে, তার জায়গা দখল করিয়াছে 'টকি' বা সবাক্ ছবি। তোমাদের মধ্যেই হয়তো এখন এমন অনেকে আছ যারা কোন দিন নির্ব্বাক্ ছবি দেখ নাই, জিনিষটা সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা পর্য্যন্ত নাই ; এবং যে সব বয়স্ক লোকেরা নির্ব্বাক্ ছবির গুণগান করেন তাদের হয়তো তোমরা একটু কৃপার চোখেই দেখ। নির্ব্বাক্ ছবি হয়তো এত দিনে উঠিয়াই যাইত শুধু চার্লি চ্যাপ্‌লিন গোছের দু'-এক জন হোমরা-চোমরা অভিনেতার জন্যই ঘটিয়া উঠে নাই। চার্লি চ্যাপ্‌লিনের নাম তোমরা সবাই জান, বায়স্কোপ-অভিনেতাদের মধ্যে

অমন একজন লোক আর হয় নাই ; ইনি সবাক্ ছবির ভয়ানক বিরুদ্ধে, ইঁহার মতে নির্ব্বাক্ ছবিতে অভিনেতা যে সব বাহাদুরী দেখাইতে পারেন—'আর্ট' দেখাইতে পারেন, সবাক্ ছবিতে তা নষ্ট হয়। কাজেই ইনি এখনও যে সব ছবি তুলিতেছেন তা' সব নির্ব্বাক্।

তা' চার্লি চ্যাপলিন্ যাই বলুন, বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এখন আর নির্ব্বাক্ ছবির ধার দিয়াও যাইতেছেন না ; ছবিকে তাঁরা এমন ভাবে দেখাইবেন যাতে জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে কোন দিক্ দিয়াই তাদের কোন তফাৎ না থাকে—হাবে-ভাবে, কথাবার্ত্তায় একেবারে নিখুঁত হইবে, তবেই না তাঁদের জয় ?

এইখানে নির্ব্বাক্ ছবি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লইলে বোধ হয় ভাল হয়। বায়স্কোপের ছবি কি ভাবে তোলা হয় তোমাদের মনে আছে কি ? না, তখন তোমাদের সকলকার রামধনু পড়িবার মত বয়স হয় নাই ? আচ্ছা, ব্যাপারটা আর একবার সংক্ষেপে বলিতেছি। বৃষ্টি যখন পড়ে তখন তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ, বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সব মিলিয়া দেখিতে লম্বা লম্বা আঁচড়ের মত মনে হয় ; অথচ প্রত্যেকটি ফোঁটা কিন্তু অপরটি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ইহা আমাদের চোখের একটা গুণ। আমরা যখন কোন একটা জিনিষ দেখি তখন চোখ দিয়া দেখিলেও যতক্ষণ না মগজের মধ্যে সেটা যায় ততক্ষণ ছবিটা বুঝা যায় না। অবশ্য চোখে দেখা আর মগজে উপলব্ধি করা এ দু'টি ব্যাপার এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই হয়। এইবার চোখের সম্মুখ হইতে জিনিষটি যদি সরাইয়া লওয়া যায় তবে সরাইয়া লইবার পরও সামান্য একটু সময় জিনিষটা আমাদের মগজের মধ্যে জাগিয়া থাকে—কাজেই তখনও মনে হয় ছবিটা আমাদের চোখের সম্মুখেই রহিয়াছে। এই সময়টা অবশ্য খুবই কম, এক সেকেণ্ডের ২৩ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ঐ সময়টুকুর মধ্যে যদি অপর কোনও জিনিষ আমাদের চোখের সম্মুখে ধরা যায় তবে ফল কি হইবে সহজেই বুঝিতে পার। আগের দৃশ্যটা সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার আগেই তার মধ্যে আর একটা দৃশ্য আসিয়া জুটিবে, আর দুইটা মিলিয়া একই দৃশ্য বলিয়া মনে হইবে। বৃষ্টির ফোঁটার বেলায় এই কারণেই একটি ফোঁটা আর একটির

সঙ্গে মিলিয়া লম্বা লম্বা আঁচড়ের মত দেখায়। বায়স্কোপের ছবিও তোলা হয় ঠিক এই ব্যাপারেরই সাহায্য লইয়া।

বায়স্কোপের ক্যামেরা এমন ভাবে তৈরী যে তা' দিয়া সেকেণ্ডে ১০।১৫ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক হাজার পর্য্যন্ত ফটো তোলা যায়। মনে কর তুমি ফুটবলে 'কিক্' করিতেছ, বায়স্কোপের ক্যামেরায় তার ফটো তোলা হইল। দেখিবে তোমার প্রত্যেকটি গতিভঙ্গীর এক-একটি আলাদা ফটো উঠিয়া গিয়াছে— প্রথম তুমি পা-টা একটু তুলিয়াছ, তার পর পা-টা বলের কাছে নিয়াছ, তার পর বলে তোমার পা লাগিয়াছে, তার পর বল্‌টা শূন্যে একটু উঠিয়াছে—এই রকম। ক্যামেরার মধ্যে কাঠিমে জড়ান, রাসায়নিক্ মশলা-মাখান বিরাট্ বিরাট্ লম্বা সেলুলয়েডের ফিতা থাকে, তাকে বলা হয় ফিল্ম ; ফটো তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে এই ফিল্ম একটু একটু সরিতে থাকে আর তার উপর ফটো উঠিয়া সেটা আর একটা কাঠিমে জড়াইতে থাকে।

ফিল্ম তোলা হইলে তা লোককে দেখাইতে হইবে ; কিন্তু এই ফটোগুলি থাকে একেবারে ছোট—এক-একটা ডাকটিকেটের মত। কাজেই তখন আর একটা যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়।

ম্যাজিক লণ্ঠনের যন্ত্র তোমরা কেউ কেউ বোধ হয় দেখিয়াছ। এই যন্ত্রের মধ্যে একটা তীব্র আলো থাকে আর থাকে দু'খানা লেন্স। ঐ লেন্স ও আলোর সাহায্যে ফটোগুলিকে প্রকাণ্ড বড় করিয়া দূরে একটা পর্দ্দার উপর ফেলা যায়। বায়স্কোপের ফিল্মও এই রকম যন্ত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া পর্দ্দায় বড় করিয়া দেখান হয়। যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে ছবিগুলি প্রতি মুহূর্ত্তে সরিয়া গিয়া পর পর দৃশ্য আসিতে থাকে এবং দু'টা ছবির মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক সেকেণ্ডের ২৩ ভাগের কম হওয়ায় পর্দ্দায় ছবি দেখিয়া আমরা মনে করি সবগুলি বুঝি একই ছবির অঙ্গ। যে যন্ত্রটি দিয়া ছবি পর্দ্দায় ফেলা হয় তাকে বলে 'প্রজেক্টার'।

এই তো গেল নির্ব্বাক্ ছবি। কিন্তু সবাক্ ছবি অর্থাৎ "টকি"তে গোলমাল অনেক বেশী। ক্যামেরার সাহায্যে কোন দৃশ্যের ছবি তোলা হইবে ইহাতে অবশ্য গোলমাল বিশেষ নাই কিন্তু সেই সঙ্গে ছবি হইতে কথাবার্ত্তা বাহির করা যায় কি

করিয়া? বৈজ্ঞানিক-মহলে অনেক দিন হইতেই ব্যাপারটা লইয়া চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছিল। অবশেষে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন্ সাহেব এর একটা উপায় বাহির করিলেন। তোমরা জান, গ্রামোফোনের রেকর্ডে মানুষের গলার স্বর হুবহু ধরা যায়। এডিসন্ ভাবিলেন, বায়স্কোপের ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে যদি কথাবার্ত্তাগুলিও রেকর্ডে ধরা যায় আর সিনেমা-হলে ছবি দেখাইবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যদি সে রেকর্ডগুলি বাজান যায় তা' হইলেই তো সে ছবি সবাক্ হইল। এই ব্যাপার কাজে লাগাইয়া তিনি 'কিনেটোফোন' নামে এক যন্ত্র তৈরী করিয়া ফেলিলেন। এই ভাবে এডিসনের হাতে প্রথম টকি তৈরী হইল।

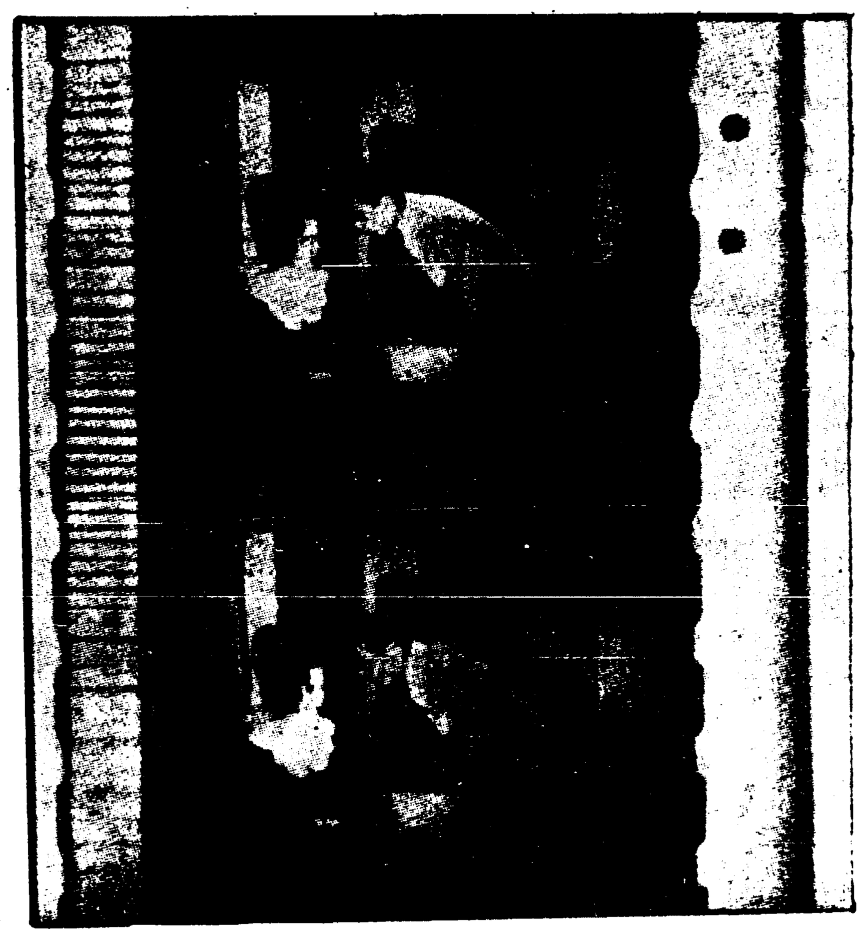

টকি-ফিল্মের খানিকটা। ছবির মাঝখানে অভিনয়ের দৃশ্য, বাঁ পাশের কালো কালো রেখাগুলি শব্দের ছবি।

কিন্তু জিনিষটা যতটা সহজ বলিয়া মনে হইয়াছিল কার্য্যক্ষেত্রে সে রকমটা হইল না। রেকর্ড্ আর ফিল্ম ঠিক এক সঙ্গে না চালাইতে পারিলে—এক মুহূর্ত্ত আগে পরে হইলেই সব মাটী—ব্যাপারটা একেবারে হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইবে। ছবিতে হয়তো দেখা গেল এক ভদ্রলোক চীৎকার করিতেছেন, তাঁর ঠোঁট কাঁপিতেছে—অথচ কোন শব্দ শোনা গেল না। ঠোঁট কাঁপা থামিল, অমনি শব্দ আরম্ভ হইল। এ রকম ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটিতে লাগিল। ফলে দর্শকদের হাসি-ঠাট্টায় টকির মালিকেরা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কাজেই ও রকম টকি আর চলিল না।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা ছাড়িবার পাত্র নন। একবার যখন টকি আরম্ভ

হইয়াছে তখন তাকে নিখুঁত করিতেই হইবে। অনেক গবেষণা, অনেক পরীক্ষার পর তাঁরা ঠিক করিলেন ফিল্মের মধ্যে দৃশ্যের ছবির পাশে পাশে শব্দেরও ছবি তুলিয়া লইবেন। তার পর দৃশ্য দেখাইবার সময় সেই শব্দের ছবিকে আবার শব্দে পরিবর্ত্তিত করিবেন।

'শব্দের ছবি' কথাটা শুনিতে খুবই অদ্ভুত, কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডই করিতেছেন, কাজেই ইহাতে আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না। তবে ব্যাপারটি বড় কঠিন, বিজ্ঞানে ভাল রকম জ্ঞান না থাকিলে বোঝা মুশ্‌কিল; কাজেই আমি এখানে ব্যাপারটার সামান্য একটু আভাস মাত্র দিব। তোমাদের একটু মন দিয়া পড়িতে হইবে; মন দিয়া পড়িলে হয়তো বুঝিতে পারিবে।

টকি তুলিতে বৈজ্ঞানিকেরা কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য লইয়াছেন সেগুলি এই—এক নম্বর হইতেছে 'মাইক্রোফোন'। শব্দ জিনিষটা আর কিছু নয়, বাতাসের একটা কাঁপুনী মাত্র। কোনও বিশেষ রকম শব্দ করিলে বাতাসে যে বিশেষ একটা কাঁপুনী উঠে সেইটাই যদি পরে আবার হুবহু সেই ভাবে ফিরিয়া কানে আসে তবেই সে শব্দ শোনা যায়। এখন, মাইক্রোফোন যন্ত্রটি এ ভাবে তৈরী যে তার সম্মুখে কথা বলিলে মুখের সম্মুখের বাতাসটা যে ভাবে কাঁপিবে মাইক্রোফোনের ভিতরের পর্দ্দাও সেইভাবেই কাঁপিবে, এবং মাইক্রোফোনের ভিতর যে বিদ্যুৎপ্রবাহ আছে সেটিও ঠিক সেই তালে কম-বেশী হইবে। এখন এই বিদ্যুৎপ্রবাহকে ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ গুণ জোর করিয়া দেওয়া যায় আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে—তার নাম 'এম্‌প্লিফায়ার'। এম্‌প্লিফায়ার হইল ২নং যন্ত্র।

এইবার ক্যামেরা। নির্ব্বাক্ ছবি তুলিবার ক্যামেরা আর টকি তুলিবার ক্যামেরায় একটু তফাৎ আছে। টকি তুলিবার ক্যামেরায় অভিনয়ের ছবি তুলিবার ব্যবস্থা তো আছেই, উপরন্তু তার এক কোণে আর একটি নতুন ধরণের বিজলী-বাতি আছে, তার নাম 'এয়োলাইট্'। এই বাতির বিশেষত্ব এই যে ইহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিলে সেই বিদ্যুতের হ্রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী এর উজ্জ্বলতারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এই এয়োলাইট্‌টা এমন ভাবে একটা চোঙ্গের মধ্যে বসান থাকে যে শুধু

সম্মুখ দিকের একটা ছোট্ট ছিদ্র ছাড়া তা' হইতে অন্য কোন দিকে আলো বাহির হইতে পারে না। যে ফিল্মের উপর ছবি তোলা হয় তা' থাকে ক্যামেরার উপর দুইটা কাঠিমে জড়ান। ফিল্মের উপর শব্দের ছবি তুলিবার সময় ফিল্মের একটা দিক্ এক কাঠিম হইতে খুলিয়া এয়োলাইটের সম্মুখের ছোট্ট ছিদ্রটার সম্মুখ দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া অপর কাঠিমে জড়ান হয়। তাহাতে এয়োলাইটের আলোর ফটো ফিল্মে উঠিতে পারে।

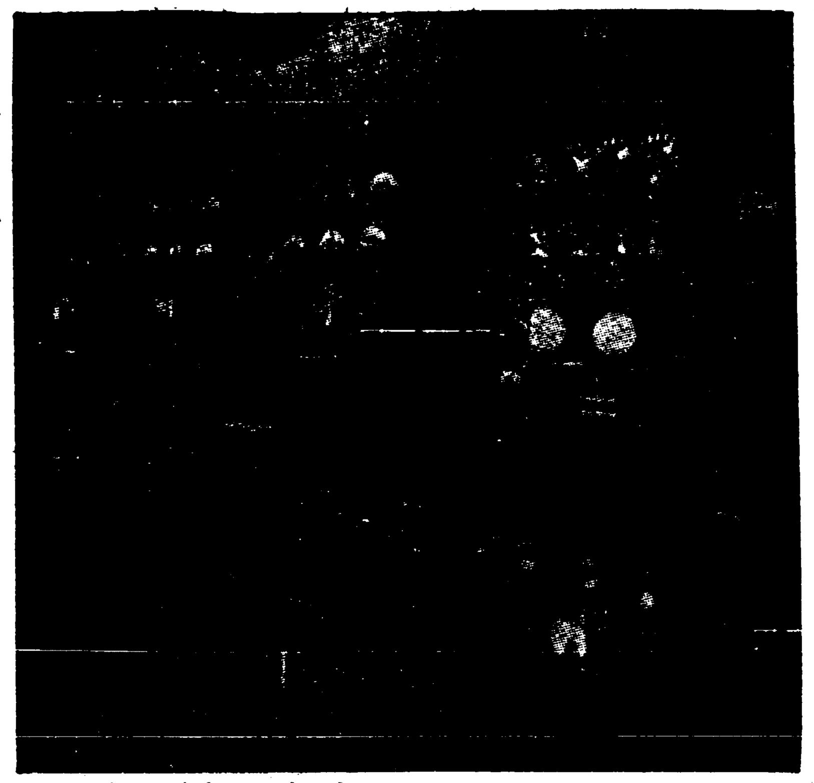

এম্‌প্লিফায়ার যন্ত্রের চেহারা

এইবার ফিল্ম তুলিবার কথা বলি। ক্যামেরার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া অভিনেতা হাত-পা নাড়িয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল; অভিনেতার মুখের কাছে রহিল মাইক্রোফোন। কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ঢেউ উঠিল, আর সেই ঢেউ মাইক্রোফোনে লাগিয়া তার ভিতরকার বিদ্যুৎপ্রবাহকে সেই শব্দের ঢেউ অনুযায়ী কম-বেশী করিয়া তুলিল। তার পর সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ এম্‌প্লিফায়ারে দশ লক্ষ গুণ বাড়িয়া গিয়া এয়োলাইটে হাজির হইল—ফলে এয়োলাইটের আলোও সেই অনুযায়ী কম-বেশী হইতে লাগিল। অর্থাৎ অভিনেতার মুখের শব্দ যেমন জোরে কিংবা আস্তে হইতে লাগিল এয়োলাইটের আলোও তেমনি বাড়িতে কিংবা কমিতে লাগিল, আর ফিল্মের এক ধারে সে আলোর ফটো (কতকগুলি সরু সরু কালো কালো রেখা) ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এগুলিই হইল শব্দের ছবি। সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের মূল ছবিও ফিল্মের মাঝখানে নির্ব্বাক্ বায়স্কোপের ছবির মতই উঠিতে লাগিল। তার পর যথারীতি ফিল্ম 'ডেভেলাপ' করা হইল।

এইবার এই অভিনয়ের আর তার শব্দের ছবি সিনেমা-হলের পর্দ্দায়

তুলিবার পালা। নির্ব্বাক্ ছবির বেলা যেমন ম্যাজিক লণ্ঠনের মত একটা প্রজেক্টার যন্ত্রের দরকার, টকির বেলাও তাই। তবে এই প্রজেক্টার একটু অন্য রকমের। অভিনয়ের ছবি পর্দ্দায় ফেলিবার একটা আলো তো তার মধ্যে থাকেই, তা' ছাড়া আরও একটা ছোট আলো থাকে শব্দের ছবির জন্য। এই আলোটির চারিদিক্ ঢাকা থাকে, শুধু সামনে থাকে দু'টি লেন্স আর তার পরে আলো বাহির হইবার একটা ছোট্ট ছিদ্র। এইবার ফিল্মের যে অংশে শব্দের ছবি, অর্থাৎ সেই কালো কালো রেখাগুলি, আছে সেটা এই ছিদ্রের সম্মুখ দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আনিতে হইবে। ফলে সে আলো ফিল্মের কালো দাগগুলি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিবে। সর্ব্বত্র সমান আলো আসিবে না, যেখানে দাগগুলি বেশী কালো সেখানে কম আলো আসিবে, যেখানে কম কালো সেখানে বেশী আলো আসিবে। ফিল্ম ফুঁড়িয়া এই আলো আসিয়া পড়িবে ফিল্মের ঠিক পরেই বসান আর একটি অদ্ভুত যন্ত্রে—৪নং যন্ত্র—তার নাম 'ফটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেল' (ফটো অর্থাৎ আলো)। এই যন্ত্রটির গুণ এই যে, ইহার মধ্যে যদি আলো আসিয়া পড়ে তবে সে আলোর উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী এই যন্ত্রের ভিতরকার বিদ্যুৎ-প্রবাহও কম-বেশী হইতে থাকিবে। এইবার সেই বিদ্যুৎপ্রবাহকে এম্‌প্লিফায়ার দিয়া বাড়াইয়া যদি এমন কোন যন্ত্রে ফেলা যায় যে তার মধ্যে পড়িয়া ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহ আবার শব্দের ঢেউএ বদ্‌লাইয়া যায় তবেই কাজ উদ্ধার হইল—কারণ এ শব্দ হইবে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহেরই অনুযায়ী,

টকি দেখাইবার যন্ত্র

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আলোর উজ্জ্বলতা অনুযায়ী—অর্থাৎ এক কথায় ফিল্মে তোলা সেই শব্দের ছবির অনুযায়ী। এই শেষের যন্ত্রটির নাম হইতেছে 'লাউড্ স্পিকার'। সিনেমা-হলের পর্দ্দার পিছনে এই যন্ত্রটি বসান থাকে।

অভিনয়ের ছবি এবং অভিনয়ের শব্দের ছবি একই ফিল্মে পাশাপাশি ছাপা থাকে, কাজেই টকি দেখাইবার সময় দু'টি এক সঙ্গে চালান যায়—আগের মত আর গোলমাল হয় না। অবশ্য ইহার মধ্যে আরও কিছু কারিগরী আছে, কিন্তু সে সবের বিস্তৃত বর্ণনা তোমাদের ভালও লাগিবে না, প্রবন্ধও বড় হইয়া পড়িবে।

বিখ্যাত ফিল্ম-অভিনেতা স্বর্গীয় লন্ চ্যানী নির্ব্বাক্ এবং সবাক্ দু'রকম ছবিতেই ইনি অদ্ভুত বাহাদুরী দেখাইয়াছিলেন।

টকির ছবি সম্বন্ধে আজ আর বিশেষ কিছু বলিলাম না। টকির আবির্ভাবে আগের চাইতে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ আমরা নিত্য ঘরে বসিয়া উপভোগ করিতেছি, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এটা বড় কম গৌরবের কথা নয়। অভিনেতাদের মধ্যে কেউ কেউ, যাঁরা নির্ব্বাক্ ছবিতে নাম করিয়াছিলেন, টকিতে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই, তবে অনেকেই করিয়াছেন। অবশ্য টকিতেও আবার এমন অনেক অভিনেতা নতুন করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—নির্ব্বাক্ ছবিতে যাঁদের অতটা নাম হয় নাই।

দস্যুর দলে ভোমরা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

৭

চিঠি পৌঁছলো

ভোমরার কাকাবাবু শচীকান্ত সকালবেলাটায় বড্ড ব্যস্ত থাকেন। মক্কেলের ভিড়; হলদে, রঙ-চটা, পুরোনো, বদ্‌গন্ধওয়ালা কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে কখন দশটা বেজে যায়। তার পর স্নান-খাওয়ার তাড়া; তার পর সাদা কলার আর কালো কুর্ত্তা চাপিয়ে পান চিবোতে-চিবোতে ট্র্যামের দিকে দৌড়।

সেদিন একটু সকাল-সকাল কাজ সেরেই তিনি উঠলেন। তাঁর মুখের ভাব তো সব সময়েই গম্ভীর, কিন্তু সেদিন একটু বিশেষ রকম গম্ভীর যেন। টেবিলের উপর থেকে একখানা লম্বা খামে ভরা চিঠি তুলে নিলেন; নেড়ে-চেড়ে, সোজা ক'রে, বাঁকা ক'রে, কাৎ ক'রে নানা ভাবে খামখানা পরীক্ষা করলেন। তার পর ভিতরের চিঠিখানা খুলে পড়লেন আরো একবার।

চিঠিখানা ইংরিজিতে টাইপ ক'রে লেখা এবং তার হুবহু বাঙলা তর্জ্জমা এই:

'প্রিয় মহাশয়,

বসন্তবাজার পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে জানাইতেছি যে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ প্রীতিকান্ত মিত্র ওরফে ভোমরা বর্ত্তমানে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পনেরো হাজার টাকা ও তৎসহ আপনার প্রতিশ্রুত পুরস্কার আমাদের হাতে পৌঁছাইয়া দিলে সঙ্গে-সঙ্গেই আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সুস্থদেহে ও নিরাপদে ফিরিয়া পাইবেন। তাহার কোনরূপ অনিষ্ট করা হয় নাই এবং অনিষ্ট করিবার ইচ্ছাও আমাদের নাই। আমরা আশা করি এই সামান্য উপলক্ষ্যে কোনরূপ অপ্রিয় উপায়ের সাহায্য নিতে আপনি আমাদের বাধ্য করিবেন না। অনেক বিবেচনার পর আমরা আমাদের দাবির অঙ্কটা যথেষ্ট

অল্প করিয়াই ধরিয়াছি; সুতরাং এই ব্যাপারের মীমাংসা উভয়তঃই স্বচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্তিকর না হইবার কোনই কারণ নাই।

আগামী শনিবার রাত ঠিক দশটার সময় আপনি নিজে উল্লিখিত টাকা লইয়া বালিগঞ্জ ময়দানের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি দেয়ালে ঘেরা অতি পুরানো ও পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইবেন। বাড়িটি ডাড্‌লি সায়েবের বাগানবাড়ি নামে ঐ পাড়ায় প্রসিদ্ধ; শোনা যায় ওটি নাকি ভূতের আস্তানা। যাহা হউক, আপনি যদি একান্ত সাধুভাবে ও নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমাদের দাবির টাকা দিতে আসেন তবে ভূতের কি মানুষের কোন রকম ভয়েরই কারণ নাই। তবে যদি কোন দুরভিসন্ধি প্রয়োগ করিতে চান তবে আমাদেরও আত্মরক্ষা করিতে হইবে, এবং ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী হইব না।

আপনি একা আসিয়া ঐ দেয়ালের উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইবেন। একটু পরে দেয়ালের ওপিঠ হইতে একখানা হাত উঠিয়া আসিবে, সেই হাতে নোটগুলি গুঁজিয়া দিয়া অপেক্ষা করিবেন। নোটগুলি গুণিয়া লওয়া হইলে শুনিতে পাইবেন, "ঠিক আছে।" তখন আপনি নিশ্চিন্তমনে চলিয়া যাইতে পারেন। আপনি নিজে আসিবেন, অন্য কেহ যেন না আসে।

আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন এ ছাড়া আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই। যদি অর্থগৃধ্নুতা, আত্মদম্ভ বা মূঢ়তার বশে আমাদের সর্ত্ত পূরণ না করেন তবে আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, আপনাদের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা ভাবিয়া দেখিবেন।

আপনার বধূঠাকুরাণীকে আমাদের সহানুভূতি ও শুভকামনা জানাইবেন।

ইতি—'মাম্বু-জাম্বু।'

চিঠিখানা শচীকান্ত এই নিয়ে চারবার পড়লেন, তার পর সেখানা জামার পকেটে ঢুকিয়ে গেলেন বাড়ির ভিতর বৌঠাকরুণের ঘরে। ভোমরার মা বিছানায় শুয়ে, দু'দিনেই অসম্ভব রোগা আর ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছেন।

শচীকান্ত ঘরে ঢুকেই বললেন, 'ভেবো না বৌদি, তোমার ভোমরা ভালোই আছে।'

দপ্‌ ক'রে যেন একটা আলো জ্ব'লে উঠলো ভোমরার মার মুখে। কাঁপা গলায় বললেন, 'সত্যি? পুলিশ খবর এনেছে বুঝি?'

'না, পুলিশ আনে নি।'

'তবে?'

'খবর একটা এসেছে।'

'কোত্থেকে এলো? কে নিয়ে এলো? কখন এলো? আর কী খবর এসেছে? সব বলো ঠাকুরপো, আমার আর একটুও সইছে না।'

শচীকান্ত তখন ঐ চিঠির ব্যাপার সংক্ষেপে বললেন।

কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসলেন ভোমরার মা। 'কই, দেখি। দেখি সে চিঠি। শোন ঠাকুরপো, যেমন ক'রে পারো ও টাকা তুমি জোগাড় করো, আমার সর্ব্বস্ব যাক্—আমার সর্ব্বস্ব তো ও-ই, ওকে ফিরে পেলে আর কিসের দরকার?'

শচীকান্ত বললেন, 'অত অস্থির হোয়ো না, সবই ভেবে-চিন্তে করতে হবে। একটা বেনামি চিঠি এলো, আর ফস্‌ ক'রে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে বসলাম—তা কি হয়!'

'না—না, কিছু ভেবো না তুমি, একটুও দেরি ক'রো না। ওঁর লাইফ-ইন্‌সিয়োরের টাকাগুলো তো সব ব্যাঙ্কেই জমা রয়েছে, আরো লাগে আমার গয়নাগুলো নিয়ে যাও। টাকা না পেলে ওরা ঠিক ওকে মেরে ফেলবে—ঠিক মেরে ফেলবে!'

'কিন্তু ধরো যদি টাকা পেয়েও ওরা ছেলে ফিরিয়ে না দেয়। কি ধরো এটা আর কিছুই নয়, এক গুণ্ডার দলের ফাঁকি দিয়ে কিছু বাগাবার চেষ্টা!'

'তা হ'লে কী হবে?' হতাশ ভাবে এ-কথা ব'লে ভোমরার মা আবার শুয়ে পড়লেন।

শচীকান্ত একটু চিন্তা ক'রে বললেন: 'কিন্তু আমার যত দূর মনে হয়, চিঠিটা বাজে নয়, সত্যি-সত্যি ভোমরাকে ওরা চুরি করেছে। তুমি কিছু ভেব না, আমি ব্যাটাদের সব ক'টাকে ধ'রে ফাঁসিতে লটকাবো তবে ছাড়বো! আমি একজন আইনজ্ঞ মানুষ, আমার সঙ্গে চালাকি! সব আমেরিকান্ কায়দা হচ্ছে!

অল্প করিয়াই ধরিয়াছি; সুতরাং এই ব্যাপারের মীমাংসা উভয়তঃই স্বচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্তিকর না হইবার কোনই কারণ নাই।

আগামী শনিবার রাত ঠিক দশটার সময় আপনি নিজে উল্লিখিত টাকা লইয়া বালিগঞ্জ ময়দানের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি দেয়ালে ঘেরা অতি পুরানো ও পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইবেন। বাড়িটি ডাড্‌লি সায়েবের বাগানবাড়ি নামে ঐ পাড়ায় প্রসিদ্ধ; শোনা যায় ওটি নাকি ভূতের আস্তানা। যাহা হউক, আপনি যদি একান্ত সাধুভাবে ও নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমাদের দাবির টাকা দিতে আসেন তবে ভূতের কি মানুষের কোন রকম ভয়েরই কারণ নাই। তবে যদি কোন দুরভিসন্ধি প্রয়োগ করিতে চান তবে আমাদেরও আত্মরক্ষা করিতে হইবে, এবং ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী হইব না।

আপনি একা আসিয়া ঐ দেয়ালের উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইবেন। একটু পরে দেয়ালের ওপিঠ হইতে একখানা হাত উঠিয়া আসিবে, সেই হাতে নোটগুলি গুঁজিয়া দিয়া অপেক্ষা করিবেন। নোটগুলি গুণিয়া লওয়া হইলে শুনিতে পাইবেন, "ঠিক আছে।" তখন আপনি নিশ্চিন্তমনে চলিয়া যাইতে পারেন। আপনি নিজে আসিবেন, অন্য কেহ যেন না আসে।

আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন এ ছাড়া আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই। যদি অর্থগৃধ্নুতা, আত্মদম্ভ বা মূঢ়তার বশে আমাদের সর্ত্ত পূরণ না করেন তবে আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, আপনাদের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা ভাবিয়া দেখিবেন।

আপনার বধূঠাকুরাণীকে আমাদের সহানুভূতি ও শুভকামনা জানাইবেন।

ইতি—'মামু-জামু।'

চিঠিখানা শচীকান্ত এই নিয়ে চারবার পড়লেন, তার পর সেখানা জামার পকেটে ঢুকিয়ে গেলেন বাড়ির ভিতর বৌঠাকরুণের ঘরে। ভোমরার মা বিছানায় শুয়ে, দু'দিনেই অসম্ভব রোগা আর ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছেন।

শচীকান্ত ঘরে ঢুকেই বললেন, 'ভেবো না বৌদি, তোমার ভোমরা ভালোই আছে।'

দপ্‌ ক'রে যেন একটা আলো জ্ব'লে উঠলো ভোমরার মার মুখে। কাঁপা গলায় বললেন, 'সত্যি? পুলিশ খবর এনেছে বুঝি?'

'না, পুলিশ আনে নি।'

'তবে?'

'খবর একটা এসেছে।'

'কোত্থেকে এলো? কে নিয়ে এলো? কখন এলো? আর কী খবর এসেছে? সব বলো ঠাকুরপো, আমার আর একটুও সইছে না।'

শচীকান্ত তখন ঐ চিঠির ব্যাপার সংক্ষেপে বললেন।

কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসলেন ভোমরার মা। 'কই, দেখি। দেখি সে চিঠি। শোন ঠাকুরপো, যেমন ক'রে পারো ও টাকা তুমি জোগাড় করো, আমার সর্ব্বস্ব যাক্—আমার সর্ব্বস্ব তো ও-ই, ওকে ফিরে পেলে আর কিসের দরকার?'

শচীকান্ত বললেন, 'অত অস্থির হোয়ো না, সবই ভেবে-চিন্তে করতে হবে। একটা বেনামি চিঠি এলো, আর ফস্‌ ক'রে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে বসলাম—তা কি হয়!'

'না—না, কিছু ভেবো না তুমি, একটুও দেরি ক'রো না। ওঁর লাইফ-ইন্‌সিয়োরের টাকাগুলো তো সব ব্যাঙ্কেই জমা রয়েছে, আরো লাগে আমার গয়নাগুলো নিয়ে যাও। টাকা না পেলে ওরা ঠিক ওকে মেরে ফেলবে—ঠিক মেরে ফেলবে।'

'কিন্তু ধরো যদি টাকা পেয়েও ওরা ছেলে ফিরিয়ে না দেয়। কি ধরো এটা আর কিছুই নয়, এক গুণ্ডার দলের ফাঁকি দিয়ে কিছু বাগাবার চেষ্টা!'

'তা হ'লে কী হবে?' হতাশ ভাবে এ-কথা ব'লে ভোমরার মা আবার শুয়ে পড়লেন।

শচীকান্ত একটু চিন্তা ক'রে বললেন: 'কিন্তু আমার যত দূর মনে হয়, চিঠিটা বাজে নয়, সত্যি-সত্যি ভোমরাকে ওরা চুরি করেছে। তুমি কিছু ভেব না, আমি ব্যাটাদের সব ক'টাকে ধ'রে ফাঁসিতে লটকাবো তবে ছাড়বো। আমি একজন আইনজ্ঞ মানুষ, আমার সঙ্গে চালাকি! সব আমেরিকান্ কায়দা হচ্ছে!

ছেলে চুরি ক'রে টাকা আদায়! আজই আমি যাব লালবাজার পুলিশ-কমিশনারের কাছে—কলকাতা এত বড় জায়গা নয় যে ওরা লুকিয়ে থাকতে পারবে!'

'কী হবে ও-সব হাঙ্গামা ক'রে—আমার ছেলে ফিরে পাওয়া দিয়ে কথা। তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরপো, টাকাগুলো জোগাড় ক'রে ফেলো। আজ কী বার?'

'সোমবার।'

'তা হ'লে শনিবার তো এখনও ঢের দূরে! ওরা কেন আজই আমার ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এলো না; আমার যা আছে সব ওদের দিয়ে দিতুম।'

'তুমি বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছো, বৌঠাকরুণ। ভোমরাকে তো ফিরে পাবেই, কিন্তু ওদেরও ঘাড়ের উপর মাথা থাকবে না। তুমি বলছো কি? একজন আইনজ্ঞ লোক হ'য়ে ওদের এই জুলুম সইবো নাকি? একটা "ক্লু" যখন পাওয়া গেছে তখন আর ভাবনা কি? দেবো কলকাতার সমস্ত পুলিশ লেলিয়ে।'

শচীকান্ত তাঁর পেশাদারি চোখে খামটাকে আরো একবার পরীক্ষা করলেন। জি-পি-ওতে পোষ্ট করা হয়েছে, সাধারণ ব্রাউন রঙের লম্বা খাম, ঠিকানাও টাইপ করা ভালোই হয়েছে, ইংরিজিটাও ঠিক যেমন হওয়া উচিত। কোনখানে একটু কালির আঁচড় নেই। আরো সূক্ষ্ম পরীক্ষার জন্য খামটাকে গোল ক'রে ধ'রে তিনি একচোখে ভিতরে তাকালেন। ভিতরে আর একটা কাগজ আছে মনে হচ্ছে। দু' আঙুল ঢুকিয়ে টান দিতেই পাৎলা সাদা একটু কাগজ বেরিয়ে এলো। ভাঁজ খুলেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: 'এ কি!'

সঙ্গে সঙ্গে ভোমরার মা ব'লে উঠলেন: 'কী? কী ওটা?'

কাগজটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে শচীকান্ত সেটা দিলেন বৌঠাকরুণের হাতে। ভোমরার মা দেখলেন—সত্যি সত্যি ভোমরার চিঠি! ভোমরার নিজের হাতে পেন্‌সিলে লেখা! ভোমরা লিখেছে!

'মাগো, আমি তো আর পারি না। কাকাবাবুকে ব'লে শীগ্‌গির আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ঠিকানা দিতে পারলুম না, কোথায় আছি জানি নে। এ ঘর থেকে কোনদিকে কোন রাস্তা চোখে পড়ে না। তবে আমাদের বাড়ি থেকে

ঢের দূর। তা হোক্, কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুঁজে বা'র করতে পারবেন। মাগো, তুমি কিছু ভেবো না, এরা আমাকে মারেও নি, কোন কষ্টও দেয় নি। তবে একলা একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছে, আমার আর ভালো লাগছে না। বিরিঞ্চি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আসে, তাকে আমার কথা বোলো। কাকাবাবু কালকেই যেন আসেন।

ভোমরা।'

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ভোমরার মা ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন। একটু পরে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'আহা—তবু যে ওরা আমার ছেলেকে কোন কষ্ট দেয় নি! ঠাকুরপো, তুমি আজই ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকার জোগাড় ক'রে ফেলো।'

শচীকান্ত গম্ভীর ভাবে বললেন: 'তা হ'লে মনে হচ্ছে এটা বুজরুকি নয়, ঠিকই ভোমরা ওদেরই কাছে।'

ভোমরার চিঠিখানা গালে বুলুতে বুলুতে বললেন ভোমরার মা: 'এখনও কি সন্দেহ আছে?'

'তবে কথা হচ্ছে এখন কী কর্ত্তব্য?'

'কর্ত্তব্য আবার কি? টাকা দিতেই হবে। তোমরা কেউ না যাও, আমি নিজে যাবো টাকা হাতে ক'রে সেই ভূতের বাড়িতে।'

'আহা—এত ব্যস্ত হ'লে চলে! এখন তো একটা দিশে পাওয়া গেলো—এখন ভেবে-চিন্তে ঠিকমত চলতে হবে, যাতে গুণ্ডাগুলোকে ঠিক জালে ফেলতে পারি। তুমি কি ভেবেছো এর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ছাড়বো?'

'ভোমরাকে ফিরে পাওয়াই হচ্ছে কথা। তুমি যতই প্রতিশোধ নাও, তার চেয়ে বেশি লাভ কি কিছু হবে?'

'না, না, তুমি বুঝছো না। ধরো, শনিবার রাত দশটায় বালিগঞ্জের ঐ পোড়ো বাড়িটায় যদি দু'শো পুলিশ বন্দুক নিয়ে হানা দেয় তা হ'লে ওরা পালাবে কোথায়?'

'ও সব কিছু করতে গেলে ওরা হয়তো রাগ ক'রে ভোমরাকে মেরে ফেলবে। তার পর ওদের সকলের ফাঁসি হ'লেই বা আমার কী লাভ?'

'আচ্ছা, দেখি। আমাকে তো এক্ষুণি খেয়ে-দেয়ে বেরুতে হবে—আগে দেখি পুলিশের লোক কি বলে।'

চিঠিখানা ভাঁজ ক'রে খুব সাবধানে পকেটে ভরে শচীকান্ত ঘর থেকে বেরুতে যাবেন এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে যে দু'জন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। নতুন কোন মক্কেল এসেছে মনে ক'রে তিনি বললেন, 'এখন চ'লে যেতে বল, সন্ধ্যের পরে যেন আসে।' চাকর ফিরে এসে বললে যে ওঁদের অত্যন্ত জরুরি কাজ, এক্ষুণি দেখা হওয়া দরকার, বেশি সময় নেবে না।

শচীকান্ত বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'আচ্ছা, বসতে বল, আমি যাচ্ছি।'

(ক্রমশঃ)

বাঙালী জাহাজ ও বাঙলার সমুদ্র-বাণিজ্য

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ)

চৈত্র মাসের "রামধনু"তে কেদার রায়ের কাহিনীতে জলযুদ্ধে বাঙালীর বীরত্ব সম্বন্ধে তোমরা কিছু জানতে পেরেছ। আরও অনেক যুদ্ধেই বাঙালী নাবিক, সেনা ও মাঝিমাল্লা মোগল, মগ ও পর্ত্তুগীজ নৌবাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধজয়ই বাঙালীর একমাত্র গৌরব নয়। চাঁদ রায় কেদার রায় প্রভৃতি ভুঁইঞাদের সময়ের বহু শত বছর আগে থেকেই বাঙলার ছেলেরা ভারতবর্ষের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাঙলার প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঐ সময় নৌ-সেনার সাহস ও মাঝিমাল্লার জাহাজ চালাবার খ্যাতি অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙলায় তৈরী জিনিষ সুদূর ইয়োরোপে পর্য্যন্ত আদর পেয়েছে। বাঙালীর জাহাজ জাপান, চীন আরব পর্য্যন্ত পাড়ি দিয়েছে। এসিয়া মাইনর-এর মুসলমান শাসনকর্ত্তারা রাজ্যের প্রয়োজনের জন্য ঈজিপ্টের প্রধান বন্দর আলেকজান্দ্রিয়াতে তৈরী জাহাজের চাইতে চট্টগ্রামের বাঙালী ছুতোরের তৈরী জাহাজই বেশী পছন্দ করতেন। আজ তোমাদের বাঙালী নাবিকের সমুদ্রজয়ের কাহিনীর একটু আভাস দেব।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পশ্চিম বাঙলায় তাম্রলিপ্ত নামে এক নগর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খুব খ্যাতি লাভ করেছিল। এই বন্দর পূর্ব্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অনেকে মনে করেন যে এই তাম্রলিপ্ত ও তমলুক একই জায়গা। তখন এখান থেকে মাদ্রাজ ও

অন্যান্য জায়গায় বাঙলার বিখ্যাত মসলিন, চীনা রেশম, নানা রকমের ওষুধ তৈরী করবার গাছ-গাছড়া, মরিচ প্রভৃতি চালান যেত। এই সব মালপত্র আবার সেখান থেকে ইয়োরোপে ও আরবদেশে চালান হ'ত। সেখানকার লোকেরা খুব চড়া দামে এই সব জিনিষপত্র কিনে নিত। য়্যালারিক নামে এক বিখ্যাত হুণ যোদ্ধা একবার বন্দীদের মুক্তির জন্য যে দাম চেয়েছিলেন তার মধ্যে এক হাজার বস্তা মরিচও ছিল। এ থেকেই তখনকার দিনে মরিচের দাম সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে। এই তাম্রলিপ্ত বন্দর প্রথম শতাব্দীতেই যখন প্রধান বন্দর ছিল তখন নিশ্চয়ই প্রথম শতাব্দীরও বহু আগে থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ফা-হি-য়ান নামে একজন বিখ্যাত চীনদেশের ভ্রমণকারী এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি দেখে গিয়েছিলেন। তখন এখানে ২৪টি বৌদ্ধ বিহার ছিল। ১৪ দিনে তাম্রলিপ্ত হ'তে সিংহলদ্বীপে যাওয়া যেত—ফা-হিয়ান নিজে গিয়েছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ইওয়ান্ চোয়াং নামে আর একজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভারতবর্ষে তীর্থ করতে আসেন। তিনিও তাম্রলিপ্তের অবস্থা খুব সমৃদ্ধ দেখেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-বিবরণীতে তিনি বলে গেছেন যে এখান থেকে বাঙলার জাহাজে করে বাণিজ্যের মালপত্র পূর্ব্ব ও পশ্চিমে নানা জায়গায় চালান যেত। হর্ষবর্দ্ধন খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করে গেছেন। ইওয়ান চোয়াংএর কিছু পরে, সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ই-সিং নামে আর একজন চীনা পরিব্রাজক প্রাচীন ভারতের গৌরব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে প্রায় দশ বৎসর বাস করেছিলেন। আরও দশ বৎসর পরে তিনি তাম্রলিপ্ত থেকে জাহাজে করে চীনদেশে ফিরে যান। সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙলা ও চীনদেশের মধ্যে রীতিমত জাহাজের চলাচল ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারে বাঙালী প্রচারকদের দান অন্য কারও চাইতে কম নয়। খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক বাঙালী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন, জাপান প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাপানে "হরি-উজি" নামে এক মন্দির আছে। সে মন্দিরে প্রাচীন বাঙলাতে লেখা একখানা পুঁথি পাওয়া গেছে। অনেকে বলেন যে পুঁথিটি খৃষ্টীয় ষষ্ঠম শতাব্দীর রচনা। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূল থেকে একদল বাঙালী বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক ব্রহ্মদেশের পশ্চিম উপকূলের মার্ত্তাবান অঞ্চলে "থেটন্" বা "সদ্ধর্ম্ম" নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বরোবুদুর, যাভা প্রভৃতি জায়গায় বাঙালীর বসবাসের পরিষ্কার চিহ্ন পাওয়া গেছে। এই সব সমুদ্র-যাত্রীরা সমুদ্র থেকে তীর কতদূর তা জানবার জন্য এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। সমুদ্র যাত্রার সময় তাঁরা সঙ্গে কয়েকটি পোষা পাখী নিয়ে যেতেন। তীর কতদূর ও কোন্ দিকে তা জানবার দরকার হলেই এই পাখীদের উড়িয়ে দিয়ে জাহাজ নিয়ে তাদের পেছন পেছন যেতেন। পাখীগুলিও সহজাত

বুদ্ধিতে তীর কোন্ দিকে তা ঠিক বুঝতে পারত। এই রকমের পাখীকে "দিশা কাক" বলত ও তাদের খুব আদর ছিল। এই সব জাহাজের কোন-কোনটাতে তিন শ' থেকে সাত শ' লোক ধরত। আবার লোক ভিন্ন কোন-কোনটাতে এক হাজার বস্তা মরিচ পর্য্যন্ত চালান যেতে পারত। আজকালকার টাকার মাপে হিসাব করলে এক সের মরিচ বেচে প্রায় আশি টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যেত।

প্রাচীন কালে বাঙলা দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগকেই বঙ্গ বলা হ'ত। অবশিষ্ট অংশ

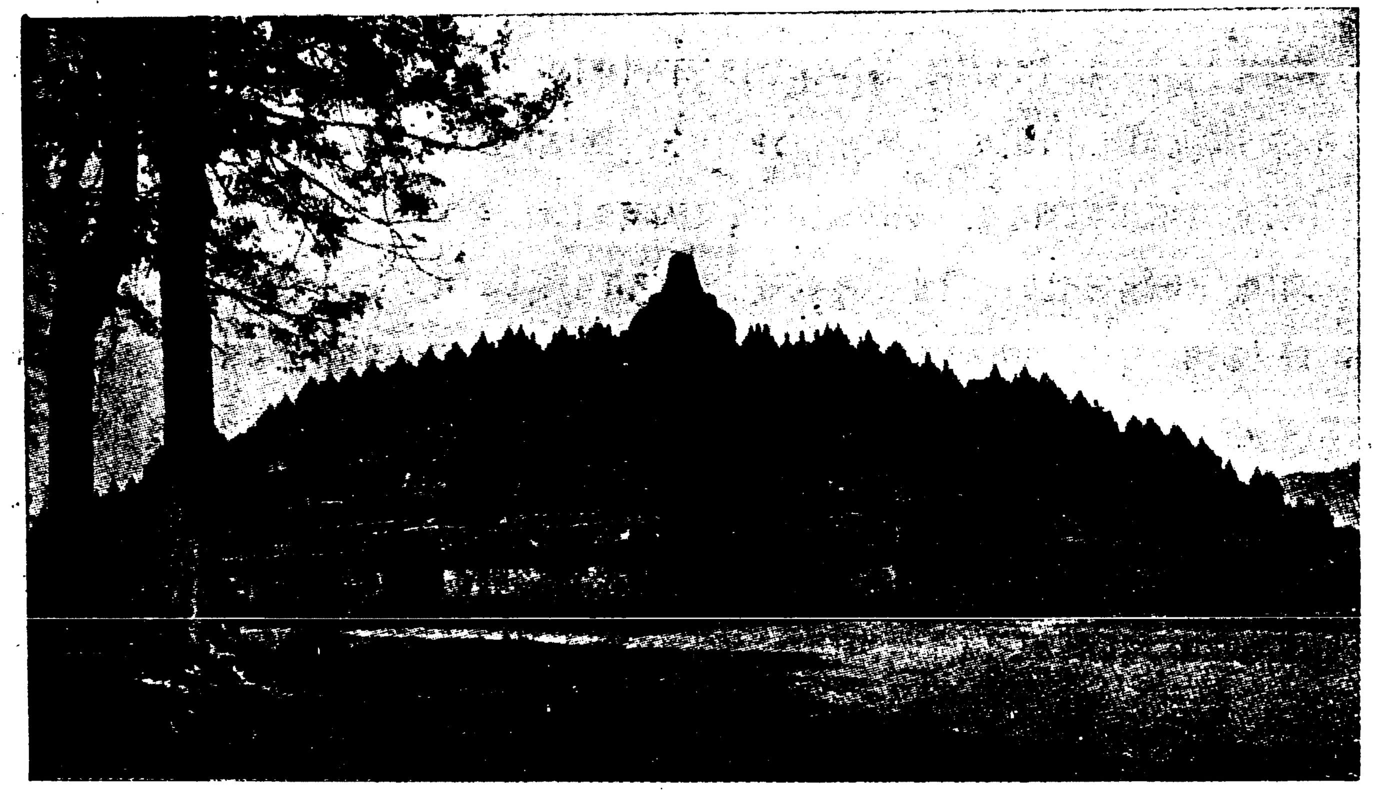

বরোবুদুর—মন্দির

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। পূর্ব্ববঙ্গ নদীনালার দেশ। সেইজন্য পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের রোজকার দরকারের জন্যই নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হ'তে হয়েছিল। বৈদেশিক আক্রমণ ও জলদস্যুর অত্যাচারের বেশীর ভাগই তাদের ওপরই পড়েছিল। এই জন্যই তাদের জলযুদ্ধে শিক্ষিত হতে হয়েছিল। আক্‌বরের সভাসদ্ আবুল ফজলের লেখা আইন-ই-আকবরীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাতে লেখা আছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলা দেশে, বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলে, ভাল ভাল নৌকা ও জাহাজ তৈরী হ'ত। তখনকার দিনে বাঙলা দেশে তৈরী সমুদ্রগামী জাহাজের খুব চল ছিল। সম্রাট্ আকবর বহু টাকা খরচ করে বাঙলা দেশ থেকে জাহাজী কারিকরদের এলাহাবাদে ও লাহোরে জায়গীর দিয়ে বসবাস করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আকবরের সময় পশ্চিম বাঙলায় সপ্তগ্রাম বন্দর একটি প্রধান ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। সপ্তগ্রাম এখনও আছে—কিন্তু তার সে পুরানো গৌরবের কিছুমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। প্রকাণ্ড বন্দর

সামান্য একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে—প্রবলবেগবতী সরস্বতী নদীর চিহ্নও লোপ পেয়েছে। আগে যেখান দিয়ে অসংখ্য নৌকা ও জাহাজ বুকে করে নদী বয়ে যেত আজকাল সেখানে কৃষকেরা জমি চাষ করে। চাষ করতে করতে ভাঙ্গা মাস্তুল অথবা জাহাজের গলুইর ভাঙ্গা টুকরো পাওয়া যায়—তাতেই আবার সপ্তগ্রামের পুরানো গৌরবের কথা মনে করিয়ে দেয়। আকবরের সময় প্রত্যেকটি জাহাজে নানা রকমের কর্ম্মচারী ছিল। পদমর্য্যাদা অনুসারে এই নাবিকদের মাইনের তারতম্য হ'ত। জাহাজের প্রধান বা কাপ্তেনকে "নাখোদা" বলা হ'ত। সপ্তগ্রাম বন্দরে নাখোদার মাসিক বেতন ছিল চার শ' টাকা। জাহাজের সব চাইতে নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীকে "গুমটি" বলা হ'ত; এদের কাজ ছিল জাহাজের খোলের জল সেঁচে ফেলা। এরা মাসে দশ টাকা করে পেত। জাহাজে সাধারণ কর্ম্মচারী ভিন্ন ছুতোর, কামার, চামার ও দরজীও কাজ করত। "পাঞ্জেরী" নামে একজন কর্ম্মচারী জাহাজের মাস্তুলের ওপর বসে থাকত ও দূরে ঝড়ের সম্ভাবনা আছে কিনা, অন্য কোন জাহাজ আসছে কিনা, অথবা তীর দেখা যায় কিনা তা "নাখোদা"কে জানাত। এই কর্ম্মচারী মাসে টাকা পনেরো মাইনে পেত। মুসলমান আমলের শেষের দিকে যে সব ইয়োরোপীয় ভ্রমণবীর এদেশে এসেছিলেন তাঁরাও সপ্তগ্রামের গৌরবের বর্ণনা করে গেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য, মনসার ভাসান, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যেও এই বন্দরের কথা লেখা আছে। চাঁদ-সওদাগর ও তাঁর "সপ্তডিঙ্গা-মধুকর" ধনপতি ও শ্রীমন্ত সাধুর গল্প নিশ্চয়ই তোমরা ঠাকুরমার মুখে শুনেছ। এই সব গল্প একেবারেই "গালগল্প" নয়—এ থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে তিন চার শ' বছর আগেও বাঙালী বণিক্ জাহাজ সাজিয়ে দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করতে যেত। এই গল্পগুলি যে কেবলমাত্র ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে দরকারী, তাই নয়। "সপ্তডিঙ্গা মধুকর"কে জল থেকে তোলা, 'ডিঙ্গা'গুলিকে পূজো করে জলে ভাসান, চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকের সমুদ্র-যাত্রা, কালীদহের ঝড়ে জাহাজ-ডুবি ও নাবিকদের দুর্গতি প্রভৃতির গল্প এমন চমৎকার ভাবে বলা হয়েছে যে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না।

যাভাযাত্রী প্রাচীন হিন্দু জাহাজ

TIGHT BINDING

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক ইয়োরোপীয় বণিক্ ও ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙলা দেশও দেখে গেছেন। তাঁরা যে সব ভ্রমণকাহিনী লিখে গেছেন তা থেকে ঐ সময় বাঙলা দেশের বাণিজ্য-সম্ভার ও সাধারণ সামাজিক অবস্থার অনেক খবর পাওয়া যায়। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে বার্থেমো নামে একজন ইটালী দেশের বণিক্ টেনাসেরিম হয়ে বাঙলা দেশে আসেন। তাঁর বিবরণীতে তিনি লিখে গেছেন যে ঐ সময় বাঙালীরা নানা রকমের বড় বড় জাহাজ তৈরী করত। তাদের মধ্যে কোন-কোনটার তলা খুব চওড়া ও সমানভাবে উঁচু করা ছিল। এই রকমের জাহাজে অনেক মাল নেওয়া যেত ও খুব অল্প জলেও এই জাহাজ চালান যেত। আবার অন্য এক রকমের জাহাজের দুই দিকের গলুই খুব সরু হ'ত। এই রকমের বড় বড় নৌকা আজকালও ঢাকা অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। বার্থেমোর সময় "গিয়ুঙ্কি" নামে অন্য এক রকমের জাহাজে হাজার বস্তা মাল চালান করা যেত। এই রকমের জাহাজের ওপরে মাল্লারা কয়েকটি ছোট ছোট নৌকা নিত। এই ছোট ছোট নৌকা আর কিছুই নয়—আজকাল তোমরা যাকে "লাইফ-বোট" বল এ তাই। এই সব জাহাজ মালাক্কা পর্য্যন্ত পাড়ি দিত। পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক বার্বোসা ১৫১৪ সালে বাঙলাদেশে আসেন। তিনি বণিক্ ছিলেন না—তাই তাঁর লিখিত বিবরণীতে সেকালে পর্ত্তুগীজ বণিকেরা ভারতীয় বণিক্ ও গ্রামবাসীদের ওপর যে কি রকম উৎপীড়ন ও অত্যাচার করত তার বর্ণনা পাওয়া যায়। বার্বোসার ভ্রমণবৃত্তান্তে আবার অনেক নূতন ধরণের জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সময় অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে বাঙলাদেশের চিনির ব্যবসারও খুব প্রচলন ছিল। চামড়ার বস্তায় সেলাই করে বহু পরিমাণ চিনি বাঙলা দেশ থেকে দূর দেশে চালান দেওয়া হ'ত।

ভেনিসের বণিক্ সিজার ফ্রেডরিক সপ্তগ্রাম ও ব্যাতোরের বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যাতোর গঙ্গার ওপর একটি ছোট বন্দর ছিল। ব্যাতোর গ্রামটি এখনও আছে বটে কিন্তু তার বাণিজ্য-গৌরব লোপ পেয়েছে। সীজার ফ্রেডরিক ১৫৫৩ সালে ভারতবর্ষে আসেন। চাটগাঁর তৈরী জাহাজের সৌন্দর্য্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সপ্তগ্রামকে তিনি "ক্ষুদ্র বন্দর" নামে অভিহিত করেছিলেন। অর্থাৎ তখন সপ্তগ্রামের পতন আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তখন চট্টগ্রামের অবস্থা খুব সমৃদ্ধ; সেইজন্য চট্টগ্রামকে "বড় বন্দর" ও সপ্তগ্রামকে "ছোট বন্দর" বলা হ'ত। ইংরেজ-আমলের প্রথম ভাগ অবধি এই দুই বন্দর এই দুই নামে পরিচিত ছিল। তার পর সরস্বতী নদী মজে যাবার জন্য সপ্তগ্রাম বন্দর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

মোগল-শাসনের শেষ ভাগ দিয়ে বাঙলা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক পরিমাণে কমে যায়। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার বাঙলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন বাঙালীর

বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারেই লোপ পেয়ে গিয়েছিল বলা চলে। মোগল আমলের শেষভাগে ও ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে মাঝে মাঝে দু' একটি বাঙালী বণিক্ উপকূল বাণিজ্য চালাতেন, কিন্তু সমুদ্রে পাড়ি দেবার যুগ এই সময়ের অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মোগল-শাসনের মধ্য ভাগে বাঙালী নাবিক দুর্দ্ধর্ষ নৌযোদ্ধা হয়ে উঠেছিল—তার পরিচয় তোমরা কেদার রায়ের কাহিনীতেই পেয়েছ। প্রত্যেক ভুঁইঞার অধীনে এক একটি নৌবাহিনী ছিল এবং প্রত্যেক ভুঁইঞাই মোগল সেনাপতিদের যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন। তবে তাঁরা নিজেদের জমিদারী নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, সকলে একত্র হয়ে মোগলের সঙ্গে লড়ার কথা তাঁদের মনে আসে নি। সকলে এক জোটে কাজ করলে মোগল-সম্রাট্ বঙ্গবিজয় করতে পারতেন কিনা সন্দেহ—অন্ততঃ ইতিহাসের ধারাটা যে অনেকখানিই বদলাতো তা বোধ হয় বলা চলে।

প্রিভেন্‌সন্ ইজ্ বেটার দ্যান্ কিওর!

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বুলুর পিসীমার ডাক্তারি-করা ব্যায়রাম। "স্বাস্থ্য-সংগ্রহ" ব'লে মাসিকের তিনি নিয়মিত গ্রাহক। এবং তার বিজ্ঞাপনের পাতায় যত পেটেণ্ট ওষুধের নাম সব তাঁর মুখস্ত। কোনও চটক্‌দার বিজ্ঞাপন দেখ্‌লেই সেই ওষুধ তাঁর আনানো চাই-ই, এবং পরীক্ষাও করা চাই। কিন্তু কার ওপর আর কর্‌বেন? তাঁর নিজের তো কোন রোগ-ব্যাধি নেই। হাতের কাছাকাছি আর কাকেই বা পাওয়া যায়? সমস্ত বাড়ীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী হচ্ছে একমাত্র ঐ বুলু। কাজেই বুলুর ওপরই চালাতে হয়। (আর একটা প্রাণী অবশ্য আছে, সে চতুষ্পদ, একেবারেই নগণ্য, বুলুর পোষা কুকুর পাপি; কিন্তু পাপির জন্য আর কে মাথা ঘামায়!)

বুলু বেচারা কি আর করে? ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাকে ওষুধ খেতে হয়। না খেয়ে কি পরিত্রাণ আছে? মাথা ধরে নি, তবু তাকে খেতে হবে ক্যাফিয়াস্পিরিন্।

TIGHT BINDING

ধরে নি, কিন্তু ধরতে কতক্ষণ? বাত হয় নি, হয়তো হবার সম্ভাবনাও নেই তবু তাকে বাতের ওষুধ খেতে হচ্ছে। বাত, পক্ষাঘাত এ সব সোজা ব্যায়রাম নয় তো, হয়ে পড়লে তখন ভোগান্তির এক শেষ। বুলুর আর কী, ও-তো কাৎ হয়ে পড়ে থাকবে! ভোগান্তি আর কার বল? পিসীমারই তো? কাজেই আগে থেকেই ওষুধ খেয়ে ওসব শক্ত অসুখ আট্‌কে রাখতে হয়।

প্রায় রোজই এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়: বুলু ছুটছে, তার পেছনে পেছনে ছুটছেন বুলুর পিসী। ওষুধের শিশি আর গেলাস তাঁর হাতে। তাঁর পিছু পিছু ছুটছে বুলুর কুকুর!

এই সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, এই আবার নেমে আস্‌ছে—ওরা তিনজনেই।

একতালা থেকে দোতালা, দোতালা থেকে ছাদে—ছুটছে বুলু। সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে-নাম্‌তে ঘেমে অস্থির হয়ে পড়ছেন বুলুর পিসী। কি করবেন? ওষুধ না খাইয়ে কি তাঁর নিস্তার আছে?

"বুলু, শোন। শোন লক্ষ্মীটী! ফিবার্‌মিক্‌চারটা খেয়ে নাও! লক্ষ্মীটী!"

"আমার যে জ্বর হয় নি পিসীমা!"

"জ্বর হয় নি! পাগল ছেলে। হয় নি বলেই তো খেতে হবে। সেই যে তুমি সেদিন স্বাস্থ্য-সংগ্রহের সেই ইংরেজি কথাটার মানে ক'রে দিলে—সেই যে কি কথাটা—"

দৌড়তে দৌড়তে বুলু চেঁচায়—"প্রিভেন্‌সন্ ইজ্ বেটার্ ত্যান্ কিওর!"

"ওর মানে কি এখন বল তো!" ছুটতে ছুটতেই পিসীমার প্রশ্ন হয়।

"ওর মানে?" তিন লাফে বুলু তখন ছাদে। "ওর মানে প্রাণ থাক্‌তে ওষুধ খেয়ো না।"

পিসীমা ততক্ষণে বুলুকে পাক্‌ড়ে ফেলেছেন। "এইবার খেয়ে ফেলো তো লক্ষ্মীটী!"

ধরা প'ড়ে নির্জ্জীব হয়ে পড়ে বুলু। করুণ দৃষ্টিতে পাপির দিকে তাকায়। পাপি আর কি করবে? পাপীরা কি কারও ত্রাণকর্ত্তা হতে পারে? অসহায় ভাবে সে ল্যাজ নাড়ে কেবল।

"এই যে বাঃ, দিব্যি হাঁ হয়েছে। এইবার ঢক্ করে ওষুধটা—। বাস্। লক্ষ্মী ছেলে। প্রাণ থাক্‌তেই তো ওষুধ খাবে। প্রাণ গেলে তখন আর ওষুধ খেয়ে লাভ?"

বুলু বেচারা মনমরা হয়ে থাকে। এত ওষুধের ধাক্কা একা সাম্‌লাতে হয় ওকে। কবে জ্বরজারি হবে তার ভয়ে আগে থেকেই ওষুধে জর্জ্জরিত হয়ে হয়ে আছে বেচারা!

এবার কিছুদিন থেকে জলচিকিৎসা সুরু হয়েছে বুলুর। এ মাসের স্বাস্থ্য-সংগ্রহে রোগ সারাবার এই নতুন ফন্দীটি জান্‌তে পেরেছেন বুলুর পিসী। তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন বুলুকে আরাম করতে, প্রায় মরিয়া হয়েই।

ভোর হতে না হতেই বুলুকে বিছানা থেকে তুলে দেওয়া হয়। চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গিয়ে খাড়া করা হয়। তার পর তার মাথায় ঢালা হতে থাকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল বাল্‌তির পর বাল্‌তি। তার পর তোয়ালে দিয়ে তাকে ঘষা হয় আপাদ-মস্তক। তিন ঘণ্টা পরে আবার সেই ব্যবস্থা—এবার কিন্তু হট্‌বাথ্। তার এক প্রহর বাদে শাওয়ার বাথ্। এই রকম সারা দিন ভোরই তার জলযোগের পালা চলে।

কিন্তু এত চিকিৎসাতেও বুলু দিন দিন শুকোতে থাকে। বাস্তবিক, কি হয়েছে ওর? ওর পিসীমা ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে পড়েন। কিছুতেই তো ছেলেটার চেহারা ফেরানো যাচ্ছে না! ওর শরীরেও কোন ফূর্ত্তি নেই, মনে তো নেই-ই। চিকিৎসার তো সব রকমই ক'রে দেখা হয়েছে। স্বাস্থ্য-সংগ্রহ আর পিসীমার বিদ্যায় যতখানি ছিল তার কিছুই ছাড় পড়ে নি। এক ব্লিস্‌টারের পুল্‌টিস্ দেওয়া বাদে।

"বুলু শোন, এদিকে এস। তোমার কি সারা গায়ে খুব ব্যাথা?"

বুলু কী জবাব দেবে? হাঁ-না ঠিক কোন্‌টা বলা হবে নিরাপদ? সে চুপ করে' থাকে।

"আচ্ছা, তোমার ঘাড়ের কাছে কি কন্‌কন্ করে? ভারী ভারী মনে হয়?"

বুলু মনে মনে ভার বোধের চেষ্টা করে। "না বোধ হয়—" সে বলে।

"ভোর রাত্রের দিকে কি ঘাম হয় তোমার?"

আন্দাজ করা শক্ত হয় বুলুর পক্ষে। তখন তো সে ঘুমিয়ে। প্রায় রোজই তখন সে ঘুমায়, তার ঢের আগে থেকেই তার ঢের পরে পর্য্যন্ত। তবু এবার সে ঘাড় নেড়ে দেয়। "হুঁ্যা, পিসীমা।"

"তবেই হয়েছে। ঠিকই ধরেছি আমি।" পিসীমার এবার উৎসাহ প্রকাশ পায়। "এ সমস্তই টি-বি-র পূর্ব্বলক্ষণ। এই প্রবন্ধেও সেই কথাই লিখেছে।" স্বাস্থ্য-সংগ্রহের পাতা ওল্টাতে থাকেন তিনি।

"এবার থেকে ক্যাল্‌সিয়াম্ মিক্‌চারই তোমাকে দিতে হবে। ওই হচ্ছে তোমার ওষুধ।"

'ক্যালসিয়াম্ মিক্‌চার' আনানোর সঙ্গে সঙ্গে বুলুর মতিগতির পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সে এখন চেয়ে চেয়ে ওষুধ খায়। যখন তখনই চায়। সঙ্গে সঙ্গে এক চামচ তাকে তক্ষুণি না দিলে আর রক্ষে নেই। পিসীমা একদিন লুকিয়ে চেখে দেখেন, কিন্তু ওষুধটা তেমন মিষ্টি নয় তো! বরং খারাপই বলতে হবে, যদিও কুইনিনের মতো অতটা নয় অবশ্য। দেখতে দেখতে বুলুর চেহারাও ফিরে আসে। ওর ফূর্ত্তিও দেখা যায় খুব।

পিসীমা কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েন ওষুধের যোগান্ দিতে দিতে। এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই বুলু এসে হাজির। "কই পিসীমা, আমার ওষুধ কই?"

"নে বাপু! আমি আর পারি নে! ওই তাকে রয়েছে বোতল, চামচও ঐখানেই। নিয়ে তোর কাছে রেখে দেগে, যখন খুসি খাস্।" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "ওষুধ দিতে দিতে হদ্দ হয়ে গেলাম!"

বোতল নিয়ে সটান্ চলে যায় বুলু বাড়ীর ছাদে। চামচ সমেত। ছাদের এক কোণে একটা ফাটল ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এক চামচ ওষুধ সেই ফাটলের মুখে ঢেলে দেয়। দিয়ে ভয়ানক মুখ বিকৃত করে; অবশ্য ফাটলের পক্ষ থেকেই। প্রায় মাসখানেক থেকেই বুলু ছাদের চিকিৎসায় মন দিয়েছে।

বোতলকে বোতল ফাঁক হতে থাকে দিনকে দিন। বুলুর চেহারার আরো

উন্নতি দেখা যায়। ওর ফূর্ত্তিও আর ধরে না—লাফ-ঝাঁপ লেগেই আছে। নিজের চিকিৎসার অব্যর্থতায় পিসীমারও আনন্দের পরিসীমা নেই।

সেদিন সকালে বুলু ফাটলের জন্য এক চামচ ওষুধ ঢেলেছে কি ঢালে নি, এমন সময়ে তার পাপি ছাদে গিয়ে হাজির তার খোঁজে।

"কি পাপি, খবর কি?"

পাপি জিভ বার ক'রে তাকায়। মনে হয় যেন ওষুধটার স্বাদ পেতে চায় সে।

"কি, খাবি নাকি এক দাগ?"

পাপি ঘাড় নাড়ে।

"আচ্ছা, তোর কি গা ব্যথা করে? দাঁত কন্‌কন্? ভালো ক'রে ভেবে বল্। ঘড়ের কাছে ভার ভার? মাথা ধরে তোর?" ল্যাজ নেড়ে প্রশ্নের উত্তর দেয় পাপি। "ভোর রাতে ঘাম হয় খুব? হয় তো?"

এবার পাপির অনেকখানি জিভ লালায়িত হয়।

"তবে খা এক চামচ। অত ক'রে যখন বল্‌ছিস্।"

পাপির মুখ তুলে ধরে ওর বিস্তারিত হাঁ-এর মধ্যে এক দাগ ওষুধ ঢেলে দেয় বুলু।

সঙ্গে সঙ্গে পাপির অভ্রভেদী এক লাফ! আর একটু হলেই ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে নেপথ্যেই ওর চলে যাবার কথা। তার পর, খুব সম্ভব আরামের আতিশয্যেই, এমন তিড়িংবিড়িং সুরু ক'রে দেয় যে পিসীমাকে ছুটে উপরে আস্‌তে হয়।

"ছাতে এত দুপ্‌দাপ্ কিসের রে?" পিসীমা ভারী বিচলিত হয়েই বলেন, "কুকুরটা অমন কর্‌ছে কেন?"

"আরাম হলেই অম্‌নি করে ওরা।" বুলু গম্ভীর ভাবে বলে, "ব্যারাম সেরে যাচ্ছে কিনা! তারই ফূর্ত্তিতে।"

"কুকুরদের আবার অসুখ করে নাকি কখনও!" পিসীমা ঠোঁট ওল্টান। "কর্‌তে কতক্ষণ?" বুলু বলে, "কর্‌লেই হ'ল। তখন আর ভোগান্তি কার

বল ? আমারই তো। ওঁর আর কি, উনি তো কেবল শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়্‌বেন !”

এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয় পিসীমার কাছে। বুলুর হাতে ওষুধের শিশি আর চামচ। আর বল্‌তে হয় না।

“বুলু, একি হচ্ছে তোমার দিন-কে-দিন ?” পিসীমা কড়া সুরেই বলেন, “বেচারা অবোলা জীব, তাকে ওষুধ খাওয়াতে গেছ ?”

“কি কর্‌ব পিসীমা ?” একটু থেমে থেমেই জবাব দেয় বুলু—“ভারী মায়া কর্‌ল আমার। ওর তো কোন পিসীমা নেই কিনা !”

“পিসীমা নেই, বটে !” একেবারে গুম্ হয়ে যান্ তিনি।

বুলু বলে, “তাই আমিই ওর পিসীমা হলাম।”

বুলুর পিসী আর কিছু বলেন না। কী আর বল্‌বেন ? যার জন্য স্বাস্থ্য-সংগ্রহ পড়া, এত ওষুধ আনানো, এত কষ্ট ক'রে ডাক্তারি করা—সেই কিনা—সেই কিনা—

অকৃতজ্ঞতার ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি।

সেই কিনা এমন ‘ওষুধ-হারাম’ !

“ডেং-মো-চি”

[জাপানী গল্প]

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

লোকটির বাড়ী জাপানে ; নাম তাকাদা। চেহারাটা জাপানী ধরণের ;—বেঁটে, গোল-মুখ, ছোট-চোখ, খাঁদা-নাক। একটু মোটা গোছের ;—বুদ্ধিটিও সেই রকমের, অর্থাৎ, মোটা গোছেঁরই।

ছেলেবেলা থেকে তা'কে লেখাপড়া শেখাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল,

কিন্তু, তা'র মাথায় বেশী কিছু ঢোকান যায় নি। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখে সে এক পুরোহিতের বাড়ীতে চাকরী কর্‌ছে।

পুরুতঠাকুর সাদাসিধে মানুষ ; তাঁর অভাবও বিশেষ কিছু নাই। তাঁর বাড়ীতে কাজ কর্‌তে হ'লে বেশী বুদ্ধির দরকার করে না ; তাই তাকাদাও কোনও রকমে কাজ চালিয়ে দেয়।

বাড়ীর কাজ তো চ'লে যায় কোনও রকমে ; মুস্কিল হয় বাজার করা ; জিনিষপত্র কেনা ইত্যাদি নিয়ে। তা'কে জিনিষের চেহারা বুঝিয়ে দিতেই প্রাণান্ত। প্রত্যেকটি জিনিষের নাম ব'লে, তা'র চেহারাখানি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে ; নইলে হয়তো কোনও বিভ্রাট বাধাবে।

গুণের মধ্যে তা'র খুসী মেজাজখানা। হাসি তার মুখে লেগেই আছে ; ধমক দিলেও এক গাল হাসি দেখা যাবে। কাজ কর্‌বার সময় সে হাসি-মুখেই কর্‌বে।

* * *

পুরুতঠাকুরের সেদিন কি-যেন ঐক পার্ব্বণ ; সকাল থেকে খুব ব্যস্ত। নানা রকমের আয়োজন চলেছে ; অনেক জিনিষপত্র চাই।

সব জিনিষই প্রায় জোগাড় হয়েছে ; কাজ আরম্ভ হবে ;—হঠাৎ পুরুতঠাকুরের মনে পড়্‌ল একটা “ডেং-মো-চি” চাই। অম্‌নি তাকাদার ডাক পড়্‌ল।

এক গাল হাসি নিয়ে তাকাদা এসে হাজির। তা'কে বলা হ'লো “একটা ‘ডেং-মো-চি’ চাই।” সেও গাল-ভরা হাসি নিয়ে মাথা নেড়ে “যে আজ্ঞে !” ব'লে রওয়ানা হবার উদ্যোগ কর্‌ল।

পুরুতঠাকুরের কিন্তু গভীর সন্দেহ হ'লো, তাকাদা কিচ্ছু জানে না ‘ডেং-মো-চি’ কি, এবং কোথায় পাওয়া যায়। তা'কে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “ওহে ! একগাল হেসে, মাথা নেড়ে বড় যে রওয়ানা হচ্ছো, বুঝ্‌তে পেরেছ কি ‘ডেং-মো-চি’ কা'কে বলে, আর কোথায় পাওয়া যায় ?” তাকাদা আবার একগাল হেসে ঘন ঘন ডাইনে-বাঁয়ে মুণ্ডু নেড়ে বল্‌ল, “আজ্ঞে না ; সে সব কিচ্ছুই বুঝি নি” ; ব'লে আবার হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

পুরুতঠাকুর তা'র রকম-সকম দেখে অভ্যস্ত ছিলেন; কাজেই রাগ করলেন না। তাকে বললেন, "শোন ভাল ক'রে মন দিয়ে। 'ডেং-মো-চি' হ'লো এক রকমের ছোট্ট জীব; শক্ত খোলার মধ্যে থাকে; মাথায় তা'র দুটো ছোট শিং-এর মত জিনিষ আছে; খোলার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে দেখে। ধীরে ধীরে চলে কিংবা চুপটি ক'রে থাকে। জলার ধারে ঠাণ্ডায় গাছের ছায়ার তলায় 'ডেং-মো-চি'কে দেখা যায়। খোলার রংটি অনেকটা ছেয়ে ধরণের। জলার ধারে গিয়ে একটু মন দিয়ে খুঁজলেই 'ডেং-মো-চি' দেখতে পাবে। তা'র একটি আমার চাই। ছোট্ট টুকরি নিয়ে যাও; তা'তে ক'রে নিয়ে এস; হাতে ধ'রে এনো না।"

"সব বুঝেছি এবার"—ব'লে তাকাদা একটা ছোট্ট ঝুড়ি নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়ল আর সোজা জলার ধারে গিয়ে হাজির হ'লো। পুরুতঠাকুর একটা গুগলি (শামুক) চেয়েছিলেন;—জাপানী ভাষায় তা'কেই "ডেং-মো-চি" বলে।

খানিকক্ষণ এদিক্-ওদিক্ চেয়ে তাকাদা 'ডেং-মো-চি' দেখতে পেল না। তা'র ধারণা ছিল, 'ডেং-মো-চি' বেশ বড়-গোছের জিনিষ; "ছোট্ট" আর "ছোট"র প্রভেদ সে কিছু বুঝতে পারে নি।

হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা গাছের নীচে, জলার ধারে ঠাণ্ডা ছায়ায় কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে গাছের পিছনে গিয়ে সে দেখতে পেল, একটি লোক শুয়ে আছে। তা'র পিঠের উপর শক্ত খোলার মতন একটা জিনিষ (সেটা হচ্ছে সে দেশের ছাতা; বাঁশের চাটাইএর তৈরী—অনেকটা আমাদের দেশী 'টোকা'র মত)। মাথার চুল ঠিক শিংএর মত ক'রে দু'দিকে বিনুনির মত বাঁধা (জাপানের সামুরাই জাতের লোকেরা অনেক সময় ঐ রকম ক'রে চুল বাঁধে;—তাদের অনেকের মাথায় লম্বা চুল থাকে)।

লোকটির দিকে হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ তাকা'তেই সেও কৌতূহলী হ'য়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল ব্যাপারটা কি। অমনি তাকাদা আরো খুসী হ'য়ে ভাবল, "পুরুতঠাকুর ঠিকই ব'লেছিলেন—'মাঝে মাঝে খোলার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে'।"

লোকটির ততক্ষণে ভারী কৌতূহল হয়েছে। সে অবাক্ হ'য়ে তাকাদার

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। তাকাদাও সাহস পেয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি ডেং-মো-চি?"

লোকটির হাসি পেল। সে ভাবল, "এ আবার কি রকমের প্রশ্ন? লোকটা

জলার ধারে…কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই পাগল।" একটু ভেবে বলল, "হ্যাঁ, আমি ডেং-মো-চি!"

তাকাদা বলল, "তোমার পিঠে খোলা আছে?"

লোকটি তা'র সেই টোকাটি দেখিয়ে বলল, "এই তো!"

তাকাদা বলল, "তোমার দুটি শিং কই?"

লোকটি বলল, "এই যে, মাথার দু'পাশে দু'টি শিং।" তা'র চুলের দু'ধারে দু'টি বিনুনি শিংএর আকারে লম্বা করা ছিল।

তাকাদা মনে মনে ভাবল—"জলার ধারে,—গাছের ছায়ায়,—ঠাণ্ডায়; মাথায় দুটি শিং,—পিঠে শক্ত খোলা,—মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে দেখে—নিজেই বলছে 'ডেং-মো-চি'—তবে আর ভাবনা কি?"

তখন সে তা'র ছোট্ট টুক্‌রিখানা সাম্‌নে ধ'রে বল্‌ল, "তবে তুমি এর মধ্যে ব'সো ; তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব।"

লোকটির ভারী কৌতুহল হ'লো। সে উঠে এসে বল্‌ল, "তোমার বাড়ীতে তো যেতেই পারি ; কিন্তু এই টুক্‌রি চ'ড়ে যেতে তো কিছুতেই পারি না। তা'র চেয়ে চল হেঁটে যাই।"

তাকাদা ভাব্‌ল, "হঁ্যা, তা'ও তো হ'তে পারে। আমাকে শুধু বলেছেন, 'হাতে ধ'রে এনো না' ; সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে তো আর হাতে ধ'রে আনা হ'লো না।"

* * *

এদিকে পুরুতঠাকুর অপেক্ষা ক'রে ক'রে হয়রান। শেষটায় তিনি নিজেই তাকাদাকে খুঁজ্‌তে বের হ'লেন ;—আর দেরি করা চলে না।

গিয়ে যা' দেখ্‌লেন তা'তে তাঁর চক্ষুস্থির ! তাকাদা একটি সামুরাইকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ছে আর নাচ্‌তে নাচ্‌তে সুর ক'রে বল্‌ছে—"ডেং-মো-চি, ডেং-মো-চি,—ডেং—ডেং—মোচি-মোচি"। তা'র মুখে, চোখে হাসি আর আনন্দের চিহ্ন।

পুরুতঠাকুরকে দেখেই সে বল্‌ল, "জলার ধারে, গাছের ছায়ায়, ঠাণ্ডায় ;—পিঠে খোলা, ছুটো শিং, মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখে—'ডেং-মো-চি'।"

পুরুতঠাকুর আর কি করেন ? লোকটির কাছে মাপ চেয়ে তা'কে বিদায় দিলেন ; তার পর নিজেই একটা 'ডেং-মো-চি' খুঁজে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাকাদা অবাক্ হ'য়ে সব ব্যাপার দেখ্‌তে লাগ্‌ল। মুখে কিন্তু তখনও তা'র হাসি লেগেই আছে।

মুষ্টিযোগ

বেরিবেরির রোগীকে প্রত্যহ তুপুরে ১ ছটাক কলার থোড়ের রস খাইতে দিলে উপকার হয়।

* * *

তেলাকুচার পাতা চিনির সহিত বাটিয়া একটু গরম করিয়া ফোঁড়ায় প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফাটিয়া যায়।

ফুলের মূল্য *

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা

হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্—মস্ত বড় সহর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, বিরাট্ বিরাট্ গীর্জ্জা, বড় বড় পার্ক্ আর অগণিত লোকজনে সর্ব্বদা গম্ গম্ করিতেছে। সহরের মাঝখান দিয়া একটি সুদৃশ্য খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই খালের জলে বাড়ীগুলির ছায়া পড়িয়া সহরের শোভা যেন আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। এমনটা না হইলে মানাইবেই বা কেন ? সাতটা দেশ একত্র করিয়া যুক্তরাজ্য হল্যাণ্ড্—তারই তো রাজধানী !

১৬৭২ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে এই হেগ্ সহরে একটা বিশেষ চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছিল ; সেদিন হইতেই আমার গল্প সুরু করিব। রক্তের স্রোত যেমন মানুষের শিরা-উপশিরা দিয়া অবিরাম বহিতে থাকে ঠিক তেমনি ভাবে হেগ্ সহরের বুকের উপর দিয়া একটা বিরাট্ জনস্রোত সহরের এক প্রান্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে লাঠি, সোঁটা, ছোরা প্রভৃতি একটা-না-একটা অস্ত্র, কারও কারও কাছে ছোট ছোট বন্দুকও আছে। ক্ষিপ্ত জনতা চলিয়াছে কারাগারের দিকে। এই কারাগারে হল্যাণ্ড রাজ্যের 'গ্র্যাণ্ড পেন্‌সনারি' জন্ ডি উইটের ভাই কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ বন্দী হইয়া আছেন। জনতার লক্ষ্য তিনিই। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বড় গুরুতর। তিনি নাকি হল্যাণ্ডের ষ্টাট্‌হোল্ডার অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়াম্—প্রিন্স অব্ অরেঞ্জকে হত্যা করার ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। কাজেই আজ আর সহজে তাঁর নিস্তার নাই।

ব্যাপারটা তবে আর একটু খুলিয়াই বলি। হল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই

---

* একখানি বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ।

সময়টা বেশ একটু ঘটনাবহুল। এ যাবৎ হল্যাণ্ডে ছিল সাধারণতন্ত্র—অর্থাৎ দেশের জনসাধারণ মিলিয়া কয়েকজন নেতা নির্ব্বাচন করিয়া তাদের দিয়া শাসনকার্য্য চালাইত। জন্ ডি উইট্ ছিলেন এঁদের মধ্যে একজন প্রধান—তাঁকে বলা হইত 'গ্র্যাণ্ড পেন্‌সনারি'। তিনি লোকটি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমিক এবং যাকে বলে কূটরাজনীতি-বিশারদ। তাঁর নিজের বিবেচনায় দেশের যাতে মঙ্গল হয় সেরূপ কাজই তিনি করিতেন, কিন্তু সাধারণে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝিত না, ফলে এই মহাপ্রাণ লোকটি দেশবাসীর শ্রদ্ধা না পাইয়া ক্রমে ক্রমে তাদের বিরক্তিরই পাত্র হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি অবশ্য দেশের মুখ চাহিয়া সে সব গায়ে মাখিতেন না এবং জনপ্রিয় হইবার লোভে নিজের কর্ত্তব্য হইতেও বিচলিত হইতেন না। এই সময় ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ লুইএর প্রবল প্রতাপ। হল্যাণ্ডের লোকেরা তাঁকে দেশের মস্ত একজন শত্রু বলিয়াই জানিত। অথচ এই ফরাসীদের সঙ্গে জন্ ডি উইটের ব্যবহার তাদের কাছে রীতিমত সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইত। কি উদ্দেশ্যে জন্ ফরাসীদের সঙ্গে অমন ব্যবহার করিতেন—দেশকে নিরাপদ্, সমৃদ্ধ করিবার কি অসীম আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে দূরদর্শী জন্ তাঁর এই কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন সাধারণ লোকের পক্ষে তা বোঝা সম্ভবও ছিল না। ফলে জনের প্রতি তাদের বিরাগ দিন দিনই বাড়িতেছিল। জনের ভাই কর্ণেলিয়াস্‌ও ছিলেন দেশের একজন গণ্যমান্য লোক—তিনিও শাসনপরিষদের সদস্য ছিলেন। কর্ণেলিয়াস্ ভাইএর পথেই চলিতেন, ভাইএর মতই দেশকে ভালবাসিতেন, কাজেই জনের মত তিনিও জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে হল্যাণ্ডে ষ্টাট্‌হোল্ডার নামে একটা পদ ছিল—পদটা রাষ্ট্রনায়কের পদ—অর্থাৎ এক কথায় দেশের কর্ত্তা বলিতে ষ্টাট্‌হোল্ডারকেই বুঝাইত। জন্ ডি উইটের নিজের ধারণা ছিল ষ্টাট্‌হোল্ডার পদটা তেমন সুবিধার নয়, নতুন একটা আইনের খসড়া করিয়া তিনি এই পদটি একেবারে চিরকালের জন্য উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যাপারে দেশের লোক একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। তাদের ধারণা হইল এই দুর্দ্দিনে হল্যাণ্ডকে রক্ষা করিতে হইলে দরকার একজন ষ্টাট্‌হোল্ডারের। ষ্টাট্‌হোল্ডার একজন খাড়া করিতেও তারা কসুর করিল

না। ইনি আর কেউ নন্, দ্বিতীয় উইলিয়ামের পুত্র, তৃতীয় উইলিয়াম্—প্রিন্স অব্ অরেঞ্জ। উইলিয়াম্ বড় ঘরের ছেলে, বয়স বেশী নয়, বড় জোর ২২।২৩ বছর। জন্ ছিলেন তাঁর শিক্ষক। কিন্তু ছাত্রের চাইতে দেশের প্রতিই তাঁর টানটা বেশী থাকায় তিনি দেশের মুখ চাহিয়া ষ্টাট্‌হোল্ডার প্রথা একেবারে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে বেচারা উইলিয়ামের বড় আশায় বাদ সাধা হইল; কারণ ন্যায়তঃ ষ্টাট্‌হোল্ডারের পদ তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু ভগবানের বিধান ছিল বুঝি অন্য রকম। উইলিয়ামের অনুরক্ত লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী—তারা ষ্টাট্‌হোল্ডার প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য এবং উইলিয়াম্‌কে সেই পদে বসাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

ব্যাপার এমন ভাবে গড়াইল যে শেষ পর্য্যন্ত জন্ সাধারণের প্রস্তাব আর অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না—ষ্টাট্‌হোল্ডার নিয়োগের আইন পাশ হইল, তিনি সুবোধ ছেলের মতই তাতে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু তাঁর ভাই কর্ণেলিয়াস্ ছিলেন আরও জেদী। তিনি কিছুতেই স্বাক্ষর করিতে রাজী হইলেন না। 'অরেঞ্জী' অর্থাৎ প্রিন্স অব্ অরেঞ্জের অনুরক্ত দলও ছাড়িবার পাত্র নয়; কয়েকজন অত্যুগ্র উৎসাহীর প্ররোচনায় তারা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাঁকে দিয়া জোর করিয়া স্বাক্ষর করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গায়ের জোরেও কর্ণেলিয়াস্‌কে রাজী করান সহজ হইত না, শুধু স্ত্রীর এবং আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটিতে বাধ্য হইয়া তিনি শেষটায় নাম সই করিলেন—কিন্তু তার নীচে দু'টি কথা বসাইয়া দিলেন—তার অর্থ "এ স্বাক্ষর গায়ের জোরে করান হইয়াছে"।

ষ্টাট্‌হোল্ডারের পদ কায়েমী হইল, কিন্তু অরেঞ্জী দলের কয়েকজন কুচক্রী তা'তেও সন্তুষ্ট হইল না। এই দুই ভাইকে না সরাইতে পারিলে পদে পদে নানা রকম বাধার সৃষ্টি হইতে পারে; অতএব? অতএব তাদেরই চক্রান্তে একদিন জন্‌কে অতর্কিত ছোরার আঘাতে নিপাত করার ব্যবস্থা হইল। ভাগ্যক্রমে জনের মৃত্যু হইল না—তবে বেশ কিছুদিন শয্যাগত থাকিতে হইল। আর কর্ণেলিয়াস্? তাঁকে কি ভাবে সরান যায়? সে উপায় ঠাওরাইতেও বেগ পাইতে হইল না; টাইকেলিয়ার নামে এক 'মহাপ্রাণ' ডাক্তার এ কাজের ভার লইল।

একদিন সে আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ণেলিয়াস্ প্রিন্স উইলিয়াম্‌কে পথের কাঁটা মনে করিয়া গোপনে তাঁকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এজন্য তিনি একজন গুপ্ত ঘাতকও ঠিক করিয়াছেন—ভাগ্যক্রমে টাইকেলিয়ারের উপরই সে কাজের ভার পড়িয়াছে। টাইকেলিয়ার সেখানে সাধু সাজিয়া কাজের ভার নিয়াছে বটে কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ব্যাপারটা যথাস্থানে ফাঁস করিয়া দেওয়া। (অবশ্য প্রিন্স উইলিয়াম্ নিজে এই সব চক্রান্তের কথা জানিতেন না)।

এই ব্যাপারে সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য নির্দ্দোষ কর্ণেলিয়াস্‌কে বন্দী করা হইল, তার পর তাঁর একটা বিচারও হইল। অবশ্য বিচারের পূর্ব্বে কথা বাহির করিবার জন্য কর্ণেলিয়াসের শরীরের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করিতে কসুর করা হয় নাই, কিন্তু কর্ণেলিয়াস্ দোষ স্বীকার করিলেন না। তা' জজদের ভালই বলিতে হইবে, তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত কর্ণেলিয়াস্‌কে প্রাণদণ্ড দিলেন না; হুকুম হইল, পদচ্যুত তো তিনি হইবেনই, তা ছাড়া তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে আর তাঁকে স্বদেশ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। ভাইএর এ অপমানে জন্‌ও ঠিক থাকিতে পারিলেন না, তিনিও কাজে ইস্তফা দিলেন। টাইকেলিয়ার অবশ্য মুক্তি পাইল, এবং সেই সঙ্গে কিছু পুরস্কারও।

হ্যাঁ, এবার যা বলিতেছিলাম বলি। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখের কথা। হেগ্ সহরের বিরাট্ জনসমুদ্র কারাগারের দিকে চলিয়াছে—কারণ আজ কর্ণেলিয়াস্ কারাগার হইতে বাহির হইয়া দেশের নিকট চিরবিদায় লইবেন। এই জনসমুদ্রের প্রত্যেকটি লোকের উদ্দেশ্যই খুব মহৎ সন্দেহ নাই—তারা এই দেশপ্রেমিকটিকে তাদের কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চলিয়াছে। এমন একটা মহৎ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে এমন মূর্খ কে আছে? কারারক্ষীদের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে কর্ণেলিয়াসের চেহারাখানা এখন না জানি কেমন দাঁড়াইয়াছে!—নিশ্চয়ই খুব উপভোগ্য! তা ছাড়া এতদিন যে লোকটা মাথা উঁচাইয়া হোমরা-চোমরাদের দলে ঘুরিয়া বেড়াইত আজ সে মুখ নীচু করিয়া ভিজা বিড়ালটির মত বাহির হইয়া যাইবে—সেও কি দেখিবার মত নয়! চাই কি সুবিধা পাইলে

কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁর উপর কিছু কাদা-মাটী বা ইট-পাটকেলও ছোঁড়া যাইতে পারে! আর হাতের এ অস্ত্রগুলি—এগুলিও কি শুধু শুধুই টানিয়া আনা হইয়াছে? এমন অবস্থায় লোকে হাঁটিতে পারে না—হেগ্‌বাসীরাও পারিতেছিল না, তারা সকলেই দৌড়াইতেছিল।

ভিড়ের মধ্যে সকলের আগে ছিল টাইকেলিয়ার। সকলে মুগ্ধ হইয়া তাকে তারিফ করিতেছিল। ভাগ্যিস্ এই লোকটা ছিল, নহিলে এত বড় মজাটা কি আর হইত? টাইকেলিয়ারও সাধ্যমত তাদের কৌতূহল মিটাইতেছিল। কেমন করিয়া কর্ণেলিয়াস্ প্রচুর অর্থ নিয়া তাকে সাধিয়াছিলেন—সেও কেমন করিয়া সুবোধ বালকের মত সেগুলি পকেটস্থ করিয়া চুপি চুপি কাজের ভার লইবার ভান করিয়াছিল, তার পর কি ভাবে নিরাপদ্ জায়গায় আসিয়া ব্যাপারটা ফাঁস করিয়া দিল—ইত্যাদি অনেক কথা। এ সব তথ্য সে এ ক'দিন মনে মনে ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিল, আজ অপর্য্যাপ্ত ভাবে বিতরণ করিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্যে আরও নানা রকম আলোচনা চলিতেছিল। হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল—"কিন্তু আমার মতে বিচারটা মোটেই ঠিক হয় নি—আমি হ'লে একেবারে অন্য রকম হ'ত। এই ভীষণ সাপকে একবার খোঁচা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া? দুই ভাই-ই তো সমান! দেশের বাইরে বেরিয়েই তো ওরা ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দেবে। তার পর দুই ভাই ফ্রান্সের অর্থে আমাদের কি ক্ষতিটাই না জানি করবে!" অমনি আর একজন বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয়ই ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দেবে—আমি শুনেছি শেভেনিংএ ওদের জন্য জাহাজ তৈরী—ফরাসী জাহাজ, বেরিয়েই লম্বা দেবে ফ্রান্সে! তার পর—"। চার ধার হইতে শব্দ উঠিল "বল কি—বল কি! সত্যি—সত্যি?"

অমনি একজন বলিয়া উঠিল "কিছুতেই দেব না—আমরা থাকতে এ রকম অবিচার কিছুতেই চলবে না—বিশ্বাসঘাতকদের এভাবে কিছুতেই পালাতে দেব না"। অমনি হাজারকণ্ঠ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"না, না, কিছুতেই না, দেখি কোথা দিয়ে পালায়! চল চল, এক্ষুণি আমরা গিয়ে ওদের আটকাই।" ক্ষিপ্ত জনতা দ্বিগুণ উৎসাহে কারাগারের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু কারাগার পর্য্যন্ত পৌঁছান হইল না, তার আগেই বাধা পড়িল। একদল অশ্বারোহী সৈন্য কারাগার পাহারা

দিতেছিল। তাদের অধ্যক্ষ কাউন্ট টিলি হুকুম দিলেন, "থাম, আর নয়।" জনতার অগ্রগতি থামিল কিন্তু চীৎকার থামিল না—"পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমরা ভিতরে যাব—বিশ্বাসঘাতকদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু, তাই তাদের দিতে হবে। জয় অরেঞ্জের জয়।"

কাউন্ট টিলি কিন্তু অটল। প্রহরী সৈন্যদের প্রস্তুত থাকিবার জন্য সাবধান

কাউন্ট্ টিলি কিন্তু অটল

করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "ভাল ভাল, উদ্দেশ্য তোমাদের মহৎ—অরেঞ্জীদের জয় হোক্, আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ যে আর একটা কি বল্লে—বিশ্বাস-ঘাতকদের মৃত্যু—ওটির আশা আপাততঃ ত্যাগ কর।" কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষান্ত হইল না। তারা জোর করিয়া ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাউন্ট বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, "খবর্দ্দার, আর এক পা এগিয়ো না, এই দেখ্ছ আমাদের হাতে তলোয়ার আর এই দেখ পিস্তল—পঞ্চাশ গজ দূর থেকেও অনায়াসে এ দিয়ে মানুষকে মানুষ উড়িয়ে দেওয়া যায়। আর তোমরা যেখানে আছ সেটা

২৫ ফুটও নয় তাও মনে রেখ।" জনতা আর আগাইল না, কিন্তু চীৎকার সমানে চলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে সকলের অলক্ষিতে কিছু দূরে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল; গাড়ীর ভিতর হইতে সম্ভ্রান্ত চেহারার এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নামিয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া কারাগারের পিছন দিকের দরজায় গিয়া হাজির হইলেন। তাঁর পিছু পিছু একজন চাকরও চলিল। দারজায় করাঘাত করিতেই জেলার বাহির হইয়া আসিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমি কর্ণেলিয়াস্‌কে নিয়ে যেতে এসেছি।" রুক্ষমূর্ত্তি জেলার তাঁদের ভিতরে আনিয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকিতেই একটি বছর ১৭।১৮ বয়সের সুশ্রী মেয়ে আসিয়া তাঁকে নমস্কার করিল—মেয়েটি জেলারের। ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ভাল আছ তো রোজা, আমার ভাই ভাল আছে?" রোজা সেই মেয়েটির নাম; সে ভারী গলায় বলিল "ওঁর জন্য তো তেমন ভাবনা ছিল না—কিন্তু—আপনি বাইরের চীৎকার শুনেছেন?"

"ও কিছু না, আমাদের দেখলেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—আমরা তো এ যাবৎ ওদের ভাল ছাড়া মন্দ করি নি কখনও—ওরা আমাদের অনিষ্ট করবে কেন?"

রোজা তেমনি ভাবে জবাব দিল, "তার কি কোন মানে আছে, বরঞ্চ সচরাচর ঠিক তার উল্টোই দেখা যায়"। বাপের চোখের দিকে চাহিয়া রোজা চুপ করিল। ভদ্রলোকটি মনে মনে ভাবিলেন, এই নিরক্ষর মেয়েটি পৃথিবীর নিয়ম-কানুন যেন এক কথায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। গম্ভীর মুখে, ধীর পাদক্ষেপে তিনি কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের সেলের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই ভদ্রলোকটি আর কেউ নন্—হল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড্ পেন্‌সনারি জন্ ডি উইট্।

(ক্রমশঃ)

তের নং বাড়ীর রহস্য

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

ব্যাপারটা ঘটেছিল এক পূজার বন্ধে; হুকা-কাশি গিয়েছিলেন শিলং, আর রণজিৎ ভাড়া নিয়েছিল কল্‌কাতারই সহরতলিতে একটা বাগান-ঘেরা সুন্দর বাড়ী। রণজিতেরই জিৎ হল, কেননা হুকা-কাশি লিখে জানালেন, অনবরত বৃষ্টির চোটে তাঁর চেঞ্জ্ মাথায় উঠেছে, আর কোথাও যেতে পারলে তিনি বাঁচেন। রণজিৎ তাঁকে তার নিরিবিলি বাড়ীখানাতে দিন কতক এসে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করল, হুকা-কাশিও শিষ্ট ছেলের মত ফিরে এলেন।

হুকা-কাশিকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য রণজিৎ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। গাড়ী করে বাড়ী আসবার পথে হুকা-কাশি বরাবর লক্ষ্য করলেন, রণজিৎ যেন বেশ একটু গম্ভীর, যেন কিছু চিন্তান্বিত। "ব্যাপার কি রণজিৎবাবু, আজ আপনার নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে!" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, দেশটা দিনকের দিন এমেরিকা হয়ে দাঁড়াল নাকি তাই ভাব্‌ছি।"

"কি রকম, লোকগুলো হঠাৎ খুব ফর্সা হয়ে যাচ্ছে নাকি? নাকি গঙ্গার ধারে ছাপ্পান্ন-তালা বাড়ীর ভিৎ গাঁথা হচ্ছে?"

"ও দু'টোর কোনটাই খুব ভয়ের কথা নয়, কাজেই ওর জন্য চিন্তিত হবার কারণ নেই। কিন্তু ইয়াঙ্কি গুণ্ডারা যে ছেলে ধরে এনে, তাকে লুকিয়ে রেখে আত্মীয়স্বজনদের চিঠি পাঠায়—'পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেল্‌বে তো ফেল, নয়তো ছেলে ফিরে পাবার আশা ছাড়'—আমাদের দেশেও যদি সেই ধরণের গুণ্ডামির চলন হয়, তবে একটু ভাববার কথা হয়ে পড়ে বৈ কি?"

"কথাটা আর একটু সোজা ভাষায় বলুন রণজিৎবাবু। দুনিয়ার হালচাল দেখে আপনি কি একটা দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করছেন, না কি বাস্তবিকই ওই ধরণের কোন ব্যাপার আপনার নজরে এসেছে?"

"দেখুন, আপনি দু'দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছেন, এখানে একটা জটীল কেস্ আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে স্বভাবতঃই আমার দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু পরশু রাত্রে যে অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমার মনে গুরুতর সন্দেহ জেগে উঠেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, সমস্ত জেনেশুনেও যদি চুপ করে থাকি, ভগবান্ হয়তো সইবেন না। ব্যাপারটা খুলে বলি, শুনুন...... এখানে যে পাড়াটাতে আমি বাড়ী নিয়েছি সেটা খুবই নিরিবিলি, লোকজনের আসা-যাওয়া নেই বল্লেই চলে। আমার বাড়ীর কাছেই আর একটা ছোটমত একতালা বাড়ী, ও রাস্তার ১৩ নম্বরের বাড়ী—আসা অবধি খালিই পড়ে আছে দেখ্‌ছি। অনেক দিন থেকেই নাকি

খালি আছে। পরশু দিন সারাক্ষণটাই বেশ গুমোট গিয়েছিল; অনেক রাত পর্য্যন্তও কিছুতে যখন ঘুম এল না, তখন দরজা খুলে বাড়ীর দক্ষিণ দিক্‌কার বারান্দাটায় গিয়ে বস্‌লাম—যদি কিছু বাতাস পাওয়া যায় সেই আশায়। বসে আছি প্রায় মিনিট পাঁচেক, হঠাৎ মনে হল তের নম্বর বাড়ীটা থেকে কেমন একটা কাতর গোঙানির আওয়াজ আস্‌ছে। আস্তে আস্তে আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, কে যেন অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করছে—'বাবাগো গেলুম! আমি আর পারি না, এর চেয়ে তোমরা আমায় মেরে ফেলে একদম্ মুক্তি দিয়ে দাও—মুক্তি দাও! ওই ছুরিখানা দাও আমার পেটে ঢুকিয়ে—এ নরক-যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারি না।'

'কি চাই এখানে?'

"ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম আমি; তৎক্ষণাৎ ওই অবস্থাতেই নীচে নেমে এলাম—ও বাড়ীটাতে গিয়ে দেখ্‌তে হবে ব্যাপারখানা কি! ওখানে গিয়ে কিন্তু বিস্ময় আমার শতগুণ বেড়ে গেল; সামনের দিক্‌কার সমস্তগুলি জান্‌লা-কপাট বন্ধ, আর সদর দরজায় ঝুল্‌ছে প্রকাণ্ড একটা তালা। দেখ্‌লে স্বভাবতঃই মনে হবে যে ওই বাড়ীটাতে কেউ যে বসবাস করছে, ভেতরের লোকেরা বাইরের কাউকে তা বুঝ্‌তে দিতে চায় না। এ অবস্থায় আর ভোর না হওয়া অবধি হঠাৎ কিছু করা উচিত হবে না ভেবে সে রাত্তিরের মত চলে এলাম। তার পর সকালে গিয়ে দেখি তালাটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বটে, তবে দরজা বন্ধই রয়েছে। আমি বারান্দায় গিয়ে উঠ্‌তেই একটা ইতর চেহারার নিম্ন শ্রেণীর লোক বার হয়ে এল, আমার পা থেকে মাথা অবধি বার দু'তিন বেশ করে দেখে নিয়ে হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করল 'কি চাই এখানে?'

"'তোমরা বুঝি এ বাড়ীটাতে নতুন ভাড়াটে এসেছে ?'

"লোকটা ফের সন্দেহের চক্ষে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বল্লে, 'হুঁ'।

"এর পর কোন কথাই যেন আর আমার মনে এল না ; কি বলে আলাপ আরম্ভ করা যায় ভাবছি, হঠাৎ লোকটা আমার মুখের উপরই ঝপ্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমারও মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল—ভেতরের লোকদের কোন কথা-বার্ত্তা শোনা যায় কিনা একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। তৎক্ষণাৎ খুব ঘটা করে চটিজুতোর শব্দ শুনিয়ে শুনিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম ; তার পর চটি বাইরে রেখে, পা টিপে চুপি চুপি বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়ালাম, কপাটের গায়ে কান লাগিয়ে। শোনা গেল, কে একজন ফিস্ ফিস্ করে অপর আর একজনাকে শাসাচ্ছে 'হুঁসিয়ার, খুঁব হুঁসিয়ার! কেউ টের পেলে সবশুদ্ধু মাঁরা পড়ব—শুধু আমি একা নই, তোরাও বাদ পড়বি না। পেছনের দুয়ার……' তার পরের কথাগুলো আর কানে এল না, তবে জেলখানা কথাটার উল্লেখ যেন শুন্‌তে পেলাম বলে মনে হল। তক্ষুণি আমি থানায় গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে দিয়ে আসতাম, যদি না জানা থাকত আজই আপ'নি এসে পৌঁছুচ্ছেন।…… কি রকম মনে হয় আপনার ব্যাপারটা ?"

হুকা-কাশি আস্তে আস্তে এক টিপ্ নস্যি নিতে নিতে বল্‌লেন, "রহস্যময়। মানে, অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ যোগ্য। তবে এখন আর এ নিয়ে বেশী আলোচনা করে লাভ নেই, বাড়ীটি আগে দেখা দরকার।"

বিকালের দিকে, বেলা নাগাদ পাঁচটায় রণজিৎকে সঙ্গে করে হুকা-কাশি ১৩ নম্বরের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফটক থেকে ছোট্ট একটা লাল সুরকির রাস্তা বাড়ীর সাম্‌না দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে আবার ফটকের কাছে চলে এসেছে। সেটুকু পার হলেই বারান্দা। ওঁরা গিয়ে সেই বারান্দায় উঠতেই সকাল বেলাকার সেই চাকরটা ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ; তার পর সেই সকাল বেলাকারই প্রশ্ন—"কি চাই এখানে ?"

"কর্ত্তা আছেন ? আমরা এই পাড়ারই লোক, আলাপ-পরিচয় করতে এসেছি।" হুকা-কাশি বল্‌লেন।

"এখন দেখা হবে না, তিনি ঘুমোচ্ছেন।"

রণজিৎ আড়চোখে একবার হুকা-কাশির দিকে চাইল, বোধ হয় আশ্বিন মাসের বেলা পাঁচটা যে ঘুমোবার পক্ষে খুব প্রশস্ত সময় নয় সেই তথ্যটুকুই স্মরণ করিয়ে দিতে। কিন্তু চাকরটার ভাবভঙ্গী খুবই সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়বার আর কোন বাক্য-ব্যয় না করে ওবেলার মত এবেলাও ঝপ্ করে সে দরজা বন্ধ করে দিল। অগত্যা রণজিৎদের ফিরতে হ'ল।

রাত তখন বোধ করি বারটা, সমস্ত সহর নিঃঝুমে, অকাতরে ঘুমাচ্ছে, হঠাৎ

হুকা-কাশির শোবার ঘরে বার কতক কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। "কে?" হুকা-কাশি প্রশ্ন করলেন।

"আমি—রণজিৎ। শীগ্‌গির দো'র খুলুন, খবর আছে।"

হুকা-কাশি উঠে এসে দরজা খুলে দিতে দিতে বল্লেন, "খবর আমি জানি, মানে কাৎরানি আর গোঙানির শব্দ আমারও কানে আস্‌ছে।"

"তা হলে এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য ?"

"চুপটি করে শুয়ে থাকা, মানে ভোরের জন্য অপেক্ষা করা।"

পরদিন প্রাতঃকৃত্য এবং চা-পানাদি শেষ করে হুকা-কাশি একবার দক্ষিণ দিকের বারান্দাটা ঘুরে এলেন, তার পর বল্লেন, "চলে আসুন রণজিৎ বাবু, কর্ত্তাগোছের এক ব্যক্তি বারান্দার ওপরে সশরীরে দেখা দিয়েছেন। দেখা তো দিতেই হবে, কাল দু' দু'বার 'পড়াপড়শীরা' খোঁজ নিতে এসেছিল শুনেছে, এরপরেও দরজা এঁটে বসে থাকলে যে নিজে থেকেই নিজের ওপর গুরুতর সন্দেহ ডেকে আনা হবে। আসুন, এই সুযোগে ওকে একটু নাড়া দিয়ে আসা যাক্।"

খুব বেশীক্ষণ "নাড়া দেওয়া" কিন্তু সম্ভব হ'ল না, মিনিট পনেরো পরেই দু'জনাকে ফিরতে হল। হুকা-কাশি একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখে কি রকম মনে হ'ল লোকটাকে ? দেখি আপনার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিটা !"

রণজিৎ হেসে বল্লে, "প্রথমতঃ মাথার চুলগুলো খাড়া-খাড়া, দ্বিতীয়তঃ ডান হাতের গেঞ্জির হাতাটা নীচের দিকে বার বার টেনে দেয়, তৃতীয়তঃ—তৃতীয়তঃ কি ? আপনিও দু'চারটা বলুন না !"

"বেশ তো বল্‌ছিলেন, বলে যান না—তৃতীয়তঃ কাল রাত গোটা তিনেকের সময় ওর বাড়ীতে মোটরে করে লোক এসেছিল…"

"কই, তা' তো বুঝতে পারি নি, আপনি টের পেলেন কি করে ?"

"অতি সহজ উপায়ে ; কাল মাঝ-রাত্রের পর এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ওই তের নম্বর বাড়ীর সাম্‌নে ভিজে সুরকির রাস্তার ওপর মোটরের চাকার দাগ এখন পর্য্যন্ত দিব্যি খাঁজ খাঁজ কাটা অবস্থায় রয়ে গেছে। কাল বিকালে এ দাগ ছিল না। তা ছাড়া মোটরের কলকব্জাও ছিল কিছু খারাপ, খানিকটা লুব্রিকেটিং অয়েল তাই চুইয়ে পড়েছে। রাস্তার সমস্ত জল একদম্ শুকিয়ে গেছে, কেবল ওই তেলের নীচেই একটুখানি জল এখনও চিক্‌চিক্ করছে, শুকোতে পায় নি। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে বৃষ্টি ধরার খুব পরে মোটর আসে নি।"

রণজিৎ খুব আশ্চর্য্য, এবং বোধ করি একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠ্‌ল, "তবে তো প্রকাণ্ড একটা সুযোগ হারিয়েছি আমরা কাল রাত্রে !"

হুকা-কাশি হেসে বল্লেন, "ব্যস্ত হবেন না, মোটর পালিয়ে যাবে না, আজ রাত্রেও নিশ্চয় ওটা এসে হাজির হবে। আপনি শুধু একটা টর্চ্চের ব্যবস্থা রাখ্‌বেন।"

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রণজিৎ হুকা-কাশিকে এসে পাকড়াও কর্‌ল, "আপনার টেবিলের ওপর আধ ছটাকটাক নুন এল কোত্থেকে মিষ্টার হুকা-কাশি ?"

"ও ওই তের নম্বর বাড়ীর নুন ; দেখবেন, তরকারিতে চালিয়ে দেবেন না যেন !"

"তের নম্বর বাড়ীর নুন ? এল কি করে ?"

"আজ সকালে যখন কর্ত্তার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে যাই, তখন সিঁড়ির নীচে ন্যাকড়ায় জড়ান অবস্থায় ওটুকু পাওয়া গেছে। আপনি টের পান নি, জুতো খুলে পায়ের আঙ্গুলে করে তখনই ওটা আমি তুলে নিয়েছিলাম।"

পর দিন সকালে উঠে রণজিৎ চাকরের মুখে শুনতে পেল হুকা-কাশি নাকি খুব ভোরেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন বলে গেছেন ফিরতে দেরী হতে পারে। খুব বেশী দেরী কিন্তু হ'ল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন—সঙ্গে একেবারে একটা ট্যাক্সি নিয়ে। চাকরকে তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানা-পত্রগুলো তাতে তুলতে বলে রণজিতের উদ্দেশ্যে তিনি বল্লেন, "আমায় মাপ করবেন রণজিৎবাবু, দিন-কতকের জন্য একটা হোটেলে গিয়ে আমাকে উঠতেই হবে। তবে যত শীগ্‌গির সম্ভব ফিরে এসে ফের আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব, কথা দিয়ে যাচ্ছি।"

হুকা-কাশির নিষেধ ছিল, তাই রণজিতের হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন আর তাঁর হোটেলে সে যায় নি, কিন্তু পরদিন দুপুরেই এসে সে উপস্থিত হল। হুকা-কাশি তখন বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে একখানা টাইম্ টেবিলের পাতা উল্‌টাচ্ছিলেন।

হোটেলের চারধারটা একবার দেখে নিয়ে রণজিৎ বললে, "আপনার রুম অবশ্য মন্দ নয়, তবে আলো-বাতাসের দিক্ থেকে দেখতে গেলে পাশের কামরাটা আরও ভাল। ওটা তো তালা-বন্ধ দেখ্‌ছি, কেউ আছে নাকি ?"

"কেন, উঠে আস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ? থাকতে হবে কিন্তু 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে' অবস্থায় কেননা ওতে থাকে একজন রাত্রির বাসিন্দে। রাত্রি দশটা থেকে ভোর ছ'টা পর্য্যন্ত তার এলাকা। দিনের বেলাটা অবশ্য আপনার রাজত্ব চলতে পারে !" হুকা-কাশি হাসলেন,—"বাস্তবিক, কি দারুণ চাকরী বলুন তো ! পাক্কা পনেরো-ষোল ঘণ্টা ডিউটি। তার ওপর আবার একদিন লেট্ হলে চাকরী নিয়ে টানাটানি ! দেখেছি তো, লেট হবার ভয়ে বেচারা কাল বেগ্‌নে হয়ে গেছল। চাকরীর এম্‌নি মোহ ! ভাল কথা, আমি আজ একটু বাইরে যাচ্ছি ; কম্বৌলির নাম শুনেছেন তো—সেইখানে। খুব বেশী দূর নয়, নৈহাটী থেকে মাত্র মাইল দুই। চলুন না আমার সঙ্গে, আপনার তো ইতিহাসে খুব ইণ্টারেষ্ট্‌ কম্বৌলির মিউজিয়ামটাও এই ফাঁকে দেখে আস্‌তে পারবেন।

রণজিতের একেবারেই আপত্তি ছিল না, বেলা দু'টার গাড়ীতে দু'জনে রওনা হয়ে পড়লেন।

কম্বৌলিতে পৌঁছে ওঁরা উঠ্‌লেন ডাক-বাংলায়। রণজিৎকে খানিকটা বিশ্রাম করে নিতে অনুরোধ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুকা-কাশি বার হয়ে পড়লেন, তাঁর কতগুলো জরুরী কাজ আছে, সেগুলো সেরে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তিনি ফেরবার চেষ্টা করবেন। কাল বরং সুবিধামত এক ফাঁকে সময় করে মিউজিয়ামটা দেখে আসা যাবে।

যথা সময়ে ডাকবাংলায় ফিরে এসে হুকা-কাশি দেখলেন, রণজিৎ দোকান থেকে এক রাশ খাবার আনিয়ে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। হুকা-কাশিকে ফিরতে দেখেই সে প্রশ্ন করে উঠল, "কদ্দূর কি করে এলেন ?"

"রসুন, রসুন, অত ব্যস্ত হলে কি চলে ? আরও দিন দুয়েক আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মিউজিয়াম দেখবার মৎলব বোধ হয় ছাড়তে হ'ল—ওতে নাকি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি চাই, পাশ চাই—অনেক কিছু ভজঘট সম্প্রতি হয়েছে। আমাদের এখানে চেনেই বা কে, আর পাশই বা কে দিতে যাচ্ছে ?"

কিন্তু রণজিতের বরাত ভালই বল্‌তে হবে, কেননা প্রায় বিনা ঝঞ্ঝাটেই মিউজিয়াম্ দেখার অনুমতি মিলে গেল। রণজিৎ পরমানন্দে হুকা-কাশির সঙ্গে মিউজিয়াম্ দেখতে রওনা হয়ে পড়ল। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত দেখে সিঁড়ি দিয়ে তাঁরা নামছিলেন, রণজিৎ বল্লে, "চমৎকার সংগ্রহ ! ব্যবস্থাও ভাল ; হবে না ? অতগুলো কর্ম্মচারী অনবরত খাটছে ! আপনি দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে আলাপ করছিলেন ? ওই বুঝি মিউজিয়ামের কিউরেটার ?"

"না, কিউরেটার উনি নন্, অন্য পাঁচজনের মত উনিও একজন সাধারণ কর্ম্মচারী। লোকটির জ্ঞান-পিপাসা দেখে একটু আলাপ করতে ইচ্ছা হল—দেখেছেন ওঁর টেবিলের ওপর কতগুলি বই পড়ে ! হ্যাঁ যা বলেছেন, সংগ্রহ চমৎকারই বটে, তবে আর দিন পাঁচ সাত আগে এলে আরো ভাল হত, কেননা একটা স্পেশাল এক্‌জিবিসন ছিল ; সেটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"তাই নাকি, কে বল্লে ?"

"কে আর বল্‌বে, এই দেখুন না," হুকা-কাশি সিঁড়ির পাশে একখানা ছাপানো বিজ্ঞাপন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, "নির্দ্দিষ্ট দিনের আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে দু'জনে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, হুকা-কাশি বল্লেন, "আপনি এবার

ডাকবাংলার দিকে এগোন, কাজ-কর্ম্ম আমার যা কিছু বাকী আছে সব চুকিয়ে আমিও এসে জুটছি। আজকেই আমরা ফিরে যেতে পারব আশা করি।

বাস্তবিকই সেদিনই তাঁরা কম্বৌলি ছেড়ে ফের কলকাতা ফিরে এলেন—অবশ্য রণজিতের বাড়ীতে নয়, হুকা-কাশির হোটেলে। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুক্‌তেই হোটেলের ম্যানেজার হুকা-কাশির কাছে ছুটে এলেন। "এইমাত্র আপনাকে টেলিফোন করছিল," তিনি বল্লেন।

"কোত্থেকে?"

"মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে তাঁরা হোটেলের আপিস কামরায় এসে ঢুকলেন। হুকা-কাশি তাড়াতাড়ি টেলিফোনের হাতলটা তুলে নিয়ে অটোমেটিক নম্বর ঘুরিয়ে বল্লেন, "হ্যালো, মেডিকেল কলেজ হস্‌পিটাল? আমি হুকা-কাশি। ওঃ, আপনি দারোগা বাবু! কি খবর? এক্স-রে হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, জানি এক ছড়া মালা তো? ওটা খাঁটি মুক্তোর, দাম কম্‌সে-কম্ পঞ্চাশ হাজার টাকা।" হুকা-কাশি হেসে রিসিভারটা রেখে দিলেন।

রণজিৎ স্তম্ভিত, বিহ্বলের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হুকা-কাশি আবার একটু হেসে বল্লেন, "আপনার প্রতিবেশী তের নম্বর বাড়ীর সেই নতুন ভাড়াটেটির রহস্য ভেদ হয়ে গেছে। ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার। অবশ্য আজকে আমরা কম্বৌলির মিউজিয়াম দেখতে না গেলে এত সহজে রহস্যটা ভেদ হ'ত কিনা সন্দেহ। আপনাকে বলেছি, পাঁচ-সাত দিন আগে ওই মিউজিয়ামে একটা স্পেশাল এক্‌জিবিসনের বন্দোবস্ত হয়েছিল, নানান্ জায়গা থেকে অনেক দামী দামী জিনিষ তাতে আসে। সে সমস্ত জিনিষের ভেতর ছিল এক ছড়া ষোড়শ শতাব্দীর মুক্তোর মালা, প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সেটা জড়িত। মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারী দেখ্‌ল, সেটাকে এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে তেমন হাত সাফাই-ওয়ালা লোকের পক্ষে ওটা সরিয়ে ফেলা আশ্চর্য্য নয়। সে তার পূর্ব্ব-পরিচিত এক ভদ্রবেশী জোচ্চোরের সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেল্‌ল—ভীড়ের সুযোগ নিয়ে জোচ্চোর সেই মালা ছড়াকে ট্যাকস্থ করবে। লোকটা বাস্তবিকই নিপুণ-হাতে মালা গাছা সরিয়ে ফেল্ল, কিন্তু ঠিক 'হজম' করা তার সাধ্যে কুলাল না, কেননা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিউজিয়মের রক্ষীরা টের পেয়ে গেল যে একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। ব্যস্, অমনি সে ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে কড়া পাহারায় প্রত্যেকের দেহ-তালাস সুরু হল। জোচ্চোর দেখ্‌লে আর উপায় নাই, এক্ষুণি নির্ঘাৎ মারা পড়বে—প্রাণের দায়ে তাই সে তখন কপ্ করে গোটা মালা ছড়াই গিলে ফেল্লে। ফলে কর্ত্তাদের শুধু দেহ-তালাসই সার হল, বামাল মিল্‌ল না।

সেদিনই স্পেশাল এক্‌জিবিসন্ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর নিয়ম করা হয়—বিনা পাশে মিউজিয়ামে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

"এদিকে মালা গেলবার পরই জোচ্চোরের অবস্থা কাহিল,—অসহ্য পেটের ব্যথা। বেচারা সইতেও পারে না, মুখও খুলতে পারে না, কেননা প্রকাশ্যে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাতে গেলেই ভেতরের কথা সব ফাঁস হয়ে পড়বে, আর তার ফল হবে শ্রীঘর। ব্যাপার দেখে মিউজিয়ামের সেই কর্ম্মচারী—তার নাম এখনও জানতে পারি নি, কাজেই মিউজিয়ামের কর্ম্মচারী বলেই তাঁকে উল্লেখ করব—এক রাত্রে ওকে এখানে নিয়ে এসে খুব নিরিবিলি পল্লীতে একটা বাড়ী ভাড়া নিলে। পেটে অস্ত্র করা ছাড়া এ ব্যামোর আর চিকিৎসা নেই; সে রকম ডাক্তার হয়তো মিলতে পারে, কিন্তু ও-চিকিৎসায় জোচ্চোর বেজায় গররাজি। বুঝলেন না, পাপ মন কিনা, ভাব্‌লে হয়তো পেট কাটার ছুতোয় পৃথিবী থেকেই তাকে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। তাই চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌ল নানান্ রকমের জোলাপ নিয়ে। দিনের বেলা বাড়ীর ভেতর চীৎকার হলে পাড়াপড়শীর সন্দেহ জাগতে পারে, তাই ও সময়টা বেশীর ভাগই মর্ফিয়া ইন্‌জেক্ট্ করে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হ'ত; জেগে থাকলেও প্রাণের দায়েই ও নিজেও দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকত। যত গোলমাল রাত্রিতে, জাগ্‌লে পরেই কাৎরানি আর গোঙানি। এই অবস্থা যখন চল্‌ছে, তখনই ব্যাপারটা প্রথম আপনার নজরে এল।

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপারটা আমি টের পেলাম কি করে। বল্‌ছি শুনুন···আপনার ধারণা হয়েছিল, হয়তো এমেরিকার অনুকরণে কোন লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তিপণ দিলে তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতে কিন্তু আপনার ও থিওরি টিক্‌ল না। প্রথমতঃ বন্দীই যদি কাউকে করা হয় তবে তো তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই, বন্দীর ওপর কেন ওরা মার ধ'র করতে যাবে? বরং তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখাই স্বাভাবিক, ভবিষ্যতে যাতে তার কোন আক্রোশ না থাকে। আর তার চাইতেও বড় যুক্তি এই যে, বাস্তবিকই অত্যাচার অথবা মারধ'র তারা যদি করেও থাকত তো আমরা—অর্থাৎ আমি আর আপনি—দু'বার ওবাড়ী যাবার পরই তা বন্ধ হয়ে যেত। ইচ্ছে ক'রে কে কবে পাড়াপড়শীর সন্দেহ জাগাতে চায় বলুন! না, অত বোকা ওরা নয়; সে রকম মৎলব থাকলে অন্যত্র কোথাও সরে পড়ত নিশ্চয়ই। গোলমাল যেটা হয়েছে সেটা ওদের ইচ্ছাকৃত নয়, চেষ্টা করেও সেটা বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। বোঝা গেল রহস্যটা অন্য ধরণের। কি ধরণের রহস্য তাও যে একটু একটু আঁচ্‌তে না পারলাম তা নয়। সেদিন বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা মনে আছে? লোকটা যে ক্রমাগতঃ গেঞ্জির ডান হাতাটা নীচের দিকে টেনে দিচ্ছিল, ওটা কোন মুদ্রাদোষ নয়—ইঞ্জেকসনের দরুণ হাতের খানিকটা জায়গা ফুলে ঢিবির মত হয়ে উঠেছিল,

TIGHT BINDING

সেইটেকেই ঢাকবার চেষ্টা। হাতের অবস্থা দেখে আর তুলের পুঁটুলিটা পেয়ে যাওয়ায় ওই লোকটাকে যে ইঞ্জেকসন দেওয়া হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। সমস্ত দিন দোতালা থেকে ওই বাড়ীটার চারদিকে আমরা নজর রেখেছি, কাউকে ঢুকতে দেখি নি, তবে ডাক্তার এল কখন? বুঝলাম গভীর রাত্রের ওই মোটরখানা আর কিছুই নয়, ডাক্তার আমদানীর ব্যবস্থা। ব্যাপারটা কেমন আগাগোড়া গোপন রাখবার চেষ্টা হচ্ছে দেখছেন তো! সমস্তটা মিলে তা হলে আগাগোড়া দাঁড়াল এই—একটা লোক অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছে; খুব গোপনে তার চিকিৎসা চল্‌ছে। কি অসুখ তা তারা কাউকে জানতে দিতে রাজী নয়, কেননা তাতে নাকি তাদের জেল পর্য্যন্ত হ'য়ে যেতে পারে।

"ডাক্তার যখন চিকিৎসা সুরু করেছে আর রোগীর অবস্থার যখন উন্নতি হয় নি—ব্যথা চাপবার চেষ্টা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল—তখন ডাক্তারকে যে ফের আস্‌তে হবে তা বুঝতে কষ্ট হল না। বাস্তবিকই গভীর রাত্রে আবার মোটর এল, সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে খুব ধীরে ধীরে। আমিও নীচে নেমে রাস্তার ধারে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম; তার পর খানিক বাদে মোটর ফিরে যেতেই পেছন থেকে টর্চ্চের আলো ফেলে গাড়ীর নম্বরটা দেখে নিলাম। ডাক্তারের পাশে গাড়ীতে আর একজন লোক বসে ছিল। গাড়ীর নম্বরটা যে আসল নম্বরই তাতে ভুল ছিল না, কেননা নকল নম্বর হলে পেছনের আলো নিভান থাকত না। পর দিন সকালে বেরিয়ে মোটর-রেজিষ্টার ঘাঁটতেই দেখা গেল ওখানা এই হোটেলের গাড়ী। সেদিনই সকালবেলা আমায় হোটেলে উঠে আসতে দেখে আপনি খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলেন না কি?

"হোটেলের যে রুমটা আপনার খুব পছন্দ-সই হয়েছিল, আমারও প্রথম নজর পড়েছিল সেইটারই ওপর, এবং যে জবাব আপনাকে আমি দিয়েছি সেটাও ম্যানেজারেরই দেওয়া জবাব। জবাবটা আমারও খুব আশ্চর্য্য বলে মনে হল—সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত বাইরে বাইরে লোকটা করে কি? অপিসে আর কিছু এতক্ষণ খাটায় না। কথা বল্‌তে বল্‌তে ম্যানেজারের সঙ্গে আমি নীচে নেমে এলাম। হঠাৎ ম্যানেজার বলে উঠ্‌লেন, 'এ কি ও-ঘরের ভদ্রলোক যে আজ এরই মধ্যে ফিরে আসছেন? এই তো সবে বেরিয়ে গেলেন!' তাকিয়ে দেখি একটি লোক ষ্টেশনের কুলীর হাতে সুটকেশ চাপিয়ে হোটেলের দিকে এগুচ্ছে, খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাব তার মুখে-চোখে। ম্যানেজারের সাম্‌নে এসেই সে বল্লে; 'মোটরখানা আর একবার চাই, ম্যানেজার বাবু, না হলেই নয়, বিশেষ দরকার।'

"ম্যানেজারের অবশ্য গাড়ী দিতে মোটেই আপত্তি ছিল না, বিল বেশী উঠলে তাঁর আর ক্ষতি কি? কিন্তু ড্রাইভারের আপত্তি দেখা গেল,—এই রাত্তিরে সে গাড়ী চালিয়ে এল,

আবার এক্ষুণি···। কিন্তু ম্যানেজার ধম্‌কে উঠ্‌লেন, 'তাতে কি হয়েছে, দরকার হলেই যেতে হবে!'

"দুটি জিনিষ তৎক্ষণাৎ আমার চোখে পরিষ্কার হয়ে গেল; প্রথমতঃ লোকটা রেলে কোথাও যাবে বলে রওনা হয়েছিল, গাড়ী ফেল্ করাতে ফিরে এসেছে। নইলে ষ্টেশনের কুলী পেল কোথা? দ্বিতীয়তঃ সে বলেছে 'মোটরখানা **আর একবারটি** চাই;' তার মানে, এর আগেই সে আরও একবার গাড়ী নিয়েছে। ড্রাইভার বল্‌ছে, এর আগেই তাকে বার হতে হয়েছিল রাত্তিরে। এ থেকে আন্দাজ করতে মোটেই কষ্ট হল না যে আগের দিনে ১৩ নম্বর বাড়ীতে মোটরে যে দু'টি লোক এসেছিল, এ লোকটি হচ্ছে তাদেরই একজন। কিন্তু কোন্ জন—ডাক্তার, না তার সহযাত্রীটি? যাই হোক, সম্প্রতি লোকটা কোথায় যাচ্ছে তা জানা এর পর কঠিন হবে না, কেননা ড্রাইভার এখন থেকেই যখন আপত্তি জানাচ্ছে তখন সে ফিরে এলেই ফের তাকে গাড়ী বার করতে বলা যাবে। নিশ্চয়ই সে তখন প্রবল আপত্তি জানিয়ে বল্‌বে যে এইমাত্র এতদূর থেকে সে ঘুরে এল, এখন আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তখন 'কোথায় গিয়েছিলে?' প্রশ্ন করলেই জায়গাটার নাম বেরিয়ে পড়বে।

"ঠিক সেই মৎলব অনুযায়ীই কাজ করা গেল; ড্রাইভার জানাল, বাবুটিকে সে নৈহাটীতে রেখে এসেছে। অনেক রাত্রে লোকটা আবার হোটেলে ফিরে এল। ভোরে সে যখন ফের বার হচ্ছে তখন আমি তার পেছু নিলাম। শিয়ালদয় এসে দেখি সে নৈহাটীরই টিকেট কাটছে। আমিও চল্লাম সেই সঙ্গে সঙ্গে নৈহাটী। নৈহাটী জংসনে নেমে সে ধরল কম্বৌলি-রোড্, আমিও কিছু দূরে সমানে তার পেছু পেছু। তার পর কম্বৌলিই যে তার দিনের লীলাভূমি এ তথ্যটি নিশ্চিত জেনে আমি ফিরে এলাম ফের কলকাতায়—বেলা প্রায় দশটার সময়।

"এর পর আপনি এলেন আমার হোটেলে আর আমরা দু'জনে রওনা হয়ে গেলাম কম্বৌলিতে। এখানে আপনাকে একটু ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, মিউজিয়াম দেখবার অতটা আগ্রহ যদি আপনি প্রকাশ না করতেন তবে হয়তো রহস্য ভেদ হতে আরো কিছু সময় লাগ্‌ত। কেননা আমার হোটেলের সেই রহস্যময় লোকটি যে কম্বৌলি মিউজিয়ামেরই একজন কর্ম্মচারী তা তখনও জানতে পারি নি। আমরা যখন ভেতরে যাই তখন ও একরাশ ফাইলের সামনে বসে খুব মন দিয়ে একখানা মোটা বই পড়ছিল। সাম্‌নে আরও কতগুলি বই। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তবু তার হুঁস্ই নাই। দেখ্‌লাম ওটা একটা ডাক্তারী বই, যে পরিচ্ছেদটা ও মন দিয়ে পড়ছে সেটা জোলাপ সম্বন্ধে। হঠাৎ আমার উপস্থিতি টের পেতেই ফট্ করে বইখানা বন্ধ করে ধরা-পড়া অপরাধীর মত আমার দিকে সে চাইলে। যেন কিছুই দেখি নি, এম্‌নি ভাবে মিউজিয়াম্ সম্বন্ধেই গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি সরে এলাম।

TIGHT BINDING

"আমার মনে তখন পর পর কয়েকটি প্রশ্ন জাগ্‌ল; এ মিউজিয়ামটি হওয়া অবধি এতকাল সর্ব্বসাধারণেরই এখানে ঢুকবার অধিকার ছিল, কোন পাশের দরকার হ'ত না। হঠাৎ পাঁচ-সাত দিন হ'ল সে নিয়ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ এখানে আর যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মিউজিয়ামে একটা স্পেশ্যল একজিবিশন চল্‌ছিল, বিজ্ঞাপন অনুযায়ী যত দিন সেটা চল্‌বার কথা তার আগেই কর্ত্তৃপক্ষ হঠাৎ সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সব কড়াকড়ির মানে কি? তবে কি কোন দামী জিনিষ হালে এখান থেকে চুরী গেছে? নিশ্চয়ই তাই, নইলে কর্ত্তৃপক্ষের এ রকম ব্যবহারের আর কোন দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এ রহস্যময় লোকটি দেখ্‌ছি এখানকারই কর্ম্মচারী! এ চুরীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই তো? নীচে নেমেই তাই আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি মিউজিয়ামের কর্ম্মকর্ত্তা—কিউরেটারের ঘরে ঢুক্‌লাম। অল্প একটু আলাপের পরই দেখা গেল আমার অনুমান মিথ্যা হয় নি, বাস্তবিকই একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মুক্তোর মালা চুরী গেছে। এবার পরের প্রশ্ন; কিউরেটারের কথাবার্ত্তায় বুঝতে পারলাম, তাঁর কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেউ ডেলি-প্যাসেঞ্জার নেই, সকলকেই কম্বৌলিতে থাকতে হয়, তাঁর বিনা অনুমতিতে কম্বৌলি ছেড়ে কোথাও কারও যাবার হুকুম পর্য্যন্ত নেই। অথচ এ লোকটি দেখ্‌ছি আজ পাঁচ-সাত দিন ধরে রোজই রাত্রের গাড়ীতে গোপনে কল্‌কাতা যাচ্ছে—নৈহাটীর মত অত বড় জংসন ষ্টেশনে কেই বা কাকে চেনে! কল্‌কাতা সে যাচ্ছে একটা লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তার সে রোগীটি অসহ্য ব্যথায় দিনরাত পড়ে কাৎরাচ্ছে, অথচ সে ব্যথার কারণ ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ করবার উপায় নেই, সাধারণ ডাক্তারের কাছেও না, কেননা তা হলে নাকি তাদের সবারই জেল হয়ে যাবে। এখানে হাজার কাজের মধ্যেও এ লোকটা ব'সে ব'সে চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই বই পড়ছে—নানা রকম জোলাপ সম্বন্ধে। ওষুধটা যখন জোলাপ, ব্যথাটা তখন নিশ্চয়ই পেটের। পেটের ব্যথার সঙ্গে কোন জিনিষ চুরীর একমাত্র সম্বন্ধ থাকতে পারে যদি চোরাই মালটা হয় খুব ছোট, আর চোর সেটাকে গিলে ফেলে থাকে। কি অবস্থায় মুক্তোর মালা চুরী হয়েছিল কিউরেটার তা বলেছিলেন, শুনে আর কোন সন্দেহই রইল না যে আপনার প্রতিবেশী ওই তের নম্বরের ভাড়াটেই মালা-চোর—চুরীর পরেই বেগতিক দেখে সে সেটা গিলে ফেলেছে। কিউরেটারকে তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলে বিদায় নিলাম। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত তা তো দেখতেই পাচ্ছেন—আমি চলে আসতেই কিউরেটার কলকাতায় পুলিশের কাছে ফোন করেছিলেন, তারা লোকটাকে মেডিকেল কলেজে ধরে নিয়ে গেছে, আর সেখানে এক্স্‌-রে করতেই ওর পেটের ভেতর মুক্তোর মালাটির সন্ধান মিলে গেছে।"

কলিকাতার ফুট্‌বল্ লীগ্ শেষ হইয়াছে। এবারেও দুর্দ্ধর্ষ ভারতীয় দল মহামেডান্ স্পোর্টিং লীগ্ বিজয়ী হইয়াছে। এবার লইয়া এই দল উপর্য্যুপরি চারবার লীগ্ বিজয়ী হইল, লীগের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত আর কোনও দলই পর পর চারবার এই সম্মান লাভ করিতে পারে নাই। মহামেডান্ স্পোর্টিংএর পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। তারা সব শুদ্ধ ৩৪ পয়েণ্ট পাইয়াছে।

২২টি খেলার মধ্যে মহামেডান্ স্পোর্টিং ১৪টি খেলায় বিজয়ী হইয়াছে, ৬টি খেলায় ড্র হইয়াছে এবং ২টিতে তাদের পরাজয় হইয়াছে। প্রথম পরাজয় ইষ্টবেঙ্গলের কাছে, ৪—২ গোলে, আর শেষ পরাজয় মোহনবাগানের কাছে, ৩—২ গোলে।

লীগে রানার্স্ আপ্ হইয়াছে ইষ্টবেঙ্গল এবং ভবানীপুর একত্রে। এই দুই দলই ২৮ পয়েণ্ট্ করিয়া পাইয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল গোড়ার দিকে খুব খারাপ খেলিলেও শেষের দিকে অতি সুন্দর খেলিয়াছে, তার ফলেই এই সাফল্য। শেষ দিক্‌কার মত যদি গোড়ার দিকেও তারা ভাল খেলিতে পারিত তবে খুব সম্ভবতঃ তারাই এবার লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হইতে পারিত। সমস্ত দলের মধ্যে ইষ্টবেঙ্গলই সব চেয়ে বেশী গোল দিয়াছে—মোট ২৯ খানা। ভবানীপুর দল প্রথম বিভাগে এবারই প্রথম খেলিল, সেই হিসাবে তাদের কৃতিত্ব প্রশংসা করিবার মত। তারা বরাবরই লীগের ২য়।৩য় স্থান দখল করিয়া ছিল। শেষ দিকে কয়েকটা খেলায় খারাপ না করিলে তাদেরও চ্যাম্পিয়ন্ হইবার আশা ছিল। ক্যামেরোনিয়ান্স দলের চ্যাম্পিয়ন্ হইবার আশাও কেউ কেউ পোষণ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা চতুর্থ হইয়াছে—২৭ পয়েণ্ট পাইয়া। মোহনবাগান শেষের

দিকে ভাল খেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৫ম স্থান পাইয়াছে। শেষ খেলায় এরা মহামেডান্ স্পোর্টিংকে হারাইয়াছে ;—পয়েন্ট পাইয়াছে ২৫। তার পর কাষ্টম্‌স্ ২৪, কালীঘাট ২৩, ই, বি, আর ২০, ক্যালকাটা ১৮, কে, ও, এস্, বি ১৮, এরিয়ান্স ১৩ এবং সকলের নীচে ডালহৌসী—৫। যে ডালহৌসী দল এক সময়ে ফুটবল-মাঠে অন্যান্য দলের রীতিমত ভয়ের কারণ ছিল, লীগ্ এবং শীল্ড জয়ের ভাগ্য যাদের বহু বার হইয়াছে, তাদের এ দুরবস্থা দেখিলে সকলেরই দুঃখ হয়। ডালহৌসী এবার একটি ম্যাচেও জিতিতে পারে নাই—৫টি ড্র করিয়া ৫ পয়েন্ট পাইয়াছে। বলা বাহুল্য আগামী বারে এদের ২য় বিভাগে খেলিতে হইবে। শোনা যাইতেছে এ দলটি উঠিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় বিভাগ হইতে এবার পুলিশ দল আবার প্রথম বিভাগে উঠিল। এরা মোট ২০টি খেলিয়া ৩০ পয়েন্ট পাইয়াছে। ২য় বিভাগে রানার্স আপ্ হইয়াছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন্ (২৫ পয়েন্ট)। বৌবাজারকে এবার ২য় বিভাগ হইতে ৩য় বিভাগে নামিতে হইল।

প্রথম বিভাগে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় বেশী গোল দিয়াছেন তার একটা তালিকা দেওয়া গেল : মাসুদ (ভবানীপুর)—১৭ গোল, মুর্গেশ (ইষ্টবেঙ্গল)—১৬ গোল, রহিম (মহামেডান স্পোর্টিং)—১৬ গোল, এস্, দে (এরিয়ান্স)—১৫ গোল, ব্লাওয়ার (ক্যামেরোনিয়ান্স)—১২ গোল, সিম্যান্ (কাষ্টম্‌স্)—১১ গোল, লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল), ডি' লাটেষ্ট (কালীঘাট) ও বি, সেন (ইষ্টবেঙ্গল) —প্রত্যেকে ৮ গোল করিয়া।

আই-এফ্-এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। তার বিবরণ আগামীবারে দেওয়া যাইবে।

ভ্রম-সংশোধন :—৩৫৩ পৃষ্ঠায় য়্যালারিক্‌কে 'হুণ' বলা হয়েছে, আসলে তিনি 'গথ্'।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বাদশাহ্ ও বিদূষক

[বিদেশী গল্প হইতে]

(শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত)

বাদশাহ্ ও তাঁহার বিদূষক খেজুর খাইতেছিলেন। বিদূষক তাঁহার পাশে যেখানে বীচিগুলি ফেলিতেছিলেন বাদশাহ্ নিজের খেজুরের বীচিগুলিও সেইখানেই ফেলিতেছিলেন। খাওয়া শেষ হইলে বাদশাহ্ বিদূষককে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "তুমি তো ভয়ানক পেটুক হে! (বীচিগুলি দেখাইয়া) এতগুলি খেজুর খেয়ে ফেললে!" বিদূষকও ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "জাঁহাপনা, অপরাধ মাপ করবেন। কিন্তু আপনি তো দেখছি আমার চেয়েও পেটুক! আপনি শুধু খেজুর নিয়েই সন্তুষ্ট ন'ন্—আপনার নিজের খেজুরের বীচিগুলি পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলেছেন! চেয়ে দেখুন, আপনার পাশে একটিও খেজুরের বীচি নেই।"

ছিঁটে-ফোঁটা

(শ্রীদেবব্রত সেন)

বিখ্যাত ভূ-পর্য্যটক প্রফেসর ফ্রীম্যান্ ৬০ বৎসর যাবৎ পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার বয়স আশীর কোঠায়। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় ঘটনা এই যে তিনি রোমের পোপকে হাসাইয়াছিলেন। পোপের গম্ভীর মুখে নাকি হাসি খুব কম লোকেই দেখিয়াছে।

* * *

ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লসের মন কারণে-অকারণে সর্ব্বদা চিন্তাভারাক্রান্ত থাকিত। তাঁহার মেজাজ খুসী করিবার জন্য তাঁহার এক পার্শ্বচর তাসের সৃষ্টি করেন। সেই সময় হইতেই নাকি তাস খেলার চলন হইয়াছে।

চিঠিপত্র

মণিমঞ্জুষা বিভাগটা প্রত্যেক বারই দিতে অনেক গ্রাহকই অনুরোধ করেছেন, আমাদের ইচ্ছা সত্বেও এবারে সেটার স্থান সংকুলান হল না, আসছে বারে আবার দেওয়া হবে।

শ্রীঅশোক গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দনা রায়, শান্তি মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন গ্রাহক জানিয়েছেন গত মাসের রামধনুতে প্রকাশিত "নাদুরাম বাবুর মহানুভবতা" ও ঠিক ঐ মাসের রংমশালে প্রকাশিত শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর একটি গল্প ঠিক এক প্লট্ নিয়ে লেখা। এ সম্বন্ধে গৌরাঙ্গ বাবু এবং শিবরাম বাবুর মিলিত কৈফিয়ৎ আমরা নীচে দিলাম—

রামধনু সম্পাদক মহাশয় সমীপে,

পেতল-ঘটিত সোনার গয়না চুরির আইডিয়া নিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে একদিন আলোচনা হয়েছিল। এবং আমাদের দু'জনেরই মনে হয়েছিল এই নিয়ে একটা গল্প লিখ্‌লে তো হয়! এক জনের লেখা আগে আর এক জনের পরে বেরুলে পরবর্ত্তী লেখাটা প্রত্যাহার করার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু একই মাসের দুই বিভিন্ন কাগজে বেরুবার জন্য তা' সম্ভব হয় নি। যাই হোক্, দুটো লেখাই আমরা দুজনে পড়ে দেখ্‌লাম, কষ্ট করেই পড়্‌তে হ'ল আবার। প্লট্ প্রায় এক হলেও দুটো একেবারে এক গল্প বলে আমাদের মনে হয় না; ট্রিট্‌মেন্ট্ একেবারেই আলাদা—এবং আমাদের মতে গল্পের কাঠামো এবং গল্পত্ব সেইখানেই। একই রোগীকে যদি একজন হোমিওপ্যাথ্ও দেখেন এবং একজন য়্যালোপ্যাথ্ও দেখেন—দুজনের চিকিৎসা কি এক বল্‌তে হবে?

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
শিবরাম চক্রবর্ত্তী

সন্দেশ

একদল দুঃসাহসী জার্ম্মান্ অভিযানকারী সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় কুলি লইয়া নাঙ্গা পর্ব্বতে উঠিবার জন্য রওনা হইয়াছিলেন সে খবর তোমরা অনেকেই হয়তো জান। হিমালয়ের বুকে এই নাঙ্গা পর্ব্বত শিখর—অত্যন্ত দুরারোহ জায়গা—উচ্চতায় ২৬৬২৯ ফুট। নানা বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু গত ২০শে জুন এক নিদারুণ দুর্ঘটনার খবর আসিয়াছে। হঠাৎ একটা বিরাট্ বরফের চাঁই ধ্বসিয়া পড়িয়া সাত জন অভিযানকারী নয় জন গুর্খা কুলিসহ শোচনীয় ভাবে প্রাণ হারাইয়াছেন। দলের নেতা ডাঃ কার্ল ভিয়েন ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আরও দু'বার—১৮৯৫ সনে ও ১৯৩৪ সনে নাঙ্গা পর্ব্বতে উঠিতে গিয়া অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

* * *

রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের আজ আরও একটি দুঃখের সংবাদ দিতে হইতেছে। শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় আর ইহলোকে নাই। যোগীন্দ্রনাথের পরিচয় আমাদের চেয়ে তোমরাই ভাল জান। তাঁর লেখা 'হাসিখুসীর' "অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে" প্রভৃতি লাইন্ মুখস্থ করে নাই এমন ছেলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে

আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তা' ছাড়া হাসি ও খেলা, রাঙ্গাছবি, ছবি ও গল্প, খুকুমণির ছড়া, হিজিবিজি, বনে-জঙ্গলে, পশুপক্ষী প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের উপযোগী অসংখ্য বই লিখিয়া যোগীন বাবু বাংলা শিশুসাম্রাজ্যে তাঁর অক্ষয় আসন রাখিয়া গিয়াছেন—কারও সাধ্য নাই তাঁকে সেখান হইতে সরায়। যোগীন বাবুর অনুকরণে এই ধরণের বই পরে আরও কিছু কিছু বাহির হইয়াছে কিন্তু তাঁর আগে বোধ হয় বাংলা ভাষায় এ ধরণের একখানি বইও ছিল না—তিনিই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। ইহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ

* * *

আমেরিকার বীর মহিলা বৈমানিক মিস্ এমিলিয়া ইয়ারহার্টের (মিসেস্ পাটনাম্) নাম হয়তো তোমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত নয়। মিস্ ইয়ারহার্ট্ তাঁর এরোপ্লেনে চড়িয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন—এই সেদিন তিনি দম্‌দমেও নামিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে হাওয়াই দ্বীপের কাছে তাঁর এরোপ্লেনের পেট্রোল হঠাৎ ফুরাইয়া যায় (বাতাস জোর হওয়ায় হিসাব মত যেটুকু পেট্রোল তাঁর দরকার ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পেট্রোল খরচ হওয়ায়ই এই কাণ্ড)। তাঁর নিকট হইতে বেতারে অস্পষ্ট ভাবে খবরটা আসে। তার পর আর তাঁর কোনও খবর পাওয়া যাইতেছে না। আমেরিকার লোকেরা

মিস্ এমিলিয়া ইয়ারহার্ট্

নাতি-নাতনী সহ রকৃফেলার

দিকে দিকে তাঁর অনুসন্ধান করিতেছে—কিন্তু খোঁজ এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই। অনেকেই মনে করিতেছেন মিস্ ইয়ারহার্ট ও তাঁর সঙ্গী সমুদ্রগর্ভে চিরকালের জন্য বিশ্রাম লইয়াছেন। ব্যাপারটা যদি সত্যিই তাই হয় তবে তার চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে?

* * *

গত মাসের রামধনুতে আমেরিকার ধনকুবের দানবীর জন্, ডি, রকৃফেলারের মৃত্যুসংবাদ বাহির হইয়াছিল। এখানে তাঁর একটি ছবি দিলাম। ছবিটি তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তোলা—বৃদ্ধ রকৃফেলার তাঁর জন্মদিনে নাতি-নাতনীদের আদর করিতেছেন, তারই ছবি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)	(২)	(৩)
দ্বি ত ল	**চি** কু র	**স্বা** ধী ন
বি **জে** তা	পি **ত্ত** ল	স **মী** র
দে বে **ন্দ্র**	সা গ **র**	লি চ্ছ **বি**
চা **লা** ক	অ **ঞ্জ** ন	দে **বে** শ
ল ল না	**ন** য় ন	**কা** ন ন
বি **রা** ট্	প্র **দা** ন	আ **ন** ন
আ ল **য়**	প্র কা **শ**	আ ন **ন্দ**

উত্তরদাতাদের নাম

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল, নির্ম্মল (বালীগঞ্জ); মায়ারাণী মিত্র (ভবানীপুর); বীণাপাণি মজুমদার (ভবানীপুর); মাধুরী ঘোষ (কলিকাতা); মায়া দেব (কলিকাতা); খোকা, বুবুল, ম্যারিকা (বারুইপুর); শান্তি ও ফুল (বারুইপুর); সুপ্রভা, সাবিত্রী, অমল সেনগুপ্ত (কানপুর); বিনয়গোপাল নন্দী (নওগাঁ); উমা বিশ্বাস, গোরা, তোতা (রবার্টসন্‌গঞ্জ); অজয় মিত্র (রাঁচি); সুললিত, প্রফুল্ল, কৃষ্ণবরণ (বাণী-মন্দির, মুড়াগাছা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); জগদীশচরণ বক্সী (করকেন্দ কলিয়ারি); স্থাণুবালা কর (কলিকাতা); প্রসূন রায় (নালন্দা); বীণা গুপ্তা (ভানু); জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, শৈলেন্দুনারায়ণ রায় (জেমো রাজবাটী); অরুণকুমার সেন (চট্টগ্রাম); অমলবরণ রায় (সাটীরপাড়া); রমাপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা); সিতেন্দু, অলকা, নীলিমা গুপ্তা (স্বর্ণাসন—পাটনা); উমা, গৌরী, প্রভাত (মোকামা ঘাট); বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা); সন্তু, খুসী, মনুমোহন (মাণিকতলা); নমিতা গাঙ্গুলী (কলিকাতা); সুলতিকা পাল, সুজাতা পাল (করিমগঞ্জ); অনিমা দেবী (তেলিনীপাড়া); কল্যাণী, ভবানী, বিজুবাণী (ধুবড়ী); খুকুদি, শঙ্করদা, সুনীল সেন (দিনাজপুর); শক্তি প্রসাদ গর্গ (কলিকাতা); বিশ্বজিৎ রায় (কালীঘাট); পাঁচুগোপাল ঘোষ, যামিনীকান্ত মণ্ডল (শ্যামনগর); অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রঙ্গপুর); মনোরমা দেবী ও গৌরী দেবী (ভবানীপুর); করুণা, মহাদেব, জলু (ইকড়া); মালতী ও কল্যাণী সেন (আনিসাবাদ); দি ভৌমিকস্ (কলিকাতা); শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা); অরুণা সেন (কলিকাতা); বিশ্বনারায়ণ, প্রফুল্ল, শঙ্কর (যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়—রাঁচি); মণিমালা, গৌরী, অনিল (শিবপুর); আশালতা নন্দী (তিনসুকিয়া); শৈলেশ, অনিল, নিরু (জলপাইগুড়ি); প্রভা, বিভা (জলপাইগুড়ী); অধর চন্দ্র হাইস্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (সাভার); ঘুটু, উষা, দীপু (সিম্‌ডেগা); পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া); প্রমোদ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (শাণ্ডিল্যপাড়া—কালীকচ্ছ); কনকলাল, ফালাইন্না ও সুশীল (কুমিল্লা); সুনীলচন্দ্র, সবিতারাণী ও শোভা মজুমদার (চট্টগ্রাম); অরুণিমা রায় (ঢাকা); মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া); সুনীল কুমার ব্যানার্জ্জি, ছোটমামা, নারু, (দিনাজপুর); ছায়া দেবী (রতনপুর); রেণু চৌধুরী (ঘোড়ামারা); অঞ্জলি চৌধুরী (কলিকাতা); শক্তি মৈত্র, মালিকা মৈত্র, সুধীরা মৈত্র (পূর্ণিয়া); চুণী, খুকী, লক্ষ্মী (তেজপুর); মহম্মদ এ, করিম (আলিপুর দুয়ার); রামপ্রসাদ সিং ও বন্ধুগণ (বেহালা); যুথিকা, লতিকা, সুধা চন্দ্র (পাটনা);

নিখিল চৌধুরী (কুমিল্লা) ; সন্ধি, মালবিকা ও মন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা) ; রমা নিয়োগী (কলিকাতা) ; অরুণ, প্রতিমা বসু (জলপাইগুড়ী) ; বাণী বিশ্বাস, সতী, মা-বাবা (ভবানীপুর) ; মনোতোষ রায়, বিমল, অমল (ভবানীপুর) ; অচল কুমার দত্ত (ভবানীপুর) ; প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (শ্যামনগর) ; এ, কে বাইন (চণ্ডীপুর) ; বাণী, শেফালি, কেবু (চট্টগ্রাম) ; বিজনকুমার শেঠ (কলিকাতা) ; রত্না দেবী (পাটনা) ; অরুণেন্দ্র নিয়োগী (কালীঘাট) ; শশঙ্ক, ও ফণীন্দ্র দত্ত, প্রীতিরঞ্জন (ধলা) ; দেবব্রত, সুব্রত, ও সত্যব্রত সেন (গোয়ালপাড়া) ; সুভাষ রায় (বহরমপুর) ; দীনেশ, সুবোধ, লাবণ্য (সৈদপুর) ; প্রমথ, হরি, কিরণ (ধেমোসেন কলিয়ারী) ; রমেন্দ্রনাথ রক্ষিত (রাজসাহী) ; সমরেন্দ্র, যতীন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ নাথ (কলিকাতা) ; দুর্গাপ্রসাদ সেন, রুচি, শীলা (কলিকাতা) ; মিনু, শঙ্কু, রাণু (ভবানীপুর) ; নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (খুলনা) ; সত্যানন্দ প্রামাণিক, মা ও দাদা (খুরদা রোড) ; প্রদ্যোতকুমার বাগচী (বলুভরা) ; প্রশান্ত, প্রতাপ, প্রতীত বসু (সীতারামপুর) ; হিমাংশুকুমার মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা) ; সমীর চৌধুরী (আঙ্গুল) ; হরিগোপাল মজুমদার (তুণ্ডি) ; লেখা সেন (কলিকাতা) ; সবিতা ও তপন সেন (রেঙ্গুন) ; রমা চৌধুরী (ময়মনসিংহ), ব্রজগোপাল গোস্বামী (বাণীগ্রাম) ; মঞ্জুভূষণ দত্ত (ঢাকা)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র)

কাকাবাবুকে তাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, "জান ত বাপু, আমার তিন ছেলে—দাসু, ছোট্টু ও খোকন। খোকনের বয়স এখন হচ্ছে দাসু ও ছোট্টুর বয়স একত্র করলে যা' হয় তা'র $\frac{১}{৪}$ ভাগ ; কিন্তু আস্‌ছে বছর দাসুর বয়স খোকনের বয়সের দ্বিগুণ হ'বে—আর আমার বয়স হ'বে তা'দের তিন জনের তখনকার বয়স একত্র করলে যত হ'বে তা'র দ্বিগুণ। আর একটা কথা, পাঁচ বছর আগে দাসুর বয়স ছোট্টুর বয়সের দ্বিগুণ ছিল। বল ত বাপু, আমার বয়স এখন কত ?"

আমি অঙ্কে বড় কাঁচা। তোমরা কেউ কাকাবাবুর বয়স বা'র করে দিয়ে উপকার করবে কি ?

দিনের শেষে

আলোকচিত্র-শিল্পী : শ্রীকালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

১০ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৪ | ৮ম সংখ্যা

বর্ষায়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝরিছে বারি,
উড়ে যায় মালা গেঁথে বলাকা-সারি।
কুয়াসার আঁবছায়
গ্রামগুলি ঢেকে যায়,
তরী ঘুরে ফিরে আসে, জমে না পাড়ি।

দিনের শেষে

১০ম বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৪ { ৮ম সংখ্যা

বর্ষায়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝরিছে বারি,
উড়ে যায় মালা গেঁথে বলাকা-সারি।
কুয়াসার আঁবছায়
গ্রামগুলি ঢেকে যায়,
তরী ঘুরে ফিরে আসে, জমে না পাড়ি।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

২

ভিজে কাঠ, নিভে যায়, ধরে না উনান
ঘর ভরা লোকজন, নদী ভরা বান।
খোটেল ছেলের দল
কেঁদে করে চঞ্চল,
কৃষক-বধূর আজ বিপদ্ ভারী।

৩

চারিদিকে মাছরাঙ্গা টিটিভ ডাকে,
ফুলে ভরা, ঠাঁই নাই মালতী-শাখে।
আসে বৃষ্টির ছাট্
একাকার মাঠঘাট,
রৌদ্র মেঘের যেন চলেছে আড়ি।

৪

ওই উঠে রামধনু নীল নভ-গায়
স্নিগ্ধ ধরণী ভরা শ্যাম মমতায়।
কেটে গেছে দুর্য্যোগ,
আবার চলেছে লোক,
বরষার অপরূপ রূপ নেহারি।

৫

শান্তি ও সংগ্রাম চলেছে সদাই
স্নান-যাত্রার যেন বিশ্রাম নাই।
লাগে ঝুলনের দোল
সারা ধরা সোরগোল,
কে দোলায় ভাবি ব'সে বুঝিতে নারি!

টুনুর স্বর্গ থেকে পতন!

[কিংবা উপসর্গ থেকেই ?]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

প্রথম দেখাতেই ভদ্রলোককে ভালো লেগে গেল টুনুর। ইস্কুলের ছুটির পর বই-বগলে চীনে-বাদাম চিবুতে চিবুতে বাড়ী ফিরছে, পাড়ার ছেলেদের জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। সাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে—ওঁর নিজেরই সাইকেল, সৌভাগ্যবান্ ভদ্রলোক, সন্দেহ কি! সাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে ভদ্রলোক হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিয়ে ছেলেদের বোঝাচ্ছিলেন। বোঝাবার কোনও দরকারই ছিল না কিন্তু, স্পোর্ট্‌সের প্রয়োজনীয়তা জানে প্রত্যেক ছেলেই। ফুটবল্ খেলা যে জীবনধারণের পক্ষে জলবায়ুর মতই অত্যাবশ্যক ছেলেদের তা বোঝাতে যাওয়াই বেশী। কেননা কোনও বালকেরই তা অজানা নেই।

টুনুও জানে এ কথা। এবং টুনু এও জানে, জীবন থেকে ফুটবল্ বিয়োগ করলে ফল দাঁড়ায় শূন্য! সে জীবনের কোনও মানেই হয় না! প্রাণবিয়োগের মতই আর কি! এবং যদি তাকে সুযোগ দেওয়া হয় তা হ'লে বক্তৃতা করে হাত-পা নেড়েও এ কথা সে বল্‌তে পারে। ঐ ভদ্রলোকের চেয়েও ভালোই পারবে সে।

কিন্তু মাইকেল ছেলেদের কাছে যেমন ভীতিকর, সাইকেল তেমনি প্রীতিজনক (সাইকেল-ওয়ালা যদি ভদ্রলোক নাও হয় তবুও আকর্ষণের বস্তু,—ভদ্রলোক হ'লে তো বলাই বাহুল্য!) তাই ছেলেরা সবাই একযোগে হাঁ করে জানা কথাই আবার নতুন করে জান্‌ছিল।

অবশেষে সমস্ত কথার সারমর্ম্মে এসে পৌঁছান্ ভদ্রলোক! ওঁদের বয়েজ স্পোর্টিং ব'লে কি একটা ক্লাব আছে লেক-এরিয়ার কাছাকাছি, ওদের সব হ'তে হবে সেই ক্লাবের সদস্য, আর দিতে হবে চাঁদা, নিয়মিত বা অনিয়মিত যে রকম ভাবে ওদের সুবিধা। চাঁদার পরিমাণ অবশ্য এখন জানা গেল না,—সদস্যদের আনন্দের পরিমাণ ও পকেটের পরিণাম থেকে সেটা ঠিক হবে পরে।

বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে টুনুকে লক্ষ্য করছিলেন ভদ্রলোক। টুনুও বেশ গর্ব্ব বোধ কর্‌ছিল মনে মনে। এমন একটা চমৎকার লোকের বারংবার চক্ষুগোচর হচ্ছে ও! আর না হবেই বা কেন? ক্লাসের মধ্যে,—কেবল ক্লাসই বা কি—সারা ইস্কুলের মধ্যে, টুনুর মত 'স্মার্ট' ছেলে আর কে আছে শুনি?

"তোমাকে কোথায় দেখেছি যেন খোকা! নাম কি তোমার?" তাকে লক্ষ্য করেই ভদ্রলোকের প্রশ্নভ্রষ্ট হয়।

কোথায় যে সাক্ষাৎ হয়েছে টুনুর স্মরণ হয় না। নামটা বলবে কি বলবে না, ইতস্ততঃ করছে, পাড়ার একটা ছেলে অযাচিতই বলে দেয়—"ওর নাম টুনু!"

টুনু! ভারী রাগ হয় ওর। নাম বল্‌তে হয়, ও নিজে বলবে। ওর নিজেরই নাম তো! কেন, ভালো নাম কি ছিল না তার? টুনু! ঐ ছোট্ট এক টুক্‌রো ওর নেহাৎ অপছন্দ-নামটা এই উল্লেখযোগ্য মানুষটির কাছে ফাঁস না কর্‌লেই কি চল্‌ত না?

টুনুর মুখ লাল হয়ে ওঠে। লজ্জায় আর রাগে।

"টুনু! বাঃ, বেশ নাম তো! কোন্ ইস্কুলে পড় তুমি?"

ওর মনে হলো অন্য একটা ইস্কুলের নাম করে দেয় এবং ক্লাসের প্রসঙ্গ উঠ্‌লে দু' ক্লাস্, নিদেন্ পক্ষে এক ক্লাস্ অন্ততঃ বাড়িয়ে বলে। কিন্তু মনের কথা মুখ অবধি পৌঁছতে না পৌঁছতে সেই উন্মুখ ছেলেটা আবার মুখর হয়ে ওঠে—"সাউথ্ সুবর্ব্বন্, স্যার্!"

"কি বল্লে, সাউথ্ সুন্দর বন? সুন্দর বনে আবার ইস্কুল আছে নাকি? জান্‌তাম না তো!"

ভদ্রলোকের রসিকতার চেষ্টায় সব ছেলেই হো-হো করে' ওঠে। কেবল টুনুই হাস্‌তে পারে না। মনে মনে গোঁ গোঁ করে সে।

আর এক মিনিট্‌ও দাঁড়ায় না টুনু। গম্ভীর চালে চলে যায় সেখান থেকে।

কয়েক দিন পরে এক বিকেলে, ইস্কুল থেকে বেরুবার মুখেই আবার দেখা। তাকে দেখতে পেয়েই সাইকেল থামান ভদ্রলোক!

—"এই যে টুনু! ছুটি হয়ে গেল বুঝি?"

টুনু ঘাড় নাড়ে। কি আর বল্‌বে? ছুটি যে হয়েছে এবং সোরগোল করেই হয়েছে সে তো একেবারেই প্রত্যক্ষ ব্যাপার! এমন গায়ে-পড়া প্রশ্নের জবাব দিতে দায় পড়েছে তার।

—"আমার সাইকেলের ব্যাকে ব'স। চল, তোমার বাড়ীর রাস্তা অবধি পৌঁছে দেব তোমায়।"

সাইকেলের কথায় টুনুর লোভ হয়। সেদিনকার সুন্দর বনের ইঙ্গিতের রাগ তার জল হয়ে যায় এক মুহূর্ত্তে। টুনু ওকে মার্জ্জনা করে দেয় মনে মনে।

সাইকেল্ হ'ল ছেলেদের কাছে স্বর্গ। ব্যাক্-সীট্ থেকেই ক্রমশঃ স্বর্গারোহণ, —পা-দানী থেকেই পালা সুরু বলতে গেলে! ব্যাকে চেপেই সাইকেলে আসল-চাপার পথ পরিষ্কার কর্‌তে হয়। সাইকেলের ব্যাক্-সীট্‌কে উপসর্গ বলা যেতে পারে, সুতরাং।

প্রথমে ঈষৎ ভদ্রয়ানার ভান, পরে অর্দ্ধ-অনিচ্ছা, তার পরে একটু দো-মনা দেখিয়ে টুনু রাজী হয় অবশেষে।

টুনুর বাড়ী কোন্ রাস্তায় এবং কত নম্বরে জেনে নেন্ ভদ্রলোক। তারপর বলেন—"যদি একটু এধার দিয়ে ঘুরে যাই তোমার খুব অসুবিধা হবে কি? একটু কিন্তু ঘুর হবে তা'তে। কিছু দেরীও হয়ে যেতে পারে তোমার?"

হোক্ গে, টুনুর কোনই আপত্তি নেই। আরও তো ভালো তার বরং, আরো বেশীক্ষণ সাইকেলের স্বর্গ সে উপভোগ কর্‌বে।

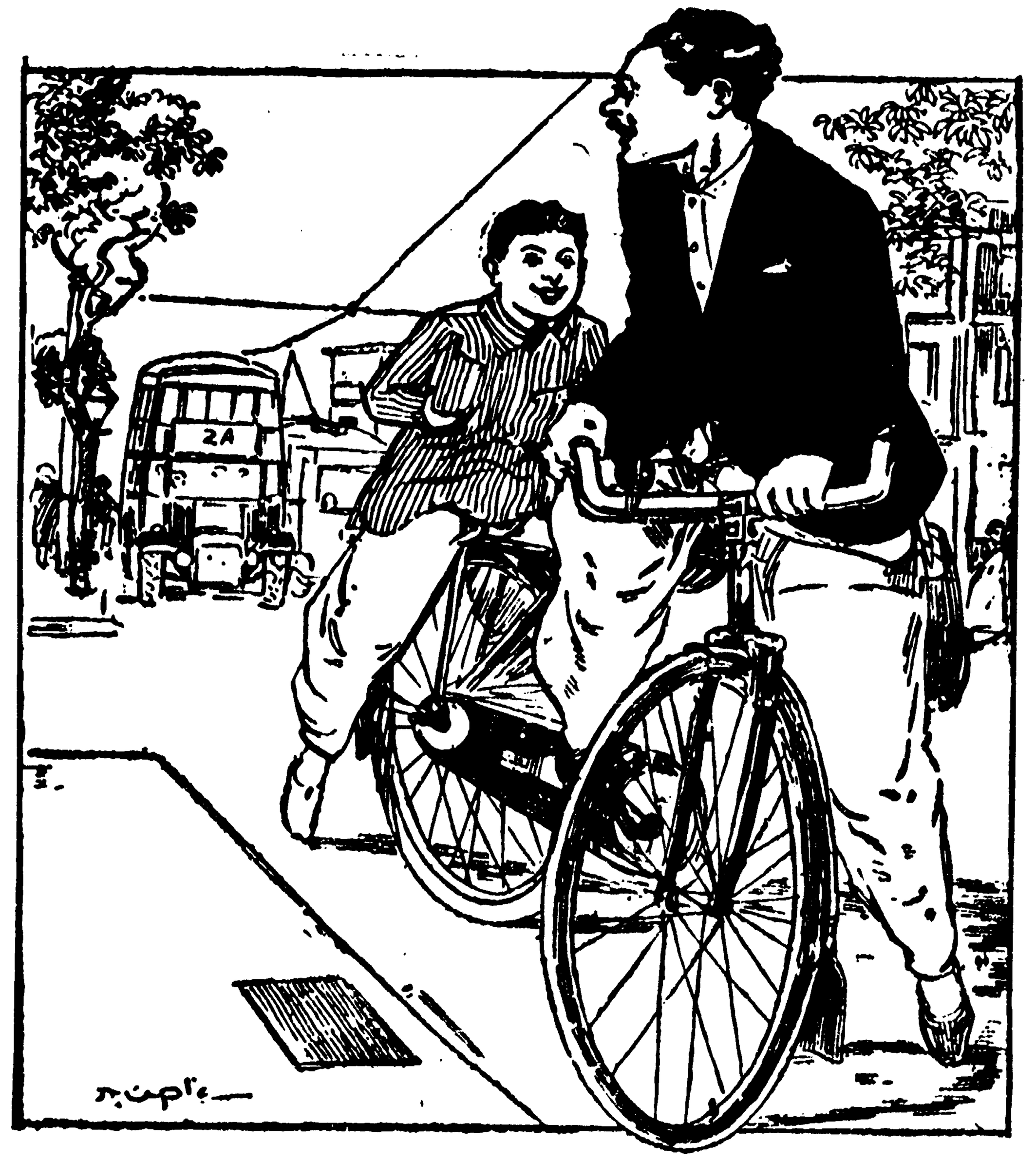
সাইকেল্………ছেলেদের কাছে স্বর্গ

নিজে থেকেই বলতে থাকেন ভদ্রলোক:

—"আ মা র নাম? বোগেশ দা'। বো গে শ দা' বলেই ডেকো আমায় তুমি!"

একটু থেমেই যোগ করেন আবার: "বোগেশ, মনে থাকে যেন। বোগাস্ নয় কিন্তু!"

দুটো শব্দের সাদৃশ্যে মনে মনে হাসে টুনু। বোগাস্ দা'! খাসা নাম! মনে মনেই বলে সে।

"বাপ মা নাম রেখে-ছিল বোগেশ! কিন্তু কি কর্‌ব বল? মানে হয় না। কিন্তু ফেল্‌তেও পারা যায় না। আবার এমন গোলমাল হয় এক-এক সময়ে!—বোগাস্ আর বোগেশে!"

টুনু এবার হেসেই ফেলে। সশব্দেই। ভদ্রলোক একটু মুষ্‌ড়ে পড়েন যেন। টুনু লজ্জিত হয়ে যায়।

সাইকেল চলতে থাকে, তাদের বাড়ীর রাস্তা বাঁ-হাতি রেখে, তে-মাথার সিনেমাকে ডান ধারে ফেলে, তাদের পাড়া ছাড়িয়ে, অনেক দূর ঘুরে তার অজানা অচেনা সব গলিঘুঁজি দিয়ে তারা চলতে থাকে। টুনু ক্রমশঃ অসুবিধা বোধ করে যেন। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফির্‌তে দেরী হ'লে আবার বকুনি আছে ঠাকু'মার! অথচ ভদ্রলোক নিজের থেকে নিয়ে চলেছেন, কিছু বলাও যায় না।

কিন্তু সাইকেলের ব্যাকে বসে টুনু নিতান্তই অসহায়! সাইকেলের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আছাড় খেতে অনেক লোককে সে দেখেছে অনেকবার,—কিন্তু স্বর্গ থেকে পতন সম্ভব হ'লেও, সে ভেবে এবং আলোচনা করে দেখে উপসর্গ থেকে পতন অত সহজ নয়। পর-চালিত সাইকেলে বসে কি করে ও আছাড় খাবে বল?

তাকে যেতেই হবে, নিরীহের মতই বসে-বসে যেতে হবে, সাইকেল-চালকের যদৃচ্ছাক্রমে এবং যেখানে খুসী। সাইকেলে চাপার সুযোগ না নিলেই সে ভালো কর্‌ত, এখন তার মনে হ'তে থাকে।

অবশেষে সাইকেল থামে এক জায়গায় এসে।

"এই আমার বাড়ী!" বোগেশ দা' বলেন,—"ভাড়াটে বাড়ীই অবশ্যি! আর এখানেই আমাদের বয়েজ্‌ স্পোর্টিং ক্লাব্‌, এরই নীচের তালায়। এস ভেতরে, দেখ্‌বে এস।"

ভাব্‌বার অবকাশ পায় না টুনু। বাড়ী ফিরে বকুনির কথাও ভুলে যায়। যন্ত্র-চালিতের মত সে বাড়ীর মধ্যে ঢোকে।

সত্যিই, দেখ্‌বার মতই বটে ক্লাব্‌টা। তিন-চারটে ঘর যুড়ে। সামনের আর পাশের ঘরে, প্রায় তারই সমবয়সী ছেলেরা ক্যারম্‌ আর পিং-পং খেল্‌ছিল। এতক্ষণে একটু উৎসাহ বোধ হতে থাকে টুনুর।

ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক চোট্‌ খেলে গেলেও হয়। পার্‌বে ওরা ওর সঙ্গে? হুঁ, তা আর পার্‌তে হয় না! পর পর নিল-গেম্‌ খাইয়ে দেবে টুনু।

আচ্ছা, আচ্ছা, খেলবে পরে। বোগেশ দা' যেন টুনুর মনের কথা টের

পান—"তুমি তো আজ থেকেই মেম্বার হয়ে গেলে আমাদের ক্লাবের। চাঁদা? এখন সঙ্গে নেই বল্‌ছ? আচ্ছা, সে কাল বিকেলে দিও 'খন এনে। এখন এস, কত শীল্ড্‌ কাপ্‌ আর ট্রফি আমরা জিতেছি দেখ্‌বে চল! সে সব ওপরে সাজানো আছে আমার ঘরে।"

ওপরে যায় টুনু। টুনুর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়—মানে, যত দূর পর্য্যন্ত হবার।

বাবাঃ! কতগুলো শীল্ড্‌ আর কাপ্‌! তাদের চক্‌মকানিতে ঘর যেন ঝক্‌মক্‌ করছে!

বোগেশ দা'র মুখ চল্‌তে থাকে, "ঐ কাপ্‌টা কিসে পেয়েছিলুম জানি? বক্সিং-এ। বলাই চাটুজ্যেকে হারিয়ে। অবাক্‌ হচ্ছ? বলাই চাটুজ্যেকে হারানো যায় না বুঝি? নাই যদি হারালুম তা হ'লে কাপ্‌টা পেলুম কি করে? তুমিই বল। আর এই যে ট্রফি দেখ্‌ছ—এটা যুযুৎসুর জন্য। যুযুৎসুর অনেক প্যাঁচ জানি আমি। তোমাকেও শিখিয়ে দেব। এক সময়ে শিখে নিয়ো। এই ব্যাট্‌টা দেখেছ তো! কেমন ব্যাট্‌ দেখ। এই দিয়ে তিন হাজার রান্‌ তুলেছি আমি, তার মধ্যে সাতটা সেঞ্চুরি আর চারটে ডবল্‌ সেঞ্চুরি। আর ঐ কাপ্‌টা টেনিস্‌-এর, সাউথ্‌ ক্লাব থেকে পাওয়া—সুভাষ বোসের বাড়ীর কাছে সাউথ্‌ ক্লাব্‌! ফ্রেঞ্চ্‌ টেনিসিয়ান্‌ কোশেকে হারিয়ে পেয়েছিলাম। কোশে। কোশের নাম শোন নি! শুন্‌বেই বা কি করে? ছেলেমানুষ! খুব ক'ষে হারিয়ে দিলুম আর কি! আর পাতিয়ালার কুস্তিগির লটপট্‌ সিংকে হারিয়ে পেয়েছিলাম এই রূপোর কাস্‌কেট্‌। তোমার কি মনে হয়, রূপো নয় এ? নিছক কাঁসা? পাগল! পাতিয়ালার মহারাজা নিজে হাতে তুলে আমাকে প্রেজেন্ট্‌ করলেন, আর তিনি কিনা কাঁসা ছোঁবেন! বল কি! এ কখনও হ'তে পারে? আর ঐ ভারী শীল্ড্‌টা দেখ্‌ছ? ওটা একটা ফুট্‌বল টুর্ণামেণ্ট জেতার। আমি যে এক সময়ে মোহনবাগানে খেলেছি হে! কদ্দিন ক্যাপ্টেন্‌ ছিলাম মোহনবাগানের। গোলেও খেলতাম, ফরোয়ার্ডেও খেলতাম; হাফ্‌ ব্যাকেও, ব্যাকেও। যাকে বলে অলরাউণ্ড প্লেয়ার—মানে, চারিধারে গোল। এই যে আমার নাকটা একটু বাঁকা, কেন বল দেখি? একবার

নাক দিয়েই বল আট্‌কে গোল বাঁচিয়ে দিলুম কিনা! সেই থেকেই। কি করি, তীরবেগে বল্ আস্‌ছে, হাত-পা দিয়ে ঠেকানো যায় না, হেড্ করেও না; নাকই ছিল হাতের কাছে, নাকিয়ে বল্‌টাকে বাঁকিয়ে দিলাম। একেবারে যাকে বলে নোজ্‌ড্ আউট্। কর্ণার হ'ল বটে, কিন্তু গোলও বাঁচল। সেই টুর্ণামেণ্ট জেতারই তো ঐ শীল্ড্। কিন্তু নাকটাও গেল বেঁকে। যাক্ গে—!"

টুনু অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে। বোগেশ দা' এবং নাক—ত্বজনের দিকেই। মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে। সব রকম স্পোর্টে সমান চৌকস্—বোগেশ দা' তো কম নন্। ভক্তির উচ্ছ্বাসে উথলে ওঠে টুনু। সাক্ষাৎ দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনে হ'তে থাকে ওর।

—"আর ঐ সব টুক্‌রো-টাক্‌রা মেডেল, কাপের তো ইয়ত্তাই নেই। ও-সব পেয়েছি ক্যারম্, ব্যাডমিণ্টন্, বাগা'ডেল, পিং-পং, দাবা-বোড়ে এই সব কম্পিটিশন্ জিতে—'

তার পর তিন মাস কেটে গেছে। টুনু এখন বয়েজ স্পোর্টিং-এর নাম-করা মেম্বার। সে নিজেও অনেককে দলে টেনেছে—তার অনেক বন্ধুকেই। তাদের ক্লাব এখন চলছে জোর। এই ফুটবলের মরশুমে তারা নিজেরাও একটা টুর্ণামেণ্ট খুলবে স্থির করছে। টুনু তার ঠাকু'মাকে অনেক ব'লে-কয়ে টাকা দেওয়াতে পর্য্যন্ত রাজী করেছে—স্বর্গগত-ঠাকুরদা'র নামেই, ক্লাব থেকে একটা কাপ্ আর এগারোটা মেডেল ঘোষণা ক'রে দেয়া হবে। একাধারে, ঠাকুরদা'কে অমর করা আর নিজেরা খেলে অমর হওয়ার এমন ফুটবল-যোগ কিছুতেই পা-ছাড়া করা চলে না।

কিন্তু এই ঘোষণার মুখেই গোলযোগ বাধল। বোগেশ দা' একদিন মুখ চূণ ক'রে এসে হাজির। কোথায় নাকি কিছু টাকা ধার করা ছিল তাঁর, না শুধতে পারায় পাওনাদাররা এসে তাঁর যত শীল্ড্ আর কাপ্, মেডেল আর অন্যান্য ট্রফি—এমন কি পাতিয়ালা-প্রদত্ত সেই সন্দেহজনক রূপোর কাস্কেট্‌টি পর্য্যন্ত ক্রোক ক'রে নিয়ে গেছে। সেগুলো উদ্ধার না করলে নয়। তা না হলে ক্লাবই ভেঙ্গে যায়, টুর্ণামেণ্ট তো টুর্ণামেণ্ট!

এবং উদ্ধার করতে হবে টুনুকেই। টুনু ছাড়া কে করবে আর! কিন্তু টুনু—? সে ভারি অবাক্ হয়ে যায়। তখন তার কানে কানে একটা উপায় বাৎলে দেন বোগেশ দা'। টুনু ঘাড় নাড়ে, বলে, "না না, সে হয় না।" বোগেশ দা' আরো বেশী ঘাড় নাড়েন। অবশেষে টুনুর ঘাড় নাড়ার ক্ষমতা লোপ পায়।

বোগেশ দা' বলে দেন—"মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ০০০৬৪ নম্বর ষ্টল্, মনে থাকবে তো? কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় যাব আমি। ঠিক যাওয়া চাই কিন্তু তোমার। ঐ নিয়ে—বুঝেছ?"

টুনু ফাইনাল ভোট দেয়, এবার নিজের বিরুদ্ধেই।

অনেক এদিক্ ওদিক্ ক'রে, বহুৎ ইতস্ততঃর পর, শেষাশেষি 'মরিয়া' হয়ে ওঠে টুনু। ঠাকু'মার পূজোর ঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে হাত পূরে দেয়। যা পায় আঙ্গুলের কাছে তুলে নিতে আর দ্বিধা করে না। তার পর সোজা ছুট মারে মার্কেটের দিকে।

তখনও বারোটা বাজতে আধ ঘণ্টা দেরী, গীর্জ্জার ঘড়িতে সে দেখতে পায়। যাক্, ততক্ষণে ষ্টল্‌টা চিনেই আসা যাক্ না কেন!

০০০৬৪ নম্বরের ষ্টল্। সেখানে এসে ঝলসে যায় টুনুর চোখ। সমস্ত ষ্টল্ বোঝাই যত শীল্ড্ আর কাপ্, আর অন্যান্য ট্রফি আর মেডেল! এবং কাস্কেটও অগুণ্‌তি! রূপোর কি কাঁসার ওগুলো, কে জানে!

টুনু অবাক্ হ'য়ে ভাবে, আজ কি যত রাজ্যের যত স্পোর্টস্‌ম্যান্, সবার সম্পত্তিই এক সঙ্গে নীলাম হ'তে চলেছে? বড় সমস্যার ব্যাপার তো!

বোগেশ দা'র জিনিষগুলোও সে চিনতে পারে—দেখবা মাত্রই। কত দিন নির্নিমেষে ওর দেখা ওগুলো। ভুল হবার যো কি! ঐ যে ওই কোণে সব থরে থরে সাজানো রয়েছে!

সাহসী হয়ে ষ্টল্-কীপারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে টুনু, "এত সব শীল্ড্, কাপ্ কেন?"

"আমরাই তো সাপ্লাই করি স্পোর্টস্‌ম্যান্‌দের! প্রায় যত পাড়াটে ক্লাব সব আমাদের ভাড়াটে! অর্ডার দিয়ে ডিজাইন-মাফিক এ সব তৈরী করানো।

এ সব না হ'লে কি ক্লাব্ চলে আজকাল ? মেম্বার আস্‌বে কেন ? ছেলেরা কি এতই বোকা নাকি ? কলকাতার ছেলে বাবা, সহজে ভোলবার ছেলে নয় এরা।" ষ্টল-কীপার্ মুখখানা একেবারে হাঁড়ি-পানা ক'রে আনেন।

টুনুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন।

"বোগেশ দা' ? বোগেশ দা' কখন আস্‌বেন বলতে পারেন ?"

"কে ? স্পোর্টস্‌ম্যান্ মিষ্টার বোগেশ দাস ? তাঁর অপেক্ষাতেই তো বসে আছি খোকা ! তাঁর কে এক বন্ধু নাকি টাকা নিয়ে আস্‌ছেন। হ্যাঁ, টাকা আজকাল সস্তা হয়েছে কিনা ! বল্লেই চলে আসে অম্‌নি !—"

তারপর টুনুকে আপ্যায়িত করার জন্যই যেন সহানুভূতির সুরে সুরু করেন—"আমরা অনেক সুবিধা দিয়েছিলাম ভদ্রলোককে—যাতে ক্লাবটা চালু হয়। তা, দু'-তিন মাস হয় তো হয়, একেবারে ন'-ন' মাসের ভাড়া বাকী! তা হ'লে কি করে চলে বল ? এই থেকেই তো চালাতে হয় আমাদেরও।"

টুনু জিজ্ঞাসা করে—"ন' মাসের ভাড়া বাকী ? কিসের ভাড়া মশাই ? আপনাদের বাড়ী নাকি ওটা, বোগেশ দা' যেখানে থাকেন ?"

"বাড়ী ভাড়া না হে ছোকরা, বাড়ী ভাড়া না। আমরা ষ্টল্-কীপার, ঘর-বাড়ীর খবরে কি দরকার আমাদের ! বাড়ী ভাড়াও বাকী ফেলেছে কিনা কে তার খবর নিতে গেছে ? সময়ই বা কোথায় ? আর এমন গরজই বা কি আমাদের ? বাড়ী নয়, আমাদের এই শীল্ড্-কাপ্-মেডেলের বাকী ভাড়ার কথাই বলছি !"

"য়্যাঁ ?" টুনুর আপাদমস্তক চমকে যায়। "এ সব কি তবে ভাড়া করা ছিল নাকি ?"

কেবল প্রথম শব্দটাই টুনুর মুখ থেকে বেরোয়, বাকীগুলো তার মনে মনেই উচ্চারিত হয়।

বারোটার দুটো কাঁটা এক হ'তে-না-হ'তেই টুনু সরে পড়ে ওখান থেকে। ঊর্দ্ধশ্বাসে সে বাড়ী ফেরে।

এবং লক্ষ্মীর সম্পত্তিও লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে ফিরে আসে আবার।

টুনু ভাবতে বসে তার পর। মুখখানা তার কেমন এক রকম হয়ে যায়—সেটা চিন্তাশীলতার লক্ষণ !

বোগেশ দা'র নামটা সত্যিই কি খুব গোলমেলে ?

নিজেকেই প্রশ্ন করে টুনু।

লোহার কথা

(শ্রীজয়ন্তকুমার বসু, বি-এস্-সি)

যে কোন জিনিষ, সামান্যই হোক আর মূল্যবান্‌ই হোক, তার অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত তার যথার্থ মূল্য ঠিক ধরা যায় না। মনে কর, আজ যদি হঠাৎ পৃথিবীতে লোহার মত একটা সামান্য—নেহাৎ 'বাজে' জিনিষের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তবে পৃথিবীতে মানুষ জাতের টিকে থাকা যেমন কষ্টকর ও মারাত্মক হয়ে উঠবে তেমনটি অনেক জিনিষের দুর্ভিক্ষেই আশঙ্কা করা যেতে পারে না। কথাটা বোধ হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না ? আচ্ছা বুঝিয়ে বলি। মানুষের কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি সভ্য দেশে যা কিছু না হ'লে চলে না, তার সমস্তই লোহার অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এমন কি যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঘটে ওঠা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। কেননা যুদ্ধের যে কোন যন্ত্র বল, যে কোন অস্ত্র বল—বড় বড় কামান, ট্যাঙ্ক, বন্দুক, গোলাগুলি, 'মেসিনগান্', এঞ্জিন ও মোটর থেকে আরম্ভ ক'রে জঙ্গল কাটবার ও ট্রেঞ্চ তৈরীর কোদাল, গাঁইতি, এমন কি একটা পেরেক পর্য্যন্ত—সবেতেই লোহার দরকার। যার মধ্যে লোহা নেই এমন অনেক জিনিষ তৈরী করতেও লোহার প্রয়োজন হয়। যে সব জিনিষে তারও দরকার নেই ব'লে মনে হয় সেখানেও পরোক্ষ ভাবে লোহার দরকার। যেমন ধর, ডাক্তারী ওষুধ তৈরী করতে কয়লার চুল্লী জ্বালতে হয়, আর সেই কয়লা খনি থেকে তুলতে লোহার কোদাল, গাঁইতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির দরকার হয়ে পড়ে। সচরাচর আমরা যে সব বাসন-পত্র ব্যবহার করি তারও সমস্তই প্রায় খনিজ জিনিষের তৈরী ; সে সমস্ত

জিনিষ যোগাড় করে তাকে কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতেও লোহার দরকার হয়। তোমরা মনে করতে পার আমাদের দালান-কোঠায় দরজা, জানালা, কড়ি, বরগা ইত্যাদি সমস্তই কাঠের তৈরী—তাতে বিন্দুমাত্রও লোহা নেই। কিন্তু কাঠকে কেটে, চেঁছে, ফুঁড়ে তবেই তো ঐ সব জিনিষ তৈরী করা হয়েছে! আর ঐ সব কাজ করতে নানা রকম লোহার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়েছে। শুনলে অবাক্ হবে—গাছপালার সবুজ পাতায় আর প্রাণীদেহে রক্তের ভিতরেও লোহার অংশ আছে।

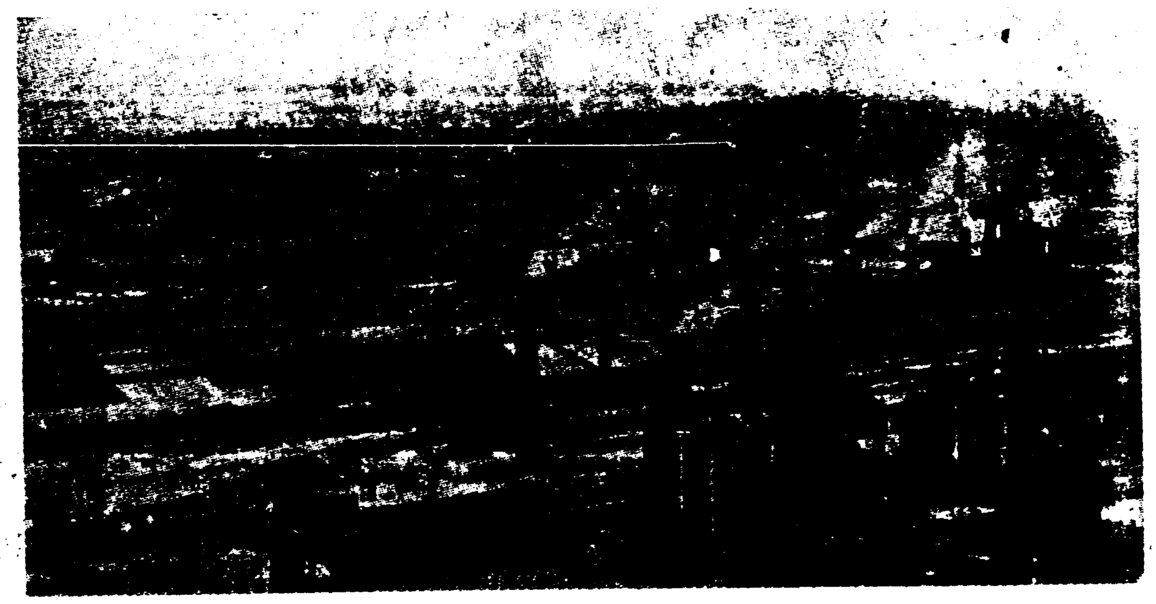

একটি বড় লোহার কারখানার সাধারণ দৃশ্য

আমাদের দেশে লোহা অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মেশান অবস্থায় মাটীর নীচে খনিতে পাওয়া যায়, পাহাড়েও অনেক জায়গায় লোহা পাথরের সঙ্গে মেশান থাকে। এ দেশে রায়পুর রাজ্যে, সিংভূম জেলায়, ঘাটশিলা, ধলভূম, ময়ূরভঞ্জ, গুরুমহিষাণি ও বাদাম পাহাড় প্রভৃতি পাহাড়ে জায়গায় প্রচুর পরিমাণে লোহা অন্যান্য ধাতু ও পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঐ সব লোহা-পাথরের (Iron ore) রং লাল বা পাটকিলে—রসায়নের ভাষায় তাকে "লাল হিমেটাইট" বলে। গন্ধক, অঙ্গার প্রভৃতির সঙ্গেও মেশান অবস্থায় লোহা পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ লাল লোহা-পাথর থেকেই লোহা বার করা হয়।

সিংভূম জেলায় জেমসেদপুরে টাটা কোম্পানী প্রতি বছর লাল লোহা-পাথর থেকে প্রচুর পরিমাণে লোহা আর ইস্পাত তৈরী করছেন। তাঁদের লোহা নিষ্কাশনের ছোটখাট একটী হিসাব দিচ্ছি। গত ১৯৩৫-৩৬ সনে ভারত থেকে ৮৮৭০০০ টন লোহা সমস্ত পৃথিবীতে সরবরাহ করা হয়েছে। তার মধ্যে শুধু টাটা

কোম্পানীই ৬৪৬০০০ টন লোহা আর ইস্পাত তৈরী ক'রে বাজারে বের করেছেন। টাটার কারখানা ছাড়া ভারতে আরও দু'-চারটী লোহা-নিষ্কাশনের কারখানা আছে, কিন্তু তারা টাটার কারখানার তুলনায় কিছুই নয়।

গত ১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণ মাসের "রামধনু"তে জেমসেদপুরের কিছু বিবরণ তোমাদের দিয়েছিলাম। এবার টাটার কারখানায় কি প্রণালীতে লোহা বার করা হ'য়ে থাকে তা বলছি শোন। ঢালাই লোহা (পিগ্ বা কাষ্ট্) তৈরী করতে হ'লে আজকাল সাধারণতঃ বড় বড় লোহার চুল্লী ব্যবহার করা হয়। একে "ব্লাষ্ট ফারনেস্" (Blast furnace) বলে। প্রথমে এই চুল্লীর একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার; সাধারণতঃ ছোট ছোট কারখানায় যে সব চুল্লী ব্যবহার করা হয়—সেই চুল্লীর কথাই বল্‌ছি। এই বিশাল চুল্লীর বাইরের খোলটী পেটা লোহা (রট্ আয়রন্) কিংবা ইস্পাতের বড় বড় পাত দিয়ে তৈরী করা হয়; আর খোলটীর ভেতরের দিকের দেয়াল আগুন-সহা ইটের (ফয়ার ব্রিক্) গাঁথুনিতে তৈরী। চুল্লীটী উঁচুতে ৫০ থেকে ১০০ ফুট, আর তার প্লেটের কাছে বেড় ১৫ থেকে ২৫ ফুট (অবশ্য টাটার কারখানায় চুল্লী এর চেয়ে ঢের ঢের গুণ বড়)। চুল্লীটী কতকগুলো লোহার থামের উপর খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। চুল্লীর মুখ খোলা, উপুড় করা সরার মত একটী লোহার ঢাকনী দিয়ে কপি-কলের সাহায্যে সেটা বন্ধ থাকে। ঐ মুখ দিয়ে লোহা-পাথরের গুঁড়ো মশলা প্রভৃতি মিশিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়। জিনিষের ভারে ঢাকনীটী আপনি খুলে যায়—পরে মাল-মশলা ভেতরে ঢুকলে আবার আপনি বন্ধ হ'য়ে যায়। চুল্লীর একেবারে ওপরের দিকে গরম গ্যাস বার হবার জন্য একটা ফুটো থাকে, চুল্লীর নীচের দিকে জোরে হাওয়া দেওয়ার জন্য কতকগুলো নল (টয়ার) বসান থাকে। ওর ভেতর দিয়ে ৭০০।৮০০ ডিগ্রি উত্তাপের গরম দম্‌কা হাওয়া বইয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। চুল্লীর তলার একটু উপরে দু'টো ছোট ছোট নর্দ্দমা থাকে। উপরেরটী দিয়ে ধাতুর ময়লা (Slag) বের করা হয়, আর নীচেরটী দিয়ে বার করা হয় গলান লোহা।

চুল্লীর ভেতর প্রথমতঃ কিছু কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালান হয়, আর সঙ্গে

সঙ্গে উপর থেকে গাড়ী গাড়ী কয়লা (কোক্) ও চুণের পাথর (Lime-stone) মেশান লোহা-পাথরের মশলা তার ভেতর ঢেলে দেওয়া হয়—একেবারে বিশ-ত্রিশ বা একশ'-দুশ' মণ। মাঝে মাঝে মশলা দেওয়া বন্ধ করা হয়। টাটার কারখানায় দু'খানা গাড়ী চুল্লীর নীচু থেকে উপর পর্য্যন্ত অনবরত পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করে। ওগুলো বৈদ্যুতিক-শক্তিতে ঝোলান তারের সাহায্যে ওঠা-নামা করে। মশলা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচে থেকে দম্কা গরম হাওয়া ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'তে থাকে। চুল্লীর ভেতরে সব জায়গায় সমান উত্তাপ হয় না—একেবারে উপরে প্রায় ৪০০° ডিগ্রি আর একেবারে নীচুতে হয় ১২০০° ডিগ্রিরও ওপর। কয়লা মেশান মশলা নীচের দিকে নামতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত গ্যাস ওপরের দিকে উঠতে থাকে। মাঝ পথে দু'টো যখন এক সঙ্গে মিলিত হয় তখন কয়লা উত্তপ্ত বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে 'কারবন্ মনক্সাইড্' নামক গ্যাস উৎপন্ন করে। এই গ্যাস লোহা-পাথরকে লোহা ধাতুতে পরিণত করে। এই লোহা প্রথমতঃ স্পঞ্জের মত ফোঁপরা থাকে। যতই নীচের দিকে নামতে থাকে ও চুল্লীর উত্তাপ বাড়তে থাকে, ততই এই লোহা কয়লা—তার পর গন্ধক—তার পর ফস্ফরাস্ ও বালির সঙ্গে মিশে অবশেষে সবশুদ্ধ গলে চুল্লীর তলায় গিয়ে জমতে থাকে।

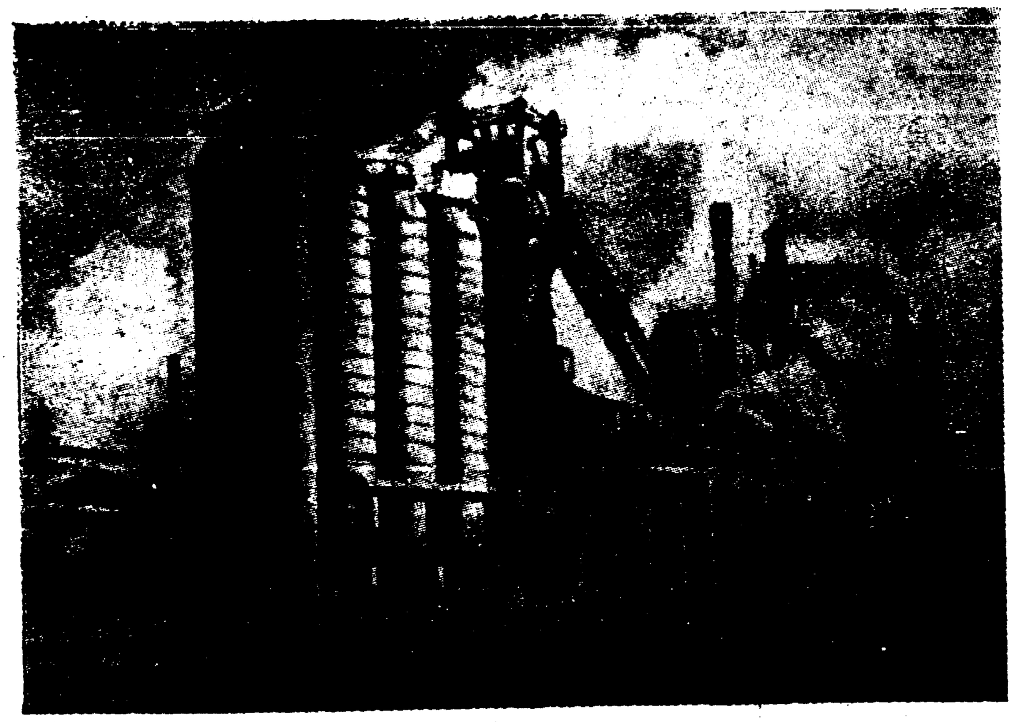

ব্লাষ্ট্ ফারনেস্

এখন, তোমরা বলতে পার, 'আচ্ছা, লোহা বানাতে আবার চুণের পাথরের কি দরকার?' চুণের পাথর দেওয়ার আর কোন মানে নেই, শুধু খুব বেশী

উত্তাপে ওটা চূণ ও কারবন্ ডাই-অক্সাইড্ গ্যাসে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে ঐ চূণ বালি প্রভৃতি বাজে ময়লা জিনিষের সঙ্গে মিশে "গাদ" (Slag) হয়ে গলান লোহার ওপরে ভেসে ওঠে। "গাদ" যখন বেশী জমে ওঠে তখন ওপরের নর্দ্দমা দিয়ে বের করে নেওয়া হয়। গলান তরল লোহা মাঝে মাঝে নীচের নর্দ্দমা খুলে বালির ওপর দিয়ে গলিয়ে বড় বড় লোহার টবে ভর্ত্তি করে ফেলা হয়। সেই টবগুলো রেল লাইনের উপর দিয়ে এঞ্জিনের সাহায্যে টেনে অন্য জায়গায় নেওয়া হয়। সেখানে টব থেকে গলান লোহা বালি ছড়ান ছাঁচের উপর ঢেলে দেওয়া হয়। পরে ঠাণ্ডা হ'লে এই লোহার খণ্ডগুলি দিয়ে নানা রকম জিনিষ তৈরী হয়ে থাকে। সে সব কথা আর একদিন বলবার ইচ্ছে রইল। এই লোহাকে পিগ্ আয়রন্ বলে।

টাটার কারখানায় দেখ্বে চুল্লীর আগুন সারা দিনরাতই জ্বলছে। দিনের পর দিন—বছরের পর বছর সে আগুন রাবণের চিতার মত জ্বলতেই থাকে, কেননা একবার আগুন নিভে গেলেই হাজার হাজার টাকার চুল্লী ফেটে মুহূর্ত্তে চৌচির হয়ে যাবে। তাই দিনরাতই সেখানে কাজ চলছে। রাতের বেলা দেখবে চিমনির মুখ দিয়ে আগুনের লাল শিখা সারাক্ষণ আকাশকে রাঙিয়ে তুলছে।

তোমরা যদি কখনও টাটার বিশাল কারখানা দেখতে যাও, তবে প্রথমেই লোহা-গলান চুল্লী (ব্লাষ্ট্ ফারনেস্) দেখতে যেও। দেখো, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে তোমাদের কানে তালা লেগে যাবে। চারদিকে নানা রকম অদ্ভুত শব্দ—ঝন্ ঝন্—শোঁ শোঁ—ঝিম্ ঝিম্—ভোঁ ভোঁ—হু হু প্রভৃতি মিশে একটা বিশ্রী কর্কশ আওয়াজের সৃষ্টি হ'তে থাকে। তখন হয়তো ঐ আওয়াজ শুনে মনে হবে ছেলেবেলার সেই রূপকথার রাক্ষসী-বধের বিকট চীৎকারের কথা;—যেখানে রাজপুত্র রাক্ষসীর প্রাণ-রূপ ভোমরা সাত তাল গাছ জলের তলার কৌটা থেকে খুলে টিপে মেরে ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসীও চীৎকার করে মরে গিয়েছিল। চুল্লীর কাছে যাওয়া বড্ড মুস্কিল, তোমরা বেশীক্ষণ থাকলে হয়তো গরমে ও তীব্র আওয়াজে ভিরমি খেয়ে যাবে। বারো বছরের কম যদি হও তবে তো কারখানায় ঢুকতেই পাবে না। চুল্লীর কাছে যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (ফোরম্যান্) থাকেন তিনি ইসারায় তাঁর

সহকর্ম্মীদের ও মজুরদের খাটাচ্ছেন ও কাজের প্রণালী বুঝাচ্ছেন। ওই সব ইসারা কর্ম্মীদের পূর্ব্বেই শিখে নিতে হয়, কারণ ঐ গোলমালে কিছু বলাও যায় না, কিছু শোনাও যায় না।

টাটার কারখানায় প্রতিদিনই সবার অলক্ষিতে আর একটী জিনিষ গড়ে উঠছে। প্রতিদিন যে সমস্ত লোহার 'গাদ' টবে ভর্ত্তি করে কারখানার চারপাশে এঞ্জিন দিয়ে টেনে নিয়ে ঢেলে ফেলা হচ্ছে—তাতে কারখানাটী কয়েক বছরের ভেতরেই একটী দেয়াল-ঘেরা হুর্গের মত হয়ে উঠছে; সঙ্গে সঙ্গে বিনা খরচায় টাটার জায়গাও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। 'গাদ' যখন এনে ঢেলে ফেলে তখন দেখেছি এক মাইল দূরে থেকেও ওর আঁচ গায়ে এসে বেশ লাগে আর তীব্র আলো চোখ ঝলসে দেয়।

ঢালাই লোহা দিয়ে সাধারণতঃ কড়ি, বরগা, শিক প্রভৃতি তৈরী হয়। লোহা তিন রকম—ঢালাই লোহা, ইস্পাত ও পেটা লোহা। ঢালাই লোহাতে কয়লা ও নানা রকম ময়লা বেশী পরিমাণে থাকে, পেটা লোহাতে খুব কম থাকে। আর ইস্পাতে থাকে এদের হুটীর মাঝামাঝি রকমের। আজ এই পর্য্যন্তই। ভবিষ্যতে একদিন ইস্পাত তৈরীর কথা বলবার ইচ্ছা রইল।

প্রোফেসারের পাল্লায়

(শ্রীবিমল দত্ত, এম্-এ)

ফট্‌কেকে সেদিন বল্‌লুম, "চ' যাই, রায় বাহাদুরের বাগানের ফল্‌সা ধ্বংস ক'রে আসি।" ফট্‌কে বল্‌লে, "উঁহু!"

বল্‌লুম, "আরে এই এত্ত বড় বড়—ঠিক মার্ব্বেলের মত ফল্‌সা, আর রসে টইটুম্বুর!" ফট্‌কে তবু বলে, "উঁহু!"

কেমন যেন খট্‌কা লাগ্‌ল। ব্যাপার কি? আমাদের কাঁচা-ডাঁশা-পাকা-

ধ্বংসকারী সমিতির সভ্য হয়ে ফট্‌কের কিনা এমন অসভ্যপনা! এ ত' ভাল নয়, এ যে "সন্ন্যাস-রোগের" পূর্ব্ব-লক্ষণ! কবে বুঝি লোটা-কম্বল সম্বল ক'রে গৃহত্যাগ করে!

চলে গেলুম বাবলুর বাড়ী। বাবলু তখন সবে এক বাটী কাঁচা আম জরিয়ে জ্যামিতির বইখানা চাপা দিচ্ছে। আমার পায়ের শব্দ শুনেই ভাল মানুষের মত পড়্‌তে লাগ্‌ল—"ক খ গ ও ঘ ঙ চ হুই ত্রিভুজের মধ্যে—"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, ও মা! বাবুলু-চাঁদ ব্যাকরণখানা খুলে চোখ ঘোরাচ্ছে—মুখ ঘোরাচ্ছে—যেন কত বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে!

আমি চাপা স্বরে ডাক্‌লুম, "এই চতুর্ভুজ, জ্যামিতি চাপা ওটা কি রে?"

বাব্‌লু বল্‌লে, "চুপ্‌ চুপ্‌, চেঁচাস্‌ নি, মেজ্‌কা ও-ঘরে রয়েছে যে!"

তার পর সে খুট্‌ ক'রে দরজা খুলে দিলে। জরানো কাঁচা আম সশব্দে খেতে খেতে আমি বাবলুকে ফট্‌কের "সন্ন্যাস রোগের" কথা বল্‌লুম—"মার্ব্বেলের মত ফল্‌সার লোভ ও কি ক'রে ত্যাগ কর্‌লে বল্‌ ত?"

বাবলু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "তাও জানিস্‌ না বুঝি! ফল্‌সা চুরি করতে গিয়ে ওর চোখ যে মার্ব্বেলের মত বড় বড় হয়ে উঠেছিল রে!"

"কি রকম, কি রকম?"

"আরে সে এক ভীষণ লোমহর্ষণ কাহিনী। ফট্‌কের একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

"আরে খুলেই বল্‌ না ভাই—আমার মতন বেলে মাছকে নিয়ে তোর রুই-কাৎলা-ধরা হুইল ছিপে খেলিয়ে লাভ কি?"

বাবলু খুসী হ'য়ে গেল। খোসামোদ শুন্‌লে "খোসা"রও যে আমোদ হয়, আর বাবলুর হবে না? তার মধ্যে যে যথেষ্ট শাঁসও রয়েছে।

বাবলু বল্‌তে সুরু কর্‌লে—"কাল ছিল রবিবার। রায় বাহাদুরের বাগানে ফল্‌সার লোভে ঠিক হুপুর বেলা ফটিকচাঁদ হাজির, কাঠের বেড়া টপ্‌কে। পচা পুকুরের পাড় দিয়ে এক ছুটে ফট্‌কে ভাঙা দেওয়ালের ফোকরে পা দিয়ে পাঁচীলের

উপর চড়ে বস্‌ল; তার পর কাঠ-পিঁপড়ের তাড়া খেয়ে যাই ওপারে লাফিয়ে রায় বাহাদুরের এলাকায় পড়েছে, অমনি একটা মাথা-কামানো জাহাজের খালাসী গোছের লোক তার হাতখানা খপ্‌ ক'রে ধ'রে ফেল্‌লে। লোকটার পরনে নীল পা-জামা, হল্‌দে কোট, মাথায় সবুজ টুপি—ফট্‌কের মুখ থেকে তার অজান্তেই পিছ্‌লে বেরিয়ে এল, "এ কি রামধনু থেকে নেমে আস্‌ছে নাকি?"

লোকটা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "তোমার বেয়াদবি দেখে আমার তাক্‌ লেগে গেছে। জান আমি কে?"

ফট্‌কে অবাক্‌ হয়ে তার গোল গোল ঘূর্ণ্যমান চোখ দুটোর দিকে চেয়ে রইল।

লোকটা সে-ভাব মুহূর্ত্তে বদ্‌লে একগাল ভারী মোলায়েম হাসি হেসে বল্‌লে—"আমারই দোষ। তোমার কিচ্ছু দোষ নেই। তুমি জান্‌বেই বা কি করে যে আমি সম্প্রতি হৈচৈপুর কলেজের প্রোফেসরি ছেড়ে দিয়ে এই নিশ্চিন্দিপুরে মৌলিক গবেষণা করতে এসেছি!"

ফট্‌কে সসম্ভ্রমে বল্‌লে, "আপনি বুঝি প্রোফেসার?"

লোকটী বল্‌লেন, "হ্যাঁ, রায় বাহাদুর ত্রিলোচন রায় আমার বাবা। অনেক কাল বাড়ীটা প'ড়ে রয়েছে, তাই ভাবলাম এইটাকেই কেন না আমার ল্যাবরেটরী করি!"

"ল্যাবারেটরী আবার কি? ল্যাবাকান্তদের জন্যে ইস্কুল? তা বেশ ভাল।"

প্রোফেসার হেসে বল্লেন, "আরে না না, তা' নয়। বিজ্ঞান কি জান?"

ফট্‌কে চাল ঝাড়্‌লে, "তা আর জানি না—সেই যে সরু সরু কাচের শিশি থাকে, তার মধ্যে লাল নীল য়্যাসিড, একটু নাড়্‌লেই ভক্‌ ভক্‌ ধোঁয়া বেরোয়, শোঁ শোঁ শব্দ হয়—তার নামই ত' বিজ্ঞান!"

প্রোফেসার বল্লেন, "কতকটা—আর যেখানে ঐ রকম সব পরীক্ষা হয় তাকে বলে 'ল্যাবরেটরী'—বুঝেছ?"

ফট্‌কে বল্লে, "তা আর বুঝি নি?"

প্রোফেসার বল্‌লেন, "তা ত' বুঝ্‌বেই; পরের বাগানে ফল্‌সা চুরি কি ক'রে করতে হয় তা বোঝ, আর এইটুকু বুঝ্‌তে পারবে না?"

ফট্‌কে বল্লে, "সত্যি বল্‌ছি স্যর্‌—আপনার ঐ ল্যাবরেটরী দেখ্‌তে এসেছিলুম।"

প্রোফেসার উৎসাহে লাফিয়ে উঠ্‌লেন, "তাই নাকি? বেশ বেশ! আমি ভারী খুসী হয়েছি। এই অজ পাড়াগাঁয়েও যে এমন একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধক আছে তা জেনে আমার যে কি আনন্দ হ'য়েছে কি বল্‌ব! চল, তোমাকে আমার ল্যাবরেটরী দেখাব। আমি সম্প্রতি একটা মস্ত বড় এক্সপেরিমেণ্ট্‌ নিয়ে মেতেছি—মৃতসঞ্জীবনী আবিষ্কার কর্‌বার খেয়াল চেপেছে।" বল্‌তে বল্‌তে প্রোফেসার গেট পেরিয়ে উঠোনের মধ্যে এসে পড়্‌লেন।

একটা নড়্‌বড়ে দরজাওয়ালা এঁদো ঘরের সামনে এসে প্রোফেসার বল্‌লেন, "শুন্‌ছ?"

ফট্‌কে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কিসের গোলমাল?"

ধমকে উঠ্‌লেন প্রোফেসার, "গোলমাল মানে? ভাল ক'রে শোন দেখি! গোলমাল করবার উপায় আছে? সবাইকেই কন্‌সার্টিনা মিক্‌শ্চার এক ডোজ করে খাইয়ে দিয়েছি—ওরা এখন কনসার্ট সাধ্‌ছে।" প্রোফেসার ঘরের দরজা হাট ক'রে খুলে দিলেন। ফট্‌কে দেখ্‌লে একটা প্রকাণ্ড প্যাক-বাক্সের মুখ জাল দিয়ে আট্‌কানো, আর তার মধ্যে খোপে খোপে কতকগুলো পাখী, কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, শেয়াল, গিনিপিগ্‌ সব একজোট হ'য়ে কন্‌সার্ট সাধ্‌ছে—ঘেউ ঘেউ—ফ্যাঁচ্‌—ফ্যাঁচ্‌—কিচির্‌-মিচির্‌—কিঁকিচ্‌-মিঁকিচ্‌—হুক্কাহুয়া……

একটা সব্‌জে বোতল দেখিয়ে প্রোফেসার বল্‌লেন, "এই দেখ কন্‌সার্টিনা মিক্‌শ্চার—খাবে এক ডোজ? তানসেনও হার মেনে যাবে হে!"

ফট্‌কে বল্লে, "যাবার সময় খাব।"

প্রোফেসার বল্লেন, "খাবে বৈ কি, এ কি আর যা তা ওষুধ? তা' ছাড়া তোমার ত' বিনামূল্যে।"

উঠোনের একধারে একটা খাঁচায় গোটা বারো কাক ঝটাপটি কর্‌ছে—ফট্‌কে

ভাব্‌লে হয়ত' ওদের কুস্তি-মিক্‌শ্চার দেওয়া হয়েছে, তাই সে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লে না।

সিঁড়ির নীচের ঘরে একটা খাঁচায় একটা বাঁদর ঝুম্‌ হ'য়ে বসে রয়েছে। বোধ হয় বহু দিন কিষ্কিন্ধ্যার কোন সংবাদ পায় নি।

প্রোফেসার বলতে লাগ্‌লেন, "সব রকম জানোয়ারের উপরই এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করেছি, কেবল একটী বাদ—"

ফট্‌কের মনের মধ্যে সংশয় উপস্থিত হ'ল—ঘামে তার গা ভিজে এল—সে শুক্‌নো গলায় কাষ্ঠহাসি হেসে বল্লে, "সেটা কি জন্তু?"

প্রোফেসার সে কথা কাণে না তুলে বল্লেন, "ঐ যে বাঁদরটা দেখ্‌ছ—ওটা ত' পরশু একেবারে মরে পাথর হ'য়ে গেছিল। ঐ যে হল্‌দে বোতলটা দেখ্‌ছ, ওর ওষুধ একটু নিয়ে যেই ওর লেজের ডগায় ফুঁড়ে দিলুম অমনি লেজটা কিল্‌ কিল্‌ ক'রে বেঁচে উঠ্‌ল, তার পর ক্রমশঃ বানরটা উঠে বস্‌ল—"

ফট্‌কে বল্‌লে, "ভারী আশ্চর্য্য ত'!"

কি পরিশ্রম স্বীকার করে যে তৈরী করেছি তা তুমি ছেলেমানুষ কি বুঝ্‌বে? জ্যান্ত ছুঁচোর হৃৎপিণ্ড জ্যান্ত অবস্থায় শিলে বেটে, তাকে ইলেকট্রিক্‌ স্পার্ক দিয়ে রীতিমত ভেজে—ভেলসিটী দিয়ে মাখিয়ে একুশ দিন পচাপুকুরে ডুবিয়ে রেখেছি; তার পর ম্যারিনার্স কম্পাসের কাঁটা দিয়ে ফুটো করে ঐ হল্‌দে আরকটাতে মিশিয়েছি। ওই বাঁদরটা আমার 'ফার্ষ্ট সাক্‌সেস্‌'—যাকে বাংলা কথায় বলে 'প্রথম সাফল্য'। কিন্তু—"

ফট্‌কে বল্লে, "কিন্তু কি? আপনি ত' কেল্লা ফতে করে ফেলেছেন।"

প্রোফেসার বল্লেন, "ওষুধ ত' রেডি, কিন্তু পরীক্ষার জন্য একটা মানুষের সন্ধান কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। আজ—"

ফট্‌কের বুকে ধ্বড়াধ্বড়্‌ হাতুড়ি পেটাচ্ছে—তার পা কাঁপ্‌ছে—গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আস্‌ছে—সে মরিয়া হ'য়ে ছুট্‌ দিতে গেল; কিন্তু কোথায় পালাবে? প্রোফেসার তার বুকের উপর চেপে ব'সে পকেট থেকে ইন্‌জেক্সনের সিরিঞ্জ বার করলেন। তাঁর হাত টেবিলের উপরের হল্‌দে শিশিটা খুঁজ্‌ছে—

ফট্‌কে ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—"ও পিসিমা, তোমার আদরের ফটু বুঝি আজ অক্কা পেলে—"

প্রোফেসার তাকে অভয় দিচ্ছেন—"আরে দূর্‌, ভয় কি? আমি ত' জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছি, আর ওই হল্‌দে শিশিতে ত' ওষুধ ভর্ত্তি—ভয় কি? চিয়ার্‌ আপ্‌ বয়্‌—একটা বাঁদরের যা সাহস আছে তোমার তা নেই? ভয় কি? মিনিট দুইয়ের মোকদ্দমা। এই হাতুড়িটা মাথায় মেরে তোম্যয় অজ্ঞান কর্‌ব, তার পর ফ্যারাডের প্রথানুযায়ী binocular দিয়ে তোমার হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকুনি থামিয়ে দেব; তার পর হল্‌দে শিশি—"

সহসা কতকগুলো ব্যাপার ঝট্‌পট্‌ ঘটে গেল। কার হ্যাঁচ্‌কা টানে ফট্‌কে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সে দেখ্‌লে যে রায় বাহাদুরের দুই ভোজপুরী দরোয়ান প্রোফেসারকে দু'দিক্‌ দিয়ে জাপ্‌টে ধরেছে, আর ফট্‌কের মেজদা' ফট্‌কেকে বাড়ী যেতে ডাক্‌ছে।

ভাগ্যিস্‌! যদি ফট্‌কের মেজদা' না দাঁতন ভাঙতে রায় বাহাদুরের বাগানে ঢুক্‌ত তা' হ'লে ত' ফট্‌কেকে প্রোফেসার চট্‌কে ফেলেছিল আর কি!

আমি বল্‌লুম, "কেন, কেন?"

বাবলু বল্লে, "বাঃ, এতক্ষণেও বোঝ নি বুঝি! হৈচৈপুরের প্রোফেসারি-ট্রোফেসারি সব বাজে। লোকটা আসলে রাঁচির পাগ্‌লাগারদ-ফেরৎ—রায় বাহাদুরের বড় আদরের ছেলে। ডাক্তারি পড়্‌তে পড়্‌তে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। সেই থেকে ওর ধারণা যে ও মস্ত ডাক্তার আর কেবল শিকার খুঁজ্‌ছে এক্স্‌পেরিমেণ্টের জন্যে। ওঃ, কী সর্ব্বনাশ বল ত', ফট্‌কেকে ত' নিয়েইছিল আর কি!"

মার্ব্বেলের মত বড় বড় ফল্‌সার লোভে আমার জিভে যে জল এসেছিল তা' শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে এসেছিল এতক্ষণে। শুষ্কমুখে বল্‌লাম, "বাবাঃ—নমস্কার! আজ থেকে আর কারুর বাগানে ঢুক্‌ছি না—শেষে কি গোহত্যা—ব্রহ্মহত্যা হ'ব!"

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

[এই প্রশ্নগুলি লোক ঠকাইবার জন্য দেওয়া হইতেছে না। যে সব সাধারণ কথা তোমাদের জানা উচিত, অথচ তোমরা জান কিনা তা নিজেরাই যাহাতে পরীক্ষা করিতে পার সেইজন্য দেওয়া হইতেছে। এগুলির উত্তর এ সংখ্যার শেষ দিকে দেওয়া হইল।]

(১) (ক) 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। (খ) 'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?' (গ) 'কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে?' (ঘ) 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। (ঙ) 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে'রে ভাই'।

উপরের বিখ্যাত লাইনগুলির কোন্‌টি নিম্নলিখিত কবিদের মধ্যে কোন্ জনের লেখা বল—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন।

(২) সম্প্রতি ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসীদল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—পাঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে, বিহারে, বঙ্গদেশে, আসামে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে, বোম্বাইএ, মধ্যপ্রদেশে, রাজপুতানায়, কাশ্মীরে, ব্রহ্মে—কোন্ কোন্‌টা ঠিক?

(৩) নীচের কথাগুলির মধ্যে যে যে ভুল আছে বাহির কর—

(ক) ধাতুর মধ্যে লোহা, তামা, কয়লা, ফটকিরি আর এলুমিনিয়াম্ অত্যন্ত দরকারী (খ) সম্প্রতি ৯৭ বছর বয়সে আমেরিকার ধনকুবের এডিসনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি মোটরকারের ব্যবসা করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছিলেন। (গ) তিব্বতের জীবজন্তুর মধ্যে ওকাপি প্রধান। সেখানে পথে-ঘাটে গরু-ভেড়ার মত ওকাপির দেখা পাওয়া যায়। টাকিনও সে দেশের জন্তু, কিন্তু টাকিনের দেখা পাওয়া বড় কঠিন।

(৪) পর পৃষ্ঠার ছবি ২টি (১নং ও ২নং) দেখিয়া বল ও দুটি কার কার ছবি।

১নং

২নং

ফুলের মূল্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই ভাই

রোজা ঠিকই বলিয়াছিল। যে সময়ে জন্ ডি উইট্ তাঁর ভাই কর্ণেলিয়াসের সেলে ঢুকিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে বাহিরের জনতাও টিলির সৈন্যদলকে সরাইয়া কারাগারে ঢুকিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে তারা ঢুকিয়াই পড়িত, নেহাৎ কাউণ্ট টিলি নাছোড়বান্দা, আর তাঁর এবং তাঁর

সঙ্গীদের হাতে এক-একটা পিস্তল থাকাতেই যা একটু গোল বাধাইতেছিল। মুখ অবশ্য তাদের কামাই যাইতেছিল না—এমন কি কাউণ্টকেও তারা বিশ্বাসঘাতকদের দলে ফেলিতে কসুর করিতেছিল না।

খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর কাউণ্ট বলিলেন, “বাপু সব, এখানে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে কি হবে—শুধু নিজেদের অমন খাসা গলাগুলো নষ্ট করা ছাড়া? আমরা সরকারের নিমক খেয়ে আছি, তাঁদেরই হুকুমে এখানে পাহারা দিচ্ছি—তাঁদের হুকুম ছাড়া শুধু গলাবাজী ক’রে আমাদের তাড়াবার কোন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখছি না। তাই বলছি ভালোয় ভালোয় ওই বন্দুকগুলো গুটাও; ওর একটা গুলি যদি হঠাৎ কোন রকমে ছুটে এসে আমাদের কারও গায়ে লাগে তবে তোমাদের অন্ততঃ শ’ দুই আমাদের হাতে নির্ঘাৎ ঘায়েল হবে। অবশ্য তার জন্য আমরা যথেষ্ট দুঃখিত হব—কিন্তু তোমাদের দুঃখটা তার চাইতেও অনেক বেশী হবে—নয় কি?”

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, “কখনও না, আমরা এক পা নড়্‌ব না। তোমরা বেরোও এখান থেকে, নইলে মজা টের পাবে—তোমাদের মাড়িয়ে আমরা ভেতরে ঢুকব।” মুখে বলিল বটে তবে গায়ের জোরে কাউণ্টের ব্যূহভেদ করিবার আগ্রহ কারোই দেখা গেল না। কাউণ্ট হাসিয়া বলিলেন, “থাক্ থাক্, খুব হয়েছে—এবার লক্ষ্মী ছেলের মত পেছন ফের তো—নইলে—নইলে—” কথাটা শেষ না করিয়াই তিনি অধর দংশন করিলেন। তার পর খানিক চুপ্ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, “আর নেহাৎ যদি আমাদের সরাতে হয় তো এখানে গলা না ফাটিয়ে টাউন্ হলে যাও, কর্ত্তাদের কাছ থেকে আমাদের সরাবার হুকুম-নামা নিয়ে এস, তাঁদের হুকুম পাওয়া মাত্র আমরা পথ ছেড়ে দেব—যাও, তাই কর—এখানে বিরক্ত ক’র না।”

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, “ঠিক ঠিক, ঠিক কথা—চল সবাই টাউন্ হলে—ডেপুটীদের কাছ থেকে হুকুম নিয়ে আসি। দেখি বেটারা রাস্তা ছাড়ে কিনা”! “তাই চল, তাই চল,”—হাজার কণ্ঠ তখনই তার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং পর মুহূর্ত্তে বিরাট্ জনতা টাউন্ হলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

কাউণ্ট পাশের সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “যাক্, ঘুরে আসুক—ডেপুটিদের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—ক্ষেপা কুকুরগুলোর কথা শুনেই হুকুম দিয়ে দিলেন আর কি!”

ততক্ষণে একবার জন্ ডি উইটের খোঁজ নেওয়া যাক্। জন্ ডি উইট্ তাঁর ভাইএর সেলের দিকে আসিয়াছেন সে খবর আমরা আগেই পাইয়াছি, কিন্তু কর্ণেলিয়াসের সঙ্গে আমাদের এখনও দেখা হয় নাই। সেলের এক কোণে একটা চাটাইএর উপর কর্ণেলিয়াস্ শুইয়াছিলেন। তাঁর শরীরের সর্ব্বত্র অসংখ্য ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—এগুলি তিনি সম্প্রতি কারাগারেই উপহার পাইয়াছেন; কর্ণেলিয়াসের শত্রুরা তাঁকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাইয়া অত্যাচার করিতে কিছু কসুর করে নাই। তবে এখন, বিচার শেষ হইয়া যাওয়ায়,—রায় বাহির হইয়া যাওয়ায়, ও সবের মাত্রা কমিয়াছে বটে।

কর্ণেলিয়াস্ শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিলেন। এ ক’দিন তাঁর উপর দিয়া যে সব অমানুষিক অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাঁর মুখ দেখিয়া তার কোন আভাস পাওয়া যাইতেছিল না—প্রশান্ত গম্ভীর মুখ, যেন পৃথিবীর তুচ্ছ সুখ-দুঃখের অনেকখানি উপরে। তবে বিচারকেরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন দেখিয়া অনেকের মত তিনিও কম আশ্চর্য্য হন নাই। কারাগারের বাহিরে ক্রুদ্ধ জনতার আকাশ-ফাটানো গর্জ্জন কারাপ্রাচীর ডিঙ্গাইয়া মাঝে মাঝে তাঁর কানে আসিতেছিল, কিন্তু জানলার কাছে গিয়া ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তাঁর কোন ঔৎসুক্য দেখা যাইতেছিল না। কর্ণেলিয়াস্ কি ভাবিতেছিলেন? তাঁর ভাইএর কথা কি?

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল, জন্ ঘরে ঢুকিলেন। দুই ভাইএর সেই করুণ মিলন-দৃশ্য বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই। কর্ণেলিয়াস্ তাঁর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত দু’টি শুধু আগাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন—জন্ তাঁকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “বড্ড কষ্ট হচ্ছে ভাই, না?” কর্ণেলিয়াস্ ম্লান হাসিয়া বলিলেন, “না দাদা, তোমাকে দেখে আমার সব যন্ত্রণা মিলিয়ে গেছে—তুমি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ নিশ্চয়ই?”

"হ্যাঁ ভাই।"

"সত্যি, আমি অনেকটা ভাল হয়ে গেছি, আমাকে একটু ধরে নিলে আমি দিব্যি হেঁটেই চলে যেতে পার্‌ব।"

"হেঁটে তোমাকে যেতে হবে না, আমি তোমার জন্য গাড়ী নিয়ে এসেছি, টিলির সৈন্যদলের পেছনে আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে।"

"টিলির সৈন্যদল! তারা এখানে কেন দাদা?"

জন্ ম্লান হাসিয়া কহিলেন, "কেন?—জান তো ভাই, আমরা এখন আর তেমন জনপ্রিয় নই, কাজেই টাউন্ হলের কর্ত্তারা মনে করেছিলেন যে আমাদের যাবার সময় অনেক লোকই আমাদের দেখতে আসবে এবং কিছু সোরগোলও করবে—তাদের থামিয়ে রাখার জন্যই টিলির ডাক পড়েছে।"

"ও, জেলের বাইরে বুঝি অনেক লোক জমেছে?"

"অনেক।"

"তবে তুমি আমার কাছে এলে কি ক'রে—তাদের মাঝখান দিয়ে?"

"তাদের মাঝখান দিয়ে কি আর এসেছি?—অনেক ঘুরে, খিড়কি দিয়ে আমাকে ঢুকতে হয়েছে।"

"শেষটা তুমি লুকিয়ে এলে দাদা!"

"কি কর্‌ব ভাই, স্থানকাল অনুযায়ী কাজ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয় কি?—নইলে খামাখা ওদের সঙ্গে সময় নষ্ট করলে এখানে আসতে দেরী হওয়া ছাড়া অন্য কোনই লাভ হ'ত না।"

এমন সময়ে বাহিরে আবার তুমুল গর্জ্জন শোনা গেল। কর্ণেলিয়াস্ একটু কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন, তার পর বলিলেন, "ও, বুঝেছি ঐ বুঝি সেই সোরগোল! কার বিরুদ্ধে এ সব—তোমার না আমার?"

"আমাদের দু'জনেরই বিরুদ্ধে। শুনেছ তো অরেঞ্জী দল আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই এনেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই—আমরা ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্ত্তা চালিয়েছি।"

"উঃ, কি মূর্খ ওরা!" কর্ণেলিয়াস্ অস্ফুটস্বরে বলিলেন।

"হ্যাঁ, কিন্তু অভিযোগ ওরা এনেছে।"

কর্ণেলিয়াস্ আপন মনেই যেন বলিলেন, "অথচ সে কথাবার্ত্তা চালান'য় বাস্তবিকই যদি আমরা সফল হ'তাম তবে রীস্, অরসে, ওয়েসেল,—কোন যুদ্ধেই আমাদের হার হ'ত না—রাইন কেউ পার হতে পারত না—হল্যাণ্ড সত্যিসত্যি অপরাজেয় দেশ হয়ে থাক্‌ত।"

"সবই বুঝি ভাই, কিন্তু এখন ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে মার্কুইস্ ডি লুভয়ের সঙ্গে আমার যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছিল তা' যদি কারও চোখে পড়ে তবে আর আমাদের হল্যাণ্ডের বাইরে যাবার কোন উপায় থাকবে না—অরেঞ্জীদের হাতে ও চিঠি পড়া মানে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু। অথচ ঐ চিঠিই যদি নিরপেক্ষ লোকের হাতে পড়্‌ত তবে সে বুঝতে পার্‌ত হল্যাণ্ডকে আমি কতটা ভালবেসেছিলাম, হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা—হল্যাণ্ডের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি কী না করেছি!" জনের গলা ভারী হইয়া আসিল। একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "ভাল কথা, সে চিঠিগুলো তুমি ডর্ট্ থেকে হেগ্-এ আসবার সময় পুড়িয়ে ফেলে এসেছিলে তো?"

কর্ণেলিয়াস্ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"পোড়াব! যে চিঠির ছত্রে ছত্রে দেশের প্রতি তোমার প্রাণ-ঢালা ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে—যার সাহায্যে এক নিমেষে প্রমাণ ক'রে দেওয়া যায় যে হল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক হচ্ছে আমার ভাই জন্ ডি উইট্—সেই চিঠি আমি পুড়িয়ে ফেল্‌ব! কি তুমি বল্‌ছ দাদা!"

জনের কণ্ঠে এবার সুস্পষ্ট হতাশার সুর ফুটিয়া উঠিল—"পোড়াও নি? তা' হ'লে সত্যিই আমাদের বাঁচবার আর কোন আশা রইল না!"

"না, ঠিক তার উল্টো—ঐ চিঠি দিয়েই আমরা আবার বাঁচব—আবার লোকের কাছে বড় হব।"

"কি করেছ সে চিঠিগুলো?"

"সেগুলো আমি কর্ণেলিয়াস্ ভ্যান্ বার্লের কাছে রেখে এসেছি। কর্ণেলিয়াস্‌কে তুমি নিশ্চয়ই চেন—আমার ধর্ম্মছেলে—ডর্ট্-এ থাকে?"

"চিনি বই কি, ভ্যান্ বার্ল্—অত বড় পণ্ডিত অথচ একেবারে শিশুর মত—

ফুল ছাড়া আর কিছুই জানে না। তারই কাছে তুমি অমন একটা মারাত্মক চিঠি রেখে এসেছ! তার যে সর্ব্বনাশ হবে!"

"তার সর্ব্বনাশ হবে! কেন?" কর্ণেলিয়াসের স্বরে এবার বেশ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল।

"হবে—হবে; কি ক'রে তোমাকে বোঝাই? সে যদি সাহসী হয়, ও চিঠি সে কাউকে নিতে দেবে না অথচ ও নিয়ে গর্ব্ব ক'রে বেড়াবে। আর ভীরু হ'লে ওর কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। দু'ক্ষেত্রেই ওর মরণ—সেই সঙ্গে আমাদেরও। চল চল, সময় থাকতে এখনও হয়তো পালাতে পারি।"

"সাহসী কিংবা ভীরু কোনটাই সে নয়—তার অনেক ওপরে সে। আমি তাকে ভাল রকমেই চিনি। কিন্তু আসল কথা তা নয়, ও গোপনীয় চিঠি সত্যিই তার দ্বারা প্রকাশ পাবে না, কারণ সে নিজেই ওর কথা কিছু জানে না; কি রকম বা কি ধরণের দরকারী খবর ওর মধ্যে থাকতে পারে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই।"

জন্ অবাক্ হইয়া ভাইএর মুখের দিকে তাকাইলেন।

"আমি তাকে কিছুই জানতে দেই নি দাদা, শুধু বলেছি, 'এটা সাবধানে রেখ, খবর্দ্দার খুল না, আর আমার নির্দ্দেশ না পেলে কিছুতেই হাত-ছাড়া ক'র না'। আমার আদেশ সে প্রাণ গেলেও লঙ্ঘন করবে না।"

"তা হ'লে—তা' হ'লে ওটা এক্ষুণি পুড়িয়ে ফেলার জন্য তাকে খবর পাঠাতে হবে।"

"কে খবর দেবে?"

"দেবে আমার চাকর ক্রেক্—ভারী বিশ্বাসী সে। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাকে আমি সঙ্গে করে এনেছিলাম—দরজার বাইরেই সে আছে।"

"কিন্তু দাদা, অমন মহামূল্য কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলার আগে আর একবার ভেবে দেখবে না?"

"না না, ভাই, আগে বাঁচতে হবে তো? আমরা মরে গেলে ও কাগজ দিয়ে তখন লাভ? কে আমাদের স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাতে যাবে?"

"তা হ'লে তুমি বলতে চাও, ও চিঠিগুলো পেলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে?"

জন্ কথার জবাব দিলেন না শুধু জানলা দিয়া বাহিরের জনতার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দিলেন। সেখান হইতে তখনও প্রচণ্ড চীৎকার শোনা যাইতেছিল—'বিশ্বাসঘাতকদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু, তাই তাদের দিতে হবে'।—"শুনতে পাচ্ছ?"—জন্ ভাইএর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি বলছে? বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু চাই? আমরাই বুঝি বিশ্বাসঘাতক?"

"হ্যাঁ, ওরা আমাদেরই উল্লেখ করছে।"

কর্ণেলিয়াস্ কয়েক মুহূর্ত্ত নতমুখে নীরব হইয়া রহিলেন, তার পর মুখ তুলিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ডাক ক্রেক্‌কে"।

ক্রেক্ ঘরে ঢুকিলে জন্ বলিলেন, "শোন ক্রেক্, কর্ণেলিয়াস্ যা বলছে ভাল করে শুনে নাও—তোমাকে এখনই ডর্ট্ যেতে হবে।"

কর্ণেলিয়াস্ বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, মুখে বললে তো হবে না—শুধু মুখের কথায় তো ভ্যান্ বার্ল্ কিছু করবে না—আমার হাতে লেখা চিঠি চাই।"

"কিন্তু তুমি? তুমি চিঠি লিখবে কেমন করে—তোমার ঐ ভাঙ্গা, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে?"

"দেখি চেষ্টা করে, কিন্তু কাগজ পেন্সিল পাব কোথায়—তোমার কাছে আছে?"

"পেন্সিল তো একটা আছে দেখছি, কিন্তু কাগজ তো দেখছি না। আচ্ছা, এই বাইবেলটা সঙ্গে করে এনেছিলাম—এর সামনের দিকে একটা সাদা পাতা আছে, এতেই লেখা যেতে পারবে বোধ হয়। কিন্তু তোমার হাতের লেখা পড়া যাবে কি?"

"যাতে পড়া যায় সে ভাবেই লিখব—যেমন করে পারি।"

কর্ণেলিয়াস্ পেন্সিল লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আহত হাতে পেন্সিল চাপিয়া ধরিতেই সমস্ত ব্যাণ্ডেজ রক্তে লাল হইয়া গেল—টস্ টস্ করিয়া কয়েক

ফোঁটা রক্ত কাগজের উপরেও পড়িল—অসহ্য যন্ত্রণায় কর্ণেলিয়াসের মুখ নীল হইয়া গেল, কিন্তু তবু তিনি জোর করিয়া লিখিলেন :

বাবা কর্ণেলিয়াস্,

এই চিঠি পাওয়া মাত্র তোমার কাছে যে প্যাকেটটা আমি রাখিয়া আসিয়াছি তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে। পোড়াইবার আগে প্যাকেটটি খুলিও না কিংবা তার ভিতর কি আছে তাহাও দেখিবার চেষ্টা করিও না। উহাতে কি ছিল তাহা তোমার জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। শুধু মনে রাখিও, এই ধরণের জিনিষ কারও কাছে জমা থাকিলেও তার জীবনের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কাজেই প্যাকেটটি পোড়াইতে কালবিলম্ব করিও না—তা হইলে হয়তো তুমি জন্ ও কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে। আমার ভালবাসা জানিবে। এখন বিদায়। ইতি—

আগষ্ট ২০, ১৬৭২ কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্।

চিঠি লেখা শেষ হইলে জন্ সেটি লইয়া সজল চোখে তার উপর হইতে রক্তের ফোঁটাগুলি মুছিয়া ফেলিলেন, তার পর ক্রেকের হাতে সেটি দিয়া তাকে কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দিলেন। আর দিলেন নিজের বাঁশীটি; তাকে বলা হইল নীচের জনতা পার হইয়া খালের ওপারে পৌঁছিয়াই যেন সে বাঁশীটি একবার বাজায়, তা হইলেই তাঁরা বুঝিবেন সে নিরাপদে ওপারে পৌঁছিয়াছে। তখন তাঁরাও রওনা হইবার ব্যবস্থা করিবেন।

ক্রেক্ বাহির হইবার মিনিট পাঁচেক পরেই জনতার উচ্চ কলরোল ভেদ করিয়া একটা অস্পষ্ট অথচ কর্কশ বাঁশীর আওয়াজ শোনা গেল। ক্রেক্ নিরাপদেই জনতা এড়াইয়া গিয়াছে। জন্ একবার কৃতজ্ঞনয়নে উপরের দিকে চাহিলেন, তার পর কর্ণেলিয়াস্কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তবে চল কর্ণেলিয়াস্, আমরাও এবার পালাই।"

(ক্রমশঃ)

ফণী বাবুর স্বপ্ন

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ)

নাক ডাকিয়ে ফণী বাবু ঘুমান সুখে—
এমন সময় শোনেন যেন, মনের দুখে
অনেক দূরে কাঁদছে কে তা' নেইক' জানা—
বল্‌ছে শুধুই হাপুস্ চোখে না না, না না।
তা'র কাঁদনে গর্জ্জে যেন বল্‌ছে কেহ—
আমার ছেলে আমার মেয়ে—দেহ দেহ।
কাঁদন-সুরে বল্‌ছে সে জন—কোথায় টাকা ?
নইলে যে হায়, হয় না তা'দের বায়না রাখা !
সে সব আগে যোগাড় কর, তার পরেতে—
ছেলেমেয়ে তোমার আমি দেবই যেতে।
শুনবে না সে, গর্জ্জে বলে—দাও না তুমি,
আমার খোকন, আমার খুকী—আমার উমি !
ইস্কুলে যে পড়্‌বে তা'রা—শুন্‌ছ কথা ?
রয় যে চেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদন-রতা !

এম্‌নি স্বপন ফণী বাবুর মাথায় ঘোরে—
এমন সময় লাঠালাঠির শব্দ দোরে !
অনেক দূরের কান্না এল ঘরের মাঝে,
ফোঁস্‌ফোসানির শব্দ যেন বুকেই বাজে।
আলো জ্বেলেই দেখেন ব্যাপার বিষম বড়—
হুলিটা তা'র বাচ্চাগুলো ক'রে জড়
হুলোর সাথে লোম ফুলিয়ে ঝগড়া করে—
খাটের তলায় আকাশ বুঝি ফেটেই পড়ে !

বাগিয়ে লাঠি গভীর রাতে জাগার পালা
হুলোহুলির চুলোচুলির ভীষণ জ্বালা !
অবশেষে রইল হুলি বাচ্চা নিয়ে—
হুলো গেলেন গলির পাশে পাঁচীল দিয়ে।

ফণী বাবু আবার ঘুমান পাশটি ফিরে—
স্বপ্নে আবার হারিয়ে যে যান ধীরে ধীরে।

তেলো তালিষ্ট্

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

প্রসূন চক্কোত্তির নাম করিলে কাকে-কোকিলেও তোমাকে তাদের লাল দোতালা বাড়ীটা দেখাইয়া দিবে। প্রসূন চক্কোত্তি অর্থাৎ আমাদের পাড়ার তেলোদা ; বাজে কথার দোহাই দিয়া রেহাই পাইতে ওস্তাদ্ বলিয়া আমরা পাড়ার ছেলেরা তাঁকে বলি তেলো তালিষ্ট্। যে সাইকেল চালাইতে ওস্তাদ্ তাকে যদি সাইক্লিষ্ট বলা চলে তবে যে তাল মারিতে ওস্তাদ্ তাকে তালিষ্ট বলিতে বাধা কি? নবদ্বীপের কাণা রঘুনাথই বল, আর গান্ধারের পাণিনি বুড়াই বল—বাঁচিয়া থাকিলে ওঁদের কারও তরফ হইতেই এ নামকরণে যে আপত্তি উঠিত না তা আমি ঠিক বলিতে পারি। সেদিনকার কথা আজও মনে পড়ে ; ফাইনাল্ পরীক্ষার আগে সিনেমা দেখিয়া ধরা পড়িয়া ধীরু বেচারা কি মারটাই খাইল সেজমামার কাছে, অথচ কড়া অভিভাবকের প্রশ্নে মোটেই ভড়্কাইয়া না গিয়া তেলো তালিষ্ট্ সটান্ বলিয়া বসিল, "কার্ত্তিককে হেড্মাষ্টার মশাই পড়ান কিনা, তাই গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে 'কন্সাল্ট্' করে পড়তে।" ইহারই নাম তাল মারা।

এ হেন তেলোদা বার চারেক ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় ঢুঁ মারিয়া তার পর হঠাৎ একদিন সাহিত্যিক হইয়া বসিলেন। পাড়ায় খবর রটিতে লাগিল, বড় বড় কবি,

ঔপন্যাসিক, সমালোচক—সকলের সঙ্গেই নাকি তাঁর একেবারে অভেদাত্মা! কারো সঙ্গে তিনি কাব্যসাগর মন্থন করিয়া খাঁটি মাখন তুলিতেছেন, কারো সঙ্গে তিনি সাহিত্য-কলার ছোবড়া ছাড়াইয়া আসল বস্তুটির দিকে হাত বাড়াইতেছেন, কারো সঙ্গে বা তিনি নাটকের প্রাণ-স্পন্দন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে মেডিকেল কলেজে যাতায়াত করিতেছেন—এই ধরণের কত বড় বড সব কথা যা আমার ছোট্ট মস্তিষ্কটুকুর মধ্যে ভাল করিয়া ঢুকিতেই পারে না। একদিন সিনেমা হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ তেলোদার বক্তৃতা সুরু হইল, "জানিস, অপরাজেয় কথা-শিল্পী বক্কেশ্বর বাগ আমার প্রাণের বন্ধু! কি করে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল জিজ্ঞাসা কর না ঐ হেবোকেই"—তেলোদা তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া আমাকে দেখাইয়া দিলেন—"আমি আর ঐ হেবো যাচ্ছিলাম দিল্লী, আর আমাদের কামরায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ গাল্পিক বক্কেশ্বর বাবু। আর্ট নিয়ে এম্নি তর্ক করলাম ভদ্র-লোকের সঙ্গে! তার পর কুতুব মিনারে গিয়ে সেদিনকার সেই তর্ক তোর মনে আছে রে হেবো?" আমি বাস্তবিকই বিপদে পড়িলাম, কেননা কুতুব মিনার আমি দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সে ছবিতে। আর সত্যিকারের দিল্লীর সঙ্গেও আমার পরিচয় শুধু ইতিহাসের বইখানার ভিতর দিয়াই।

ধীরু বেচারা কি মারটাই খাইল

কিন্তু তেলোদা বড়ই জব্দ হইয়া গেলেন কানাইয়ের কাছে। সে বেরসিক ছোঁড়া সন-তারিখের অঙ্ক কষিয়া একেবারে অকাট্য ভাবে প্রমাণ করিয়া দিল যে ও-দিন ও-সময়টাতে তেলোদা মোটেই সোৎসাহে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইতে-

ছিলেন না, যাইতেছিলেন প্রমোশন না পাইয়া নিতান্ত নিরুৎসাহে ইস্কুল হইতে বাড়ীতে, এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া যে বস্তুটির সাক্ষাৎ তিনি পান সেটি দিল্লীর কুতুব মিনার নয়, ক্রুদ্ধ অভিভাবকের রক্তচক্ষু। অতএব সিদ্ধান্ত ?—বক্কেশ্বর বাগের সঙ্গে তেলোদার পরিচয় কস্মিন্ কালেও হয় নাই।

'হাতে-নাতে' ধরা পড়িয়া গিয়া তেলোদার বড়ই অভিমান হইল—নাঃ, বক্কেশ্বর বাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে এটি প্রমাণ না করিতে পারিলে সম্মান আর তাঁর কিছুতেই বজায় থাকে না। প্রমাণ করিতেই হইবে। কিন্তু কি ভাবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষটায় তিনি একদিন একখানি চিঠি লিখিয়া বক্কেশ্বর বাগকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন। সত্যিকার আলাপ তো আর নাই, বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করিতে তাই বাধ-বাধ ঠেকিল, চিঠিতেই কাজ সারিলেন।

যথা সময়ে চিঠির উত্তর আসিল, বক্কেশ্বর বাগ লিখিয়াছেন—

"স্নেহাস্পদেষু,

আপনার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া খুসী হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার যাওয়ার একটু প্রতিবন্ধক আছে। আমার স্ত্রী পীড়িত, তিনি বর্ত্তমানে পুরীতে আছেন, ছেলেপেলেরা আমারই কাছে। মুস্কিল এই যে আমার ছোট ছেলেটি এ অবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারে না, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। বড় ছেলেটির আবার সর্ব্বক্ষণ তার ছোট ভাইএর কাছে থাকা চাই, এমনি প্রাণের টান। ওদিকে আবার বড় ছেলেকে ছাড়িয়া মেজ ছেলে একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারে না, আবার মেজ ছেলের অদর্শন সেজ ছেলের পক্ষে অসহ্য। অতএব সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আশা করি মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না—ইতি"

চিঠি পাইয়া তেলোদা যেন হাওয়ায় ভাসিতে লাগিলেন—স্বয়ং বক্কেশ্বর বাগের স্বহস্তলিখিত চিঠি—যে হাতে তিনি অপরাজেয় কথা-সাহিত্য-রচনা করেন সেই হাতেরই চিঠি! তৎক্ষণাৎ তিনি দ্বিতীয়বার পত্রাঘাত করিলেন—তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বক্কেশ্বর বাবু যেন আগামী সোমবার বেলা সাড়ে পাঁচটায় তাঁর সব কয়টি পুত্রকেই সঙ্গে লইয়া তেলোদার 'গরীবখানা'টিকে ধন্য করিতে আসেন। না আসিলে

তাঁর এই অকৃত্রিম ভক্ত......ইত্যাদি। এইবার পত্রোত্তর আসিল সম্মতিসূচক, অর্থাৎ বক্কেশ্বর বাবু ঐ দিন ঐ সময় বাস্তবিকই চারিপুত্র সমভিব্যাহারে তেলোদার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিবেন। ব্যস্, তেলোদাকে আর পায় কে! হাতের কাছে একটি ঢোল থাকিলে বোধ হয় তিনি সেটিকে পিটাইয়া রাজ্যশুদ্ধ লোককেই জানাইয়া দিতেন যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক বক্কেশ্বর বাগ তাঁর ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সেটির যখন অভাব তখন নিজেই তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়া সুসংবাদটা প্রচার করিয়া আসিলেন, এবং এ কথাও বলিতে ভুলিলেন না যে অত বড় সাহিত্যিক যখন তাদেরই পাড়ায় আসিতেছেন তখন সকলেরই উচিত

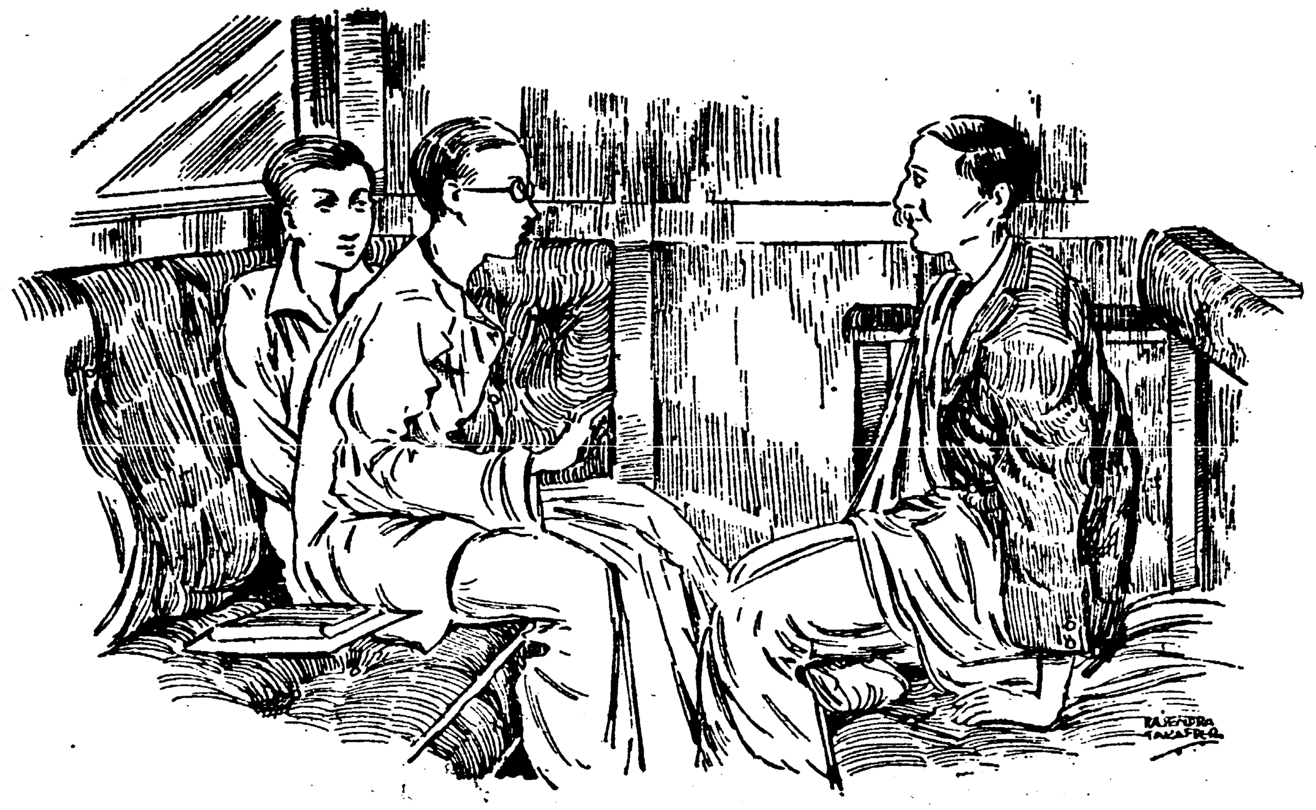

আর্ট্ নিয়ে এমনি তর্ক করলাম...

হইবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করা। তার পর কানাইয়ের কান ধরিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "কিরে, বক্কেশ্বর বাবুকে বলে চিনি না!"

বোকার মত ফজফজ করিয়া হাসিতে হাসিতে কানাই বলিল, 'খাবার নাম শুনলে তো সকলেই—'

তেলোদা ফাটিয়া পড়িলেন, "কি! অত বড় লেখকের মর্ম্ম তুই কি বুঝবি

রে মর্কট? বুঝবি, বুঝবি যখন সময় আসবে।" তার পর সকলের দিকে ফিরিয়া থিয়েটারি ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন, "ওরে জীবনে বাজে কথা বলি নি; বলি নি তোদের যে বক্কেশ্বর বাবু আমার প্রাণের বন্ধু? কিন্তু কানাইয়ের ধাপ্পায় তোরা তো আমাকে উড়িয়েই দিলি, এখন দেখ্ চিঠি।"

তেলোদা বক্কেশ্বর বাবুর চিঠি বাহির করিয়া দেখাইলেন। ভুঁদো অনর্থক গুষ্টিশুদ্ধ অতগুলি লোককে খাওয়াইবার বিরুদ্ধে কি একটা যুক্তি দেখাইতে যাইতেছিল কিন্তু তেলোদার মুখের পানে চাহিয়া কথাটা আর শেষ করিতে সাহস করিল না।

* * *

সোমবার। বেলা পাঁচটা। তেলোদা এরই মধ্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। টেবিল সাজাইয়া, চাদর যোগাড় করিয়া, চায়ের জল চড়াইয়া এক কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলেন তেলোদা। অন্যান্য বন্ধুরা এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, কিন্তু পৌঁছিলেই বোধ হয় ভাল হইত, কেননা তাদের সম্মুখে বক্কেশ্বর বাবুকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিয়া তেলোদা দেখাইতে পারিতেন কি রকম অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনি আমাদের তেলোদার।

হঠাৎ ভীষণ জোরে কড়া নড়িয়া উঠিল। তেলোদা সলম্ফে ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন একপাল ছেলে লইয়া তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক ভদ্রলোক। চার জন ছেলের আসিবার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেল সাত জন ছেলে আসিয়াছে; সব রকম বয়সের ছেলে আছে, যথা, এগারো, দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ।

দরজা খুলিতেই ভদ্রলোক বলিলেন, "আমি বক্কে—"

তেলোদা একেবারে গদগদ হইয়া উঠিলেন, ভদ্রলোককে আর কথা শেষ করিতে দিলেন না, সাষ্টাঙ্গে গড় করিলেন। তেলোদার আজ আর জাত্যভিমান নাই।

—"আ হা হাঃ, করেন কি, করেন কি! আমি—"

"বিলক্ষণ! গুণিজনের পায়ের ধূলো নেব এতে আর বামুন কায়েত কি,

গান্ধীজীর পায়ের ধুলো তো উঁচু জাতের লোকদের নিতে দেখেছি। আসুন ভেতরে আসুন, এস খোকারা!"

"আমি বল্‌ছিলাম আগে....."

আনন্দের আতিশয্যে কাঁপিতে কাঁপিতে ভদ্রলোককে বাধা দিয়া তেলোদা বলিলেন, "খাবার সব ঠিক, আগে খেতে বসুন, কথা পরে হবে। ব'স খোকারা, খাও, এ তোমাদের নিজের বাড়ী।" তেলোদা সকলকে এক রকম টানিয়াই ভিতরে লইয়া গেলেন। খাইতে বসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "খাওয়ার আগে..."

"পরে হবে, আপনার মত সাহিত্যিক যে কষ্ট ক'রে দয়া করে আমার বাড়ীতে এসেছেন, সেই আমার সৌভাগ্য।"

"কিন্তু খেতে যে..."

"উঁহুঁ, সে হবে না, সব খেতে হবে, ভারী তো সামান্য আয়োজন।"

ছেলেরা নিমেষে কচুরীর পর কচুরী, চপের পর চপ্, রসগোল্লার পর রসগোল্লা উড়াইতে লাগিল। এ দৃশ্য দেখার পর তাদের পিতৃদেবেরও বোধ করি আহারের অনিচ্ছা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল, কোন ওজর আপত্তিই টিঁকিবে না দেখিয়া তিনিও অবশেষে আসরে নামিলেন—এবং চুপি চুপি বলিয়া রাখি, ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়াই রসগোল্লা হননে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। তেলোদা তখন সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করিতেছেন—আর কানাই 'ষ্টুপিড্'টা একবার আসিলে হয়, ছোঁড়ার থোঁতা মুখ ভোঁতা হইয়া যাইবে—বলে কিনা বক্কেশ্বর বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব নাই!

"আরও সন্দেশ—" তাড়াতাড়ি তেলোদা সন্দেশ আনিয়া খোকাদের পাতে দিলেন। খোকারা আবার বলিল, "আরও সিঙাড়া, আরও কচুরী—" খুসী হইয়া তেলোদা পারিবেষণ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ দলবলসহ কানাই আসিয়া উপস্থিত। "কোথায় রে তোর বক্কে—" তেলোদা চোখের ইসারায় কানাইকে থামিতে বলিয়া ভদ্রলোকের দিকে গোপনে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। কানাই বলিল, "সে কিরে! আমি যে খবর পেলাম

হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর অসুখ বেড়ে পড়াতে বক্কেশ্বর বাবু হঠাৎ সপরিবারে আজ সকালেই পুরী চলে গেছেন !"

একটি কাট্‌লেট্‌ শেষ করিতে করিতে ভদ্রলোক বলিলেন, "আমিও তো সেই কথাটাই বলতে এসেছিলাম কিন্তু উনি যে নাছোড়বান্দা, বলেন, আগে না খেয়ে নিলে কোন কথাই শুনবেন না। তাই তো খেতে…"

সকলে সশব্দে হাসিয়া উঠিল, তেলোদার মুখের সূর্য্যকিরণ এক মুহূর্ত্তে কোথায় উবিয়া গেল, সেখানে দেখা দিল অমাবস্যার পুঞ্জীভূত অন্ধকার। তাঁর মুখ হইতে কোন মতে বাহির হইল, "কিন্তু ছেলেরা ?"

"ওরা আমারই ছেলে, বড় ভাল সব, ওদের নিয়ে রোজ বেড়াতে বার হই কিনা ! কাল বক্কেশ্বর বাবু আপনাকে খবরটা দিতে—ও কি খোকা উঠ্‌ছিস্‌ কেন, সন্দেশ ক'খানা খেয়ে নে. বড় ভাল ছেলে ও জানেন মশাই…"

আর জানেন মশাই, তেলোদা সেই যে অতিথি-সৎকারের গুরুতর ভার আমাদের কাঁধে চাপাইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন, রাত দশটার আগে তাঁর আর টিকিটিরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।

অষ্ট্রেলিয়া

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

তোমাদের মধ্যে যারা একটু মন দিয়া ভূগোল পড়িয়াছ তাদের নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে হইবে না যে পৃথিবীর ভিতর সব চেয়ে বড় দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়া। বড়ও বড় যেমন-তেমন বড় নয়,—গোটা ইয়োরোপটার প্রায় কাছাকাছি। ইয়োরোপের আয়তন ৩৯ লক্ষ বর্গ মাইল, অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল। ইংল্যাণ্ড্‌, ওয়েল্‌স, স্কট্‌ল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ড্‌ একত্র যুড়িলে যত বড় হয় অষ্ট্রেলিয়া প্রায় তার পঁচিশ গুণ। আমাদের বিশাল ভারতবর্ষকে পর্য্যন্ত তার কাছে হার মানিতে হয়, বঙ্গদেশের তো কা কথা! অথচ এত বড় দ্বীপটায় লোকের বাস অতি সামান্য—মোটামুটি ৫২ লক্ষ ধরা যাইতে পারে। আমাদের এক ময়মনসিং জেলাতেই বোধ হয়

ও ক'টি লোক রহিয়াছে। লোকসংখ্যা যে কেন এত কম তা তোমরা এ প্রবন্ধটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে।

অষ্ট্রেলিয়াকে আমরা বরাবরই দ্বীপ দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত বলেন এমন এক সময় ছিল যখন অষ্ট্রেলিয়াকে দ্বীপ বলা চলিত না, কেননা ডাঙ্গার পথেই তখন এশিয়ার সঙ্গে এ জায়গাটির সংযোগ ছিল। তার পর সমুদ্রের জল ফুলিয়া উঠিল, বহু ডাঙ্গা জলের নীচে ভাসিয়া তলাইয়া গেল, অষ্ট্রেলিয়াও পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল—পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর, পূবে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে টরেস প্রণালী ও আরাফুরা সাগর—এক কথায় দ্বীপ বলিতে যা বুঝায় তাই—"চতুর্দ্দিকে জল, মধ্যভাগে স্থল"। এ সব অবশ্য পৃথিবীর অতি ছেলেবেলাকার কথা, সমুদ্রগুলির নামকরণ হইয়াছে এ সব ঘটনা ঘটিবার অনেক—অনেক পরে।

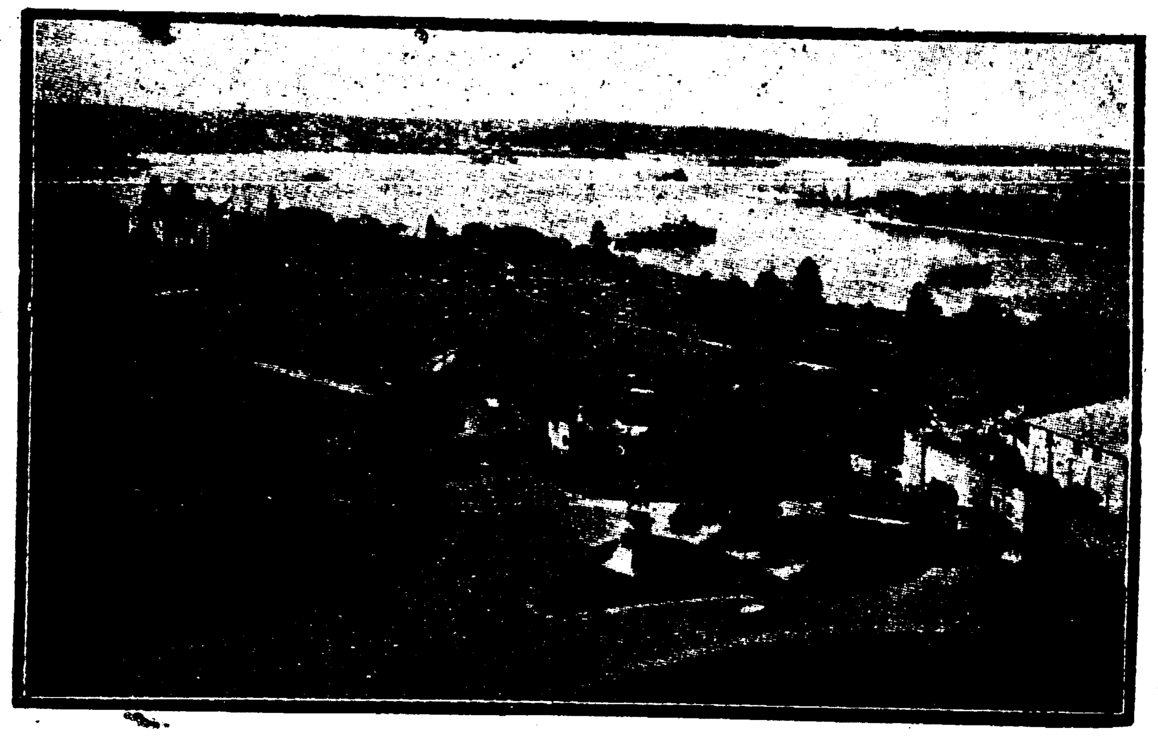

আধুনিক অষ্ট্রেলিয়ার একটি দৃশ্য

সেই যে পৃথিবীর ছেলেবেলায় অষ্ট্রেলিয়া একবার এশিয়া হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়িল তার পর আর বহু দিন জায়গাটা সভ্য দুনিয়ার চোখে পড়ে নাই; প্রথম পড়িল ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে। স্পেন দেশের একদল নাবিক ভারত মহাসাগরের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম পারে আসিয়া উপস্থিত। অষ্ট্রেলিয়ার এই দিকটা অতি কদর্য্য; বন-জঙ্গল এবং পাহাড়ে ভরা, আর আব্‌হাওয়াও শরীরের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। কাজেই ভিতরে ঢুকিয়া বেশী দূর আগাইতে তাঁদের আর কোন রকমই আগ্রহ রহিল না, 'পাত-তাড়ি' গুটাইয়া তাঁরা সরিয়া পড়িলেন। তার পর আসিলেন একদল ওলন্দাজ নাবিক; পার ধরিয়া ধরিয়া তাঁরা অনেকটা জায়গা ঘুরিয়া দেখিলেন বটে, কিন্তু জায়গাটা তাঁদের চোখে বড় সুবিধার মনে হইল না। তাঁদের নিজেদের দেশের নাম হল্যাণ্ড্‌, কাজেই এই নতুন দেশের নাম "নিউ হল্যাণ্ড" রাখিয়া তাঁরাও ফিরিয়া আসিলেন। তার পর আসিলেন একজন ইংরাজ নাবিক, নাম ডাম্পিয়ার। ডাম্পিয়ার প্রথম

জীবনে ছিলেন একটি পাকা জলদস্যু, তার পর সে সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া ভদ্রলোকের মত জাহাজে চাকরী নেন। এ লোকটির নাম পৃথিবীতে অনেক দিন থাকিয়া যাইবে কেননা ইনিই "রবিন্সন ক্রুসো"কে দ্বীপ হইতে উদ্ধার করিয়া বাড়ী আনিয়াছিলেন। রবিন্সন্ ক্রুসোর গল্পটিকে তোমরা যেন একেবারে আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দিও না; অবশ্য ও-নামের-নয়, তবে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক নামে এক নাবিককে বাস্তবিকই এক জনমানবশূন্য দ্বীপে ওইভাবে অনেক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। যাক্ সে কথা, ১৬৯৯ সনে ডাম্পিয়ার তো আসিয়া উপস্থিত হইলেন অষ্ট্রেলিয়ায়—উত্তর-পশ্চিম উপকূলটিতে। এ জায়গাটাও পশ্চিম উপকূলের মতই বিশ্রী,—ফলে ডাম্পিয়ারও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন।

এই ভাবে বিশাল অষ্ট্রেলিয়া ইয়োরোপীয়ান্‌দের নজরে পড়িল বটে, কিন্তু কাজে আসিল না। এটা যে একটা দ্বীপ সে সম্বন্ধেও লোকের ধারণা ছিল না। প্রায় বছর সত্তর কাটিয়া গেল, তার পর আসিল এক নতুন যুগ। ইংরাজ নাবিক ক্যাপ্‌টেন কুকের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া ১৭৭০ সনে তিনি নিউজিল্যাণ্ড্ দ্বীপটি আবিষ্কার করিলেন, তার পরই আসিয়া পড়িলেন অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব উপকূলে—পূর্ব্ব-দক্ষিণ উপকূলে বলিলেই বোধ হয় ভাল হইবে। এর আগে যে সমস্ত নাবিকেরা আসিয়াছিলেন তাঁরা নামিয়াছিলেন পশ্চিম দিকে, কুক নামিলেন ঠিক তার বিপরীত দিকে। মাটীতে পা ফেলিতেই তিনি মোহিত হইয়া গেলেন; কি সুন্দর দেশ! চারিদিকে অপর্য্যাপ্ত গাছপালা, লতা-পাতা—যেন সবুজের রাজত্ব! সমস্ত জায়গাটাই তখন তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজার নামে অধিকার করিয়া নিলেন—নাম দিলেন নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌স্।

সে সময়ে ইংল্যাণ্ডের আইন-কানুন বড় কড়া রকমের ছিল; সামান্য কারণেই ফাঁসি হইত, সামান্য কারণেই জেলে যাইতে হইত। এখন বিলাতের অপরাধীদের দেশেই রাখা হয়, কিন্তু সে সময় মাঝে মাঝে তাদের বিদেশেও চালান দেওয়া হইত—সাধারণতঃ আমেরিকায়। কিন্তু ১৭৭৬ সনে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া গেল। তখন আর সেখানে অপরাধী চালান দেওয়া চলে না। নজর পড়িল এইবার অষ্ট্রেলিয়ার উপর। জাহাজ বোঝাই করিয়া অপরাধীদের আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌এ—আজকাল যেখানে চমৎকার সীডনি সহর সেইখানে। বেচারারা তো নামিল আসিয়া, কিন্তু খায় কি? এদিকে যে জায়গাটীতে তাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে সেটুকুও বিশেষ বড় নয়, পেছনে প্রকাণ্ড পাহাড় ব্লু মাউণ্টেন। সেটী পার হইয়া ওধারে যাইতেও ভরসা হয় না—ওদিকে কি আছে কে জানে! শেষে কিন্তু এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল যে পাহাড় আর না ডিঙ্গাইলেই নয়। ব্যস্, সেই হইতে সুরু হইল অষ্ট্রেলিয়ার আসল আবিষ্কারের চেষ্টা—যেখানে যে অঞ্চল আছে ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া বাহির করা। কি দারুণ বিপজ্জনক

যে এই কাজ আর কি অলৌকিক ধৈর্য্য যে অধিবাসীরা এ কাজে দেখাইয়াছে তা বাস্তবিকই একটা বিস্ময়ের বিষয়—কেননা এ দ্বীপটির চার ভাগের তিন ভাগ জায়গা যুড়িয়াই প্রকাণ্ড একটি মালভূমি, আর তার অধিকাংশ স্থানেই ধূধূ করিতেছে মরুভূমি। তবে মানুষের বসবাসের উপযোগী জায়গা যা আছে তাও কিছু কম নয়; পূবে এবং দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূল দিয়া যে লম্বা জমির ফালি চলিয়া গেছে, বাসের পক্ষে সেই জায়গাটিই প্রশস্ত। আর দক্ষিণে যে টাস্‌মানিয়া নামে ছোট্ট দ্বীপটুকু আছে সেটিও চমৎকার। এই সব জায়গাতেই ধীরে ধীরে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিলাত হইতে দলে দলে নতুন লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল; এরা অবশ্য জেলখানার বন্দী নয়, স্বদেশে কাজকর্ম্মের সুবিধা নাই দেখিয়া কপাল ঠুকিয়া নতুন দেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এই ধরণের লোকই বেশীর ভাগ।

সীডনির বন্দর; এখানেই প্রথম অপরাধীদের চালান দেওয়া হয়। যে পোলটিকে তৈরী হইতে দেখিতেছ এটি পৃথিবীর একটী বিখ্যাত জিনিষ।

অনেক ঔপনিবেশিক আসিবার সময় ভেড়া সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার মাটীর গুণে ভেড়ার দল খাসা বাড়িতে লাগিল, তাদের 'পুরুষ্টু' গা গুলি সুন্দর লোমে ভরিয়া উঠিল। আর তা নাই বা হইবে কেন, স্বচ্ছন্দে চরিয়া খাইবার মত নরম নরম ঘাসে ভরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের তো আর অভাব নাই! দেখিতে দেখিতে ভেড়ার ব্যবসা অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইল—আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাত এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ান্‌দের হঠাইতে পারে নাই। লাখে লাখে, কাতারে কাতারে ভেড়া সেখানে নিয়ত চরিয়া বেড়াইতেছে। বাজারে যত পশম বা উল দেখিতে পাও তার অধিকাংশের যোগান দেয় এরাই। শুধু কি পশম? রাশি রাশি

ভেড়ার মাংস অষ্টপ্রহর উদরস্থ করিয়াও তারা শেষ করিতে পারিতেছে না, ইয়োরোপ-আমেরিকা নানান্ দেশে প্রতিনিয়ত চালান পাঠাইতেছে। পাঠাইতেও আজকাল আর কোন হাঙ্গামা নাই ; জাহাজে জাহাজে 'ঠাণ্ডা-ঘর' আছে, মাল নিয়া সেখানে মজুত করিতে পারিলেই হইল। দশ দিন বল, বিশ দিন বল, এক মাস বল, এতটুকু পচিবার আশঙ্কা নাই।

ভেড়ার 'চাষে'র সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিকেরা আরও আরম্ভ করিয়া দিল গমের চাষ, নানা রকম ফল-ফলারির চাষ। লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি পড়িয়া আছে প্রচুর, উর্ব্বরতা-শক্তিও সে জমির কিছু কম নয়। তার উপর আব্‌হাওয়াও যেমন সুন্দর, লোকেদের মনের উৎসাহও তেমনি অফুরন্ত। দেখিতে দেখিতে বাগবাগিচায় দেশ ভরিয়া উঠিল। আজ কৃষিসম্পদে অষ্ট্রেলিয়া জগদ্বিখ্যাত। কবির ভাষায় বলিতে গেলে সে আজ "দেশ-বিদেশে বিতরিছে অন্ন"; অবশ্য অন্ন মানে এখানে গম। বাংলা দেশের চটকলগুলি হইতে অষ্ট্রেলিয়া আজ বহু টাকার বস্তা কিনিতেছে,—দেশ-বিদেশে গম পাঠাইবার জন্য। তা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার আপেল, আঙ্গুর, নাসপাতি, কমলা লেবু, পিচ্‌ফল প্রভৃতিরও বাজারে কম কদর নয়।

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কোন এক ব্যাপারে লোকের মনে ধারণা জন্মিল নিশ্চয়ই মেলবোর্ণের আশেপাশে কোথাও সোনা আছে। হুলুস্থূল কাণ্ড! খোঁজ খোঁজ! খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল মেলবোর্ণেরই কিছু উত্তরে নদীর ধার দিয়া সোনার খনি, পাহাড়ের ঢালুর নীচে সোনার খনি। আর কি রক্ষা আছে? পৃথিবীর নানান্ জায়গা হইতে দলে দলে লোক পাগলের মত সোনা কুড়াইতে অষ্ট্রেলিয়ার পানে ছুটিয়া আসিল। চার্লি চ্যাপলিনের "গোল্ড্ রাস" নামে ছবিখানা দেখিয়াছ কি? অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার আর কি! কোটি কোটি টাকার সোনা উঠিতে লাগিল। মেলবোর্ণ ছিল ছোট্ট একটু জায়গা, দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপিয়া হইয়া দাঁড়াইল প্রকাণ্ড জাঁকাল রকমের এক সহর। এখন মেলবোর্ণের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ; সাতটি পাহাড়ের উপর তৈরী মেলবোর্ণের শোভা আজ জগদ্বিখ্যাত।

বছর কুড়ি পরে আবার এক কাণ্ড; এবার সোনা নয় রূপা। সাউথ্ অষ্ট্রেলিয়ার ব্রোক্‌ন্ হিল্ নামে জায়গায় রূপার খনি পাওয়া গেল—ফের হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। আবার বহু টাকার রূপা উঠিল, আবার একটা সহর গজাইয়া উঠিল। ক্রমে দেখা গেল, কেবল সোনা, রূপা নয়, তামা, টিন এবং কয়লার খনিও অষ্ট্রেলিয়ায় ঢের রহিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার লোক একেবারে "লাল" হইয়া যাইবার উপক্রম! আজকাল ভেড়ার ব্যবসা, চাষ-বাস এবং খনির ব্যবসা—তিনটাই অষ্ট্রেলিয়ায় চলিতেছে, তবে ভেড়ার ব্যবসাই অবশ্য প্রধান।

অষ্ট্রেলিয়ায় আজ যে এত শোভা-সমৃদ্ধি, তা অবশ্য পুরামাত্রাতেই সম্ভব হইয়াছে ঔপনিবেশিকদের চেষ্টার ফলে। তাঁরা এখানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করার আগেও এখানে এক জাতের

লোক বাস করিত বটে, তবে তারা আদিম যুগের সেই অসভ্য মানুষ! ঔপনিবেশিকেরা আসিয়া দেখেন এরা ভাল করিয়া কাপড় পর্য্যন্ত পরিতে জানে না, গাছের বাকল বা ঐ ধরণের যা হোক একটা কিছু কোন রকমে কোমরে ঝুলাইয়া রাখে মাত্র। লোহা কি জিনিষ তা তারা চক্ষেও দেখে নাই, তবে আগুন জ্বালাইবার কৌশলটা শিখিয়াছে বটে। চাষ-বাস তাদের মগজে ঢোকে না, স্থায়ী ঘর-বাড়ী বলিয়া কোন বস্তুও তাদের নাই। জন্তু জানোয়ার মার, আর তাদের মাংসে পেট চালাও—এই সাদা কথাটাই শুধু তারা জানিয়া রাখিয়াছে। জন্তু-জানোয়ার নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িলে, গুগ্‌লি, টিকটিকি, পোকা, মাকড়—কিছুতেই তাদের আপত্তি নাই। পশু-শিকারে তীরধনুকের ব্যবহার তারা জানিত না; তাদের অস্ত্র লম্বা লম্বা বল্লম আর এক রকমের জাল। বল্লমের মাথায় অবশ্য লোহার ফলা থাকিত না, থাকিত

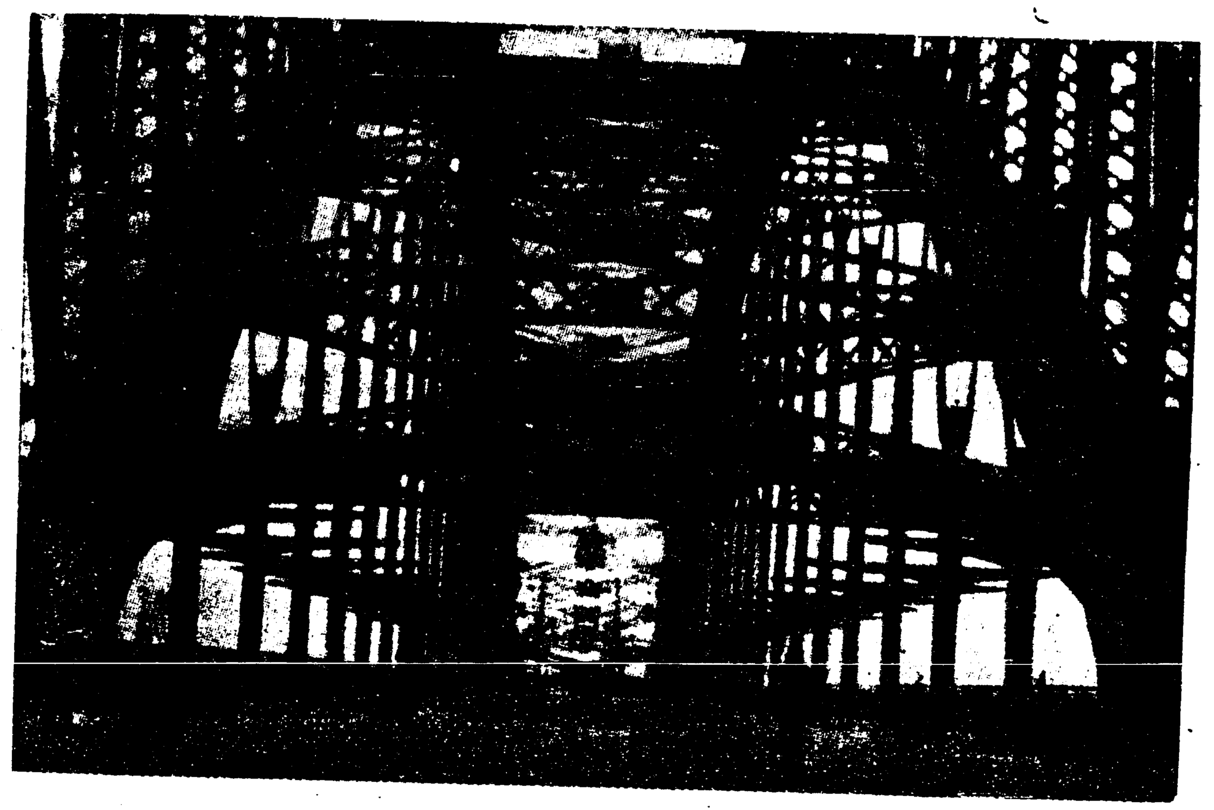

সীডনি বন্দরের পোল—তৈরী হওয়ার পরের অবস্থা। সীডনি-বন্দরের শোভা অতুলনীয়।

ধারাল পাথরের টুকরা। তবে এ লোকগুলির যে বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই নাই এ কথা মনে করিলে কিন্তু ভুল করা হইবে—শিকারের সময় নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের ডাকের অনুকরণ করিয়া তাদের ধাপ্পা দিয়া একেবারে নিজেদের খপ্পরে আনিয়া ফেলে। তা ছাড়া এদের একটা অস্ত্র আছে যেটা বাস্তবিকই অদ্ভুত। অস্ত্রটির নাম বুমেরিং—একখানা বাঁকান কাঠের ফলা, সাম্‌নের দিকে ছুড়িয়া মারিলে আপনা হইতেই আবার পেছনের দিকে ফিরিয়া আসে। তৈরী করিতে বুদ্ধির দরকার বই কি!

অষ্ট্রেলিয়ান্‌রা এই আদিম অধিবাসীদের নাম দিয়াছে "Black fellow" বা "কালা-আদ্‌মি"। আসলে কিন্তু এদের গায়ের রং ঠিক কালো নয়, তামাটে রংয়ের। নিগ্রোদের সঙ্গে এদের চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তাদের মত এদের চুলও পশম জাতের, নাক, ঠিক অতটা না হইলেও অনেকটা ওই রকমেরই থাঁদা, নীচের ঠোঁটও বেশ পুরু পুরু। এদের মধ্যে

আবার নানান্ রকমের দল আছে, প্রত্যেক দলের বাসস্থান আলাদা আলাদা ; ভাষাও কিছুটা আলাদা রকমের। প্রায় প্রত্যেক দলেই মোড়ল বা পঞ্চায়েৎরা সর্দ্দারি করে। বয়স বাড়িলে এদের গায়ে নানা রকমের দাগ কাটিয়া দেওয়া হয় ; এটা নাকি খুব পৌরুষের পরিচায়ক। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন রকমের ধারণা আছে। এদের মধ্যেও কোন কোন জাতির ধারণা, বয়স বাড়িবার পর উপরের মাড়ির দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই সৌন্দর্য্য একেবারে উপচাইয়া পড়িবে। ধর্ম্ম বলিয়া এদের বিশেষ কিছুই নাই। তাদের বিশ্বাস এক বিরাট্ শক্তিশালী বৃদ্ধ হাতের উপর মাথা রাখিয়া বালির মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁর নাম বুদ্দাই। একদিন তাঁর এই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে, আর অমনই তিনি দুনিয়ার যেখানে যা কিছু আছে সমস্তই পেটের মধ্যে পূরিবেন। অষ্ট্রেলিয়ায় ব্ল্যাক্ ফেলোদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তারা মুক্ত প্রকৃতির সন্তান, সভ্যতার ছোঁয়াচ্ নাকি তাদের ধাতে সয় না। সারা দ্বীপটায় আজকাল এক লক্ষের বেশী "কালা-আদ্‌মি" আছে কিনা সন্দেহ।

ঔপনিবেশিকেরা এদেশে আসিয়া কেবল "ব্ল্যাক্ ফেলো"দেরই দেখিতে পান নাই, এমন কতগুলি জন্তু-জানোয়ারের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন যাদের পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। এগুলির বিশেষত্ব এই যে এদের শরীরের সাম্‌নে একটা করিয়া থলি থাকে, আর সেই থলিতে করিয়া বাচ্চাদের তারা সঙ্গে নিয়া বেড়ায়। ইরাজীতে এদের বলা হয় pouched animal (পাউচ্ মানে থলি)। এই থলিওয়ালা জানোয়ারের মধ্যে আকারে সব চাইতে বড় হইতেছে ক্যাঙ্গারু—প্রায় পাঁচ ফুট। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তোমরা নিশ্চয়ই ক্যাঙ্গারু দেখিয়াছ। এদের সাম্‌নের পা দু'টি অত্যন্ত ছোট ছোট, কিন্তু পেছনের পা দু'টি যেমনি বড় তেম্‌নি জোরাল। এদের সাহায্যে ক্যাঙ্গারুরা এক এক লাফে কুড়ি পঁচিশ হাত ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারে। এমনও দেখা গিয়াছে যে ঘোড়ায় চড়িয়া লোকে হয়তো ক্যাঙ্গারু শিকারে গিয়াছে, ক্যাঙ্গারু মশাই দিব্যি 'কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড' করিয়া ঘোড়া এবং সওয়ার দু'জনারই মাথা টপকাইয়া চলিয়া গেলেন। কখনও কখনও এরা আবার শুধু লেজের উপর ভর রাখিয়া সোজা মাটীর উপর খাড়া অবস্থায় দাঁড়ায়। ক্যাঙ্গারু ছাড়া অষ্ট্রেলিয়ায় থলিওয়ালা হায়েনা আছে, থলিওয়ালা ভালুক আছে, থলিওয়ালা ইঁদুর আছে। সব চেয়ে ছোট জানোয়ার উড়ুক্কু ইঁদুর—একটা পিলের বাক্সে অনায়াসে তাকে পূরিয়া রাখা চলে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য জীব বলিতে হইবে হাঁসঠুঁটোকে (duck-bill)। এরা পাখীও নয়, সরীসৃপও নয়, একেবারে খাঁটি স্তন্যপায়ী জন্তু ; কিন্তু হইলে কি হইবে, ঠোঁট দুইটি ঠিক হাঁসের মত, পাও অনেকটা সেই রকম, অর্থাৎ সাঁতার কাটার উপযোগী। স্তন্যপায়ী জীবেরা ডিম পাড়ে না, কিন্তু হাঁসঠুঁটোর বেলায় সে নিয়মও খাটে না, সরীসৃপের মত ইনি আবার ডিমও পাড়েন। সমস্ত গা'টি খরগোসের মত কোমল লোমে ভর্ত্তি ; আর জল বল, স্থল বল, দু' জায়গাতেই

অবাধ গতি। এমু নামে এখানে এক পাখী আছেন, তিনি আবার উড়িতে পারেন না, দৌড়ান—উটপাখীর মত।

বদমেজাজী জীবের নাম করিতে হইলে সব চেয়ে প্রথম নাম করিতে হয় টাস্‌মেনিয়ার 'সয়তান' এবং টাস্‌মেনিয়ার নেকড়ের। এই 'সয়তান'টি দেখিতে অনেকটা ব্যাজারের মত, কিন্তু ব্যাজারকে না ঘাঁটাইলে সে নিরীহ প্রাণীরই সামিল, কিন্তু তার এই 'আত্মীয়'টির ক্রোধ যেন লাগিয়াই আছে। শরীরের তুলনায় বলবিক্রম এবং যুদ্ধ করার ক্ষমতাও এর অসীম, কাজেই সকলেই একে সমীহ করিয়া দূরে রাখিয়াই চলে। আর নেকড়ের তো নামেই পরিচয়!

এদের মত আর একটি জানোয়ারকেও অষ্ট্রেলিয়ান্‌রা ভারী অপছন্দ করে—ডিঙ্গো নামে এক জাতের বুনো কুকুরকে। এই দুরন্ত কুকুরের হাত হইতে ভেড়ার পাল রক্ষা করিতে গিয়া চাষীরা একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া যায়। শোনা যায় আগে নাকি অষ্ট্রেলিয়ায় ডিঙ্গো ছিল না, ঔপনিবেশিকেরাই এই কুকুর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। কথাটা কতদূর সত্য বলা শক্ত, কেননা অষ্ট্রেলিয়ার অনেক জায়গায় এমন সব ডিঙ্গোর হাড় পাওয়া গেছে যে দেখিয়া মনে হয় সেগুলি বহু কালের পুরানো—ঔপনিবেশিকেরা আসার ঢের ঢের আগেকার। ডিঙ্গো তো দুরন্ত জীবই, এক নিরীহ জীবের হাতেও চাষীরা কম নাকাল হয় না—খরগোসের কথা বলিতেছি। মাঠের সমস্ত ঘাস খাইয়া ফেলিয়া তারা এমন এক অবস্থা আনিয়া ফেলে যে ভেড়ার খাবার জোটানই কঠিন হয়। আর তাদের হাতে শস্য নষ্ট তো হয়ই! আজকাল তাই ফি বছর বহু খরগোস মারিয়া ইয়োরোপে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

ইঁদুর-মুখো ক্যাঙ্গারু

আমেরিকার মত অষ্ট্রেলিয়াও আজকাল একটা যুক্তরাষ্ট্র। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে টাস্‌মেনিয়া নামে ছোট্ট অথচ সুন্দর দ্বীপ ; এটিও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। আগে এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল সীডনি ; আজকাল সীড্‌নি এবং মেলবোর্ণের মাঝামাঝি জায়গায় নূতন রাজধানী ক্যান্‌বেরা

সহর তৈরী হইয়াছে—উদ্যানে ভরা সুন্দর সহর। এগুলি ছাড়া ব্রিস্‌বেন, এডেলেড্‌, পার্থ, হোবার্ট্‌ (টাস্‌মেনিয়া) প্রভৃতি আরও বড় বড় সহর আছে। ইংল্যাণ্ডের ও অষ্ট্রেলিয়ার একই রাজা, তবে এ ছাড়া রাজ্যশাসন ব্যাপারে আজকাল ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার আর কোন সম্বন্ধই নাই। ইংল্যাণ্ডের মত অষ্ট্রেলিয়ারও আলাদা পার্লামেণ্ট, আলাদা মন্ত্রিসভা, আলাদা প্রধান মন্ত্রী, সবই আছে। তারাই দেশবাসীর মত নিয়া রাজ্য চালায়। অবশ্য ইংল্যাণ্ড হইতে একজন বড়লাট বা **Governor General** নিযুক্ত হইয়া আসেন বটে, তবে শাসন-ব্যাপারে তিনি কোনই হস্তক্ষেপ করেন না—যা দিয়া যা করেন মন্ত্রীরাই।

অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় খেলা ক্রিকেট; সে সম্বন্ধে তোমাদের ইতিপূর্ব্বে এত বেশী বলা হইয়াছে যে নতুন করিয়া আর কিছু বলিবার নাই।

দস্যুর দলে ভোমরা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

৮

প্রাইভেট ডিটেকটিভ

শচীকান্ত তাঁর আপিস ঘরে ঢুকতেই ছু'জন লোক নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

শচীকান্ত পেশাদারি চালে হেসে বললে, 'বস্থন, বস্থন, আপনারা—?' ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলেন একজন প্রকাণ্ড মোটা, দাড়ি-গোঁফ কামানো সুশ্রী চেহারাই বলতে হবে, আর একজনের মাথার সামনের দিকে টাক, উপরের ঠোঁটে একটুখানি গোঁফ। ছু' জনেরই পরনে ইংরেজি পোষাক, বেশ ভারি গোছের মক্কেল মনে হয়।

শচীকান্ত আবার বললেন; 'আপনারা—?'

মোটা লোকটি চেয়ারে ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললে: 'আজ্ঞে আমরা আইনের কোন ব্যাপারে আসি নি।'

'তা হ'লে এখন আমাকে মাপ করবেন। আমার কোর্টের বেলা হ'য়ে গেছে।'

'আমাদের দরকার তার চেয়েও জরুরি। আপনার ভাইপো ভোমরা—'

শচীকান্ত ছু' হাতে টেবিল চেপে ধ'রে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললেন: 'আপনারা কি লালবাজার থেকে এসেছেন।'

'আজ্ঞে না। আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার নাম হচ্ছে অজয় সরকার', বললে মোটা লোকটি। 'আর ইনি সুভদ্র দত্ত। আমরা ছু'জনে পার্টনার।'

একটু নিরুৎসাহ হ'য়ে শচীকান্ত বললেন, 'তা আপনারা কি এই কেসটা নিতে চান?'

গোঁফওলা বললে: 'দেখুন, কেসটা নিতে চাই বললে ঠিক বলা হয় না। আমরা নিজের গরজেই, পুলিশকে কি অন্য কাউকে কিছু না ব'লে, ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। কারণ আর কিছুই নয়: এ-রকম ঘটনা আমাদের দেশে খুব কম, তাই মনে হ'লো দেখি না একবার। তা পুলিশ কি কোন কূলকিনারা করতে পেরেছে?'

শচীকান্ত গম্ভীর ভাবে বললে: ওঁরা তো আশা দিচ্ছেন।'

গোঁফ-ওলা বাঁকা হেসে বললে: 'আর কিছু না হোক্, ও জিনিসটা ওরা প্রচুর পরিমাণেই দিয়ে থাকে। আমাদের কিন্তু মনে হচ্ছে—'

উৎসুক ভাবে বললেন শচীকান্ত: 'কী? কী মনে হচ্ছে আপনাদের?'

গোঁফওলা বললে: 'কিছু যেন বোঝা যাচ্ছে। কী বলো, সরকার?'

মোটা লোকটি বললে: 'যদি আমাদের বিশ্বাস করেন, তা হ'লে—'

শচীকান্ত তাড়াতাড়ি বললেন, 'অবিশ্বাস করবো কেন? আপনারা কি গুণ্ডাদের আস্তানাটার খোঁজ পেয়েছেন?'

দাড়ি-গোঁফ-কামানো বললে: 'আস্তে, আস্তে। ছেলেকে ফিরে পাওয়াটাই আপনাদের পক্ষে আসল কথা—কী বলেন?'

'কিন্তু ঐ বদ্‌মাস গুণ্ডাদের শাস্তি হওয়াই কি কিছু নয়?'

'কিন্তু ধরুন—ভোমরাকে যদি ওরা ফিরিয়ে না দেয়—যদি মেরে ফেলে—তবে ওদের সকলের ফাঁসি হ'লেও কি আপনাদের খুব জিৎ হ'লো?'

শচীকান্ত চুপ ক'রে রইলেন।

গোঁফওলা বললে, 'আচ্ছা, এবারে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনারা কি শীগ্‌গির কোন চিঠি পেয়েছেন···কোন বেনামী চিঠি···'

শচীকান্ত চমকে উঠলেন, 'আপনারা কী ক'রে জানলেন ?'

'আমরা জানি না, তবে আঁচ করছিলুম ঐরকম। হয়তো ওরা কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে—কী বলেন ?'

'হ্যাঁ, পনেরো হাজার টাকা!' শুষ্কভাবে বললেন শচীকান্ত।

মোটা লোকটি বললে: 'আপনারা কী করবেন স্থির করেছেন ?'

'আমরা তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না, আপনারা কী বলেন ?'

'দেখুন, আমরা এ পর্য্যন্ত যতদুর সম্ভব চেষ্টা ক'রে দেখেছি। কোন লাভের আশায় যে করেছি তা নয়; কিছু করতে পারলে সেটাই হ'তো সব চেয়ে বড়ো লাভ। নিজেদের প্রাণ বিপন্ন ক'রে যে সব জায়গায় গেছি, যা সব করেছি এখন তা বলবার সময় নেই। এটুকু আমরা বুঝেছি যে যারা এ কাজ করেছে তারা বড় শক্ত লোক; গায়ের জোর, বুদ্ধির জোর দুটোই তাদের আছে—শেষেরটাই বেশি। মশাই বলবো কী, একবার ওদের খোদ্ সর্দ্দারকে হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিলুম—বুঝতেই পারলুম না কিছু। গোয়েন্দাগিরিতেও ওরা ওস্তাদ্। ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা বড় সহজ নয়।'

'বলেন কী! এই সভ্য সমাজে আমরা কিনা একদল রাস্তার গুণ্ডার কাছে হেরে যাবো! এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কী হ'তে পারে? তা হ'লে তো দেশে আইন, নিয়ম, শৃঙ্খলা ব'লে কিছুই রইলো না—যার যখন খুসী যে কোন ছেলেকে চুরি করে নিলেই হ'লো!'

মোটা লোকটি বললে, 'আমাদের কী মনে হয় জানেন? এই টাকাটা দিয়ে ভাইপোকে আগে উদ্ধার করুন তো, ছেলেটার মা-রও প্রাণ বাঁচবে। তার পর ওদের জেলে পুরতে হয় তো সে বিষয়ে ভেবে দেখা যাবে।'

'কথাটা কিন্তু ঠিক গোয়েন্দার মত হ'লো না, মিঃ সরকার। একবার টাকা হাতে নিয়ে চম্পট দিলে আর কি ওদের ধরতে পারবো? ছেলে ফিরিয়ে না দিলেই বা কী করতে পারি তখন?'

'আচ্ছা, আপনি কি ওদের ধরবার কোন প্ল্যান ঠাউরেছেন ?'

শচীকান্ত সতর্কভাবে বললেন, 'আপনারাই বলুন না, কী করলে ভালো হয়।'

'আচ্ছা, ওরা কোন জায়গা ঠিক ক'রে দিয়েছে নিশ্চয়ই ? সেখানে গিয়ে টাকা দিতে হবে ?'

'তা আর দেয় নি! দস্তুরমত ডিটেকটিভ নভেল মশাই। এই দেখুন।' শচীকান্ত পকেট থেকে চিঠিটা বার ক'রে ওদের সামনে ধরলেন।

চিঠিটা দেখে, প'ড়ে ও নাড়াচাড়া ক'রে ওরা দু' জনেই যেন বড় গম্ভীর হ'য়ে গেলো। গোঁফ-ওলা বললে: 'ওরা একটুখানি রসিকতা করছে এমন তো মনে হয় না। চিঠিতে ওরা যা লিখেছে তা-ই করবে ব'লেই তো মনে হয়।'

'আপনারা যেন ওদের মনের কথা সব জানেন বোধ হচ্ছে।'

শচীকান্ত ব্যঙ্গ ক'রেই বলেছিলেন কথাটা, কিন্তু কথাটা শুনে ওরা পলকের জন্যে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। চোখের ইসারায় ওদের মধ্যে কী যেন ঠিক হ'য়ে গেলো। শচীকান্ত কিছু লক্ষ্য করলেন না।

মোটা লোকটি বললে, 'দেখুন, এই পনেরো বছরের প্র্যাকটিসে আমরা নানা রকম চোর, বাটপাড়, খুনে, গুণ্ডা দেখেছি। তা ছাড়া, এ বিষয়ে পড়াশুনাও করেছি, ক্রিমিনালদের মনের ভাব কিছু বুঝতে পারি। তবে আমাদের যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তো বলুন—এ আপনারই ব্যাপার, আপনার কোন কাজে লাগতে পারি এই আশা ক'রেই আমরা এসেছিলুম।'

শচীকান্ত তাড়াতাড়ি বললেন, 'আহা—চটে যাচ্ছেন কেন? বসুন না! কী ভাবে এগুলে ওরাও ধরা পড়ে, ছেলেও উদ্ধার হয়?'

'যদি বলেন তো আমরা সেই তারিখে আপনার সঙ্গে যেতে পারি।'

'যাবেন আপনারা?'

'কেন যাবো না? এই তো আমাদের কাজ। আপনি কি পুলিশের সাহায্য নিতে চান?'

'ভাবছিলুম।'

'দেখুন ভেবে। আমাদের কিন্তু মনে হয় পুলিশ সঙ্গে নিলে হাঙ্গামা হবে

খুব, কিন্তু আসল কাজ কিছু হবে না। এই দেখুন না, এতদিন তো পুলিশের হাতে কেসটা রয়েছে—পারলে কিছু করতে ?'

শচীকান্ত মুখে বললেন, 'কী করছে না করছে আমাদের তো বলবে না, হয়তো অনেকদূর এগিয়েছে।' মনে মনে কিন্তু তিনি খুব আশান্বিত হতে পারছিলেন না।

'তা হ'লে ভেবে দেখুন। আমাদের যদি চান, আসতে পারি। আমাদের তোড়জোড় সম্বল যেটুকু আছে সব দিয়েই আপনাকে সাহায্য করবো। প্রাণের ভয় নেই আমাদের—চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তার পর অদৃষ্ট।'

শচীকান্ত চিন্তিত ভাবে বললেন, 'আচ্ছা···।'

লোক দু'জন উঠে দাঁড়ালো।—'আপনার সময় আর নষ্ট করবো না, তা হ'লে এ-ই ঠিক রইলো। শনিবার, রাত দশটায় তো ?'

'শনিবার, রাত দশটায়।'

'হ্যাঁ, একটা কথা', মোটা লোকটি যেতে যেতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো। 'টাকাটা আপনি বোধ হয় নিয়ে যাবেন না ?'

'আমি তো বলি এ সব জোচ্চোরির ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু আমার বৌঠান···'

এমন সময় বসন্ত ঘরে ঢুকে বললে, 'বাবা, মা বলে পাঠালেন তোমার বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। এই যে এসো, বইটা এখানেই আছে।'

আর একটি ছেলে ঘরে ঢুকলো, আমরা অবিশ্যি তাকে চিনতে পেরেছি, সে বিরিঞ্চি। ওরা দু'জনে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে শেল্‌ফের উপরে একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

ওদের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে মোটা লোকটি চুপি-চুপি বললে : 'আমাদের কিন্তু মনে হয় টাকাটা সঙ্গে নেয়াই ভালো। কিছু না থাকলে টোপ গিলবে কেন ? আমাদের প্ল্যানটা যদি ঠিকমত উৎরোয়, তা হ'লে টাকা, আর ছেলে দুই-ই ফেরৎ পাবেন—ওরাও পড়বে ধরা।'

'আপনাদের প্ল্যানটা কী ?'

'সে পরে শুনবেন। শনিবার সাড়ে ন'টার সময় আপনার এখানে আমরা

গাড়ি নিয়ে আসবো, প্রস্তুত থাকবেন। আর যদি এর মধ্যে কোন দরকার হয়, এই যে আমাদের কার্ড রইলো। আচ্ছা, নমস্কার।'

শচীকান্ত কার্ডখানার দিকে তাকিয়ে দেখলে : সরকার এণ্ড ডট্, সুইট এক্স্,—জি, পার্ক ষ্ট্রীট।'

হয়তো কিছু হ'তে পারে এদের দিয়ে, কে জানে !

ওদের বিদায় দিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি বাথ-রুমে গিয়ে ঢুকলেন। (ক্রমশঃ)

মণি-মঞ্জুষা

মাষ্টারম্যান্ রেডি

[মাষ্টারম্যান্ রেডি ক্যাপ্‌টেন্ ম্যারিয়টের লেখা। ম্যারিয়ট্ জন্মেছিলেন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে—লণ্ডনে। তিনি ছিলেন নৌ-বিভাগের একজন বড় কর্ম্মচারী। সমুদ্র-জীবনের, বিশেষতঃ ছেলেদের উপযোগী, গল্প লিখে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁর "মিড্‌শিপ্‌ম্যান্ ইজি", "পিটার সিম্প্‌ল্", "জেকব ফেদ্‌ফুল", "মাষ্টারম্যান্ রেডি" প্রভৃতি বই বিলাতের ছেলেরা "রবিন্‌সন্ ক্রুসোর" মতই আদর করে পড়ে। মাষ্টারম্যান্ রেডি বইখানা ইনি নিজের ছেলেদের মনস্তুষ্টির জন্য লিখেছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ম্যারিয়টের মৃত্যু হয়।]

আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে প্যাসিফিক জাহাজ চলেছে—নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্-এর দিকে ; মাষ্টারম্যান্ রেডি এই জাহাজের সেকেণ্ড মেট্। রেডির বয়স হয়েছে ; গত ৫০ বছর তিনি জাহাজে জাহাজেই কাটিয়েছেন, পৃথিবীর কত জায়গায় ঘুরেছেন, কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তার ঠিক নেই। জাহাজের সবাই তাঁকে খাতির করে—ক্যাপ্‌টেন কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করেন।

প্যাসিফিক্ জাহাজ চলেছিল কতকগুলি বাণিজ্যের সওদা নিয়ে। জাহাজে নাবিকেরা ছাড়া যাত্রী ছিলেন একটি মাত্র পরিবার—মিঃ সিগ্রেভের। মিঃ সিগ্রেভ সীডনির একজন সম্পত্তিওয়ালা লোক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, বড় ছেলে উইলিয়াম্, মেজ ছেলে টমি, ছোট ছেলে এলবার্ট্ (সে খুবই ছোট) আর মেয়ে ক্যারোলিন। আর ছিল একটি ঝি—জুনো

TIGHT BINDING

এবং দু'টো কুকুর—রোমিউলাস্ আর রেমাস্। টমি ছিল ভয়ানক দুরন্ত, বছর ছয়েক তার বয়স। উইলিয়ামের সঙ্গে রেডির খুব ভাব হয়ে গেল, রেডি তাকে তাঁর জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতেন, উইলিয়াম্‌ও প্রতিদানে তাঁকে রবিন্‌সন্ ক্রুসোর গল্প শোনাত।

একদিন সমুদ্রে তুমুল ঝড় উঠ্‌ল এবং সে-ঝড় কয়েক দিন ধরে চলতে লাগ্‌ল। কয়েকজন লোক মারা পড়ল, জাহাজের ক্যাপ্‌টেনও অজ্ঞান হয়ে রইলেন, জাহাজে একটু একটু করে জল উঠতে লাগ্‌ল।

ক্যাপ্‌টেনের অভাবে জাহাজে যা হয় তাই হ'ল, নাবিকেরা আর কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা মান্‌ল না, একখানা মাত্র লাইফ্-বোট্ আস্ত ছিল, জাহাজ ছেড়ে তাতেই তারা উঠে পড়ল,—অচৈতন্য ক্যাপ্‌টেনকে নিয়ে; যাত্রীদের দিকে চাইল না। রেডিকেও তারা ডাকল, কিন্তু রেডি সিগ্রেভদের ফেলে যেতে রাজী হ'লেন না, তিনি ভাঙ্গা জাহাজেই পড়ে রইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছু পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল এবং দূরে একটা দ্বীপ দেখা গেল। একখানা ভাঙ্গা লাইফ-বোট্ অবশিষ্ট ছিল, সেটা কোন রকমে মেরামত করে রেডি সিগ্রেভদের নিয়ে সেখানে চললেন। মিঃ সিগ্রেভ একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, রেডি তাঁকে নানা রকমে প্রবোধ দিলেন। দ্বীপে প্রচুর নারকেল গাছ ছিল, কাজেই খাবারের ভাবনা বড় একটা রইল না, তা ছাড়া জাহাজ থেকেও তাঁরা কিছু খাবার এবং গরু-ভেড়া প্রভৃতি এনেছিলেন। বালির উপর তাঁবু গাড়া হ'ল, কিন্তু গোল বাধ্‌ল জল নিয়ে, দ্বীপটা ছিল ভয়ানক নীচু।

শেষ পর্য্যন্ত উইলিয়াম্ আর রেডি কুকুরগুলির সাহায্যে দ্বীপের অন্যদিকে বালির নীচে খানিকটা খাবার জল আবিষ্কার কর্‌ল। সেইখানে থাকবার মত একটা বাড়ী তৈরী করে সবাই উঠে গেলেন। এইখানে রেডি তাঁর জীবনের কাহিনী শোনালেন।

এদিকে আবার বিপদ্ ঘনিয়ে এল। একদিন দু'টি কৃষকজাতীয় জংলী মেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে তাঁদের আশ্রয় নিল, তাঁরাও তাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করলেন; কিন্তু মেয়ে দু'জন একদিন কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে গেল। সবাই বুঝলেন ব্যাপারটা মঙ্গলজনক নয়। ভাবী বিপদের আশঙ্কায় এবার তাঁরা একটা নিরাপদ্ ঘর তৈরী করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন—কখন কে আক্রমণ করে তার ঠিক নেই। ইতিমধ্যে একদিন দূরে একটা জাহাজের মাস্তুল দেখা গেল; আশায় উত্তেজনায় প্যাসিফিকেরও নিশান উড়িয়ে দেওয়া হ'ল—যাতে সে জাহাজ সেটা দেখতে পায়, কিন্তু কোন ফল হ'ল না—সে জাহাজ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার পর তাঁরা যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হ'ল। একদিন ডিঙ্গী চড়ে একদল অসভ্য কৃষ্ণকায় লোক এসে তাঁদের আক্রমণ কর্‌ল। তাঁরা প্রস্তুতই ছিলেন, তাঁদের বন্দুকের সামনে

তারা দাঁড়াতে পারল না। কিন্তু এবার থেকে তাঁদের বেশী সতর্ক হয়ে থাকতে হল, নিরাপদ্ ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ হ'ল।

টমির দুষ্টুমি কিন্তু বন্ধ হ'ল না। তার নিত্য নতুন দুষ্টুমিতে সবাইকে অস্থির হ'য়ে উঠতে হ'ল। ইতিমধ্যে একবার সে লুকিয়ে নৌকোয় চেপে প্রায় হাঙ্গরের মুখে যেতে বসেছিল, কোন রকমে তাকে উদ্ধার করা হয়। খাবার জন্য যে জল সংগ্রহ করা ছিল তাও সে একদিন নষ্ট করে ফেল্‌ল। জল না হ'লে কেমন ক'রে বাঁচা যায়? রেডি ঠিক করলেন হোক্ বিপদ্, জল আনতে তিনি যাবেনই। জল নিয়ে ফিরছেন এমন সময় একজন অসভ্যের অস্ত্রাঘাতে তাঁকে আহত হ'তে হ'ল। অসভ্যটাকে অবশ্য তখনই খতম করা হ'ল এবং রেডিকেও টেনে ঘরে আনা হ'ল, কিন্তু বিপদ্ কম্‌ল না। অসভ্যেরা আবার দল বেঁধে বিপুল উদ্যমে তাঁদের আক্রমণ কর্‌ল।

এমনি সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে গোলার পর গোলা এসে অসভ্যদের একেবারে মাটীতে মিশিয়ে দিল—যারা বাঁচ্‌ল তারা প্রাণ নিয়ে পালাল। তখন দেখা গেল একটা জাহাজ থেকে নৌকো করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক আসছে—এ তাদেরই গোলা। আর এই দলের সঙ্গে রয়েছেন প্যাসিফিক্ জাহাজের ক্যাপ্‌টেন অস্‌বোর্ণ।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম। কিছুদিন আগে যে জাহাজের মাস্তুলটা সিগ্রেভের দল দেখেছিলেন সে জাহাজের লোকেরাও প্যাসিফিকের নিশান দেখতে পেয়েছিল কিন্তু আব্‌হাওয়া অত্যন্ত খারাপ থাকায় কাছে আসতে পারে নি। তারা তাড়াতাড়ি সীডনিতে গিয়ে খবর দিয়েছিল। এদিকে ক্যাপ্‌টেন অসবোর্ণ ও অন্যান্য নাবিকদের (যারা প্যাসিফিক্ থেকে একটা লাইফ-বোটে করে পালিয়েছিল) আর একটা জাহাজ উদ্ধার করে এবং ক্যাপ্‌টেন অস্‌বোর্ণ অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান। সীডনিতে প্যাসিফিকের খবর পেয়ে তিনি সরকারের কাছ থেকে একটা জাহাজ চেয়ে নিয়ে প্যাসিফিকের পরিত্যক্ত লোকদের উদ্ধার করতে এসেছেন। অস্‌বোর্ণ-এর সঙ্গে রেডির দেখা হ'ল, কিন্তু রেডির সময় ফুরিয়ে এসেছিল, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি অনুরোধ করলেন তাঁকে যেন কূয়োর ধারে টিলার উপর গাছের ছায়ায় কবর দেওয়া হয়, আর টমিকে যেন জানান না হয় যে তারই দুষ্টুমির জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। রেডির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হ'ল।

টমি বড় হয়ে সৈন্যবিভাগে ঢুকল—তখন অবশ্য তাকে দেখলে সবাই বল্‌ত 'চমৎকার ছেলে।'

TIGHT BINDING

ছোটদের চিত্রশালা

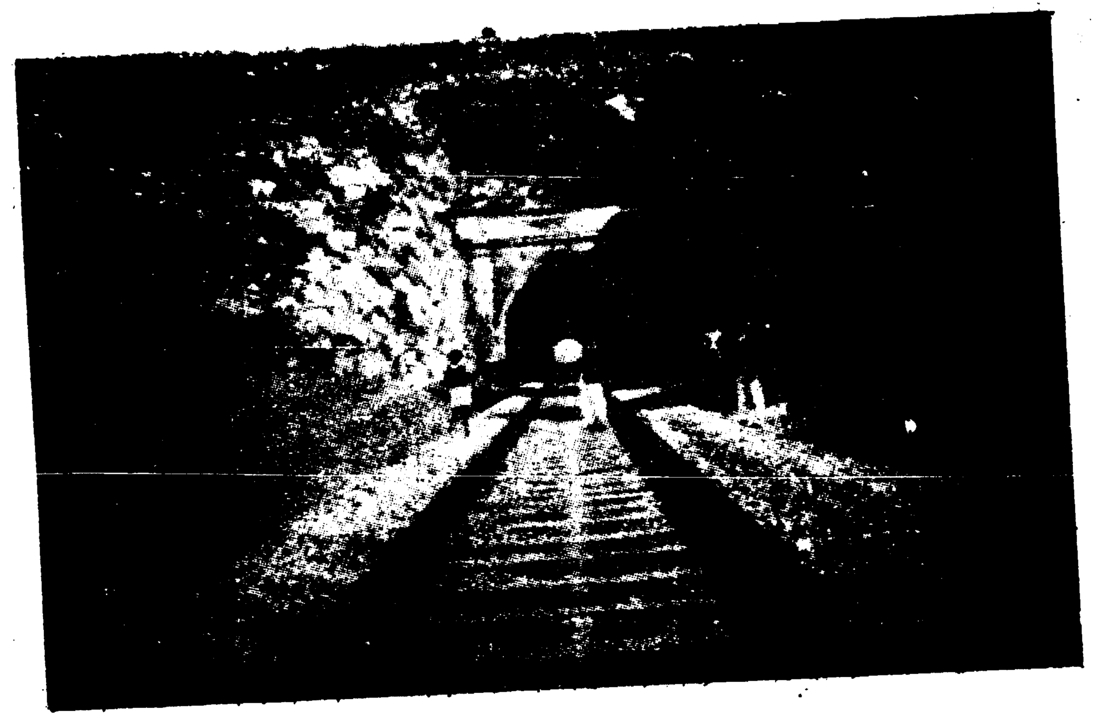

জামালপুর টানেল
আলোকচিত্র-শিল্পী :—শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ

মুর্শিদাবাদের ইমামবাড়ী
আলোকচিত্র-শিল্পী :—শ্রীমনোতোষ রায়

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

'বাদল-দিনে'

(কুমারী সুজাতা গুপ্ত)

কেয়া ফুলের ভিড় জমেছে
আজ্‌কে আঙ্গিনায়
দাওয়ায় বসে এমন দিনে
দেখবি যদি আয়।
বাদল এল ফিরে ;
ধরারে আজ ফেল্‌ল কে ও
সবুজ রংএ ঘিরে !

ঝিরি ঝিরি ইল্‌সেগুঁড়ি
ঝর্‌ছে আজিকে,
শালের বনে তারই সনে
মাদল বাজিছে।
গাং-শালিখের দল
পাখ্‌না মেলে ঝিমুচ্ছে আজ
বাবলা-গাছের তল।

বাদ্‌লা হাওয়ার আমেজে আজ
কাঁপ্‌ল বাঁশের বন,
শাঙন-ধারার সাথে সাথে
উদাস হ'ল মন।
রাখ্‌ তুলে আজ পাঠ,
দিদাই ডেকে গল্প শুনি—
তেপান্তরের মাঠ !

কুঁচের বরণ রাজকুমারী,
মেঘের বরণ কেশ—
ডালিমকুমার ছুট্‌ছে রে আজ
নিঝুম পুরীর দেশ !
উথলে উঠে প্রাণ,
তালের পাতার নতুন ভেঁপু
আজ গড়িয়ে আন্‌।

ঝিঙে ফুলের সবুজ বনে
ফড়িং নাচে রে,
রাশি রাশি ফুল ফুটেছে
নেবু গাছে রে !
কদম-তলে চল্‌
ঝিমি ঝিমি বাদল মেয়ের
বাজছে পায়ে মল।

পুস্তক-পরিচয়

Shield Guide—প্রিমিয়ার পাব্‌লিসিটি সোসাইটি—৮, বীডন্‌ ষ্ট্রীট্‌ থেকে প্রকাশিত।

মেসার্স্‌ প্রিমিয়ার পাব্‌লিসিটি সোসাইটি বরাবরই আই-এফ্‌-এ শীল্ড প্রতিযোগিতার সময়ে খেলা-ধূলা সম্বন্ধীয় এই সুন্দর ইংরাজী বইখানা বার করেন। আমরা দেখে খুসী হ'লাম এবার

এঁরা বইটা আরও অনেক বর্দ্ধিত আকারে বার করেছেন। বইখানা খেলা-ধূলা সম্বন্ধীয় অসংখ্য তথ্যে পরিপূর্ণ—প্রত্যেক ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিই এ থেকে প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন। জানবার বিষয় ছাড়াও বহু সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন ও ব্যঙ্গ-চিত্র বইখানাকে আরও লোভনীয় করে তুলেছে। ছাপা-কাগজ অতি রমণীয়।

তপনকুমারের অভিযান—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্. এ, প্রণীত। প্রকাশক বাগচী এণ্ড সন্স, ৭৪।এ, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। দাম ॥০

ছেলেদের উপযোগী একখানি গল্পের বই। আজগুবি ঘটনার মধ্যে ছাড়াও যে সত্যিকারের য়্যাডভেঞ্চার থাকতে পারে হেম বাবু এ বইখানায় তা দেখিয়েছেন। তপন থেকে আরম্ভ করে গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রই সুন্দর ফুটেছে। এ বই ছেলে-মহলে বেশ আদর পাবে। ছাপা, বাঁধাই, মলাট সুন্দর ও বেশ সুরুচির পরিচায়ক।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩।এ, মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা। দাম ॥৵০

সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় কোন ভাল বই ছিল না। সম্প্রতি কয়েকখানা বেরিয়েছে—এ বইটিও তাদের, অর্থাৎ সেই 'ভাল' বই ক'খানার, অন্তর্গত। এই চলমান যুগের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হ'লে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এ বই একখানা রাখা উচিত। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ মনোজ্ঞ। অনবধানতার জন্য ২।১টি সামান্য ভুল ২।১ জায়গায় চোখে পড়্‌ল, আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে তা সংশোধিত হবে।

চিঠিপত্র

এবারেও আমরা গ্রাহকদের অনেক চিঠিপত্র পেয়েছি। নতুন উপন্যাস 'ফুলের মূল্য' অনেকেরই ভাল লাগছে বলে জানিয়েছেন। বইখানা কোন্ লেখকের কোন্ বইএর মর্ম্মানুবাদ তা আমরা বই শেষ হ'লে জানাব। গত সংখ্যার ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে প্রকাশিত 'বাদশাহ্ ও বিদূষক' গল্পটি মৌলিক নয় বলে শ্রীনরেশ গুহ বক্সী অভিযোগ করেছেন—কিন্তু লেখক তো জানিয়েই দিয়েছিলেন যে ওটা একটা বিদেশী গল্প—অভিযোগ পাঠাবার আগে সেটা দেখা উচিত ছিল। শ্রীবীণা গুপ্তা, শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত প্রভৃতি রামধনুতে পুরস্কার-প্রতিযোগিতা বছরে একটি না দিয়ে আরও বেশী দিতে অনুরোধ করেছেন। পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় গ্রাহকদের খুব বেশী উৎসাহ কয়েক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে না বলেই আমরা তার সংখ্যা আর বাড়াই নি। এ বিষয়ে গ্রাহকদের উৎসাহ দেখা গেলে অবশ্যই বাড়াব। আপাততঃ আগামী পূজা-সংখ্যায় বরাবরকার মত একটা পুরস্কার-প্রতিযোগিতা থাকবে। শ্রীঅশোক গুপ্তের কথা মত 'কি ও কেন' এবং 'বিজ্ঞানের খবর'ও আমরা মাঝে মাঝে দিতে

চেষ্টা করব। রামধনুতে সূচীপত্র থাকে না বলে কেউ কেউ অনুযোগ করেছেন—সূচীপত্র আগে দেওয়া হ'ত, কিন্তু ছোট কাগজে সাধারণতঃ ও কেউ দেখে না বলে কয়েক বছর হ'ল তুলে দেওয়া হয়েছে। শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্ত জানতে চেয়েছেন—গ্রাহকদের প্রশ্ন থেকে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন দেওয়া হয় না কেন। ঐ বিভাগের প্রশ্নগুলির মধ্যে গ্রাহকদের প্রশ্নও কিছু কিছু থাকে বই কি, তবে অনাবশ্যক বোধে প্রশ্নকর্ত্তার নাম দেওয়া হয় না। —রাঃ সঃ

সন্দেশ

ইটালির যাদুকর, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্কনির সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। রেডিও বা বেতারের আবিষ্কারক মার্কনির নাম তোমাদের অজানা নয়, এই রামধনুতেই গত বছর তাঁর কথা লেখা হইয়াছিল। তাঁর মৃত্যুতে বিজ্ঞান-জগতের মস্ত ক্ষতি হইল। আগামী বারে তাঁর জীবন সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

* * *

চীন ও জাপানে আবার লড়াই সুরু হইয়াছে। চীনারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন পণ করিয়া নামিয়াছে, তবে শক্তিশালী জাপানের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কিনা কে জানে?

* * *

সম্প্রতি পাটনা হইতে ২৩ মাইল দূরে বিহিটা নামক ষ্টেশনের কাছে একটা ভয়ানক রেল-দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব এক্সপ্রেস বিপুল বেগে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছিল, হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে লাইন হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া যায়। ফলে প্রায় ১২৬ জন লোক মারা গিয়াছে—আহতও হইয়াছে বহু। এরূপ দুর্ঘটনা ভারতবর্ষে বেশী হয় নাই।

* * *

কলিকাতার ফুটবল্ খেলার, মরশুম এক রকম শেষ হইয়াছে—আই-এফ্-এ শীল্ড্ প্রতিযোগিতা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে। আই-এফ্-এ শীল্ডে এবার যত টীম্ যোগ দিয়াছিল এ পর্য্যন্ত আর কোনবারই নাকি তত বেশী টীম্ যোগ দেয় নাই। মফঃস্বলের অনেক ছোটখাট টীম্ও খেলিতে আসিয়াছিল; তাদের মধ্যে কোন কোনটা শক্তিশালী দলের সঙ্গে পড়ায় বিশ্রী ভাবে হারিয়া গিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত জয় লাভ করিয়াছে ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড্ দল। এ দলই যে এবারকার টীম্গুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দল ছিল সে বিষয়ে কারও মতভেদ নাই—এদের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় আশ্চর্য্য ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন।

রানার্স্ আপ্ হইয়াছে স্থানীয় পুলিশ দল—ইহারা লীগে ২য় বিভাগের টীম্—আগামী বছর প্রথম বিভাগে খেলিবে। সেমি ফাইনালে এইচ্, এল্, আই টীম্‌কে ২—০ গোলে হারাইয়া পুলিশ দল ফাইনালে গিয়াছিল, কিন্তু ফাইনালে শোচনীয় ভাবে (৪—১ গোলে) হারিয়া গিয়াছে। সেমি ফাইনালের অপর টীম্ ছিল ডি, সি, এল্, আই। ইহারা একদিন ড্র করিয়া দ্বিতীয় দিনে শীল্ড-বিজয়ীদের নিকট পরাজিত হয়। গত বারের শীল্ডবিজয়ী এবং এবারকার লীগ্ বিজয়ী মহামেডান্ স্পোর্টিং ৪র্থ রাউণ্ডে ৬ষ্ঠ

ফ্রিল্ড ব্রিগেডের কাছে ২—০ গোলে পরাজিত হইয়াছে। ৪র্থ রাউণ্ডে গত বারের রানার্স আপ্ ক্যালকাটা হারিয়াছে পুলিশের কাছে, আর মোহনবাগান হারিয়াছে ডি, সি, এল্, আইএর কাছে। ইষ্ট বেঙ্গলের উপর অনেকে অনেক আশা করিয়াছিল কিন্তু তারা ৩য় রাউণ্ডে কাষ্টম্‌স্‌এর কাছেই পরাজিত হয়। কাষ্টম্‌স্ ৪র্থ রাউণ্ড্ পর্য্যন্ত গিয়া এইচ্, এল্, আইএর নিকট পরাজিত হয়।

বাহির হইতে আগত (visitors) সম্মিলিত দলের সহিত স্থানীয় সম্মিলিত দলের (Local) একটি খেলা হইয়াছিল। উহাতে ভিজিটার্স ২—১ গোলে জয় লাভ করে।

*   *   *

দীর্ঘ এগার বছর পরে সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করিয়া বাঙ্গালী পর্য্যটক শ্রীযুক্ত বিমল মুখার্জ্জি দেশে ফিরিয়াছেন। এই এগার বছর তিনি ভারতবর্ষ, মেসোপটেমিয়া, তুরস্ক, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ (পর্ত্তুগাল ব্যতীত), আইস্‌ল্যাণ্ড, আমেরিকা, আমেরিকার কাছাকাছি দ্বীপগুলি, জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরিয়াছেন, নানা রকম বিপদের মুখে পড়িয়াছেন, বহু বার দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাইতে হারাইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, অনাহারে, অর্থকষ্টে জীবিকার জন্য নানা উপায়—এমন কি মৎস্যজীবীর কাজ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, কিন্তু নিজের অটল সংকল্প হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে এ কি কম গৌরবের কথা? বাংলার এই কৃতী সন্তানটিকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমাদের দেশে মানুষের স্বাভাবিক গায়ের উত্তাপ ৯৭ হইতে ৯৮ ডিগ্রী; থার্ম্মোমিটারে "নর্ম্যাল টেম্পারেচার" বলিয়া যে দাগ থাকে তাহা ৯৮·৪ ডিগ্রীতে থাকে। কিন্তু পাখীদের গায়ের স্বাভাবিক উত্তাপ ইহার চেয়ে অনেক বেশী হয়। অনেক পাখীরই স্বাভাবিক উত্তাপ প্রায় ১০০ ডিগ্রী। কোন কোন পাখীর উত্তাপ ১১৩ ডিগ্রীও দেখা গিয়াছে।

*   *   *

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন বাংলাভাষায় প্রায় ৩০০০ বিদেশী শব্দ আছে। তার মধ্যে আরবী ফার্সী শব্দই বেশী—অন্ততঃ ২৫০০; তা ছাড়া ইংরাজী ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দও ২০০র উপরে আছে। 'চা', 'লিচু'—প্রভৃতি শব্দগুলি আসিয়াছে চীনা ভাষা হইতে।

*   *   *

তিব্বতে হানির বৌদ্ধ মন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬০০০ ফুট্ উঁচুতে অবস্থিত। এখানে লামারা সারা বছর থাকেন। এত উঁচুতে বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও লোকের বসতি নাই।

*   *   *

সেণ্ট জন্ য়্যাম্বুল্যান্স এসোসিয়েশনের নাম তোমরা অনেকেই সম্ভবতঃ শুনিয়াছ। ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় তীর্থযাত্রীদের সাহায্যের জন্য প্যালেষ্টাইনে অর্ডার অব্ সেণ্ট্ জন্ অব্ জেরুজালেম স্থাপিত হয়। ইহা হইতেই ক্রমে সেণ্ট জন্ য়্যাম্বুল্যান্স এসোসিয়েশন্ হইয়াছে। এই সমিতির কাজ হইতেছে আহত ও বিপন্নদের সাহায্য করা হয়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

কাকাবাবুর বয়স এখন ৪৫ বছর (দাসুর বয়স এখন ৯ বছর, ছোট্টুর বয়স ৭ বছর আর খোকনের বয়স ৪ বছর)

উত্তরদাতাদের নাম

রমেন্দ্রনাথ রক্ষিত (রাজসাহী); শৈলেন বোস (কলিকাতা); সুনীল ও অনিল ভট্টাচার্য্য (দিল্লী); বখতিয়ার হোসেন (মেদিনীপুর); পান্নাদা', শঙ্কর দা', সুনীল সেন (দিনাজপুর); ঘুটু, উষা, দীপু (সিম্‌ডেগা); অজয়কুমার মিত্র (ঢাকা); জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); রেণু চৌধুরী (রাজসাহী); প্রসূন রায় (নালন্দা); ছায়া তরফদার (ময়মনসিংহ); মায়ারাণী মিত্র (ভবানীপুর); রামেন্দু দাশগুপ্ত ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); প্রীতি, অরুণ ও অনিল (রাজসাহী); শঙ্কর, প্রফুল্ল, বিশ্বনারায়ণ (যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়—রাঁচী) যূথিকা, লতিকা চন্দ্র (মান্দ্রাজ); ছায়া দেবী (রতনপুর); হরিগোপাল মজুমদার (টুণ্ডি); উলানিয়া হাই-স্কুলের ছাত্রবৃন্দ; সতী, করুণা, রেণুকা মৈত্র (রাজসাহী); রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া); সত্যরঞ্জন ও মনোরঞ্জন ঘোষ (কলিকাতা); সান্ত্বনা ঘোষ ও সাধনা ঘোষ (যশোহর; সুভাষ রায় (বহরমপুর); বাসন্তী কল্যাণী, নীহার (শ্রীহট্ট); রণেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী); সত্যানন্দ প্রামাণিক (খুরদা রোড); শচীন, অনিল, প্রসাদ (সাহড়া); বিমলা, শতদল ও স্মৃতিকণা দে (ডেহ্‌রী অন্ শোন); অনিমা দেবী (তেলিনীপাড়া); রমা নিয়োগী (কলিকাতা); নন্দগোপাল বাজপেয়ী, শৈলেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা); উমা, গৌরী, প্রভাত (মোকামা ঘাট); মায়া পাল, সুকুমার পাল, ক্ষিতীশ (উল্লাপাড়া); স্বরাজ, ইন্দু, লীলা প্রভৃতি (সুনামগঞ্জ); অরুণা সেন (কলিকাতা); শশাঙ্ক ও ফণীন্দ্রভূষণ দত্ত (ধল্লা); রত্না দেবী (পাটনা); ভোলানাথ মিত্র (কৃষ্ণনগর); দীনেন মুখার্জ্জি ও বিজয় (নলহাটি); পাঁচুগোপাল ঘোষ (শ্যামনগর); প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর); রঙমারি বি, এম্, ভি স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রগণ; নলিনীরঞ্জন মুখার্জ্জি, সুনীল ও নারায়ণ ব্যানার্জ্জি (দিনাজপুর); সন্ধি, মালবিকা, মন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা); আশীষ, শ্যামল, দুলু প্রভৃতি (কলিকাতা); সুনীলকান্তি সেন (চাঁদপুর); সিতেন্দু নীলিমা, নটরাজ গুপ্ত (স্বর্ণাসন—পাটনা); অশোককুমার রায়চৌধুরী (ভবানীপুর); প্রমথ, হরিসাধন, অমরেশ প্রভৃতি (ধেমো মেন কলিয়ারী); অগ্রবিদ্যালয়ের সভ্যবৃন্দ (ইনাথগঞ্জ);

বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দ (শালিখা, হাওড়া); প্রভা ও প্রমা দেবী (বেতিয়া); প্রসিত ও প্রদ্যোতকুমার বাগচী (বালুভরা); লীলা দাস (কুমিল্লা)

(ধাঁধাটি ভাল ক'রে পড়ে না দেখায় আরও অনেকে ভুল উত্তর পাঠিয়েছেন।)

নূতন ধাঁধা

নীচের ব্র্যাকেটে যে শব্দগুলি আছে তাদের জায়গায় তাদের এক-একটি প্রতিশব্দ বা ভাবার্থসূচক শব্দ বসাইয়া '+' কিংবা '−' চিহ্নযুক্ত শব্দগুলি সেই শব্দের আগে, পরে, বা মাঝখানে বসাইতে হইবে কিংবা সেখান হইতে বাদ দিতে হইবে। তাহা হইলেই লাইনগুলি পড়া যাইবে।

(একটি ফল)+য় বড় (সময় বিশেষ)−স,
(একটি তরকারী)−বে (বাদ্যযন্ত্র)−সে (কপাল)।
(রীতি)−য় (পোকা বিশেষ)−জো বি+(একটি সহর)−(হাট)।
প+(মৃতদেহ) ও (পাখী বিশেষ)−তা (রত্ন)−ব (লক্ষ্মী)!

দ্রষ্টব্য ঃ—কেবল মাত্র সম্পূর্ণ উত্তরদাতাদের নামই আগামী বারে বাহির হইবে, আংশিক উত্তর পাঠাইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(১) (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (খ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (গ) কাশীরাম দাসের (ঘ) চণ্ডীদাসের (ঙ) রজনীকান্ত সেনের।

(২) যুক্তপ্রদেশে, বিহারে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে, বোম্বাইএ, মধ্যপ্রদেশে।

(৩) (ক) কয়লা ও ফটকিরি ধাতু নয়। (খ) সম্প্রতি ৯৭ বছর বয়সে যে ধনকুবেরের মৃত্যু হইয়াছে তাঁর নাম রকফেলার। এডিসনের নাম খ্যাত ধনকুবের বলিয়া নয়—বৈজ্ঞানিক বলিয়া এবং তিনি কয়েক বছর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন। রকফেলার ধনকুবের হইয়াছিলেন কেরোসিনের ব্যবসায়ে, মোটরকারের ব্যবসায়ে যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছিলেন তাঁর নাম হেনরি ফোর্ড। (গ) ওকাপি তিব্বতের জন্তু নয়—আফ্রিকার জন্তু, এবং খুব দুষ্প্রাপ্য, পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায় না। টাকিনের কথা যা লেখা হইয়াছে তা ঠিকই আছে।

(৪) ১নং—হেনরি ফোর্ড, ২নং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

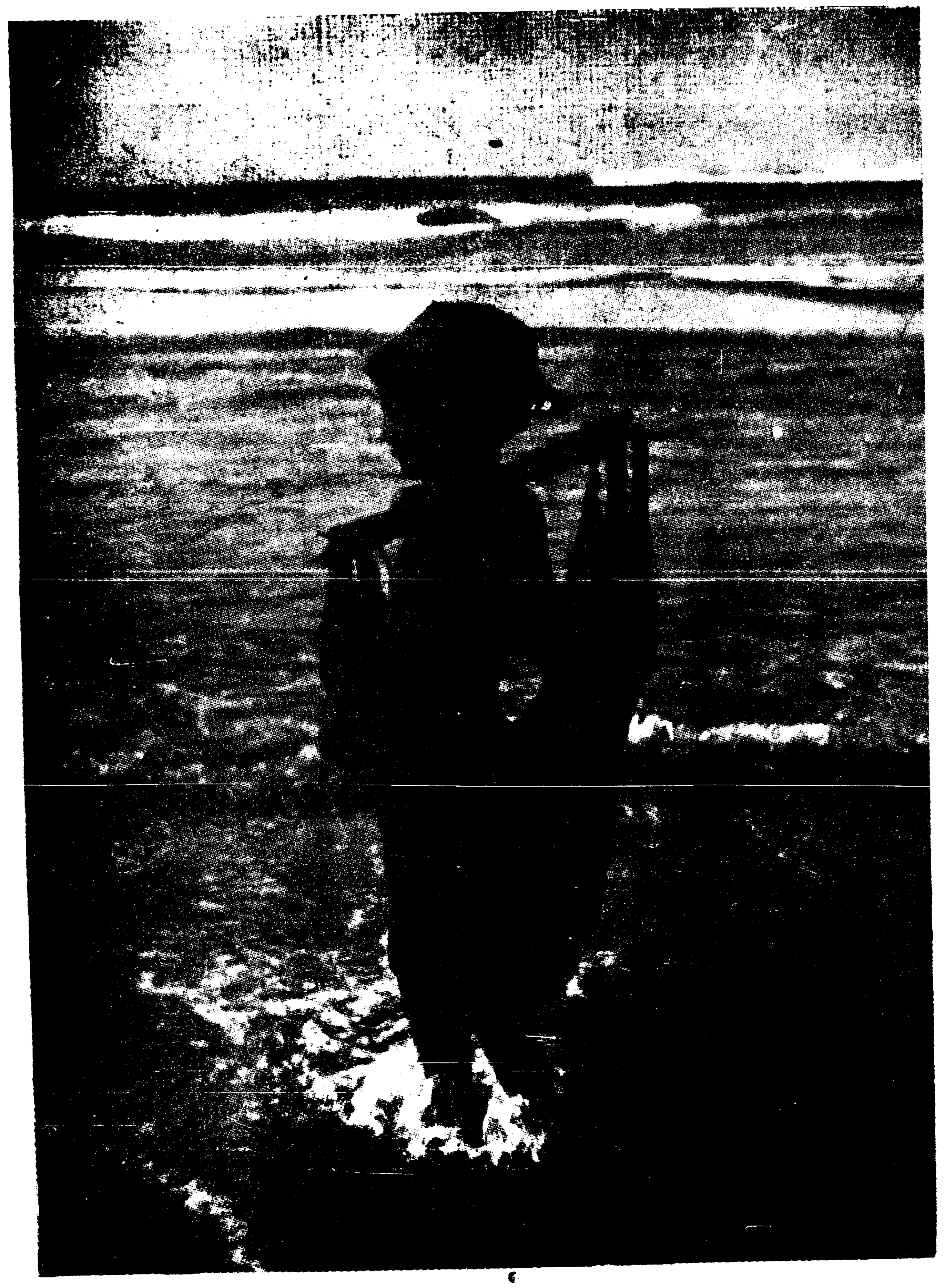

জেলের ছেলে
আলোকচিত্র-শিল্পী : শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

১০ম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৪ | ৯ম সংখ্যা

পিতৃহারা

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

মাতা গেছেন গত বরষ, পিতাও নাই আর,
দেবতা মোর এমনি করে হচ্ছে নিরাকার।
একে একে হচ্ছে খালি বুকের সিংহাসন,
মাতা-পিতার লাগি আমার মন করে কেমন!

আমায় ঘিরে আবার আসে সে সুখ-শৈশব,
কোথায় আমার স্নেহের সে নীড়, সঙ্গীরা কই সব?
সইতে নারি সাধের ধরার এ পরিবর্ত্তন,
মাতা-পিতার লাগি আমার মন করে কেমন!

সম্মুখে মোর মিলিয়ে গেল স্নেহের হিমালয়,
এমন বিরাট্ বিয়োগ-বেদন কেমন করে সয়!
নিরাশ্রয় হায় শিশুর মত কাঁদছি অনুক্ষণ,
মাতা-পিতার লাগি আমার মন করে কেমন!

বয়স আমার অনেক হ'ল সান্ত্বনা পাই কই?
ছেলে চিরদিবস ছেলে তার তো বেশী নই!
শূন্য আমার ভূতল-গগন, শূন্য ত্রিভুবন,
মাতা-পিতার লাগি আমার মন করে কেমন!*

বাড়ি চাই, বাড়ি!

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

নাঃ, আর পারি নে। সেই সকালবেলা বেরিয়েছি, এখন বেলা বাজে একটা। ক্ষিদেয় নাড়ী-ভুঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর কী রোদ—বাপ্‌স্! হাঁটতে-হাঁটতে পা দুটো বোধ হয় ইঞ্চিখানেক ছোট হ'য়ে গেছে! দেখি।...নাঃ, ঠিকই তো আছে মনে হচ্ছে। এবারে ফিরে যাই। নাকি আর একটু দেখবো? এই একটা নতুন রাস্তা মনে হচ্ছে। কী নাম রাস্তার? রাজা রাজেন্দ্র রোড। ও-হো, নামের কী ছিরি! একেবারে রাজ-রাজড়ার বাজার বসিয়েছে যেন! যাক গে, এত দূরে এলুম যখন, এখানেও একটা ঢুঁ মেরে যাই। কে জানে কোথায় কার কপাল খোলে? হয়তো আর দু'পা হাঁটলেই ঠিক মনের মত...উঃ! এই একমাস

* গত ৪ঠা আষাঢ় দশহরার দিন কবির পিতৃদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ধ'রে রাস্তার কুকুরের মত পথে-পথে বেড়াচ্ছি, সোজা রাস্তায় হাঁটলে এতক্ষণে বোধ হয় পৃথিবী চক্কোর দিয়ে আসতে পারতুম। বাড়িও তো কম দেখলুম না—ছোট বাড়ি, বড় বাড়ি, সাদা বাড়ি, হলদে বাড়ি, লাল বাড়ি, ঝকঝকে বাড়ি, নড়বড়ে বাড়ি, স্যাঁৎসেঁতে বাড়ি, ম্যাটমেটে বাড়ি, ঝাঁঝরা পাঁজরা-দেখানো, মুখ-ভ্যাংচানো লবজং বাড়ি, আনকোরা রঙ-করা, ফ্যাশানওয়ালা, শান-পালিশ-বার্নিশ-কার্নিশে কেষ্ট-বিষ্টু অতি-পুরুষ্টু বাড়ি...বাড়ি তো সবশুদ্ধ কম দেখলুম না, কিন্তু ঠিক আমার থাকবার মত বাড়ি একটাও নেই। তা হ'লেও, বাড়ি একটা না-হ'লেই বা চলবে কি ক'রে? বাড়ি যদি পাওয়া না-ই যায় তবে আমি থাকবো কোথায়? থাকতে তো আমাকে হবেই। মশাই, বিশ্বাস না হয় না করবেন, কিন্তু কোনখানে আমাকে থাকতেই হবে, এ হচ্ছে খাঁটি সত্যি কথা। এক কাজ করা যাক্। টালিগঞ্জ কি ওয়াটগঞ্জ, বেহালা কি চেৎলা, যাদবপুর কি ব্যারাকপুর কোনওখানে বেশ ভালো দেখে একটা মস্ত গাছে চ'ড়ে বসা যাক্—হাঃ-হাঃ, ভাড়া লাগবে না অর্দ্ধ-পয়সা, দিব্যি সুখে দিন-গুজরান! কিন্তু কর্পোরেশনের লোক যদি হানা দেয়—বলে ট্যাক্সো দাও! বলবো, স'রে পড়, গাছে যে থাকে তার আবার ট্যাক্সো কি? পাখী কি ট্যাক্সো দেয়? বাঁদর কি ট্যাক্সো দেয়? ভীমরুল, জামরুল, বোলতা, নিমপাতা, কাঁঠাল, মাকাল, কঙ্কাল—এরা কি ট্যাক্সো দেয়? অবশ্যি কঙ্কাল ট্যাক্সোও দেয় না, গাছেও থাকে না। হাঃ হাঃ!

[পরিপাটি চুল, চোখে চশমা, ধব্‌ধবে ফিনফিনে জামা-কাপড় পরা এক যুবক সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।]

যুবক। মশাই, মাপ করবেন, আপনি এইমাত্র হাসছিলেন কেন?

সুখেন্দু (ধরা যাক্ তার নাম সুখেন্দু)। হাসছিলাম নাকি?

যুবক। বিড়বিড় ক'রে কথাও বলছিলেন যে! বাঃ, জানেন না! চমৎকার—ঠিক হয়েছে। আপনারটা হচ্ছে 'ইগো-কমপ্লেক্স্', এ রকম কেস্ প্রায়ই দেখা যায়...

সুখেন্দু। কি বললেন মশাই? কী হয়েছে? আমার কোন অসুখ করেছে নাকি?

যুবক। অসুখ আপনার করেছে, অবিশ্যি আপনি তা জানেন না। যখন সেরে যাবে তখন জানবেন। আমার চেম্বারে আসবেন—০০১ নম্বর জনক সিং রোডে—ভয় নেই আপনার, ফি লাগবে না।

সুখেন্দু। হঠাৎ আবার কী অসুখ করলো আমার! একটু বলবেন? (হাত বাড়িয়ে দিলে।)

যুবক (মৃদুহাস্যে)। থ্যাঙ্কিউ, নাড়ী দেখতে হবে না। আপনার অসুখ আপনাকে যেদিন বলতে পারবো সেদিন তো আপনি সেরেই যাবেন। ভয় নেই, এ অসুখে কেউ মরে না।

সুখেন্দু। খুব শক্ত ব্যামো নাকি?

যুবক (পিঠ-চাপড়ানো ভাবে) আমার চেম্বারে আসবেন, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। একটু দাঁড়ান, আমার নোট-বইয়ে টুকে নিই। মশায়ের নাম?

সুখেন্দু। আজ্ঞে?

যুবক। আপনার নামটা একটু বলবেন।

সুখেন্দু (মনে-মনে)। ওরে বাবা, নাম টুকে নিতে চায় কেন, পুলিশের লোক নয় তো! সারাদিন পথে-পথে ঘুরি, তাইতে নজর পড়েছে। কী করি এখন? নাম ভাঁড়াবো? না, না, তা হ'লে আরো হয়তো বিপদে পড়বো। হায় হায়, বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে শেষটায় কি শ্রীঘরে যাবো?

যুবক। আপনার নামটা···

সুখেন্দু। আজ্ঞে কিছুতেই মনে আনতে পারছি না।

যুবক। ঠিক! ঠিক! ঠিক মিলে যাচ্ছে। লোকাল য়্যাট্রফি অব মেমরি। খুব ইন্‌ট্‌রেস্‌টিং কেস্ মনে হচ্ছে আপনার। তা আপনি এক কাজ করবেন—কাল সকালে ন'টার সময় ঠিক এই রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি এসে আপনাকে চেম্বারে নিয়ে যাবো। মনে থাকবে তো ঠিক? আমারটা হচ্ছে মশাই পিওর লভ্‌ অব্‌ সায়ান্স—ঠিক আসবেন কিন্তু। [প্রস্থান]

সুখেন্দু। বাঁচা গেলো বাবা! কে না কে, পথের মধ্যে ধ'রে উৎপাত! ব্যামো হয়েছে না হাতী! নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। যাক্ গে, এ রাস্তাটা

তাড়াতাড়ি সেরে যাই। রাস্তাটা সুন্দর তো! তা এখানে কি আর বাড়ি খালি আছে! গোঁফওয়ালা, গোঁফ-কামানো, মোটা, রোগা, লম্বা, বেঁটে, কিপ্‌টে, টাম্বুস রিটায়ার্ড সবজজ, মাজিষ্ট্রর, পেশ্‌কার, মাষ্টার যে যার মতো বাড়ি তুলে দিব্যি গ্যাঁট হ'য়ে বসেছেন। এখানে নাক ঢোকায় কার সাধ্যি! আরে আরে, এই যে একটা টু-লেট ঝুলছে দেখছি! হ্যাঁ, সত্যিই তো, ঐ তো পষ্ট বড়ো-বড়ো কালো অক্ষরে টু-লেট লেখা! বাড়িটার বাইরের চেহারা তো ভালোই মনে হচ্ছে। সমস্তটা বাড়ি নয় তো? না, না, ঐ তো দেখছি উপরে লোক রয়েছে। বোধ হয় নীচের তলাটা খালি। কি হয়তো উপরেরই দু'খানা ঘর। দেখি খোঁজ নিয়ে, এখানে যদি কপাল খোলে।

[একজন গোঁফওয়ালা মোটাসোটা লোক সেই বাড়িরই দরজা থেকে বেরিয়ে এলো।]

সুখেন্দু। দেখুন মশাই—

গোঁফওয়ালা। দেখেছি, মশাই, সবই দেখেছি। দেখেই বেরিয়ে এলুম। মশাই আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, এটা কি আপনার উচিত?

সুখেন্দু। কী হয়েছে?

গোঁফওয়ালা। থাক্, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। বলি, ভদ্দরলোকের বাড়ির দিকে অমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকাটা কি ভালো?

সুখেন্দু। ও, আপনারা থাকেন বুঝি দোতলায়? তা দেখুন, আমি বাড়ির খোঁজ করছি।

গোঁফওয়ালা। বাড়ির খোঁজে এখানে কেন? বড়বাজার আছে, রাধাবাজার আছে, পিপুলপটি, চিংড়িহাটা, বেলেঘাটা কত জায়গা আছে···এত জায়গা থাকতে আপনি যে ঠিক আমার বাড়ির সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন তার কারণটা কী শুনতে পাই?

সুখেন্দু। বাঃ, আপনার বাড়ির গায়ে টু-লেট লেখা রয়েছে, দেখছেন না?

গোঁফওয়ালা। না মশাই, এখানে টুলেট-ফুলেট কিছু নেই, ভালো চান তো স'রে পড়ুন।

সুখেন্দু। মশাই, দয়া ক'রে একবার তাকিয়ে দেখুন। টু-লেট যখন রয়েছে বাড়ি নিশ্চয়ই খালি। সেইজন্যই তো তাকিয়ে দেখছিলাম।

গোঁফওয়ালা। ফোঃ! ঐ যে জানলায় পরদা রয়েছে দেখছেন না? বারান্দা থেকে আমার শালীর তিনখানা সাড়ি ঝুলছে—দেখছেন না? এ সব দেখেও উঁকিঝুঁকি দেয়ার কারণটা কী শুনি?

সুখেন্দু। দেখুন মশাই, সেই সকাল থেকে হন্টনং হন্টনং সহর ঢুঁড়নম্—এখন বেশি জ্বালাবেন না ব'লে দিচ্ছি। পারেন তো বাড়িওয়ালাকে ডেকে দিন।

গোঁফওয়ালা। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কী দরকার আপনার?

সুখেন্দু। সে ভয়ানক রহস্যের কথা মশাই। আপনার মগজে ঢুকবে না।

গোঁফওয়ালা। বুঝেছি, আপনি বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছেন। হাঃ-হাঃ!

সুখেন্দু। ও, বুঝতে পেরেছেন সেটা! অসংখ্য ধন্যবাদ।

গোঁফওয়ালা। মশায়ের ক'খানা ঘর চাই?

সুখেন্দু। ও, আপনিই বাড়িওয়ালা বুঝি। নমস্কার। আপনার এই বাড়ির কোন্ অংশটা ভাড়া দেবেন?

গোঁফওয়ালা। ক'খানা ঘর চাই আপনার?

সুখেন্দু। তা, ধরুন খান তিনেক···

গোঁফওয়ালা। হুঁ···তিনখানা। মশায়ের কী করা হয়?

সুখেন্দু। আজ্ঞে আমি জগত্তারণ ইস্কুলে মাষ্টারি করি।

গোঁফওয়ালা। জগত্তারণ ইস্কুলটা আবার কোথায়?

সুখেন্দু। লেক্ রোডে।

গোঁফওয়ালা। লেক্ রোডে? তা হবে। কত ইস্কুল হচ্ছে আজকাল!

সুখেন্দু। তা আপনার বাড়ি···

গোঁফওয়ালা। মশাই বিবাহিত?

সুখেন্দু। আজ্ঞে?

গোঁফওয়ালা। বলি, বিবাহ করেছেন?

সুখেন্দু। আজ্ঞে না।

গোঁফওয়ালা। বিধবা মা আছেন?

সুখেন্দু। আছেন।

গোঁফওয়ালা। ভাই-বোন?

সুখেন্দু। একটি ভাই, একটি বোন।

গোঁফওয়ালা। বিধবা মাসি-পিসি···

সুখেন্দু। মশাই, অত খোঁজে আপনার দরকার কি? বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছি, বাড়ি দেখাবেন—মাসি-পিসির খোঁজ দিয়ে আপনার কী হবে?

গোঁফওয়ালা। তা এক বছরের গ্যারান্টি দেবেন তো?

সুখেন্দু। মশাই, আপনার বাড়িই দেখলুম না তো অত কথায় কী হবে? বাড়িটা আগে দেখান, যদি পছন্দ হয়···

গোঁফওয়ালা। আর ভাড়াটি ঠিক পয়লা তারিখে চাই মশাই, নড়চড় না হয়।

সুখেন্দু। বাড়ি দেখাবেন কিনা বলুন, নয়তো···

গোঁফওয়ালা। একটু দাঁড়ান। (হাঁক দিয়ে) কেষ্ট, অ কেষ্ট, অরে কেষ্ট, হরেকেষ্ট! একতলার চাবিটা নিয়ে আয় তো রে!

সুখেন্দু। ও, একতলাটা বুঝি ভাড়া দেবেন?

গোঁফওয়ালা। হ্যাঁ, একতলাটা। তা আমার দোতলার চাইতে একতলাটাই ভালো।

সুখেন্দু। সে দেখলেই বুঝতে পারবো।

[প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেলো।]

সুখেন্দু। কই মশাই, আপনার কেষ্ট তো আসছে না! এদিকে রোদ্দুরে তো মাথা ফেটে গেলো।

গোঁফওয়ালা। এই যে, ছায়ায় এসে দাঁড়ান। অ কেষ্ট, অরে কেষ্ট, হরেকেষ্ট, রামকেষ্ট, প্রাণকেষ্ট!—ব্যাটা বোধ হয় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণে!

সুখেন্দু। আর কাউকে ডাকুন না!

গোঁফওয়ালা। মশাই, আমাকে কি নবাব-বাদশা পেয়েছেন যে দশটা চাকর রাখবো। খেটে খাই মশাই, বাবুগিরির ধার ধারি নে।

সুখেন্দু। আহা—সে-কথা কে বলছে! আপনার বাড়িটা দেখাবেন তো দেখান—অত ঝামেলা করবার সময় নেই।

গোঁফওয়ালা। ও, দেখেই স'রে পড়বেন—কেমন না? আপনাকে বলবো কি মশাই, জ্বালাতন হ'য়ে গেলুম। বলি, সত্যি-সত্যি বাড়ি ভাড়া নেবেন তো?

সুখেন্দু। তা নয় তো কি এই রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে পরিহাস করছি?

গোঁফওয়ালা। আর বলবেন না মশাই, রোজ সারাক্ষণ হাঁক-ডাক জ্বালাতন—বাড়ি দেখে-দেখে বাবুরা সব চ'লে যাচ্ছেন, তার পর আর কারো নাকের ডগাটি দেখবার উপায় নেই। ও-সব নবাবি আমার ধাতে সয় না বাপু।

সুখেন্দু (মনে-মনে)। গুঁফোটা তো আচ্ছা লোক দেখছি। বাড়ি দেখাবার নামটি নেই, খালি বকর-বকর! (জোরে) থাক্ মশাই, আপনাকে আর বিরক্ত করবো না, আমি চললুম।

গোঁফওয়ালা। আহা—হা, রাগ করলেন নাকি? কেষ্টটা তো এলো না, আসুন আপনাকে এমনি দেখিয়ে দিই। এই জানলা দিয়ে তাকালেই বুঝতে পারবেন। এই যে আসুন, গলা উঁচু ক'রে দেখুন না—ঐ দেখছেন ঘর, পাশেই আর একখানা, হ'লো দু'খানা। কি বললেন মশাই, ছোট ঘর? য়্যাঁ? মানুষের থাকবার ঘর তো ঐ রকমই হয়, বড় ঘর চান তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে থাকলেই পারেন। কি বললেন, খুপরি? মশাই, আপনার সাহস তো খুব! জানেন স্যার গৌরীশঙ্করের পার্সনেল য়্যাসিস্ট্যান্ট আমার এ-বাড়িতে ছ' বছর থেকে গেছে? অতি চমৎকার বাড়ি, মশাই—যেমন আলো-হাওয়া,—য়্যাঁ, কী বললেন? দক্ষিণ বন্ধ? তা মানুষ তো ও-রকম বাড়িতেই থাকে, খোলা চান তো গড়ের মাঠে থাকলেই পারেন। হ্যাঁ, রান্নাঘর আছে বই কি ও-দিকে, রান্না, ভাঁড়ার সব আছে মশাই। কি বললেন, ঐ টিনের ছাপরা খারাপ হ'লো? ও, ঘরের মধ্যে দিনরাত উনুনের ধোঁয়া না হ'লে বুঝি ভালো লাগে না? সুন্দর টিনের

রান্নাঘর ক'রে দিয়েছি, মশাই, ও-রকম আর কোথাও পাবেন না। আর ঐ কলতলাটা টিন দিয়ে ঘেরাও ক'রে নিলেই তো বাথরুম হ'য়ে গেলো, টিন না হয় আমিই দেব। কী সুন্দর বাড়ি দেখলেন তো? ভাড়া পঞ্চাশ টাকা—মাসের পয়লা তারিখেই দিতে হবে কিন্তু।···ও কী···কী হ'লো মশাই···ও মশাই, শুনুন, শুনুন, আরে শুনেই যান না···

সুখেন্দু (রাস্তার মাঝখানে লাফাতে-লাফাতে)। আমি পাগল হ'য়ে যাবো, আমি পাগল হ'য়ে যাবো!

ইতালীর মুসোলিনী

(শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর)

এক আপেল-বাগানে একদল ছেলে ঢুকেছে আপেল চুরী করতে। একজন গাছের উপর গিয়ে উঠেছে, ডালে ডালে ঝাঁকানি দিয়ে সে নীচে ফল ফেলে দিচ্ছে, দলের সকলে তাই কুড়িয়ে নিয়ে নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করছে। এমন সময় লাঠি হাতে বাগানের মালী এসে হাজির, সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল দিল ছুট্। গাছের উপর যে ছিল, তারই হ'ল বিপদ্—নেমে আসতে আসতে দেরী হয়ে যাবে—ধরা পড়ে যাবে! তাড়াতাড়ি সে নীচে লাফিয়ে পড়লো, তার পর ছুটে পালাতে গিয়ে দেখে, আর উঠে দাঁড়াতেই পারছে না—পা ভেঙ্গে গেছে। দলপতি তখনও পালায় নি, দলের কেউ পেছনে পড়ে থাকবে, সে পালিয়ে যাবে সে ছেলে সে নয়। বন্ধুর বিপদ্ দেখে সে এগিয়ে এল—দু'হাতে বন্ধুকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে ছুটলো—প্রাণপণে।

দলের ছেলেরা বললে—হ্যাঁ! এমন না হ'লে দলপতি!

এই দলপতিটীর নাম বেনিতো মুসোলিনী।

ছেলেটী অসম্ভব দুষ্টু, এমন দিন নেই যেদিন মারামারি না করে ইস্কুল থেকে ফিরবে। মাষ্টাররা বেশী কড়াক্কড়ি করলে ইস্কুল পালিয়ে মাঠে-মাঠে ঘুরতে সুরু করবে। মা তাকে কত চেষ্টা করেন শোধরাবার জন্য, সাধু-সন্ন্যাসীদের গল্প বলেন, গির্জ্জায় নিয়ে যান, কিন্তু ছেলের মেজাজ এতটুকু বদলায় না, মন তার ঘুরছে নানা রকম ফন্দি-ফিকিরের পেছনে।

লেখাপড়ায় বেনিতো বেশ ভাল ছেলেই ছিল। কিন্তু সামান্য দু'খানা বইয়ের পড়ার জন্য

TIGHT BINDING

ইস্কুলে ছ' ঘণ্টা আটকে থাকা বেনিতোর কাছে ছিল অসহ্য, একটু সুযোগ পেলেই সেজন্য সে ইস্কুল থেকে পালাতো।

বাপ ছিলেন কামার, তিনি লেখাপড়া মোটেই পছন্দ করতেন না, যখন তখন তিনি বেনিতোকে ডেকে পাঠাতেন কামারশালায় হাতুড়ি পেটানর জন্য।

বাপ যতক্ষণ আছেন ছেলে ততক্ষণ হাতুড়ি পেটে, বাপ যেই চোখের আড়ালে গেছেন, একটু ফাঁক পাওয়া গেছে, অমনি হাতের হাতুড়ি থামিয়ে বেনিতো বক্তৃতা সুরু করে দিলে; ফাঁকা ঘর—নিজেই বলে, নিজেই শোনে।

মুসোলিনী—কর্ম্মজীবনে নেমে বক্তৃতা দিচ্ছেন

চীৎকার শুনে মা এসে পড়লেন, জিজ্ঞাসা করলেন,—কি করছিস রে, অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

বেনিতো জবাব দিলে—লেক্চার দিচ্ছি!

মা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কারা শুনছে?

গম্ভীর ভাবে ছেলে বললে—আজ কেউ শুনছে না, কিন্তু একদিন হয়তো আমার বক্তৃতাই লোকে শুনবে!

মা আর কিছু বলেন না।

গাঁয়ের পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল। বাবা বল্লেন—আর পড়াশুনার দরকার নেই, আমার কামার-শালায় কাজ করুক!

মা'র সে কথা মনে লাগবে কেন, তিনি নিজে ছিলেন শিক্ষয়িত্রী, বললেন—তা হয় না, এ যুগে লেখাপড়া না শিখলে ছেলে পাঁচজনের মাঝে গিয়ে দাঁড়াবে কেমন করে?

শেষে মায়ের কথাই রইল, এক পাদ্রীর ইস্কুলে বেনিতোকে বাবা ভর্ত্তি করে দিয়ে এলেন।

ভিন্ গাঁয়ের ইস্কুল। বোর্ডিংয়ে থাকতে হবে, আর ইস্কুলে পড়তে হবে, নিয়মকানুন বড় কড়া। কোথায় মা-বাবা, আর কোথায় সে পড়ে আছে! দুরন্ত ছেলের প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে!

দু'দিন যেতে না যেতেই গোঁয়ার্ত্তুমির জন্য তাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

বেপরোয়া কামারের ছেলে আর এক ইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হ'ল। সেখানে ক'দিন পরে আবার সেই গোলমাল—নানান্ অভিযোগ! গতিক সুবিধার নয় দেখে শাস্তি পাবার আগেই বেনিতো ইস্কুল থেকে উধাও—

ক'দিন আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, শেষে ইস্কুলের অধ্যক্ষ বেনিতোর বাবার কাছে চিঠি লিখলেন। বাবা চিঠি পেয়ে বেনিতোকে নিয়ে এসে আবার বোর্ডিং-ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে গেলেন।

এই ইস্কুল থেকেই ক'বছর পরে বেনিতো শিক্ষক হবার ডিপ্লোমা নিয়ে বেরুলো।

কতদিন চেষ্টার পর দূরে নদীর তীরে ছোট একটী গ্রাম্য পাঠশালায় এক মাষ্টারী মিলে গেল। মাইনে প্রায় সাড়ে আট টাকা (ইতালিয়ান মুদ্রায় ৫৬ লীরা)।

চল্লিশটী ছেলে নিয়ে ছোট্ট পাঠশালাটী। ঘণ্টা চারেক করে রোজ পড়াতে হয়। পড়ানোর হাঙ্গামাও বিশেষ কিছু নেই—ছেলেগুলো ভারী শান্তশিষ্ট।

পড়ানোর পরেও হাতে সারাদিন সময় থাকে প্রচুর; সেই সময়টুকু আড্ডা দিয়ে, তাস খেলে কাটিয়ে দেবার ছেলে বেনিতো নয়, তিনি শুধু বই পড়েন। পড়ে পড়ে যখন আর ভাল লাগে না, তখন ছবি আঁকেন। না হলে বেহালা বাজান, গান গান, নাচেন—এক মিনিট সময় বাজে যায় না।

ক'মাস পরে পাঠশালার বার্ষিক ছুটি পড়লো, বেনিতোর হাতে তখন সামান্য কিছু পয়সা জমেছে, তিনিও সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়লেন সুইট্জারল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে।

ভস্ ভস্ করে ট্রেন যখন সুইট্জারল্যাণ্ডের এক ষ্টেশনে বেনিতোকে নামিয়ে দিয়ে গেল, হাতে তখন মাত্র সাড়ে চার আনা পয়সা (দু লীরা)। অচেনা-অজানা জায়গা, হাতে মাত্র ওই ক'আনা পয়সা—কতক্ষণই বা লাগে খরচ হতে!

বাবার কাছে চিঠি লিখে যে টাকা চেয়ে পাঠাবেন তারও উপায় নেই, এক ভোটের ব্যাপারে মারামারি করার জন্য তাঁর জেল হয়েছে। কাজেই যা হোক কিছু একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে হ'ল। প্রথমে রাজমিস্ত্রি, তারপর কুলি, তারপর হোটেলের বয়!—একে একে অনেক কিছুই তাঁকে করতে হ'ল। এক জায়গায় কাজ করেন, হাতে কিছু পয়সা জম্‌লেই চাকরী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন নতুন দেশ দেখতে, সেখানে অর্থহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আবার একটা চাকরী জোটান্!

এমনি ভাবে একদিন জেনেভায় এসে পৌঁছলেন হাঁটাপথে।

ট্রেনের ভাড়া ছিল না, সারাদিন হেঁটেছেন, রাত্রের জন্য একটা আশ্রয় না পেলে চলছে না।

এমন পয়সা নেই যে কোন হোটেলে গিয়ে থাকেন। শেষে পথের ধারে একটা প্যাকিং বাক্স পড়ে থাকতে দেখে তার মধ্যে ঢুকে দিব্যি ঘুমাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

এক ঘুমেই রাত কাবার।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখেন এক পুলিস সার্জ্জেণ্ট সামনে দাঁড়িয়ে!

সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে বেনিতোকে থানায় যেতে হ'ল। বেকার বলে ক'দিন বেনিতোকে হাজতে আটকে রাখা হ'ল।

এমনি ভাবেই নানান্ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডে মুসোলিনীর দিন কাটতে লাগলো।

বেনিতো যখন দেশে ফিরলেন তখন ইতালীতে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। 'সোস্যালিষ্ট্' বলে একটা নতুন দল তখন ইতালীতে বড় প্রবল হয়ে উঠেছে। মুসোলিনীর বাবা ছিলেন সেই দলের একজন পাণ্ডা, দলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে, তিনি তখন এক জায়গার মেয়র হয়েছেন। ছেলেকে তিনি পাকা সোস্যালিষ্ট করে গড়ে তুললেন।

দু'বছর পরে এই মতবাদ প্রচারের জন্য আবার তাঁকে যেতে হ'ল সুইট্জারল্যাণ্ডে।

এই সময় খবর পেলেন—মা মরণাপন্ন। বেনিতোকে ফিরে আসতে হ'ল মা'র কাছে ইতালীতে। মা মারা গেলেন। মন বড় খারাপ, দিন আর কাটে না। শেষে ফোরলি সহরের সোস্যালিষ্ট শ্রমিক-সমিতির সেক্রেটারীর চাকরী নিলেন, মাইনে প্রায় আঠারো টাকা (১২৫ লীরা)।

এই সময় পাড়ার একটী মেয়ে তাঁর শোকাচ্ছন্ন মনকে সান্ত্বনার কথা শোনাতো, কাছে কাছে থেকে তাঁকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতো। মেয়েটীকে বেনিতোর ভাল লাগে, ক'মাস পরে এই মেয়েটীকেই তিনি বিয়ে করেন, মেয়েটীর নাম—ডোনা র‍্যাচেল।

স্বামি স্ত্রী—আঠারো টাকা মাইনেতে দুটী লোকের চলা মুস্কিল। বন্ধুরা বলেন—'মাইনে বাড়িয়ে দি'—

মুসোলিনী জানালেন তার দরকার নেই। শ্রমিক-সমিতি কুলিমজুরদের চাঁদায় চলে, মাইনে বাড়ানো মানে তাদের কষ্টের পয়সা নিজের সুখের জন্য খরচ করা। তা তিনি চান না।

কাজেই দুঃখ্-কষ্টের মধ্যে দিয়েই দিন চলতে থাকে।

দিনের পর দিনে হয় সপ্তাহ—সপ্তাহ কেটে হয় মাস—মাস ফুরিয়ে যায় বছরে—বছরের পর বছর চলে—

ফোরলির লোকেরা ঠিক করলে, একখানি কাগজ বা'র করতে হবে। জন কতক কর্ম্মী

অবিরাম পরিশ্রম করে যা করতে পারে না, একখানি কাগজ ছেপে সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে তার চাইতে বেশী কাজ হয়।

কাগজ বেরুলো। ইতিমধ্যে কুলি-মজুরদের সম্পর্কে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখে তিনি বেশ নাম করেছেন; কাজেই সম্পাদক হ'তে হ'ল মুসোলিনীকেই।

ক'দিন পরেই গরম গরম লেখার জন্যে তাঁর তিন সপ্তাহ জেল হ'ল।

জেল থেকে বেরিয়ে 'ইল পোপোলো' কাগজের সহঃ সম্পাদক হয়ে তিনি গেলেন 'ত্রেঁতে'। যাবার সময় বাবাকে বললেন—ইতালীকে আমি মুক্তির বাণী শোনাব, এবার অষ্ট্রিয়ান্দের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া। পিতা কোন বাধা দিলেন না, শুধু হাসলেন মাত্র।

ত্রেঁত তখন অষ্ট্রিয়ার অধীন। ইতালী তখন খুব দুর্ব্বল, তার সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য, ফরাসী, জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া, খানিক-খানিক স্থান নিজেদের অধীন করে নিয়েছিল। ইতালিয়ানরা চেষ্টা করছিল, সেই সব স্থানগুলিকে আবার উদ্ধার করে আন্তে; সেই উদ্দেশ্যেই মুসোলিনী ত্রেঁতে এলেন।

'ইল্ পোপোলো'র গরম-গরম লেখা পড়ে অষ্ট্রিয়ানরা ক্ষেপে উঠলো, ত্রেঁত থেকে মুসোলিনীকে বার করে দিলে।

১৯১৪ সালে জার্ম্মান যুদ্ধ সুরু হ'ল।

মুসোলিনী তখন 'লা অভান্তি' পত্রিকার সম্পাদক। ৯০ হাজার কাগজ বিক্রী হয়, সম্পাদকের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। মুসোলিনী ভেবে দেখলেন, এই সুযোগে জার্ম্মানরা যদি হেরে যায় তা হ'লে ইতালীর পরাধীন অংশটা তাদের কবল থেকে উদ্ধার করার সুবিধা হবে। এক সভায় বললেন—লড়াইয়ে যোগ দাও—লড়াই চাই!

সোস্যালিষ্টদের কাগজ, তারা যুদ্ধ-বিরোধী, তক্ষুণি তারা বেনিতোকে দল থেকে তাড়িয়ে দিলে। মুসোলিনী নিজে কাগজ বার করলেন—'ইল্ পোপোলো দ্য ইতালিয়া।' লিখে চললেন—যুদ্ধ চাই!

সোস্যালিষ্টরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠ্লো, মুসোলিনীকে পদে পদে তারা লাঞ্ছিত করতে লাগলো, কিন্তু বেনিতো দমলেন না, ক'জন মাত্র সহকারীর সহযোগিতায় তিনি নিজের মতবাদ প্রচার করে চললেন—যুদ্ধ চাই!

এদিকে হাতে একটী পয়সা নেই। কম্পোজিটাররা মাইনে পায় না। খাবার পয়সা পর্য্যন্ত সব দিন পকেটে থাকে না, কিন্তু মুসোলিনী তখন 'মরিয়া' হয়ে উঠেছেন।

শেষ পর্য্যন্ত মুসোলিনী জয়ী হলেন। ইতালীর লোকেরা যুদ্ধে যোগ দিলে। মুসোলিনীও কলম ছেড়ে বন্দুক ধরলেন, সৈন্যদলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

সাধারণ সৈনিকের দল রাত্রির অন্ধকারে ট্রেঞ্চের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে, উপরে অসংখ্য বোমা আর কামানের গোলা অবিরাম দুম্‌দাম্‌ করে ফাটছে! কখন কোন্‌টা ছিট্‌কে এসে লাগে, কখন কার প্রাণ যায়! অবস্থা প্রতিমুহূর্ত্তেই সঙ্গীন হয়ে আসছে, সেনা-নায়ক আদেশ করলেন—নিজ-নিজ মাথা বাঁচাবার মত আশ্রয় খুঁজে নাও।

রাত্রির অন্ধকার গন্ধকের ধোঁয়ায় আরো গভীর দৃষ্টিহীন হয়ে উঠেছে। তারই বুক চিরে লাল জ্বলন্ত কামানের গোলাগুলো এদিকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে। আদেশ পাবামাত্রই সৈনিকের দল ট্রেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়লো, এদিক্‌ ওদিক্‌—যেখানে হয় একটু আশ্রয় চাই। বোমা ফাটার আলোয় মাঝে মাঝে চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে পলায়মান সৈন্যদের ইতস্ততঃ ছুটোছুটি। সহসা মুসোলিনীর চোখে পড়লো পাশের সৈনিকটী পালাতে গিয়ে পড়ে গেল, বোমার আঘাতে তার একখানি হাত উড়ে গেছে। নিজের পালানোর কথা বেনিতো ভুলে গেলেন, তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গেলেন এক গাছের নীচে; নিজের কম্বলখানা তার গায়ে চাপা দিয়ে দিলেন। আহত সৈনিক তখন এক চুমুক জল খাবার জন্য কাতরাচ্ছে। কাছে জল নেই, সেই গোলাগুলির মধ্যে জল আনতে যাওয়া মানে মরণের মুখে এগিয়ে যাওয়া। তবু বেনিতো কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটলেন জল আনতে।

এই ধরণের অসংখ্য সাহসের কাজ করার জন্য মুসোলিনী কর্পোরালের পদে উন্নীত হলেন।

কিন্তু সাহসের সঙ্গে বিপদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

সে এক দুর্য্যোগের রাত্রি। অষ্ট্রিয়ানদের মেশিন-গান কেড়ে নেবার জন্য ইতালিয়ানরা তাদের আক্রমণ করেছে। সাম্‌নে অষ্ট্রিয়ানদের কামান বারবার গর্জ্জন করছে, তবু ইতালিয়ানরা এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ একটা বোমার আঘাতে মুসোলিনী ধরাশায়ী হলেন।

আঘাত হয়েছিল গুরুতর। রেড্‌ক্রশ সোসাইটীর লোকেরা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে নিয়ে গেল।

যুদ্ধ যখন শেষ হ'ল ইতালী হিসাব করে দেখলে তাদের দু'লক্ষ সৈন্য মরেছে, আহতও বড় কম হয় নি।

এতগুলি জীবনের বিনিময়ে ইতালী-শক্তির যা লভ্য হ'ল তা কিন্তু নিতান্তই সামান্য। সব

আশা ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তবু মিত্রশক্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার ক্ষমতা তখন ইতালীর ছিল না। দেশে তখন প্রায় অরাজকতা স্থরু হয়েছে, রুষিয়ার বলশেভিক্‌দল ইতালী ছেয়ে ফেলেছে, সোস্যালিষ্টরা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, মন্ত্রীরা কোন্‌ দিকে যাবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না। মুসোলিনী সেই সময় ১৫০ জন যুদ্ধফেরৎ সৈনিক নিয়ে নিজের একটী দল গড়ে তুললেন, নাম দিলেন—ফ্যাসিস্ত।

কিছুদিন পরে ইতালীর প্রধান মন্ত্রী ফ্যাসিস্ত-নেতার এক চিঠি পেলেন—'দু'দিনের মধ্যে আপনি পদত্যাগ না করলে জোর করে আপনাকে সরিয়ে দেওয়া হবে।'

চিঠি পেয়েই প্রধান মন্ত্রী ফ্যাক্‌টা, রাজার কাছে অনুমতি চাইতে গেলেন—বিদ্রোহীর স্পর্দ্ধা দমন করার জন্য সৈন্য যোগাড় করতে হবে।

সম্রাট তৃতীয় ভিক্‌টর্‌ ইমানুয়েল কিন্তু অনুমতি দিলেন না, মুসোলিনীকে চিঠি লিখলেন—এসো, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কর। বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন, অরাজকতার মধ্যে শৃঙ্খলা আন্‌তে মুসোলিনীর মত শক্ত লোকই চাই। দু'দিন পরে, ১৯২২ সালের ৩০শে অক্টোবর ৩০ হাজার কালো পোষাক পরা ফ্যাসিস্ত দল মার্চ্‌ করে এসে রোম দখল করলে, মুসোলিনী ইতালীর প্রধান মন্ত্রী হলেন।

মন্ত্রী হয়ে মুসোলিনী সমগ্র ইতালীকে নতুন করে গড়ে তুললেন—দুর্ব্বল পঙ্গু ইতালী তাঁর হাতে সবল ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠলো।

চাষা ও মজুররা যাতে ভাল ভাবে থাকতে পায়, দিন দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পায়, তিনি সে ব্যবস্থা করেছেন। সারা দেশময় মোটরের লাঙল আমদানী করেছেন—চাষারা যাতে বেশী জমি চষে বেশী রোজগার করতে পারে। কলকারখানার মজুরদের খাটুনীর সময় কমিয়ে দিয়েছেন। গরীব ছেলেদের ভাল করে লেখাপড়া শিখে 'মানুষ' হবার সুবিধে করে দিয়েছেন। সরকার থেকে ইতালিয়ানদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে দরকার হ'লে রণক্ষেত্রে দেশের জন্য প্রাণ দিতে তারা ইতস্ততঃ না করে। সারা দেশকে তিনি সৈন্য করে তুলেছেন,—প্রত্যেক ছাত্রকে সৈনিক হতে হবে। তার উপর যে সব ছেলে ভাল করে তলোয়ার চালাতে পারবে তাদের প্রতি বছর 'মুসোলিনীর তলোয়ার' পুরস্কার দেওয়া হয়।

গরীব দুঃখীদের তিনি ভাল বাসেন, কথায় কথায় তাদের বলেন—তোমরা মনে রাখবে আমি কামারের ছেলে, পনেরো ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি হাতুড়ি পিটেছি, আমি তোমাদেরই একজন। কথায় ও ব্যবহারে মুসোলিনীর পার্থক্য নেই এতটুকু।

একদিন মুসোলিনী তাড়াতাড়ি করে মোটারে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। যাবার পথে রেল

লাইনের এক লেভেল্ ক্রসিংয়ে ফটক বন্ধ থাকায় মোটার আটকে গেল। মুসোলিনী জিজ্ঞাসা করলেন—গেট্ বন্ধ কেন ?

দরোয়ান বললে—মুসোলিনীর ট্রেন যাবে, তাই—

সত্যই সেদিন মুসোলিনীর ট্রেনেই যাবার কথা ছিল।

মুসোলিনী জিজ্ঞাসা করলেন—মুসোলিনী কে ?

জানেন না, তিনি এ দেশের প্রধান মন্ত্রী।

তুমি তাঁকে দেখেছ ?

না, তবে ছবিতে দেখেছি, দেখলে চিনতে পারবো।

আমায় চেন ?

দরোয়ান চমকে উঠলো, তাইতো এঁকেও তো সেই ছবির মতই দেখতে, ইনিই নাকি মুসোলিনী ! ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার জন্য মুসোলিনী তখন হেসে উঠলেন, বললেন—আচ্ছা তোমার মুসোলিনীর ট্রেন যাক, আমি ততক্ষণে অপেক্ষা করছি। বলে মোটার থেকে নেমে দরোয়ানের ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুললেন।

মানুষ হিসাবেও মুসোলিনী চমৎকার। একবার বায়োস্কোপের বিখ্যাত বালক-অভিনেতা জ্যাকি কুগান্ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যান তাঁর আপিসে। মুসোলিনী তখন ভয়ানক ব্যস্ত, কিন্তু জ্যাকির নামের কার্ড দেখেই বললেন—কে বায়োস্কোপের জ্যাকি ? নিয়ে এসো—

তার পর সব কাজকর্ম্ম ভুলে ঘণ্টাখানেক জ্যাকির সঙ্গে আড্ডা।

এত সদ্গুণ থাকা সত্ত্বেও মুসোলিনীর দোষও আছে। মন্ত্রী হয়ে বিরোধী মতাবলম্বীদের মুখ তিনি বন্ধ করে রেখেছেন। চিন্তার স্বাধীনতা বলে কোন জিনিষই ইতালীতে আজ নেই। তাঁর কর্ম্মধারা সমস্ত পৃথিবীকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। নিজের দেশকে বড় করে তুলেছেন সত্য, কিন্তু তাকে আরো বড় করার জন্য অন্য দেশের সঙ্গে লড়াই করে জগতের শান্তি নষ্ট করতে তিনি পেছ্‌পাও হন্ নি। সে পরিচয় আমরা পেয়েছি গত আবিসিনিয়া-যুদ্ধে। একটা অন্যায় অজুহাতে তিনি সে দেশ দখল করে নিয়েছেন। শান্তিকামী আবিসিনিয়ার অসংখ্য লোককে বিষাক্ত গ্যাসে জীবন দিতে হয়েছে—যে রেড্‌ক্রশ-সমিতি একদিন জার্ম্মান-যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর জীবন রক্ষা করেছিল, তাদের তাঁবুতেও বোমা মারতে তাঁর অধীনস্থ ফ্যাসিস্ত-সৈন্যরা পেছোয় নি, এমন কথাও খবরের কাগজে বার হয়েছে। নিজেদের দেশের জন্য অপরের অনিষ্ট করবো এ যুক্তি দুনিয়ার কেউই সমর্থন করবে না। বর্ত্তমান ইতালী এবং জার্ম্মানীর কর্ম্মধারায় দুনিয়ায় এমনই এক হাওয়া বইতে সুরু করেছে যে আবার একটা মহাযুদ্ধ বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ভৌতিক কাহিনী

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ)

যথাসময়ে ট্রেনে উঠে বসা গেল।

যা বর্ষা বাইরে নেমেছে তা'তে নির্ব্বিঘ্নে ও শুকনো অবস্থায় ট্রেনের কামরায় আশ্রয় পাওয়া আমার কাছে যেন দুরাশা ছিল। বেশ সুস্থিরে আমার সামান্য জিনিষপত্তরগুলো গুছিয়ে কামরার একেবারে পাশের একটা বেঞ্চে ব'সে পড়্‌লুম।

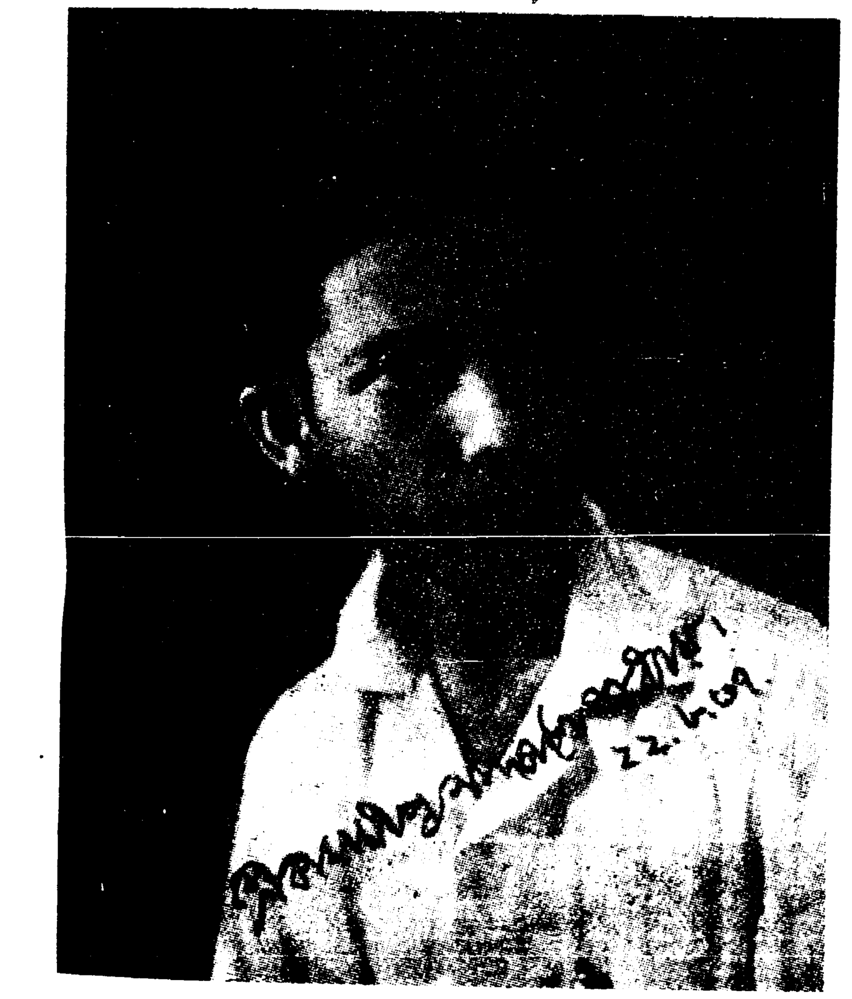

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আগামী কাল সকাল বেলায় পৌঁছুবো আমার কর্ম্ম-স্থানে, সমস্ত রাতটার মধ্যে আর কোনও অসুবিধে নেই। ট্রেন ছাড়্‌তে এখনও আধ-ঘণ্টাটাক দেরী ; ক'য়েকটা মাসিকপত্র এনেছি—ট্রেন-ভ্রমণের পক্ষে অপরিহার্য্য এগুলো ; মেস্ থেকে এক পেট খেয়েও বেরিয়েছি, তা' ছাড়া সঙ্গেও কতকগুলো মিষ্টি আছে—বাকী রাতটার জন্য ভাবনা নেই তা' হলে ! গরম এক পেয়ালা চা খাওয়া যাবে খানিক পরে, তার পর একেবারে নিটোল একটি ঘুম—ব্যস্ !

ট্রেন ছাড়তে তখনও মিনিট দশেক দেরী আছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রৌঢ়-প্রায় ভদ্রলোক এক রকম ছুট্‌তে ছুট্‌তেই আমার কামরার সাম্‌নে এসে হাজির হলেন, তার পর ব্যস্তসমস্ত ভাবে হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়্‌লেন।

ভদ্রলোকের বেশবাস, মোট-ঘাট, চলন-বলন, সমস্তই অদ্ভুত ধরণের।—দিব্যি নধর তাঁর দেহটি, মানে কালো আর গোলগাল তাঁর চেহারা, কানের পাশের চুলগুলোয় সামান্য পাক ধ'রেছে; পায়ে একটা ফিতে-হীন কালো ডার্বি জুতো; কাপড়টা মালকোঁচা মারা, প্রায় হাঁটু অবধি উঠে এসেছে; গায়ে সবুজ পাঞ্জাবীর ওপর কালো একটা কোট, আর মাথায় একটা সোলার হ্যাট্। সঙ্গের মালপত্রের ভেতর মাত্র তু'টি জিনিষ—প্রথমটি বেয়াড়া সাইজের পেট-মোটা বড় একটি থার্ম্মোফ্লাস্ক, আর দ্বিতীয়টি কাঠের ষ্ট্যাণ্ডে আট্‌কানো জলের কুঁজো।

ভদ্রলোক গরমে অসহিষ্ণু হয়ে পট্‌পট্ ক'রে কোটের আর পাঞ্জাবীর বোতামগুলো টেনে খুলে ফেল্‌লেন, তার পর পাখার অভাবে সোলার হ্যাট্ নাড়িয়েই হাওয়া খেতে লাগ্‌লেন।

ট্রেন ছেড়ে দিল। একটু পরেই কানে এল, "ও মশাই, শুন্‌ছেন?"

দেখি, ভদ্রলোক তাঁর তু'টি লাগেজ্ তু' হাতে ঝুলিয়ে আমার বেঞ্চেই এসে বস্‌লেন। বল্‌লেন, "যা খট্‌খট্ ঘট্‌ঘট্ আওয়াজ, দূর থেকে তো কিছু শোনারই উপায় নেই। তাই এলুম আপনার কাছে—আপত্তি নেই তো?"

তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, "না না, আপত্তি কিসের?"

অমায়িক হাসিতে তাঁর সারা মুখখানা উদ্ভাসিত ক'রে ভদ্রলোক বল্‌লেন, "হেঁ হেঁ···তা' যা বলেছেন। আমি আবার গল্প কর্‌তে না পেলে পেট ফুলে মারা পড়ার যোগাড় হই মশাই!"

ভদ্রলোকের এই নিজের সম্বন্ধে উক্তি নেহাৎ মিথ্যে নয় প্রত্যক্ষ কর্‌লুম। পাঁচ মিনিটের ভেতরেই তাঁর নামধাম, আয়-ব্যয়, পারিবারিক সুখতুঃখ, মায় অফিসের বড়বাবুর মেজাজ ইত্যাদি সব রকম জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিই তিনি আমাকে বলে ফেল্‌লেন। কিন্তু মোটের ওপর মন্দ লাগ্‌ছিল না ভদ্রলোকটিকে—একটু কথা বেশী বলেন এই যা, কিন্তু তার ভেতর যে সরলতা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল তা আমার সত্যিই ভালো লাগ্‌ল।

রাত্তির সাড়ে এগারোটায় কোথায় কোন্ ষ্টেশনে তিনি নাম্‌বেন—সেখানেই তাঁর বাড়ী। ছুটীতে চলেছেন তিনি সেখানে। তাঁর স্ত্রী বহু দিন ধরেই একটা

থার্ম্মোফ্লাস্কের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি সুরু করেছেন তাই তাঁকে আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ করে দেবার জন্যে দোকানের ভেতর সব চেয়ে বড় আর মোটা সাইজের থার্ম্মোফ্লাস্কটা তিনি নিয়ে চলেছেন। তারপরেই আমাকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "আচ্ছা বলুন দিকিনি, এর ভেতর কি আছে?"

একটু হেসে বল্‌লুম, "চা কিংবা সরবৎ।"

তিনি বল্‌লেন, "মোটেই না, হ'ল না। এটা আপনাদের একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়—কেন, থার্ম্মোফ্লাস্ক হলেই তা'তে যে চা কিংবা সরবৎ থাকতে হবে তার কি মানে আছে শুনি? আজকালকার ছেলে-ছোক্‌রারা নতুনত্ব নতুনত্ব করে লাফায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে না আছে তাদের কল্পনার নতুনত্ব না আছে—" ভদ্রলোক তাঁর তেজস্বী বক্তৃতা হঠাৎ থামিয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা, খুলুন তো থার্ম্মোফ্লাস্কটা।"

কৌতূহলী হয়ে সেটার ঢাক্‌না আর ছিপি খুলে ফেল্‌লুম—আর তার পরে সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক্ হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না;—সত্যিই আইডিয়া আছে এই ভদ্রলোকের!

পকেট থেকে তু' টুক্‌রো পরিষ্কার অয়েলক্লথ বার করে ভদ্রলোক বেঞ্চের ওপর রাখ্‌লেন, তার পর ধীরে ধীরে থার্ম্মোফ্লাস্ক থেকে বার কর্‌তে লাগ্‌লেন ফাউল কাট্‌লেট্, মাংসের সিঙাড়া, মাটন্ চপ্, কত কি! সবগুলি জিনিষ থেকেই ধোঁয়া উঠ্‌ছে।

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "নিন্, সুরু করুন।"

পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে ভোজ্য দ্রব্যগুলির সদ্‌গতি করলুম। ভদ্রলোকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মনটা ভরে গেল। কিন্তু এবারে খাবার জল চাই। বল্‌লুম, "কুঁজো তো এনেছেন, কিন্তু গেলাস?"

হেসে ভদ্রলোক বল্‌লেন, "এই দেখুন আইডিয়ার অভাব! কেন গেলাসে কি হ'বে? এই অয়েলক্লথ্‌টা ধুয়ে নিন্; হ্যাঁ—এইবার ওটাকে ফানেলের মত ক'রে ফেলুন—ঠিক যেমন ক'রে বোতলে কেরোসিন ঢালে না, সেই রকম করেই জল খেতে হ'বে। নিন্, চোঙাটা মুখে লাগান আমি ঢেলে দিচ্ছি; আপনি 'নভিস্'

কিনা তাই একটু অসুবিধে হল, মানে বিষম খাবার 'টেন্‌ডেন্‌সি' দেখা যাচ্ছিল; কিন্তু এই দেখুন আমি নিজে কি রকম সহজে জল খাই।" এক হাতে অয়েলক্লথের ফানেলটা মুখে লাগিয়ে ভদ্রলোক অন্য হাত দিয়ে কুঁজো থেকে নিতান্ত সহজ ভাবে জল ঢেলে খেলেন। বুঝ্‌লুম ভদ্রলোক স্বাবলম্বীও বটেন!

সুস্থ হয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "ক'টা বেজেছে? সাড়ে দশটা? যাক্, এখনও সুস্থিরে ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নেওয়া যাবে। হাঁ—কিন্তু সোনার ঘড়িটা চেন শুদ্ধু পকেটে রেখে অমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকবেন না মশাই। তিন তিনবার ও রকম করে রাখায় আমার ঘড়ি চুরি গিয়েছে। মাণিব্যাগ্ নেই? তা'র ভেতরে পূরুন—আর সাবধান, রাতে কেউ সময় জান্‌তে চাইলে হুঁট্ ক'রে ঘড়িটা বার ক'রে বস্‌বেন না যেন।"

ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহ আমার চেয়ে অনেক বেশী। তাই আর আপত্তি না ক'রে বুক পকেট থেকে মাণিব্যাগ্‌টা বার করে ঘড়িটা তার একটা খোপে ভরে ফেললাম।

ভদ্রলোক হঠাৎ শিউরে উঠে বল্‌লেন, "সর্ব্বনাশ মশাই! করেছেন কি? এক সঙ্গে অতগুলো নোট্ পকেটে নিয়ে কখনও ট্রেন্-জার্‌নি কর্‌তে আছে! এই ইয়ং ম্যান্‌দের, মানে আপনাদের 'সেন্স অব্ রেস্‌পন্‌সিবিলিটি' ব'লে যদি কিছু থাকে! তার ওপর ওটা আবার রেখেছেন বুক পকেটে···সর্ব্বনাশ! একটু নীচু হবেন কি টুপ্ ক'রে কখন যে ওটা মাটিতে পড়ে যাবে তা' বুঝ্‌তেই পার্‌বেন না। রাখুন ওটাকে পাশের পকেটে—তার ওপর রুমালটা চাপান, কেউ তা' হ'লে সন্দেহই কর্‌তে পার্‌বে না।"

একটু লজ্জিত হয়েই তাড়াতাড়ি তাঁর কথামত কাজ কর্‌লাম। মনে হ'ল সেকেলে লোকদের আর যাই বলি না কেন, তারা সাবধানী এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।

ভদ্রলোকের গল্প চলতে লাগ্‌ল। নানা কথার পর অবশেষে ভূতের গল্প উঠ্‌ল। এই নির্জ্জন কামরায়, তৃপ্তি সহকারে এক পেট খাবার পর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখে অশরীরীদের সম্বন্ধে নানান্ আজগুবি, অদ্ভুত তথ্য শুন্‌তে বিশেষ

খারাপ লাগ্‌ছিল না। তা' ছাড়া বাইরে নেমেছে বর্ষা আর নির্জ্জন ঘনকালো রাত—ঐ আজ্‌গুবি গল্পের জন্যই যেন বিশেষ ভাবে সৃষ্টি হয়েছে!

অশরীরীদের সম্বন্ধে চিরকালই আমার ধারণা একটু সন্দিগ্ধ—তাই বোধ হয় কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমার ঠোঁটের পাশ দিয়ে একটু অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছিল। অশরীরীদের বদলে শরীরী ভদ্রলোকটিরই তা'তে যেন আঘাত লাগ্‌ল বেশী। তিনি বল্‌লেন, "দেখুন মশাই, এই যে যুগ এসেছে এটা অবিশ্বাসেরই যুগ। ফলে আজকাল আর সে রকম খাঁটি জিনিষ বেরুচ্ছে কই? কারণ শিক্ষা ও তাদের মূলই হচ্ছে বিশ্বাস। কিন্তু যাই বলুন, জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে যা আপনি যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝ্‌তেই পার্‌বেন না। আচ্ছা, আমারই জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি। এর যদি কোনও সঙ্গত অর্থ আপনি আমাকে জানাতে পারেন তা হ'লে বুঝ্‌ব যে আপনার এই অবিশ্বাসের তবুও খানিকটা যুক্তি আছে।

"সে বোধ হয় আজ বছর পাঁচেক আগেকার কথা। এমনিই বর্ষা নেমেছিল সেদিন কল্‌কাতায়। চিরকালই আমার দাবা খেলার সখ প্রবল, তাই ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে সেদিনও পাঁচুদা'র বাড়ীতে সন্ধ্যের মুখে হাজিরা দিতে মোটেই ভুল হয় নি। একে বর্ষার রাত, তার ওপর দাবার নেশা। খেয়ালই নেই কতক্ষণ খেলে চলেছি। পর পর দু' বাজি মাৎ হয়ে যাওয়ায় উত্তেজনায় আমি খাড়া হয়ে বস্‌তে যাচ্ছি এমন সময়ে ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বেজে উঠ্‌ল। চম্‌কে উঠ্‌লুম, ইচ্ছে থাক্‌লেও আর ছক্ নিয়ে বস্‌তে পারলাম না। পাঁচুদা' বল্‌ল সেই দুর্য্যোগের রাতে তার বাড়ীতেই থেকে যেতে, এবং তার কথা শুন্‌লেই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ করতাম। কিন্তু অদৃষ্টে আমার 'ভোগান্তি' লেখা আছে। পাঁচুদা'র কাছে পর পর দু'বার হেরে যাওয়ায় মনটা অকারণে তার ওপর বিমুখ হয়ে ছিল। তাঁর অনুরোধ-উপরোধ সদর্পে উপেক্ষা করে ঘরের কোণ থেকে ছাতিটা তুলে বেরিয়ে পড়লাম।

"উঃ, কি বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন কল্‌কাতায়! পাকা দু' মাইল পথ হাঁট্‌তে হবে, তা' ছাড়া সেই বর্ষার রাত্রে জোরে জোরে পা চালানোও তো আর সম্ভব হবে না!

যাই হোক্ মালকোঁচা দিয়ে কাপড়টা পরে নিলাম, আর জুতো যোড়া পা থেকে খুলে নিলাম হাতে ঝুলিয়ে।

"রাত হয়েছে অনেক, তার ওপর বর্ষার রাত আজ। পথে একটিও লোক নেই। কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো অসহায় ভাবে ভিজ্‌ছে, আশ-পাশের সমস্ত বাড়ীগুলোই নির্জ্জন—দরজা-জান্‌লা বন্ধ। এ পথেও বেশ জল জমেছে; মনটা এক অজানা কারণেই ছম্‌ছম্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

"আরও খানিক এগিয়ে এলাম। পথ এমন পেছল আর ঈশ্বরের কৃপায় শরীরটা এমন ভারী যে তাড়াতাড়ি যে পা চালাব তারও উপায় নেই।···কিন্তু আশ্চর্য্য, সেই দুর্য্যোগের রাত্রে গ্যাসের আব্‌ছা ঘোলাটে আলোয় হঠাৎ নজর পড়ল দূরে তে-মাথার মোড়ে একটা থার্ড-ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথা নীচু ক'রে ঘোড়াটা ভিজ্‌ছে, আর চালকের আসনে একটা ছাতার তলায় কে যেন বসে রয়েছে! আশ্চর্য্য, লোকটা এখনও তা' হলে যাত্রীর আশা করে!

গাড়োয়ানের সঙ্গে বেশী বাক্যব্যয় না করে তাড়াতাড়ি গাড়ীটায় উঠে পড়্‌লাম। তার পর জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার বাড়ীর ঠিকানাটা তা'কে জানিয়ে খড়খড়ি তুলে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বস্‌লাম।

"গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। ঘড়ঘড়—ঘড়ঘড় সেই একটানা শব্দ, আর গাড়ীর চালে বৃষ্টি-ফোঁটার অদ্ভুত চিড়্‌চিড়্।···গাড়ী চলেছে তো চলেইছে! ঝাঁকানিতে একটু তন্দ্রাই এসেছিল বুঝি, হঠাৎ বাজ পড়ার এক বিকট শব্দে চম্‌কে উঠে' হুঁস হ'ল এ আমি চলেছি কোথায়? অনেক আগেই তো আমার বাড়ী পৌঁছে যাবার কথা! চীৎকার করে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় সে চলেছে। তখনও কিন্তু উত্তর পেলাম না কোনও। আকাশে, বজ্রের সেই প্রচণ্ড চীৎকার, যেন কোনও অপদেবতার অট্টহাসি, আর পথে আর বাড়ীর চালে বৃষ্টির সেই ঝম্‌ঝম্, আর শ্রান্ত ঘোড়ার পায়ের সেই একঘেয়ে খুট্‌খুট্ খুট্‌খুট্ ধ্বনি!

"সত্যিই এক অজানা ভয়ে সমস্ত শরীরটা আমার কেঁপে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি খড়্‌খড়ির জানলাগুলো নামাতে গেলাম, কিন্তু সেগুলো খোলে কার সাধ্যি! আঁট হয়ে জমে আছে—দরজার অবস্থাও তাই। এ যেন কোনও অশরীরী আত্মার কার্‌সাজি! বুঝ্‌তেই পারছেন আমার অবস্থাটা!

"হঠাৎ মনে হল আমি যেন সে গাড়ীতে একা নই! আমার সাম্‌নের বসবার জায়গাটায় কে যেন খস্‌খস্ ক'রে উঠ্‌ল। আমার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে, আর আমার সমস্ত শরীরটাকে কে যেন স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছে। জিজ্ঞেস কর্‌তে গেলাম 'কে?' কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরুল না।

"সাম্‌নের বসবার জায়গায় কারা যেন উত্তেজিত হয়ে কথা কইছে—ক্রমশঃ তা'দের গণ্ডগোল বেড়েই চল্‌ল। আমি কাঠ হয়ে ব'সে আছি। হঠাৎ এক মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ, ঝপ্ ক'রে কে যেন পড়ে গেল! সেই মুহূর্ত্তে কোথায় যেন পড়্‌ল একটা বজ্র আর এক দম্‌কা বাতাসে সাম্‌নের জান্‌লার খড়্‌খড়িটা সশব্দে গেল পড়ে। পথের ঘোলাটে গ্যাসের মৃদু আলো গাড়ীর ভেতর এসে পড়্‌ল আর আমি দেখ্‌লাম সেখানে পড়ে রয়েছে একটা লোকের দেহ—দেহ থেকে মুণ্ডুটা তা'র সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আর তার সেই স্থির চোখে যে রকম তীব্র ভয় আর নির্য্যাতনের ছাপ তা' জীবনে ভুল্‌বার নয়! আমার অবস্থা তো—কিন্তু ট্রেন থাম্‌ল যে! আরে এই তো পৌঁছে গিয়েছি। ষ্টপেজ্ এখানে খুবই কম। দয়া ক'রে আমাকে একটু সাহায্য করুন···"

ভদ্রলোক অতি মাত্রায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। তাড়াতাড়িতে কুঁজোটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। তিনি তাঁর টুপিটা মাথায় দিয়ে ফ্লাস্কটা নিয়ে নীচু আর অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম্মটায় নেমে পড়্‌লেন, আমি জলের কুঁজোটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

গার্ড নীল আলো নাড়াল, ট্রেনের সমস্ত দেহটা ঝাঁকানি দিয়ে আবার যাত্রা সুরু কর্‌ল। দরজার কাছ দিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ভদ্রলোক বল্‌লেন, "অনেক ধন্যবাদ মশাই, অনেক ধন্যবাদ। গল্পটা শেষ হ'ল না। আবার যদি কখনও দেখা হয় তখন শেষ কর্‌ব—শেষটা এমন থ্রিলিং যে আপনাকে মান্‌তেই হবে···" ট্রেনটা প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছাড়িয়ে অন্ধকার মাঠের বুক চিরে আবার ছুটে চল্‌ল, ভদ্রলোকের কথাগুলো আর শোনা গেল না।

ঐ কাহিনীর শেষটা যেমন করুণ তেমনিই থ্রিলিং—সন্দেহ নেই। পরের ষ্টেশনে পৌঁছেই এক পেয়ালা চা কেনার জন্যে পাশের পকেটে হাত দিয়েই চম্‌কে উঠ্‌লুম, পকেটের কোন চিহ্নই নেই সেখানে! আরও নিরাপদ্ স্থানে রাখবার জন্য ভদ্রলোক সেটা তুলে নিয়েছেন। শুধু টিকেট্‌টি মাত্র সম্বল, সেটা রুমালে বাঁধা অবস্থায় বুক-পকেটে ছিল বলেই রক্ষা পেয়েছে।

গাছের যাদুকর

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি. এস্ সি, বি.ই. এস)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্ণিয়া নামে একটা জায়গা আছে তা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। প্রায় আটাশী বছর আগে, ১৮৪৯ সনে লুথার বারব্যাঙ্ক নামে এক ভদ্রলোক এখানে জন্মগ্রহণ করেন; লোকে তাঁকে বলিত 'গাছের যাদুকর'। গাছ-গাছড়ার ব্যবসা করিয়া তিনি একদিকে টাকাও যেমন রোজগার করিয়াছিলেন অঢেল, তেমনি নামও করিয়াছিলেন জগৎ-জোড়া।

বিদেশে, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে একটা লোক গাছের ব্যবসা করিয়া প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছিল—এটা এমন একটা কিছু পুণ্যকাহিনী নয় যে শুধু তাই শুনাইবার জন্যই বড় একটা প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। এই 'যাদুকর'টির সম্বন্ধে আজ যে দু' কথা লিখিতে বসিয়াছি তার কারণ এই যে ব্যবসার ভিতর দিয়া ইনি সমস্ত মানব জাতির অনেকখানি উপকার করিয়া গিয়াছেন—নিজের দেশটিকে যে ধন সম্ভারে ভরিয়া দিয়া গেছেন সে কথা তো বলাই বাহুল্য। তোমরা হয়তো ভাবিবে, গাছ-গাছড়ার ব্যবসায় আবার পৃথিবীর এমন কি বড়দরের উপকার করা সম্ভব! কথাটা তবে একটু বুঝাইয়া বলি। মনে কর, দেশী কুরকুটে পেয়ারাগুলিকে বিজ্ঞানের সাহায্যে চালতার মত বড় বড় করা হইল, তার বীচিগুলি কোথায় উড়িয়া গেল—ভিতরটা শুধুই সুস্বাদু এবং সুগন্ধ শাঁসে ভরা; বৈঁচিগুলিকে আকারে টোপা কুলের মত বড় করা হইল, ভিতরে 'বীচি নাই, রসে টইটম্বুর;

দেশী গোড়া লেবুগুলিকে কমলা লেবুর মত সুস্বাদু করা হইল—বাতাবিগুলিকে এমন একটা অবস্থায় আনা হইল যে তেতো অথবা টক বলিয়া তার মধ্যে কোন পদার্থই নাই, সবই মিষ্টরসে ভরপুর। আবার মনে কর, গাঁদা ফুলগুলির ব্যাস আধ ইঞ্চির জায়গায় চার ইঞ্চি হইয়াছে, বেলফুলগুলি টগরের মতই বড় বড় হইয়া ফুটিয়াছে; ওদিকে আবার গন্ধরাজের গাছগুলি হইয়া গেছে ছোট ছোট, তাতে প্রচুর ফুল ধরিয়া সুগন্ধে দিগ্বিদিক্ মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছে। অস্বীকার করিতে পার কি, যে এ-অবস্থায় পৃথিবীবাসের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ অনেক-গুণে বাড়িয়া যাইবে! বারব্যাঙ্ক্ এই ধরণের সমস্যা লইয়াই প্রায় সারা কর্ম্মজীবনটা কাটাইয়া দিয়া গিয়াছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য-লাভও করিয়াছেন একেবারে আশ্চর্য্য রকমের। পিচ্, প্লাম্, আপেল প্রভৃতি নানা রকম ফলের তিনি

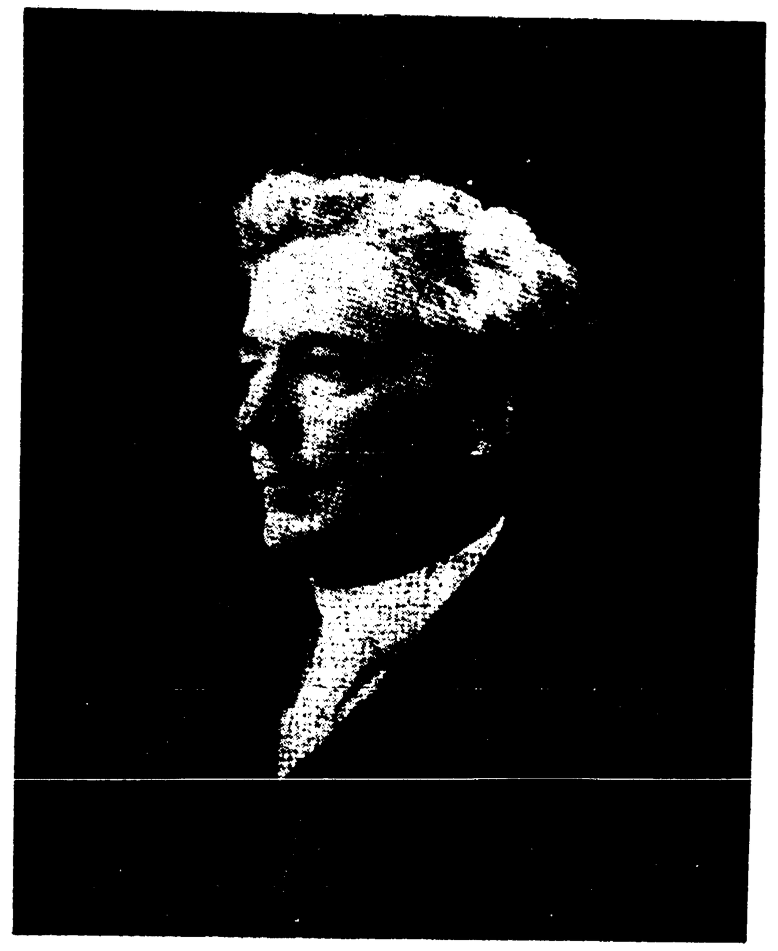

লুথার বারব্যাঙ্ক্

আশ্চর্য্য রকম উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। উন্নতি বলিতে ঐ ফলগুলির গন্ধ, স্বাদ, আকার, বীজহীনতা, ফলন—সব রকমের উন্নতির কথাই বলিতেছি। এমন এক জাতের আলু তিনি "আবিষ্কার" করিয়া গেছেন, যার ফলন হয় খুব বেশী। একই খরচে এক বিঘা জমি চাষ করিয়া পঞ্চাশ মণের বদলে ষাট মণ আলু যদি পাওয়া যায় তবে ভাবিয়া দেখ চাষীর কত লাভ, দেশের কত আর্থিক উন্নতি! ক্ষেতের আশ-পাশে আগাছার মধ্যে যে সব নগণ্য গন্ধহীন ফুল ফুটিয়া থাকে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সেগুলির ভিতর হইতেই তিনি হরেক রকমের চটকদার অথচ সুগন্ধি ফুল বাহির করিয়া আনিয়াছেন। ফুলের প্রয়োজন তো মানুষের সদা-সর্ব্বদা লাগিয়াই

আছে—মানসিক প্রফুল্লতার জন্য ফুল চাই, উৎসবাদির ব্যাপারে ফুল চাই, পূজা-পার্ব্বণেও ফুলের দরকার। বড় বড় সহর-অঞ্চলে বেশ চড়া দামেই সবাইকে এখন ফুল কিনিতে হয়। যদি সুশ্রী অথচ সুগন্ধি ফুল নামমাত্র দামে পাওয়া যায় তবে সে কত বড় সুখের ব্যাপার বল তো!

বাস্তবিকই আজকাল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ফলের, ফুলের, যব, গম প্রভৃতি শস্যের, গরু, ঘোড়া ভেড়া, কুকুর, মুর্গী প্রভৃতি জীবের কি করিয়া নানান রকম উন্নতি সম্ভব সে সম্বন্ধে বহু চেষ্টা, বহু পরীক্ষা চলিতেছে—যাতে এগুলির দ্বারা মানুষের অভাব বেশী মাত্রায় পূরণ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কেমন করিয়া এই ধরণের উন্নতি সম্ভব হইতে পারে, বুঝাইয়া বলিতেছি শোন।

প্রথমে দেখা যাক, কি ভাবে এক জাতীয় জীব হইতে ক্রমে ক্রমে চর্চ্চার ফলে অন্য জাতীয়, অথবা সেই জাতেরই উন্নততর জীবের সৃষ্টি হইতে পারে। ফরাসী জীববিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত লামার্ক্ (১৭৪৪—১৮২৯) অতি সুন্দর ভাবে জিনিষটি বুঝাইয়া দিয়াছেন। ধরা যাক্, অতি প্রাচীন কালে কোন একটা দেশের মাঠে এবং জঙ্গলে প্রচুর জেব্রা বাস করিত। সে দেশের জলবায়ু—অর্থাৎ আব্‌হাওয়ার অবস্থাটা তখন ছিল এমনই যে জেব্রাদের বাসের পক্ষে সেটি বিশেষ উপযোগী। বহু শত বছর এইভাবে কাটিয়া যাওয়ার পর সেখানকার আব্‌হাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিল; ভূমিকম্পের ফলে সেখানকার নদীর মুখ ফিরিয়া গেল, ফলে দেশে ঘটিল জলাভাব। মাটী ক্রমে শুকাইয়া আসিতে লাগিল। মাটী যখন শুকাইতে সুরু করে তখন প্রথমেই শুকাইয়া যায় সব চেয়ে উপরের স্তরটা, তার পর নীচের স্তর, তার পর তার নীচের—এইভাবে। কাজেই বুঝিতেছ এ ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমেই মারা পড়িবে ছোট ছোট গাছগুলি; সেগুলির শিকড় ছোট ছোট, কাজেই মাটীর উপরকার স্তর ভেদ করিয়া বেশী নীচে তো আর যাইতে পারে না! বড় গাছগুলি কিন্তু বাঁচিয়া গেল—তাদের শিকড় যে অনেক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া গেছে। দেশের যখন এরূপ অবস্থা তখন উদ্ভিদ্ভোজী জেব্রাদের যে খাদ্যাভাব ঘটিবে সে তো সহজেই বোঝা যায়। তারা ক্রমশঃ গলা বাড়াইয়া বড় গাছের ডালপালা, পাতা প্রভৃতি খাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। যে সব জেব্রার গলা ছিল স্বভাবতঃই একটু লম্বা,

তারা খাবার পাইতে লাগিল বেশী বেশী, আর যাদের গলা ছোট, পেট ভরিয়া খাবার না পাওয়ায় তারা একে একে মরিতে লাগিল। কয়েক শ' বছর পরে দেখা গেল শুধু বড় গলা-ওয়ালা জেব্রাগুলিই টিকিয়া আছে, ছোট গলা-ওয়ালাদের বংশ লোপ পাইয়াছে। দেশের মাটী ক্রমেই শুকাইয়া চলিতেছে। আরও কয়েক

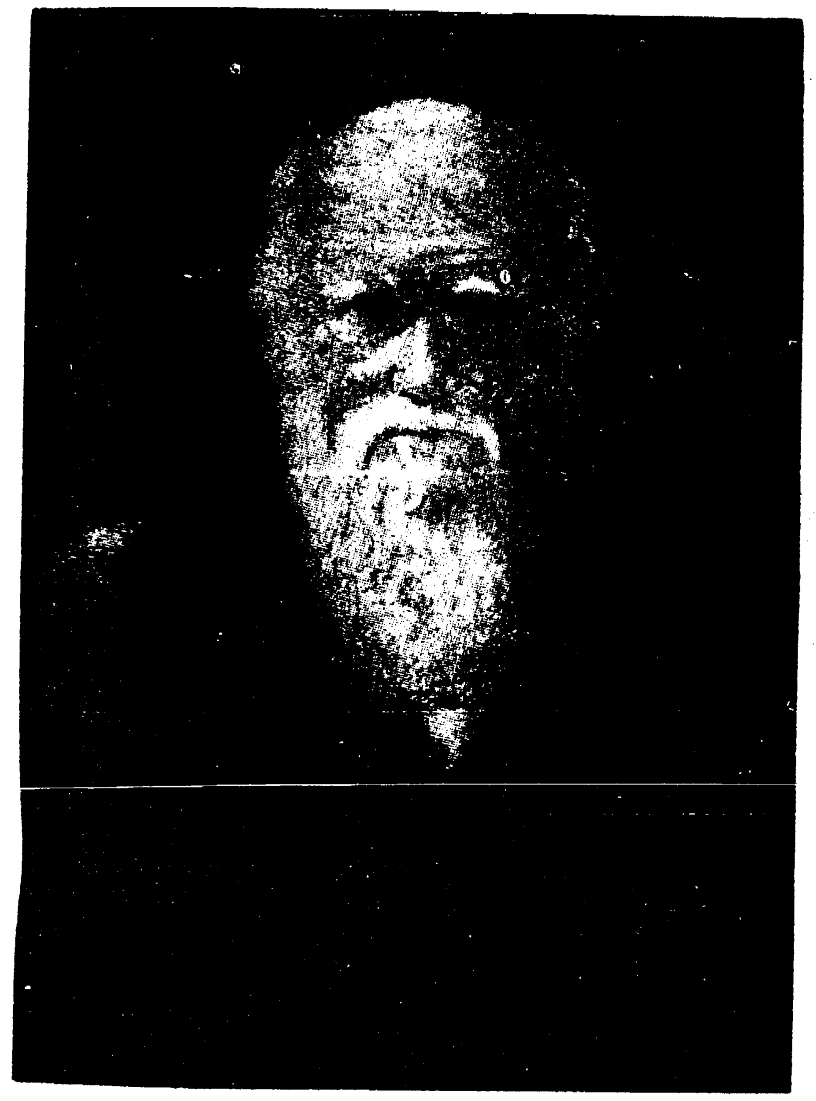

ডারউইন্

হাজার বছর পরে দেখা গেল, দেশে আর জেব্রা বলিয়াই কোন জীব নাই, রহিয়াছে শুধু তাদের বংশধর জিরাফ। লামার্ক্ই প্রথমে এই ক্রম-বিকাশতত্ত্ব (Theory of Evolution) প্রচার করেন।

তার পর ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডারউইন (১৮০৯—১৮৮২) এই ক্রম-বিকাশতত্ত্বকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। উপযুক্ত ভাবে পছন্দ করিতে পারিলে এক জাতীয় জীবের যে কত উন্নতি করা যায় ডারউইন্ নানা ভাবে তা বুঝাইয়া দিলেন। একদল পায়রা লইয়া তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন; প্রত্যেকটি পায়রার আলাদা আলাদা ওজন রাখা হইল। দলের যেগুলি সব চেয়ে বড় এবং বেশী ওজনের সেগুলিকে অন্য পায়রা হইতে তিনি পৃথক্ করিয়া রাখিলেন। এই বড় পায়রাগুলির বাচ্চা হইলে সেই বাচ্চাদের ভিতর হইতে আবার বাছাই করিয়া বড় বড় গুলি আলাদা করা হইল। এইভাবে দশ বার পুরুষ ধরিয়া বাছিয়া বাছিয়া পায়রার চাষ করার ফলে দেখা গেল শেষের পায়রাগুলি প্রথমকার পায়রার চেয়ে ওজনে দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে।

এর পর মেণ্ডেল (১৮২২—১৮৮৪) নামে এক অষ্ট্রীয়াবাসী পাদ্রী সাহেব বংশ-ক্রমের একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলেন। তাঁর এ নিয়মটি কিন্তু বহুকাল অজ্ঞাত ছিল, পরে কিছু কাল হইল ডি ভ্রাইল নামে প্রসিদ্ধ ডাচ্ উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এটির পুনরাবিষ্কার করেন, এবং নিয়মটি যে নির্ভুল নানা ভাবে সেটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এ নিয়মটি তোমাদের বুঝাইয়া দেওয়া যাক্।

উপরের নিকৃষ্ট ফুলকে আশ্চর্য্য কৌশলে নীচেকার সুপুষ্ট ও সুশ্রী চেহারায় আনা হইয়াছে।

দোপাটি ফুল তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ—এক পেটে দোপাটি, ডবল দোপাটি, সাদা, লাল কিংবা গোলাপী রংয়ের দোপাটি, ঘোর লাল অথবা বেগুনী দোপাটি—হরেক রকমের দোপাটি ফুল; সাদার মধ্যে আবার কোন-কোনটায় ছিট্ ছিট্ও দেওয়া থাকে, তাও বোধ করি তোমাদের চোখ এড়ায় নাই। এখন, মনে কর, একটা লোক একা একটা দ্বীপের মধ্যে বাস করিতেছে। হঠাৎ একদিন সে দেখিতে পাইল সেই নির্জ্জন দ্বীপের কোন এক জায়গায় রাশি রাশি বেগুনী রংয়ের দোপাটি ফুল ফুটিয়া আছে। দেখিয়া তার কতকগুলি ডবল দোপাটী পাইবার ভারী ইচ্ছা হইল। অন্য কোন জায়গা হইতে তো আর বীজ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাই সে সেই একপেটে বেগুনী দোপাটিরই বীজ সংগ্রহ করিয়া

খানিকটা জমিতে প্রায় বিশ হাজার দোপাটী গাছ ফলাইয়া ফেলিল। তার পর যখন এই নূতন গাছগুলিতে ফুল ধরিল তখন সে আরম্ভ করিল এই ফুলগুলিকে বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে। এই ভাবে দশ বিশ হাজার গাছ পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল, তু'চারটা গাছ যেন তাদের পূর্ব্বপুরুষদের চাইতে খানিকটা আলাদা রকমের হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ তুই-একটার ফুল একদম্ সাদা হইয়া গেছে, তুই একটার ফুল ঘোরাল লাল, আবার তুই-একটার ফুল **ডবল**। এই পরিবর্ত্তন (variation) যেন হঠাৎ হইয়াছে। হঠাৎ যে এই ধরণের পরিবর্ত্তন হয় মালীদের মধ্যেও অনেকে সে কথা জানিত, কিন্তু মেণ্ডেল এবং বৈজ্ঞানিক ডি ভ্রাইল বেশ করিয়া অধ্যয়ন করিয়া এই পরিবর্ত্তনের নিয়মটি আবিষ্কার করিয়াছেন। যাক্ সে কথা, আমাদের নির্জ্জন দ্বীপবাসী লোকটি তখন করিল কি—ওই আলাদা ধরণের গাছগুলির বীজ লইয়া আবার দশ বিশ হাজার গাছ ফলাইয়া ফেলিল। এবারে দেখা গেল, নূতন চারাগুলির কতকগুলি পূর্ব্বপুরুষের মতই হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলির আলাদা ভাবটা (অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত গুণ) আরও বাড়িয়া গিয়াছে—অর্থাৎ সাদা অথবা লাল ভাব আরও উগ্র রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ডবল দোপাটীর ভাব আরও বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে এক জাতের গাছ হইতে আর এক জাতের গাছের উৎপত্তি সম্ভব হয় হঠাৎ এক-একটা পরিবর্ত্তন হইয়া। এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের তথ্যটুকুই মেণ্ডেল এবং ডি ভ্রাইলের আবিষ্কার—বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় Theory of Mutation।

বারব্যাঙ্ক এই সব তত্ত্বগুলিই জগতের কাজে লাগাইয়াছেন—এই সব তথ্যগুলির উপর নির্ভর করিয়াই 'নিত্যি-নূতন' উদ্ভিদের সৃষ্টি করিয়াছেন। মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে জলার ধারে এক রকম ফুল দেখিতে পাইয়া তিনি তার বীজ সংগ্রহ করিলেন। বহুসংখ্যক গাছ তৈরী হইল। তাদের মধ্য হইতে ভাল কয়েকটি বীজ সংগ্রহ করিয়া বাকী সব তিনি পোড়াইয়া ফেলিলেন। ভালদের আবার দশ বিশ হাজার গাছ হইল। সেগুলির মধ্য হইতে আবার 'সরেশ'গুলি বাছিয়া নিয়া মন্দগুলি নষ্ট করিলেন। এইভাবে কয়েক 'পুরুষ' চলিবার পর দেখা গেল সেই জংলী ফুলের বংশেই চমৎকার জমকালো ফুলের সৃষ্টি হইয়াছে।

বারব্যাঙ্কের ফণীমনসা (Cactus) গাছ সৃষ্টি এক বিচিত্র ব্যাপার। ফণীমনসা গাছগুলি রসহীন বেলে জমিতেও জন্মিতে পারে। তোমাদের মধ্যে যারা পুরী গিয়াছ তারা দেখিয়া থাকিবে সমুদ্রের ধারে 'রসকষহীন' ধূ ধূ বালির মধে অন্য কোনও উদ্ভিদেরই চিহ্ন নাই কিন্তু ফণীমনসা গাছের দিব্যি জঙ্গল রহিয়াছে। কয়েক জাতের ফণীমনসার কাঁটা বাদ দিলে দেখা যায় গরু অথবা ঐ শ্রেণীর জীবেরা সেগুলি খাইয়া বেশ আরামে থাকিতে পারে। আর কয়েক জাতীয় ফণী-মনসা আছে, তাদের কাঁটা বেশী হয় না। বারব্যাঙ্ক এক জাতের পরাগ অন্য জাতের ফণীমনসার ফুলের সহিত মিশাইয়া নূতন জাতের বীজ প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐরূপ পরীক্ষার ফলে বেশ মোটা এবং সুপুষ্ট কাঁটাহীন ফণীমনসা গাছ হইয়াছে। সে গাছ গরু-ভেড়ারা অনায়াসে খাইতে পারে।

বারব্যাঙ্কের অদ্ভুত আবিষ্কার—কাঁটাহীন সুপুষ্ট ফণীমনসা

ফুলের মূল্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এস্-সি)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধিমতী রোজা

কাউন্ট টিলির সৈন্যদলকে সরাইবার হুকুম-নামা আনিবার জন্য উদ্ধত জনতা টাউন্-হল্ চড়াও করিতে ছুটিয়াছে সে খবর আমরা আগেই পাইয়াছি।

তার পর প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, কারাগারের সম্মুখের ভিড় কিছু কমিয়াছে বটে কিন্তু কৌতূহলী দর্শকের সংখ্যা এখনও সেখানে নেহাৎ কম নাই। কাউন্ট টিলি আগেকার মতই কঠোর ভাবে তাদের আটকাইয়া রাখিতেছেন।

হঠাৎ দূরে আবার একটা অস্পষ্ট কোলাহল শোনা গেল—এবং সে শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া উন্মুক্ত জলস্রোত যেমন ভীমবেগে ছুটিয়া আসে তেমনি একটা বিরাট্ জনস্রোত আবার টাউন্-হল্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। দলের আগে আগে যে লোকটি আসিতেছিল তার উৎসাহ এত বেশী যে হঠাৎ দেখিয়া মনে হয় সে দৌড়াইতেছে না—উড়িতেছে। লোকটিকে আমরা চিনি—তার নাম টাইকেলেয়ার।

কাউন্ট তাঁর পাশের সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তবে কি ওরা সত্যি-সত্যিই হুকুম নিয়ে এল নাকি?" তাঁর স্বরে উদ্বেগের চিহ্ন। বাস্তবিক সন্দেহের আর কোন কারণ ছিল না, জনতার আকাশ-ফাটানো গর্জ্জন এবার বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছে—"পথ ছাড়, পথ ছাড়, বেরোও এখান থেকে—পালাও—এই দেখ হুকুমনামা!" টাইকেলেয়ারের হাতে একখানা কাগজ—শূন্যে ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে।

কাউন্ট টিলির মুখ পলকের মধ্যে সাদা হইয়া আসিল। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কি কেউ কখনও দিতে পারে! কিন্তু তিনি 'নিমকের' চাকর, হুকুম তাঁকে মানিতেই হইবে—ভাল-মন্দ বিচারের ভার তাঁর উপর দেওয়া হয় নাই। তিনি শুধু হুকুম-নামাখানা একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়া সেটা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন—এমন একটা জিনিষ হাত-ছাড়া করিবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তার পর যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় সঙ্গীদের লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ক্ষিপ্ত জনতার হাতে কারাগার অর্পণ করিয়া টিলির সৈন্যদল ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এদিকে জন্ ডি উইট্ ভাইকে লইয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। সিঁড়ির নীচে একটি মেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল।

এ মেয়েটিকে আমরা ইতিপূর্ব্বে আর একবার দেখিয়াছি; মেয়েটি রোজা—জেলারের মেয়ে।

দুই ভাই নীচে পৌঁছিতেই রোজা ধরা গলায় বলিল, "শুনেছেন, ওই বদমাইস লোকগুলো টাউন্-হলে গেছে—টিলির সৈন্যদের সরাবার হুকুম আনতে!"

জন্ এই নতুন সংবাদে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। রোজা বলিল, "আমার মনে হয়, আপনাদের সামনের ফটক দিয়ে বেরোনো মোটেই উচিত নয়। আমার সঙ্গে আসুন, পেছন দিকে একটা দরজা আছে সেটা দিয়ে গেলে একটা ছোট গলিতে পড়া যায়; সেদিকে লোকজনও বড় একটা থাকে না, সেদিক্ দিয়ে গেলে সম্ভবতঃ আপনাদের বিপদের ভয় থাকবে না।"

"কিন্তু কর্ণেলিয়াস্ তো হাঁটতে পারবে না, আমাদের গাড়ী যে সামনের দিকে রয়েছে!"

"সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। আপনাদের কোচ্‌ম্যান্ খুব বিশ্বাসী লোক, আমি জানি, তাকে আমি খবর দিয়ে সেই গলিটাতেই আপনার গাড়ী আনিয়ে রেখেছি।"

জন্ অবাক্ হইয়া সকৃতজ্ঞনয়নে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোজা ব্যস্ত ভাবে বলিল, "আসুন, আর দেরী করবেন না—আমার পেছন পেছন আসুন।"

"কিন্তু—কিন্তু রোজা, সে দরজা তোমার বাবা নিশ্চয়ই তালা দিয়ে আটকে রেখেছে, সে কি আর তা খুলে দেবে?"

"বাবা ও তালা কিছুতেই খুলবেন না তা ঠিক, কিন্তু সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। একটু আগে বাবা জানলায় দাঁড়িয়ে একজন সৈন্যের সঙ্গে গল্প করছিলেন—বাবার গল্প করা জানেন তো, এত মশ্‌গুল হয়ে পড়েন যে কোন দিকেই হুঁস থাকে না। সেই সময়ে ফাঁক পেয়ে আমি তাঁর চাবির তাড়া থেকে আলগোছে চাবিটা বের করে এনেছি।"

এবার কৃতজ্ঞতায় দুই ভাইএর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। এই মেয়েটি—এই ছোট্ট মেয়েটিই আজ তাঁদের জীবন রক্ষা করিল! একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া

কর্ণেলিয়াস্ বলিলেন, "তোমার এ ঋণ কি দিয়ে শুধ্‌ব মা? তোমাকে দেবার মত যে কিছুই নেই—আমার ঘরে একখানা বাইবেল পড়ে আছে সেটা তুমি নিও, আমার স্নেহের দান বলে নিও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।"

রোজা বিগলিতকণ্ঠে বলিল, "আপনার দান আমি মাথায় পেতে নেব।" তার পর যেন মনে মনেই বলিল, "আমি যদি পড়তে পারতাম!"

আর বাক্যব্যয় করিবার সময় ছিল না, তিনজনে তাড়াতাড়ি একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ বাহিয়া কারাগারের পেছন দিকে ছোট একটা গলির মুখে আসিয়া

গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন

পড়িলেন। রোজা চাবি দিয়া দরজা খুলিয়া দিল, দেখা গেল জন্ ডি উইটের বিশ্বাসী কোচ্‌ম্যান্ সত্যিসত্যিই গাড়ী লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। দুই ভাই তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। জন্ গলা বাড়াইয়া বলিলেন, "টোলহেক্, ফটক।" ঐ ফটক দিয়াই সহর হইতে বাহির হইয়া তাঁরা শেভেনিং বন্দরে যাইবেন এই রকম ঠিক আছে। পরমুহূর্ত্তেই কোচ্‌ম্যানের নির্দ্দেশ পাইয়া বলিষ্ঠ ঘোড়া দু'টি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। রোজার সজল চোখে ধীরে

ধীরে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। গাড়ী চোখের আড়ালে যাইতেই সে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চাবিটা নিকটস্থ একটা কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জনতার নৈরাশ্য

অল্পক্ষণ পরেই একটা বিকট হট্টগোল রোজার কানে ভাসিয়া আসিল। টিলির সৈন্যেরা চলিয়া যাওয়ায় ক্ষিপ্ত জনতা এবার কারাগারের দরজায় আছড়াইয়া পড়িয়াছে। জেলার গ্রাইফাস্ দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু ভাবে মনে হইল এখনই কাঠের দরজা ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িবে। রোজা তাড়াতাড়ি বাপের কাছে আসিতেই গ্রাইফাস্ আকুলকণ্ঠে বলিল, "কি করি বল্ তো রোজা? দরজা খুলে দেব, না ভাঙ্গতে দেব?"

"খুলতে তুমি পার না বাবা, সে হুকুম তো নেই—ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, আমি হ'লে ভাঙ্গতেই দিতাম।"

"কিন্তু দরজা ভেঙ্গে ঢুকলে ওরা বন্দীদের সঙ্গে আমাকেও যে মেরে ফেলবে?"

"ইস্, মারলেই হ'ল! এস, আমরা দরজায় তালা লাগিয়ে লুকিয়ে থাকি—কোথায় লুকাব বুঝেছ তো? সেই চোরা-কুঠরীতে—কার সাধ্য আমাদের খুঁজে বার করবে?"

"কিন্তু বন্দীদের অবস্থা কি হবে?"

"তাদের অবস্থা তারা বুঝবে, এস আমরা শীগ্‌গির লুকোই।" বাপকে টানিয়া নিয়া রোজা সত্যিসত্যিই চোরা-কুঠরীতে ঢুকিয়া পড়িল। এই ঘরগুলি কারাগারের গুপ্তগৃহ—গুপ্ত দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়; বিশেষ বিশেষ কয়েদীদের জন্য এগুলি তৈরী, বাহিরের লোকের সাধ্য নাই এ ঘর খুঁজিয়া বাহির করে।

একটু পরেই বিরাট্ সিংহদরজা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। "বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু চাই—মৃত্যু চাই" বলিতে বলিতে হাজার হাজার লোক কারাগারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কিন্তু আসল সত্য বাহির হইয়া পড়িতেও বেশী দেরী হইল না। যে 'সেলে' কর্ণেলিয়াস্‌কে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল একজন লোক তারই জানলা বাহিয়া উঠিয়া ঘরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "কই কোথায় গেল বিশ্বাসঘাতকটা! দেখছি না তো!"

"পালিয়েছে! পাখী পালিয়েছে! কোথা দিয়ে পালাল?" এক সঙ্গে হাজার কণ্ঠে প্রশ্ন উঠিল। প্রশ্নের সঠিক জবাব দিবার মত কেউ ছিল না। তবে কর্ণেলিয়াস্ যে কারাগারে আর নাই সে বিষয়ে সন্দেহ করিবারও কিছু রহিল না। কয়েকজন ভিতরে ঢুকিয়া তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কোন ফল হইল না—পাখী সত্যই পালাইয়াছে।

একদল রুখিয়া উঠিল—"জেলার গেল কই!—আজ তাকেই দেখে নেব।" কিন্তু জেলারেরও খোঁজ পাওয়া গেল না। জনতার মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ লোক ছিল। সমগ্র জনতাকে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে চেঁচাইয়া বলিল, "দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি? জেলারকে দিয়ে কি করবে? আসল আসামীদের কি তবে সত্যিসত্যিই পালাতে দেবে? এখনও হয়তো ওরা সহরের বাইরে যেতে পারে নি, এখনও হয়তো ওদের ধরে ফেলা যেতে পারে!" কথাটা সকলেরই মনে ধরিল। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল জলস্রোতের মত মানুষের স্রোত কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এদিকে জন্ ও কর্ণেলিয়াসের গাড়ী গলি পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িতেই জন্ গাড়ীর বেগ কমাইয়া দিতে বলিলেন—পাছে কেহ সন্দেহ করে। কোচ্‌ম্যান্‌ও যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘোড়া দু'টিকে আরও সংযত করিয়া লইল। যাক্, ফাঁড়া তা' হইলে কাটিয়াছে। কিন্তু সে খানিকক্ষণের জন্য। কোন বিভীষিকা দেখিলে লোকে যেমন চমকাইয়া উঠে সহসা তেমনি ভাবে চমকাইয়া উঠিয়া কোচ্‌ম্যান্ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। গাড়ী টোলহেক ফটকের সম্মুখে আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু একি! ফটক যে তালা বন্ধ!—এ সময়ে তো কোন দিন এ ফটক বন্ধ থাকে না!

(ক্রমশঃ)

মায়ের দেশ

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়ের দেশে তুই কি থাকিস্
ভোরের বেলার পাখী ?
আলোর গানে ফুল ফুটিয়ে
আমারে যাস্ ডাকি !
সন্ধ্যাবেলার রূপকথারা
সেখান থেকে আসে,
নিঝুম রাতে চাঁদ ভেসে যায়
সেই দেশে আকাশে ;
ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি
সন্ধ্যা হ'লে পরে—

সেখান থেকে ঘুমের মায়া
পাঠায় মোদের ঘরে।
বল তো মা কবে তুমি
সেথায় ছিলে একা,
সন্ধ্যাতারার সাথে এসে
আমায় দিলে দেখা ?
পদ্মা-জলে পাল-দোলানো
ডিঙাখানি বেয়ে
তুই জনে মা, যাই সেথা চল্
আজ ভোরে গান গেয়ে।

ইস্কুলেতে হয় না যেতে
তোমার সোনার গাঁয়ে—
শুধু খেলা সারা বেলা
বকুল-বনের ছায়ে।
তোমার দেশে সোনার শরৎ
এলো মাঠে মাঠে
ঘর ভোলানোর বাঁশী বাজে
গাঁয়ের বাটে বাটে।

নদীর পারে নতুন রাখাল
বাজায় বাঁশী একা—
ভাব করতে চাই সাথে যার
সে আজ দেবে দেখা।
চাঁদকে ডাকো যেখান থেকে
আমায় নিয়ে কোলে
তোমার সোনার নতুন দেশে—
যাই সেথা মা চলে।

নানা কথা

বিজ্ঞান-যাদুকর মার্কনি

ঠিক এক বছর আগে গত পূজা সংখ্যা রামধনুতে তোমরা বেতারের আবিষ্কারক মার্কনি আর তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা পড়িয়াছিলে। তার পর এক বছরও যায় নাই, গত ১৯শে জুলাই বিজ্ঞানের এই যাদুকরটিকে পৃথিবী হারাইয়াছে।

মার্কুইস্ গুগলিয়েলমো মার্কনি জন্মিয়াছিলেন ১৮৭৪ সনে—ইটালির বোলান সহরে; তাঁর বাবা ইটালিরই লোক, কিন্তু মা ছিলেন আইরিশ। অতি ছেলেবেলা হইতেই নানা রকম আবিষ্কারের দিকে মার্কনির ঝোঁক দেখা যাইত। জঙ্গলে গিয়া জংলী ফল সংগ্রহ করিয়া তা হইতে কালি তৈরী করা, ছোটখাট টিনের কলকব্জা তৈরী করা—এ সবেরই দিকে তাঁর খুব মাথা খেলিত। ১৩।১৪ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের লেখা অনেক বই পড়িয়া ফেলিলেন।

মার্কনি

লেখাপড়া শেষ করিয়া মার্কনি বেতার সম্বন্ধে গবেষণা যুড়িয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে হার্ট্জ্ নামে এক জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া এক আশ্চর্য্য যন্ত্র তৈরী করিয়াছিলেন, তাঁরই অনুপ্রেরণায় মার্কনি এ কাজে হাত দিলেন। দীর্ঘ দিন পরীক্ষার পর তিনি এ কাজে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া ইটালি সরকারের কাছে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁর বয়স তখন নেহাৎ কম (মাত্র ২২ বছর) বলিয়া ইটালি সরকার তাঁর কথায় বিশেষ আমল দিলেন না। মার্কনি ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন, এবং সেখানেই তখনকার ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের অধ্যক্ষের সাহায্যে তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

দেখিতে দেখিতে মার্কনির নাম সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল—ইটালি সরকার লজ্জিত হইয়া তাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বেতারের চলন আরম্ভ হইল।

তার পর মার্কনি কি ভাবে ধীরে ধীরে বেতারে নিত্যনূতন উন্নতি করিয়া পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া দিলেন সে কাহিনী তোমরা গত বছর রামধনুতেই পড়িয়াছ। মার্কনির দেখাদেখি আরও অনেক বড় বড় মাথাওয়ালা বৈজ্ঞানিক এ কাজে নামিয়া পড়িলেন, তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় দেখিতে দেখিতে বেতার-বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সব কাণ্ড ঘটিতে সুরু করিল।

মার্কনি জীবনে অনেক রকম সম্মান পাইয়াছেন। ১৯০৯ সনে পদার্থবিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তা ছাড়া জি, সি, ভি, ও উপাধি, কেলভিন পদক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠ সম্মানগুলিও তাঁকে দেওয়া হইয়াছিল। ১৯১৫ সনে তিনি ইটালির সেনেটর হন, ১৯২৯ সনে হন মার্ক্ইস্। কিন্তু পৃথিবীকে তিনি যা দিয়া গিয়াছেন তার সঙ্গে তুলনা করিলে প্রতিদান হিসাবে এ সবের নাম উল্লেখ না করাই বোধ হয় ভাল।

একটি অদ্ভুত জানোয়ার

গত মাসের রামধনুতে তোমরা অষ্ট্রেলিয়ার কথা পড়িয়াছ। অষ্ট্রেলিয়ার অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তুগুলির কথাও কিছু কিছু শুনিয়াছ। সেখানকারই আর একটা অদ্ভুত জানোয়ারের কথা এখানে বলিব। একিড্না জন্তুটির নাম শুনিয়াছ কি? এঁদের নিবাস অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরের নিউগিনি দ্বীপ এবং দক্ষিণের টাসমানিয়া। 'পিপীলিকাভুক্' অর্থাৎ পিঁপড়েখোর জানোয়ারের কথা তোমরা জান—একিড্না তাঁদেরই একজন জ্ঞাতি। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই জানোয়ারটিকে লইয়া একটু মুশকিলেই পড়িয়াছিলেন। অন্যান্য জন্তুদের শরীরের গঠনের একটা নিয়ম-কানুন আছে,—কারও পায়ে হয়তো পাঁচটা আঙ্গুল, কারও বা চারটা। কিন্তু এই একিড্নাদের মধ্যে পাঁচ আঙ্গুল-ওয়ালা আছে, তিন আঙ্গুল-ওয়ালা আছে—আবার কারও কারও সম্মুখের পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল, পিছনের পায়ে চারটি। প্রাণিতত্ত্ববিদ্দের গোলমাল হইবার কথাই বটে।

একিড্না

একিড্নার চেহারায় আরও বাহাদুরী আছে। এদের সারা গায়ে লোমের ফাঁকে ছোট ছোট ধারাল কাঁটা বসান,—অনেকটা সজারুর মত। পিছনের পা দিয়া এরা অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত গর্ত্ত খুঁড়িতে পারে,—ভয় পাইলে তাড়াতাড়ি এই রকম গর্ত্ত খুঁড়িয়া তার মধ্যে ঢুকিতে চেষ্টা করে। সেটুকু সময়ও যদি হাতে না থাকে তবে এরা শরীরটা তাল পাকাইয়া ফুটবলের মত গোল করিয়া ফেলে; গোল বলের গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা—দেখিলে ভয় হইবারই কথা।

কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য হইতেছে এদের মুখ। মুখটা অদ্ভুত রকম ছুঁচাল, ঠোঁটটাও পাখীর ঠোঁটের মত শক্ত এবং একটু বাঁকান; মুখের ছিদ্রও অত্যন্ত ছোট—তার ভিতরে একটিও দাঁত নাই, আছে শুধু এক লম্বা জিভ। বেচারার অদৃষ্টে কোন বড় জিনিষ খাইবার উপায় নাই—ক্ষুদে ক্ষুদে উই ও পিঁপড়ে খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। অবশ্য ঐ লম্বা ছুঁচাল মুখ দিয়া উই বা পিঁপড়ে খুঁজিয়া বাহিরকরিতে সুবিধাই হয়।

একিড্না স্তন্যপায়ী জীব—কিন্তু মজা হইতেছে এই যে সাধারণ স্তন্যপায়ী জানোয়ারের মত তাদের একবারেই বাচ্চা হয় না—স্ত্রী-একিড্নারা প্রথমে ডিম পাড়ে, সেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইয়া মায়ের দুধ খায়,—অনেকটা অষ্ট্রেলিয়ার প্লাটিপাস্ বা 'হাঁসঠুঁটো'র মত। ডিম ফুটিবার আগে কিছু দিন স্ত্রী-একিড্নারা একটা থলির মধ্যে সেগুলিকে বহিয়া বেড়ায়।

একিড্না কয়েক জাতের আছে। সাধারণ একিড্না আকারে এক-একটা বিড়ালের মত, কিন্তু কোন কোনটা আরও বড়—একটা ছোটখাট ভালুকের মতও হয়।

কি ও কেন?

এস্পের‍্যাণ্টো কা'কে বলে?

পৃথিবীর এক-এক দেশে এক-এক রকম ভাষা, কাজেই এক দেশের লোকের পক্ষে আর এক দেশের লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলা কি রকম অসুবিধাজনক তা যারা বিদেশে যায় তারাই বুঝতে পারে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লাড্উইগ্ জামেনহফ্ নামে রাশিয়ার এক ভদ্রলোক ঠিক করলেন পৃথিবীর সব দেশের লোক বুঝতে পারবে এমন একটা সাধারণ ভাষা তিনি তৈরী করে যাবেন। তদনুসারে তিনি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে একটা ভাষা তৈরী করলেন—আর তার নাম দিলেন "এস্পের‍্যাণ্টো"। জামেনহফের এই চেষ্টা খুব ফলবতী না হ'লেও তাঁর ভাষার একেবারে অনাদরও হয় নি। এ পর্য্যন্ত এ ভাষায় প্রায় ৪০০০ বই বেরিয়েছে এবং প্রায়

শ' খানেক পত্রিকা এখনও নিয়মিত বেরোচ্ছে। কোন কোন আন্তর্জ্জাতিক সভায়ও এস্পেরান্টো ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স-এর বদলে £, s, d, লেখা হয় কেন ?

£, s, d, ইংরেজী পাউণ্ড, শিলিং পেন্সের বদলে সংক্ষেপে লেখা হয় তা তোমরা সবাই জান, তোমরাও লিখে থাক। সাধারণতঃ কোন শব্দ সংক্ষেপে লিখতে হলে শব্দটির আদ্যক্ষর ব্যবহার করা হয়, কিন্তু £ কিংবা d কোনটাই পাউণ্ড (Pound) বা পেন্স (Pence)-এর আদ্যক্ষর নয়। এই চিহ্নগুলি এসেছে ল্যাটিন শব্দ থেকে। পাউণ্ডের ল্যাটিন হচ্ছে Librae, তার আদ্যক্ষর হচ্ছে *L*। সাধারণ *L* থেকে পৃথক্ বোঝাবার জন্য *L* এর মাঝখানে একটা টান দিয়ে £ করা হয়েছে। *s* এসেছে শিলিংএর ল্যাটিন Solidi থেকে ; আর *d* এসেছে পেন্সের ল্যাটিন Denarii থেকে।

বয়স বেশী হ'লে কপালে ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় খাঁজ পড়ে কেন ?

আমাদের চামড়ার নীচে মাংসপেশী এবং চর্ব্বির আস্তর আছে তা বোধ হয় তোমরা জান। বয়স বেশী হ'লে ঐ মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে আসে আর চর্ব্বিও শুকিয়ে যায়—কাজেই উপরের চামড়া 'ঘোঁচ' হয়ে কুঁচকে যায়—আর আমরা চামড়ায় ভাঁজ দেখতে পাই।

বিড়ালের আবার গোঁফ কেন ?

মানুষ ছাড়াও কোন কোন জানোয়ারের গোঁফ আছে—বিড়াল তাদের একটি। বিড়ালের গোঁফ কিন্তু তার অঙ্গশোভার জন্য তৈরী হয় নি—ও জিনিষটা বিড়ালের ভয়ানক কাজে আসে। পথ খুঁজে চলতে—বিশেষতঃ অন্ধকারের মধ্যে, এই জিনিষটা বিড়ালকে আশ্চর্য্য রকম সাহায্য করে। তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে, বিড়ালের শরীর যতটা চওড়া, গোঁফও ততটা লম্বা।

স্যাণ্ডউইচ্ নাম কোথা থেকে এল ?

স্যাণ্ডউইচ্ খেতে তোমরা অনেকেই হয়তো খুব ভালবাস। দু' টুক্‌রো রুটির মধ্যে মাংস ভরা এই খাবারটা একদম বিদেশী জিনিষ—কিন্তু আজকাল হালফ্যাশনের বাঙ্গালী পরিবারে এর বেশ চলন হয়েছে। স্যাণ্ডউইচ্ নামের উৎপত্তি কিন্তু খুব মজার। ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ আর্ল অব্ স্যাণ্ডউইচ্ নাকি খুব তাস খেলতে ভালবাসতেন - এত ভালবাসতেন যে খেলা ছেড়ে খেতে পর্য্যন্ত যেতে চাইতেন না।' একদিন খেলার নেশায় তিনি এমন মেতে উঠলেন যে বার বার খেতে ডাকা সত্ত্বেও তিনি উঠতে রাজী হলেন না—শেষে বিরক্ত হয়ে চাকরকে বল্লেন, "দু' টুক্‌রো রুটীর ভিতর মাংস পুরে এখানেই নিয়ে এস—এখানে বসে আমি খেতে খেতেই খেলব।" সেই থেকে

দু' টুকরো রুটীর মধ্যে ভরা মাংসের—নাম হ'ল স্যাণ্ডউইচ্—এবং দেখতে দেখতে এই নতুন খাবার খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌ল।

ভগ্নদূত

প্রাশিয়ার রাজবাড়ীতে আজ হুলুস্থুল ব্যাপার, চাকর-বাকর, পাইক-বরকন্দাজ সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক্-ওদিক্ ঘোরাঘুরি কর্‌ছে। কারো মুখে যেন আর রক্তের লেশটুকুও নেই!

রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের আমোল ; তাঁরই রাজবাড়ীর কথা বলা হচ্ছে।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট্ আসলে লোক মন্দ ছিলেন না। নিজে তিনি পরম পণ্ডিত, সাহিত্য, শিল্প এবং চারুকলার উপর তাঁর যথেষ্ট টান। ইয়োরোপের বড় বড় পণ্ডিতদের উপর তাঁর অগাধ শ্রদ্ধার কথাও সবাই জানে, আর প্রজাবাৎসল্যও যে তাঁর নেই তাও নয়। কিন্তু এত সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে দু' চারটা দোষও ছিল আবার বিশ্রী রকমের। মাঝে মাঝে এক-একটা খামখেয়ালী ভাব এম্‌নি তাঁর মাথায় চেপে বস্‌ত যে সে সময়টাতে তিনি যেন দিগ্বিদিক্ হারিয়ে ফেল্‌তেন।

তাঁর একটি ঘোড়া ছিল যেটি তাঁর প্রাণের মতই প্রিয়। (এখানে বলা দরকার যে ফ্রেডারিক দি গ্রেট্ মস্ত সেনাপতি ছিলেন।) এই ঘোড়াটিই বাধিয়েছে যত গোলমাল—কিছুদিন হ'ল সে মারাত্মক অসুখে পড়েছে, বাঁচবার আশা খুবই কম। শুনে রাজা প্রায় ক্ষেপে গেছেন, প্রাসাদময় হুকুম জারি করে দিয়েছেন—যে করেই হোক ঘোড়াকে বাঁচান চাই-ই। যার মুখ দিয়ে ঘোড়ার মৃত্যুসংবাদ প্রথম বার হবে, তার বরাতে মৃত্যুদণ্ড লেখা আছে—এটা সবাই যেন স্থির জেনে রাখে। সেই ঘোড়া আজ মারা গেছে। প্রত্যহ দিনান্তে ঘোড়ার কুশল-সমাচার রাজাকে দিতে হয় ; কিন্তু আজ তাঁকে কি জানান হবে ? আর জানাবেই বা কে ?

সন্ধ্যা যতই এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল, কর্ম্মচারী-মহলে ভীতির ভাব ততই স্ফুটতর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কার এমন বুকের পাটা আছে যে ফ্রেডারিককে খবরটা পৌঁছে দেয়! এই রকম যখন অবস্থা তখন রাজবাড়ীর একজন বেহারা নিজে থেকে এগিয়ে এসে বল্লে, "আচ্ছা, তোমাদের কারুকেই মরতে হবে না, আমি যাব রাজাকে খবর দিতে।"

"তুমি যাবে ?" সকলে সবিস্ময়ে এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠ্‌ল।

TIGHT BINDING

"তা তোমরা সবাই যখন মরবার ভয়ে নীল হয়ে যাচ্ছ তখন আর করা কি? একজনকে তো যেতেই হবে!"

তাই হ'ল। বেহারা রাজার সাম্‌নে গিয়ে হাজির হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ঘোড়ার খবর কি?"

"মহারাজ, ঘোড়া আস্তাবলের মেঝেতে শুয়ে পড়ে আছে; সে খাচ্ছেও না, দাচ্ছেও না, চোখও চাইছে না, নড়ছেও না, লেজও……"

ফ্রেডারিক একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন, "বল কি, তবে তো সে নিশ্চয়ই মরে গেছে!"

"আজ্ঞে মহারাজ, তাই বটে, সত্যিই সে মরে গেছে। কিন্তু তার মৃত্যুর খবরটা মহারাজের মুখ থেকেই প্রথম বার হ'ল।"

ছোটদের চিত্রশালা

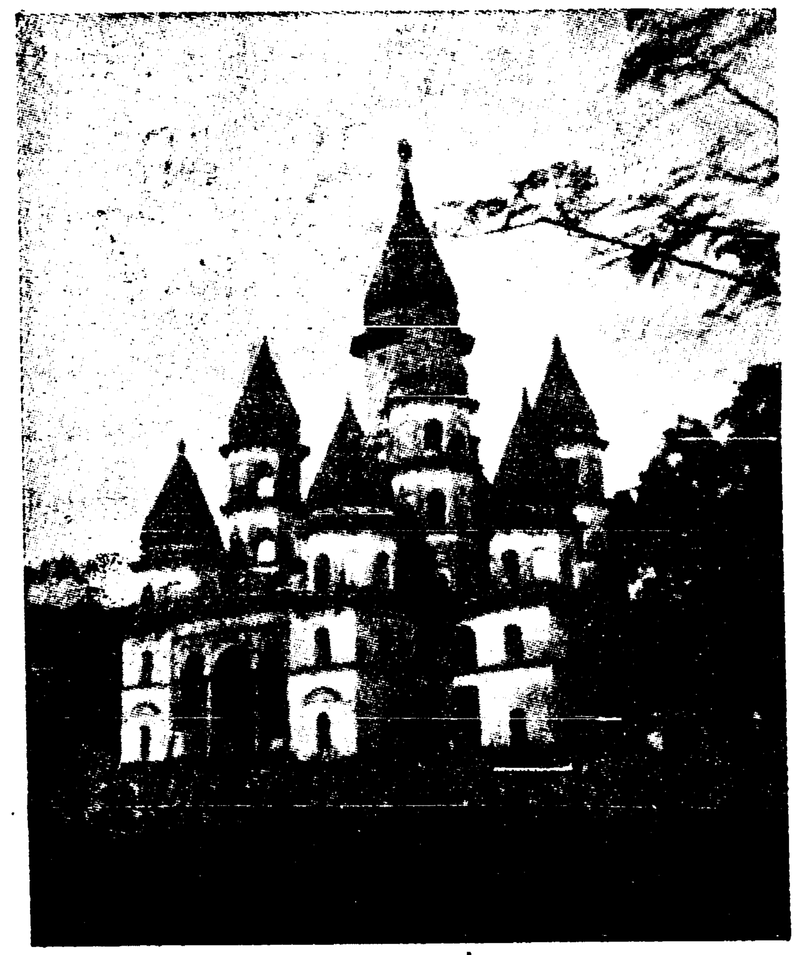

হংসেশ্বরী মন্দির—বাঁশবেড়িয়া

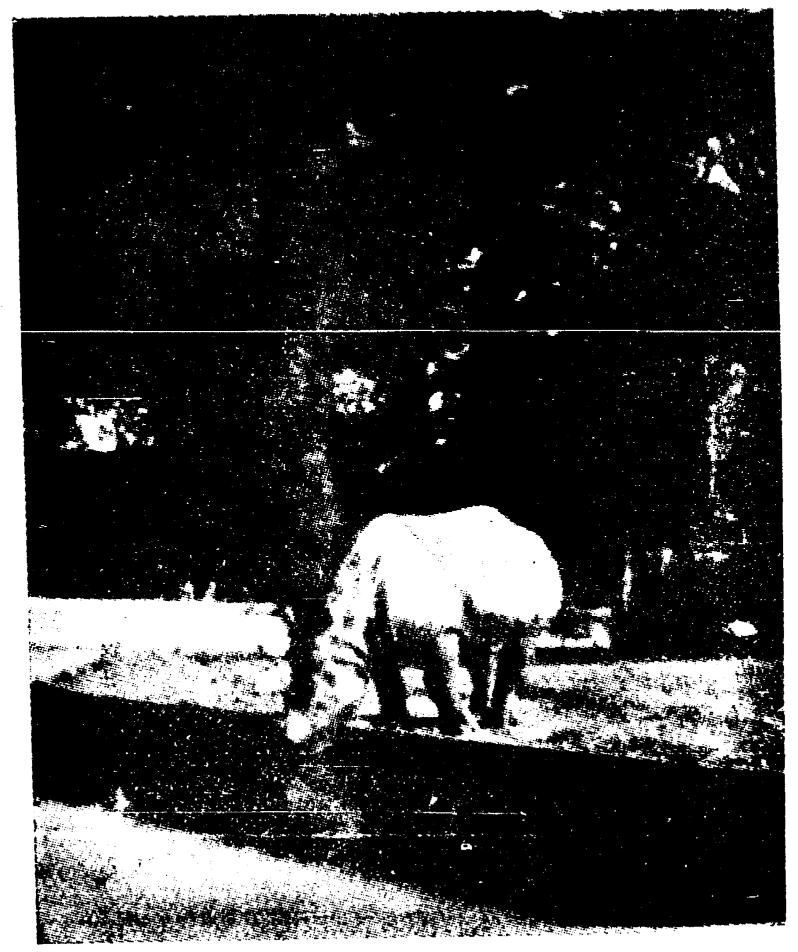

আলিপুরের বাগানে

(শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র)

গরীবের ধন

(শ্রীমাধব্য)

পাহাড়ের কোলে দুই বুড়োবুড়ীর বাস, বেজায় গরীব তারা। সময়টা শীতকাল; অষ্টপ্রহর কণ্‌কণে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, মনে হচ্ছে বাতাস যেন গায়ের মাংস ভেদ করে হাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। শীতের দেশে গরীব হয়ে জন্মানোটাই বোধ হয় ভগবানের অভিশাপ; না আছে তাদের পর্য্যাপ্ত কাপড়-চোপড়, না আছে থাকবার ঘরটাকে খট্‌খটে গরম করে রাখবার মত আর্থিক অবস্থা।

গোদের উপর বিষফোঁড়া—ক'দিন থেকে আবার এম্‌নি বৃষ্টি যাচ্ছে, কি বল্‌ব। এক টুকরা শুক্‌নো কাঠ পর্য্যন্ত তারা আজ সন্ধ্যায় সংগ্রহ করে আন্‌তে পারে নি। রাত্তিরে শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য যে একটু আগুন পোহাবার বন্দোবস্ত করবে, বেচারাদের সেটুকুর পর্য্যন্ত জোগাড় নেই। ঘরের কোণে আগুন পোহাবার গর্ত্তটা সকাল থেকেই খালি পড়ে আছে, একটু কাঠ বা এক ছটাক কয়লাও তাতে পড়ে নি।

কাল গাঁয়ের মোড়লের বাড়ীতে বিয়ে গেছে; ওদের ওখানে খাবার-দাবার কিছু বেশী হয়েছিল, আজ সকালে তাই পাড়ার বাড়ী বাড়ী সেগুলো বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, বুড়োবুড়ীও তার ভাগ পেয়েছে। ও বেলার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা তা' থেকেই বেশ চলে গিয়েছিল, এবেলাও তার খানিকটা উদ্বৃত্ত আছে—মানে আজকের রাতটাও এক রকম চলে যাবে। বুড়ী বুড়োকে খাইয়ে নিজে খেতে বসতে যাবে ঠিক এমনি সময় কোত্থেকে একটা বেড়াল এসে হাজির হল। বেড়াল তো নয় যেন একটা বেড়ালের কঙ্কাল, হাড়ে মাসে এক হয়ে গেছে, গলা দিয়ে কোন মতে চিঁচিঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে, দেখলেই মনে হয় বেচারার কয়েকদিন ধরেই আহার জোটে নি। দেখে বুড়ীর ভারী মায়া হল, না খেয়ে থাকার যে কি কষ্ট সে নিজেও তা জানে কিনা! বুড়ী তাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে নিজের খাবার থেকে কিছুটা ভাগ দিলে। খাবার পেয়ে বেড়ালটার যা ফূর্ত্তি! তড়াক্‌ করে এক লাফে সে বুড়ীর কোল থেকে মাটীতে নেমে পড়ল; তার পর একবার হাই তুলে, লেজটা খাড়া করে হেল্‌তে দুল্‌তে সাম্‌না থেকে চলে গেল।

এদিকে বাইরে তখন শীতের হাওয়া আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, বুড়ো হিহি করে কাঁপছে। আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গেল আগুন পোহাবার সেই গর্ত্তটার দিকে, যদি তার তলা থেকে কোন-গতিকে একটু গরম ভাপ্‌সা ভাব বেরোয় সেই দুরাশায়। বুড়ীরও খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেও স্বামীর পাশে এসে বস্‌ল।

তার পর দু' জনাতে মিলে সুরু কর্‌লে তাদের পোড়া অদৃষ্টের কথা। বুড়ী বল্লে, "আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে ওপর থেকে কোন দেবদূত বসে বসে আমাদের এই দশা দেখ্‌ছেন। দেখে দেখে তাঁর মনে কষ্ট হ'ল, ভাব্‌লেন আহা, দুটো বুড়োবুড়ী এই হাড়-কাঁপানো শীতে কষ্ট পাচ্ছে—যাই তাদের একটু আগুন দিয়ে আসি! ও কি, তুমি হাস্‌ছ কেন, তা হয় না বুঝি? ওঁরা হলেন দেবদূত, যখন যা ইচ্ছে তাই তো করতে পারেন! শোন নি, সেদিন মোড়লের বাড়ীতে যে পাদ্রীসাহেব এসেছিল, সে কি বলে গেল। সে বল্লে, 'তোমরা যদি ভাল কাজ করে যাও, তবে দেবদূত নিজে এসে তোমাদের সমস্ত দুঃখু ঘুচিয়ে দিয়ে যাবেন, আর যদি মন্দ কাজ কর, তবে তোমাদের যা কিছু আছে সব কেড়ে নেবেন।' তা আমি ভাল কাজ করি বা নাই করি, মন্দ কাজও তো কিছু করি না, তা তো তুমি স্বীকার করবে!"

বুড়ো স্বীকার করুক বা না-ই করুক, এ কথা ঠিক যে সেই মুহূর্ত্তেই সে বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে গেল—বাস্তবিকই তাদের আগুন পোহাবার গর্ত্তটার মধ্যে কে যেন দু' টুকরা জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বুড়ীকে ব্যাপারটা দেখাতেই বুড়ীতো একেবারে আত্মহারা, বলে উঠ্‌ল,—"দেখ্‌লে, দেবদূত সত্যিসত্যিই আসে কিনা! আঃ, কী চমৎকার তাপ কয়লার টুকরো দুটো থেকে উঠে আস্‌ছে। আমার শীত তো এরই মধ্যে অর্দ্ধেক কমে গেছে। কী গো, তোমার গরম লাগ্‌ছে না?"

"লাগ্‌ছে বই কি, শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠছে—মনে হচ্ছে সমস্ত আশপাশটাই যেন গরম ভাপে ভর্ত্তি হয়ে গেছে•••রোস, ও দুটোকে বাইরে নিয়ে আসা যাক্, বিছানার পাশে রেখে ঘুমাব।"

বুড়ী তাড়াতাড়ি জিব কেটে বল্লে, "না না, খবরদার, তা করতে যেও না যেন, দেবদূত হয়তো চটে যাবেন! ইচ্ছা করলে তিনি তো নিজেই ওগুলো আমাদের বিছানার কাছে রেখে যেতে পারতেন, তা যখন করেন নি তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে ওগুলো ওখানেই থাকে এই তাঁর ইচ্ছা।"

বুড়ো বল্লে, "আচ্ছা, থাক তা' হলে ওখানেই। আমি কিন্তু তা হলে এখন আর শুতে যাচ্ছি না। এই গরমের রাজ্যি ছেড়ে কে বিছানায় গিয়ে শীতে কাঁপতে থাকবে?"

বুড়ী বল্লে, "যা বলেছ; আমিও।"

তার পর অনেকক্ষণ ধরে দু'জনার গল্প চল্ল; রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। বুড়ো এরই মধ্যে একবার জানলা খুলে বাইরে পানে তাকিয়েছিল—নাঃ, ধোঁয়াটে ভাব তেমন আর দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ভোর থেকে দিব্যি খট্‌খটে রোদ্দই আবার পাওয়া যাবে। সেই কথাটাই বুড়ো বুড়ীকে বল্‌তে যাবে, হঠাৎ দু' জনেই দারুণ ভড়কে গেল—গর্ত্তের ভেতরের জ্বলন্ত অঙ্গার দুটো ঠিক একই সঙ্গে তাদের সাম্‌নে লাফিয়ে এসেছে। আর সেই সঙ্গেই আওয়াজ হ'ল মিঁয়াঁও!

ও হরি, ওই মেরকুট্টি বেড়ালটাই তা হলে খেয়ে দেয়ে সারারাত আরাম্‌সে গর্ত্তের ভেতর বসে ছিল! আর অন্ধকারে তার চোখ দুটোকেই ওরা দু'জনে এতক্ষণ জ্বলন্ত কয়লা বলে ঠাউরে বসে আছে! আর কি আশ্চর্য্য, কয়লা ভাবামাত্রই তাদের শীত কমে গেছে, অনবরত মনে হয়েছে—ওগুলো থেকেই যেন একটা গরম ভাব ফুটে বার হচ্ছে। ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট, যে বুড়ী পর্য্যন্ত তা বুঝে ফেল্ল, বুড়োর পানে তাকিয়ে একটু বোকার মত হাসি হেসে বল্লে, "তা না-ই বা হ'ল সত্যিকার কয়লা, আমরা তো ওকে কয়লাই ভেবে নিয়েছি, আর আমাদের কাজও তো তাতে চলে গেছে!"

বুড়ো একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বল্লে, "তা বই কি, গরীবের ধন কল্পনার চোখেই দেখতে হয়, সত্যিকার চোখে তার দেখা পাওয়া যায় না।*

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বাদল-সন্ধ্যা

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ)

ঝর ঝর ঝরে জল বাদলের ছন্দে,
শ্যামলা ধরণী আজ কার পায়ে বন্দে?
ফোটে ফুল গাছে গাছে সুন্দরগন্ধা,
মুখরিত ধূসরিত বাদলের সন্ধ্যা।

আকাশের নীলিমার দূর হল গর্ব্ব,
শশী তারা সূর্য্যের ঢেকে গেল সর্ব্ব।
বেগবান্ সমীরণ বাজাইয়া ডঙ্কা,
দিয়ে যায় মনে ভরে শিহরণ-শঙ্কা।

* একটা পুরানো বিদেশী গল্প অবলম্বনে।

আঁধারিল চারিধার, চলে নাকো দৃষ্টি,
মনে হয় আজ বুঝি ভেসে যাবে সৃষ্টি !

চারিদিকে ঝম্‌ঝম্ অবিরাম শব্দ,
বিস্ময়ে আমি শুধু মুগ্ধ ও স্তব্ধ।

"অলক্ষুণে"

(শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ)

প্রভাত-পাখীর গান ঠিক তখনও থামে নি—অন্ধকারের শেষ রেখা তখনও পৃথিবীর গা থেকে মিলিয়ে যায় নি, এমনি সময়ে রাজামশাই এক পাহাড়ের কোলে বসে ছিলেন। রোজ এমনি সময়ে তিনি এখানে বেড়াতে আসেন। হঠাৎ কার একটা ঘোড়া সামনে এসে পড়তেই তিনি চম্‌কে উঠে পাহাড় থেকে পড়্‌তে পড়্‌তে কোন রকমে বেঁচে গেলেন।

ঠিক ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক কৃষকও দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত। রাজাকে দেখেই তো সে অবাক্! রাজাও রেগে অস্থির। এরই ঘোড়ার জন্য আজ তাঁর প্রাণ যেতে বসেছিল। তিনি অমনি অনুচরদের ডেকে হুকুম দিলেন, "এই, একে বেঁধে রাখ, আজই একে শূলে দিতে হবে। বেটা ভারী অলক্ষুণে, সকালে এর মুখ দেখেই আজ আমার প্রাণ যেতে বসেছিল।"

অনুচরেরা কৃষককে বেঁধে নিয়ে গেল। যখন শূলে চড়ান হবে তখন কৃষক বল্‌ল "হুজুর, আমি তো খুব অলক্ষুণে, আমার মুখ দেখে তো আপনার প্রাণ যাচ্ছিল; কিন্তু সকালে উঠেই আপনার মুখ দেখে আমার কি হ'ল দেখুন তো! আপনি কি আমার চেয়েও অলক্ষুণে নন?"

লোকটির বুদ্ধি দেখে এবার রাজামশাই বড় ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারী খুসীও হলেন। তখনই হুকুম হ'ল, ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক, আর এই পরগণার জমিদারী ওকে দিয়ে দেওয়া হোক।

জেনে রাখা দরকার

(শ্রীমতী শান্তি দত্ত)

কাঁচা কাঁঠালের এঁচড় কাটিবার সময় কতকগুলি কচুপাতা সামনে নিয়া বসিবে, কাটিবার সময়ে যে আঠা বাহির হইবে কচুপাতা দিয়া ঘষিলেই সে আঠা কচুপাতায় উঠিয়া আসিবে।

কচুপাতা বেশী করিয়া রাখিবে। প্রত্যেক বার কাটিয়া খণ্ড করিবার সময় কচুপাতা দিয়া আঠায় ঘষিলে হাতে অনেক কম আঠা লাগে।

মোচা, কাঁচকলা এবং কচুর কষ হাত হইতে সহজে ছাড়ান কষ্টকর। ঐগুলি কাটিবার সময়ে খানিকটা তেঁতুল গোলা জল রাখিয়া কাটার অল্প পরে পরে ঐ জলে হাত ভিজাইয়া লইলে হাতে একেবারে কষ লাগে না। উক্ত তরকারীগুলিও কিছুক্ষণ তেঁতুল-গোলা জলে ভিজাইয়া রাখিলে রংও তাদের বেশ ভাল হয়। তেঁতুল খুব অল্প হইলেই চলে।

"ভাদর"

(শ্রীনরেশচন্দ্র গুহ বক্সী)

ভাদর এল রে ভাই !
বর্ষার জল কূল ছেপে উঠে,
কাশের গুচ্ছ উঠে ফুটে ফুটে,
আকাশ কখন ধরাতলে লুটে—
কেঁদে কেঁদে সারা তাই।

ভাদর এল রে ভাই !
কুমুদ-পদ্মে ভরে গেছে ঘাট,
আউস ধানেতে ভরে যাবে মাঠ,
যেদিকে তাকাই সবুজেরি হাট,
কোথা নাহি তিল ঠাঁই।

দস্যুর দলে ভোমরা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

৯

গোয়েন্দার পিছনে গোয়েন্দা

রাস্তায় বেরিয়েই বিরিঞ্চি বললে, 'ঐ যে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছে। চল্।'

বিরিঞ্চি আঙুল ইসারা করতে ট্যাক্সি তাদের কাছে এসে থামলো। উঠে বসলো বিরিঞ্চি আর বসন্ত; বিরিঞ্চি হাঁক দিলে, 'বড়ো রাস্তায় চলো।'

ট্যাক্সিওয়ালা বাঙালী, অল্প বয়েসেই চুল পেকেছে। একটু দ্বিধার স্বরে বললে, 'খোকাবাবু, আপনারাই যাবেন?'

খোকাবাবু বলাতে দু' জনেই গভীর অপমান বোধ করলে। কিন্তু এখন তর্ক করবার

সময় নেই। বিরিঞ্চি বললে, 'হ্যাঁ, আমরাই যাবো। তোমার কিছু ভয় নেই বাপু, এই নাও।' ব'লে হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালার হাতে গুঁজে দিলে দশ টাকার নোট।

ট্যাক্সিওয়ালা অবাক্ হ'য়ে এই নিতান্ত বালক দুটির দিকে একবার তাকালো; কিন্তু নোটটা পকেটে ভ'রে রওনা হ'লো ফ্ল্যাগ্ নামিয়ে দিয়ে।

বসন্ত চুপি-চুপি বললে: 'কোথায় পেলি টাকা?'

'পেয়েছি পথে কুড়িয়ে', উদাসীনভাবে বললে বিরিঞ্চি। 'ত্যাখ্, আরো আছে', ব'লে পকেট থেকে আরো খান দুই নোট, তার সঙ্গে খুচরো কিছু টাকা-পয়সা বা'র ক'রে দেখালে। 'ভোমরা উদ্ধার-ফণ্ড। হবে না এতে?'

বসন্তর হাতে এ-পর্য্যন্ত কখনো এক টাকার বেশি একসঙ্গে পড়ে নি, সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো। 'খুব জোগাড় করেছিস তো!'

'হবে না এতে?'

'ওঃ, এত লাগবে কিসে? আমাদের একদিন সিনেমা দেখা, চপ-কাটলেট খাওয়া পর্য্যন্ত হ'য়ে যাবে।'

'তুই একটা গাধা। গোয়েন্দাগিরিতে টাকার দরকার—এ আর কী? ঐ যে কালো রঙের প্রকাণ্ড গাড়িখানা যাচ্ছে, তার পিছন-পিছন যেতে হবে।'

শেষের কথাটা ট্যাক্সিওয়ালাকে বলা। ট্যাক্সিওয়ালার পকেটে আস্ত দশ টাকার নোট পড়েছে, তার জগতে এখন বিরিঞ্চির আদেশ ছাড়া আর কোন মূল্যবান্ কথা নেই।

'ঐ যে সীডান বডি—'

'হ্যাঁ—নম্বরটা দেখে নাও, ওয়ান-টু-ফাইভ্-সেভ্ন-নাইন-এইট্, ও।'

'ঐ গাড়ির পিছনে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ—ঠিক ঐ গাড়িখানা চোখের সামনে রেখে চলো। ও চললে চলবে, ও থামলে থামবে।'

বড়ো রাস্তার ট্র্যাফিকের স্রোতের মধ্যে মিশে গেলো একখানা কালো রঙের মোটর, আর তার প্রায় পঞ্চাশ গজ পিছনে একখানা ঝক্কর ট্যাক্সি।

বসন্ত হঠাৎ বল্‌লে, 'কালো মোটরটা যেন হারিয়ে গেলো।'

'না, না, হারায় নি, ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বল্‌লে বিরিঞ্চি। 'কী রে, তোর মুখ যে শুকিয়ে গেছে। ভয় করছে নাকি একটু-একটু?'

বসন্ত শুকনো হেসে বল্‌লে, 'না, না, ভয় করবে কেন?'

'ভয় কেন করে তা জানতে পারলে তো আর ভয়ই থাকতো না,' বিরিঞ্চি বসন্তর কাঁধ

ধ'রে একটু ঝাঁকুনি দিলে। 'কিছু ভয় নেই, আমরা জায়গাটা শুধু দেখে আসবো বই তো নয়!'

'এক্ষুণি ফিরে আসতে পারবো—কি বলিস্?'

'তা পারবো না! আজকের দিনটা ইস্কুল কামাই হ'লো, তা আর কী হবে! আমি বাড়িতে বলেছি—যাচ্ছি ফুলের চারা কিনতে বড়বাজার। তুই কিছু বলেছিস তো?'

'মাকে বলেছি—আজ ইস্কুল থেকে শিবপুরের বাগানে নিয়ে যাবে।'

'যাক্ গে। কী-রকম হঠাৎ আমরা উধাও হয়ে গেলাম, বাড়িতে ওরা কিছু মনে না করে। তা চটপটে না হ'লে এ সব কাজ হয় না।'

'আচ্ছা, ধর, আমরা জায়গাটা দেখেই এলাম। তার পর কী করবো?'

'সেটা তখন ভেবে ঠিক করা যাবে। এমনও হতে পারে, বিশেষ কিছু ভাবতে হবে না। কিন্তু ঐ লোক দুটো যে সত্যিকারের গোয়েন্দা নয়—'

'কী ক'রে বলতে পারিস্। তোর আন্দাজি কথা তো?'

'একটু পরেই দেখবি।'

পার্ক ষ্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে গাড়ি সোজা চললো উত্তরদিকে। হাত-তালি দিয়ে বলে উঠলো বিরিঞ্চি: 'দেখলি তো! এই ত্যাখ্—' বিরিঞ্চি পকেট থেকে একখানা কার্ড বার করলে, 'সরকার এণ্ড্ ডট্, সুইট এক্স্,—জি পার্ক ষ্ট্রীট্।'

কার্ডখানার উপর একটু হাত বুলিয়ে বসন্ত বল্‌লে, 'এটা কোথায় পেলি?'

'বাঃ, তুইও তো দেখলি ওই যুগলমূর্ত্তি এই কার্ড দিয়ে গেলেন তোর বাবাকে। যেই তিনি বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন, আমিও খপ্ ক'রে সেটি তুলে নিলুম টেবিল থেকে।'

'বেশ করেছিস্, খুব ভালো করেছিস।' কিন্তু কেন যে কাজটা ভালো হয়েছে, এই কার্ড কোন্ কাজে লাগবে তাদের, বসন্তকে জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারতো না।

'সুতরাং দেখা গেলো ওঁরা পার্ক ষ্ট্রীটের বাসিন্দা নন্। এবং ওঁদের বংশে সরকার কি দত্ত ব'লে কেউ কখনও ছিলো না, এটাও মনে হয় বই কি!'

'আহা—ধর্ না ওরা বাড়ি না ফিরে এখন অন্য কোথাও যাচ্ছে। ধর, ভোমরার খোঁজেই যাচ্ছে।'

'এটা ঠিক বলেছিস। ভোমরার খোঁজেই যে যাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; এদের পিছন-পিছন আমরাও ভোমরার বর্ত্তমান ঠিকানায় গিয়ে হাজির হব, দেখিস।'

এস্প্লানেডের মোড়ে প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে হ'লো। সেই ফাঁকে ট্যাক্সিটা কালো মোটরখানার প্রায় কাছে এসে পড়ছিলো, বিরিঞ্চি নীচু গলায় বললে, 'এই—এত কাছে না।'

পুলিশম্যানের হাত নামলো, আস্তে আস্তে আবার রওনা হ'লো গাড়ির মিছিল, কালো মোটরখানা বেন্‌টিঙ্ক ষ্ট্রীট ধ'রে চিৎপুরে গিয়ে ঢুকলো। সরু রাস্তা, তার মধ্যে ট্রাম, বাস্‌, রিকশা, গোরুর গাড়ি···পদে পদে হর্ণ বাজিয়ে আস্তে আস্তে এগুতে হয়।

এ সব জায়গায় বিরিঞ্চি কি বসন্ত কখনও আসে নি। দু'দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে লাগলো—বিদেশী চেহারার, অদ্ভুত চেহারার কত লোক, ছোট ছোট বেনে দোকান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাঁচ-তলা ছ'-তলা বাড়ি যেন আকাশের বুকের উপর চেপে বসেছে। এই বেলা সাড়ে দশটাতেও রাস্তার কোনোখানেই রোদ নেই।

বসন্ত চুপি-চুপি বললে, 'কোথায় এলুম?'

বিরিঞ্চি খুব সহজ ভাবেই বললে, 'কী রে, ভয় করছে নাকি?' কিন্তু তারও বুকের ভিতরটা ডুড়ডুড় করছিলো। এখানে সবই অচেনা, সবই অন্য রকম। কলকাতার এ রকম চেহারা কখনোই যেন সে দেখে নি। কত গলিঘুঁজি, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে জটলা, অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে নোংরা। হারিয়ে যেতে হলে এমন জায়গা আর নেই। ট্যাক্সির মধ্যে ব'সে-ব'সেই এই দুটি ছেলের মনে হ'তে লাগলো যেন তারা হারিয়ে গেছে।

বসন্ত হঠাৎ বিরিঞ্চির হাত ধ'রে ব'লে উঠলো—'চল্‌ ফিরে যাই।'

কথাটায় সায় দেবার প্রবল ইচ্ছা দমন করে বিরিঞ্চি বললে, 'পাগল! এত কাছে এসে ফিরবো কি?'

বসন্ত পেটের উপর হাত চেপে বললে, 'আমার কেমন বমি-বমি করছে।'

'নে, খা,' ব'লে বিরিঞ্চি পকেট থেকে কতগুলো চকোলেট বার করলে। বসন্ত একটা নিলে বটে, কিন্তু এক কামড় দিয়ে কিছুতেই গিলতে পারলে না। দিলে ফেলে। বিরিঞ্চি জোর ক'রে একখণ্ড চকোলেট খেলো, সে শুনেছিলো চকোলেটে পরিশ্রমের শক্তি বাড়ায়।

তার পর হঠাৎ কালো মোটরটাকে তারা হারিয়ে ফেললো। বিরিঞ্চি বলে উঠলো—'কি হ'লো, কোথায় গেলো ঐ গাড়ি?'

ট্যাক্সিওয়ালা এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকাতে লাগলো।

'ঐ ডাইনের গলিতে ঢোকো,'—হুকুম দিলে বিরিঞ্চি।

সে ঠিকই বলেছিল। ডাইনের গলির একটা মোড়ে এইমাত্র ১২৫৭৯৮০ নম্বরকে এইমাত্র অদৃশ্য হ'তে দেখা গেল। 'খুব আস্তে যাও, খুব সাবধানে,' বললে বিরিঞ্চি। 'ওরা যেন কিছু সন্দেহ না করে।'

ট্যাক্সিটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে এগোতে লাগলো। মোড়ের পর মোড়, আঁকাবাঁকা সাপের মত, স্যাঁৎসেঁতে বিশ্রী অন্ধকার, আর দু'দিকে অতি প্রকাণ্ড অতি কুৎসিত সারি-সারি

বাড়ি। বিরিঞ্চি বাইরে তাকিয়ে প্রাণপণে চিহ্ন মনে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলো—এই একটা হলদে রঙের বাড়ি, এই একটা পোষ্টবাক্স, এই একটা যাত্রার পোষাকের দোকান—কিন্তু ক্রমশঃই তার মাথা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। শেষটায় হঠাৎ এক জায়গায় এসে খামখা যেন কালো মোটরখানা থেমে গেলো। একদিকে একটা চারতলা মাড়োয়ারির বাড়ি, আর অন্যদিকে—মনে হয় কিছুই নেই, শুধু একটা দেয়াল, বুঝি একটা বাড়ির পিছনের দিক্‌।

একটু দূরে ট্যাক্সিও দাঁড়ালো।

(ক্রমশঃ)

মণি-মঞ্জুষা

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

[কবিকঙ্কণ চণ্ডী কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা। মুকুন্দরামের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় ছিল, কিন্তু তিনি মেদিনীপুর জেলায় বাস করতেন। খুব সম্ভবতঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষে কিংবা ১৭শ শতাব্দীর প্রথমে এ বইখানা তিনি লিখেছিলেন। ছন্দ, ভাষা ও ভাবের গুণে এই বই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খুবই আদর লাভ করেছিল।]

দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করলে হিমালয়ের ঘরে তাঁর জন্ম হ'ল পার্ব্বতী নাম নিয়ে, এবং শিবের সঙ্গে বিবাহ হ'ল। কিছু দিন পরে গণেশ কার্ত্তিক নামে তাঁর দু'টি ছেলে হ'ল।

ভোলানাথ সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতেন না, ফলে একদিন অন্নকষ্ট নিয়ে পার্ব্বতীর সঙ্গে হ'ল তাঁর ঝগড়া। পার্ব্বতী রাগ করে কৈলাস থেকে চলে গেলেন। পার্ব্বতীর সখী পদ্মা তাঁকে পরামর্শ দিলেন—পৃথিবীতে তাঁর পূজা প্রচারের চেষ্টা করতে।

পার্ব্বতীর (চণ্ডীর) মায়ায় ইন্দ্রের ছেলে নীলাম্বর শিবের শাপে কালকেতু ব্যাধ হয়ে পৃথিবীতে জন্মাল। পার্ব্বতী একদিন গোসাপের রূপ ধরে তাঁর কাছে দেখা দিতেই সে দেবীকে বেঁধে ঘরে নিয়ে এল। কালকেতুর ঘরে গিয়ে পার্ব্বতী নিজের রূপ প্রকাশ করলেন। তখন কালকেতু নানা ভাবে তাঁর স্তবস্তুতি করল। দেবীর দয়ায় কালকেতু মহাধনী হ'ল। এর পর আরও একবার বিপদের সময়ে দেবীর স্তব করে কালকেতু মুক্তি লাভ করল।

তার পর দেবী ঠিক করলেন তিনি মেয়েদের কাছে পূজা নেবেন। ধনপতি নামে এক

সওদাগরের দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন খুল্লনা (ইনি পূর্ব্বজন্মে ছিলেন এক অপ্সরী)। একবার ধনপতি গৌড়ে গেলে তাঁর প্রথমা স্ত্রী লহনা খুল্লনার উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ করলেন, এমন কি তাঁকে ছাগল চরান'র ভার পর্য্যন্ত দিতে কসুর করলেন না। খুল্লনা তখন চণ্ডীপূজা করে দেবীর প্রসাদে আবার সৌভাগ্য ফিরে পেলেন।

এর পর একদিন ধনপতি সিংহলে যাবার সময়ে চণ্ডীকে ঠাট্টা করলেন। ফলে পথে ঝড় উঠে তাঁর সমস্ত জাহাজ ডুবে গেল, তিনি সিংহলে গিয়ে বন্দী হলেন। তার পর ধনপতির ছেলে শ্রীমন্ত আবার দেবীর পূজা করে তাঁর সাহায্যে নানা বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেয়ে সিংহলে গিয়ে বাপকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

'ভাদরের গান'

(গ্রাহকের লেখা)

(শ্রীঅজয়কুমার মিত্র)

১

মেদুরা রবষা গেল ঘোমটা টানি,
মৃদুল চরণে আসে শরৎ-রাণী।
নদীতীরে আশেপাশে,
ছেয়ে গেলো ঘনকাশে,
ভাদর মেঘেতে খেলে ছল দামিনী,
মৃদুল চরণে আসে শরৎ-রাণী।

২

কূলে কূলে হেসে চলে ভরা তটিনী,
সোনালী আলোয় আসে শরৎ-রাণী।
খেয়া পারাপার চলে,
পাখীগুলো কথা বলে,
ভাদর-নদীতে ফের চলে তরণী,
সোনালী আলোয় আসে শরৎ-রাণী।

৩

বরষা কোথায় গেল আমি কি জানি ?
তবে শুনি ওই আসে শরৎ-রাণী।
রামধনু নীলাকাশে,
মাটির নরম ঘাসে,
আনমনে কি যে বলে আমি শুনি নি,
তবে শুনি ওই আসে শরৎ-রাণী।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

ভোম্বোল সর্দ্দার—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরী। দাম ॥৵০

ছোট্ট একটি পাড়াগেঁয়ে দুষ্টু ছেলে ভোম্বল, তারই নানা রকম 'এডভেঞ্চারের' গল্প। এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। পল্লীচিত্র আঁকতে লেখক আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এ বই তোমাদের খুব ভাল লাগবে।

অতীতের পৃথিবী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। দেব সাহিত্য কুটীর। দাম ১৲

ঠাকুরদা'র মুখে গল্পচ্ছলে পৃথিবীর জন্ম থেকে আরম্ভ করে তার জীবের উৎপত্তি, তার নানা পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্য কৌশলে লেখা হয়েছে। উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক, অথচ প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা শিক্ষনীয় বিষয়ে ভরপূর। শিশুসাহিত্যে এ বইএর খুবই আদর হওয়া উচিত। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবিও আছে।

ইক্‌ড়ি মিকড়ি—শ্রীবিকাশ দত্ত প্রণীত। চারু-সাহিত্য কুটীর। দাম ॥৵০

খুব ছোটদের জন্য লেখা খুব মজার একখানা বই। পাতায় পাতায় মজাদার ছবি। পড়লে না হেসে থাকতে পারবে না।

লাফিংগ্যাস—শ্রীবিমল দত্ত এম্.এ প্রণীত। চারু-সাহিত্য কুটীর। দাম ॥০

লাফিংগ্যাস অর্থাৎ হাসাবার গ্যাস। লেখক নামটা ঠিকই দিয়েছেন। প্রত্যেকটি গল্পই বিমল হাস্যরসে ভরপূর। ঝরঝরে ভাষা বইখানাকে আরও সুখপাঠ্য করেছে।

বীর আশানন্দ—(২য় সং)। শ্রীচণ্ডীচরণ দে প্রণীত। নিউ বুক্ ষ্টল। ॥০ (ডি, পি, আই কর্ত্তৃক প্রাইজ-বইএর জন্য মনোনীত)। আশানন্দ ঢেঁকি বাংলার গৌরব। তাঁরই জীবনের কাহিনী সুন্দর ও সরস ভাবে এতে বলা হয়েছে। অল্প দিনেই বইখানার ২য় সংস্করণ হওয়া সুখের কথা। তোমাদের বইটা পড়ে দেখতে বলি।

চিঠিপত্র

তোমরা শুনে সুখী হবে যে রামধনুর গ্রাহক শ্রীমান্ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিপদক পেয়েছেন। লেখক হিসাবেও কামাক্ষীপ্রসাদ এর মধ্যেই নাম করেছেন। ফটো তুলতেও তিনি খুব ওস্তাদ্। এ মাসের রামধনুতে তাঁর গল্প এবং ছবি দুই-ই দেখতে পাবে।

শ্রীশঙ্করকুমার মিত্র জানতে চেয়েছেন—রামধনুতে আগে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতাবার যে ব্যবস্থা থাকত সেটা এখনও আছে কিনা। আছে বৈকি! গ্রাহকেরা ইচ্ছা করলেই এর সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

শ্রীমতী মঞ্জরী গুহ রামধনুর 'মণি-মঞ্জুষা' বিভাগে মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্যেরও পরিচয় দিতে অনুরোধ করেছেন। এ মাসে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর' কথা দেওয়া হ'ল।

শ্রীমতী শোভারাণী দত্ত জানতে চেয়েছেন ঘরে বসে কালি, সাবান প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিষ সহজ উপায়ে তৈরী করবার উপায় লেখা আছে এমন কোন বাংলা বই আছে কি? আছে। অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের লেখা "শিল্প ও বিজ্ঞান-শিক্ষা" নামক বই-এ ও বিষয় এবং ঐ ধরণের আরও অনেক বিষয় সুন্দর ভাবে লেখা আছে।

কুমারী পুষ্পলতা গোস্বামী শ্রাবণের ধাঁধার উত্তরটা কি করে হ'ল বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। কাকাবাবুর বয়স এখন ৪৫ বছর, আসছে বছর ৪৬ হবে। আসছে বছর দাসুর বয়স হবে ১০, ছোটুর ৮, আর খোকনের ৫ বছর। তিন জনের একত্রে হবে ২৩। অর্থাৎ কাকাবাবুর তখনকার বয়সের অর্দ্ধেক। ঠিক এই ভাবে হিসাব করলেই দাসু প্রভৃতির বয়সও ঠিক আছে দেখা যাবে। অনেক গ্রাহকই আসছে বছরের সঙ্গে এ বছরের বয়স গোলমাল করে ফেলেছেন, ফলে উত্তর শুদ্ধ হয় নি।—বাঃ সঃ

সন্দেশ

সম্প্রতি নিউইয়র্কে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই-এর সঙ্গে ইংরাজ মুষ্টিযোদ্ধা টমি ফার-এর মুষ্টিযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জো লুই ফারকে হারাইয়া এ বছর পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা (ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন্) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। টমি ফারও খুব প্রশংসার সহিত যুঝিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই নিগ্রোটির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই—অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি পয়েণ্টে পরাজিত হইয়াছেন। ১৫ রাউণ্ড লড়াই হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হইবার সম্মান যাঁদের যাঁদের ভাগ্যে জুটিয়াছিল তাঁদের কয়েক জনের নাম এখানে দিলাম—

১৮৮২—জন্ সুলিভান, ১৮৯২—জেম্‌স্ করবেট, ১৮৯৭—বব্ ফিট্‌জ্‌সাইমন্‌স্, ১৮৯৯ জেম্‌স্ জেফ্রিস্, ১৯০৫—মারভিন হার্ট, ১৯০৬—টমি বার্ন্‌স্, ১৯০৮—জ্যাক্ জন্‌সন্, ১৯১৫—জেস্ উইলার্ড্, ১৯১৯—জ্যাক্ ডেম্প্‌সি, ১৯২৬—জিন্ টুনি, ১৯৩০—ম্যাক্‌স্ শ্মেলিং, ১৯৩২—জ্যাক্ শার্কি, ১৯৩৩—প্রাইমো কার্ণেরা, ১৯৩৪—ম্যাক্স্ বেয়ার, ১৯৩৫—জেম্‌স্ ব্র্যাডক্।

* * *

কলিকাতায় যেমন ফুটবলে আই, এফ, এ শীল্ড, তেমনি বোম্বাইএ রোভার্স কাপ্ আর সিমলায় ডুরাণ্ড্ কাপ্। সম্প্রতি বোম্বাইএর রোভার্স কাপ্ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে—ফাইনালে বাঙ্গালোর মুস্‌লিম্‌স্ দল কলিকাতার মহামেডান স্পোর্টিংকে ১ গোলে হারাইয়া এই কাপ্ জয় করিয়াছে। রোভার্স কাপের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত মিলিটারী দল ছাড়া কোন

সিভিল্ দলই কাপ্ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এমন কি, সিভিল দলের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগান ছাড়া অন্য কোন দল ফাইনালেও যাইতে পারে নাই। কিন্তু এবার ফাইনালে উঠিয়াছিল দু'টিই সিভিল দল এবং দু'টিই ভারতীয় দল। এবারকার আই-এফ-এ বিজয়ী ৬ষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড দল অল্ রেড্‌স্-এর কাছে হারিয়া যায়, আর অল্ রেড্‌স্ সেমি-ফাইনালে হারে মহামেডান্ স্পোর্টিংএর কাছে। বাঙ্গালোর মুস্‌লিম্‌স্ দলে কয়েকটি হিন্দু খেলোয়াড়ও ছিলেন—এঁদের মধ্যে ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের মুর্গেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণের নাম তোমরা জান; লক্ষ্মীনারায়ণই জয়নির্দ্দেশক গোলটি দেন। বিখ্যাত ফরওয়ার্ড রহমৎও এই দলে খেলিয়াছিলেন।

* * *

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কত তার হিসাব প্রায়ই নেওয়া হয়—কিন্তু গৃহপালিত পশুর সংখ্যা কত তার হিসাব বড় একটা কেহ রাখে না। সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে পৃথিবীতে এখন প্রায় ১৬৫ কোটি গৃহপালিত পশু আছে, তার মধ্যে ভেড়ার সংখ্যা সব চেয়ে বেশী—৭৫ কোটি।

* * *

সাধারণতঃ অল্প বয়সেই লোকে বেশী অপরাধ করে। আমেরিকার এক বড় জেলখানার কয়েদীদের হিসাব নিয়া দেখা গিয়াছে যে তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বয়স ২১ বছরের কম। ৩০ বছরের বেশী বয়সের কয়েদীর সংখ্যা সেখানে মাত্র শত করা ২০ জন।

* * *

এক-একটি ঈল মাছ বছরে প্রায় ১ কোটি ডিম পাড়ে। কড্ মাছ পাড়ে প্রায় ৮০ লক্ষ ডিম, কাঁকড়াও প্রায় ঐ রকম। চিংড়ি, উই, মৌমাছি এরাও সারা জীবনে লক্ষ লক্ষ ডিম পাড়ে। অবশ্য এই সব ডিমের অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত বাঁচে না তাই রক্ষা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এক ইঁদুরই যদি পৃথিবীতে যত জন্মায় সব বাঁচে, তবে ৭০ বছরের মধ্যে তারা সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিতে পারে।

* * *

জীবাণুর জন্ম-মৃত্যু আরও তাড়াতাড়ি হয়। এক গ্লাস ঘোলের মধ্যে যে জীবাণু থাকে তারা যদি একটিও না মরিয়া বংশ বিস্তার করিবার সুবিধা পায় তবে ৫।৬ দিনে সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতে পারে।

* * *

আমেরিকার পুলিশেরা আজকাল এক রকম বৈদ্যুতিক দস্তানা ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছে। ঐ দস্তানা হাতে পরিয়া কারও হাত চাপিয়া ধরিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কাজেই তাকে গ্রেফতার করিতে বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে দেশে চোর-ডাকাতের সংখ্যা খুব বেশী সেখানে পুলিশকেও তেমনি ব্যবস্থা করিতে হইবে তো!

* * *

সমুদ্রের জলে লবণ থাকে তা সকলেই জান। আটলাণ্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতিতে প্রতি ৩০ সের জল প্রায় ১ সের লবণ পাওয়া যায়, কিন্তু মরু-সাগরে (ডেড্ সী) পাওয়া যায় প্রায় সওয়া ২ সেরেরও উপরে। সেজন্য সেখানকার জল এত ভারী যে সে জলে কারও ডুবিবার ভয় নাই।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

কলা, সকাল, বেগুণ, সেতার, ভাল, নিয়ম, জোনাকি, শ্রীহট্ট, লাশ, তোতা, বসু, শ্রী।
লাইনগুলি এইরূপ হইবে—

কয়লা বড় কাল, গুণ তার ভাল।
নিম নাকি বিশ্রী। পলাশও তো সুশ্রী !

উত্তরদাতাদের নাম

প্রভা, প্রমা ও প্রবীর (বেতিয়া); কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল); ছায়া দেবী (রতনপুর); মাষ্টার নিখিল চৌধুরী (কুমিল্লা); রেণু চৌধুরী (রাজসাহী); রত্না দেবী (পাটনা); অমলবরণ ও অসিত রায় (সাটীরপাড়া); কল্যাণী, শান্তি, সরলা, মীনাক্ষি (কলিকাতা); মীরানন্দিতা দাশ (লাহোর); শঙ্কর, প্রফুল্ল, বিপু, বুটু (যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়); রাখাল, তারা, বিনু, মনা (নীলফামারী); রমা নিয়োগী (কলিকাতা); মায়ারাণী মিত্র (কলিকাতা); দিলীপ সেন, সত্যনারায়ণ সিংহ (রাজসাহী); মৃত্যুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া); সত্যানন্দ প্রামাণিক, ছানা, ননী, সুশীলদা' (খুরদা রোড্); পাঁচুগোপাল ঘোষ (গারুলিয়া); রণেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী); সত্যরঞ্জন, মনোরঞ্জন ঘোষ (কালীঘাট); অঞ্জলি চৌধুরী, শ্যামল, বিজু, তুলু, (কলিকাতা); বেলা, বেবী, সতী, তরুণ (পাতিহাল); রথীন্দ্রমোহন দাস, মঞ্জুভূষণ দত্ত (ঢাকা); পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া); হরিহর, শান্তি, গৌরী, পুষ্প মজুমদার (বালিগঞ্জ প্লেস্)।

নূতন ধাঁধা

(হেঁয়ালী)

(১) জলে কি দিলে বাজনা বাজে ?
(২) জলে কি দিলে গান সুরু হয় ?
(৩) চিল কখন মুখে বসে ?
(৪) কোন্ জিনিষ গাছের গা বেয়ে ওঠে,
কিন্তু উল্টে দিলে গাছের মাথায় গিয়ে চড়ে ?
(৫) ধারাল অস্ত্রের সাহায্য না নিয়েও কোন্ জিনিষ কাটা যায় ?

(ধাঁধার উত্তর ১০ই আশ্বিনের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।)

কোজাগরী পূর্ণিমা

১০ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৪ | ১০ম সংখ্যা

পূজায়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

এ শুভ শরতে মায়ের সোহাগ
কমল হইয়া ফুটে,
পাপিয়া-কণ্ঠে আদরের বাণী
মধুর হইয়া উঠে।

বনের পুলক হয় যে শেফালি—
শ্যাম বনভূমে শোভার দীপালী,
সুধার কণিকা ধরে আনন্দে
বিটপী পর্ণপুটে।

কোজাগরী পূর্ণিমা

১০ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৪ | ১০ম সংখ্যা

পূজায়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

এ শুভ শরতে মায়ের সোহাগ
কমল হইয়া ফুটে,
পাপিয়া-কণ্ঠে আদরের বাণী
মধুর হইয়া উঠে।

বনের পুলক হয় যে শেফালি—
শ্যাম বনভূমে শোভার দীপালী,
সুধার কণিকা ধরে আনন্দে
বিটপী পর্ণপুটে।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

২

সুনীল গগন, উজ্জ্বল রবি,
সুরভিত সমীরণ,
নির্ম্মল জল, শ্যামল ভূতল
সাথে তাঁর আগমন।
বিশ্বের এই নির্ম্মলতার
ছাপ পড়ে যেন বক্ষে সবার,
ক্ষণিকের তরে যায় স্বার্থের
সব বন্ধন টুটে।

৩

ধনী আজ তাঁর ধনের অংশ
দীনেরে বিলাতে চান,
হিসাবীও আজ পুলকে করেন
অনাবশ্যক দান।
খাওয়া চেয়ে আজ খাওয়াইয়া সুখ,
গ্রহণের চেয়ে দানে ভরে বুক,
অনিমন্ত্রিত কেহ নাহি আজ
মায়ের অন্নকূটে।

একদা এক কুকুরের পা ভাঙ্গিয়াছিল

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বনমালী ডাক্তারের নাম-ডাক ভারী। নাম তাঁর খুব এবং নামের চেয়ে ডাক আরও বেশী। কলের তাঁর বিরাম নেই—কেননা, ডাক্তার হলেও, পরোপকার করতে মজ্‌বুত তাঁর মত আর দু'টি ছিল না। অনেক সময়ে ভিজিট্‌ না নিয়েই তিনি রোগী দেখ্‌তেন, এমন কি, তেমন পীড়াপীড়ি করে ধর্‌লে, ওষুধ-পথ্যের দামটাও দিয়ে ফেল্‌তেন নিজের পকেট থেকেই। এমনও শোনা গেছে, দু'-এক অপারগ-ক্ষেত্রে, রোগীর সৎকারের ব্যয়ভারও তিনি নিজেই বহন করেছেন—চরম-উপকারটাই বা বাদ যায় কেন!

মোটের উপর, কখনও কারও উপকার করার সুযোগ পেলে তা থেকে আত্মসম্বরণ করা তাঁর পক্ষে শক্তই ছিল। এই কারণে, সেই ছোট্ট মফস্বলের সহরে, পসার তাঁর খুব জম্‌লেও পয়সা তিনি খুব বেশী জমাতে পারেন নি।

একদিন কল্‌ সেরে বনমালী বাবু বাড়ী ফির্‌ছেন। রোদ তখন চড়্‌চড়ে, বেলা দুপুর বয়ে গেছে—বিকল অবস্থা তাঁর! হেঁটেই ফির্‌তে হচ্ছে তাঁকে,—কেননা, ঐ তো বলেছি, পসার জমলেও পয়সা তেমন জমে নি,—এই কারণেই গাড়ী-ঘোড়া আর করা হয়ে ওঠে নি।

বাড়ী ফিরছেন, এমন সময়ে, পথপ্রান্ত থেকে এক করুণ আর্ত্তনাদ তাঁর কানে গেল—"কেঁউ!"

বনমালী বাবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকান। নিতান্তই পাশবিক আহ্বান! মানবিক ভাষায় অনুবাদ কর্‌লে যার মানে হবে—"কে যায়?"

বনমালী বাবু চল্‌তে থাকেন, এই চড়ন্ত রোদে, একটা উত্তর দেবার জন্যও, দাঁড়ানো কঠিন হয় তাঁর পক্ষে। জবাব দেবার প্রয়োজনও মনে করেন না তিনি। কে যায়? দেখতে পাচ্ছ না, যাচ্ছেন বনমালী বাবু, আমাদের সহরের সবার সেরা ডাক্তার? পিছন থেকে ডাকার জন্য মনে মনে বিরক্তই তিনি হন।

কিন্তু দু' পা না এগুতেই—আবার "কেঁউ কেঁউ!"

এবার কেবল শব্দের সংখ্যাই দ্বিগুণ নয়, আহ্বানও তীক্ষ্ণতর, করুণতর। মুখ আরো কাঁচুমাচু।

এবার বনমালী বাবুর করুণার তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত করে। একেবারে সটান্‌ তাঁর হৃদয়ে—তাঁর 'য়্যানাটমি'র সব চেয়ে দুর্ব্বল জায়গায়। পরোপকারের স্পৃহা তাঁর জাগ্‌তে থাকে। তাঁকে ফিরে আস্‌তে হয়।

বেচারী কুকুর, একটা পা তার গেছে ভেঙে। কোন দুর্ঘটনার ফলেই, নিশ্চয়ই। ডাক্তারকে দেখ্‌তে পেয়েই তাই ডাকাডাকি সুরু করেছে; বুঝ্‌তে দেরী হয় না বনমালী বাবুর। বনমালী বাবু তার পা দেখেন, তার পর ঘাড় নাড়েন।

কুকুরের ব্যবস্থা তিনি কি করবেন? এ পর্য্যন্ত মানুষ ছাড়া অন্য কোন জানোয়ারের চিকিৎসা করেন নি তিনি—অন্ততঃ, তাঁর সজ্ঞানে। অবশ্য অনেক মানুষকে, জানোয়ার সন্দেহ না করেই, তিনি আরাম ক'রে এনেছেন। যেমন সেবার এক পাওনাদারকে বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচালেন, আর সে কিনা ভালো হয়েই ডিক্রিজারি ক'রে তাঁর বসত-বাড়ী নিয়ে টানাটানি সুরু কর্‌ল!

আস্ত জানোয়ার সে ব্যাটা, তাতে আর ভুল নেই। কিন্তু সে তবু পদে আছে; তার দুই পদে। কিন্তু এই চার-পদের জানোয়ার নিয়ে তিনি কি কর্‌বেন এখন? এদের চিকিৎসার কী জানেন তিনি? ভারী বিপদের ব্যাপার হ'ল তো!

ঘাড় নেড়ে তিনি চল্‌তে সুরু করেন। একধারে অগ্নিমূর্ত্তি সূর্য্য, আর এক ধারে ভগ্নপদ কুকুর—এর মাঝামাঝি সমস্ত পৃথিবীর উপর নিদারুণ বৈরাগ্য হয় তাঁর।

কুকুরটা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল—"কেঁউ?"

ওর অর্থ, 'কি রকম দেখ্‌লে হে?' ওদের ভাষায় শব্দ মাত্র দু'-একটি—কেবল উচ্চারণের আর 'এম্‌ফ্যাসিসে'র তারতম্যে মানে আলাদা আলাদা হয়।

"দেখে আর কর্‌ব কি!" তিনি উত্তর দিয়েছেন, তাঁর ঘাড় নেড়েই। বাক্যব্যয় পর্য্যন্ত করেন নি।

চল্‌তে চল্‌তে ছোটবেলায়-পড়া ঈশপের গল্প তাঁর মনে পড়ে যায়—'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল', এবং তাকে ভালো কর্‌তে গিয়ে বক-ডাক্তারের কি নাকালটাই না! তাঁর বাঘা-পাওনাদারের কাহিনীও তাঁর মনে পড়ে। নাঃ, জানোয়ারদের উপকার করার কোন মানেই হয় না, ও কোন কাজের কথাই নয়!

তাঁকে চলে যেতে দেখে কুকুরটা আবার আরম্ভ করে—"কেঁউউ—কেঁউউ—!"

থম্‌কে দাঁড়ান বনমালী বাবু। বাঘ এবং বকের বৃত্তান্তটা আবার ভাবেন। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের চেয়ে রোগী ছিল বেশী দুর্দ্দান্ত। কুকুরটাকে বাঘের মধ্যে তিনি গণ্য কর্‌তে পারেন না। এবং নিজেকে বক বলে জ্ঞান কর্‌তে পারেন না কিছুতেই! তাঁকে ফির্‌তে হয়।

আর তা ছাড়া, যদি পরোপকারের কথাই ধর, কুকুর তো কিছু মানুষ নয় যে তাকে পর বিবেচনা করতে হবে। মানুষই কেবল পর হতে পারে, মানুষের মত এত পর আর আছে কে! এই জন্যই, মানুষের উপকার করার মানেই পরোপকার করা। কিন্তু কুকুর তো মানুষ নয়, তার উপকার অনেকটা নিজের উপকার করা বলেই ধরা উচিত—এমনি ধারণা হয় বনমালী বাবুর।

কুকুরটাকে বাড়ী নিয়ে যান তিনি। অনেক যত্নে এবং বহুৎ পরিশ্রমে পায়ের হাড় যোড়া দিয়ে, ব্যাণ্ডেজ্‌ ক'রে ছেড়ে দেন বেচারাকে। আরাম হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যায় সে। অবশ্য, যাবার আগে ধন্যবাদ জানিয়ে যায়—"ক্যাঁও!"

অর্থাৎ কিনা,—"বহুৎ আচ্ছা।"

বনমালী ডাক্তারের বাইরের ঘরেই ডিস্‌পেন্‌সারী। এবং সেইখানেই তাঁর রাত্রের শয়নের ব্যবস্থা। কি জানি, গভীর রাত্রে যদি কোন ব্যারামীর ডাক পড়ে! বাইরের ঘরে শুলে সহজেই ডেকে পাবে তাঁকে। পরোপকারের সুযোগ হাতছাড়া করতে নিতান্তই নারাজ তিনি।

পর দিন ভোর হ'তে-না-হ'তে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। অদ্ভুত রকমের শব্দ! তিনি কান খাড়া করেন, রোগীর বাড়ী থেকে কেউ ডাকৃতে এসেছে বোধ হয়! কিন্তু না, দরজার গায়ে কেবল একটা হাঁচোড়-পাঁচোড়ের আওয়াজ।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খোলেন তিনি। খুলেই ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যান। সেই কালকের কুকুরটা এবং তার সঙ্গে আর একজন! নতুন কুকুরটার আকার-প্রকার দেখে মনে হয়, এ-পাড়ার কেউ না! কোন ভবঘুরে হয়তো!

ব্যাপার কি?

মুখ থেকে প্রশ্ন খস্‌তে না খস্‌তে আরামগ্রস্ত কুকুরটা নিজস্ব ভাষায় তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। "দেখ্‌ছ না! এ বেচারারও একটা পা যে ভেঙেছে!"

ডাক্তারের চক্ষুস্থির হয়, তাই বটে!

আগের কুকুরটা আবার যোগ করে: "কেঁউ কেঁউ-কেঁউউ।"

ওর বাংলা অনুবাদ—"আমার বন্ধুকেও সারাতে হবে তোমায়।"

তৎক্ষণাৎ ওষুধ-পত্র, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বনমালী ডাক্তার। এবং ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেন এই ভেবে, যে তাঁরই দয়ায়, হতভাগ্য জীবদের উদ্ধার করার সুযোগ এবং শক্তি তিনি পেয়েছেন।

অল্পক্ষণেই আরাম হয়ে, দুই বন্ধু পুলকিত-পায়ে চলে যায়। যাবার সময় নমস্কার ক'রে যায় ডাক্তার বাবুকে—ল্যাজ তুলে।

তার পর দিন প্রাতঃকালে আবার সেই দু'টো কুকুর (তারা তখন পদস্থ ব্যক্তি), এবং তাদের সঙ্গে আরো দু'জন। নবাগতরা খোঁড়া। এদের সারাতে বেশ বেগ পেতে হয় ডাক্তারকে, অনেক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

তারা চলে গেলে ডাক্তার বাবু বিস্ময়ের আতিশয্যে ভেঙে পড়েন। এত দিন মানুষের মহলেই তিনি খ্যাত ছিলেন, এখন কি ইতর-প্রাণীর সাম্রাজ্যেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়্‌ল! অবাক্‌ হয়ে ভাব্‌তে থাকেন তিনি। বেশ গর্ব্বও হয় মনে মনে।

তার পর দিন আটটা কুকুরের আবির্ভাব। ঐ একই দুর্ঘটনাপীড়িত! ওদের নতুন ক'রে নির্ম্মাণ করতেই ডাক্তারের সারা সকালটা কেটে যায়—মানুষের কলে আর বেরুনো হয় না ওঁর!

নাই হোক্‌, তাতে দুঃখিত নন্‌ বনমালী ডাক্তার! মানুষকে ভালো করে যত না আনন্দ পেয়েছেন জীবনে, তার শতগুণ বেশী আনন্দ তিনি বোধ করছেন ক'দিন থেকে। তা ছাড়া, অনেক মানুষের সঙ্গে এক বিষয়ে এদের একটা ভীষণ মিলও তিনি লক্ষ্য করেছেন। এরাও কেউ ভিজিট্‌ দেয় না! কাজেই কোন দুর্ভাবনাই নেই বনমালীর।

পরদিন দরজা খুল্‌তেই তাঁর চোখে পড়ে ষোলটা কুকুর! সবাই সমান লালায়িত। তাঁর চিকিৎসার জন্যই, অবশ্য। এবার আনন্দের ধাক্কা সাম্‌লানো দুরূহ হয় তাঁর পক্ষে।

চার-পেয়ে রোগীদের ব্যবস্থা করতেই বিকেল হয়ে যায় তাঁর। স্নানাহারের ফুরসৎ পান না।

তার পরের দিন বত্রিশটা।

যারা 'সারৃতব্য' তারা তো এসেছেই, যারা সেরে গেছে তারাও এসেছে তাদের সঙ্গে। সমস্ত ডিস্‌পেন্‌সারিতে আর তিল ধারণের স্থান নেই। সেদিন তাঁকে দু'জন কম্পাউণ্ডার ভাড়া ক'রে আন্‌তে হয়।

সেদিনও কেটে যায়।

তার পর দিন কুকুরে-কুকুরে একেবারে ছয়লাপ! সাম্‌নের রাস্তার একধার কেবল কুকুরে ভর্ত্তি, অন্য ধারে পাড়ার যত ছেলে-বুড়ো দাঁড়িয়ে। তারা সব দেখ্‌তে এসেছে।

"এত কুকুর ছিল কোন্ রাজ্যে!" চোখ কপালে তুলে চমৎকৃত হন বনমালী বাবু।

কুকুরদের চেঁচামিচির আর অন্ত নেই। সবাই আগে দেখাতে চায়, সারতে চায় সবার আগে।

সব জিনিষেরই সীমা আছে। বনমালী ডাক্তারের অসহ্য হয় আজ। কুকুরদের কাতর প্রার্থনায় আজ তাঁর মাথা গরম হ'তে থাকে। তাঁর মানুষ-রোগী দেখার ফুরসৎ নেই, নাওয়া-খাওয়া তো মাথায় উঠেছে, দিনরাত কেবল কুকুর আর কুকুর! হঠাৎ তিনি ক্ষেপে ওঠেন।

"আর আমার নিজের উপকার ক'রে কাজ নেই! পরোপকারেও ইস্তফা দিলাম আজ থেকে। নিয়ে আয় তো আমার বন্দুক!"

ব'লে নিজেই গিয়ে নিয়ে আসেন বন্দুকটা। "আজ এই দিয়েই শেষ করব ব্যাটাদের! তবেই আমার নাম বনমালী ডাক্তার!"

বন্দুক নিয়ে বেরুতেই, একটা কুকুরের ল্যাজে তাঁর পা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁকে কাম্‌ড়ে দেয় খ্যাঁক্ ক'রে। তাকিয়ে দেখেই তাকে চিন্‌তে পারেন—তাঁর সব প্রথমের রোগী!

কামড় খেয়ে তার পর রাগে আর তাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বন্দুক হাতে যেন তাণ্ডবনৃত্য সুরু হয় তাঁর। বন্দুক ছোঁড়ার কথা তিনি একদম্ ভুলেই যান, বন্দুককে ছড়ি বলেই তাঁর ভ্রম হয়; বন্দুক-পেটা কর্‌তে আরম্ভ করেন তিনি। ফলে, যারা খোঁড়া ছিল তাদের খোঁড়ামির মাত্রা তো বেড়ে যায়ই, ভূতপূর্ব্ব খোঁড়াদেরও অনেকে আবার পা-ভাঙা হয়ে বাড়ী ফেরে। (অর্থাৎ, রাস্তায় ফেরে, রাস্তাই কুকুরদের ঘর-বাড়ী কিনা!)

এর একমাস পরের ব্যাপার।

বনমালী ডাক্তার নিজেই হাসপাতালে পড়ে আছেন। কুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্কে তাঁকে ধরেছে, জীবনের তাঁর আশা নেই।

শেষ মুহূর্ত্ত ঘনীভূত হবার আগে নার্স্‌কে তিনি ইঙ্গিতে ডাকেন—"আমার একটা কথা রাখ্‌বে?"

নার্স্ ব্যস্ত হয়ে ওঠে—"ডাক্‌ব ডাক্তার সাহেবকে?"

"না না, তার কোন দরকার নেই। একটা কথা রাখ্‌তে বল্‌ছি তোমায়। ঈশপের গল্প পড়েছ?"

নার্স্ ঘাড় নাড়ে।

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, সেই গল্পটা?"

"পড়েছি ডাক্তার!

"আমার গল্পটাও যেন সেই বইএ যোগ করা হয়। একদা এক কুকুরের পা ভাঙিয়াছিল। বকের চেয়েও আমার পরিণাম শোচনীয়, বক মাথা বাঁচাতে পেরেছিল, আমি কিন্তু পারি নি। যোগ কর্‌তে বল্‌বে তো?"

"কাকে বল্‌ব স্যার্?" নার্স্ ঠিক বুঝতে পারে না।

"কেন, ঈশপ্‌কে?" একেবারে অ-বাক্ হবার আগে বনমালী আর একবার অবাক্ হন! "কাকে আবার? সেই-ই তো তার বইএ এটাও যোগ করবে।"

"ঈশপ্!" নার্সের বাক্যস্ফূর্ত্তি হতে ঈষৎ দেরীই হয়, "তিনি তো মারা গেছেন!"

"মারা গেছেন? কেন? তাঁকেও কি কুকুরে কাম্‌ড়েছিল নাকি?"

ঈশপের মৃত্যু-শোক তাঁর সহ্য হয় না। বল্‌তে বল্‌তে তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে যায়। সেই ধাক্কাতেই তিনি 'হার্ট-ফেল্ করেন।'

ভবিষ্যতে

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

ভবিষ্যতে মানুষের চলাফিরা, বসবাস, কাজকর্ম্ম, খাওয়া-দাওয়া—অর্থাৎ জীবনযাত্রা, কেমন হবে সে বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা কর্‌ছেন পণ্ডিতেরা।

কেউ বলেন, "তখন আমরা মঙ্গল-গ্রহে যেতে শিখ্‌ব", "কেরোসিন থেকে দুধ তৈরী হবে", "হাঁস-মুর্গী গরুর মত বড় হবে, এবং মানুষের চেষ্টার ফলে হবে", "শর্দ্দি-কাশি পৃথিবীতে থাক্‌বে না"; কেউ বলেন, "রাস্তায় দুর্ঘটনা, গাড়ী চাপা-পড়া, এ সব অসম্ভব হবে তখন", "ইচ্ছামত বৃষ্টি পড়ান, মেঘ তাড়ান সম্ভবপর হবে", "মানুষ অনায়াসে ১০০ বছর বাঁচ্‌তে পার্‌বে"; কেউ বলেন, "তখনকার মোটর-গাড়ীর টায়ার ফাটবে না, গাড়ীতে রং দিতে হবে না, নিঃশব্দে বিদ্যুৎবেগে চল্‌বে, পেট্রল

ছাড়া চালান যাবে", "এরোপ্লেন আকাশপথে সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে ; ঘণ্টায় ৩।৪ শ' মাইল চল্‌বে" ইত্যাদি।

এ সব তো গেল জল্পনা-কল্পনার কথা। এর কিছু হয়তো ঠিক হবে, কিছু হবে না। এ ছাড়াও আরো অনেক ব্যাপার আছে যে বিষয়ে এখনকার নানা ঘটনা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা ঠিক কথা বলা চলে। সেই রকমের দু'চারটি কথা আমি বল্‌ব।

আমরা সংবাদপত্রে বা বইএ ভবিষ্যতের যে সব আলোচনা বা জল্পনা-কল্পনার বিষয় পড়ি সে সব প্রায়ই সাহেবদের লেখা, এবং সে জন্যই তাঁদের কল্পনা বিলাতের নানা ব্যাপার নিয়ে। তখন নাকি কাচের বাড়ী হবে; রাতদিনই সে বাড়ীতে আলো থাক্‌বে—দিনে সূর্য্যের তেজ, রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোর তেজ। বিলাতে না হয় এটা সম্ভবপর; আমাদের এই গরম দেশে ঐ রকমের বাড়ী হ'লে কি ব্যাপার হবে একবার ভেবে দেখ তো! সারাদিন রোদের ঝাঁঝে একেবারে অস্থির হ'য়ে যেতে হবে! কাজেই, আমাদের দেশের ব্যবস্থা এ বিষয়ে অন্য রকম হ'তেই হবে। অবশ্যি বাড়ীতে কাচের ব্যবহার অনেক বেড়ে যাবে। এখনই কাচের টালি, অভঙ্গুর মজবুত কাচ প্রভৃতির চল হয়েছে; ভবিষ্যতে আরও অনেক হবে ব'লে আশা করা যায়।

ভবিষ্যতের সহরের একটি দৃশ্য। বিরাট্ ২০।৩০ তলা বাড়ী; কাচের দেয়াল। মাথার উপর রাস্তায় মোটর চলে; নীচে মানুষ চলে। কাচের চোঙ্গায় দ্রুতগামী লিফ্‌ট্ (Lift)। ৮।১০ তলার উপর বাগান।

তখনকার বাড়ীতে নাকি জানালা থাক্‌বে না। কিন্তু, আমাদের দেশে, বিনা-পয়সার সুন্দর ফুর্‌ফুরে বাতাস বন্ধ কর্‌বার কোনও কারণ হবে ব'লে তো মনে হয় না; বিলাতে না হয় ঠাণ্ডার ভয়ে জানালা তুলে দেওয়া যায়। তখন নাকি বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বত্র বাতাস খেলাবার, এবং খারাপ বাতাস টেনে বের ক'রে নেবার কৃত্রিম ব্যবস্থা থাক্‌বে। আমাদের দেশে দ্বিতীয়টি থাক্‌বে; প্রথমটি অনেক সময়ই আবশ্যক হবে না, কারণ প্রকৃতিই তা'র ব্যবস্থা করেছেন। বৈদ্যুতিক পাখার চল তখন অনেকটা ক'মে যাবে, ঘর ঠাণ্ডা রাখার কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রীষ্মকে অনেক সময়েই শীত বা বসন্তে পরিণত কর্‌বে।

অভঙ্গুর কাচ কত মজবুত দেখ! একটি কাচের চাদর থেকে প্রকাণ্ড পাটাতন ঝুলিয়ে তার উপর তিনটি হাতীর বাচ্চা আর তিন জন লোক দাঁড় করান হয়েছে!

অভঙ্গুর কাচের চাদরের দুই কোণায় দু'জন পূর্ণবয়স্ক লোক ব'সে—কাচ বাঁকে কিন্তু ভাঙ্গে না।

তখন নাকি "কৃত্রিম সূর্য্যালোক" প্রত্যেক বাড়ীতে থাক্‌বে। সেটি হ'লো এক রকমের বৈদ্যুতিক আলো, যা'র মধ্যে সূর্য্যের আলোর উপকারী রশ্মি পাওয়া যায়। ইচ্ছামত

ছাড়া চালান যাবে", "এরোপ্লেন আকাশপথে সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে; ঘণ্টায় ৩।৪ শ' মাইল চল্‌বে" ইত্যাদি।

এ সব তো গেল জল্পনা-কল্পনার কথা। এর কিছু হয়তো ঠিক হবে, কিছু হবে না। এ ছাড়াও আরো অনেক ব্যাপার আছে যে বিষয়ে এখনকার নানা ঘটনা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা ঠিক কথা বলা চলে। সেই রকমের হু'চারটি কথা আমি বল্‌ব।

আমরা সংবাদপত্রে বা বইএ ভবিষ্যতের যে সব আলোচনা বা জল্পনা-কল্পনার বিষয় পড়ি সে সব প্রায়ই সাহেবদের লেখা, এবং সে জন্যই তাঁদের কল্পনা বিলাতের নানা ব্যাপার নিয়ে। তখন নাকি কাচের বাড়ী হবে; রাতদিনই সে বাড়ীতে আলো থাক্‌বে—দিনে সূর্য্যের তেজ, রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোর তেজ। বিলাতে না হয় এটা সম্ভবপর; আমাদের এই গরম দেশে ঐ রকমের বাড়ী হ'লে কি ব্যাপার হবে একবার ভেবে দেখ তো! সারাদিন রোদের ঝাঁঝে একেবারে অস্থির হ'য়ে যেতে হবে! কাজেই, আমাদের দেশের ব্যবস্থা এ বিষয়ে অন্য রকম হ'তেই হবে। অবশ্যি বাড়ীতে কাচের ব্যবহার অনেক বেড়ে যাবে।

ভবিষ্যতের সহরের একটি দৃশ্য। বিরাট্ ২০।৩০ তলা বাড়ী; কাচের দেয়াল। মাথার উপর রাস্তায় মোটর চলে; নীচে মানুষ চলে। কাচের চোঙ্গায় দ্রুতগামী লিফ্‌ট্ (Lift)। ৮।১০ তলার উপর বাগান।

এখনই কাচের টালি, অভঙ্গুর মজবুত কাচ প্রভৃতির চল হয়েছে; ভবিষ্যতে আরও অনেক হবে ব'লে আশা করা যায়।

তখনকার বাড়ীতে নাকি জানালা থাক্‌বে না। কিন্তু, আমাদের দেশে, বিনা-পয়সার সুন্দর ফুর্‌ফুরে বাতাস বন্ধ কর্‌বার কোনও কারণ হবে ব'লে তো মনে হয় না; বিলাতে না হয় ঠাণ্ডার ভয়ে জানালা তুলে দেওয়া যায়। তখন নাকি বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বত্র বাতাস খেলাবার, এবং খারাপ বাতাস টেনে বের ক'রে নেবার কৃত্রিম ব্যবস্থা থাক্‌বে। আমাদের দেশে দ্বিতীয়টি থাক্‌বে; প্রথমটি অনেক সময়ই আবশ্যক হবে না, কারণ প্রকৃতিই তা'র ব্যবস্থা করেছেন। বৈদ্যুতিক পাখার চল তখন অনেকটা ক'মে যাবে, ঘর ঠাণ্ডা রাখার কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রীষ্মকে অনেক সময়েই শীত বা বসন্তে পরিণত কর্‌বে।

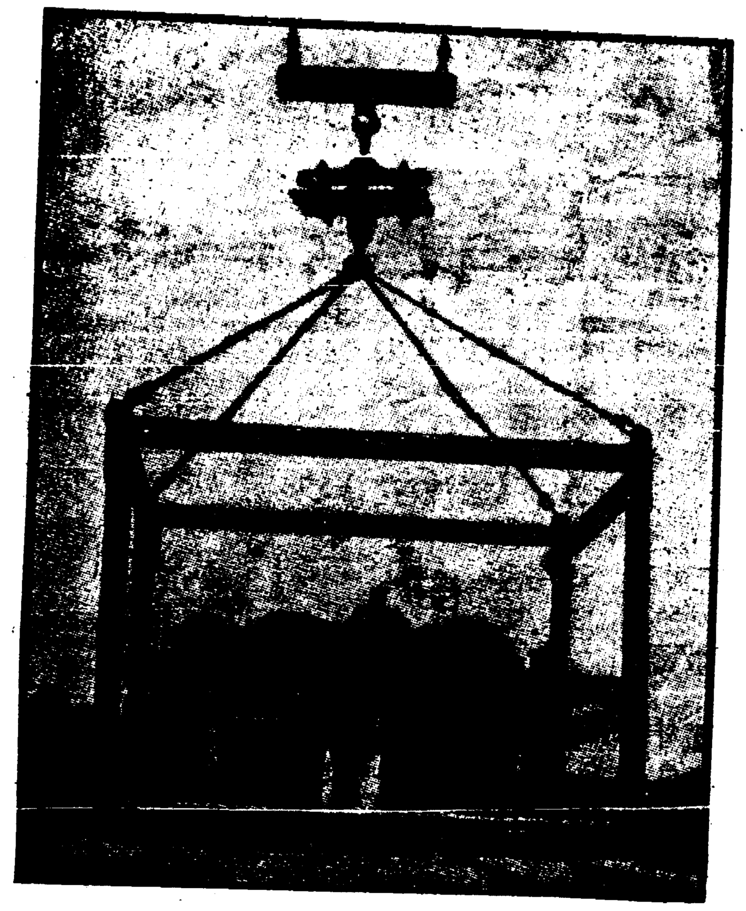

অভঙ্গুর কাচ কত মজবুত দেখ! একটি কাচের চাদর থেকে প্রকাণ্ড পাটাতন ঝুলিয়ে তার উপর তিনটি হাতীর বাচ্চা আর তিন জন লোক দাঁড় করান হয়েছে!

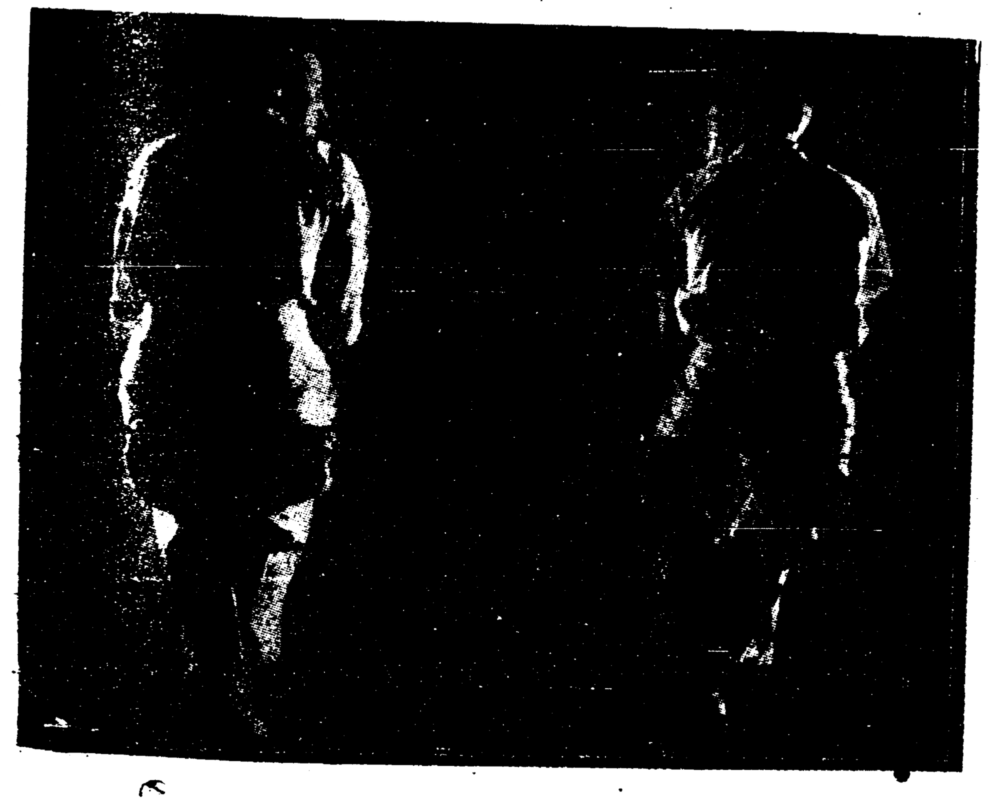

অভঙ্গুর কাচের চাদরের দুই কোণায় দু'জন পূর্ণবয়স্ক লোক ব'সে—কাচ বাঁকে কিন্তু ভাঙ্গে না।

তখন নাকি "কৃত্রিম সূর্য্যালোক" প্রত্যেক বাড়ীতে থাক্‌বে। সেটি হ'লো এক রকমের বৈদ্যুতিক আলো, যা'র মধ্যে সূর্য্যের আলোর উপকারী রশ্মি পাওয়া যায়। ইচ্ছামত

সেই আলো গায়ে লাগা'লে অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচা যাবে; স্বাস্থ্যলাভও হবে। আমাদের এই সূর্য্যালোকের দেশে আবার "কৃত্রিম সূর্য্যালোক" কেন?—এ সব কথা বিলাতের জন্যই খাটে। তবে, আমাদের দেশে হয়তো রোদ পোহাবার ভাল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হবে এবং কা'র কতখানি রোদ লাগান দরকার তা'রও একটা বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম হবে।

মেম-সাহেবের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে, তবু তিনি নির্ব্বিকার;—বরং হাসছেন। তাঁর কাপড়-চোপড়ে জল ঢোকে না—অর্থাৎ 'ওয়াটারপ্রুফ'। জুতা, মোজা সবই তাই।

মেঘ তাড়িয়ে বৃষ্টি বন্ধ করা হয়তো তখন কতক পরিমাণে সম্ভবপর হবে;—কতটা হবে ঠিক বলা যায় না। তবে, তখনকার জুতা, কাপড়-চোপড় এমন হবে যে, বৃষ্টি পড়্‌লেও ভিজ্‌বার ভয় থাক্‌বে না। সে রকমের কাপড়-চোপড় এখনই তৈয়ারী হ'তে আরম্ভ হয়েছে। তখনকার লোহায় জল লাগ্‌লে মর্‌চে ধর্‌বে না; রাস্তায় কাদার ভয় থাক্‌বে না; বন্যার ভয়ও থাক্‌বে কিনা সন্দেহ;—কাজেই, বৃষ্টিকে ভয় পাবার বিশেষ কারণ থাক্‌বে না। চাষীরা বৃষ্টির উপর তত বেশী নির্ভর কর্‌বে না। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির নকল করা হবে; অনাবৃষ্টিতে মেঘ তাড়িয়ে এনে বৃষ্টির ব্যবস্থা হ'তে পারে, কিংবা মাটির তলার জল নলকূপের সাহায্যে তোলা যেতে পারে।

চাষীরা তখন বিজ্ঞানের সাহায্যে চাষের অনেক উন্নত প্রণালীতে ফসল জন্মাতে পার্‌বে। বোতলের মধ্যে, মাটির সাহায্য না নিয়ে, শুধু জল এবং 'খাদ্য' দিয়ে বীজ থেকে চারা জন্মান হবে। কোনও অনিষ্টকারী পোকা বা দৈবদুর্ব্বিপাক ফসলকে নষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না। বিদ্যুতের সাহায্যে এবং কৃত্রিম আলো প্রভৃতির সাহায্যে চারাকে খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং বাড়ন্ত করা হবে—যা'তে, অতি অল্প সময়ে

প্রচুর ফসল জন্মান যায়। এ সব বিষয় নিয়ে এখন নানা রকমের পরীক্ষা চ'লেছে। ফলের উন্নতি এত বেশী হবে যে এখন হয়তো সে সব ধারণায়ই আসে না। এখনই এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা চলেছে। ফলের আকার বড় করা, বীচি ছোট করা, খোসা পাতলা করা, আঁশ দূর করা, স্বাদ ভাল করা, রং সুন্দর করা—এ সব বিষয়ে এখনই অনেক উন্নতি হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও ঢের হবে। তখন হয়তো ল্যাংড়া আম ফজ্‌লির মত বড় হবে, আঁঠি লিচুর বীচির মত হবে; লিচু হয়তো ল্যাংড়া আমের মত বড় হবে, বীচি কুলের বীচির মত ছোট হবে;—আরও কত কি হবে কে বল্‌তে পারে!

প্রকাণ্ড নাশপাতি

তখনকার দিনে ঘরে ব'সে রেডিওর সঙ্গে চলন্ত রঙ্গিন ছবিও দেখা যাবে—অর্থাৎ রঙ্গিন 'টকি' শোনা যাবে। ফুটবল খেলা, ঘোড়দৌড়, তামাসা, সবই ঘরে ব'সে 'টেলিভিষণ' যন্ত্রে দেখা যাবে—অর্থাৎ, পৃথিবীর যত ভাল ভাল খেলা, গান, তামাসা, সিনেমা, সব ইচ্ছামত ঘরে ব'সে দেখা যাবে, শোনা যাবে। তখন নাকি 'টেলিভিষণ' যন্ত্রের সাহায্যে চিঠিপত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদেশে পাঠান যাবে;—অবশ্যি, সব চিঠি নয়। যা'র মধ্যে

রেডিওর সাহায্যে ছবি তোলা হয়েছে—অর্থাৎ, দূর দেশ থেকে পাঠান ছবি সাম্‌নের ঐ যন্ত্রটির সাহায্যে তোলা হয়েছে; সাহেব সেটি হাতে নিয়ে দেখ্‌ছেন।

কিছু গোপনীয় নাই, বা, অন্যে জান্‌লে ক্ষতি নাই, সেই সব চিঠিই এ ভাবে পাঠান যাবে। নানা ঘটনার ফটো মুহূর্ত্তের মধ্যে 'রেডিও ফটো' 'টেলিভিষণ' যন্ত্রে বিদেশে পাঠিয়ে সংবাদপত্রের অনেক সুবিধা ক'রে দেওয়া হবে।

সেকালের সংবাদপত্রে হয়তো অনেক ছবি রঙ্গিন থাক্‌বে। কেউ কেউ বলেন, 'টেলিভিষণ' যন্ত্রে খবর দেবার ব্যবস্থা থাক্‌বে; রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিনা পয়সায় সে সব খবর শোনা এবং দেখা যাবে। তখনকার রাস্তায় গাড়ী চলাচল করবে না—তার জন্যে তো আলাধা রাস্তাই থাক্‌বে;—কাজেই, হাঁ ক'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সংবাদ পড়্‌লেও কোনও বিপদ্ থাক্‌বে না।

এত কল-কারখানা সে যুগে হবে, যে, তার জন্য অনেক শক্তির আবশ্যক হবে;—অর্থাৎ, সে সব কল চালাবার জন্য অনেক মোটর, এঞ্জিন প্রভৃতির আবশ্যক হবে। তা'র জন্য কয়লা খরচ আর করা হবে না—কয়লা তখন রাসায়নিকের কাজেই বেশীর ভাগ ব্যবহার করা হবে। সূর্য্যের শক্তি (তাপ), সাগরের

সূর্য্যের আলো আয়নার উপর ফেলে, সেই আলো একত্র ক'রে প্রচণ্ড তাপ জন্মাবার যন্ত্র

ঢেউয়ের শক্তি, নদীর জলের প্রবাহের শক্তি। বাতাসের শক্তি, আকাশের বিদ্যুতের শক্তি—এমন কি, চাঁদের শক্তি—এ সবের সদ্ব্যবহার ক'রে তখনকার পৃথিবী এক বিরাট্ কারখানার মত ব্যাপার হবে। কিন্তু, তখন ধোঁয়া

থাক্‌বে না, ঝুল-কালী থাক্‌বে না; ধূলো অনেক পরিমাণে কমে যাবে, কাদাও থাক্‌বে না।

আবর্জ্জনা ব'লে তখন বিশেষ কিছুই থাক্‌বে না; প্রায় সব জিনিষই কাজে লাগ্‌বে। রাস্তার আস্তাকুঁড়ের ময়লা অতি সামান্যই থাক্‌বে;—তা'রও অধিকাংশের সদ্ব্যবহার হবে। তখনকার লোহা মর্‌চে ধ'রে নষ্ট হবে না, কল-কারাখানা সহজে বিগ্‌ড়া'বে না, আগুন লেগে নষ্ট হবে না, ভেঙ্গে চুরমার হবে না—কাজেই "লোহা-লক্কড়" বিশেষ কিছু থাক্‌বে না।

রাসায়নিকের চেষ্টার ফলে তখন ফল পচ্‌বে না, তরকারী পোকায় খাবে না, প'চে নষ্ট হবে না;—কাজেই খাওয়া-দাওয়ার সুবিধাও হবে অনেক।

তুলা, কাঠ, খড়-কুটো তখন আমাদের রেশম, পশম, আস্‌বাব, চিনি, কাচের নকল, নানা সুগন্ধি, কাগজ,—আরও কত আবশ্যকীয় জিনিষ যোগাবে। কয়লার তো কথাই নাই;—আতর, এসেন্স, ওষুধ, রং, কত কি যে যোগাবে তা'র আর হিসাবই করা যায় না।

ভূমিকম্প, ঝড়, ঘূর্ণি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক তখনও থাক্‌বে ব'লে মনে হয়; তবে, তখনকার ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট আর অন্যান্য ব্যবস্থা এমন হবে যে, সেই সব দৈবদুর্ব্বিপাক মানুষের বেশী অনিষ্ট কর্‌তে হয়তো পার্‌বে না।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে আর শেষই হবে না জল্পনা-কল্পনার। এক-একটি দিক্ দেখ্‌লে দশ-বিশটা বিষয় লেখা যায়; কাজেই আর এখন এ বিষয়ে লিখ্‌ব না। নইলে শেষই হবে না।

তবে, বড় কৌতূহল হয় কয়েকটি কথা জান্‌বার জন্য। সে সব বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনও কিছু বল্‌ছেন না। কথাগুলি এই:

(১) পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠে যাবে কিনা।

(২) দাড়ী কামাবার হাঙ্গাম উঠে যাবে কিনা।

(৩) কালো লোক তখন সহজে ফর্সা হ'তে পার্‌বে কিনা।

(৪) চুরি, ডাকাতি, খুনোখুনি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা—এ সব উঠে গিয়ে পৃথিবীতে শান্তি আসবে কি না।

এ সবের সঠিক জবাব পেলে, তবে বুঝি ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনার কিছু জোর আছে।

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে একরাত্রি

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র)

ঘটনাটি ঘটে হাজারীবাগ জেলায়।

জায়গাটার বিশেষ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। কেননা সকলেই জানে, সারা জেলাটি ঘন-বনাচ্ছন্ন, পাহাড় ও পাথরময়; ওর নির্জ্জন বনে, পাহাড়ের ছোট ছোট গুহায় বাঘ-ভালুক-হায়েনা প্রভৃতির বাস এবং বনের মাঝে মাঝে হরিণ, ময়ূর ও টিয়া পাওয়া যায়; এককালে জেলাটির এদিকে-ওদিকে বনের মাঝে দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের আড্ডা ছিল। তাদের মধ্যে কালুয়া-ভেলুয়া, দুই ভাইয়ের বিক্রমের কথা আজও অনেকের মনে আছে। 'ভেলুয়ার' জঙ্গলের নির্জ্জন পথ দিয়ে চল্‌তে গেলে এখনও গা ছম্ ছম্ করে।

তখন আমি ঐ জেলায় ঠিকেদারী করি। কাজের পাকে কখনও ঘোড়ায়, কখনও সাইকেলে, কদাচিৎ বা পুস্‌পুসে ঘুরে বেড়াই। স্থান-অস্থান কিছু নেই, সময়-অসময়েরও ঠিক নেই, দু' টাকা রোজগারের চেষ্টায় খাকির হাফপ্যাণ্ট, সাদা জিনের কোট পরে, পায়ে মোজা ও বুটজুতো এঁটে, মাথায় টুপী চড়িয়ে আমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ছুটোছুটি করি। পথে-প্রবাসে দু'-একবার ভালুকের দেখা পেয়েছি, কালে-ভদ্রে দু'টি-একটি সবৎসা হরিণী বা হরিণ দম্পতির সাক্ষাৎলাভ হয়েছে, আর হায়েনার সঙ্গে তো হামেসাই দেখা হ'ত; কিন্তু বাঘ বা ডাকাতের কবলে কোথাও বা কোন দিন পড়ি নি। এর কারণ কি আমি জানি না। অথচ ঐ দু'টি হিংস্র জীবের অত্যাচারের কাহিনী প্রায়ই আমার কানে আসত। কখনও কখনও দেখ্‌তামও শিকারীর দল বা পুলিশবাহিনী স্ব স্ব শিকারের চেষ্টায় পার্ব্বত্যপথে যাত্রা করেছে।

সেবার হাজারীবাগ শহর থেকে কতকগুলি গাছ কেটে নিয়ে আমার একটা বড় রকম কাজ সুরু করতে হবে। তাতে মুনাফাটা হবে বেশ মোটা গোছের। সেই চিন্তায় ক'দিন ভাল করে ঘুম হয় নি, ঘোড়াটাকে নিয়ে এদিকে-ওদিকে ঘুরেছিও যথেষ্ট। তার ফলে বাহন ও সওয়ার উভয়েই বড় ক্লান্ত। স্থির করলাম, উভয়েই দিন চারেক বিশ্রাম করে আবার কাজে লাগ্‌ব। কিন্তু

তার আগে লোকজন সব জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়ে কাজ সুরু করা দরকার। না হলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারা যাবে না, ফলে মক্কেলের কাছে 'খেলাফতির' দায়ে পড়ে 'মুনাফার' অংশে মার খাব। সে হবে না।

একদিন ভোরে লোকজন তো সব চলে গেল। আমিও ঘরে বসে এক মনে হিসাব কষতে ও নক্‌সা পরীক্ষা করতে লেগে গেলাম। এর ফাঁকে ফাঁকে শহরের মধ্যে যে সব জায়গায় কাজ হচ্ছিল, সকালে-বিকেলে একবার করে দেখে আসি। এমনি ভাবে তিনটে দিন কেটে গেল। আমি বেশ তাজা হয়ে উঠ্‌লাম, কিন্তু ঘোড়াটা তখনও শ্রমের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারল না। তার ওপর খবর পেলাম, ওদিকে বাঘের উৎপাত; সেইজন্যে কাজের বড় গোলমাল। কুলীরা থাকতে চাইছে না। শুনে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

অগত্যা পঞ্চম দিন বেলা দু'টোর সময় বাইসিক্‌লে যাত্রা করলাম। সমতলভূমিতে বিশ মাইল পথ কিছুই না; কিন্তু বড় বড় চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে এই দূরত্বটা পার হতে অনেক সময় ও শ্রমের দরকার। তবে আমি অভ্যস্ত। তার ওপর সময়টা তখন শীতকাল।

চলেছি। সঙ্গে কেরিয়ারে খান দুই মোটা কম্বল বাঁধা; সামনে হ্যান্‌ডেলে 'টুল-ব্যাগে' বাইসিক্‌ল্ মেরামতের যন্ত্রপাতি। আমার পোষাক সময়োচিত। মনে মনে স্থির করে রেখেছি, যেখানে আমার কাজ হচ্ছিল, তার মাইল তিনেক আগে একটা পি. ডব্‌লিউ. ডি.র বাংলো আছে; সেখানে রাত কাটাব। সঙ্গে দু'-একজন কুলী থাকলেই চল্‌বে। তবে প্রায় বছর তিনেক ওদিকে যাই নি; ঘরখানার অবস্থা বর্ত্তমানে কি রকম জানি না।

দু' পাশে ঘন বন; নির্জ্জন রাঙা পথ। শীতের বাতাস হু হু করে বয়ে চলেছে। মাইল পোষ্ট দেখে বুঝলাম—দশ মাইল পথ পার হয়েছি। আর দশ মাইল। বেলা কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে তিনটে। যত দূর মনে হচ্ছে, সন্ধ্যার মুখে জঙ্গলে পৌঁছতে পারব। তার পর যদি সুবিধা হয়, বাংলোয় আস্‌ব। না হলে কুলীদেরই ছাপ্পড়ে রাতখানা কাটানো যাবে।

তখন একটা উৎরাই পার হচ্ছি। গাড়ী সোঁ সোঁ শব্দে নীচে নামছে, এমন সময়ে সামনের চাকার টিউবটা হঠাৎ ফেটে গেল। গাড়ীর ব্রেক কষতে কষতে একেবারে নীচে এসে থাম্‌লাম। এ রকম ঝঞ্ঝাটে এর আগেও পড়েছি; কিন্তু এ ব্যাপারে সেদিন মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে মনে হ'ল—"এ অঞ্চলে বাঘের ভয়।" আবার সাহস এল, সন্ধ্যা হতে এখনও দেরী আছে। সামনে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ নেই। কেবল এক যোড়া শিয়াল রাস্তার এধার থেকে ওধারে চলে গেল। যাবার সময় আমার দিকে যেন বড় কৌতূহল-ভরে তাকাতে তাকাতে গেল। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীখানা শুইয়ে ফেলে তার টায়ার খুল্‌তে লেগে গেলাম। মিনিটখানেকের মধ্যেই টায়ারটা খুলে টিউবটা বার করে দেখি—"সর্ব্বনাশ! এ'যে একেবারে

পুরোনো টিউব! গায়ে শত তালি; দু' জায়গায় লম্বালম্বি ফেটে গেছে। এ টিউব তো আমার নয়। দোকানে সারাতে দিয়েছিলাম, দোকানের কেউ বদলে দিয়ে থাকবে। না হ'লে—

কিন্তু দোকানদারের ওপর তখন রাগ করা বৃথা; আবার টিউবটা যে সারানো যাবে তারও উপায় নেই। সেটা তাড়াতাড়ি টায়ারের ভেতর পূরে মনের ক্রোধ মনে চেপে গাড়ীখানা ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে যত দূর সম্ভব দ্রুত-পায়ে সামনের চড়াইটার ওপর উঠ্‌তে লাগলাম। চলি, আর প্রতি পায়ে মনে হয়—আজ কপালে দারুণ দুর্ভোগ। এখন কোন রকমে বাংলোটাতে পৌঁছতে পারলে প্রাণ বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু মাইল পাঁচেক পথ পার হতেই সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এল। বাংলো সেখান থেকে তখনও মাইল দু'য়েক দূর। কাছে কিনারে কোন গ্রাম নেই, কোন আশ্রয়ও চোখে পড়ছে না, কোন পথিকের সঙ্গে দেখা হয় নি। কেবল পথের দু'পাশে গভীর জঙ্গল! তার তলায় লক্ষ ঝিঁঝিঁ এক সঙ্গে ডেকে উঠ্‌ল, অন্ধকারের স্রোতের টানে এধার ওধার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী ভেসে এল, শীতের একটানা হাওয়ায় দূর থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আস্‌ছে। আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল।

স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারলাম, আজ এই গহন বনে বাঘের মুখে নিশ্চিত মৃত্যু। তবুও যতক্ষণ বেঁচে থাকি নিরাপদ হবার চেষ্টা করা যাক্‌। আর বাংলোয় পৌঁছবার চেষ্টা করা উচিত নয়, এখনই কাছেই কোন বড় গাছে উঠে আশ্রয় নেওয়া দরকার। তার জন্যে বেশী দূর যেতে বা বেশী খুঁজতে হ'ল না। কাছেই একটা প্রকাণ্ড পলাশ গাছ ছিল। বাইসিক্‌ল্‌খানা তার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রেখে জুতো-মোজা পরেই গাছে উঠে ক্রমে বেশ একটা উঁচু ডালে গিয়ে বস্‌লাম। তখন নিজেকে বড় নিরাপদ মনে হতে লাগ্‌ল। এখন সারা রাত যাতে ভূতের মত জেগে থাকতে পারি সেই চেষ্টাই করতে হবে। চোখের পাতা একটু বন্ধ হ'লেই গাছ থেকে পতন ও মৃত্যু।

পকেটে চুরুট ছিল। একটি বার করে ধরাতেই শুন্‌লাম, বাঘ ডাক্‌ছে। তারপরই খুব দূর থেকে অস্পষ্ট মাদলের আওয়াজ ভেসে আস্‌তে লাগল। সম্ভবতঃ পাহাড়ের ধারে কোন কোল-পল্লী থেকে শব্দটা আসছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, তা নাও হতে পারে, কেননা এক সঙ্গে অনেকগুলো মাদল বাজছে। সম্ভবতঃ ওরা মাদল বাজিয়ে গাঁয়ের কাছ থেকে বাঘ তাড়াচ্ছে। আমি জ্বলন্ত চুরুটটা দু' আঙুলে চেপে চুপ কোরে কান পেতে বসে রইলাম; চুরুটে টান দেবার কথা মনে পড়ল না।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। মাদলের আওয়াজ আর শোনা যায় না, বাঘের ডাকও থেমে গেছে, যা কিছু শুন্‌ছি ঝিঁঝিঁর ডাক ও বনের ডালে ডালে শীতের বাতাসের সর্‌ সর্‌ শব্দ। তারই মাঝে মাঝে শাখা থেকে দু'টি-একটি শুকনো পাতা টুপ্‌টাপ্‌ শব্দে বনের

তলায় খসে পড়ছে। আমার মনে ধীরে সাহস এল; চুরুটে কয়েকটা টান দিলাম। সেই সময়ে ঘড়িতে দেখ্‌লাম—সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। এখনও সমুখে শীতের সুদীর্ঘ রাত পড়ে আছে।

তার পর মিনিট কতক কেটেছে। হঠাৎ শুন্‌লাম, গাছের নীচে হুড়মুড় শব্দ। আমার বাইসিক্‌ল্‌খানা পড়ে গেল, সেই শব্দে আমারও সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। বাতাসে যে গাড়ী খানা পড়ে নি, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; ওটা কি? বাঘ? বাঘ আমার সন্ধানে গাছে উঠ্‌ছে? কথাটা ভাব্‌তেই জিভ্‌ ও গলা শুকিয়ে এলো, তারপরই মনে হ'ল, অত বড় একটা প্রাণী গাছে উঠ্‌লে নিশ্চয়ই গাছটা একটু নড়ত। গাছটা তো আগের মতই আছে। তাহলে ওটা কি?

দাঁত দিয়ে চুরুটটা, হাত দিয়ে সামনের ডালটা খুব শক্ত করে চেপে ধরে আছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই আশঙ্কা করছি, বাঘটা এখনই গাছে উঠে আসবে, কিন্তু তার বদলে শোনা গেল—চড়্‌ চড়্‌ শব্দ। গাছের গোড়ায় যে জন্তুই থাক্‌, সে যে কিছু একটা টেনে টেনে ছিঁড়ছে, এতে ভুল নেই। আর, সে জিনিষটা যে আমারই খাবার-ভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ তাও ঠিক! কিন্তু কি জন্তু ওটা? বাঘের মন অত ছোট নয়, আর তার ক্ষুধাও প্রচণ্ড। তবে কি ওটা চিতা বাঘ? হতে পারে। ঐ যে একবার হাঁচলে। ঐ যে একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জনও শোনা গেল; চিতাবাঘ হলে আরও বিপদ, এখ্‌নুই হয়ত ব্যাগের খাবার ছেড়ে তার মালিকের রক্তের লোভে গাছের ওপরে উঠে আসবে। এ অবস্থায় উপায় কি? কি কুক্ষণে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম! কিন্তু তখন নিজের উপর ধিক্কার দিয়েই বা লাভ কি! চুরুটের আগুন তখনও নেভে নি। ভাবলাম চুরুটটা বার কয়েক জোরে জোরে টেনে আগুনটা আরও উস্কে দিয়ে সেটাকে নীচে ফেলে দিই। গাছের তলা শুক্‌নো পাতায় ভরা। এই টানা হাওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ধরে যেতে পারে। তারপরই আবার মনে হল, এ আগুন যদি চার ধারে ছড়িয়ে যায় তাহলে নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে মরব। তবে তা যে ঘটবেই তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কেবল আগুনের গণ্ডী বেড়ে গিয়ে তার মাঝে অগ্নিশূন্য ছাইও পড়ে থাকতে পারে।

সঙ্কল্পটা স্থির করতে আমার বোধ হয় মিনিট দুই সময় লেগেছে, আমি চুরুটে গোটা কয়েক টান দিয়েছি, এমন সময় আমার গাছের কাছ থেকেই সারা বন কাঁপিয়ে হুঙ্কার উঠ্‌ল। চুরুটটাও সেই সঙ্গে হাত থেকে আপনিই গাছের নীচে গিয়ে পড়ল। ঐ তার কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ বাতাসে জোনাকীর মত ভেসে যাচ্ছে, আর ঐ যে ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করে জ্বল্‌ছে একযোড়া চোখ! আমার হাত-পা-শরীর অসাড়, চিন্তাশক্তি কমে এল, কিন্তু তার মধ্যেই মনে হল, এর আগে যে জন্তুটা গাছের গোড়ায় ছিল, সে বাঘ নয়, এবার সত্যই বাঘ এসেছে।

ঐ যে চোখ যোড়া গাছের গোড়ার দিকে একটু একটু করে সর্‌ছে; বোধ হয় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আস্‌ছে। শেষে লাফ দিয়ে গাছে উঠ্‌বে কি? আমি এবার দু'হাত দিয়ে গাছের ডালটা জড়িয়ে ধরে আছি। একটু আল্‌গা দিলে আর রক্ষা নেই। তারপর কতক্ষণ কাট্‌ল ঠিক করে বল্‌তে পারব না। হঠাৎ নাকে পাতা পোড়ার গন্ধ এল। গাছের গোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখি, হাত খানেক জায়গায় একটু একটু আগুন জ্বল্‌ছে, সেই চোখ যোড়া আর নেই। ওদিকে নেই সত্য, কিন্তু অন্য দিকে ত থাকতে পারে! সেই গাঢ় অন্ধকারে এদিকে-ওদিকে, চার ধারে তাকাতে লাগলাম। জোনাকী উড়ছে, পাতার আগুনের ফুল্‌কি উড়ে যাচ্ছে, সেই চোখ যোড়াকে আর দেখা যায় না। নিশ্চয়ই আগুন দেখে সরে পড়েছে।

আমি নিজের বুদ্ধি দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে মনে মনে অওড়ালাম 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্'? শরীর হাল্কা হ'ল, মনে আনন্দ এল, কিন্তু নাকে পাতা পোড়ার গন্ধ, ও চোখে ধোঁয়া লাগল। ভাবলাম, এবার নিশ্চিন্তমনে একটা চুরুট ধরান যেতে পারে। ধরালামও, বার কয়েক টানও দিলাম, কিন্তু নীচে আগুনের অবস্থা দেখে একটু অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

আগুন সাপের মত এঁকে-বেঁকে চারধারে ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাসে এক-একবার লক্‌লকে জিভ বার করে লাফিয়ে ওঠে, আবার পাতার মধ্যে মাথা লুকিয়ে লতিয়ে চলে। মাঝে মাঝে শুক্‌নো সরু ডাল পোড়ার চট্‌-পট্‌ শব্দ কানে আসে। ধোঁয়ার গন্ধে বনের বাতাস ক্রমে ভারী হয়ে উঠ্‌ছে। আমার চোখ দু'টো মাঝে মাঝে জ্বালা করে, নিঃশ্বাস নিয়েও আরাম পাই না, শেষে কি এই বিষাক্ত বাতাসে মৃত্যু হবে? বাঘের ভয়ের চেয়ে অগ্নি-ভয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। বাঘ আমায় ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু আগুন কিছুতেই ছাড়বে না।

ওদিকে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়েছে। একটা শুকনো লতা ভর করে একটা ছোট গাছের উপর উঠে বাতাসে নাচতে লাগল। ছোট ছোট ফুলকিতে পাতায় পাতায় মাণিক জ্বলে উঠ্‌ল। এখনই হয়ত আমার এই বিশাল পলাশ গাছটির ডালে ডালে আগুন লাগবে। আগুনের আভায় বন আলোকিত, সেই সঙ্গে তাপও উঠ্‌ছে অসহনীয়। নাম্‌লে আগুনের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমার গাছটার কাছ থেকে পথও অল্প দূর; কিন্তু তার ওপর গিয়ে দাঁড়ালেও রক্ষা নেই; যে কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পড়বার সমূহ সম্ভাবনা, এখন মনে—"all's well that ends well."

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আগুনটা আরও দূরে ছড়িয়ে গেছে, ধোঁয়ার গন্ধে বাতাস আরও ভারী,. তাপ আরও প্রখর। আমার কপালে, হাতে এক-একটা তপ্ত ঝাপটা এসে লাগ্‌ছে; এখানে আর থাকা যায় না। তিল তিল করে আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বাঘের মুখে মরা অনেক ভাল।

কিন্তু নামবই বা কোথায়, আর কি করে! ওদিকে বাইসিক্‌ল্‌খানা পুড়ে তেতে হয়ত এমন হয়ে আছে যে আর চেনবার যো নেই। একবার চারধারে তাকিয়ে দেখলাম—আগুন বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়েছে, বনের গাছ-পালা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঐ আকাশ পানে ধোঁয়া উঠ্‌ছে, লক্ষ লক্ষ আগুনের ফুল্‌কি উড়ে চলেছে, পট্‌ পট্‌ শব্দে ডাল-পালা পুড়ছে, এবার আমিও হয়ত পুড়ব। আর না, কিছুতেই না। এই অগ্নিকুণ্ডের মাঝ থেকে বাঁচতেই হবে। কিন্তু কোন্‌ দিকে পথ?

ঐ যে বাঁ ধারে এখনও ভাল করে আগুন লাগে নি; জায়গাটা বেশ ফাঁকা। বাতাসের ঝাপটায় আগুনটা ওদিক্‌ থেকে এদিকে ফিরে আস্‌ছে, ঐ ওর পরে রাস্তা দেখা যায়। কোন রকমে যদি ওখানে গিয়ে পড়তে পারি! গাছের গোড়া থেকে জায়গাটার দূরত্ব হাত কুড়িক হবে। এই কুড়ি হাত যেতে—!

আমি আর ভাবতে পারলাম না, চিন্তাশক্তি লোপ পেল। তারপর কি করে যে গাছ থেকে নেমে সেই জায়গাটার ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম নিজেই জানি না। যখন চেতনা হল, বুঝ্‌তে পারলাম পায়ে মোজা নেই, পা দুখানা জ্বালা করছে। কিন্তু সেখানেও আর দাঁড়ানো নিরাপদ্‌ নয়। ছুটে জায়গাটা থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে গিয়ে আগুনের দিকে পিঠ করে দাঁড়ালাম। চারধারে বহুদূর অবধি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার ওপর দৃষ্টি আমার খুব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। রাস্তার ওপারেও বন। তাতে এখনও আগুন ধরে নি, কিন্তু এপার থেকে রাশি রাশি ফুল্‌কি উড়ে গিয়ে তার গাছের মাথায়, তলায়, পাতায় পড়ছে, আবার বাতাসে এদিকে ওদিকে ভেসে যাচ্ছে। ওদিকেও যে-কোন মুহূর্ত্তে আগুন লাগা বিচিত্র নয়। কিন্তু লাগলেও আর উপায় নেই; আমি অসাড়ের মত রাস্তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সারা রাতের মধ্যে আগুন আর নিভল না।

তার পর ভোর হ'ল, পাখী ডেকে উঠল, ক্রমে আগুনের আভাকে ম্লান করে দিয়ে আলো ফুট্‌ল। আমি ক্লান্ত শরীরে আহত পা দুখানাকে টেনে নিয়ে অতি ধীরে বাংলোর দিকে এগিয়ে চলেছি। শরীর আর পারে না; প্রতি পায়ে টলে পড়ি। কিন্তু তখন পথের ধারে বসা মানে মৃত্যু। এমন সময়ে শুনলাম, পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হচ্ছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছিলাম; শব্দটা ক্রমে কাছে আস্‌ছে। পথ ছেড়ে দেবার বা পিছন ফিরে দেখবার এতটুকু শক্তি আর নেই।

ঘোড়াটা একেবারে পাশে আসতেই কে যেন মোটা গলায় ইংরেজীতে ধমক দিলে, তার পর হাত কয়েক এগিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখেই পরম বিস্ময়ে বলে উঠ্‌ল—"এ যে মিত্র! কি ব্যাপার?"

চিন্‌লাম ব্রাউন সাহেব ; মস্ত শিকারী।

সাহেব ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—"তুমি এই বেশে এখানে? মনে হচ্ছে সারা রাত এন্‌জিন্ ঘরে কাটিয়েছ—"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। কেবল সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সাহেব তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে আমার একখানা হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লে— "কি হয়েছে তোমার?"

ধীরে ধীরে বল্‌লাম—"মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে চলেছি—"

—"কি রকম?"

আমি আর কিছু বল্‌তে পারলাম না, তেমনি টল্‌তে টল্‌তে চল্‌তে লাগলাম। সাহেবও আর কিছু না বলে, আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে চলতে লাগ্‌ল।

তার পর যখন বাংলোয় এসে পৌঁছলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে। সাহেব আমাকে তৎক্ষণাৎ খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে যথারীতি চিকিৎসা করলে। তার লোকজন আগের দিনই সেখানে পৌঁছেছিল।

দুপুরের দিকে আমার শরীর কিছু সুস্থ হ'লে রাতের ঘটনাটি সাহেবকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলাম। সাহেব মনোযোগ দিয়ে শুনে বল্‌লে—"বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছ ; সেই সঙ্গে আমার বাঘটাকেও এ অঞ্চল থেকে তাড়িয়েছ। আমি ওরই সন্ধানে এসেছিলাম। যাক্—তুমি শীঘ্রই সুস্থ হবে। তোমার লোকজনকে খবর পাঠাচ্ছি।"

তার ঘণ্টা দুই পরেই আমার লোকজন এসে পড়ল।

পর দিন আমি বাংলোতে যে পুসপুস্‌খানা ছিল তাতে চড়ে বাড়ী রওনা হলাম, সাহেবও দলবল নিয়ে শিকারে যাত্রা করলে।

এই ঘটনার ঠিক দু' বৎসর পরে আবার এক রাত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। কিন্তু সে ডাকাতের হাতে, আর গল্পটাও অন্য রকম।

সহজ টোট্‌কা

(শ্রীমতী শান্তি দত্ত)

অত্যধিক গরমে অনেক সময়ে শিশুদের গায়ে ফোস্কা পড়ে, শ্বেত অথবা রক্তচন্দন ঘষিয়া ঐ ফোস্কায় প্রলেপ দিলে উহা সহজে সারিয়া যায়। আগুনে পোড়া ঘা'য়েও রক্তচন্দন একটি ভাল ঔষধ। পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা খুব কম বোধ হয়।

আংটি-বিভ্রাট!

(শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু)

হাতীর দাঁতের আংটি কিনিল খরিদ্-দার,—
"জিনিস খাঁটি তো বটে?" পুছিয়া বারংবার।
দোকানী সে কয়,—
"শোন মহাশয়,
নিখুঁৎ-নি-খাদ দাঁত—নাই সন্দেহ তার!"

দু'দিন কাটিয়া গেছে, সেদিনও হয়েছে রাত,
ক্রেতাটি আসিয়া কয়—"এ নয় হাতীর দাঁত!
এ বাপু নকল
বলি অবিকল!
রাম-গাঁট্টায় আজি তোমারে করিব কাত্।"

দোকানী কহিল, "বাবু, সব কথা শোন মোর,
শুন্‌লেই বুঝবে যে দোষ নেই কোন মোর!
হাতীটাই পাজী
তারি কারসাজি!
তার দোষে অকারণ কেন তুলো ধোন মোর?

"এই যে হাতীটি ছিল, মাজ্‌তো না দাঁত তার!
নিতান্ত 'গাধা' সেটা—বল্‌ব কি বাৎ তার?
পায়োরিয়া ধ'রে
গেল শেষে প'ড়ে
দন্তযুগল, আহা, সেদিন হঠাৎ তার!

"ফোক্‌লা দিগম্বর ! লজ্জায় আঁখি নত,—
পেয়ে এক ডেন্টিস্‌ট্‌, তাহারি শরণাগত—
সেই ডাক্তার
তুলে দাঁত তার
নতুন বাঁধিয়ে দিল—'হাতিয়ে' কয়েক শত !

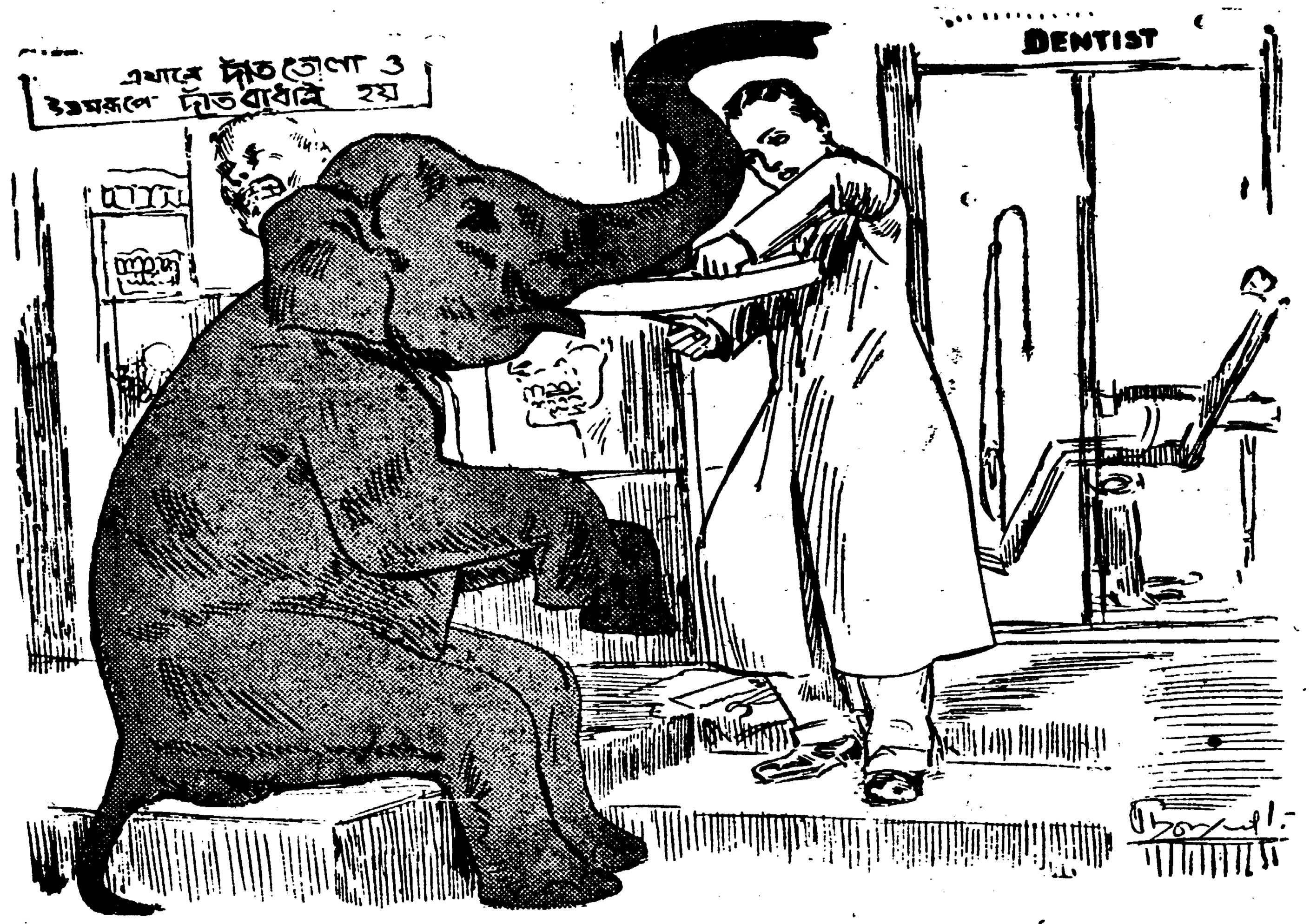

"সে-হাতীর দাঁত এটি—জ্যান্ত হাতী তো বটে !
জাল-জোচ্চুরি, দাদা, আমি তো করি নি মোটে !
হাতীর মুখেই
ছিল দাঁত এই !
কেন তবে হাতাহাতি ? গাঁট্টাতে চাও চ'টে ?"

দিন হ'য়ে যায় রাত

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়)

সেদিন আমি বেপরোয়া হয়ে বল্লাম, "পিসীমা, আজ আমি যাবই—"

পিসীমা বেশ চিন্তিত হয়েই বল্‌লেন, "সে কিরে, এই বৃষ্টি মাথায় করে ? এখান থেকে ষ্টেশনও তো বড় কম দূর নয়—প্রায় এক ক্রোশ পথ ! এমন পোড়া দেশ যে একখানা গাড়ীও নেই !"

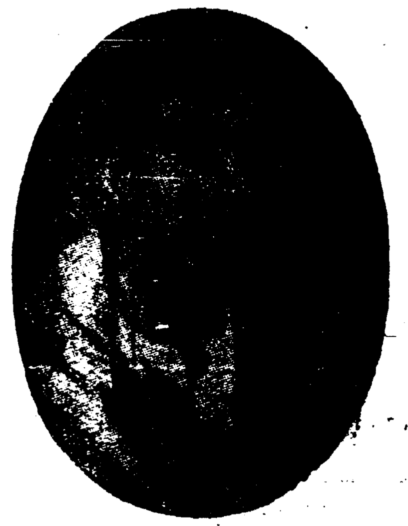
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম, "আজ যত জলই হোক, আমি যাবই। হেঁটে কেন, যদি সাঁতার দিয়ে যেতে হয় তাও যাব।"

পিসীমা তখন নিরুপায় হয়ে বল্‌লেন, "যা ভাল বুঝিস্‌ তাই কর্‌।"

আমি যখন খুব ছোট তখনই আমার বাবা মারা গেছেন ; কোন কাকা-জ্যাঠা আমার ছিলেন না, ছিলেন শুধু একমাত্র পিসীমা ; তিনি নাকি বাবার চেয়ে অনেক বড়। এই পিসীমাকে আমি ভাল করে জ্ঞান হয়ে আর দেখি নি, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর চিঠি দেখ্‌তে পেতাম—মার কাছে আস্‌ত। মা আমাকে প্রায়ই বল্‌তেন, "যা না একবার তোর পিসীমার কাছে, কত দুঃখু করেন ! তোকে সেই ছোট্ট বেলায় দেখেছেন !" আমারও যে এক-একবার যাওয়ার ইচ্ছা হ'ত না মাঝে মাঝে তা নয়, কিন্তু নানা কারণে হয়ে উঠ্‌ত না। সেবার বি, এস. সি পরীক্ষার পর গেলাম পিসীমার দেশে। ট্রেন থেকে নেমে আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। এ কোথায় এলাম রে বাবা, এ যে সুন্দরবনেরও বাবা ! যাই হোক, কুলির মাথায় মোট দিয়ে চল্‌লাম তো পিসীমার বাড়ীর উদ্দেশ্যে। কুলিটা বল্‌লে বাড়ী চেনে। পাকা আধ ঘণ্টা বনের মধ্যে দিয়ে চল্‌লাম, তার পর প্রকাণ্ড মাঠ, সেও প্রায় কুড়ি মিনিট কেঁটে গেল পার হতে।

কুলিটাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "হ্যাঁরে ঠিক সোজা রাস্তায় যাচ্ছিস তো ?"

সে বল্‌লে যে এই-টে দিয়েই নাকি খুব তাড়াতাড়ি হয়, নৈলে বড় রাস্তা দিয়ে যেতে হ'লে তিন ক্রোশ পথ হাঁট্‌তে হ'ত। শেষ পর্য্যন্ত পিসীমার বাড়ী পৌঁছুলাম। পিসীমা ভাইপোতে দেখা হ'ল, অথচ কেউ কাকেও চেনে না।

পিসীমা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি কে বাছা, কোথা থেকে আস্‌ছ ?"

আমি বল্‌লাম, "আমি আদিত্য, কলকাতা থেকে আস্‌ছি।"

পিসীমা হঠাৎ আনন্দে অধীর হয়ে উঠে বল্‌লেন, "ওঃ, তুই ছোট্টর ছেলে—সেই খোকন—" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠ্‌লেন।

আমি এবার একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আপনি তো'—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি বল্‌লেন, "ওরে আমি যে কে সে তুই কি করে জান্‌বি ! তোর বাবা বেঁচে থাক্‌লে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তিস্ যদি—" বলেই আবার কান্না। কি মুস্কিলে পড়লাম—বাবা বেঁচে থাক্‌লে না হয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌তাম কিন্তু বাবা যখন নেই তখন কি করি ? যাই হোক, কান্না দেখে আন্দাজ কর্‌লাম, পিসীমা ইনিই।

ভেবেছিলাম পিসীমার বাড়ী একদিন কি দু'দিন থাক্‌ব—কিন্তু জীবনের সেরা দুঃখ রয়েছে অদৃষ্টে; যেদিন পৌঁছুলাম সেইদিন বৈকাল থেকে যে বৃষ্টি আরম্ভ হোল সাত দিনের মধ্যে সে বৃষ্টির আর বিরাম নেই।

একে তো যে জায়গা—খান পাঁচ ছয় ইটের বাড়ী, আর খান দশ বারো খড়ের বাড়ী; বাইরে বেড়াতে বার হ'লে হয় পুকুর-ডোবার ধারে ধারে, নয় তো বনের মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ান ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এই বৃষ্টির জন্য তারও উপায় নেই—পাক্কা সাত দিন ধরে ঘরে বন্ধ। পিসীমার বাড়ীতে প্রাণী তিনটী, পিসীমা, পিসতুত দাদার স্ত্রী, মানে আমার বৌদি, আর তাঁর সবে-ধন নীলমণি—গোপাল। দাদা নাকি দু বছর হোল মারা গেছেন। সাত দিন ধরে এই তিন জনের সঙ্গে কাটাতে হয়েছে। বৌদির কথা ছেড়ে দাও—সারাদিন কাজকর্ম্ম নিয়েই থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ই না। পিসীমা সাতটী দিন ধরে সত্তরটী বার কেবল শোনাচ্ছেন—আমার বাবা তাঁর কত আদরের ছিলেন, ঠাকু'মা মারা যাওয়ার পর

কত কষ্ট করে তাঁকে তিনি মানুষ করেছেন—এই সব, আর সঙ্গে সঙ্গে সমানে চোখের জল পড়ে চলেছে। উঃ, পাগল হয়ে উঠ্‌লাম! বাইরে মেঘের জল, ভেতরে পিসীমার চোখের জল—কি দুর্দ্দশা! তার উপর উঃ, সেই গোপাল বাবাজী! আমার জীবনে অনেক শয়তাম ছেলে দেখেছি কিন্তু অত বড় শয়তান ছেলে দেখিনি কখনও। শুনেছি, আগে নাকি 'বোম্বেটে'র দল ছিল, এখন তারা আর নেই। অনেক দিন থেকে আমার মনে হ'ত এই বোম্বেটেগুলো মরে কি হোল ? এখন বুঝি যে সব 'বোম্বেটে' মরে এক সঙ্গে ঐ একটী গোপাল হয়ে জন্মেছে—পিসীমার ঘরে। পিসীমার বড় আদরের নাতি—একমাত্র ছেলের একমাত্র ছেলে—কারোর কিছু বল্‌বার জো নেই।

আমি দেখলাম যে একে এই বৃষ্টি, তার পর পিসীমার সমানে বকুনি, এর পর ঐ গোপলার শয়তানী—আর একদিন থাক্‌লে আমি হয় পাগল হয়ে যাব, না হয় আত্মহত্যা কর্‌ব। তাই সেদিন 'মরীয়া' হয়ে বার হ'য়ে পড়লাম ভীষণ বৃষ্টির মধ্যেই। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! মাত্র মিনিট পাঁচ-সাত রাস্তা হেঁটেছি, আস্তে আস্তে বৃষ্টি গেল থেমে, মেঘ গেল কেটে, এমন কি খানিকটা পরে মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু রৌদ্রও উঁকি মার্‌তে লাগ্‌ল। অবাক্ হ'লেও খুসীও হ'লাম খুব; একটা আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চল্‌লাম ষ্টেশনের দিকে। একটু যেতেই দেখি এক ভদ্রলোক চলেছেন মাঠের উপর দিয়ে ষ্টেশনের দিকে—গায়ে তাঁর একটী রেণ্-কোট।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে এতখানি পথ গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাওয়া যাবে ভেবে আলাপ সুরু করে দিলাম. বল্‌লাম, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "কলকাতায়।"

আমি বল্‌লাম, "আমিও যাব কলকাতায়—বেশ হ'ল, একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।" তারপর একটু থেমে বল্‌লাম, "উঃ, কি বৃষ্টি আজ সাত দিন ধরে, পাগল করে তুলেছিল! যাক বাঁচা গেল, বেশ পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছে।"

ভদ্রলোকটী এবার একটু হেসে বল্‌লেন, "সে জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিন।"

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"মানে ?"

ভদ্রলোকটী বেশ গম্ভীর ভাবেই বল্‌লেন, "আমার জন্যই এ বৃষ্টি থেমেছে, আমার ইচ্ছাতেই সব ঘটে—আমি এ সংসারে সব চালিয়ে থাকি।"

কি সর্ব্বনাশ, লোকটা যে প্রকাণ্ড পাগল! হবে না? এই রকম বৃষ্টি হ'লে কে না পাগল হয়—আমিও তো প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে যাই হোক্, এই পাগলের সঙ্গে একসঙ্গে কলকাতা পর্য্যন্ত যেতে হ'বে ভেবে বেশ চিন্তিতই হ'য়ে পড়লাম।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকটী বল্‌লেন, "ভাবছেন হয়ত আমি পাগল, না? মোটেই পাগল নয়—আমার জীবনে এতদিন, যা ঘটে আস্‌ছে তাই

"আমি এ সংসারে সব চালিয়ে থাকি।"

বলছি। আমার যখনই একটা কিছুর বিশেষ দরকার হয়, বা যখনই আমি কোন কিছু বিশেষ করে চাই, তখনই দেখি তার উল্টো ঘটে। আমার কপালে দিন হয়ে যায় রাত! এই দেখুন না, সাতদিন আগে যখন আমি বর্দ্ধমান যাই তখন এখানে কাঠফাটা রোদ্দুর, রোদের তেজে খাল বিল সব শুকিয়ে যাচ্ছিল—কাজেই সে সময় কেউ ওয়াটার-প্রুফ নিয়ে বার হয় না—আমিও হই নি। কিন্তু মশায়,

বর্দ্ধমানে নামার পর থেকে ক'দিন ধরে কী বৃষ্টি—সমানে ভিজলাম ক'দিন। কাল বাড়ী এসেছি ভিজে ভিজে, আজ কলকাতায় যাচ্ছি একটা চাকুরীর জন্য, সাহেব দেখা কর্‌বার জন্য চিঠি দিয়েছে। আজ ভাবলাম যে, আজ যা বৃষ্টি—ওয়াটার-প্রুফটী বা'র করে বেশ করে গায়ে দিয়ে বার হ'য়ে পড়ি। কিন্তু গায়ে দিয়ে যেই পথে বার হ'য়ে একটুখানি এসেছি, অমনি অত বৃষ্টি গেল থেমে, মেঘ গেল কেটে, এমন কি রোদ পর্য্যন্ত উঠে গেল! এখন যতক্ষণ আমি এই রেণ-কোট্‌টী ঘাড়ে করে ঘুরব ততক্ষণ বৃষ্টি হ'বে না। আজ তিন বছর এই ওয়াটার-প্রুফটা কিনেছি, একদিন কাজে লাগল না! যত মেঘই করে থাকুক, কিংবা যত জলই হোক, এই ওয়াটার-প্রুফটী নিয়ে বার হলে সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে আমরা ষ্টেশনে এলাম এবং একটু পরেই ট্রেন এল; আমরা ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু হ'ল। ট্রেন চল্‌তে সুরু করেছে—ভদ্রলোকটী বল্‌লেন, "দেখেছেন তো, যেই ট্রেনে উঠলাম অমনি বৃষ্টি সুরু হ'ল, আবার ওয়াটার-প্রুফটী কাঁধে করে যদি এক্ষুণি নামি তো বৃষ্টি এক্ষুণি থেমে যাবে। তা হ'লেই বলুন, আমার ইচ্ছাতেই চল্‌ছে না সংসার?"

আমি সত্যিই একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম বৃষ্টির ব্যাপার দেখে। ভদ্রলোকটী জানালা দিয়ে বাইরে খানিকটা তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "এ তো সামান্য! বর্দ্ধমান গিয়েছিলাম বল্‌ছিলাম না? আমার কাকা সেখানে থাকেন; তাঁর ছেলেমেয়ে নেই, আমিই ছিলাম তাঁর নয়নের মণি। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা তাঁর ব্যাঙ্কে—সমস্তই আমার হবার কথা। কিছুদিন আগে হঠাৎ খবর পেলাম কাকার ভীষণ অসুখ—নিউমোনিয়া। যাব ভাবছি এমন সময় পরদিনই প্রকাণ্ড লম্বা এক টেলিগ্রাম পেলাম, "তোমার কাকার মৃত্যু সন্নিকট; ডাক্তারেরা সব আশা ছেড়ে দিয়েছে—আর দু' এক ঘণ্টা মাত্র; এক্ষণি যাত্রা কর। তাঁর সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হ'বে না, তবে তাঁর দেহটা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেতে পার।"

"পরের ট্রেনেই যাত্রা কর্‌লাম। ট্রেনে উঠবার আগেই হঠাৎ কি মনে হ'ল—সামনের কাপড়ের দোকানটা থেকে একজোড়া কাচা—কাচা জানেন নিশ্চয়, বাপ-

মা ম'লে যা লোকে পরে—সেই কাচা এক জোড়া কিনলাম; ভাবলাম কাকা আমার পিতৃতুল্য, আমিই তাঁর শ্রাদ্ধের অধিকারী, কাকার মৃত্যুর পর আমার 'কাচা' পড়া উচিত। কিন্তু অত রাত্রে পৌঁছাব, হয়ত সোজা শ্মশানেই চলে যেতে হ'বে, আমি যাওয়ার আগেই হয়ত তাঁর মৃতদেহ নিয়ে সব শ্মশানে চলে যাবে—তখন অত তাড়াতাড়ি 'কাচা' পাওয়াও মুস্কিল হবে। কাচা জোড়া বগলে করে ঘণ্টা পাঁচেক পরে বর্দ্ধমান গিয়ে পৌঁছুলাম। বাড়ী ঢুকবার আগে বুকটার মধ্যে কি রকম করতে লাগ্‌ল—ভাবলাম কি দেখব কি জানি! হয়ত দেখব কাকার মৃতদেহ ঘিরে সব বসে কাঁদ্‌ছে, কিংবা হয়ত কাকার মৃতদেহ নিয়ে সব শ্মশানে চলে গেছে,—সমস্ত বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌ছে। ...কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যা দেখলাম তাতে আমার মাথাটা একেবারে ঘুলিয়ে গেল। তবে কি এরা ঠাট্টা করে টেলিগ্রাম করেছিল! কাকা দেখি বেশ সুস্থ—শুয়ে শুয়ে কিসের একটা সুপ্‌ খাচ্ছেন।

"শুনলাম, কয়েক ঘণ্টা আগে নাকি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে। ডাক্তারেরা সব হতাশ হয়ে চলে গেছে; কাকার শ্বাস আরম্ভ হয়ে গেছে, চোখ উঠেছে কপালে, শুধু শেষ নিঃশ্বাসটী পড়তে বাকী। এমন সময় হঠাৎ কাকা কি রকম কেসে উঠলেন; তারপর কপালে-ওঠা চোখ আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল, বেশ স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল—সবাই অবাক্‌ হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল। ডাক্তার এসে তিনিও অবাক্‌ হয়ে গেলেন। নাড়ী দেখ্‌লেন, বুক পরীক্ষা কর্‌লেন, শেষে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'এ কি, এ যে একেবারে ভূতুড়ে কাণ্ড! রোগী যে সেরে গেছে প্রায়, এ কি করে হ'ল?'

"আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল; জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কখন থেকে কাকা ভাল হ'তে সুরু কর্‌লেন?'

"শুনলাম—বেলা প্রায় সাড়ে ছ'টা।

"ভেবে দেখলাম, হয়েছে, সাড়ে ছ'টার সময়েই তো আমি কাচা কিনেছিলাম! যে সময় কাকা মারা গেছেন ভেবে কাচা কিনেছি সেই সময় থেকেই ঠিক কাকা ভাল হ'তে সুরু কর্‌লেন!

"আমি কাকার পাশে বিছানাতে বসে পড়লাম, অন্যমনস্ক ভাবে 'কাচা' জোড়াটা তাঁর বিছানার উপরই রাখলাম। কাকা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'ওটা কি?'

"আমি অন্যমনস্ক ভাবেই বলে ফেল্‌লাম—'কাচা'।

"কাকা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কাচা? কাচা কেন?' তারপর হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌লেন, 'ও বুঝেছি, উঃ কী শয়তান, কী নিমক-হারাম- ওকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম, আর ও আমি মরবার আগেই কাচা কিনেছে—মরা পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা কর্‌তে পারে নি। নিয়ে এস, নিয়ে এস আমার উইল, নিয়ে এস, ঐ আলমারীতে আছে'।

"তিনি যে উইলে আমাকে সমস্ত দান করেছিলেন সেই উইল রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন, 'সমস্ত টাকা গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দেব তবুও ও শয়তানকে এক পয়সা দিয়ে যাব না।' ছ'দিন ধরে চেষ্টা কর্‌লাম—কাকার মত বদলাতে পার্‌লাম না। বুড়ো কিছুতেই বুঝলেন না যে আমার জন্যই তিনি বেঁচে গেলেন। কাচা কিনে মরা কাকাকে আমিই বাঁচিয়ে দিলাম!"

আমি বল্‌লাম, "মরা কাকাকে তো বাঁচালেন, কখনও বাঁচা কাউকে মেরেছেন নাকি?" ভদ্রলোক একটুখানি দুঃখিত ভাবেই বল্‌লেন, "হ্যাঁ একটা ঘোড়া একবার মারা গিয়েছিল আমারই জন্য। একবার খেয়াল হ'ল যে রেস খেলে কিছু টাকা কর্‌ব। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, যে ঘোড়াটা আমি বাজি ধরলাম সেই ঘোড়াটা ছুটবার আগেই সর্দ্দিগর্ম্মী হয়ে মারা গেল। আমি বাজি ধরেছি—পাছে বাজি জেতে তাই দৌড়াবার আগেই সে বেচারা গেল মারা। জিতবার আশা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল।"......একটু থেমে তিনি বল্‌লেন, "তবে অপকার সংসারে বেশী হয় নি, উপকারই বেশী হয়েছে আমার জন্য। সেবার আমার জন্যই দেশের গরীব লোকেরা খেতে পেয়ে বাঁচল—দুবেলা দুমুঠো ভাত যাতে তা'রা খেতে পায় তার বন্দোবস্ত আমিই কর্‌লাম।" আমি অবাক্‌ হ'য়ে বল্‌লাম, "সে কি, এদেশের সমস্ত গরীব লোকের ভাতের বন্দোবস্ত আপনি কর্‌লেন মানে?"

"মানে আর কি ?" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "মানে, এগার বছর আগে হঠাৎ চালের দর বেড়ে যাচ্ছিল ভীষণ – মনে আছে ?"

আমি বল্‌লাম, "এগার বছর আগের কথা, তখন আমি নেহাৎ ছোট, কাজেই···"

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "যা হ'ক, এগারো বছর আগে চালের দর হু হু করে চড়ে যাচ্ছিল ; আমি প্রায় হাজার খানেক টাকার চাল কিনে রাখলাম। ভাবলাম, যে রকম দাম চড়ে যাচ্ছে, মাস কয়েক পরে ঐ চাল বিক্রি কর্‌লে হয়ত তিন হাজার টাকায় বিক্রি কর্‌তে পার্‌ব ; ফলে দুইটী হাজার টাকা লাভ—" বলে ভদ্রলোক একটু থেমে আবার বল্‌লেন, "আমি তখন একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার অদৃষ্টে ঘট্‌বে উল্টো। হোলোও তাই, যেই আমি চাল কেনা অমনি চালের দর হু হু করে নেমে এল ; যাকে বলে জলের দর তাতেই আমাকে সমস্ত চাল বিক্রি করে দিতে হোলো। আমি একেবারে পথে বস্‌লাম, সর্ব্বস্ব গেল ; তবে একটা কথা—আমারই জন্য চালের দর এত নেমে যাওয়ায় যে সব গরীব দুঃখীরা চালের দর চড়ে যাওয়ায় হা-হুতাশ কর্‌ছিল তারা এখন আনন্দে নাচ্‌তে লাগল—খেয়ে বাঁচল তারা প্রাণ ভরে। বুঝতে পার্‌ছেন তা হ'লে ?"

আমি বল্‌লাম, "তা হ'লে দেখুন কয়লার দর তো হু হু করে চড়ে যাচ্ছে, সকলে ভেবে অস্থির হচ্ছে ; আপনি কিছু কয়লা কিনুন না বেশী করে ! তা হ'লে কয়লার দর নেমে যাবে।"

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "ভুল কর্‌ছেন, তা কি করে হ'বে ? আমি কয়লা কিন্‌লে কয়লার দাম কমে যাবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আমি কয়লা কিনি তাহ'লে হু হু করে কয়লার দাম বেড়ে যাবে—আপনারা পাঁচজনে মারা যাবেন। বুঝতে পার্‌ছেন না ? চাল কিনেছিলাম চালের দাম বাড়বে এই উদ্দেশ্যে, কাজেই কমে গেল। আমি যা ভাবব বা চাইব তারই উল্টো হ'বে"—বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোক তাঁর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "এ কি, মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার যে !"

আমি একটু আশ্চর্য্য হয়েই বল্‌লাম, "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ?"

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "কলকাতার ট্রেন দেখ্‌ছি ঠিক সময় পৌঁছুচ্ছে ! আর আধঘণ্টা

মাত্র বাকী ; কি রকম হোলো ! আধ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছুলে যে আমার তখনও প্রায় আধঘণ্টা সময় থাকবে সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য। ভেবেছিলাম পথে নিশ্চয় একটা কিছু ঘট্‌বে যাতে সায়েবের সঙ্গে দেখা করার যে সময় তার মধ্যে পৌঁছাতে পারব না ; কিন্তু আজ দেখ্‌ছি অদৃষ্টে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে"—এই কথা বল্‌তে বল্‌তেই হঠাৎ ট্রেন গেল মাঝ-পথে থেমে।

সকলেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাপার কি জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রৈল—অথচ কিছুই জানা গেল না প্রথমটা। খানিক পরে জানা গেল যে সামনের লাইনে একটা মালগাড়ী লাইন থেকে বার হ'য়ে গেছে—সেটাকে ঠিক করতে ঘণ্টা দেড়েক-দুয়েক সময় নেবে।

ভদ্রলোক এবার চীৎকার করে হেসে উঠলেন—বল্‌লেন, "দেখ্‌লেন তো মশাই ! তাই তো বলি এ কি করে হয় ?"

সেদিন কলকাতায় পৌঁছাতে প্রায় দু ঘণ্টা দেরী হ'য়ে গেল। ভদ্রলোকেরও সেদিন আর সাহেবের সঙ্গে দেখা হোলো না, চাকরীও হোলো না সে-যাত্রা নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে তারপর আর দেখা হয় নি, তবে এখন যখনই যেখানে যা ঘটে আমি ভাবি সেই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তার উল্টো একটা কিছু ভাবছেন বা কর্‌ছেন।

ওদেশের কাণ্ড

(শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু)

কিপ্‌লিং—এই নামটা তোমরা
শুনিয়াছ নিশ্চয় ?
এক দোকানীর কাছে তাঁর ষাট
পাউণ্ড্‌ পাওনা হয়।

লিখিয়া দিলেন, 'টাকাটা আমার
শীঘ্র চুকায়ে দিয়ো।
না হইলে, তার পরিণামটাও
কল্পনা ক'রে নিয়ো।'

যায় কিছুদিন, এলো না জবাব,
অবশেষে রেগেমেগে,
ধম্‌কানি দিয়ে চিঠি একখানি
লিখিয়া দিলেন বেগে,
মোট কথা তার,—'কাঠগড়াতেই
চাও টেনে নিয়ে যাওয়া ?
দুষ্টের সনে শিষ্টতা ক'রে
অশান্তি মিছে পাওয়া !'
তারো উত্তর এলো না, দেখিয়া
রাগে জ্ঞানহারা কবি
সশরীরে গিয়ে হ'লেন হাজির,
ভোলে কি সহজে ভবী ?
বলিলেন 'কি হে ? টাকাটা আমার
দিতে কি ইচ্ছা নাই ?'
'নিশ্চয় দেব !' কহিল দোকানী,
'হ'ল কি, শুনুন তাই !
প্রথম চিঠিটা যেই এলো, সেটা
নীলামে উঠিল চ'ড়ে,
কুড়িটি পাউণ্ড দিয়ে একজন
নিয়ে গেল ক্রয় ক'রে।
দ্বিতীয় চিঠিটা বড় ছিল কিনা,
দেখি বাজারের হাওয়া
ধ'রে ব'সেছিনু তিরিশ পাউণ্ড,
সহজেই গেল পাওয়া।
দশটি পাউণ্ড বাকী আছে আর,
আরেকটি লিপি এলে
ঘর থেকে কিছু হয় না তো দিতে,
সব টাকা দিই ফেলে !
উপরন্তু সে লাভও হ'তে পারে,
তাই কহি, দয়া ক'রে
নিজের পাওনা নিয়ে গিয়ে, ফের
চিঠি লিখে দিন্ মোরে !'
হাসে কিপ্‌লিং এতখানি তার
খ্যাতির বহর দেখি।
আমি ভাবি, কভু এ দেশে এমন
সম্ভবও হইবে কি ?

কোনও গ্রীষ্মের ছুটির এক মাস

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ)

আজ সন্ধ্যেয় কল্‌কাতায় ছোঁট একটি ঘরে যেখানকার কথা লিখ্‌তে বসেছি এখান থেকে তা'র দূরত্ব প্রায় আট শ' মাইল। সেবারের গ্রীষ্মের ছুটির একটা মাস সে জায়গাতেই কেটেছিল : পাঁচ্‌মুড়ি তা'র নাম, মধ্যপ্রদেশ ও

বেরারের গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। পাহাড়ের তরঙ্গ তাকে ঘিরে র'য়েছে—মূক পাহাড় ক্রমশঃ অব্‌ছা হ'তে হ'তে নীল কুয়াসার ওধারে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গিয়েছে যেন! মাঝখানে এই পাঁচমুড়ি সহর, পাহাড়ের ওপর এক উপত্যকায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ; যেন আমাদের চির-পরিচিত জগৎ থেকে তা'কে ছিঁড়ে আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে। বছরের বাকী ক'টা মাস সেখানে বিশেষ কেউ থাকে না। শুধু এই সময়ে সেখানে হঠাৎ হৈ হৈ ক'রে ওঠে মানুষের ভীড়, মোটারের ছুটোছুটি ; পথে পথে জ্বলে আলো, ক্লাবে ক্লাবে বাজে বাজ্‌না ; লাট সাহেবের অফিসটা আসে উঠে, আসে অফিসারেরা আর কেরাণীর দল, আসে বণিক্ আর ব্যবসায়ী। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাস দুই তিন কেটে যায়—আবার স্রোতের মত ফিরে চলে যারা এসেছিল ; পথে জ্বলে না আলো, খালি বাড়ীগুলো পাহাড়ী বাতাসে হা-হা ক'রে হেসে ওঠে, সেখানকার বনে জমে উঁচু উঁচু ঘাস। পাঁচমুড়ি যেন ঘুমিয়ে পড়ে, যেন ম'রে যায়—সেখানকার অগোছালো প্রকৃতিতে এলোমেলো শুক্‌নো পাতা উড়ে বেড়ায়, এলোমেলো ফুল ফোটে, যেন সে স্বপ্নে ওঠে কথা কয়ে—মুখর হয়ে ওঠে ফুলের হাসিতে, ঝরা-পাতার কান্নায়, মুখর হ'য়ে ওঠে বন্য জন্তুর গর্জ্জনে, মুখর হয়ে ওঠে রোদে ও বৃষ্টিতে! আজ, যখন আমাদের চারধারে পূজোর বাঁশী বেজে উঠেছে, যখন আকাশে-বাতাসে সেই চিরপরিচিত অথচ চিরনতুন অদ্ভুত সুন্দর সুর, যখন সন্ধ্যায় ঝক্‌ঝকে আলোর নীচে প্রজাপতির মত চঞ্চল ছেলেরা আর মেয়েরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর হাস্‌ছে আর ছুট্‌ছে—তখন হয়তো সেখানকার গোধূলির নির্জ্জন ধূসরতায় কোনও বাঘ তা'র গোঁফের ওপর থাবা বুলিয়ে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠ্‌ল তা'র দিবা-নিদ্রা থেকে, ক'য়েকটা হায়না হয়তো হা-হা ক'রে ঠাণ্ডায় কেঁদে উঠ্‌ল, পাহাড়ী বাতাসে মর্ম্মর ক'রে উঠ্‌ল আম্‌লকি আর মহুয়ার ডাল, আর ঝরাপাতাগুলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠ্‌ল সেই চিরন্তন রিক্ত হাসি!

পাঁচমুড়ির কথা লিখ্‌তে ব'সে আজ প্রথমেই যেটা মনে পড়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে নাগপুর থেকে পাঁচমুড়ি পর্য্যন্ত মোটারে ক'রে যাওয়ার কথা। বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে সেই নির্জ্জন রাত্রির কথা, যখন প্রায় তিনটের সময়ে আমরা ক'টি প্রাণী হুড্‌-খোলা মোটারে উঠে বস্‌লুম। নির্জ্জন ঝক্‌ঝকে পিচের পথের ওপর দিয়ে

ছুটে চল্‌ল আমাদের গাড়ী, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কালো আকাশে ঝিল্‌মিল্‌ কর্‌ছে লক্ষ কোটি তারা। কত দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আমরা ছুটে চল্‌লুম —ঝিঁঝিদের ধারালো ঝিঁ-ই-ই ঝিঁ-ই-ই. ভিজে মাটির সুন্দর সোঁদা গন্ধ। তার পর আকাশে এল এলোমেলো হাল্‌কা সাদা মেঘ, পড়্‌ল তু'-চার ফোঁটা বৃষ্টি, আর হেড্‌-লাইটের তীক্ষ্ণ আলোয় অন্ধকারকে চিরে ছুটে চল্‌ল আমাদের গাড়ী। পেরিয়ে এলুম আমরা ছোটখাট গোটা তুই ঘুমন্ত গ্রাম, তার পর সারারাত ধ'রে জ্বলার দরুণ যেন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এল তারার আলোগুলো, আর পূব-আকাশে আলোর ক্ষীণ আঁচড় ফুটে উঠ্‌ল। বন্ধুর পাহাড়ী পথে ভোর হতে লাগ্‌ল। মাথার ওপর পাখা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে মালার মত উড়ে গেল একসার বক, চারধারে দেখ্‌লুম তরঙ্গায়িত পাহাড়ের আব্‌ছা নীল ইসারা, আর অবশেষে কতকগুলো পাতা-ঝরা শুক্‌নো গাছের ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দ সূর্য্যোদয়। বেলা আটটা নাগাদ ছিন্দ্‌-ওয়ারার ডাক-বাংলোয় পৌঁছুলুম। ছোট্ট গ্রাম, নাগপুর থেকে প্রায় মাইল আশী হবে। সারাটা তুপুর ঘুমিয়ে কাটানো হ'ল। বিকেলের দিকে গাড়ী ক'রে খানিক ঘুরে এসে চট্‌পট্‌ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সকাল সকাল শুয়ে পড়্‌লুম, কাল আবার প্রায় মাঝ-রাতে যাত্রা কর্‌তে হ'বে।

লেক্‌ ও বাবু পাহাড়

ছিন্দ্‌ওয়ারা থেকে পাঁচমুড়ির পথটা প্রায় সবটাই উচুঁ-নীচু, আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ। ভারী ভালো লাগ্‌ছিল এ রকম ক'রে মোটারে যেতে, সে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা! পাহাড়ী পথে সবে যখন ভোর হয় সে একটা দেখ্‌বার

জিনিষ। সত্যিই বেশ অনুভব করা যায়, গাছগুলো যেন আলোর প্রথম কণার সঙ্গে ঝল্‌মল্‌ ক'রে জেগে উঠ্‌ল, সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ল যেন—আর যে রকম অদ্ভুত মিষ্টি মিষ্টি নরম হওয়া বইল তা আর কখনও অনুভব করি নি। উষার সঙ্গে সঙ্গে যেন নির্ব্বাক্‌ অরণ্য, স্তব্ধ পাহাড় মুহূর্ত্তের জন্যও মুখর হ'য়ে ওঠে, তা'দের হঠাৎ-জেগে-ওঠার খুসীটা তারা যেন চাপ্‌তে পারে না। সেই রকমই এক শান্ত, সুন্দর ভোর হ'ল পাঁচমুড়ির পথে। ঝির্‌ঝিরে আম্‌লকি, শালের মত ধূপ্‌ আর সবুজ মহুয়া গাছগুলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল, আর পাহাড়ী পথ পাহাড়ী ঝর্‌ণার মতই খুসীমত চল্‌ল এঁকে-বেঁকে।

সকাল দশটা নাগাদ আম্‌রা পাঁচমুড়িতে পৌঁছুলুম। লেকের পাশেই আমাদের ছোট্ট নতুন বাংলোটাকে খুঁজে নিতে মোটেই অসুবিধে হ'ল না।

পাঁচমুড়ি জায়গাটা খুব ঠাণ্ডা নয়, আর দার্জ্জিলিঙ্‌ বা শিলঙের মত এখানে বেড়াতে হ'লেই উচুঁ-নীচু পথ ভে'ঙে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয় না। এখানকার বাজারের অংশটুকু ছাড়া সমস্তটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; ঝক্‌ঝকে পথগুলো রেঙ্গুনের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। আর বন্দোবস্ত ভারী চমৎকার। প্রতিটি পথের মোড়ে শাদা কাঠের বোর্ডের ওপর পরিষ্কার কালো অক্ষরে লেখা আছে—সে পথটা কোথায় যাচ্ছে, কত দূর, ইত্যাদি ইত্যাদি। বড় বড় মাঠ, মাঝে মাঝে তাল ও খেজুর গাছের জটলা, মাঝে মাঝে সাদা ধব্‌ধবে ছোট ছোট পুল এলোমেলো খেয়ালী স্রোতগুলো পার হবার জন্যে। দ্রষ্টব্য স্থান এখানে আছে প্রায় তেষট্টিটি। সবগুলো জায়গাই বেশ সুন্দর, তবে যেগুলো আমার মনে এখনও স্পষ্ট হ'য়ে আছে সেগুলোর কথাই লিখ্‌ব।

এখানে ছোট একটি পাহাড় আছে আর সেখানে আছে অনেকগুলি গুহা। প্রবাদ অজ্ঞাতবাসের সময়ে পঞ্চপাণ্ডবেরা সেখানে লুকিয়ে ছিলেন। এই পাহাড় থেকেই এখানকার নাম হ'য়েছে পাঁচমুড়ি অর্থাৎ পাঁচটি কুঁড়ে ('মুড়ি'—কুঁড়ে)।

শিলঙে যে রকম পাহাড়ী বন্ধুরতার সঙ্গে বাংলা দেশের শ্যামল প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়, পাঁচমুড়ি কিন্তু ঠিক সে রকম নয়। জায়গাটা একটু যেন

বেশীর ভাগ সময়েই সেটা যেন ঘুমে অচেতন—সেখানকার ঘরবাড়ী, সেখানকার পথঘাট সমস্তই এখন যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছে ; স্বপ্ন দেখছে তা'দের সেই সোনালী জাগরণের—যখন গ্রীষ্মের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তা'রা জেগে উঠ্‌বে, পথে পথে জ্বল্‌বে আলো, আস্‌বে অনেক মানুষ, আস্‌বে চাক্‌রে আর বণিকেরা, আর প্রতিটি সন্ধ্যায় যখন ক্লাবে ক্লাবে বেজে চল্‌বে সুন্দর বিচিত্র বাজ্‌না।

প্রেম ও হেম

(শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর)

পাণ্ডুরপুর গ্রামে একজন দরিদ্র বাস করিত। তাহার নাম ছিল বাঁকা, তাহার স্ত্রীর নাম ছিল রাঁকা। বাঁকা ছিল বড় ভক্ত ; সারাদিনই হরিগুণগান করিত, জীবনে কোন পাপ করে নাই—পাছে পাপ হয় বলিয়া কোন বৃত্তি-ব্যবসা গ্রহণ করে নাই। ভিক্ষা করাই সে পাপ মনে করিত—কারণ ভিক্ষা ভগবানের নাম করিয়া পরস্বহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, ভিক্ষা চাহিলে অনেকে বিরক্তও হয়। অথচ স্বামিস্ত্রী তুই জনের অন্নসংস্থান হওয়া চাই। তাহারা তুই জনে বনের মধ্যে শুক্‌না কাঠ কুড়াইয়া হাটে বাজারে কিংবা লোকের তুয়ারে তুয়ারে বিক্রয় করিত—তাহাতেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

বাঁকা সর্ব্বদাই ভগবানের নাম করিত—রাঁকাও স্বামীর দেখাদেখি ভগবানের নাম করিত। অতি দারিদ্র্যের মধ্যেও তাহারা প্রফুল্ল চিত্তেই কাল যাপন করিত। একদিন নারদ ভক্তের অন্বেষণে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে বাঁকার কুটীরে উপস্থিত। তাহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া নারদ অবাক্ হইয়া গেলেন—এরূপ ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হইতে কোন সাধু সন্ন্যাসীকে তিনি দেখেন নাই। তাহাদের দারিদ্র্য দেখিয়া নারদের বড় তুঃখ হইল। নারদ সটান বৈকুণ্ঠে গিয়া নারায়ণকে

বলিলেন—"প্রভু, এ কি তোমার অবিচার! পাণ্ডুর গ্রামে বাঁকা ও রাঁকা সারাদিন-রাত তোমাকে স্মরণ করছে। অথচ তাদের ঘরে জল পড়ে, পরনে কাপড় জোটে না, পেট ভরে তারা খেতে পায় না। এ কি তোমার অবিচার!" লক্ষ্মীদেবীকে নারদ বলিলেন—"মা, তোমারই বা কেমন বিচার? যত পাষণ্ডের উপর তোমার দয়া, আর এই বাঁকা ও রাঁকাকে তু' মুঠো অন্ন দিতেও তুমি চাও না!"

লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন—"নারদ বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে বাছা। আমরা কি এত খোঁজ রাখি? তুমি পৃথিবী ঘুরে বেড়াও, তুমি সব খোঁজ রাখ। তুমি ব'লে ভাল করেছ। যাও দেখি, আজই কতকগুলো সোনার মোহর নিয়ে তাদের সাম্‌নে ফেলে দিয়ে এস গে।"

নারদ কতকগুলি মোহর লইয়া গিয়া বাঁকা ও রাঁকা তু'জনে যে বনে কাঠ কুড়াইতেছিল—সেই বনে, তাদের পথের উপর সেগুলিকে ফেলিয়া, বনের অন্তরালে লুকাইয়া পড়িলেন।

পথে সোনার মোহর পড়িয়া আছে – বাঁকা চাহিয়াও দেখিল না, আগাইয়া চলিয়া গেল। রাঁকা পিছু পিছু আসিতেছিল, সে—

'দেখি মোহরের তোড়া মনে মনে ভাবে
স্বামী মোর জানিলে তো লইতে না দিবে।
ধূলামাটি চাপা দিয়া এখন তো রাখি
পাছে কি বিচার করে তেঁহ তাহা দেখি।'

রাঁকা মোহরগুলির উপর ধূলামাটি চাপা দিয়া স্বামীর পিছু পিছু কাঠ কুড়াইতে গেল।

ফিরিবার সময় রাঁকা মোহরগুলির কাছে আসিয়া স্বামীকে বলিল—"প্রভু, এখানে কতকগুলি মোহর পড়েছিল, যাবার সময় আমার চোখে পড়েছিল। তখন কিছু বলতে সাহস করি নি – ধূলামাটি চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। এগুলো বাড়ী নিয়ে গেলে আমাদের তুঃখ ঘোচে—আর বনে বনে কাঠ কুড়াতে হয় না।"

বাঁকা বলিল—"ভদ্রে, সোনার উপর ধূলামাটি ফেলাই উচিত। ধূলার চেয়েও যা অসার ও তুচ্ছ, তার উপর ধূলামাটি দিয়ে ভালই করেছ। আর ওদিকে

তাকিও না, তাড়াতাড়ি চলে এস। কোন্ মূর্ত্তিমান্ পাপ আমাদের সর্ব্বনাশ করবার জন্য সোনার জাল পেতে রেখেছে! চলে এস, ভদ্রে, চলে এস তাড়াতাড়ি। নারায়ণ—নারায়ণ।”

নারদ বনের আড়াল হইতে সব দেখিলেন। তার পর মোহরগুলি কুড়াইয়া লইয়া বৈকুণ্ঠে মা লক্ষ্মীর হাতে দিয়া বলিলেন, “এই নাও, তোমার মোহর ফিরে নাও। আমাকে বলে কিনা মূর্ত্তিমান্ পাপ!”

লক্ষ্মী—“সে কি নারদ, তুমি বাঁকা-রাঁকার দুঃখ ঘুচাতে মোহর নিয়ে গেলে—দিলে না কেন? ফিরিয়ে আনলে যে!”

নারদ—“আমার অপরাধ ক্ষমা ক’রো, মা। আমি বুঝতে পারি নি। বাঁকার সাম্‌নে মোহরগুলো রেখে বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। বাঁকা বলে কি, কোন্ মূর্ত্তিমান পাপ আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্য পথে মোহর ছড়িয়েছে! আমি বুঝ্‌তে পারি নি।”

নারায়ণ—“বৎস, সে যদি ধনদৌলত চাইত—তবে সে অনেক আগেই পেত, কিন্তু তাতে সে আমার প্রেম হ’তে বঞ্চিত হ’ত। সে তো হেম চায় না—সে যে চায় প্রেম। যে পরম ধনের সন্ধান পেয়েছে—সে কি পার্থিব ধন চায়? তার জন্য বৃথা বেদনা অনুভব ক’রো না—তার জন্য মাথাব্যথা মিথ্যা।”

নারদ নীরবে নতমস্তকে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

হীরক-রহস্য

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

বেলা তখন আন্দাজ একটা; খাওয়া-দাওয়ার পর হুকা-কাশি বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় বেহারা অমৃত একখানা

ভিজিটিং কার্ড্ আনিয়া উপস্থিত করিল। অপাঙ্গে একবার সেদিকে তাকাইয়া তিনি দেখিলেন নামটা অচেনা। “সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে এস” বলিয়া খবরের কাগজখানা টেবিলের এক পাশে তিনি সরাইয়া রাখিলেন।

একটু পরেই প্রৌঢ়-বয়সী যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি ভিতরে ঢুকিয়া হুকা-কাশিকে অভিবাদন জানাইলেন, তাঁর পানে মুহূর্ত্তকাল তাঁকে নির্ণিমেষে তাকাইয়া থাকিতে হইল। বাস্তবিকই কার্ডে-লেখা নামটা আগে হইতে দেখা না থাকিলে ইনি যে বাঙ্গালী তা বুঝিতে হুকা-কাশির মত লোকেরও কষ্ট হইত। প্রায় সাহেবের মতই পরিষ্কার ধব্‌ধবে রং, পা হইতে গলা অবধি নিখুঁৎ সাহেবী পোষাক, চলিবার এবং কথা বলিবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত সাহেবী ধরণের। ভদ্রলোকের মুখখানা কিন্তু বড়ই মলিন, চোখে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। আগন্তুকটিই প্রথম আলাপ সুরু করিলেন, বলিলেন, “আমাকে আপনি চিন্‌তে পারবেন না, কিন্তু আমাদের ফার্ম্মটার নাম সম্ভবতঃ আপনি শুনেছেন।”

“কোন্ ফার্ম্ম?” হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

“সেন এণ্ড্ সরকার লিমিটেড্—জুয়েলার্স্।”

হ্যাঁ, এ নাম হুকা-কাশি শুনিয়াছেন বটে। সাধারণতঃ জুয়েলার্স্ বা মণিকার বলিতে যা বুঝায় ইঁহারা তা হইতে একটু স্বতন্ত্র রকমের। অবশ্য হীরা-জহরৎ এঁরাও বেচেন বটে, কিন্তু কারবারের প্রধান কাজ হীরা পালিশ এবং কাটাই করা। কিছুদিন হইল এঁরা দম্‌দমে ছোটখাটো একটা কারখানা খুলিয়াছেন সে খবরও হুকা-কাশি রাখেন। ঠিক বিলাতী কায়দার না হইলেও কারখানাই বটে।

আগন্তুক—তাঁর নাম মিষ্টার সেন—আবার কহিলেন, “আমিই এ কারবারের সিনিয়ার পার্ট্‌নার (প্রধান অংশীদার)। হল্যাণ্ডের আম্‌ষ্টার্ডামে কুড়ি বচ্ছর হাতে-কলমে কাজ শিখে এসে এখানে ব্যবসার পত্তন করেছি। কাজকর্ম্ম চল্‌ছিলও ভালই, কিন্তু মিষ্টার হুকা-কাশি, হঠাৎ আমার এক বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে!”

হুকা-কাশি একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, “সব কথা আমায় খুলে বলুন!”

“বিঘাউনির রাজার নাম শুনেছেন, বোধ করি; তিনি আমাদের একজন বাঁধা খদ্দের। দিন কতক হল তাঁর কাছ থেকে একখানা হীরা আসে, সেখানাকে

হাল্‌-ফ্যাসান-অনুযায়ী কেটে পালিশ করে দিতে হবে। কালকে কারখানায় আমাতে আর আমার পার্ট্‌নার সরকারেতে এই নিয়ে কথাবার্ত্তা হয়; হীরাখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি বেশ করে দেখিয়ে দিই যে কি ভাবে কাট্‌লে ওখানার জৌলশ সবচাইতে বেশী খুলবার সম্ভাবনা। ঠিক হল, আমার উপদেশ মত, আমারই সম্মুখে আজ ওটা কাটা হবে—কাল আমার সময় ছিল না, কাজের তাড়ায় বার হতে হয়েছিল। দিনের শেষে কাল যখন কারখানা বন্ধ করা হয় তখনও ওখানা ঠিক জায়গাতেই ছিল; তার পর হীরার কেস্‌ বন্ধ করে চাবি দেওয়া হ'ল। কিন্তু আজ কারখানায় এসে দেখ্‌তে পেলাম কেসে হীরাখানা নেই, তার খোপটা খালি পড়ে রয়েছে—অর্থাৎ রাত্তির বেলায় হীরাটি চুরি গেছে। অথচ কিভাবে যে হীরা চুরি যেতে পারে আকাশ-পাতাল ভেবেও আমরা তার কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না। সমস্ত কারখানাটির একটি বর্ণনা দিলেই ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারবেন। যে প্রকাণ্ড হল-ঘরটাতে আমাদের কাজ হয়—হীরা থাকে—সেটা থেকে বাইরে বেরোবার একটী মাত্র দরজা; সারা ঘরে আর দ্বিতীয় দরজা নেই। ল্যাচ্‌-কী দিয়ে সে দরজা খোলা হয়, বন্ধও হয় সেই-ভাবেই। আমার আর মিঃ সরকারের কাছেই শুধু তার চাবি, আর কারো হাতে সে চাবি কখনই পৌঁছুতে পায় না। দরজার পরেই বাইরে শক্ত লোহার কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেট, তারও চাবি শুধু আমাদেরই হু'জনার কাছে। কারখানা ছুটী হলে প্রত্যহ আমি নিজে হাতে প্রথমে ভেতরের দরজা, তার পর কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেট বন্ধ করে দিই। হলের ভেতরে আলো আস্‌বার জন্য অনেকগুলি জান্‌লা অবশ্য রাখতে হয়েছে, তবে সেগুলো মানুষের নাগালের অনেকখানি উঁচুতে। সবগুলো জান্‌লাতেই প্রথমতঃ মোটা মোটা লোহার শিক, তার ওপর আগাগোড়া মিহি তারের জালে ছাওয়া। মাছিটিরও গল্‌বার জো নেই। জান্‌লার পাল্লা আগাগোড়া লোহার, কাজ বন্ধ হয়ে গেলে ভেতর থেকে সেগুলো এঁটে দেওয়া হয়। ঘরের ভেতর কাজ চল্‌বার সময় যে সব আবর্জ্জনা-জঞ্জালের সৃষ্টি হবে তা পর্য্যন্ত একটু নড়চড় হবার উপায় নেই। হলের সঙ্গে লাগান চৌবাচ্চার মাপের প্রকাণ্ড উঁচু আর একটা ঘর আছে—শুধু একটা নর্দ্দমা দিয়েই হল-ঘরের সঙ্গে তার যোগাযোগ। এটাকে আমরা বলি চৌবাচ্চা-ঘর। ঐ নর্দ্দমার

পথে সমস্ত জঞ্জাল চৌবাচ্চা-ঘরে এসে জড় হবে। এই চৌবাচ্চা-ঘরে ঢোকবারও শুধু একটিমাত্র দরজা, চাবি থাকে কেবল আমার আর মিঃ সরকারের কাছে। আমরা হু'জনা ছাড়া এ-ঘরে অন্য কারো ঢুকবারই হুকুম নেই। রোজ বিকাল পাঁচটায় কারখানা বন্ধ করে আমি এসে জঞ্জালগুলো পরীক্ষা করে দেখে আবার বন্ধ করে চলে যাই। হল-ঘরে তবুও জানালা রয়েছে, এখানে সে বালাইও নেই, থাকবার মধ্যে আছে কেবল বাতাস প্রবেশের জন্য ছাতের কাছাকাছি দেওয়ালের গায়ে হুটো ছোট ছোট ফোকর—মোটা শিক সেখানেও এমনি ভাবে বসান যে মানুষের সাধ্য কি সেখানে কোন রকম দন্তস্ফুট করে! মেঝের ওপর থেকে চৌবাচ্চা ঘরের ছাদ চোদ্দ ফুট উঁচু। দিন রাত বন্দুক কাঁধে বরকন্দাজ কারখানা পাহারা দিচ্ছে—একজন চৌবাচ্চা-ঘরের কাছে, আর একজন ঠিক তার উল্‌টো দিকে। এক-তালায় কারখানা, দোতালায় আমার কোয়াটার্স্‌। আজ বেলা দশটায় কারখানা খোলবার সময় বরাবরকার মতই

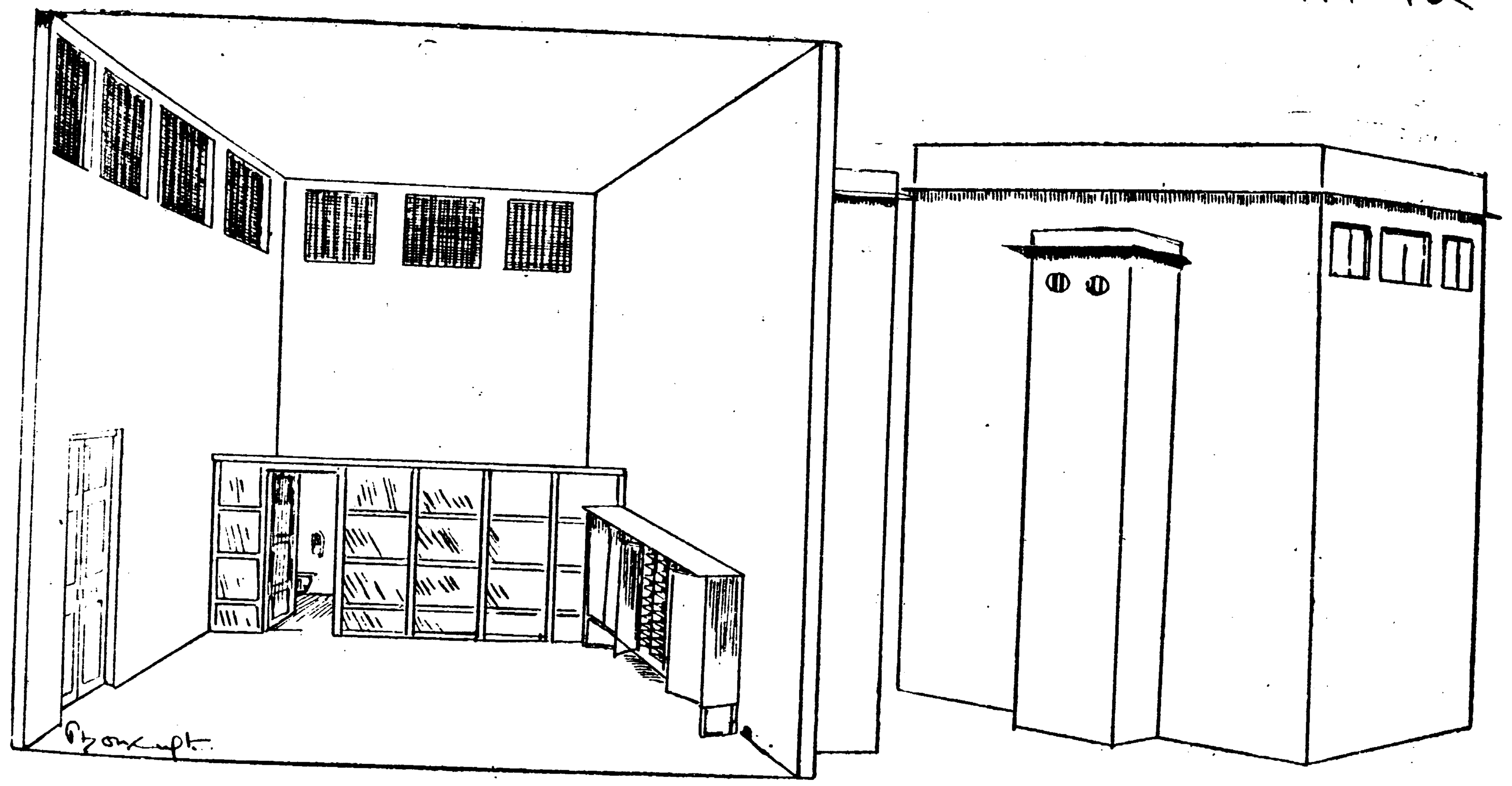

সেন এণ্ড্‌ সরকারের কারখানা—বাঁ দিকে ভিতরের এবং ডান দিকে বাহিরের দৃশ্য।

বিশেষ লক্ষ্য করে দেখা গেছে, দরজা-জান্‌লা কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ নেই; হীরার কেস্‌গুলোও দিব্যি তালা-বন্ধই আছে। কাজেই কি ভাবে যে হীরাখানা

খোয়া যেতে পারে তা বাস্তবিকই একটা প্রকাণ্ড রহস্য। আপনি হয়তো বল্‌বেন, কাজ করবার সময় কারিগরদের ভেতরেই কেউ হয়তো এ দুষ্কর্ম্মটি করেছে। কিন্তু আমি অপনাকে বল্‌ছি, মিষ্টার হুকা-কাশি, তা একেবারেই অসম্ভব। অসম্ভব এইজন্য যে আমাদের ওখানকার নিয়মই হ'ল এই, যে একবার কাজের ঘরে ঢুক্‌লে কারখানা বন্ধ হবার আগে আর কেউ সে-ঘর থেকে বাইরে আস্‌তে পাবে না। টিফিনের সময়ও জলখাবার খেতে হবে ঐ ঘরেরই ভেতরে—যার যা খেতে অভিরুচি বাড়ী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌তে পারে। ঘরের এক পাশে কাঠের পার্টিশন দিয়ে জলের কল, বাথরুম সমস্তই করে রাখা হয়েছে, বাইরে আস্‌বার কোন দরকার নেই। কাজের ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একমাত্র ভিতর-দরজাটা আঁমরা বন্ধ করে দি, আর সেই বন্ধ দরজার এপাশে সারাক্ষণ একটা দরওয়ান মোতায়েন থাকে। মিঃ সরকার এবং আমি ছাড়া সারাদিনে ও-ঘরে আর কোন প্রাণীর ঢোকবার উপায়ও নেই, হুকুমও নেই। তার পর ছুটীর ঘণ্টা বেজে গেলে কারিগরদের একে একে দরজার সাম্‌নে আনা হয়; তন্ন তন্ন করে তাদের 'দেহ-তালাস' করে তবে আমি ওদের বাইরে যেতে দিই। বিশ বচ্ছর আমষ্টার্ডামে চাকরী করে এসেছি, হীরা সরিয়ে নেবার যত-রকম সম্ভব-অসম্ভব ফন্দি-ফিকির আছে, কোনটাই আমার জান্‌তে বাকী নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার চোখে ধূলো দিয়ে কেউ যে সেরে যেতে পারে নি, এ কথা ধ্রুব সত্য। আর তা ছাড়া তার তো প্রত্যক্ষ প্রমাণই রয়েছে—দিনের শেষে কেস্‌ বন্ধ করবার সময় হীরা তো কেসেই ছিল দেখা গেছে! এক ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া এ রহস্যের তো আর কোন সমাধানই আমি দেখ্‌তে পাই না। অথচ সময়-মত রাজা-বাহাদুরকে তাঁর হীরা ফিরে দিতে না পারলে আমাদের কি দশা হবে একবার ভেবে দেখুন আপনি!" ভদ্রলোক হাতের তেলোর উপর কপালের ভর রাখিয়া ম্রিয়মানভাবে মেঝের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

হুকা-কাশি ধীরে ধীরে একটিপ্‌ নস্যি লইয়া কহিলেন, "হুঁ, হীরাচুরির ব্যাপারটা আজকাল কল্‌কাতায় একটু সংক্রামক হয়ে দেখা দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। শুধু আপনি নন্‌, আরও দু'য়েক জন মণিকার এ বিষয়ে আমার পরামর্শ

চেয়ে পাঠিয়েছেন।……আচ্ছা আপনি এখন দম্‌দমায় ফিরে যান, ঘণ্টা খানেক বাদেই আমি আস্‌ছি।

মিষ্টার সেন গিয়া মোটরে উঠিতেই হুকা-কাশি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া লইলেন, "হ্যাল্লো……, কে রণজিৎ বাবু? ভারী ইণ্টারেষ্টিং—আর একটা হীরাচুরির কেস্‌! হ্যাঁ, এবারে দম্‌দমার সেন এণ্ড্‌ সরকার কোম্পানী থেকে। হাতে সময় আছে?—একবারটি যেতে পারবেন আমার সঙ্গে ওখানে? আধ ঘণ্টার মধ্যেই আস্‌ছেন? আচ্ছা, আমি তা' হলে তৈরী হয়ে থাকি।"

যথা সময়ে রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া হুকা-কাশি দম্‌দমার সেন এণ্ড্‌ সরকারের কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিঃ সেন ফটকের সাম্‌নেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, অল্প পরে মিঃ সরকারও আসিয়া জুটিলেন। হুকা-কাশি বলিলেন, "সময় নষ্ট না করে প্রথমেই চলুন অকু-স্থানে যাওয়া যাক, মানে যেখান থেকে হীরা খানা অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে।"

দরজা খোলা হইল, চারিজনেই প্রকাণ্ড হলটার ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। সে সময়টা টিফিনের, কারিগরেরা কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া ঘরের মধ্যেই যে যার টিফিন খাইতে বসিয়া গেছে—কেউ টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি হইতে রুটি-তরকারি বাহির করিতেছে, কেউ বা গুড় সহযোগে চিঁড়া চিবাইতেছে। কারো কারো আবার স্বাস্থ্যকর জিনিষের উপর ততটা লক্ষ্য নাই, মুখরোচক হইলেই হইল; তারা ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলিয়া বাহির করিতেছে ঝুরিভাজা। কেউ বা দুনিয়ার একমাত্র সার বস্তুটাকেই শুধু চিনিয়াছে, অর্থাৎ সেই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও থার্ম্মোফ্ল্যাস্ক খুলিয়া গিলিতেছে কেবল বাটি বাটি চা। রণজিৎ একটু হাসিয়া মিঃ সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "নাঃ, আপনার কারিগরদের ভোজন-বৈচিত্র্য আছে বল্‌তেই হবে; কেউ কেউ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেজায় সতর্ক, আবার কেউ কেউ সে বিষয়ে কোন তোয়াক্কাই রাখেনা!"

হুকা-কাশি টিপ্পনী কাটিলেন, "অর্থাৎ খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ, এইতো? কিন্তু কেউ কেউ আবার বিশেষ অজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ—দুই-ই। ঐ

দেখুন, পাছে বাতাস লেগে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে ওই লোকটা খাবারের বাক্সে ছোট ছোট কতকগুলি ফুটো করে নিয়েছে, অথচ খাবার বেলায় খাচ্ছে তেলেভাজা বেগুনি—এক কথায় যাকে সদ্য বিষ বল্লেই চলে !”

মুখে রসিকতা করিতে থাকিলেও হুকা-কাশি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমস্ত ঘরখানাই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন ; গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, “বাস্তবিকই আপনারা একটী অভেদ্য দুর্গ-ই তৈরী করে রেখেছেন, মিষ্টার সেন। কোন বাইরের লোকের পক্ষে এখানে ঢুকে কোন কিছু সরিয়ে নেওয়া যেমন অসম্ভব, তেম্‌নি ভেতর থেকেও যে-কোন লোকের পক্ষেই বাইরে কোন জিনিষ চালান দেওয়াও দুঃসাধ্য-ব্যাপার ! ওপরের ঐ জান্‌লার পাল্লা গুলি তো দেখ্‌ছি খাঁটি ষ্টীলের ! কাজ বন্ধ হয়ে গেলে নিশ্চয়ই ওগুলোকে ভেতর থেকে এঁটে দেওয়া হয় ! ...এইগুলোই বুঝি হীরার কেস্ ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, এগুলোও খাঁটী ষ্টীলেই তৈরী। কেসের ভেতর প্রত্যেকটি হীরার জন্য আলাদা আলাদা খোপ আছে, গায়ে নম্বর আঁটা। এখন কাজ চল্‌ছে তাই কেসের ডালা খোলা,—মিঃ সরকার এগুলোর কাছে কাছেই থাকেন। ছুটীর সময় প্রত্যেকটি খোপে হীরা আছে কিনা দেখে নিয়ে ডালা বন্ধ করে চাবি এঁটে দেবেন। তার মানে লোহার সিন্ধুকের মধ্যেই এগুলো রাখা হ’ল !”

“বুঝেছি ; এখন চলুন, পার্টিশন্‌টার ওধারটা একবার দেখে আসা যাক্। বাঃ, এদিকেও তো দেখছি আপনাদের সতর্কতার সীমা নেই—একেবারে দুর্গ !”

পার্টিশনের এধারে আসিয়া হুকা-কাশি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, “আপনার কারিগরেরা কি মাঝে মাঝে খিচুরী দিয়েও টিফিন করে নাকি মিঃ সেন ?”

“খিচুরী ? কই, দেখিনিতো কখনও ! তা খেতে পারে, আশ্চর্য্য কি ?”

“আমি কিন্তু রান্না-করা খিচুরীর কথা বল্‌ছিনা,—কাঁচা খিচুরী !”

“কাঁচা খিচুরী ! সে আবার কি ?”

“নইলে এগুলো এখানে এল কোত্থেকে ? এই দেখুন !” বলিয়া তিনি গুটিকয়েক ডাল এবং চাল মেঝে হইতে তুলিয়া মিষ্টার সেনের হাতে দিলেন। এগুলির দিকে কিন্তু আর কারোই নজর পড়ে নাই।

সেন এবং সরকার পরস্পরের দিকে তাকাইয়া মুখ চাওয়া-চাওই করিতে লাগিলেন, ব্যাপারটা তাঁদের কিছুই বোধ-গম্য হইল না। কিন্তু হুকা-কাশির তখন আর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, একখানা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ততক্ষণে তিনি ঘরের মেঝে পরীক্ষা করিতে বসিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ রণজিৎকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “দেখুন তো রণজিৎ বাবু, মেঝের ওপর ছড়ান এগুলো কি ?”

রণজিৎ খানিকটা দেখিয়া নিয়া কহিল, “এ তো দেখছি বালি !”

“কিন্তু সাধারণ বালি নয় নিশ্চয়ই। না না, হাতে করে অত জোরে রগড়াবেন না, কি রকম খরখরে দেখ্‌ছেন তো, হাত ছড়ে যাবে যে !”

মিঃ সেনেরও কৌতূহল হইয়াছিল, হাতে করিয়া জিনিষটা তুলিয়া নিয়া কহিলেন, “এ তো দেখ্‌ছি কাচের গুঁড়ো, কারখানায় এ জিনিষ আন্‌লে কে ?”

হুকা-কাশি বলিলেন, “আমার এ দিক্‌টা দেখা হয়ে গেছে, আর কোন জায়গা যদি দেখাবার থাকে তো চলুন মিষ্টার সেন।”

“আর কোন্ জায়গা ?”

“সবই যখন দেখা হল, তখন আপনাদের চৌবাচ্চা ঘরটাই বা বাদ যায় কেন ? চলুন, ওটাও দেখে আসি।”

হল হইতে বাহির হইয়া সকলে চৌবাচ্চা-ঘরের দরজার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন ! মিঃ সেন পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দরজাটি খুলিয়া দিলেন—ভিতরে এত অল্প জায়গা যে চারি জন লোকের স্থান-সঙ্কুলান হওয়াই শক্ত ; তার উপর আলোর অভাবও যথেষ্ট। মিষ্টার সেন পকেট হইতে খুব দামী একটা টর্চ্চ বাহির করিয়া এধার ওধারে টর্চ্চের তীব্র আলোক ফেলিতে লাগিলেন। এক কোণে ছোট্ট সাদা মত কি একটু জিনিষ দেখা গেল ; আঙ্গুলে করিয়া সেটুকু তুলিয়া আনিয়া মিঃ সেনকে হুকা-কাশি জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখুন তো, এটা কি আপনাদের হীরা কাটার কোন কাজে আসে ?”

মিঃ সেন দুই হাতে জিনিষটা একটু কাল নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, “এ তো

দেখ্‌ছি তূলো, কিন্তু সাধারণ তূলো এ তো নয়, এ যে প্রায় রেশমের সামিল—এ আমাদের কারখানায় ঢুকল কোত্থেকে ?”

“ঠিক বলেছেন, কাচের গুঁড়োও যেমন অসাধারণ, তূলোও ঠিক তাই ! বাজারে এ ধরণের তূলো আপনি কিন্‌তে পাবেন না। চলুন, এবারে বার হওয়া যাক্, আমার কাজ হয়ে গেছে।”

দরজা বন্ধ করিতে করিতে মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপারটা কিছু আঁচ্‌তে পারছেন ?”

“তা পারছি বই কি, বারো আনা রহস্যই পরিষ্কার হয়ে গেছে।”

“বটে নাকি ?” মিঃ সেন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, পলকের জন্য আশার আলোকে তাঁর সমস্ত মুখ ভরিয়া উঠিল, কহিলেন, “মহারাজের হীরা তবে ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে ?”

“তা, নেই একথাই বা বলি কি করে ! কাল আর আমার দেখা হয়তো আপনি পাবেন না, তবে নাগাদ পরশু আমার কাছ থেকে একটা টেলিফোন আপনি আশা করতে পারেন। এখন যাবার আগে একটা কথা—কারখানা-ঘরের দরওয়ানটাকে আমি একটু আড়ালে ডেকে গুটি দুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, অবশ্য আপনাদের যদি তাতে কোন আপত্তি না থাকে।”

“সে কি কথা, আপনি যা ভাল বুঝ্‌বেন করবেন, আমাদের আবার কি আপত্তি !”

“বেশ, তবে চলুন একবার তার কাছে আমায় নিয়ে।”

হুকা-কাশি ঠিকই বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকই পরদিন সারা বেলা তাঁর আর কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। তারপর সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ তিনি ঝড়ের মত রণজিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত, কহিলেন, “চট্ করে জামাটা গায়ে চড়িয়ে নিন তো রণজিৎ বাবু, একবার ‘বঙ্গ-বিশ্লেষণ’ আপিসে যেতে হবে।”

“কেন ? সেখানে কি দরকার ?”

“ডাট্ এণ্ড ডাট্ জুয়েলার্স একটা বিজ্ঞাপনের কপি আমার হাতে দিয়েছে

রামধনু—

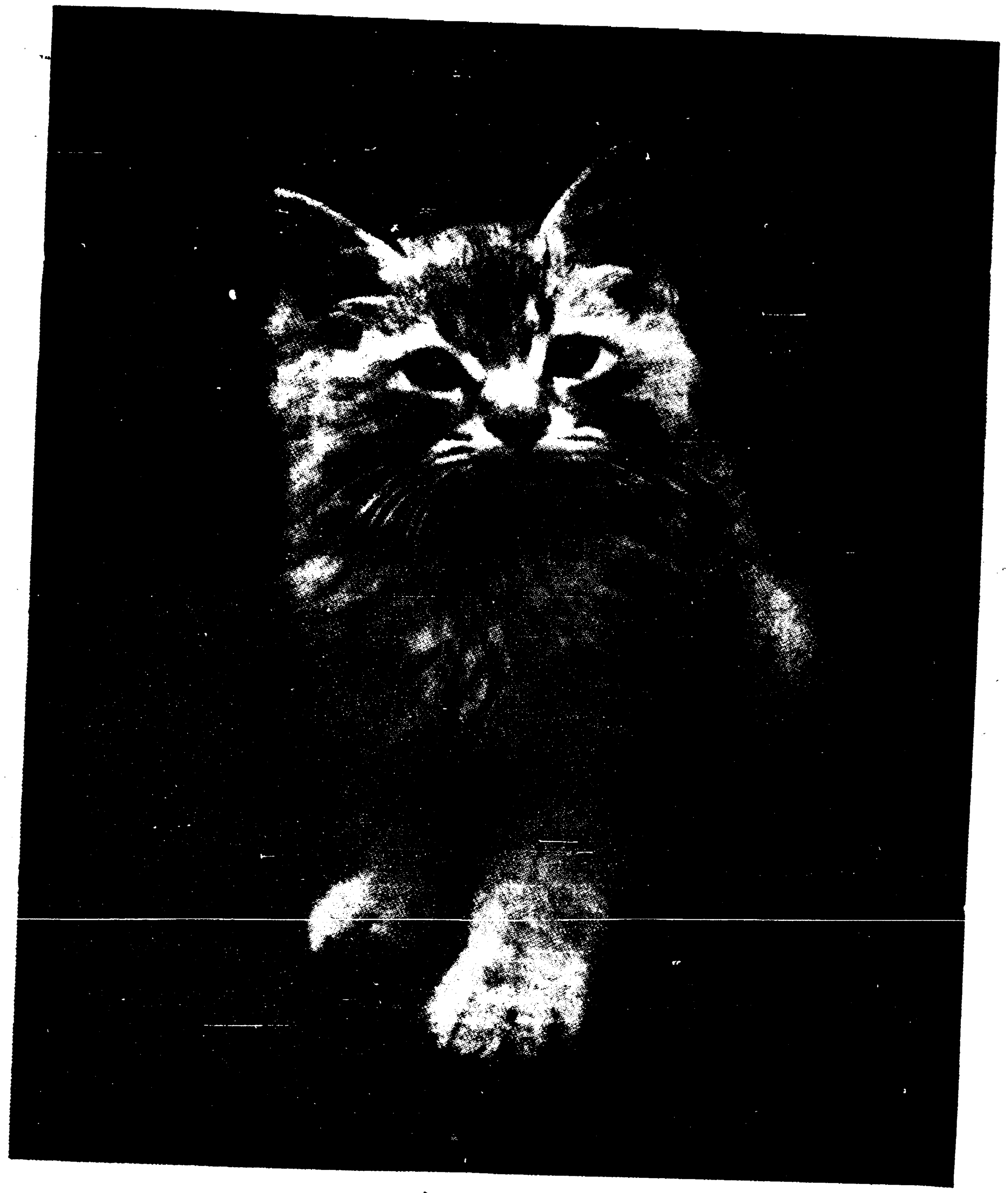

আমাদের পুষি

দেখ্‌ছি তূলো, কিন্তু সাধারণ তূলো এ তো নয়, এ যে প্রায় রেশমের সামিল—এ আমাদের কারখানায় ঢুক্‌ল কোত্থেকে ?”

“ঠিক বলেছেন, কাচের গুঁড়োও যেমন অসাধারণ, তূলোও ঠিক তাই ! বাজারে এ ধরণের তূলো আপনি কিন্‌তে পাবেন না। চলুন, এবারে বার হওয়া যাক্‌, আমার কাজ হয়ে গেছে।”

দরজা বন্ধ করিতে করিতে মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপারটা কিছু আঁচ্‌তে পারছেন ?”

“তা পারছি বই কি, বারো আনা রহস্যই পরিষ্কার হয়ে গেছে।”

“বটে নাকি ?” মিঃ সেন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, পলকের জন্য আশার আলোকে তাঁর সমস্ত মুখ ভরিয়া উঠিল, কহিলেন, “মহারাজের হীরা ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে ?”

“তা, নেই একথাই বা বলি কি করে ! কাল আর আমার দেখা হয়তো আপনি পাবেন না, তবে নাগাদ পরশু আমার কাছ থেকে একটা টেলিফোন আপনি আশা করতে পারেন। এখন যাবার আগে একটা কথা—কারখানা-ঘরের দরওয়ানটাকে আমি একটু আড়ালে ডেকে গুটি তুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, অবশ্য আপনাদের যদি তাতে কোন আপত্তি না থাকে।”

“সে কি কথা, আপনি যা ভাল বুঝ্‌বেন করবেন, আমাদের আবার কি আপত্তি !”

“বেশ, তবে চলুন একবার তার কাছে আমায় নিয়ে।”

হুকা-কাশি ঠিকই বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকই পরদিন সারা বেলা তাঁর আর কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। তারপর সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ তিনি ঝড়ের মত রণজিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত, কহিলেন, “চট্‌ করে জামাটা গায়ে চড়িয়ে নিন তো রণজিৎ বাবু, একবার ‘বঙ্গ-বিশ্লেষণ’ আপিসে যেতে হবে।”

“কেন ? সেখানে কি দরকার ?”

“ডাট্‌ এণ্ড্‌ ডাট্‌ জুয়েলার্স একটা বিজ্ঞাপনের কপি আমার হাতে দিয়েছে

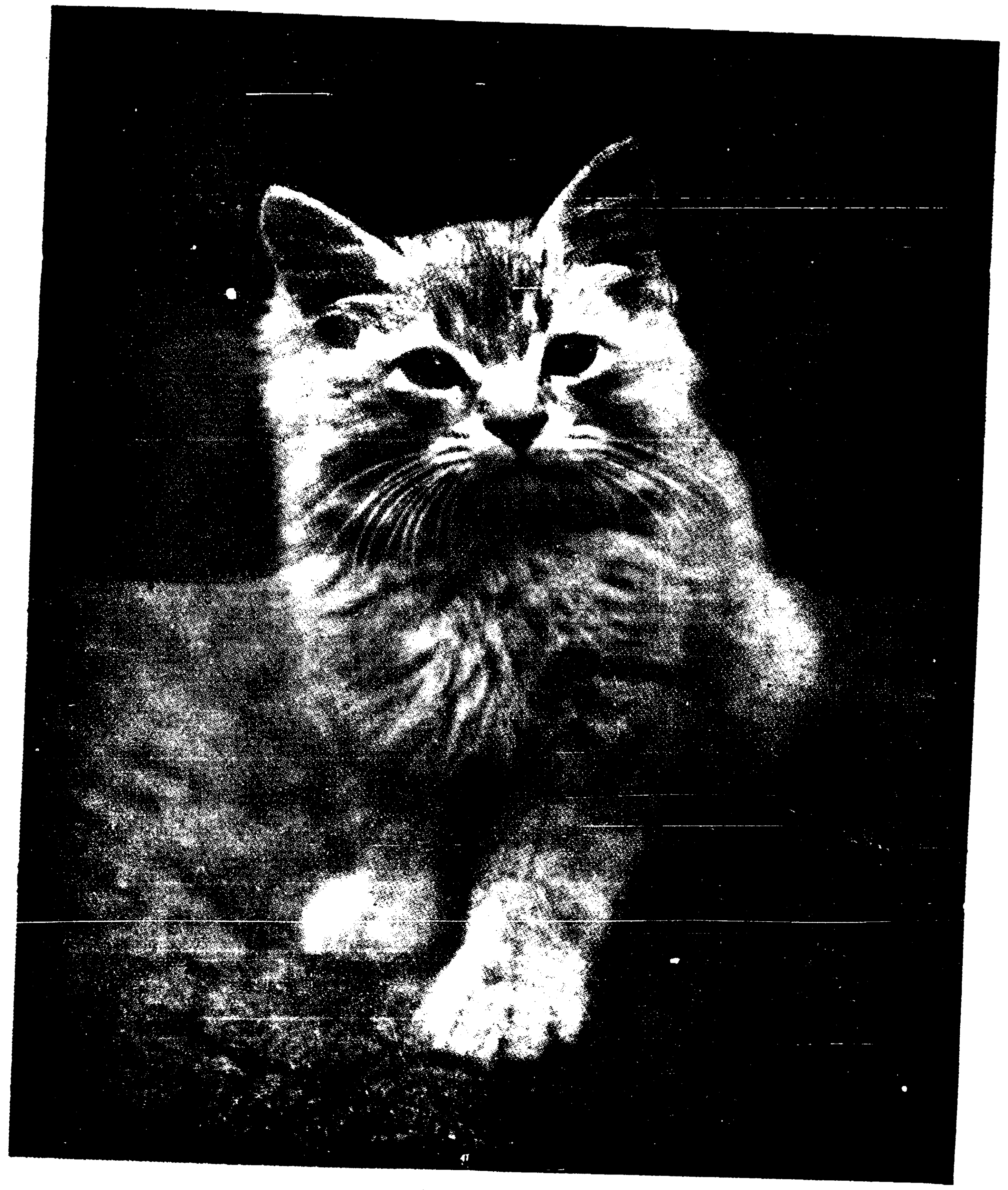

আমাদের পুষি

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

কালকের 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' পত্রিকায় সেটা বার হওয়াই চাই। আমার কথায় এত দেরীতে ওরা যদি বিজ্ঞাপনের কপি নিতে আপত্তি করে, তাই আপনাকে সঙ্গে নেওয়া। খবরের কাগজ-মহলে আপনার খুব খাতির, আপনার অনুরোধ ওরা কেউ ঠেল্‌তে পারবে না।"

খবরের কাগজের আপিস্ হইতে বাহির হইয়া হুকা-কাশি আবার ডুব মারিলেন, পরদিন বিকাল পর্য্যন্ত আবার আর তাঁর কোন খবরা-খবর নাই। রণজিৎ অদম্য কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অনবরত ঘর-বা'র করিতেছিল, এমন সময় ক্রিং ক্রিং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সে রিসিভারটা কানে লাগাইল, তারপর চোঙ্গার কাছে মুখ লাগাইয়া বলিল, "হ্যাল্লো, ওঃ মিষ্টার হুকা-কাশি? খবর কি? আমার আর আপনার ছু'জনারই সন্ধ্যার পর মিঃ সেনের ওখানে নেমন্তন্ন? হঠাৎ এত আনন্দোৎসবের কারণ কি? বলেন কি, বিঘাউনি-রাজের হীরার উদ্ধার এরই মধ্যে হয়ে গেছে? আপনি মানুষ নন্ মিষ্টার হুকা-কাশি, কিছুতেই মানুষ নন্—হ্যাঁ অপদেবতা, তাই বটে! আমায় ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাবেন? আচ্ছা"

রণজিৎ ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলে হুকা-কাশি বলিতে সুরু করিলেন, "একেবারে বৈজ্ঞানিক চুরি মশাই, এদেশে এমন-তর ব্যাপার বড় দেখা যায় না। অক্ষয় নামে এক নামজাদা ঝানু জোচ্চোর সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এক নতুন ধরণের জোচ্চুরি সুরু করেছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্ণের অনেকগুলো নকল হীরা জোগাড় করে—সে সব কোথায় পাওয়া যায় আপনি না জান্‌লেও জোচ্চোরেরা তার খবর রাখে—সে কল্‌কাতার দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াত। খদ্দের সেজে দোকানের কাউণ্টারের ওপর হীরা পরখ্ করবার ছুতোয় নকল হীরা বাক্সে চালান দিয়ে, আসল খানা বার করে এনে বল্‌ত, 'না, মশাই পছন্দ হল না।' তারপর দোকানীর চোখের সাম্‌নেই খুট্ করে বাক্সটা' টিপে দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ত। চোখের সাম্‌নে হীরা বন্ধ করা হয়েছে দেখে দোকানীর আর কোন সন্দেহ হত না, তারপর আসল ব্যাপারটি যখন খোলসা হত তখন খদ্দের একদম্ ভেগে পড়েছে। এই

রকম বার দু'তিন ঘট্‌তেই মণিকার-মহল সাবধান হয়ে গেল, দু' এক জন আমাকেও খবর দিলে। অক্ষয়ও বুঝ্‌ল, ঘন ঘন এক ফিকির বেশীদিন চালান নিরাপদ্ নয়, একটু অন্য পথে যাওয়া দরকার। হঠাৎ তখন তার মনে পড়ল সেন এণ্ড্ সরকার কোম্পানীর কথা। শোনা যায় ওদের হীরা নাকি বাজার-চল্‌তি হীরার চাইতে ঢের ঢের বেশী দামী। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? টাকা কব্‌লে বনমালী নামে সেন এণ্ড্ সরকারের এক কারিগরকে অক্ষয় হাত করে ফেল্লে। এবার প্ল্যান্ হল সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। ঝানু জোচ্চোর কিনা, হরেক রকম জোচ্চুরিরই সাজ-সরঞ্জাম ওর কাছে আছে। এই সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে গুটিকয়েক শেখানো পায়রা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, শিক্ষিত পায়রাকে কোন জায়গা থেকে ছেড়ে দিলে সে উড়ে গিয়ে ঠিক তার মালিকের বাড়ীতেই হাজির হবে। আগেকার দিনে সেনাপতিরা এদের পায়ে চিঠি বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীতে পর্য্যন্ত খবর পাঠাতেন। এই রকম একটি শেখানো পায়রা বনমালীকে দেওয়া হল। সেন এণ্ড্ সরকারের কারখানা-ঘরে কর্ম্মচারীদের ঢোকবার বেলায় কোন রকম 'দেহ-তালাস' হয় না, কেননা তা অনাবশ্যক; ওটা করা হয় শুধু বার হবার সময়তেই। বনমালী তার টিফিনের বাক্সে হাওয়া চলাচলের উপযোগী গুটিকয়েক ছ্যাঁদা করে পায়রাটীকে তারই ভেতর পূরে ফেল্ল, তারপর টিফিন বলে চালিয়ে বাক্সটাকে নিয়ে এল কারখানা-ঘরের মধ্যে। ভেল্কিওয়ালার পায়রার মত অক্ষয়ের পায়রাও ডাকে না, চুপচাপ পড়ে থাকে। বনমালী আগেই খবর পেয়েছে, পাকা জহুরী মিষ্টার সেনের উপস্থিতি ছাড়া বিঘাউনি-রাজের হীরা কাটা হবে না, আর সে দিনই টিফিনের সময় মিষ্টার সেনকে কাজের তাগাদায় বেরুতে হবে; ফিরবেন তিনি কারখানা বন্ধ হবার সময়—'দেহ-তালাসী' করতে। কাজেই টিফিনের পরই সে সুযোগ বুঝে অক্ষয়ের দেওয়া একখানা যুৎসই নকল হীরা কেসে রেখে আসল হীরাখানা তুলে নিল। যেমন গহনা-গাটীর দোকানে সচরাচর হয়ে থাকে—কাজের খাতিরে সকলকেই সর্ব্বদা কেসের কাছে যেতে হচ্ছে, সন্দেহের কোনই কারণ নেই। পার্টিশনের এ-ধারে বাথরুমে এসে অন্যের অলক্ষ্যে পায়রার পায়ে বিঘাউনি-রাজের হীরা বেঁধে দিতে তার কোনই কষ্ট হয় নি।

তার পর বাক্সে ফের পায়রা পুরে সে আবার চলে এল হল-ঘরে, যেখানে জঞ্জাল ফেলবার নর্দ্দমা, ঠিক তারই মুখে। এ নর্দ্দমাটিরও সর্ব্বদাই ব্যবহার হচ্ছে, কাজেই হুঁসিয়ারির সঙ্গে চারদিক্ দেখে নিয়ে কৌশলে সে যখন পায়রাটিকে এই নর্দ্দমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলে তখনও কারো কোন সন্দেহ হবার কারণ ঘটে নি। পায়রা এসে পড়ল চৌবাচ্চা-ঘরে; সে ঘরের খুব উঁচুতে আলো ঢুকবার ফোকরগুলিতে মোটা মোটা লোহার শিক লাগানো। চোর আট্‌কাবার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত বটে, কিন্তু পায়রার পক্ষে সে-পথে গলে যাওয়া কিছুই কষ্টকর নয়। শিক্ষিত পায়রা সেই পথেই উড়ে এসে অক্ষয়ের হাতে বিঘাউনি-রাজের হীরা পৌঁছে দিল।

"এদিকে এক মুহূর্ত্তও হীরার খোপ খালি পড়ে থাকেনি বলেই ওদিকে কারু নজর যায় নি, আর বনমালীও এতটা সাহস পেয়েছিল। ছুটীর সময় প্রত্যেকটি খোপই ভর্ত্তি আছে দেখে মিঃ সরকারও কিছু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যক মনে করেন নি, কেস্ বন্ধ করে ফেলেছেন। সকলেরই ধারণা বিঘাউনি-রাজের হীরা সারারাত কেসেই ছিল। পরদিন বনমালী এসে প্রথমেই সেই নকল হীরা, মানে কাচের টুক্‌রোটা কেস্ থেকে তুলে এনে পেষাই-কলে ফেলে এক মুহূর্ত্তে বালির মত মিহি করে ফেল্লে। তারপর সেই কাচের গুঁড়ো পার্টিশনের ওধারে ফেলে দিল—যাতে জলের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়িতে কাজ সারতে যাওয়ায় অল্প একটু গুঁড়ো কিন্তু মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নকল হীরাটাকে এ ভাবে নষ্ট করার অর্থ এই যে, মিষ্টার সেনের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাবে রাত্তিরেই বাইরের কোন চোর এসে বিঘাউনি-রাজের হীরাখানা আত্মসাৎ করেছে, ভেতরের কোন কারিগরের এর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ, একদম্ উল্‌টো দিকে অনুসন্ধানের মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়া।"

রণজিৎ অবাক্ হইয়া সমস্ত ঘটনা শুনিতেছিল, হুকা-কাশির বর্ণনা শেষ হইয়া যাওয়ার পরও সে একটু কাল চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, "বাস্তবিক, এ যে আপনি কি করে বার করলেন ভেবে ভেবে কিছুই কূলকিনারা পাচ্ছি না।"

হুকা-কাশি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা শুনুন তবে, কূল-কিনারা পাইয়ে দিচ্ছি।...সেন এণ্ড্ সরকার কোম্পানীর কারখানায় এসে গোড়াতেই একটা জিনিষ

একদম্ পরিষ্কার হয়ে গেল—রাত্রিযোগে বাইরের কোন চোর ভেতরে এসে যে হীরা চুরি করেনি সেটা সুনিশ্চিত। এমন একটা সুরক্ষিত দুর্গে তাদের আসাই যে শুধু দুরূহ ব্যাপার তাই নয়, দরজা অথবা জানালা কোথাও তাদের আস্‌বার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই, এমন কি হীরার কেস্‌টি পর্য্যন্ত বন্ধ অবস্থাতেই দেখা গেছে। কাজেই প্রথম হ'তেই সে সম্ভাবনাটা একদম্ বাতিল করে বিচারের বিষয়টি সীমাবদ্ধ করে আন্‌লাম। বাইরে থেকে কেউ যখন আসেনি তখন নিশ্চয়ই ভেতর থেকে হীরা চালান দেওয়া হয়েছে। কারখানা-ঘরটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে এ-ও বেশ বোঝা যায় যে হীরা তো দূরের কথা, একটা মাছি গলান যেতে পারে এমন ফাঁকও কোথাও নেই, বাদ শুধু ঐ নর্দ্দমাটা। শুধু ঐ নর্দ্দমার পথেই হীরা আস্‌তে পারে হল্-ঘর থেকে চৌবাচ্চা-ঘরে। কাজেই নর্দ্দমাটাই হবে আমার অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য। বিচারের বিষয় আরও সীমাবদ্ধ হয়ে এল। তারপর বিবেচ্য, চৌবাচ্চা-ঘরে মিঃ সেন ভিন্ন আর কারো ঢোকবার উপায় নেই, কাজেই সেখান থেকে হীরাখানাকে ফের কোথাও চালান দিতে হলে তার এক মাত্র পথ—প্রায় চৌদ্দ ফুট্ উঁচুতে আলো বাতাস ঢোকবার উদ্দেশ্যে লোহার শিক-দেওয়া যে দুটো ফোকর রয়েছে তারই কোন একটা। এ অবস্থায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরের হীরা চালান দেওয়া কোন লোকের পক্ষে শুধু নিজের চেষ্টায় অসম্ভব; হয় তাকে কোন যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে, নতুবা কোন জীবের। এতখানি বোধসম্পন্ন যন্ত্র থাক্‌তে পারে বলে আমি নিজে বিশ্বাস করি না, কোন সুস্থ-মস্তিষ্কের লোকই বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। কাজেই সাহায্য নেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই কোন জীবের। সে জীবটি এত ছোট হওয়া চাই যে একটা নর্দ্দমার পথ দিয়ে অনায়াসে সে গলে যেতে পারে, একটা টিফিন বইবার বাক্সে করে অনায়াসে তাকে কারখানা-ঘরে আনা চলে, কেন না ও-ভাবে আনা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই কারখানা ঘরে তাকে আনা সম্ভব নয়। কাজেই অন্য সব চিন্তা ছেড়ে আমায় শুধু দেখতে হবে ঘরের কোথাও এ-হেন কোন জীবের কিছুমাত্র চিহ্ন পড়ে আছে কিনা! বিচারের বিষয়টা কতখানি ছোট হয়ে গেছে লক্ষ্য করেছেন? ঘরে ঢুকেই একজন কারিগরের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি একটু কটাক্ষ করেছিলাম মনে আছে? খাবার নষ্ট হবার ভয়ে খাবারের

বাক্সে ছোট ছোট ছ্যাদা করে নিয়েছিল বলে! খাবার টাট্‌কা রাখবার উদ্দেশ্যে একাজ সে করেছে একথা কিন্তু তখনও আমি বিশ্বাস করি নি, ঘোরতর সন্দেহ হয়েছিল যে জীবটীকে বাক্সে পোরবার পর তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া সরবরাহের জন্যই এ ব্যবস্থা। পার্টিশনের এপাশে এসে মেঝের ওপর চাল আর ডাল দেখতে পেয়ে আপনারা সবাই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, আমি কিন্তু হই নি। এগুলো যে 'জীব'টিরই খাবার—এ-পাশে এনে তাকে খোলবার সময় বাক্স থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছে তা আমি তক্ষুণি বুঝতে পেরেছিলাম। কি ধরণের জীব, খাবার দেখে তাও কিছুটা আন্দাজ হল—যদিও আমার মনে মনে ঐ রকমেরই ধারণা ছিল। তার পর চৌবাচ্চা-ঘরে তূলো-জাতীয় জিনিষটা দেখে মিঃ সেনের মনেও সন্দেহ হয়েছিল যে সাধারণ তূলো সেটা নয়। আমি কিন্তু তখনই বুঝতে পেরেছি—সাধারণ, অসাধারণ কোন তূলোই ওটা নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ,—একটা সাদা পায়রার পালক। নর্দ্দমার পথে ঘষাঘষিতে পায়রার রোঁয়া ওপর-ওপর উঠে এলে সেটা ঠিক 'রেশমী' তূলোর মতই মনে হওয়ার কথা। সমস্ত ব্যাপারটার তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল—পায়রার পায়ে বেঁধে কারখানারই একজন কারিগর হীরা চালান দিয়েছে; এবং সে কারিগরটি কে তা আঁচ্‌তেও কষ্ট হল না—ছ্যাদাওয়ালা খাবারের বাক্সের মালিক যিনি, তিনিই; অর্থাৎ, খাঁকি হাফ্‌প্যান্ট্ পরা লোকটা।

"পার্টিশনের ওধারে মেঝের ওপর আরও একটি রহস্যময় জিনিষ পাওয়া গেল; মিঃ সেন ঠিকই এঁচেছিলেন, ওগুলো সত্যিই কাচের মিহি গুঁড়ো। হীরার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, থাকলে মিঃ সেনের মত পাকা জহুরী কখনই ভুল করতেন না। কাচের গুঁড়ো তাঁর কারখানায় কি করে এল ভেবে মিঃ সেন আশ্চর্য্য হচ্ছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ্‌লে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ব্যাপারটাতো এই—কোন কারণে হীরাচোরের একখণ্ড কাচ কারখানার ভেতরে আনার দরকার হয়েছিল, তার পর দরকার চুকে গেলে সেটাকে আর কোন-মতে লুকোবার উপায় নেই দেখে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি জন্য কাচের টুকরোটাকে কারখানায় আনার প্রয়োজন হতে পারে।

একটু বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, বিঘাউনি-রাজের নম্বর-আঁটা হীরার খোপটা খালি রেখে পায়রার পায়ে সেটি বাঁধবার চেষ্টা করা বিশেষ দুঃসাহসের কাজ,—কেন না তাতে তো কিছু সময় লাগ্‌বে! ধরা পড়লে আর রক্ষা নাই। কাজেই কারিগর স্বভাবতঃই চেষ্টা করবে এক টুকরো নকল হীরা সেই খোপে রেখে সবার চোখে ধূলো দিতে। পর দিন একটু সকাল সকাল এসে কাচখানা উড়িয়ে দিলেই হ'ল, কারিগরদের সম্বন্ধে কর্ত্তাদের কোন সন্দেহ হবে না, পুলিশ তাদের পেছনে লাগ্‌বে না। সুযোগ খুঁজে কাচখানাকে পেষাই-কলে চূর্ণ করতে আধ মিনিটও সময় লাগে না—এ অতি সহজেই সমাধা হ'তে পারে। আমি গোপনে দরওয়ানের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, পর্শু দিন সন্ধ্যার আগে কারখানার গেটে এসে পৌঁছেছিল ঐ খাঁকি প্যাণ্ট-পরা লোকটাই; বড় বেশী গরজ কিনা, তাই দেরী সয় নি। ওর নাম যে বনমালী তাও দরওয়ানের কাছেই শুনেছি।

"এর পরের ঘটনা আর বিতং দিয়ে বল্‌বার দরকার নেই, সংক্ষেপে বল্‌লেই চল্‌বে। আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি কারখানারই কাছে কোন একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে থাক্‌লাম। তার পর ছুটীর পর বনমালী বার হতেই গোপনে তার পেছু নেওয়া গেল। সে এসে উপস্থিত হল বাগ্‌বাজারের একটা বাড়ীর দরজায়। বার কতক কড়া নাড়তেই যে লোকটা এসে দরজা খুলে দিল তাকে দেখে আমায় দস্তুরমত চম্‌কে যেতে হল——বছর কয়েক আগে এক জোচ্চুরীর ব্যাপারে ধরতে গেলে আমিই ওকে জেলে পূরেছিলাম। লোকটার নাম অক্ষয়; জোচ্চোরের ধাড়ি। ভাব্‌লাম জেল থেকে বেরিয়েও আবার 'হীরার ব্যবসা' ধরেছে নাকি? হালে কল্‌কাতার মণিকার-মহলে আসল হীরার জায়গায় মাঝে মাঝে যে নকল হীরা চালান হচ্ছে সেগুলির মূলে এই মহাত্মাটি নেই তো! একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে তো! ফলে পরদিন অনেকটা সময় আমাকে বাগ্‌বাজারেই কাটাতে হ'ল। বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, অক্ষয়চন্দ্র আমাদের 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' কাগজের একজন নিয়মিত পাঠক। আমার মক্কেল মেসার্স ডাট্ এণ্ড্ ডাট্, জুয়েলার্সের সঙ্গে পরামর্শ করে সেদিন তাদেরই নামে 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বার করে দেওয়া গেল—কয়েক খানা হীরা তাদের ওখানে

অল্পদামে বিক্রী হবে, শো-কেসে আছে—যে কোন লোক এসে দেখে যেতে পারে। বেশ জান্‌তাম ভয়ের চাইতে লোভটাই অক্ষয়চন্দ্রের বেশী। 'বঙ্গ-বিশ্লেষণে' বিজ্ঞাপন পড়বার পর সে কিছুতেই স্থির থাকৃতে পারবেনা, একটা-না-একটা জোচ্চুরির মৎলব মাথায় নিয়ে ঠিক এসে হাজির হবে। হ'লও ঠিক তাই। যেম্‌নি সে দোকানে এসে ঢোকা, আমিও অম্‌নি কঁ্যাক্ করে ওকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। বেরিয়ে এল খান পনেরো নানান্ সাইজের, নানান্ প্যাটার্ণের নকল হীরা! এর পর আর বেশী কিছু বলবার নেই,—শুধু এটুকু ছাড়া যে আমার টেলিফোন পেয়ে অক্ষয়চন্দ্রেরই বিছানার তোষক কেটে মিষ্টার সেন পুলিশের সাহায্যে বিঘাউনি-রাজের হীরাখানা উদ্ধার করে এনেছেন; অক্ষয়চন্দ্র এবং বনমালী দু'জনাই এখন হাজতে। এইযে আমরা দমদমায় মিষ্টার সেনের বাড়ীতে এসে পড়েছি—এ পাঁয়জি, রোখ্‌কে, রোখ্‌কে!"

স্পেনের কথা

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্.সি)

ডন্ উইক্‌সটের দেশ স্পেন্ থেকে দু'চারটা খবর আজকাল মাঝে মাঝে খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। যেমন ধর, "জেনারেল ফ্রাঙ্কো সদলবলে সান্‌টাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন"—"ভ্যালেন্সিয়ায় বিদ্রোহীরা এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলায় ২০ জন লোক নিহত হইয়াছে;"—এই রকমের। দেশটার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকায় খবরগুলি অনেক সময়ই হয় তো তোমাদের কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকে। কে এই জেনারেল ফ্রাঙ্কো,—আর ভ্যালেন্সিয়াই বা কোথায়?

জিনিষটা ভাল ভাবে বুঝতে হ'লে স্পেনের অল্প একটু ভূগোল এবং ইতিহাস তোমাদের জানা দরকার। ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটাকে বলা হয়—আইবেরিয়ান উপদ্বীপ; স্পেন দেশটা এই আইবেরিয়ান্ উপদ্বীপেরই একটা অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের ভারতবর্ষে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার চল্‌তি, ঠিক ততটা না হলেও স্পেনের অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই বটে। যে যে জায়গার ভাষা ঠিক খাটী স্প্যানিশ ভাষা থেকে, বিভিন্ন,

সেই-সেইখান্‌কার লোকেরা অনেকদিন ধরেই নিজেদের একটু আলাদা আলাদা মনে করে আস্‌ছে। তাদের মনোগত ইচ্ছা স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা দেশ, আলাদা জাতি গড়ে তোলে। এই জায়গাগুলির ভিতর দু'টির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বাস্ক্‌ আর ক্যাটালোনিয়া। বাস্ক্‌ বিস্কে-উপসাগরের উপর, আর ক্যাটালোনিয়া ভূমধ্যসাগরের ধারে। এই শেষেরটি হচ্ছে স্পেনের সব চাইতে উন্নতিশীল প্রদেশ—যার রাজধানী বার্সিলোনা কল-কারখানার দৌলতে খোদ্‌ ম্যাড্রিডের ওপরেও টেক্কা মেরে চলে।

খুব অল্প কথায় স্পেনের গত হাজার-খানেক বছরের ইতিহাসটাও তোমাদের শুনিয়ে দেওয়া যাক্‌। সপ্তম শতাব্দীর কথা, আফ্রিকার মরোক্কো দেশে মূর নামে এক জাত, আরব-সভ্যতার আওতায় এসে প্রবল হয়ে উঠেছে। এপারে মরোক্কো, ওপারে স্পেন, মাঝখানে ভূমধ্যসাগর। সেই ভূমধ্যসাগর পার হয়ে মূরেরা চলে এল স্পেনে। স্প্যানিয়ার্ড্‌রা (স্পেনের লোক) এই নবাগত বিদেশীদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ল না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত দেশটাই মূরদের হাতে এসে পড়ল। তার পরে অবশ্য স্প্যানিয়ার্ড্‌রা দেশের উত্তরে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে কোনমতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখ্‌ছিল। মূরদের হাতে এসে স্পেনের চেহারা যে ফিরে গিয়েছিল প্রত্যেক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই এ কথা স্বীকার করবেন—চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে এরিষ্টট্‌ল্‌-প্লেটোর জ্ঞানসম্ভার নতুন করে ইয়োরোপকে শেখান হতে লাগ্‌ল, কারুকার্য্যখচিত সুন্দর সুন্দর ইমারৎ দর্শকের চোখ বিমোহিত করে দিল। শ' তিনেক বছর ধরে মূরদের রাজত্ব পূরাদমে চলেছিল, তার পরই সুরু হল তাদের পতনের যুগ—স্প্যানিয়ার্ড্‌দের সঙ্গে যুদ্ধে আস্তে আস্তে তারা পেছু হট্‌তে আরম্ভ করে দিল। তার পর ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে রাণী ইজাবেলা এবং রাজা ফার্ডিনাণ্ড্‌ (তাঁরা স্বামি-স্ত্রী) মূরদের শেষ রাজ্য গ্রানাডাও দখল করে নেন। তার ফলে মূর-রাজত্বের চিহ্ন স্পেন থেকে একদম্‌ লোপ পেয়ে গেল।

রাণী ইজাবেলা বড় সামান্য নারী ছিলেন না, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন থেকে যাবে। বহু দিন ধরেই ইয়োরোপে "প্রাচ্য দেশের" ধন-রত্নের গল্প ঠিক প্রবাদ-বাক্যের মতই চলে আস্‌ছিল। সে সব ধনরত্ন পাইয়ে দেবার ভরসা দিয়ে কলম্বাস্‌ এই রাণী ইজাবেলারই সাহায্যে জল-পথে "প্রাচ্যদেশ" আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়েন। প্রাচ্যদেশ আবিষ্কার হল না বটে, কিন্তু আবিষ্কার হ'ল "হিস্পানিয়া" বা আমেরিকা। সেই থেকেই স্পেনের অভ্যুদয়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন হয়ে গেল, স্পেন ক্রমে হয়ে দাঁড়াল ইয়োরোপের সর্ব্বপ্রধান রাজ্য, যার নামে চারদিকে থরহরি কম্প পড়ে যেত। কিন্তু একাদিক্রমে সৌভাগ্যভোগ দুনিয়ায় কম দেশের বরাতেই জোটে, ধীরে ধীরে স্পেনেরও পতন আরম্ভ হল। তার পর ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমস্ত সাম্রাজ্য হারিয়ে স্পেন হয়ে দাঁড়াল ক্ষুদ্র একটী নগণ্য

রাজ্য। এখন পর্য্যন্ত তার সে অবস্থার বেশী কিছু উন্নতি হয় নি। এই হ'ল নিতান্ত দু'কথায় স্পেনের একটা মোটামুটি ইতিহাস। এবার জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে ধরা যাক্‌।

একটা কথা তোমাদের গোড়াতেই জানিয়ে রাখা দরকার; গত মহাযুদ্ধের আগে অবধি বরাবর, এবং তার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত স্পেনে চলে আস্‌ছিল রাজতন্ত্র, মানে রাজা নিজেই দেশ শাসন করতেন। ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রের সঙ্গে কিন্তু এ-রাজতন্ত্রের অনেক তফাৎ, কেননা ইংল্যাণ্ডের রাজা শাসন-ব্যাপারের সমস্তই দেশের লোকেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু স্পেনের রাজা সব ক্ষমতা রেখে-ছিলেন নিজেরই হাতের মুঠোর ভিতর। ইয়োরোপের নানা দেশে গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসির হাওয়া যখন বইতে সুরু করল তখন সে হাওয়া স্পেনেও এসে পৌঁছাল। কেউ কেউ আবার গণতন্ত্রের আন্দোলনের সঙ্গে কুলি-মজুরদের দলবদ্ধ করবার জন্য নানা রকম 'ইউনিয়ান' গড়ে তোল্‌বারও চেষ্টা দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

কলম্বাস্‌

ফলে ধর্ম্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি ক্রমেই বেড়ে চল্ল। স্পেনের রাজ-সরকার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন; অনেক লোক জেলে গেল, স্পেন থেকে অনেককে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কিন্তু গোলমাল তাতেও থাম্‌ল না।

নিজেদের ভিতর গোলমাল যখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে তখন অভ্যুদয় হ'ল এক সৈনিক-পুরুষের, তাঁর নাম প্রাইমো-ডি-রিভেরা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি নিজের হাতে নিয়ে ফেল্লেন দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব—অর্থাৎ একেবারে মুসোলিনি-হিট্‌লারের মত "ডিক্টেটারী" ক্ষমতা। কিন্তু তাঁর এই ডিক্টেটারী শাসনের পেছনে জনমত না থাকায় সে শাসন স্থায়ী হ'ল না, গোলমাল বেড়েই চল্ল। শেষটাতে রাজা আলফোন্‌সো সিংহাসন ছেড়েছুড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। স্পেন সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে দিল।

এইবার স্পেনের সাধারণ-তন্ত্রটিকে বুঝতে হলে ওখানকার পার্লামেণ্ট "কর্টেসে"র একটু

খবর নেওয়া দরকার। মোটামুটি পার্লামেণ্টে দুটো প্রতিপত্তিশালী ভাগ—একটিকে এক কথায় বলা যেতে পারে ডানপন্থী, অপরটিকে বামপন্থী। ডানপন্থীরা সমাজে কোন বড় রকমের পরিবর্ত্তন আন্‌তে নারাজ—তাদের মধ্যে রাজতন্ত্রী (যারা রাজার আমোল ফিরিয়ে আন্‌তে চায়), ফ্যাসিষ্ট (যারা মধ্যবিত্তদের প্রাধান্য দেখতে চায়), প্রভৃতি অনেক ছোট ছোট দল আছে। বামপন্থীরা ঠিক এর উল্টো, তাদের ইচ্ছা সমাজে একটা আমূল পরিবর্ত্তন নিয়ে আসা। এই দুই ভাগের মাঝামাঝি আরও কতগুলি ছোটখাটো দল আছে। প্রথম বারের ইলেক্‌সন বা সাধারণ নির্ব্বাচনে বামপন্থীদের জয় হ'ল, সিনর আজানা নামে এক ভদ্রলোক প্রধান মন্ত্রী হলেন। স্পেনে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যাই বেশী, বড় বড় ক্যাথলিক মঠগুলি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। আজানা কর্ত্তা হয়েই পাদ্রীদের মঠের অনেক সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। পাদ্রীরা তাই বামপন্থীদের উপর গোড়া থেকেই অসন্তুষ্ট ছিল; কাজেই দ্বিতীয়বারের নির্ব্বাচনে যখন ডানপন্থীদের জয় হল, তখন তারা পরোক্ষভাবে যোগ দিল সেই দলেই। বামপন্থীরা দেখ্‌লে ডানপন্থীদের জব্দ করতে হলে তাদেরও একতাবদ্ধ হতে হবে; তারা তখন "পপুলার ফ্রন্ট্‌" নামে এক সম্মিলিত দলের সৃষ্টি করল। গত বছরের প্রথম ভাগে যখন ইলেক্‌সন্‌ বা সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তখন দেখা গেল 'পপুলার ফ্রন্ট্‌' দলই বেশী ভোট পেয়ে জিতেছে।

নির্ব্বাচনে হেরে গিয়ে ডান-পন্থীরা কিন্তু আশা ছেড়ে দিল না, গোপনে তাদের মধ্যে পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল। স্পেনের সাধারণ সৈন্যেরা একটু ঢিমে-তেতালা গোছের, তার উপর এত দিনকার অব্যবস্থার ফলে লড়াইয়ের হাতিয়ারগুলোও ছিল তাদের সেকেলে ধরণের, কিন্তু "ফরেন লিজিয়ন্‌" নামে সৈন্যবাহিনীর যে একটা ভাগ ছিল তাতে ভর্ত্তি হ'ত এসে বিদেশী পেশাদারী সৈন্যেরা। এ বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। তাঁর হেড্‌কোয়ার্টার ছিল মরোক্কোতে। সরকারী চাকুরে হলেও ফ্রাঙ্কো ডান-পন্থী, মরোক্কোতে বসে বসেই তিনি বাছা বাছা লোক আর আধুনিক হাতিয়ার নিয়ে সুন্দর একটি দল গড়ে তুল্‌লেন। তারপর পূর্ব্ব পরামর্শমত যখন সবই ঠিকঠাক, হঠাৎ তখন একদিন ফ্রাঙ্কোর 'ফরেন লিজিয়ন' মরোক্কোর সমস্ত সরকারী অপিস দখল করে বিদ্রোহীদের পতাকা উড়িয়ে দিল, অর্থাৎ আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারকে সরিয়ে বিদ্রোহী-সরকার প্রতিষ্ঠিত করল। এদিকে দেশেও কলকাঠি টেপা ছিল, তার ফলে দেশের নানান্‌ জায়গায় ডান-পন্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফেল্ল। সরকারি সৈন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই প্রথম ধাক্কাতেই দক্ষিণে আন্দালুসিয়া এবং উত্তরে পুরানো ক্যাষ্টাইল, লিয়ঁ গ্যালেসিয়া প্রভৃতি জায়গায় হটে গেল—এ জায়গাগুলিতেও বিদ্রোহী-গভর্ণমেণ্টেরই পত্তন হ'ল।

বিদ্রোহীদলের এবার লক্ষ্য গেল একটু একটু করে নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে। কিন্তু এদিকে সরকারি দলও অটল, বিনা যুদ্ধে তারা একটি ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজী নয়। উত্তরে

সান সিবাষ্টিয়ান্‌, সান টেণ্ডার, বিল্‌বাও প্রভৃতি বাস্ক্‌-অঞ্চলগুলো ফ্রাঙ্কোর হাতে এসেছে বটে, কিন্তু অনেক রক্তক্ষয়ের পরে।

ফ্রাঙ্কো-দলের এতটা সাফল্যের একটা কারণ হচ্ছে ইটালী এবং জার্ম্মেনী থেকে আমদানী অস্ত্র-শস্ত্র এবং এরোপ্লেন। অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর মানে ওখানকার সাধারণ ব্যবসাদারদের কাছ থেকেই আমদানী। ফ্রাঙ্কো ফ্যাসিষ্ট, কাজেই তাঁর সুবিধা হলে, ওই ব্যবসাদারদেরও আখেরে সুবিধা ঘট্‌তে পারে। সাফল্যের আর একটি কারণ ফ্রাঙ্কোর মূর-সৈন্য। অনেক রকম সুখ-সুবিধার ভরসা পেয়ে মূর-সৈন্য বহুদিন বাদে আবার স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে পা দিয়েছে।

খবরের কাগজে দেখা যায় দলে দলে সাধারণ শ্রেণীর লোক সরকার-পক্ষে যোগ দিচ্ছে। স্পেনের ছেলেপেলেদের আজকাল চরম দুরবস্থা। এরোপ্লেন থেকে বোমা পড়ায় ঘর-বাড়ী বলে আর কিছু নেই, বাপ-দাদারা যুদ্ধে মৃত, কাজেই অভিভাবকও নেই। "পাব্‌লিক্‌ কিচেনের" খাবারে কোন মতে জীবনটা বাঁচিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানই এখন তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিল্‌বাও-এর পতনের আগে কয়েকজন সদাশয় ইংরাজ দয়া করে এই ধরণের দু' তিনশো বালককে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে এসেছেন।

বিদেশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র এবং স্বেচ্ছা-সৈন্যের আমদানী চলতে থাক্‌লে ভবিষ্যতে হয়তো যুদ্ধের আগুন সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মেনীকে অনুরোধ করেছে, আইন করেই হোক বা যে করেই হোক্‌ এটি বন্ধ করতে। ইটালী এবং জার্ম্মেনীও কথা দিয়েছে অস্ত্র-চালান নিষিদ্ধ করে দেবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও লুকিয়ে লুকিয়ে এখনও যে অস্ত্র আস্‌ছে খবরের কাগজে প্রায়ই এমন খবর দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আজ প্রায় দেড় বছর হ'ল এই ঘরোয়া বিবাদ সুরু হয়েছে। ম্যাড্রিড্‌ ও বার্সিলোনা সরকারের হাতে। ম্যাড্রিড্‌ থেকে রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ভ্যালেন্‌সিয়ায়। স্পেনে যে কত দিনে ফের শান্তি ফিরে আস্‌বে, বলা শক্ত।

ভাড়াটে—মশাই, আপনার বাড়ীর ছাদ দিয়ে জল পড়ে যে!

বাড়ীওয়ালা—কি কর্‌ব বলুন, ঐ ভাড়ায় তো জলের বদলে সরবৎ ফেলা সম্ভব নয়!

শ্রীমমতা সেন

"অয়েল-পেণ্টিং"

[একাঙ্ক নাটিকা]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

কুশীলব

সদাশিব বাবু	···	ধনী জমীদার	দাশু, ভীম, সতীশ, ভোঁদা,
ভজহরি	···	ঐ ভৃত্য	কালু, উপেন, হরি প্রভৃতি
গদাই, বলাই, নিমাই	···	সদাশিব বাবুর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়	—সদাশিব বাবুর আশ্রিত
			অন্যান্য লোক

প্রথম দৃশ্য

[সদাশিব বাবুর বাড়ীর একটি ঘর। ভিতরে একটা ফরাসে শুইয়া বলাই নাক ডাকাইতেছে, নিমাই অদূরে বসিয়া একা-একাই দাবা খেলিতেছে।]

নিমাই—(অট্টহাস্য করিয়া) এইবার ! নাও যে বোর্‌ল !

(বলাই পাশ ফিরিয়া শুইল, নাকের গর্জ্জন বাড়িতে লাগিল। আবার খানিকক্ষণ চুপ্‌চাপ্, শুধু দেওয়ালে একটা ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ।)

নিমাই—ব্যস্, এইবার দাবা সামলাবে কেডা ?

(গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে গদাই-এর প্রবেশ)

গদাই—
দক্ষিণ হ'তে এল বুড়ো লম্বা লম্বা দাড়ি,
কল্‌কাতাতে এসে বুড়ো কিন্‌ল মোটর-গাড়ী।
মোটর চড়ে বুড়ো ঘোরে লালদীঘিরই ধারে—

নিমাই—(বিরক্ত হইয়া) আরে কী পেচাল পার রাইত-দিন। থুইয়া দেও তোমার মাণিক-পীরের গান ! তার চাইয়া আস, এক হাত দাবায় বস, প্রাণডা ঠাণ্ডা হইবো—যারে বলে 'নেটিভ প্রিন্স অব্ গ্যাম্'।

বলাই—(নাকের গর্জ্জন বন্ধ করিয়া হাই তুলিতে তুলিতে) দাওয়ায় বসে কি আর প্রাণ ঠাণ্ডা হবে দাদা, এক কাপ্ চায়ের যোগাড় দেখ। ভজা গেল কই ? ওরে ভজা—ভজা—আ ! বেটার কি আর টিকি ত্যাখবার যো আচে ! এ বাড়ীতে তো শাসন বলে কিস্যু নেই !

নিমাই—যা কইছ রে ভাই। তুই বেটা চাকর, থাকবি চাকরের ল্যাখান। আমরা হইলাম গিয়া বাবুর নিকট-আত্মীয়, আমাগো কাছে তুই রবি যোর হাত কইরা।

বলাই—(উঠিয়া) ভজা ! ওরে ভজা ! বাবা ভজহরি !

গদাই—
ভজা ভজা করা মিছে, ভজার তো সাড়া নাই,
হাড় হ'ল ভাজা ভাজা তবু তার সাড়া নাই।
ভজার তো সাড়া নাই !
ভজা শুধু লোটে মজা, সাজা তারে দেওয়া চাই,
সাজা তারে দেওয়া চাই !

নিমাই—আরে থাম মশয়, খালি শোলোক আর শোলোক !

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজ—আজ্ঞে আমাকে ডেকেছেন ?

বলাই—চা—চা—চানো।

ভজ—চান করবেন ? বেশ, কূয়োয় অনেক জল আছে, তিন জনের খুব হবে।

নিমাই—কী ! মস্করা পাইছ ! কার সঙ্গে কথা কও জান না, চেন না আমাগো ?

বলাই—কেন বাপু, চাঁটী খাবে, লক্ষ্মী ছেলেটির মত গুটি গুটি রান্নাঘরে যাও।

ভজ—আজ্ঞে, সেখানে কি যাওয়ার উপায় আছে ? বামুন ঠাকুরকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে, তাঁকে সেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ঘৌ-ঘৌ করছেন। আজ রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ।

নিমাই—(সন্দিগ্ধ স্বরে) আরে কি কও ছাতা-মাতা ?

গদাই—
ছাতা মাথায় দিয়ে গেলেও বামুন ঠাকুর ছাড়বে না,
কামড়ে দেবে ঘাড়ের কাছে ক্ষ্যাপার সাথে পারবে না।
পারবে না পারবে না,
ক্ষ্যাপার সাথে পারবে না।

বলাই—তাই তো ভজ, বড় বিপদে ফেল্লে দেখছি ! তা তোমার বাবুর জন্যে তো এষ্টোপ জ্বালিয়ে যখন-তখন চা কর, তাই একবারটি—

ভজ—(জিভ কাটিয়া) কী যে বলেন, বাবুর সঙ্গে—

(নেপথ্যে—ভজা ! ভজা !)

ঐ কর্ত্তা আসছেন, আমি যাই।

(সদাশিবের প্রবেশ)

সদা—ভজা! এই যে তুই এ এখেনে আড্ডা মারছিস বেটা টিকটিকি! আর আমি সারা বাড়ী টহল দিচ্ছি! আমার কলকে কে চুরি করেছে বের কর্ ছুঁচো।

ভজা—কলকে চুরি!

বলাই—বলেন কি জ্যাটামশাই, কলকে চুরি গ্যাচে?

গদাই—গড়গড়ার কলকে? রূপোর কলকে মামাবাবু?

বলাই—সোনা-বাঁধান কল্কে জ্যাটামশাই?

নিমাই- ইস্, তালুই মশাইর কইল্কা শুদ্ধু চুরি কইরা নিল!

সদাশিব—(চীৎকার করিয়া) এ আমি সহ্য কর্ব না বলে দিচ্ছি, কাল আমার হাঙ্গর-মুখো ছড়িখানা গেছে, পরশু গেছে কি বলে ওর নাম কি—

বলাই—সিল্কের চাদর?

সদা—না না।

নিমাই—বালাপোষ?

সদা—না না না, কি বলে আঃ, ওর নাম কি—

গদাই—নিকার-বোকার?

সদাই—উঁহু উঁহু! (হঠাৎ থামিয়া) য়ঁ্যা য়ঁ্যা, কি বল্লে, কি বল্লে? আমি পর্ব নিকার-বোকার, আমি!

বলাই—য়ঁ্যা য়ঁ্যা, কি বল্চ—যা মুখে আসে তাই? নিকার-বোকার পড়বেন উনি? বাড়ীর কত্তা, তিনি পড়বেন নিকার-বোকার? বলতে লজ্জা কর্ল না, মাটীর সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হ'ল না?

সদা—ব্যাদব ছোকরা! আমার সঙ্গে ঠাট্টা! গিরগিটি, ছারপোকা, জংলী—অ—অ—অ—

বলাই—অসভ্য?

সদা—না না, অ—অ—অ—

নিমাই—অগা?

সদা—না না, না না, অ—অ—অ—অ—

গদাই—অবিমৃষ্যকারী?

সদা—না না, অ—অ—অ—

নিমাই—অর্ব্বাচীন?

বলাই—অকৃতজ্ঞ?

সদা—না না, ঐ যে—ঐ যে—অ—অ—অ

গদাই—অনড্বান্?

সদা—হঁ্যা হঁ্যা, ঠিক ঠিক। হতভাগা অনড্বান্, ছুঁচো, বেজী, ইঁদুর, আ—আ—আ—আ

ভজ—ঐ তো আপনার হাতেই তো কলকে রয়েছে হুজুর!

সদা—(সাশ্চর্য্যে) আরে তাই তো! কে দিল আমার হাতে গুঁজে?

বলাই—তাই তো কে দিল!

নিমাই—কে ডা দিল? কও দেখি তামসা!

গদাই—সত্যিই তো, কার এমন সাহস, মামাবাবুর হাতে কিনা কলকে গুঁজে দেয়! লোক চেনে না!

(সদাশিব বাবু আরাম করিয়া তাকিয়া টানিয়া বসিলেন। ভজা গড়গড়া লইয়া আসিল। তিনি তা'তে ধীরে ধীরে টান দিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তাঁর মুখে মৃদু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল)

সদা—(ঈষৎ সলজ্জ ভাবে) আজ আসছে।

বলাই—কি আসচে জ্যাটামশাই?

গদাই—(ধমক্ দিয়া) কি আসছে! লজ্জা কর্ল না জিজ্ঞেস কর্তে? আজ তিন দিন ধরে আমার ওর জন্য ঘুম হচ্ছে না—দুপুর রাতে কোথাও খুট্ করে একটু আওয়াজ হ'লে ধড়মড়িয়ে উঠি—মনে হয় ঐ বুঝি এল! গ্রামশুদ্ধ লোক ওর জন্যে অধীর হয়ে বসে আছে, আর তুই এতক্ষণে জিজ্ঞেস করছিস্ 'কি আসবে'! লজ্জা কর্ল না ও কথা বলতে! মাটীর সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা কর্ল না কেঁচোর মত! ছ্যা ছ্যা—"

নিমাই—যা কইছ রে ভাই। আমারও তো আহার-নিদ্রা য়্যাক্কেকালে ঘুইচা গেছে। খাইমু কি, ঘুমাইমু কি—থাইকা থাইকা দরজার দিকে ছুইটা যাই—ঐ বুঝি আইল, ঐ বুঝি আইল!

বলাই—(কাঁচুমাচু মুখে) ও, বুঝেছি জ্যাটাবাবুর—কি বলে আহা ঐ যে—

সদা—ওরা আমার ছবির কথা বলছে, সেদিন কল্কাতায় ওর নাম কি—উল্—উল্—উল্—

গদাই—উল্ফ্, ফক্স এণ্ড জ্যাকল্ কোম্পানীতে মামাবাবুর অয়েল-পেন্টিং করতে দেওয়া হয়েছে—সেইটাই আজ আসবে। ভোঁদা তো সেই শেষ রাত্রে উঠে ইষ্টিশানে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে—আমিই তো পাঠালাম। নিজেই যেত্যম, কিন্তু ছবি এলে কোথায় টাঙ্গানো হবে তার ব্যবস্থাও তো আগেই করতে হবে! আপনি আসবার আগে মামাবাবু, আমাদের সেই কথাই তো হচ্ছিল! এর মধ্যে ভুলে গেলি বলাই, কি ভোলা-মন তোর!

বলাই—ভুল্‌ব ! য়্যাঁ ? কী যে বল্‌চ গদাই দা ! ঐ কথাই তো রাত্দিন মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে—কি করে মগজটা একটু পেঁচিয়ে গিছ্‌ল—নইলে যারা সকাল থেকে আমাদের শুধু ঐ কথা—

নিমাই—হ, হ, হ, ঠিক—সেই বেয়ান হইতে—

(ভোঁদা ও আর কয়েক জন মিলিয়া ধরাধরি করিয়া একটা বিরাট্‌ অয়েল-পেন্টিং লইয়া ঘরে ঢুকিল)

বলাই—(লাফাইতে লাফাইতে) এসেচে—এসেচে—এসেচে !

নিমাই—আইছে, বাচাইছে। অ হইরা, অ সতীশা, অ কাউলা, অ দাউশা, অ বীমা, অ ওপীন দা,—আরে শীগ্‌গির আয়—তরন্ত আয়—দ্যাখ্‌ আইসা কি আইছে !

গদাই—(দৌড়াইয়া ছবির কাছে গিয়া)—মামাবাবু, মামাবাবু ! (হঠাৎ পিছনে তাকাইয়া সদাশিব বাবুকে দেখিয়া) ও আপনি এখানে ! সত্যি বলছি, কোন্‌টা আসল মামাবাবু, কোন্‌টা ছবি বুঝতে পারি নি !

(কাছা-খোলা অবস্থায় হন্তদন্ত করিতে করিতে দাশু, হরি, সতীশ, কালু, ভীম, উপেন্দ্র ও ভজার প্রবেশ এবং ছুটিয়া ছবির কাছে গমন)

সতীশ—কই—কই—কই ?

দাশু—কি আশ্চর্য্য ! কী অদ্ভুত !

ভীম—খাসা হাত, খাসা হাত।

বলাই—হবে না বাওয়া, সায়েবের আঁকা ছবি ! এ কি ব্যাঙ্গালী পেয়েচ ?—ফোঃ।

নিমাই—কি খারাটাই খারছে ! ফার্ষ্টো কেলাস্‌ !

উপেন—মুখের হাসিটা দেখেছ—এ একেবারে এ বাড়ীর মার্কা-মারা হাসি ! সাহেবের বাহাদুরী আছে, কি বল হরি, দেখ্‌ছ না ?

হরি—দেখছি না আবার ! তিরিশ বছর ধরে এ বাড়ীতে কাজ করে আসছি—আমি দেখ্‌ব না তো দেখবে ও পাড়ার হারু গয়লা ? বুড়ো কত্তার হাসিটিও যে ছিল অবিকল ঐ রকমের।

দাশু—আশ্চর্য্য কাণ্ড !

সতীশ—আশ্চর্য্য কাণ্ড !

ভীম—আশ্চর্য্য কাণ্ড !

বলাই—হবে না, এ কি রামা-শ্যামা-যেদোর ছবি, না রামা-শ্যামা-যেদোকে দিয়ে আঁকান হয়েচে ?

দাশু—তা সত্যি—

সতীশ—হ্যাঁ সত্যি।

ভীম—সত্যিই তো !

গদাই—মামাবাবু, সায়েবকে আরও কিছু টাকা বখসিস্‌ দিয়ে দিন—গুণীর আদর হবে, বিলেতে গিয়ে আপনার নামও করবে দশজনের কাছে।

উপেন—আমি শুধু দেখছি থুৎনির আদলটা, কি ক'রে আন্‌লে তুলিতে ! ফটো তো নয়, দস্তুরমত হাতে আঁকা। ধন্যি বিদ্যে শিখেছিল বলতে হবে !

কালু—হাজার হোক, সাদা চামড়ার জাত্‌, ওদের কাণ্ডই আলাদা।

(সকলে অভিনিবেশ সহকারে ছবি দেখিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে "আ-হাহা", "মরি মরি", "ধন্যি ধন্যি"—প্রভৃতি বিস্ময়সূচক শব্দ করিতে লাগিল।)

(পিয়নের প্রবেশ)

পিয়ন—বাবু, একঠো তার হ্যায়।

সদা—(ব্যস্ত হইয়া) তার ? কই দেখি ? এখন আবার তার আসবে কোথাসে ? (সই করিয়া), চোখেও দেখি না—গদাই পড় তো !

(পিয়নের প্রস্থান)

গদাই—(টেলিগ্রামখানি লইয়া) এ যে উল্‌ফ্‌, ফক্স এণ্ড্‌ জ্যাকল্‌ কোম্পানীরই তার দেখছি ! (সকলে জিজ্ঞাসুনেত্রে ফিরিয়া চাহিল)।

সদা—কি লিখেছে দেখ তো ? বাংলা ক'রে বল।

গদাই—(টেলিগ্রাম পড়িতে লাগিল) "ডিয়ার স্যার, প্রিয় মহাশয়, দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি, আজ আপনাকে যে ছবিটা পাঠান হইয়াছে উহা"—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ, এ কি লিখছে ! ওটা নাকি আপনার ছবি নয়, আর এক ভদ্রলোকের ছবি ভুল করে পাঠিয়েছে—আপনারটা কাল পাঠাবে !"

(সমবেত কণ্ঠের তুমুল একটি 'য়্যাঁ'-ধ্বনিতে ঘর কাঁপিয়া উঠিল)

যবনিকা পতন *

---

* একটি বিদেশী গল্পের সামান্য ছায়া লইয়া

জীবাণুর জন্মকথা

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি, বি.ই. এস্)

কলেরা, টাইফইড্ প্রভৃতি কতকগুলি রোগ যে জীবাণু হইতে জন্মায়, তা বোধ করি তোমরা অনেকেই জান। আগেকার লোকেরা কিন্তু এ খবর রাখিত না—তথ্যটি দুনিয়াকে প্রথম শুনাইলেন লুই পাস্তর নামে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক (Louis Pasteur : ১৮২২—১৮৯৫)।

সমস্ত মানব-জাতির বন্ধু হিসাবে পাস্তরের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। সিমলার কাছে কসৌলিতে, শিলঙে এবং কলিকাতায় পাস্তর ইনষ্টিটিউট্ তৈরী হইয়াছে—কাউকে ক্ষ্যাপা শেয়াল-কুকুরে কামড়াইলে চিকিৎসার জন্য এই সব পাস্তর ইনষ্টিটিউটে লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতায় এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রায় সমস্ত বড় বড় সহরেই আজকাল দুধকে 'পাস্তরা-ইজড্' করারও চলন হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় দুধকে জীবাণুশূন্য করা হয়; তাই সে দুধে কোন অসুখের ভয় থাকে না।

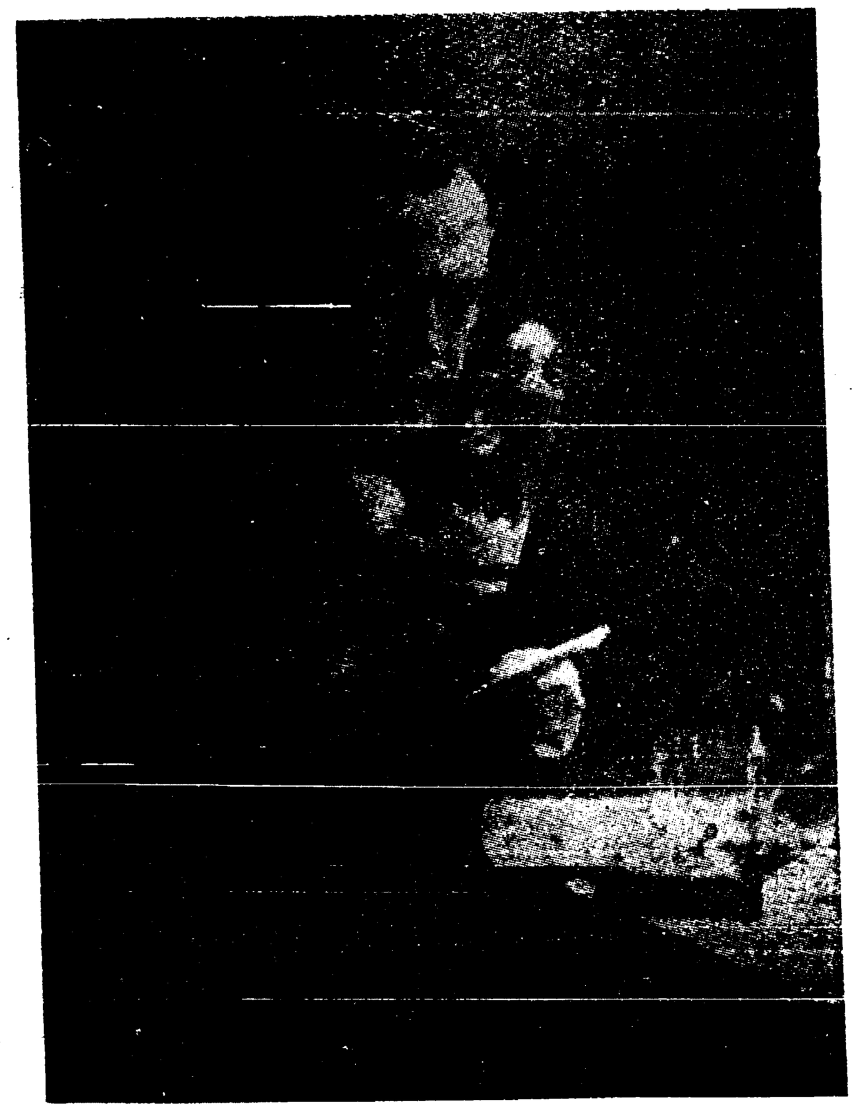

লুই পাস্তর

পাস্তর তখন সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁর গুরুর কাছে সমাধানের জন্য একটি সমস্যা আসিয়াছে; একজন বুদ্ধিমান্ লোকের উপর এ কাজটির ভার দিতে হইবে। সমস্যাটি এই রকমের—

ফ্রান্সের দক্ষিণ দিক্‌টায় খুব রেশমের চাষ। রেশমের চাষ বলিতে মনে করিও না যেন, যে মাটীতে রেশমের গাছ হয় আর সেই গাছে রেশম জন্মে। চাষীরা মাটীতে চাষ করে তুঁতগাছের (Mulberry Tree)। তুঁতগাছের ফল বেশ মিষ্টি মিষ্টি, কষা কষা, ছেলেদের ভারী প্রিয়। যাক্ সে কথা—গাছ জন্মিলে চাষারা সেই গাছের পাতা সংগ্রহ করে; তারপর সেই পাতাগুলি সরু সরু করিয়া কাটিয়া ডালার (Tray) উপর বিছাইয়া দেয় আর সেই পাতার কুচির উপর ছড়াইয়া দেয়—রেশম-পোকার বাচ্চাগুলিকে। তুঁতের পাতা খাইয়া বাচ্চারা দিব্যি 'পুষ্ট' হইতে আরম্ভ করে। বেশ খানিকটা বড় হওয়ার পর তাদের খাওয়ার ইচ্ছা আস্তে আস্তে কমিয়া আসে, শেষে একদম বন্ধ হইয়া যায়। তখন তারা মুখ হইতে বাহির করিতে থাকে এক রকম লালা; বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া সেই লালা সূতার মতন শক্ত হইতে থাকে। এইগুলিই রেশমের সূতা। রেশম-পোকারা এই সূতা দিয়া নিজের দেহটিকে ঘিরিয়া ফেলিয়া একটি গুটি তৈরী করে, তার পর সেই গুটির মধ্যেই বাস করিতে থাকে। কেউ যদি সেই গুটিটির কোন অনিষ্ট না করে তবে পোকাগুলি সেই গুটির মধ্যেই কিছুদিন ঘুমাইয়া থাকিবে, তার পর সূতার গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। এই সময় ইহাদের ডানা গজায়—প্রজাপতির আকারে উড়িতে আরম্ভ করে। (সচরাচর বাগানে আমরা যে প্রজাপতি দেখি তারা শুঁয়াপোকার প্রজাপতি, তারা ভাল গুটি বাঁধিতে পারে না) রেশম-পোকার লালা বা রেশমী সূতাই হইল তাদের কালস্বরূপ। এই রেশমের লোভেই মানুষ গুটিশুদ্ধ পোকা-গুলিকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে—উদ্দেশ্য সূতার গুটি কাটিয়া তারা যাতে বাহির না হইতে পারে।

এখন চাষাদের কি সমস্যা হইল শোন; তারা লক্ষ্য করিল, রেশম-পোকাগুলির মধ্যে কি এক রোগ দেখা দিয়াছে যার ফলে তারা একে একে মরিতে সুরু করিয়াছে। মহা মুস্কিল, রেশম আর হয় না, চাষাদের হাঁড়ি বন্ধ। এমন একজন লোকের দরকার যে এই রোগ ধরিতে পারে, পোকাদের মৃত্যু রদ করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজের জন্য পাঠাইলেন পাস্তরকে।

তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রস্কোপের আবিষ্কার হইয়াছে—কি করিয়া আবিষ্কার হইল সে গল্পটি ভারী মজার, দু'কথায় আগে সেটি বলিয়া নিই। শোনা যায় লিউয়েনহোক নামে একজন ওলন্দাজ চশমা-নির্ম্মাতাই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কারক। চশমা তৈরী করিতে এক টুকরা লেন্স্ বা কাচকে প্রথমে মোটা দানার, তার পর সরু দানার পাথরে ঘষিতে হয়। এই লেন্স্ হইতেই হয় চশমা, অর্থাৎ চোখের সাম্‌নে এগুলিকে ধরিলে ছোট অক্ষরকে বড় দেখায়। একবার ভদ্রলোক, দু'খানি লেন্সের ভিতর দিয়া তাকাইয়া দেখিলেন অক্ষরগুলি আরও বড় বড় হইয়াছে। তখন তাঁর মাথায় খেয়াল আসিল—যদি একটা চোঙ্গার ভিতর পর পর খান কয়েক লেন্স্ সাজান যায় তবে নিশ্চয়ই সেগুলির ভিতর দিয়া যে কোন ছোট জিনিষকেই অনেকখানি বড় বলিয়া মনে হইবে। এই খেয়াল হইতেই প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি। পরে অবশ্য অনেক লোকের চেষ্টায় আজকালকার কার্য্যকরী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিকাশ হইয়াছে।

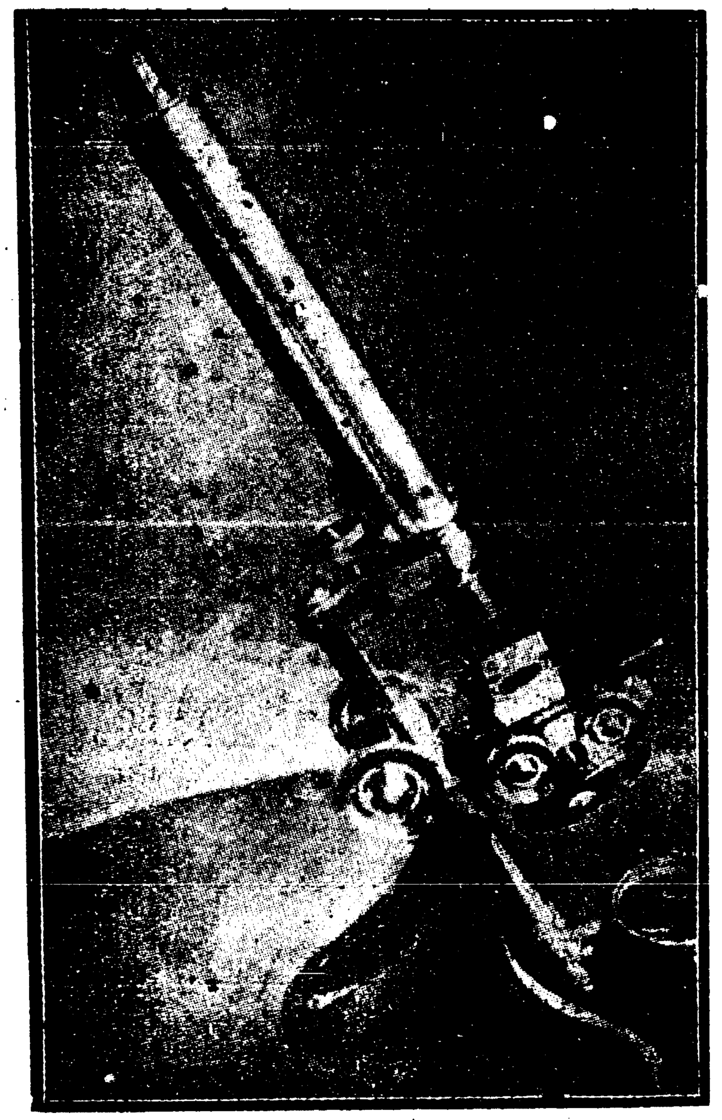
অণুবীক্ষণ যন্ত্র

যে কথা বলিতেছিলাম,—পাস্তুর তো নতুন কাজের ভার লইয়া আসিলেন। তিনি করিলেন কি, এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রেশম-কীটের বাচ্চাগুলিকে অনবরত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, তবু তাঁর পর্য্যবেক্ষণের বিরাম নাই, অষ্টপ্রহর শুধু পর্য্যবেক্ষণই চলিতেছে। অনেক সময় উঠিয়া খাইতে যাইবার পর্য্যন্ত অবসর নাই, যন্ত্রের পাশে বসিয়াই যা হোক কিছু মুখে দিয়া লইতেছেন। এইভাবে ক্রমাগত একই অবস্থায় বসিয়া থাকায় ফলে

তাঁর শরীরের একটা দিক্ কতকটা অবশ হইয়া পড়িল, তবুও এ নবীন তপস্বীটির ধ্যান ভঙ্গ হইল না।

এইভাবে পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জ্ঞান-আহরণ সব দেশেই বিজ্ঞান-শিক্ষার একটা প্রধান উপায় বলিয়া মানিয়া নেওয়া হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা কিন্তু বই পড়িয়া জ্ঞান "মুখস্থ" করিতেই বেশী ব্যস্ত। এক ভদ্রলোক জাপানে রেশমের কাজ শিখিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, প্রথম দিন তাঁকে একটা রেশমের পোকা আর এক টুক্‌রা সাদা কাগজ আনিয়া দেওয়া হইল—পোকাটির ছবি আঁকিতে হইবে। দিনের শেষে শিক্ষক মহাশয় আসিয়া পোকা এবং ছবি দুই-ই ফিরাইয়া লইলেন, ছাত্রকে বলিলেন, "বেশ হয়েছে"। পরদিন আসিল, ফের সেই পোকা আর এক টুক্‌রা নতুন সাদা কাগজ—আবার সেই পোকারই ছবি আঁকিতে হইবে। এই ভাবে পর পর দশ দিন সেই একই কাজ; রোজই দিনের শেষে শিক্ষক মশাই আসিয়া ছাত্রের কাজের প্রশংসা করেন। শেষের দিন ছাত্র একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল "একই কাজ রোজ রোজ দিচ্ছেন কেন মাষ্টার মশাই?" মাষ্টার মশাই তখন একটু হাসিয়া প্রথম দিনের ছবি এবং দশম দিনের ছবি আনিয়া ছাত্রের কাছে ধরিলেন; দেখাইলেন, দুই ছবিতে কত তফাৎ! প্রথম দিনে ছাত্রের অনভ্যস্ত চক্ষু যে-সব জিনিষ দেখিতে পায় নাই, শেষ দিনে তার চেয়ে ঢের বেশী জিনিষ দেখিয়াছে।

পাস্তুরেরও কঠোর পর্য্যবেক্ষণের ফল ফলিল—রোগাক্রান্ত পোকা এবং সুস্থ পোকার যে কি পার্থক্য ধীরে ধীরে তা তাঁর চোখে সম্পূর্ণই ধরা পড়িয়া গেল। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন রুগ্ন পোকাগুলিকে যদি সুস্থ পোকার দলে একত্র রাখা যায় তবে সুস্থ পোকার মধ্যেও রোগ ছড়াইয়া পড়ে, ফলে তাদের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু রুগ্নগুলিকে যদি আলাদা করিয়া ফেলা যায় তবে সুস্থ পোকার মধ্যে রোগ আর ততটা দেখা যায় না। রোগাক্রান্ত পোকাগুলিকে তখন তিনি পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন; তার পর চাষাদের ডাকিয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন কি ভাবে রুগ্ন পোকা চিনিতে হইবে। একথাও বার বার তিনি তাদের বলিতে ভুলিলেন না, যে খবর্দ্দার, যেন রোগাক্রান্ত পোকাগুলাকে সুস্থ পোকার সঙ্গে একত্র

মিশান না হয়। পাস্তুরের উপদেশ মত কিছুদিন চলিতেই ফ্রান্সের রেশম-শিল্প আবার জাঁকিয়া উঠিল—চাষারা দু'হাত তুলিয়া পাস্তুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

এই ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তারই উপর ভিত্তি করিয়া পাস্তুর

কলেরার জীবাণু

যক্ষ্মার জীবাণু

টাইফইডের জীবাণু

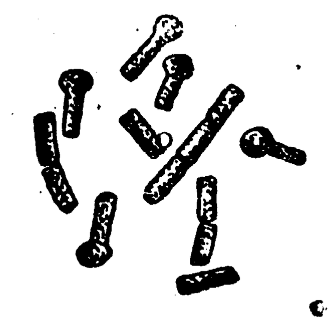

লকৃজ'র জীবাণু

তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন, অনেক রোগ জীবাণু হইতে জন্মায়; আর সেই জীবাণুগুলিও আপনা হইতে জন্মিতে পারে না—মানুষ এবং অন্যান্য জীবের মত তাদেরও পূর্ব্বপুরুষ আছে। ইহারই নাম 'Germ theory of disease'।

ব্যস্, বৈজ্ঞানিক-মহলে একেবারে হৈচৈ পড়িয়া গেল। অনেক বৈজ্ঞানিকেরই সে সময়ে ধারণা ছিল, আমরা যে পচা জল এবং পচা খাদ্যদ্রব্যে নানা রকমের জীবাণু দেখিতে পাই সেগুলি আপনা হইতেই জন্মে। এই মতবাদকে বলা হইত স্বতঃজনন-বাদ বা doctrine of abiogenesis. আমাদের দেশেও এই ধরণের মতেরই চল্‌তি ছিল—যেমন কতকগুলি জীবকে বলা হইত স্বেদজ, অর্থাৎ যারা স্বেদ বা ঘাম হইতে জন্মে। (মনুসংহিতায় ছারপোকাকেও স্বেদজের কোঠাতেই ফেলা হইয়াছে।) কাজেই পাস্তুর যখন প্রচার করিলেন যে লোকের প্রচলিত ধারণা ভুল, জীবই বল, আর জীবাণুই বল, আপনা-আপনি কেউই পৃথিবীতে আসিতে পারে না, তাদের পূর্ব্বপুরুষ থাকিবেই, তখন লোকের একটা আজন্ম সংস্কারে ধাক্কা লাগিল; কাজেই পণ্ডিত-মহলে যে বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইবে তা আর বিচিত্র কি? পাস্তুরের নতুন মত কিন্তু মানিয়া লইলেন ইংল্যাণ্ডের একজন বড় বৈজ্ঞানিক—জন্ টিন্‌ডাল (John Tyndall,

১৮২০—১৮৯৩)। শুধু মানিয়া নেওয়া নয়, নানা রকম প্রমাণ দিয়া দেখাইলেন পাস্তুরের মত অভ্রান্ত।

একটা ঘরের ভিতর যে বাতাস রহিয়াছে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় সে বাতাস বুঝি বেশ স্বচ্ছ, কোন কিছুর কণাই তাতে নাই। কিন্তু টিন্‌ডাল ঘরটিকে একেবারে অন্ধকার করিয়া তার মধ্যে আলোর রশ্মি ফেলিয়া দেখাইলেন, হঠাৎ-দৃষ্টিতে যে বাতাসকে চমৎকার স্বচ্ছ দেখাইতেছিল, তারই মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে—(১) অতিসূক্ষ্ম বালি, মাটী, কয়লা বা অন্য কোন খনিজ বস্তুর কণা, (২) তূলা, রেশম ও পশমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা, (৩) গরু-ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তুর মলের কণা এবং (৪) অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক্‌টিরিয়ার (জীবাণু) বীজ—যাকে ইংরাজীতে বলে spore। তিনি প্রমাণ দিয়া আরও দেখাইলেন, বাটিতে করিয়া একবাটি খাবার রাখিয়া দিলে দু'দিন বাদেই খাবার পচিয়া উঠে তার কারণ বাতাসের ভিতরকার এই spore বা জীবাণুর বীজ সেই খাবারে আসিয়া পড়ে। জল, তাপ এবং খাবার পাওয়ায় সেগুলির উপরকার আচ্ছাদন (বীজত্বক্) ফাটিয়া যায় আর তারই ফলে সেগুলির সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠে। একটা জীবাণু দুই ভাগে ফাটিয়া হয় দুইটি, দুইটি হয় চারিটা—এই ভাবে একদিনের মধ্যেই অসংখ্য জীবাণুর সৃষ্টি হইয়া ঐ খাবার একদম্ পচাইয়া ফেলে। তবে উগ্র রকম উত্তাপ দিতে পারিলে এই জীবাণুগুলিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দেওয়া যায়।

টিন্‌ডালের প্রথম পরীক্ষাটী এই রকম: একটা মুখ-সরু কাচের পরীক্ষা-নলের (test tube) মধ্যে তিনি খানিকটা তরল খাদ্যদ্রব্য পূরিয়া সেগুলি খুব ফুটাইয়া লইলেন। তার পর খানিকটা বাদে তাপ দিয়া নলের সরু মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। (তাপ দিয়া বন্ধ করার মানে এই যে কাচের মুখ-সরু নল আগুনে ধরিলে নলের মুখ নরম হইয়া আপনি বন্ধ হইয়া যায়।) দেখা গেল ভিতরের খাদ্যদ্রব্যে বহুদিনেও পচিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহা হইতে প্রমাণ হইল জীবাণু আপনা-আপনি জন্মিতে পারে না—কেননা তা হইলে তো ভিতরের খাবার ঠাণ্ডা হওয়া মাত্রই জীবাণু জন্মিত!

কিন্তু বিপক্ষ দল দমিলেন না; তাঁরা বলিলেন, "তুমি তো বাপু, নলটিকে

ফুটাইয়া আর মুখ বন্ধ করিয়া সমস্তখানি বাতাসই বাহির করিয়া দিয়াছ, বাতাসের অভাবে জীবাণু আপনা-আপনি জন্মিবে কি করিয়া ?” টিন্‌ডাল তখন আবার এক নতুন পরীক্ষা দেখাইলেন। এবার নিলেন একটি বাঁকা নল; ভিতরে খাবার ভরিয়া নলের মুখে গুঁজিয়া দিলেন খানিকটা তূলা। তার পর ভিতরের খাদ্যদ্রব্যকে ফুটান হইল। দেখা গেল এবারেও ভিতরের খাবার বেশ ভাল আছে। এবার আর কেহ একথা বলিতে পারিল না যে নলের মধ্যে বাতাস ঢুকিতে পাইতেছে না; তূলার ভিতর দিয়া বাতাস ঢুকিতেছে ঠিকই, কিন্তু জীবাণু ঢুকিতে গিয়া বাধা পাইতেছে। কাজেই প্রমাণ হইল ভিতরে জীবাণু আপনা হইতেই জন্মিতে পারে না, বাহিরের জীবাণু আসিয়াই বংশবৃদ্ধি করে।

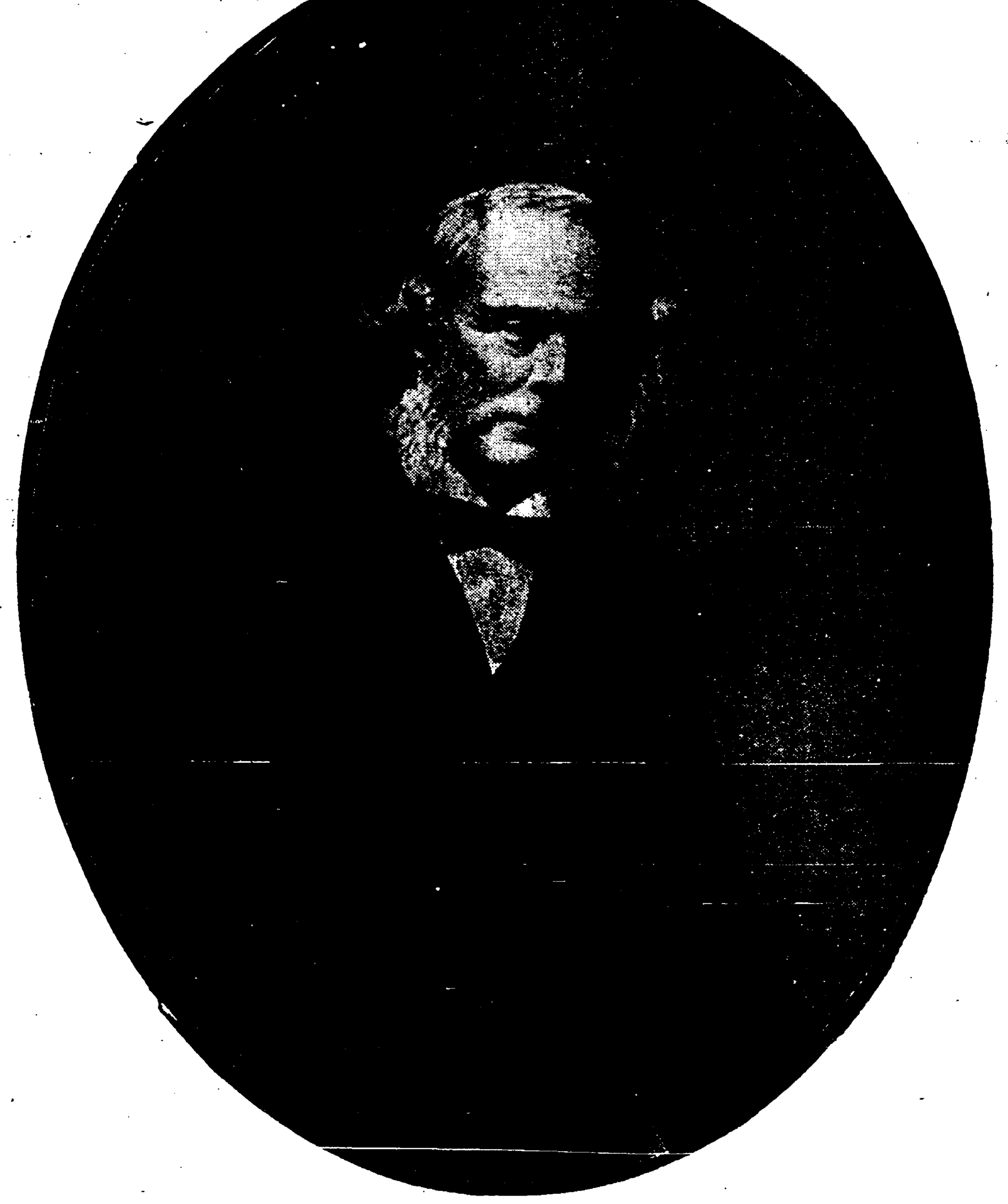

লর্ড্ লিষ্টার

টিন্‌ডালের আর একটি পরীক্ষা আরও অদ্ভুত। তিনি এমন একটি কাচের বাক্স নিলেন যার তলার দিক্‌টা সহজেই খোলা যায়। তার পর বাক্সটার ভিতরের গায়ে এবং তলায় খানিকটা গ্লিসারিন লেপিয়া দিয়া দিন দশ-পনেরো ওটিকে ঐ ভাবেই রাখিয়া দিলেন। বাক্সের ভিতরকার ধূলার কণাগুলি ক্রমে ক্রমে গ্লিসারিনে আট্‌কাইয়া গেল, আর উড়িতে পারিল না। অন্ধকার ঘরে বাক্সটির মধ্য দিয়া

আলোর রশ্মি পাঠাইয়া তিনি দেখিলেন, সে আলোর পথে ধূলার সামান্য কণাও আর ঝিক্‌মিক্ করিতেছে না, অর্থাৎ ধূলার সমস্ত কণাই গ্লিসারিনে আট্‌কাইয়া গিয়াছে। তখন তিনি খুব সাবধানে ফুটানো এক বাটী খাবার সেই বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। দেখা গেল সে খাবার কয়েক মাসের মধ্যেও পচিল না। বাক্সের মধ্যে বাতাস রহিয়াছে বটে, কিন্তু সে বাতাস সম্পূর্ণ ভাবে জীবাণুশূন্য—আর খাবারের ভিতরকার জীবাণুকেও ফুটাইয়া আগে হইতেই ধ্বংস করিয়া নেওয়া হইয়াছে। ব্যস্, প্রমাণ হইয়া গেল, জীবাণু বা জীব কোনটাই আপনা হইতে জন্মিতে পারে না—তাদের পূর্ব্বপুরুষ থাকিবেই।

পাস্তুরের আবিষ্কার কাজে লাগাইয়া পরবর্ত্তী কালে লর্ড্ লিষ্টার নামক বিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার অস্ত্র-চিকিৎসায় যুগান্তর আনেন। সে কথা তোমাদের আর একদিন বলিব।

মেট্রোতে বুড়ী

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

রবিবার দুপুরবেলা ব’সে-ব’সে হাই তুলছি। কোন কাজ নেই। গরমও পড়েছে বড্ড, আশ্বিন মাসে যখন প্রচণ্ড রোদ ওঠে আর একটুও হাওয়া দেয় না, সেই দম-আটকানো, পিন-ফোটানো গরম। ভেবেছিলুম আনকোরা টাটকা য়্যাডভেঞ্চার-গল্পের বইখানা পড়বো, কিন্তু দু’ পাতা প’ড়েই মনে হচ্ছে কোথায় যেন আগে পড়েছি। ব’সে আছি চুপচাপ।

এমন সময় পা টিপে-টিপে অনুতোষের প্রবেশ। পা টিপে-টিপে—কেননা, মেজকাকা পাশের ঘরে দিবানিদ্রায় সচেষ্ট; যে-বেচারারা নেহাৎই ছেলেমানুষ, তারা যেন কোন রকমেও তাঁর সেই মহৎ চেষ্টায় বাধা না দেয়, এই হচ্ছে তাঁর তিন নম্বর আইন। এক আর দুই নম্বর এখন না-ই শুনলে।

'কী রে অনুতোষ, কী মনে ক'রে ?'

কপালের ঘাম মুছে অনুতোষ বললে, 'চল্।'

'কোথায় ?'

'চল্, সিনেমা দেখে আসি।'

'পাগল ! এই রোদ্দুরে !'

'কী যে বোকার মতো কথা বলিস ! মেট্রোর ভিতরটা কেমন ঠাণ্ডা ! গরমের দিনের দুপুর কাটাবার জায়গাই যে ঐ।'

'আচ্ছা—চুপ কর্।' বাক্‌বিতণ্ডা করবার উপায় নেই, পাছে মেজকাকার হুমকি শুনতে হয়। মনের মধ্যে নানা রকম প্রতিবাদ ফোঁস ফোঁস করছে, তবু চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

'তবে চল্।'

'পয়সা ?'

'সেজন্য ভাবতে হবে না। ওঠ্ তুই। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।'

মাকে ব'লে, এমন কি চার আনা পয়সা আদায় ক'রে নিয়ে, (এটা দিয়ে 'হ্যাপি বয়' খাওয়া হবে) বেরিয়ে পড়লুম অনুতোষের সঙ্গে। খাঁ খাঁ রোদ, গাছের পাতা নড়ে না। এদিকে বালিগঞ্জের রাস্তায় ট্রাম তো আর সহজে অসবে না।

একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি দু' জনে, এমন সময় একটা বুড়ী এসে আমাদের কাছে হাত পাতলো। ভিখিরীর জ্বালায় কোন খানে কি শান্তি আছে ! আমরা একটু স'রে দাঁড়ালুম, কিন্তু ছায়াটুকু ছেড়েও যেতে পারি নে। বুড়ীটা আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। এমনিতেই ভিখিরী দেখলে আমার বড় ঘেন্না করে, তার উপর ভিখিরীদের মধ্যেও অমন বীভৎস কঙ্কালমূর্ত্তি চট্ ক'রে চোখে পড়ে না। ও কিছু বল্‌লে না, ওর নুয়ে-পড়া শরীর থেকে যেন একখানা কাদায়-গড়া হাত বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝুলে রইল। আমি ওর দিকে না-তাকাবার যতই চেষ্টা করলুম, ততই আমার চোখ ওর ওপরে গিয়ে পড়তে লাগল। বিশ্রী !

অনুতোষ বললে, 'দ্যাখ, গরমে বুড়ীটা কেমন ধুঁকছে। ঠিক কুত্তার মতো !'

আমি বললুম, 'যাক, ঐ ট্রাম এলো।'

'চল্ বুড়ীকে মেট্রোতে নিয়ে যাই, খুব ঠাণ্ডা লাগবে', ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো অনুতোষ।

একটু পরেই আমরা ট্রামে চেপে বসলুম। ঢিকস ঢিকস চলেছে বালিগঞ্জের ট্রাম, সময় আর কাটে না। একযুগ পরে এসে পৌঁছনো গেল। রাস্তাটুকু পার হ'য়েই মেট্রো। আজ বড্ড ভিড়, জোর ছবি দিয়েছে। ন' আনা টিকিটের জানলায় ফিরিঙ্গি বাঙ্গালী মিশিয়ে দশ-বারজন দাঁড়িয়ে। অনুতোষই আজ 'বস্' করছে; সে এগিয়ে এলো টিকিট আনতে, আমি একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টিকিট নিয়ে এলো অনুতোষ, আমরা ভিতরে ঢুকতে যাবো, এমন সময়—ভাবতে পারো !—আমাদের সামান এসে দাঁড়ালো সেই বুড়ী, সেই তার কাদায়-গড়া হাতখানা বাড়িয়ে ধরলো আমাদের সামনে ! আমরা তো হতভম্ব।

'এ কী ! ও এখানে এলো কেমন ক'রে ?' ব'লে উঠলো অনুতোষ।

আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। এই মেট্রো সিনেমায়, সায়েব, মেম আর ঝক্‌ঝকে বাঙ্গালীর ভিড়ের মধ্যে ওকে যে কী বেখাপ্পা, কী বীভৎস দেখাচ্ছিল তা আর কী বলবো ! ওকে যে ওরা তাড়িয়ে দিচ্ছে না, সেটাই তো আশ্চর্য্য—এ-সব জায়গায় তো আর কোনদিন ভিখিরী দেখি নি !

আমি বললুম, 'আমাদের ট্রামে ক'রেই উঠে এলো নাকি ?'

অনুতোষ বললে, 'হ্যাঁ রে, ট্রামে এসেছে না রোল্‌স্ হাঁকিয়ে এসেছে।'

'তবে ও এলো কি ক'রে ? উড়ে তো আর আসে নি ?'

'নে, নে, আর মাথা ঘামাতে হবে না। চল্ ভিতরে বসি গে।'

বুড়ীটা কিন্তু সেই একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, একটি কথাও বলছে না, একটু নড়ছেও না। চারিদিকে এত লোক—ওকে কেউ লক্ষ্য করছে না কেন ? আশ্চর্য্য !

ভিতরে গিয়ে ব'সে পড়লুম, কিন্তু মাথার মধ্যে কথাটা কেবলই ঘুরতে লাগলো। অনুতোষকে বললুম—'দ্যাখ, এ বুড়ী ঠিক সেই বুড়ীই তো ?'

'মনে তো হ'লো ঠিক সেই রকমই। কে জানে ! কলকাতায় কত ভিখিরী আছে, হ'তেও পারে এ আর-একজন। কিন্তু একেবারে এক রকম।'

'যদি ও-ই হয়—কী ক'রে এলো বল্ তো ! আশ্চর্য্য না ?'

অনুতোষ চুপ ক'রে রইলো।

'তা ছাড়া', আমি চুপি-চুপি বললুম, 'আমার মনে হচ্ছিল আমরা ছাড়া আর-কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না।'

অনুতোষ হেসে উঠলো। 'তোর মাথা খারাপ হ'লো নাকি রে ?'

'তবে ওকে ওরা তক্ষুণি তাড়িয়ে দিলে না কেন ?'

'কী যে বলিস—ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ে নি আর কি। নে, চুপ কর্। আরম্ভ হ'লো।'

একটা বেগ্‌নি রঙের ঠাণ্ডা অন্ধকারের মধ্যে ব'সে সিনেমা দেখতে লাগলুম। নিউজ্-রীল হ'য়ে গেলো. আরম্ভ হ'লো দিগ্বিজয়ী ছবি। অনেকক্ষণ এক মনে দেখছি, হঠাৎ কী-রকম অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলুম। ছবির পরদা থেকে আমার চোখ নেমে এলো প্রেক্ষাগৃহে। আধো চাঁদের আকারে চেয়ারের পর চেয়ারের সারি—কত রকম লোক ব'সে—এ-ও দেখতে মন্দ লাগে না। তারপর হঠাৎ যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেলো।

ঠিক আমাদেরই সারিতে, আমাদের কয়েকটা চেয়ার পরে, সেই বুড়ী ব'সে। স্পষ্ট দেখলুম সেই রঙিন অন্ধকারে। ঠিক সে বসেছে চেয়ারে, শরীর নুয়ে-পড়া, একখানা কাদায়-গড়া হাত সামনের দিকে বাড়ানো।

আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেলো, কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারলুম না।

অনেকক্ষণ পর আস্তে একটা ঠেলা দিলুম অনুতোষকে। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললুম, 'ঐ ছ্যাখ্।'

'কী ?'

'ঐ যে—' আমি আঙ্গুল বাড়ালুম ওদিকে, কিন্তু তার আগেই অনুতোষের চোখ পড়লো গিয়ে ওখানে। সেই হলদে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলুম অনুতোষের মুখ একেবারে সাদা হ'য়ে গেলো।

হয়তো আমাদের চোখের ভুল, হয়তো আমাদের দু'জনেরই মাথা-খারাপ

হয়েছে। জোর ক'রে আবার সিনেমা দেখতে লাগলুম ; অর্থহীন কতগুলো ভেল্কি-বাজি নেচে যাচ্ছে চোখের সামনে। একটু পর-পরই আমরা তাকাচ্ছি ওদিকে—হ্যাঁ, ঠিক ব'সে আছে বুড়ী, শরীর নুয়ে-পড়া, একখানা কাদার মতো হাত সামনে বাড়ানো। মেট্রো সিনেমার ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ব'সেও ঘেমে জল হ'য়ে গেলুম।

হঠাৎ অনুতোষ বললে—'আর না, চল্।'

আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম। উঠে দাঁড়ালুম দু' জনে, নুয়ে-নুয়ে কয়েকটা পা মাড়িয়ে, দু' একটা হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে বাইরে এসে যেন বাঁচলুম। পিছন ফিরে তাকালুম না একবারও। এক দৌড়ে এক্কেবারে রাস্তায়।

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, বিরাট্ সহর, আর লোক, কত লোক !

ফিরতি ট্র্যাম ধরলুম। সারা রাস্তা দু' বন্ধু এক্কেবারে চুপ। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কেমন একটা ভয় যেন গলা আঁকড়ে ধরলো ; আবার যদি সেইখানে, সেই গাছের ছায়ায় ওকে দেখি ! কিন্তু না—কিছু নেই, কেউ নেই। বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই, হঠাৎ যদি আবার— ! রাত্তিরে ভালো ঘুম হ'লো না।

পরের দিন খেতে ব'সে মা বললেন, 'কী কাণ্ড ! কাল দেখি আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় গাছের নীচে একটা বুড়ী প'ড়ে ম'রে আছে।'

বাবা বললেন, 'কত হচ্ছে এ-রকম।'

'মরে পড়েই আছে—কতক্ষণ পর কর্পোরেশনের লোক এসে নিয়ে গেলো।'

আমি বললুম. 'কখন্ বলো তো ?'

'এই তো দুপুরবেলা—তুই বেরিয়ে গেলি, তার একটু পরেই। কী বিশ্রী দেখতে ! ও কি ? তোর খাওয়া হ'য়ে গেলো ?'

আমি তাড়াতাড়ি পাতে জল ঢেলে বললুম, 'আর খাবো না।'

'কী হ'লো তোর ?'

'কিছু হয় নি', বলে আমি উঠে পড়লুম।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

গল্পের মণিমালা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। কমলা বুক ডিপো লিঃ। দাম ১।৵০

বাংলার বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের লেখা অনেকগুলি গল্প সংগ্রহ করে এই সুন্দর বইখানা ছাপা হয়েছে। এ বই পূজায় ছেলে-মহলে খুবই আদর পাবে। অনেক ছবি আছে। মলাটটি খুবই সুন্দর হয়েছে।

আঁধার রাতে আর্ত্তনাদ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, কমলা বুক ডিপো লিঃ। দাম ৸০।

ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ধীরেন্দ্র বাবুর পাকা হাতের লেখা। ছাপা, বাঁধাই এবং ছবিগুলিও সুন্দর।

চিঠিপত্র

পূজা-সংখ্যা রামধনু আকারে অনেক বড় করা হ'ল। আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতাবার উৎসাহ অনেকে দেখিয়েছ। যারা বন্ধুত্ব পাতাতে চাও তারা নাম, ঠিকানা, গ্রাঃ নং, বয়স এবং কোন্ জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাস লিখে আমাদের কাছে পাঠাবে। এক সঙ্গে কিছু নাম জমলে আমরা প্রকাশ করব।

শ্রীনরেশ গুহবক্সী শ্রীমঞ্জুভূষণ দত্তের নামে যে অভিযোগ এনেছিলেন সেটা তাঁকে ভুলে যেতে অনুরোধ করেছেন এবং তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করেছেন। প্রথম ফরাসী শিক্ষার কোন ভাল বই আছে কিনা তাও জানতে চেয়েছেন। বই অনেক আছে, **J. Adams**এর **French Self-Educator** একখানা ভাল বই। দাম ১৷৶১০।

কুমার অমলচন্দ্র রায় অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ না মহাদেশ জানতে চেয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ—কিন্তু খুব বড় দ্বীপ বলে তাকে মহাদেশ বলা হয়।

শ্রীশৈলেশ বসুর প্রশ্ন—কোন লেখার অনুবাদ করতে হ'লে অনুমতি নিতে হয় কিনা। হ্যাঁ, লেখকের অনুমতি নিতে হয়।—রাঃ সঃ

সন্দেশ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁর জন্য সমস্ত দেশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবানের অনুগ্রহে কবি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ

করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি তিনি আরও সুদীর্ঘকাল সুস্থদেহে থাকিয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা করুন—দেশের মুখোজ্জ্বল করুন।

* * *

ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইল। রমেশচন্দ্র সাময়িক পত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অসংখ্য সুলিখিত প্রবন্ধ লিখিয়া এদিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; এ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকখানি বইও বাহির হইয়াছিল। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

* * *

আজকাল কয়েক বছর পর পর পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে যে অলিম্পিক্ খেলা হয় তার প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন ব্যারন কুবারতঁ্যা। ইনি একজন বড় দার্শনিক—১৯২৮ সনে নোবেল পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

* * *

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একাদিক্রমে ৪৯ ঘণ্টা ৩ মিনিট সাঁতার কাটিয়া এক নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষ দাশগুপ্ত নামে আর একজন সাঁতারু এই রেকর্ডও ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রেকর্ড ভাঙ্গিতে না পারিলেও ইনিও ৪৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট সাঁতার কাটিয়াছিলেন।

* * *

ইটালির মুসোলিনী সম্বন্ধে গত সংখ্যায় তোমরা অনেক কিছু পড়িয়াছ। মুসোলিনীর কর্ম্মশক্তি যেমন প্রচুর, স্বাস্থ্যও তেমনি সুন্দর। তিনি বলেন, সাধারণতঃ তিনি শাক-সব্জীই বেশী খান, প্রত্যহ সকালে নিয়মিত ব্যায়াম করেন, অন্যান্য কাজও ঠিক ঘড়ি ধরিয়া করেন। রাত্রি ঠিক ১১টায় শুইতে যান, সকাল ঠিক ৭টায় উঠেন, কখনও দিনে ঘুমান না।

* * *

এবারকার "ভবিষ্যতে" প্রবন্ধে তোমরা ভবিষ্যতে কাচের বাড়ী তৈরী হইবার সম্ভাবনার কথা পড়িয়াছ। সম্প্রতি ইংলণ্ডের এক সহরে সত্যিই একটি কাচের বাড়ী তৈরী হইয়াছে। এ বাড়ীর দেয়াল, মেঝে—এমন কি আসাবপত্রও কাচ দিয়া তৈরী করা হইয়াছে। বাড়ীটা একটা হোটেল।

* * *

চীন-জাপানের লড়াই পুরাদমে চলিয়াছে। জাপান এরোপ্লেন লইয়া চীনের বড় বড় সহরগুলির উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে—অসংখ্য নিরীহ নরনারী—শিশু, বৃদ্ধ অতর্কিতে প্রাণ হারাইতেছে। অবশ্য চীনও মাঝে মাঝে প্রচণ্ড পাল্টা জবাব দিতেছে—এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করিয়া লড়িতেছে। ওদিকে সমস্ত ইয়োরোপের আকাশও ঘনমেঘপূর্ণ। যে কোন সময়ে একটা বিরাট্ যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

* * *

মাখন জিনিষটি বেশ পুষ্টিকর খাদ্য এবং সুখাদ্যও বটে। কিন্তু পূর্ব্ব আফ্রিকায় এক জাতের লোক বাস করে যারা মাখনের ব্যবহার জানে কিন্তু খাইবার জন্য কখনও মাখন ব্যবহার করে না; তারা মাখন মাথায় মাখে—চুলের বাহার করিবার জন্য। পাঞ্জাব-অঞ্চলেও কোন কোন লোক মাথায় দই মাখে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

আশ্বিনের ধাঁধার উত্তর ১০ই আশ্বিনের মধ্যে চাওয়া হয়েছিল। যে সব গ্রাহক দূরদেশে থাকেন তাঁরা কেউ কেউ জানিয়েছেন—সময় অত অল্প দিলে তাঁদের পক্ষে অসুবিধা হয়। সেজন্য এ সংখ্যায় আর ধাঁধার উত্তর বা উত্তরদাতাদের নাম বের করা হ'ল না। অগ্রহায়ণ মাসে এক সঙ্গে দু' মাসেরটা বের করা হবে। ২০শে কার্ত্তিকের মধ্যে আশ্বিন, কার্ত্তিক দু' মাসের ধাঁধারই উত্তর পাঠালে চলবে।

নূতন ধাঁধা

ব্র্যাকেটের কথাগুলির ভাবার্থ বসিয়ে পড়তে হবে :—

(জামার নীচে যা থাকে)ছ ভর্ত্তি (বিছানা যা করা হয়)র মধ্যে (জানালায় যা থাকে) (যা দিয়ে নেশা করে) (পশ্চিমের একটি সহর)মে বসে ছিল। (দড়িতে যা লাগে)কেল (বুদ্ধদেবকে যে বাধা দিয়েছিল)তেই (যাত্রায় যা থাকে)ল।

(এশিয়ার ম্যাপে যা পাবে)এ নদীর (কাপড়ে যা থাকে) বসে গল্প (বাজারে যা ছড়ায়) (শরীরের উপর যা চাপান হয়) (সন্দেশ জাতীয় জিনিষ) লাগে।

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

"এবার পূজার ছুটীতে কে কি করলে"—এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ কিংবা একটি কবিতা পাঠাতে হবে। লেখাটি রামধনুর দু' পৃষ্ঠার মধ্যে রাখতে হবে। ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে লেখা রামধনু-সম্পাদকের কাছে পেঁছান চাই; সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। খামের উপর "পুরস্কার-প্রতিযোগিতা" কথাটি লিখে দিতে হবে—এবং প্রত্যেক লেখার সঙ্গে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও **নিজের** গ্রাহক-নম্বর লিখে দিতে হবে।

২টি পুরস্কার দেওয়া হবে—একটি প্রবন্ধের জন্য এবং একটি কবিতার জন্য। একজন গ্রাহক দু'টোই পাঠাতে পারবে। যারা পুরস্কার পাবে তাদের ছবি রামধনুতে ছাপা হবে।

দ্রষ্টব্য :—যদি পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় গ্রাহকদের আশানুরূপ উৎসাহ দেখা যায় তবে ভবিষ্যতে প্রায় প্রতি মাসেই নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যাবে।

—রাঃ সঃ

ভাবী গ্রাহক

১০ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ { ১১শ সংখ্যা

তুম্‌ভ্রু

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

আমাদের গোটা গ্রামে পড়ে গেছে ডঙ্কা,
অতিথির আগমন হল, হতে লঙ্কা।
নাম তার তুম্‌ভুরু, রাক্ষস নয় সে,
মানুষের মত খাসা হেসে কথা কয় সে।
মাথা তার একটীই, মোট দুটী হস্ত,
দস্ত সে দেহ বটে, নয় বেশী মস্ত।
কই তো মূলার মত নয় তার দন্ত,
লেখাপড়া জানে কিছু, বেশ গুণবন্ত।

সুদূরের অতিথিকে খাওয়াবো কি ভাবছি,
চিনি আন্, পেড়ে আন্ গোটা কত কাব্জী।
সে কি হয় ? জ্ঞান নাই, যত সব চ্যাংড়া,
কোহিতুর নিয়ে আয়, নিয়ে আয় ল্যাঙ্ড়া।
ফজ্লি, গোপালভোগ, আন বড় সিঁদূরে,
আন সরী, বোম্বাই, আমরা যে হিঁদুরে !
এই সব মধুফল অনায়াসে পেলি কি,
গিয়েছিল হনূমান্ সব ভুলে গেলি কি?
মহা খুসী তুম্ভুরু যত খায় হাসে সে,
সুমধুর আম্র যে বড় ভাল বাসে সে।
পাতে দেয় ক্ষীর তার, পাতে দেয় রম্ভা ;
পারণ তো হল তার গুরুতর লম্বা।
ভুল নাক' প্রতীক ও প্রতিভূটা লঙ্কার,
গঙ্গার জলে আজ পূজা হ'ক গঙ্গার।
তাহারি যে দেশ হতে এলো এই দ্রব্য
না দিয়ে খেদায়ে দিলে ভাবিবে অসভ্য।
আনো ভাই 'হাতীশুঁড়' ধানী আর 'সূয্যি'
'কাম্‌রাঙ্গা' লঙ্কার রাজা তা তো বুঝ্ছি।
শিলে বাঁটি গুলে দাও, দিও কম নুনটা,
'ওলা' ভিজা জল দাও বেড়ে যাবে গুণটা।
স্বর্ণের লঙ্কা যে, গ্লাস চাই স্বর্ণের
নেই তাহা, আনো বাটী স্বর্ণের বর্ণের।
অতিথিকে দাও তুলি' হ'ন তিনি তৃপ্ত,
লঙ্কার স্বাদ চায়, 'লঙ্কার জিভ তো।
বসে আছে 'আতিথেয়' বালকেরা সুমুখে,
তুম্‌ভ্রু সে পানীয়ম্ পান করে চুমুকে।

লাল হয়ে উঠে গাল, হয় ঠোঁট সোনালী,
চক্ষেতে জল ভাঙ্গে, জিহ্বাতে গোনালী।
জ্বলে যায় গলা তার কথা তার বন্ধ,
ব্রহ্মা ও বরুণের সমাহার দ্বন্দ্ব।
দশানন দেবগণে দিল যত কষ্ট,
তুম্‌ভ্রুর মুখে তাহা হয়ে উঠে স্পষ্ট।
সারা দেহ জ্বলে যায়, উঠে তার হেঁচ্কী
বঙ্গেও লঙ্কার এত বেশী তেজ কি ?
তিন্তিড়ি নিয়ে আয়, গোঁড়া লেবু আন্ রে
হেথা এসে বুঝি যায় বিদেশীর প্রাণ রে !
বাঙ্গালী যে করেছিল সিংহল জয় গো,
উপনিবেশের প্রজা ঘাল বুঝি হয় গো।
মুখে তার আমড়া ও আমরুল রগ্ড়া ;
কলিতে কি বাধাইবি সে ত্রেতার ঝগড়া ?

শিকার

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্চী, এম্-এ)

একটি পানকৌড়ি ডোবাটির হল্‌দে পানাগুলির উপর দিয়া এক পা এক পা করিয়া আগাইয়া যাইতেছিল। কয়েক মাস ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে আশেপাশে ঘন হইয়া কল্‌মিশাক বাড়িয়া উঠিয়াছে। পানায় ভরা ডোবা—জলের দেখা পাওয়া যায় না। পানাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়া যেন কল্‌মি শাক অতি-দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ডোবার জলরেখার প্রান্তে শুশুনিশাকের মেলা—তাহারই একটু উপরে

কাশ এবং উলুখড়ের ঝোপ ঘন সবুজ রঙে যেন আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহার আর একটু উপরে ডোবার চারিদিকের উঁচু পাড়; তাহার উপরে আরও সবুজ রঙের লীলা। কলা, বাঁশঝাড়, সিজুকাঁটা এবং কচার বেড়া—মাঝে মাঝে ছোট ছোট নারিকেল গাছের চারার ঝিলিমিলি পাতার উপরে সকালবেলাকার রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ঘন নিবিড় বন—সবুজে সবুজে একাকার। মাঝে মাঝে এক আধফালি পোড়ো জমি—সেখানেও দূর্ব্বা তাহার সবুজ রঙ ঢালিয়া দিয়াছে। পাখীরা কোথা হইতে হয়ত ফলের বীজ আনিয়াছিল, ছোট ছোট চেনের চারা বর্ষার বারিধারায় স্নান করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার পর আর দৃষ্টি চলে না, ঘন দুর্ভেদ্য সেঁয়াকুল কাঁটাগাছ আর বাঁশের বন—তাহাদের নীচে যে কালো ছায়া পড়ে, তাহার উপর মাঝে মাঝে সূর্য্যের আলো দিনে এবং চাঁদের আলো রাত্রে বড় অদ্ভুত ছবি আঁকে। সকালের রৌদ্র ক্রমশঃ খরতর হইতেছে এবং পানকৌড়ি পানার উপর দিয়া এক পা এক পা করিয়া আগাইয়া যাইতেছে।

পানকৌড়ি যে কোথায় ঘর বাঁধিয়াছে, তাহা আমরা অনুমানে বলিতে পারি। কলমিশাকগুলি যেখানে পানাগুলির উপরে অত্যন্ত ঘন হইয়া শুইয়া আছে, তাহারই মধ্যে হয়ত তাহার বাসা। সেইখান হইতে সে অতি প্রত্যূষে বাহির হইয়া খাবার খুঁজিতেছে—কিন্তু পায় নাই। ছোট ছোট গুগ্‌লি কিংবা ছোট ছোট পুঁটিমাছ, অথবা গুবরে পোকার মত এক জাতীয় পোকা শুঁড় বাহির করিয়া ভিজা শেওলা এবং ঝিঁঝির উপরে পড়িয়া থাকে; এই হইল পানকৌড়ির নিত্য খাদ্য। আজ তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ; ছোট ছোট তিনটি ছানা ব্যাকুল হইয়া আছে, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহাদের কিছুই খাওয়া হয় নাই। যেমন করিয়াই হউক্, কিছু লইয়া যাইতেই হইবে। হঠাৎ সে চলিতে চলিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; পাশেই একখণ্ড পানা নড়িয়া উঠিল না! পানকৌড়ি চাহিয়া দেখিল, পানা নড়িতেছে বটে! শিকার আসিয়াছে—পানকৌড়ি আর দেরী না করিয়া তাহার লম্বা গলা এক নিমেষে পানার মধ্যে ডুবাইয়া দিল। বারকতক মাথা ঝাঁকাইয়া জলের মধ্যে একটি বড় পুঁটিমাছ ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ধরিয়া উপরে মাথা

তুলিয়া লইল। তার পর তাড়াতাড়ি পানার উপর দিয়া বাসার দিকে দৌড়াইল। সে জানে কাছাকাছি কোথাও তাহার শত্রু চিল হয়ত লুকাইয়া আছে! সম্মুখেই উলুবনের মধ্যে ছোটখাট বাঘের মত ডোরাকাটা জানোয়ার হয়ত লুকাইয়া আছে। চিলের নখের কি ধার! ডোরাকাটা জানোয়ারের চোখ্ দুইটি কি ভীষণ ভাবে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে—তাহার সম্মুখে একবার পড়িলে হয়, মাছ ত যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহারও প্রাণ যাইবে। যেমন এই কথা ভাবা, সঙ্গে সঙ্গে উলুবন সর্ সর্ করিয়া দুলিয়া উঠিল, এবং তীরবেগে একটি ঢোঁড়া সাপ ডোবার জলের মধ্যে নামিয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনে একটি বেজী দ্রুত ধাওয়া করিয়া একেবারে জলের কিনারে আসিয়া দাঁড়াইল। বেজীকে দেখিতে পাইয়া পানকৌড়ি খুসী হইল। বেজীর সঙ্গে তাহার কি ভাবে জানি না বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বেজী নিষ্ফল আক্রোশে ঘাসের উপর লেজ আছ্‌ড়াইতে আছ্‌ড়াইতে বলিল, 'বন্ধু, ভালো আছ ত? দেখ না, আমার সকালটা আজ মাটি!'

বেজীর কথার উত্তর দিতে গেলে পুঁটি পলাইয়া যাইবে। সেই ভয়ে সে কথা না কহিয়া মাছসমেত মুখটা একটু ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। বেজী তাহার গোঁফ জোড়ায় তা' দিয়া বলিল, 'বেশ, বেশ—খাবার জুটেছে দেখ্‌ছি—আচ্ছা, অন্য সময়ে আবার দেখা হ'বে।'—বলিয়া সে উলুবনের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। পানকৌড়ি নিঃশব্দে বাসার দিকে দৌড়াইল। মাছটি তখনো মরে নাই। পানকৌড়ির ঠোঁটের ভিতরে তাহার পাঁজরগুলি খসিয়া যাইবার মত হইয়াছে—ঘোলা চোখ্ বাহির করিয়া সে একবার ডোবাটির উপরের হল্‌দে পানাগুলির দিকে শেষ বারের মত চাহিয়া লইতেছিল! পানকৌড়ি ভাবিতেছিল, তাহার ছানা তিনটির কথা,—সমস্ত রাত তাহারা কিছু খায় নাই।

* * *

এদিকে ঢোঁড়াসাপ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গভীর জলের তলায় চলিয়া গেল। সেখানেও তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি কালো শেওলার ফাঁকে বেজী লুকাইয়া আছে! জলের একেবারে নীচেকার পাঁক কি ঠাণ্ডা আর কি নরম! ঢোঁড়া তাহারই উপরে, সাটপাট হইয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিল। হঠাৎ তাহার

কানের কাছের পাঁক ঠেলিয়া কাদামাছ তাহার মাথা তুলিয়া বলিল, 'কি হে, তুমি এখানে— ব্যাপার কি ?'

ঢোঁড়া বলিল, 'বিরক্ত ক'রো না বিশ্রাম নিচ্ছি ! এক্ষুণি একটা বেজীকে তাড়িয়ে এলাম।'

কাদা বলিল, 'বলো কি বেজীকে ? তুমি ? বিশ্বাস হয় না !'

'বিশ্বাস না হয়, তা'তে আমার কিছু যায় আসে না ! তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানে যাও !'

কাদা বলিল, 'যাচ্ছি, তোমার খাওয়া হ'য়েছে কি ?'

ঢোঁড়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'খাওয়া ? কেন, খাবারের সন্ধান তুমি দেবে নাকি ?'

কাদা বলিল, 'দেব, এস তুমি আমার সঙ্গে ! একঝাঁক পুঁটি ঐদিকে চলে গেল।'

ঢোঁড়া গভীর জলের তলায় তাহার চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ দেহ আন্দোলিত করিতে করিতে উপরে উঠিতে লাগিল। দাম-শেওলা ও শরকাঠির ঝোপের পাশ দিয়া সে সাঁত্‌রাইয়া চলিয়াছে। পিছনে পিছনে কাদামাছ—ঠিক সাপেরই মত দেখিতে—তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

* * *

ঘন বাঁশবনের নীচে সেঁয়াকুল ঝোপের উপরে সকালের রৌদ্র যেন ছবি আঁকিয়া দিয়াছে। তাহারই উপর অসংখ্য গঙ্গাফড়িং, মাকড়সা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। অনেক দূর দিয়া ঝোপের অস্পষ্ট ছায়ান্ধকারে একটি শিয়াল দৌড়াইয়া গেল। তাহার ধূসর শরীরের খানিকটা ঘন বাঁশবনের পাশে চকিতে মিলাইয়া গেল। নিঃস্তব্ধ বন। তাহারই মধ্য দিয়া একটি সরু পায়ে-চলা-পথ চলিয়া গিয়াছে। বাঁশের ঘনশ্যাম অগ্রশাখাগুলি রৌদ্রে স্নান করিয়া বাতাসে ধীরে ধীরে মাথা দুলাইতেছে। উপরে গাঢ় নীল আকাশ—অনেক দূর হইতে চিলের তীব্র তীক্ষ্ণ ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে—আর ভাসিয়া আসিতেছে অসংখ্য পাখীর কল-কাকলি। সকলে যেন একসঙ্গে কন্‌সার্ট বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে। হঠাৎ

এসব দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না, একটু মনোযোগ দিয়া সেই সরু পায়ে-চলা পথ ধরিয়া হাঁটিয়া গেলে এই অলক্ষ্য কনসার্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

হঠাৎ বাঁশের ডগাগুলির উপরে বলশালী দুইখানি পাখার শন্ শন্ শব্দ হইল। মাছরাঙা, কাঠঠোক্‌রা ঘুঘুজাতীয় নিরীহ পাখীর দল শশব্যস্তে মৃদু কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহারা আর কিছুই দেখিল না—শুধু বঁড়্‌শির মত বাঁকানো, তীক্ষ্ণ দুইখানি ঠোঁট, দুইখানি বলশালী পাখার নীচে চিত্রিত কয়েকটি শাদাকালো পালক, আর সমস্ত পালকবেশের নীচে প্রচ্ছন্ন অতি-তীব্র দুইটি চক্ষু—সে চক্ষু সমস্ত বনভূমির উপরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একটি মুহূর্ত্তে কোথায় শত্রু এবং কোথায় মিত্র বুঝিয়া লইতেছে। তাহারা বুঝিল, মহারাজ আসিয়াছেন—এখন একটু সাবধানে চলাফেরা করিতে হইবে।

বাজপাখী যে কতদূর হইতে আসিতেছে বোঝা গেল না—ক্লান্ত হইয়া সে একটি শক্ত কঞ্চির উপরে বসিল। তীক্ষ্ণ নখসহ একখানি ঈষৎ রক্তাভ পা একটু তুলিয়া ঠোঁট দিয়া খুঁটিতে লাগিল। একটু দূরে একটি কাঠঠোক্‌রা পাখী একটি কৎবেলের গাছের গুঁড়িতে ক্রমাগত ঠক্-ঠক্ করিয়া ঠোক্কর দিতেছে। বাজপাখীকে দূর হইতে দেখিয়া সে মাথা নত করিয়া অভিবাদন জানাইল।

মহারাজ বলিলেন, 'কি খবর তোমার ? এ অঞ্চলের খবর কি ?'

কাঠঠোক্‌রা অতি বিনীতভাবে জানাইল, খবর সব ভালোই। তবে সাপ এত বেশী বাড়িতেছে যে, এই বনে নির্ব্বিঘ্নে বাস করা অসম্ভব। বাজ মহারাজ তাঁহার তীব্র চক্ষুদু'টি ঘুরাইয়া বলিলেন, 'তাই না কি ? আচ্ছা, দেখ্‌ছি !'

কাঠঠোক্‌রা আরও জানাইল যে, মানুষ-রা অতি ঘন ঘন বনে আসিয়া তীর, বোল্‌টু দিয়া ঘুঘু মারিয়া লইয়া যাইতেছে।

মহারাজ এ কথায় কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। ঘুঘুর মরিয়া যাওয়াই উচিত। কাঠঠোক্‌রা বলিয়া চলিল, দূরের পূবদিকের ডোবাটিতে একমাত্র যে খাদ্য মাছ—তাহাও জলঢোঁড়া, ভাম, বেজী পানকৌড়ি, চিল প্রভৃতি সকলে জুটিয়া প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল। মহারাজের এদিকে ঘন ঘন আসা দরকার।

বাজপাখী পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত। ডোবা এবং মাছের কথা শুনিয়া তাহার

মন বিচলিত হইল। জলঢোঁড়াও আছে। মুখটা সম্মুখে আগাইয়া দিয়া কয়েকটি পাখসাট্ মারিয়া সে ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিয়া পড়িল। তাহার চলমান ছায়ার দিকে চাহিয়া কাঠঠোক্‌রা সম্ভ্রমে এবং শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া কৎবেলের গুঁড়ির উপরে ঠোঁট ঘসিতে লাগিল।

এদিকে জলঢোঁড়া এবং কাদামাছ ডোবার মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছিল। পুঁটিমাছের ঝাঁক সেই যে অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদের আর দেখা নাই। কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া ঢোঁড়া কাদার উদ্দেশে বলিল, 'কৈ হে, তুমি ত খুব খাবারের সন্ধান দিলে! অকারণ ঘুরে মর্‌লাম।' কিন্তু তাহার কথার উত্তর মিলিল না—পিছন ফিরিয়া ঢোঁড়া চাহিয়া দেখিল, কাদামাছ যে কখন অদৃশ্য হইয়াছে কিছুই সে জানে না। বোধ হয় খুব ঠাণ্ডা পাঁকের আভাস পাইয়া সে জলের গভীর অংশে নামিয়া গিয়াছে। তাহাকে আর অকারণ না খুঁজিয়া ঢোঁড়া একেবারে সোজা উপরে উঠিয়া গেল। পানার ফাঁক দিয়া শরীরের অর্দ্ধেকাংশ একেবারে জলের বাহিরে উঠাইয়া ফেলিল—মাঝে মাঝে ঢোঁড়া এইরূপে জলের উপরে উঠিয়া পড়ে। ঘন কল্‌মির উপরে কিচিরমিচির শব্দ আসিতেছে কিসের? বোধ হয় এইবার খাবার জুটিয়াছে! ঢোঁড়ার মহা আনন্দ হইল। পানকৌড়ি তাহার বাসায় ছোট ছানা তিনটিকে খাওয়াইতেছিল। শন্ শন্ শব্দে সে সাবধান হইবার পূর্ব্বেই ঢোঁড়া বিদ্যুদ্বেগে একটি ছানাকে মুখে করিয়া জলের মধ্যে চলিয়া গেল। পানকৌড়ি নিষ্ফল আক্রোশে অন্য ছানাদুইটিকে পাখা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া বসিয়া রহিল।

ঢোঁড়া একেবারে ডোবার অপরপ্রান্তে চলিয়া গেল। সেখানে সে অর্দ্ধেক দেহ ডোবার ধারে ঘাসের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া নিঃশব্দে তাহার আহার গ্রহণ করিল। তার পর স্তিমিতনেত্রে নিতান্ত অলস দেহে সে সেইখানে শুইয়া রোঁদ্ পোহাইতে লাগিল।

বেলা হইয়াছে। ক্রমে জ্বলন্ত রৌদ্র উঠিয়া চারিদিক্ যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। বেজী সমস্তক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছু পায় নাই। হঠাৎ উলুবনের পাশ হইতে সে ঘাসের উপর শায়িত ঢোঁড়াকে দেখিতে পাইল।

ঢোঁড়ার তখন আহারের নেশা লাগিয়াছে। ভালো করিয়া সে চাহিতেই পারে না। চোখের সম্মুখে কি যেন একবার চক্ চক্ করিয়া উঠিল। তারপরেই একেবারে গাঢ় নিদ্রা চিরদিনের মত। তাহার দীর্ঘদেহ উলুবনের ধারে টানিয়া লইয়া গিয়া বেজী তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিল। পানকৌড়ি দূর হইতে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বেজীর দিকে চাহিয়া রহিল। ডোবা আর বনশ্রেণীর উপরে মধ্যাহ্নের পীত রৌদ্র নামিয়াছে। এখন আর কাহারো কোন চেষ্টা নাই। অবশ শিথিল দেহে সব তন্দ্রাচ্ছন্ন।

* * *

অকস্মাৎ কাহার যেন পাখার শব্দ নিঃশব্দতার বুক চিরিয়া বাজিয়া উঠিল। পানকৌড়ি সবিস্ময়ে তাহার ঘন কল্‌মির ঝোপ হইতে চাহিয়া দেখিল। বাজ মহারাজ ডোবার ঠিক উপরে ঘুরিতেছেন। সে তাহার ছানাদুইটির উপরে বুক দিয়া পড়িয়া রহিল। ছানাদু'টির সঙ্গে সঙ্গে যেন বাজ-মহারাজ তাহাকেও লইয়া যান—এই রকম তাহার মনের অবস্থা।

ক্ষুধার্ত্ত বাজের সেদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। দৃষ্টি যতই তীক্ষ্ণ হোক্, পানার ভিতরে তাহা চলে না। সুতরাং তাহাকে চারা-নারিকেলের ঝিলিমিলি পাতার ভিতরে গা-ঢাকা দিতে হইল। কাদামাছ তাহার শীতল পঙ্কশয্যা ত্যাগ করিয়া কখন যে ডোবার ধারে পোকা ধরিতে আসিয়াছে, তাহা তাহার নিজেরই খেয়াল নাই। সাপের মত সে তাহার লিক্‌লিকে গলা বাহির করিয়া শিকারের চেষ্টা করিতেছে। ঐদিকে একটা পোকা উড়িয়া গেল না! ঐ যে আর একটাও উড়িতেছে! দিশাহারা হইয়া কাদামাছ তাহার সমস্ত শরীরটা একেবারে পানার উপরে আনিয়া ফেলিল। সে একটি পোকা ধরিয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছে! রৌদ্রে তাহার সমস্ত দেহ জ্বলিয়া গেল। পোকাটিকে গিলিয়া ফেলিয়াই সে আবার তলাইয়া যাইবে এই অভিপ্রায়। পোকাও ছাড়িবার পাত্র নয়! সে কাদামাছের নরম গলায় তাহার তীব্র বিষাক্ত হুল্ ফুটাইয়া দিয়াছে! যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে কাদামাছ পানার ভিতর দিয়া জলে নামিয়া যাইতে চায়। পানাগুলিও হাওয়ায় ভাসিয়া জমাট বাঁধিয়াছে। কাদার চোখ্ ঘুলাইয়া যাইতেছে। এরকম ত তাহার পূর্ব্বে হয় নাই!

সময় বুঝিয়া বাজ-মহারাজের তীক্ষ্ণ নখর চঞ্চল হইয়া উঠিল। কাদামাছ অত্যন্ত সুস্বাদু! আর, ইহারা এত নির্ব্বিবাদে মরিতে পারে! কাদার দুইটি খোলা চক্ষুর মধ্যে তীক্ষ্ণ নখর ফুটাইয়া বাজ-মহারাজ তাহাকে লইয়া শূন্যে উঠিয়া গেল। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে কাদামাছের পিছন শরীর একবার ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। বেজী তাহার তৃণশয়ন হইতে লুব্ধ দৃষ্টিতে একবার সেই কাদামাছের দিকে চাহিল মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে কাদামাছের দীর্ঘ কঙ্কালটি একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পরিতৃপ্তমনে বাজপাখী উড়িয়া চলিল।

* *

সমস্ত বনভূমির উপরে জমাট অন্ধকার রাত্রি নামিয়াছে। অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছে; আর জ্বলিতেছে বিড়ালজাতীয় প্রাণীর চক্ষু। তাহাদের থাবার নীচে কত কি যে মরিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বাজ-মহারাজ একটি বড় বটগাছের উপরে রাত্রির মত আশ্রয় লইয়াছে। বটের লাল ফলগুলি টুপ্‌টাপ্ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। আর, তাহারই মিষ্টগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কোথা' হইতে এক ঝাঁক হরিয়াল সেই রাত্রে বটের শাখা-পল্লবের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া বসিয়া আছে। বটের পাতার সঙ্গে তাহারা নীলদেহ মিশাইয়া প্রচুর ফল খাইতেছে। একটু বেশী রাত্রে বাজ একটি ছোট হরিয়াল দিয়া রাত্রির আহার সমাধা করিল। ছোট হরিয়ালটি দলছাড়া হইয়া একেবারে তাহার জ্বলন্ত চোখ দুইটির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল।

ক্রমশঃ সকাল হইয়া আসিল। ছোট হরিয়ালের মাংস বোধ হয় সুবিধা-জনক নয়। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় বাজপাখী কেমন যেন অসুস্থতা বোধ করিতেছে। বটগাছের পাতাগুলিও বেশ ঘন। সে ভাবিল, খানিকটা ঘুমাইয়া লইলে মন্দ হয় না। ঘন পাতার আড়ালে পাখা দুইটি প্রসারিত করিয়া দিয়া বাজ নিঃশব্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল। একবার সে মনে মনে ভাবিয়া লইল, সকাল হইলেই বাহির হইতে হইবে। খুব ঘন বনের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে যথাস্থানে একটি নীড় নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহার অনেক কাজ। এই রকম ভাবনায় কখন যে তাহার তন্দ্রা আসিয়াছে, তাহা সে নিজেও জানে না। তার পর, কখন

পা টিপিয়া টিপিয়া কাহারা যে সেখানে আসিয়াছে, তাহাই বা সে জানিবে কি করিয়া? যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'ঐ যে হরিয়াল, দেখা যাচ্ছে—এইবার ফায়ার কর!'

সমস্ত কাননভূমি বন্দুকের শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ভোরের আলোয় যাহারা সদ্য গান গাহিয়া উঠিতেছিল, তাহাদের ভয়ার্ত্ত চীৎকারে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। সকালবেলাকার অল্প আলোয় বন্দুকের নলের ধোঁয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্যে মিলাইয়া গেল। নলের ভিতর ফুঁ দিয়া অপরে কহিল, 'দেখ্ তো, কিছু হ'ল কিনা!'

অন্য জন ছুটিয়া বটতলায় চলিয়া গেল। সেখান হইতে সে সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, 'হাঁ দাদা, হ'য়েছে—হরিয়াল নয়, বাজ! নিয়ে যা'ব?'

দাদা বলিল, 'কৈ, নিয়ে আয় দেখি!'

বাজপাখী আনা হইল। তাহার তীক্ষ্ণ নখর, দৃঢ় কুঞ্চিত, বাঁকানো ঠোঁট এবং পাখার সুন্দর গঠন দেখিয়া দু'জনেই বলিল,—'বাঃ, বেশ পাখী! গুলিটা ঠিক ওর বুকে লেগেছে দেখেছিস্?'

বাজপাখীর সুন্দর পালকে ভরা সুগঠিত বক্ষ ভেদ করিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে! সেই স্থানটি হইতে অল্প অল্প তাজা রক্ত বাহির হইয়া সাদা পালক-গুলিতে জমাট বাঁধিয়াছে। কৎবেলের গুঁড়ির পাশ হইতে কাঠ-ঠোকরা হঠাৎ গলা বাহির করিয়া বাজের এই অবস্থা দেখিয়া তীরবেগে ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার আর তখন ভাবিবার শক্তি নাই। কোন রকমে এই ভীষণ মানুষদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিলেই সে বাঁচে।

যে ছেলেটি বটতলায় ছুটিয়া গিয়া বাজপাখীটিকে তুলিয়া আনিয়াছিল, সে দুই হাতে পাখীটির পাখা দুইটিকে প্রসারিত করিয়া ধরিল। অদ্ভুত সব পালক, সাদা কালোয় মিলিয়া সে এক অদ্ভুত রঙ। অসীম শূন্যে সেই প্রসারিত দুইটি পাখার উপরে ঝলমল করিয়া উঠিত মধ্যাহ্নের রৌদ্র! তীক্ষ্ণ বাঁকানো ঠোঁট দুইটি ঈষৎ ফাঁক হইয়া গিয়াছে—আর সেই ঠোঁটের একটু উপরে দুইপাশে মৃত্যুযন্ত্রণাহত বিবর্ণ দুইটি চোখ চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইয়া গিয়াছে।

বন্দুকের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া শিকারী পাখীটির দিকে চাহিয়া তাহার ভাইকে বলিল, 'এটা নিয়ে কি কর্‌বি ?'

তার পর, কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, 'আচ্ছা, নিয়ে আয় !' সরু পায়ে-চলা-পথ ধরিয়া আবার হরিয়ালের উদ্দেশে তাহারা গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মুষ্টিযোগ

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি)

এক যে ছিল মুষ্টিযোদ্ধা কেষ্টচন্দ্র গোষ্ঠপুরে,
পুষ্ট দেহে শক্ত পেশী, মাংস বেশী ওষ্ঠ জুড়ে।
বর্ণ যেন কষ্টিপাথর, কঠিনতর বক্ষ বিশাল।
উচ্চ কায়া বৃক্ষ সম,—শীর্ষ তুলি' প্লক্ষ কি শাল !
হৃদয় কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ, সঙ্গীতে তার কম্প আসে ;
বৃষ্টিপাতের শব্দ-স্বরেও রুষ্ট সে দেয় লম্ফ ত্রাসে।
একদা, হায় ! জ্যৈষ্ঠমাসে বোষ্টম এক সেই গাঁয়েতে
ইষ্টদেবের তুষ্টি লাগি ভজন করে আখড়া পেতে।
মৃদঙ্গ আর খঞ্জনীতে বোল্ বাজে তার নৃত্য সাথে,
মিষ্ট গলার কীর্ত্তনে তার অষ্টপ্রহর পল্লী মাতে।
কেষ্ট তখন শ্বশুর-বাড়ী, ষষ্ঠীপূজোয় ব্যস্ত ভোজে,
পিষ্টকে আর মিষ্টান্নেই মুষ্ট্যাঘাতে হস্ত যোঝে !
পৃষ্ঠে শেষে একটা ছোট বিস্ফোটকের জাগলো ব্যথা ;
জ্যেষ্ঠভ্রাতাও লিখলে চিঠি—কনিষ্ঠ ভাই ভাগ্‌লো কোথা।
অগত্যা তাই কেষ্টচাঁদের আপন গ্রামে হয় আগমন,
নিরুদ্দিষ্ট ভাইয়ের তরে চিন্তাক্লিষ্ট মনটি তখন।

হঠাৎ যেন লোষ্ট্রাঘাতে ডোবায় ওঠে তরঙ্গদল !—
কেষ্ট শোনে চমকে', ভীষণ গানের রোলে পল্লী উতল।
তাহার গৃহের সন্নিকটেই গোষ্ঠ-গীতির রাগ-রাগিনী,—
বোষ্টমেরা নৃত্য-পাগল লাফায় যেন বাঘ-বাঘিনী।
ধৈর্য্য গেলো ভ্রষ্ট হ'য়ে, কেষ্ট এলো রণোল্লাসে,
ডাইনে বাঁয়ে চালায় ঘুঁষি, পদক্ষেপে সৃষ্টি নাশে !
বোষ্টমেরা ভাবলে, হরি ! ভক্ত এ কোন্ নূতন এলো !
ভক্তিভাবের প্রবল দশা, প্রেমের ঘোরে চেতন গেলো !
সবাই তখন বেষ্টি' তারে হরিধ্বনি কর্‌লে সুরু,
নিমেষ মাঝে রাষ্ট্র হ'লো কেষ্টচন্দ্র ভক্ত-গুরু।
কেষ্টচাঁদের মুষ্টি পড়ে মৃদঙ্গে বা মস্তকে কা'র,
ভক্তগণেও ধর্‌লো দশা, রুখবে তখন হস্ত কে কা'র !
দম্‌দমাদম্ মৃদঙ্ বাজে, ধুম্‌ধুমাধুম্ মুষ্টি চলে,
কেউ ধূলিসাৎ, কেউ বা আঘাত করছে পাশের বক্ষ-তলে।
দৃশ্য সে এক গোলক-ধাঁধার, ভক্তি-ভাবের আগম-নিগম !
ঘণ্টাখানেক ধ্বস্তাধ্বস্তি হস্তাহস্তি চল্লো বেদম।
থাম্‌লো শেষে। ক্লান্ত সবাই। কেষ্টচন্দ্রে যায় না চেনা-
পিষ্ট তাহার বিস্ফোটকের রক্তে মেশে মুখের ফেনা।
সংজ্ঞাহারা ভক্তেরা সব, একটু গোঙায় কেউ বা কেঁদে,
গঙ্গাজলের তেষ্টাতে কেউ হস্ত নাড়ায় বারেক সেধে।
কেষ্টচাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কবিরাজের সঙ্গে এসে
আয়ুর্ব্বেদিক মুষ্টিযোগের ব্যবস্থাটা দিলেন শেষে।
সেদিন থেকে কেষ্ট ছাড়ে মুষ্টি সাথে ঘনিষ্ঠতা,
সতর্কতায় হস্তে নিলো ভক্তি-রোধক যষ্টি-লতা !

বিদ্যাবাগীশ বনাম নিতাই

(শ্রীমাধব্য)

রামরূপ বিদ্যাবাগীশের শাস্ত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে কেউ কোনদিন সন্দেহ প্রকাশ করে নি, কিন্তু তাঁর কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে গাঁয়ে নানা রকম কাণাঘুষা শোনা যেত; মানে তাঁর কাণ্ডজ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে।

সেদিন বিদ্যাবাগীশ মশাই শিষ্য-বাড়ী চলেছেন, পথে দেখা নিতাই মোড়লের

প্রাতঃপেন্নাম হইগো, ঠাকুর মশাই !

সঙ্গে। নিতাই এসেছিল তার ক্ষেতে, পথে একটা দেশলাই কুড়িয়ে পেয়ে হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাবাগীশ মশাইকে দেখে সে ভয়ানক রকম দানশীল হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, "প্রাতঃপেন্নাম হইগো, ঠাকুর মশাই! আপনি একটা বিড়ি খাবা ?"

বিদ্যাবাগীশ মশাই নিতাইএর ব্যাকরণ ভুল দেখে মনে মনে চটেছেন, কিন্তু

মুখে সে ভাবটা প্রকাশ না করে বল্লেন, "সারাটা জীবন বিড়ি টেনেই যাবে মোড়লের পো ? বলি ঈশ্বর সম্বন্ধে একটু চিন্তা-টিন্তা কর ?"

এখন আমাদের এই 'মোড়লের পো'টি একটি আস্ত খাঁজা ; ঠাকুর-দেবতার নাম তার জানা আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বর – ওঃ বাবাঃ, অত বড় গালভরা সংস্কৃত নাম সে জন্মে শোনে নি। তাই বল্লে, "ঈশ্বর কে ঠাকুর মশাই ? তাকে তো চিনি না !"

বিদ্যাবাগীশ মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আঃ মর, বুড়ো ধাড়ি, বলে কিনা ঈশ্বরের নাম শোনে নি ! ঠিক সেই সময়ে একটি ছোট্ট ছেলে দূরের পথ দিয়ে যাচ্ছিল ; বিদ্যাবাগীশ মশাই তাকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকলেন। ছেলেটি কাছে এলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা, তুমি ঈশ্বরের নাম শুনেছ ?"

খোকা জবাব দিল, "শুনেছি বৈকি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, পরম দয়ালু। তিনি আমাকে, পৃথিবীর সকলকে, সৃষ্টি করেছেন।"

বিদ্যাবাগীশ মশাই তখন নিতাইকে উদ্দেশ করে বল্লেন, "শুন্‌লি বেটা মুখ্যু, এই কচি ছেলেটা পর্য্যন্ত জানে যে ঈশ্বর ওকে, জগতের সবাইকে, সৃষ্টি করেছেন। আর তুই বেটা বুড়ো ধাড়ি, বলিস্ কিনা ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত শুনিস্ নি !"

নিতাই বল্লে, "সৃষ্টি করা আবার কাকে বলে ?"

"সৃষ্টি করা বলে তৈরী করাকে—বেটা দেখ্‌ছি একেবারেই গোমুখ্যু।"

বার বার গাল খেয়ে নিতাইও এবার রুখে গেছে, বল্লে, "এইজন্যই তো তোমাকে সকলে বোকা-পণ্ডিত বলে ঠাকুর ! ওর সৃষ্টি হল্ল সবে সেদিন ; কে সৃষ্টি কর্‌ল তা ওর এখনও দিব্যি মনে আছে। আমার কি আর আজ সৃষ্টি হয়েছে ! সে—ই কো—ন্ কালে ! কে সৃষ্টি কর্‌লে তা কি আর আমি মনে করে বসে আছি ? কবে ভুলে মেরে দিয়েছি।"

জেনে রাখ

কাপড়ে টিঞ্চার আয়োডিনের দাগ লাগলে প্রথমে সেটাকে কিছুক্ষণ লবণ-গোলা জলে ভিজিয়ে রেখে তার পর সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবে।

চিনির বিপক্ষে

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি, বি.ই. এস্)

আজ এমন একটা কথা বলতে যাচ্ছি, যার জন্য বেশ বুঝতে পারছি যে বেশীর ভাগ ছেলেই আমার উপর খাপ্পা হয়ে উঠবে, এবং দু চার জনা হয়ত মনে মনে আমায় দু'-চারটে অভিসম্পাতও দেবে।

ছেলেরা যে মিষ্টি ভালবাসে তা সবাই জানে; ছেলেরা কেন বুড়োরাও। চিনি, মিছরী, বাতাসা, নকল দানা, ছাঁচ ইত্যাদি নানা জাতীয় চিনির খাবার এবং সন্দেশ, রসগোল্লা পান্তুয়া, মিহিদানা, দরবেশ প্রভৃতি চিনি-বহুল খাদ্য—এগুলির কথাই আমি বলছি। নিতান্ত বেরসিক ছাড়া সকলেই এদের পক্ষপাতী।

কিন্তু আজকাল খাদ্য-বৈজ্ঞানিকেরা চিনির বিপক্ষে লেগেছেন। শুধু চিনি কেন, সাদা ময়দা, সাদা ধব্ধবে চাল, এ সবেরও বিপক্ষে। এখনকার মত হচ্ছে স্বাভাবিক খাদ্যগুলিই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। খাদ্য পরিষ্কার করে তাকে যতই কৃত্রিম ভাবে সুন্দর ও সুস্বাদু করা যাবে ততই তা শরীরের পক্ষে অল্প-বিস্তর বিষের মত কাজ করবে। চকোলেট বিস্কুট, সাদা পাঁউরুটি এ সব দেখতে ও খেতে বেশ ভাল, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন অনুকূল নয়—খাদ্যগুণে হীন। এদের দোষ ঢাকবার জন্য অনেকটা স্বাভাবিক খাদ্য খেতে হয়। তা না হ'লে শরীর ক্রমশঃ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আখ চিবিয়ে তার রস খাওয়া ভাল। চিবানোর ফলে দাঁতগুলি বেশ জোরাল ও ব্যাধিহীন হয়। তোমরা হয়তো ভাবছ, আখের রস থেকেই তো চিনি হয়, কাজেই আখ চিবিয়ে খাওয়া ভাল অথচ চিনি খাওয়া দোষের—এ কি রকম কথা! কথা আছে বৈকি; আখের রসের মধ্যে তো শুধু চিনিই থাকে না, সেই সঙ্গে থাকে নানা রকম লবণ-জাতীয় জিনিষ এবং ভিটামিন। আখ থেকে সাদা চিনি তৈরী করার সময় এ সমস্ত বাদ পড়ে যায়—ফলে জিনিষটা একটা অসম্পূর্ণ খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়।

চালের এবং গমের বাইরের খোসাগুলিতে ভিটামিন ও অনেক লবণ পদার্থ

থাকে। সাদা ময়দায় বা সাদা চালে সে সব বেরিয়ে যায়, এজন্য এসব খাদ্যও অসম্পূর্ণ।

যাদের খাদ্যে বেশী পরিমাণ চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা থাকে তাদের খাদ্যে ভিটামিন বি কম পড়ে। যার খাদ্যে ঐ রকম পরিষ্কৃত খাদ্যের মাত্রা বেশী তাকে অন্য স্বাভাবিক খাদ্য থেকে ভিটামিন বি নিতে হবে। পরিষ্কৃত খাদ্যের মাত্রা ও ভিটামিন বি'র মাত্রার সামঞ্জস্য না থাকলে নানা রকম ব্যাধিসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। লাল চাল, লাল আটা, ডাল, আলু—এই সব জিনিষ থেকে আমরা ভিটামিন বি পাই। যারা বেশী চিনি, সাদা ময়দা ও সাদা চাল খায় তাদের খাদ্যে বেশী মাত্রায় ডাল ও আলু বাড়ান প্রয়োজন। নচেৎ স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। যাদের শরীর স্বাস্থ্যহীন ও নির্জীবভাবাপন্ন তাদের খাবারের মধ্যে ভিটামিন বি-যুক্ত খাবার বাড়িয়ে দিলে বেশ তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়—পরিপাক-যন্ত্র এবং হৃদয়-যন্ত্রের অবস্থা ভাল হয় কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়; জোলাপ নিতে হয় না। গেটেবাত সম্বন্ধের পীড়াতেও তাদের বিশেষ উপকার হয়। খাবারে ভিটামিন বি'র অভাব থাকলে শরীরে ফোঁড়া, ব্রণ প্রভৃতিও খুব দেখা দেয়। কাজেই ফোঁড়া, ব্রণ প্রভৃতির উপদ্রব আরম্ভ হ'লে তোমরা খাবারে যাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি থাকে তার দিকে নজর দেবে—দেখবে তাতে বিশেষ উপকার পাবে।

ডাক্তার ফ্রেণ্ড দেখেছেন অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে ফোঁড়া ও রক্তদুষ্টি ব্যাধিও বেশী হয়।*

ম্যাকক্যারিসন নামে আর একজন বড় ডাক্তার ভারতের পশ্চিম প্রান্তে একটা বীর জাতির উল্লেখ করেছেন। এদের খাদ্যে আদৌ চিনি ছিল না, এবং স্বাভাবিক খাদ্য খেয়েই এরা জীবন ধারণ করত।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে ডেনমার্কে মাংসের অত্যন্ত অভাব ঘটে; খুব ধনী লোক ছাড়া সাধারণ লোকে তা সংগ্রহ করতে পারত না। ঐ সময়ে হিন্দহেডী নামক জনৈক বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ মত সাধারণ লোকে নিম্নলিখিত রকমের খাবার

* Plimmer's and Plimmer's Food Health Vitamins; Seventh Edition, 1936.

খেতে আরম্ভ করল ঃ—যব ও সম্পূর্ণ গমের রুটী, দুধ, মাখন, সবুজ আনাজ এবং আলু। ঐ খাবারে লোকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল, মৃত্যুর হারও দেখা গিয়েছিল বেশ কমে গেছে। ক্যানসার রোগের সংখ্যাও তা'তে বেশ কমে যায়। হিন্দহেডির মত এই যে অনুচিত মত পানীয় বা খাদ্য খেয়েই লোকে বেশী রোগে ভোগে এবং মারা পড়ে।

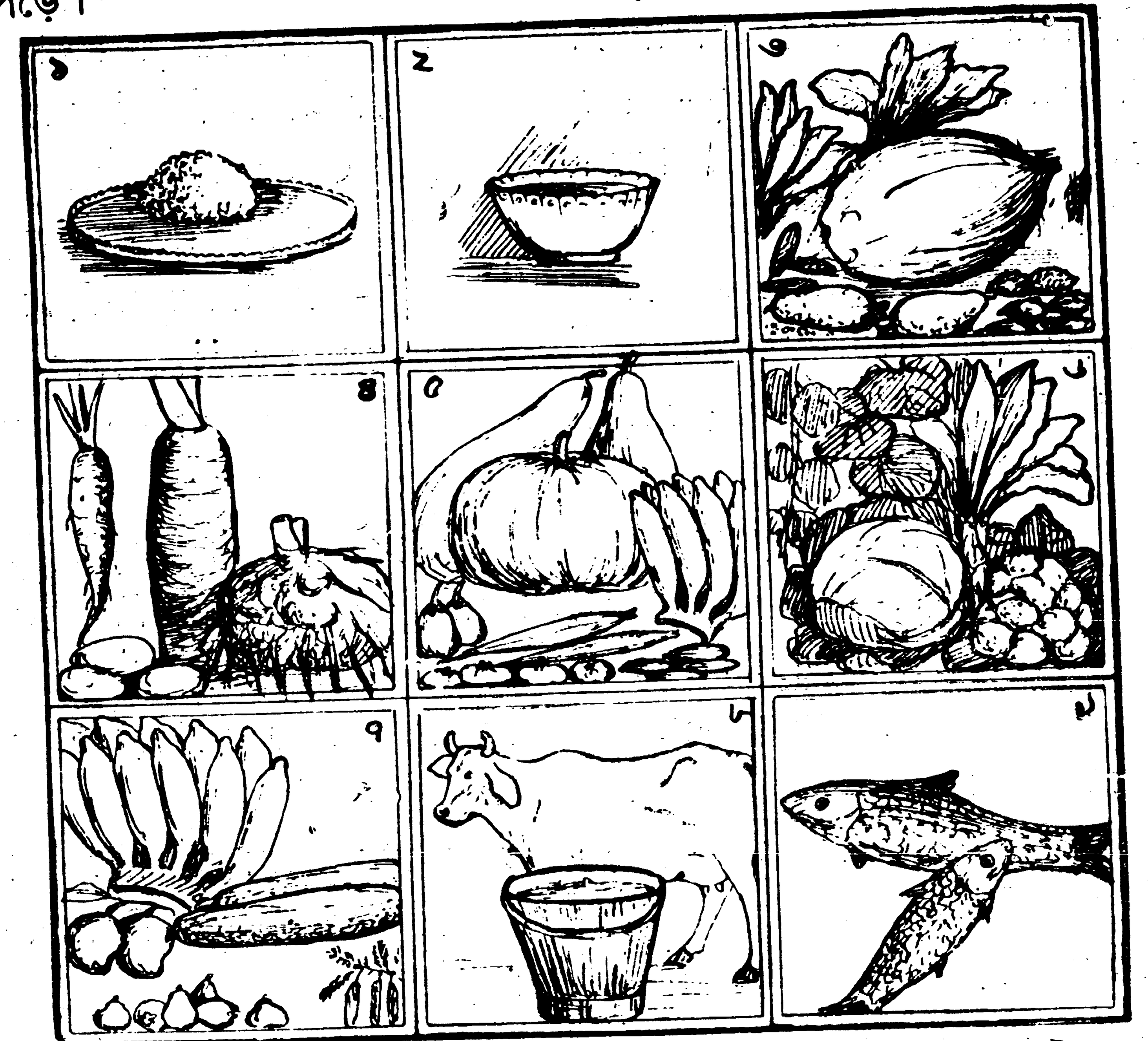

আমাদের প্রতিদিনকার খাবারে কোন্ কোন্ ধরণের জিনিষ থাকা দরকার উপরের ছবিতে তার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া গেল। (১) ভাত (২) ডাল (৩) কিছু ঝুনা নারকেল, শাক, পটল প্রভৃতি সিটাওয়ালা জিনিষ (৪) মূল-আনাজ (মূলা, আলু প্রভৃতি) (৫) ফল-আনাজ (কাঁচকলা, বেগুণ, কুমড়া প্রভৃতি) (৬) গাছের পাতা ও ডগা-আনাজ (শাক, কপি প্রভৃতি) (৭) ফল (৮) দুধ (৯) মাছ।

বাংলার অতিথি

মহাত্মা গান্ধী

সীমান্ত-গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁ ও মহাত্মা গান্ধী

পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

মৌলানা আবুল কালাম্ আজাদ্

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে কল্‌কাতায় কংগ্রেস্ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়েছিল। বিরাট্ প্যাণ্ডেল তৈরী করে হাজার হাজার দর্শকের স্থান তাতে করা হয়। দর্শকদের টিকেট প্রায় নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। ভারতবর্ষের অনেক গণ্যমান্য কংগ্রেসী নেতা এই উপলক্ষ্যে বাংলার আতিথ্য গ্রহণ করেন। কয়েক জন নেতার ছবি দেওয়া হ'ল; এর মধ্যে অবশ্য বাংলার সুভাষচন্দ্র এবং মৌলানা আবুল কালাম্ আজাদ্‌ও আছেন।

নাম-বিভ্রাট

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ)

চাঁদমোহন বাবুর বাড়ী শ্যামবাজার, বিয়ে করেছেন হাতীবাগান, মামার বাড়ী দর্জ্জিপাড়া, পিসী থাকেন উল্টাডিঙ্গি। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে চাঁদমোহন একেবারে খাঁটি, পূরোদস্তুর কলকাতার লোক। কলকাতা সহরের

বাইরেও যে একটা দেশ আছে, সেটা জানেন তিনি ভূগোল পড়ে, আর দু'একবার মধুপুর দেওঘর বেড়াতে গিয়ে। শিয়ালদ ষ্টেশনের নাম শুনলেই তাদের বুক শুকিয়ে যায়। তাঁরা জানেন, ওখান থেকে গাড়ী ছাড়লেই দু'ধারে কেবল মশা, মাছি, সাপ আর ম্যালেরিয়া।

এমনি কপালের ফের! এমন যে চাঁদমোহন, তাঁর চাকরি জুটল দূর পূর্ব্ব বাংলার এক জেলে। তাঁর বাপ-দাদারা চিরটা কাল কলকাতার সরকারী কিংবা সওদাগরী আফিসে কলম পিষে গেলেন। কিন্তু অত বড় বড় বাড়ীগুলোয় চাঁদমোহনের একটু জায়গা হ'ল না। তাঁকে যেতে হ'ল একেবারে তেপান্তরের মাঠে। অর্থাৎ গাড়ী চড়ে এক রাত, ষ্টীমারে এক দুপুর আবার রেলে প্রায় এক দিন। শুনে অবধি বাড়ীর মেয়েরা সুরু করলেন কান্নাকাটি, কর্ত্তারা করলেন নাম জপ আর পুরুত ঠাকুর করলেন চণ্ডীপাঠ। চাঁদমোহন জামার হাতায় চোখের জল মুছে শিয়ালদ গিয়ে গাড়ী চড়লেন।

কয়েকদিন পরের কথা। চাঁদমোহন আফিসে বসে কাজ করছেন। জমাদার একটা কয়েদীকে ধরে এনে, মেজের উপর বুট ঠুকে সেলাম করে জানাল, এই লোকটা "বহুৎ বদমাস্ আছে"। চাঁদমোহন বই থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাম তোর?'

—'আই তো চাঁদের বাপ।'

চাঁদমোহন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, 'কী!'

লোকটা যোড়হাত করে বললে, 'চাঁদের বাপ, উজুর।' চাঁদমোহনের মুখ দিয়ে প্রথমটা কথাই বেরোল না। তার পর হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'কেয়া দেখতা হ্যায়, জমাদার? আমার বাপ তুলে কথা! এত বড় সাহস! লেয়াও উস্‌কো টিকিট্। জলদি লেয়াও, আমি আব্‌ভি রিপোর্ট করে গা।'

সিপাই, কয়েদী সব তটস্থ হয়ে উঠল। জেল-গেটে যে বন্দুকধারী শান্ত্রী থাকে, সে সঙ্গীন লাগিয়ে তৈরী হ'য়ে রইল; হুকুম পেলেই "পাগ্‌লা ঘন্টি"* বাজিয়ে দেবে।

* জেলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কয়েদী পালান কিংবা অন্য কোন বিপদ্-আপদ্ হ'লে যে বিপদ্-সূচক ঘণ্টা বাজে তাকেই চলিত কথায় বলে "পাগ্‌লা ঘন্টী"।

"পাগ্‌লা ঘন্টি" হয়তো বাজানো হ'ত। এমন সময় চাঁদমোহনের সহকারী মাধব বাবু এসে পড়লেন। ব্যাপার দেখে শুনে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ওর নাম চাঁদের বাপই বটে। এখানকার লোকগুলোর অনেকেরই হুটো করে নাম থাকে, তার মধ্যে একটা কারুর না কারুর বাপ। এই বলে তিনি চাঁদবাবুকে জেলের ভিতরে নিয়ে গেলেন। কয়েদীরা "ফাইল" করে দাঁড়াল, এবং নাম বলে যেতে লাগল—পিপড়ার বাপ, ক্যান্দ্‌ড়ার বাপ, মশার বাপ, জজের বাপ, পুলিশের বাপ, ট্যাংড়ার বাপ, টিকটিকির বাপ, ইত্যাদি। এই "বাপের" জঙ্গলে দাঁড়িয়ে চাঁদমোহনের মনে হ'ল এখনিই এ দেশ থেকে "বাপ বাপ" বলে বেরিয়ে পড়া দরকার।

পুরুষগুলো যেমনি বাপ, মেয়েরা তেমনি মা। দশ বছরের মেয়ে, তার নাম হ'ল ভূষার মা; এমনি, খুসীর মা, বাঘার মা, মহারাজের মা, পুলিশের মা ইত্যাদি।

শুধু কি এই "বাপ-মায়ের" অত্যাচার? নামগুলোও যেন সব এক রকম। বইতে লেখা এক, মুখে বলে আর। এমনি ধারা এক গোলমালে তাঁকে পড়তে হ'ল দিন তিনেকের মধ্যেই। একটি কয়েদীর খালাসের হুকুম এসেছে। হুকুম-নামায় নাম রয়েছে—নঝা। লোক খুঁজে বার করা হ'ল হু'জন—সহোদর ভাই—একজন তার নাম বলে "নজা" আর একজন বলে "নছা"। বাপের নাম এক; বাড়ী, ঘরহুয়ার, মোকর্দ্দমার বিবরণ সব এক; এবং সবই মিলে যাচ্ছে হুকুম-নামার সঙ্গে। সমস্যা দাঁড়াল এই—হুকুমটা কার জন্য—নজা না নছা? কোন্‌টাকে ছাড়া যায়? অনেক ভেবে চাঁদমোহন স্থির করলেন, "জ" আর "ঝ" থাকে পাশাপাশি, "ছ" টা একটু দূরে, কাজেই "নঝার" সঙ্গে "নজার" মিল বেশী, "নছার" মিল কম। স্থুতরাং নজাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, নছা রয়ে গেল জেলে।

পর দিন। চাঁদমোহন ভয়ানক ব্যস্ত। পঁচিশটা কয়েদী যাবে অন্য জেলে চালান; তারই সব ব্যবস্থা হচ্ছে। ভীষণ কাজের ভিড়। এমন সময় গেটের সিপাই এসে জানাল, এক মোক্তার বাবু এসেছেন দেখা করতে। বাবুটিকে আনা হ'ল—মাথাযোড়া টাক, নাকের নীচে ঝাঁকালো গোঁফ, পরনে আধময়লা প্যান্ট্

হাঁটুর একটু নীচে নেমেই শেষ হয়ে গেছে; গায়ে কালো চাপকান, আর তার উপর পাকানো চাদর সাপের মত গলা, কাঁধ, বগল জড়িয়ে আছে। নিজেই চেয়ার টেনে বসে প্রশ্ন করলেন, 'আমার মক্কেল খালাস পায় নি কেন, মশাই?'

চাঁদমোহন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কে আপনার মক্কেল?'

—'নছা'।

চাঁদমোহনের বুকটা কেঁপে উঠল। সর্ব্বনাশ, তা হলে কি ভুল হ'ল! বাইরে সে ভাব না দেখিয়ে একটু কড়া ভাবেই বল্‌লেন, 'আমরা হুকুম-নামা দেখেই কয়েদী ছেড়ে থাকি। আপনার মক্কেল কি কার মক্কেল, সে সব জানি না। আপনি এবার যেতে পারেন।'

—'আজ্ঞে, আমি তো যাবই। কিন্তু আপনারাও বিশেষ আরামে থাকতে পারবেন না। রামের বদলে শ্যামকে ছেড়ে দেবেন, তার ওপর আবার চোখ রাঙানো! এত চেষ্টা, এত টাকা-পয়সা ব্যয় করে আমরা নিয়ে এলাম নছার হুকুম, আর আপনি ছেড়ে দিলেন তার ভাই পরম শত্রু নজাকে। আসল লোকটা পচতে লাগল জেলে, আর নকল গিয়ে বাড়ী বসে মাছের মুড়ো চিবোচ্ছে! ব্যাপারটা আমরা সহজে ছেড়ে দেব এই আপনি মনে করেন?'

মোক্তার উঠে পড়লেন। চাঁদবাবুকে উঠতে হ'ল। বোঝা গেল ভুলই হয়েছে—মারাত্মক ভুল। এক সঙ্গে হুটো অপরাধ—একটা লোককে বে-আইনি ভাবে আটকে রাখা, আর একটাকে বে-আইনি ভাবে ছেড়ে দেওয়া। চাকরি তো যাবেই, এর পরে আরো টানাটানি চলবে।

চাঁদবাবুর মনে পড়ল মায়ের কথা। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেছিলেন, "বাবা চাঁহু, আমরা বরং হুবেলা শাক-ভাত খাব। শ্যালদর ইষ্টেষণে গাড়ী চড়িসনে। ও আমাদের সইবে না।" মায়ের কথা না শুনেই আজ এই হুর্দ্দশা! যা হোক, মোক্তার বাবু লোকটি ভালো ছিলেন। কয়েক কাপ্ চা, এক থালা খাবার, পান সিগারেট এবং সেই সঙ্গে প্রচুর মিষ্টি বাক্যে আপ্যায়িত হয়ে তিনি বলে গেলেন এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করবেন না। চাঁদমোহনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

তার পরদিন রাত ন'টার সময় চাঁদমোহন খেতে বসেছেন। মাছের ঝোলটা

মুখে দিতেই চোখে ছলছল করে জল এসে গেল। ঠাকুরকে ডেকে বললেন, 'এটা কি রেঁধেছ ?'

ঠাকুর খুসী হয়ে বলল, 'আইজ্ঞা নলা মাছের রসা'।

—'তোমার মাথার রসা। ক'টা লঙ্কা দিয়েছিলে ?'

ঠাকুর বুঝতে পারলে না। চাঁদমোহন গলা চড়িয়ে বললেন, 'মরিচ, মরিচ! কতগুলো মরিচ দিয়েছ ?'

—'বারোডা আর আউধখান।'

চাঁদমোহন কোন কথা না বলে উঠে মুখ ধুতে গেলেন। এমনি প্রায়ই হয়, কোনদিন আধপেটা, কোনদিন অনাহার। শুতে যাবেন, হঠাৎ বাইরে ভীষণ গোলমাল। গিয়ে দেখেন, বাইরের ঘরের সাম্‌নে প্রায় এক হাট লোক। এক বুড়ো এক বুড়ী, একটি ঘোমটা-ঘেরা বৌ, আর নানা বয়সের ছেলেমেয়ে গুটি সাতেক। তাকে দেখে সবাই মিলে একসঙ্গে নানান্ সুরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। সেটা কান্না না কোরাস গান, চাঁদমোহন প্রথমটা বুঝতেই পারলেন না। বুড়ীর গলাটাই সকলের উপরে শোনা যাচ্ছিল,—'আমার নছারে নছা—আ-আ!' একটা লোক ওদের থামাবার চেষ্টায় ছিল। তাকে ডেকে চাঁদমোহন জানতে পারলেন যে এরা হচ্ছে নছার বাপ, মা, বৌ এবং ছেলেমেয়ের দল। নছাকে ছাড়া হয় নি, মোক্তারের কাছে এই খবর পেয়ে অনেক দূর থেকে ছুটে এসেছে। সারাদিন খাওয়া পর্য্যন্ত হয় নি। লোকটা আরো বললে, নছার বোন, পিসী, মাসী আর শালা এখনও খবর পায় নি। তারা কাল আসবে।

চাঁদমোহনের মাথাটা ঘুরে গেল। তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি নছাকে ছেড়ে দেওয়া যেত সে ব্যবস্থা তিনি এখনই করতেন। কিন্তু সে উপায় নেই। উপায় আছে, এই মুহূর্ত্তে চাকরি ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া। তাতেও সমস্যা মিটবে না। এই নছার জের তাঁকে টানতেই হ'বে। হাজার গণ্ডা কৈফিয়ৎ, তার পর কোর্ট, শেষ পর্য্যন্ত জরিমানা কিংবা জেল। নিস্তার তাঁর কোনমতেই নেই। চাঁদমোহন সেই বারান্দার উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে শুধু বেরোল, 'উঃ ভগবান!' তাঁকে ঘিরে কোরাস্ কান্না সমানে চলতে লাগল।

পর দিন। চাঁদমোহনের ঠাকুর অফিসে গিয়ে খবর দিলে তার বাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে ছুটে এসে দেখল, জিনিষপত্তর সব পড়ে আছে, ঘর খোলা, কেবল চাঁদমোহন নেই। জোর খোঁজ-খবর করা হ'ল। কলকাতায় টেলিগ্রাম, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন কোনটাই বাকী নেই। কিন্তু চাঁদমোহন এখনও নিখোঁজ।

জাপানী গল্প

(শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর)

সে অনেক দিনের কথা। জাপান তখন এত সভ্য হয় নাই। তখন জাপানীরা ছিল যেমন সরল, তাহাদের জীবনযাত্রাও ছিল তেমনি অনাড়ম্বর। তখন কিয়োটো ছিল রাজধানী। রাজধানী হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে সেগুারো নামে একজন সূত্রধর বাস করিত। সংসারে তাহার স্ত্রী ওহানা ও কন্যা ইরহি ছাড়া কেহ ছিল না। তিনটিতে একটি সুখের সংসার রচনা করিয়া দিন কাটাইত। কোন বিশেষ কারণে একবার সেগুারোকে রাজধানীতে যাইতে হইল। ওহানা কখনও একলা থাকে নাই—সে ত ভয়েই অস্থির। সেগুারো ওহানাকে অনেক বুঝাইয়া সাত দিনের মধ্যে আসিব বলিয়া চলিয়া গেল। সেগুারোর জ্ঞাতি ভাইবোনেরা তাহার স্ত্রী-কন্যার খোঁজ-খবর লইত। সাত দিনের জায়গায় একুশ দিন হইয়া গেল—তবু সেগুারো ফিরিল না। ওহানা ও ইরহি দুইজনে সারা দিন আশাপথ চাহিয়া থাকে—রাত্রিকালেও ভাল করিয়া ঘুমায় না—কাঁদাকাটা করে। সেকালে চিঠিপত্র পাঠানোরও সুযোগ ছিল না। পঁচিশ দিনের দিন সেগুারো ফিরিয়া আসিল। রাজধানীতে গিয়া সেগুারো একটি এমন কাজ পাইয়াছিল যাহাতে সে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিল। সেই অর্থে সে স্ত্রী-কন্যার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর সখের জিনিস আনিয়াছিল। সেইগুলি পাইয়া ওহানা ও ইরহি বড়ই

খুসী হইল। উপহারের জিনিসগুলির মধ্যে একটি আয়না ছিল। ওহানা কখনও আয়না দেখে নাই—আয়না বলিয়া কোন জিনিস আছে বলিয়াও সে জানিত না।

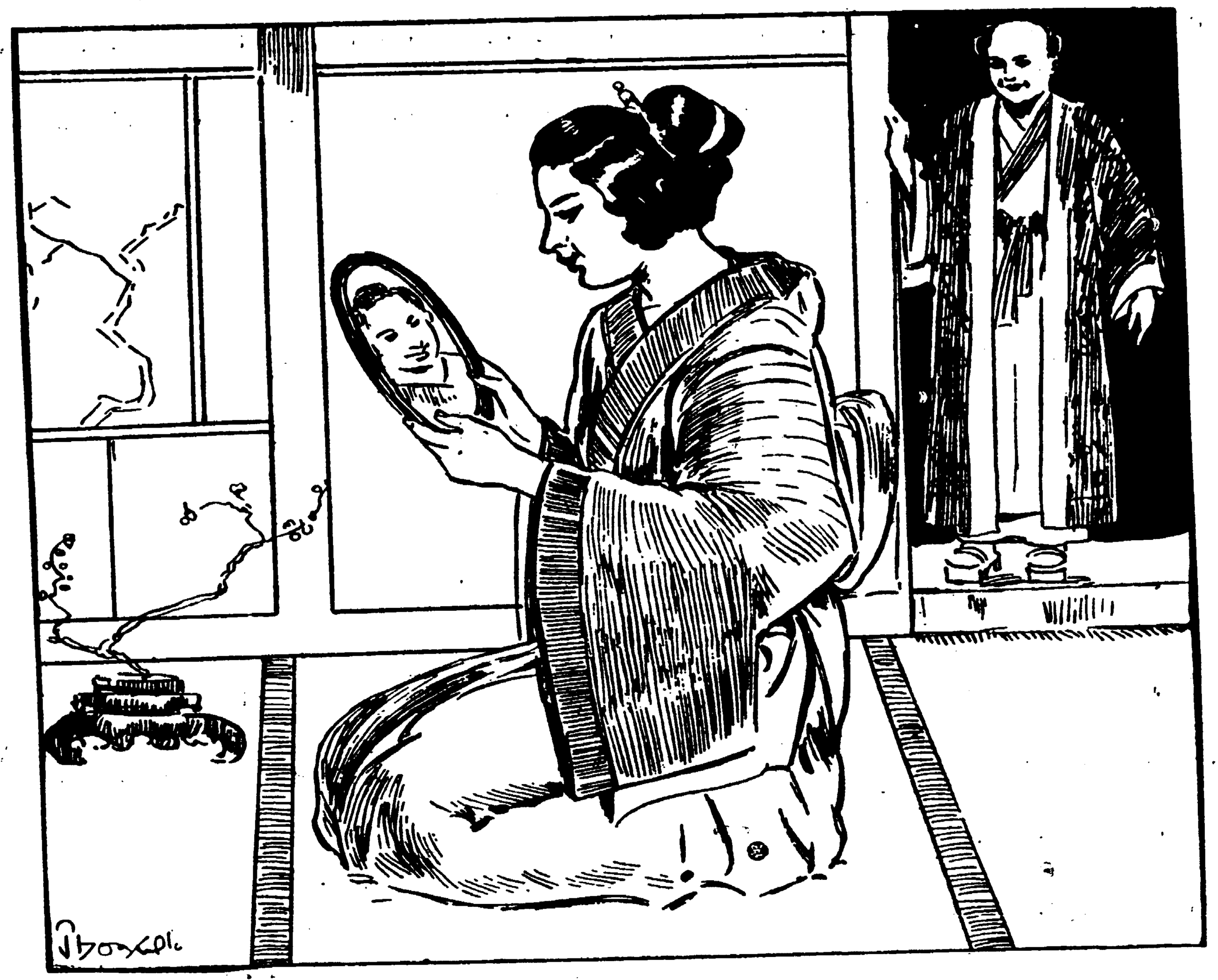

অবাক্ হইয়া গেল

শুধু ওহানা কেন— ওহানাদের গ্রামের কেহই আয়না চোখে দেখে নাই। ওহানা আয়নাটির পানে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সেণ্ডারো ওহানাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওটার মধ্যে কি দেখে অত হাস্‌ছ?"

ওহানা—"দেখছি, একটি সুন্দরী রমণী আমার মত পোষাক পরে হাসছে এবং আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চেষ্টা করছে। এ ভারি অদ্ভুত!"

সেণ্ডারো—"ও মেয়েটিকে তুমি কখনও কোথায় দেখেছ?"

ওহানা—"কোথায় যেন দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে—বড় সুন্দরী কিন্তু মেয়েটি, বার বার ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে—হয়ত ও কথা বল্‌বে একদিন।"

সেণ্ডারো—"আচ্ছা পাগল! ও মেয়েটি যে ওহানা ছাড়া অন্য কেউ নয়,

বুঝতে পারছ না? তোমারই মুখের ছবি ওতে পড়েছে—তুমি হাসছ তাই ও হাসছে—তুমি কথা কইছ তাই ও-ও কথা বলার ভঙ্গী করছে। ও জিনিসটার নাম আয়না। কিয়োটোর প্রত্যেক লোকের একটা ক'রে আয়না আছে। যে ওটার পানে চাইবে তারই মুখ ওতে ফুটে উঠবে।"

ওহানা নিজের রূপ নিজের চোখে দেখিয়া বড় আনন্দ পাইল, শুধু আনন্দ নয়—তার একটু অহঙ্কারও হইল। সে বুঝিতে পারিল—গ্রামের মধ্যে তাহার মত সুন্দরী কেহ নাই। ওহানা তাহার আয়নাখানিকে অতি যত্নে লুকাইয়া রাখিল। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর সুখস্বপ্নের মত অতীত হইতে লাগিল। ইরহি আর নেহাৎ বালিকাটি থাকিল না—সেও তরুণী হইয়া উঠিল, তাহার চেহারাও অনেকটা মায়ের মতই হইল। ওহানা তাহাকে আয়নাটি দেখায় নাই—আয়নার কথাও বলে নাই। আয়নায় নিজের রূপ দেখিয়া পাছে ইরহির মনে অহঙ্কার জন্মে—সেই ভয়ে মা আয়নাটিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে ইরহির যখন ১৫ বৎসর বয়স তখন ওহানা রোগে পড়িল— ইরহি প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু ওহানার অবস্থা দিন দিন খারাপই হইতে লাগিল। ওহানার প্রধান চিন্তা, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মেয়েটি কি করিয়া শোক সংবরণ করিবে? সরলা বালিকা, দুঃখ শোক কাহাকে বলে কখনও জানে না, মাতৃশোক সে ভুলিবে কি করিয়া? স্বামীর জন্যও তাহার উদ্বেগ অল্প ছিল না—তবু সে পুরুষমানুষ, কাজেকর্ম্মে কতকটা ভুলিয়া থাকিতে পারে—কিন্তু ইরহি ভুলিবে কি করিয়া? ওহানার জীবনদীপ ক্রমে নিভিয়া আসিতে লাগিল। ওহানা ইরহিকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া বলিল, "মা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—আমি ২।৪ দিনের মধ্যেই মর্‌ব। তোমাকে আমি একটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছি—তা এই বাক্সের মধ্যে আছে। আমি মরে গেলে এই বাক্সটি খুল্‌বে। এতে যে চকচকে একটা জিনিস আছে তার পানে চাইলেই তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাবে। আমি কথা কইতে পার্‌ব না—কিন্তু তোমার পানে চেয়ে থাকব। যখনই তোমার আমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে হবে তুমি সেই জিনিসটার দিকে চেয়ে থেক।"

ইরহি কাঁদিতে কাঁদিতে কাঠের বাক্সটি লইয়া তাহার পেটরার মধ্যে রাখিয়া

দিল। ওহানা ৪।৫ দিন পরেই চিরবিদায় গ্রহণ করিল। সেগুারো ৭।৮ দিন ধরিয়া কাঁদাকাটা করিল—তার পর কন্যাটির মুখ চাহিয়া আবার কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। ইরহির চোখের জল আর ফুরায় না, তাহার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। সেগুারো নিজে শোক সংবরণ করিয়া ইরহিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ইরহির কাছে সকল সান্ত্বনাই ব্যর্থ।

একদিন ইরহির মনে পড়িল—মায়ের দেওয়া কাঠের বাক্সটির কথা। ইরহি বাক্সটি খুলিয়া পাইল সেই আয়নাটি। আয়নাটির পানে চাহিয়া ইরহি দেখিল—তাহার মধ্যে সত্যই তাহার মা,—ম্লানমুখে তাহার পানে চাহিয়া আছে। মায়ের চেহারাটা কিন্তু তাহার অনেক দিনকার আগেকার। ইরহির বয়স যখন ৫।৬ বৎসর ছিল তখন তাহার মায়ের চেহারা যেমন ছিল আয়নার মধ্যে তেমনিটি সে দেখিতে পায়, একেবারে জীবন্ত। ইরহি দিনরাত আয়নাটির পানে চাহিয়া তাহার মাকে দেখে—মায়ের সঙ্গে কথা বলে; উত্তর পায় না বটে কিন্তু মা যে সব কথা শুনিতেছে ও বুঝিতেছে তাহা তাহার মনে হয়। আয়নাটিকে সে বুকে করিয়া রাখে—মাথার শিয়রে রাখিয়া ঘুমায়। সেগুারো দেখিল—কন্যা সারাদিন আয়নাটির পানে চাহিয়া থাকে, তাহার শোক আর নাই—সে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতেছে। সেগুারো ইরহিকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তুমি সারাদিন আয়নাটার পানে চেয়ে থাক কেন?" ইরহি বলিল—"বাবা, তোমাকে এত দিন বলি নি। এই আয়নাটার মধ্যে আমি মাকে দেখতে পাই—মা আমার পানে জীবন্ত-চোখে চেয়ে থাকেন। মা আমাকে মৃত্যুকালে এটা দিয়ে বলেছিলেন—'ইরহি, যখন আমাকে দেখতে ইচ্ছে হবে এটার মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাবে'। বাবা, মা আমাদের ছেড়ে একেবারে চলে যান নি—তিনি এ জিনিসটার মধ্যে লুকিয়ে আছেন। বাবা, তুমি মাকে দেখ্‌বে? এটার পানে চাও, তা হলেই দেখ্‌তে পাবে।"

সেগুারো সব কথা বুঝিল। কেন যে ওহানা ওটা ইরহিকে দিয়া ওকথা বলিয়া গিয়াছিল—কেন যে তাহাকে গোপন করিতে বলিয়াছিল—সেগুারো বুঝিল। হায়! সরলা বালিকা, নিজের চেহারাকেই মায়ের তরুণ বয়সের চেহারা

মনে করে—তাহাতেই সে সস্ত্বনা লাভ করিতেছে! এ জীবনের সকল সান্ত্বনাই মিথ্যা; এটাও মিথ্যা—এটাও স্বপ্ন। এই স্বপ্ন না ভাঙ্গাই উচিত। সেগুারো কন্যার হাত হইতে আয়নাখানি লইয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"হাঁ, তাই ত মা, তোমার মাকেই ত দেখতে পাচ্ছি! এত দিন আমাকে দেখাও নি কেন?"

ইরহি বলিল—"মা যে তোমাকে দেখাতে নিষেধ ক'রে গিয়েছিলেন; তুমি ধরে ফেল্‌লে তাই ত তোমাকে দেখালাম বাবা।"

সেগুারো আয়নাটির পানে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া রহিল; তাহার চোখ দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

ফুলের মূল্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জনতার কবলে

জন্ ডি উইট্ গাড়ীর জানলা দিয়া গলা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল?" কিন্তু কোচ্‌ম্যান্‌কে জবাব দিতে হইল না, সম্মুখের বিরাট্ ফটক তার বিরাট্ তালা আঁকড়াইয়া ধরিয়া যেন নিজেই বিদ্রূপের স্বরে তার জবাব দিল।

তখন আর ভাবিবার সময় ছিল না। হয়তো অন্য কোন ফটক এখনও খোলা আছে, তার কোনটায় পৌঁছিতে পারিলে হয়তো এখনও কোনও রকমে প্রাণরক্ষা হইতে পারে—কোচ্‌ম্যান্ ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া প্রাণপণে চাবুক কষাইয়া দিল।

কিন্তু বিধির বিধান ইহাকেই বলে। জন্ যখন জানলা দিয়া গলা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে সম্মুখের এক দোকান হইতে একটি লোক তাঁকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং চিনিতেও ভুল করে নাই। এই লোকটি এক মদওয়ালা—এতক্ষণ সে বিশেষ একটা কাজে দোকানে আটকা পড়িয়াছিল কিন্তু মন তার ছিল কারাগারের দিকে,—কতক্ষণে তার দেশ-ভাইদের সঙ্গে যোগ দিয়া সেও উইট্ ভাইদের লইয়া একটু মজা করিবে সেই চিন্তাতেই সে বিভোর

হইয়া ছিল। এখন জন্‌কে এমন অতর্কিত ভাবে পালাইতে দেখিয়া সে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধি যোগাইতেও তার বেশী সময় লাগিল না। কোচ্‌ম্যান্ গাড়ী ঘুরাইবার আগেই সে তারই মত জনা দশ-বারো লোক জড় করিয়া গাড়ীর পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল, এবং "থামাও, থামাও" বলিয়া চীৎকার যুড়িয়া দিল।

জন্ ভিতর হইতে দৃঢ়স্বরে হুকুম দিলেন—"গাড়ী থামিও না, জোরে চালিয়ে যাও"। কোচ্‌ম্যান্ ঘোড়া দু'টিকে আবার চাবুক কষাইয়া দিল, গাড়ী আবার আগাইয়া চলিল; পরমুহূর্ত্তেই দুই ভাই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করিলেন, গাড়ীর চাকা যেন কোন উঁচু জিনিষের উপর দিয়া গড়াইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল আর্ত্তনাদ ও সম্মিলিত চীৎকার আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল। কর্ণেলিয়াস্ এতক্ষণ নির্লিপ্ত ভাবে গাড়ীর ভিতর শরীরটাকে এলাইয়া দিয়াছিলেন, এবার ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "কি হ'ল দাদা? আমার মনে হচ্ছে গাড়ী বোধ হয় কাউকে চাপা দিয়েছে।" জন্ ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বোধ হয়"; তার পর কোচ্‌ম্যান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "চালাও চালাও, এক মুহূর্ত্তের জন্য গাড়ী থামিও না।" দৃঢ়চিত্ত কোচ্‌ম্যান্ প্রভুর আদেশ পালন করিতে বিন্দুমাত্র দেরী করিল না, কিন্তু সেও কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। কয়েক গজ আগাইয়া গাড়ী বাঁক ফিরিতেই দেখা গেল তাদের ঠিক সামনা সামনি ঝড়ের মত বেগে এবং তেমনি গর্জ্জন করিতে করিতে হাজার হাজার লোক ছুটিয়া আসিতেছে। এরাই এতক্ষণ কারাগার অবরোধ করিয়া ছিল—সেখানে হতাশ হইয়া দুই ভাই-এর খোঁজে টোলহেক্ ফটকের দিকে আসিতেছে।

এখন আর জীবনের আশা করা বৃথা। জন্ কোচ্‌ম্যান্‌কে তাড়াতাড়ি নামিয়া ছুটিয়া পালাইতে বলিলেন, কিন্তু প্রভুভক্ত কোচ্‌ম্যান্ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তাঁদের অসহায় ফেলিয়া এক পা নড়িতে রাজী হইল না।

তার পর যে ঘটনা ঘটিল 'তা যেমনি বেদনাময়, তার বর্ণনা করাও তেমনি অসাধ্য। ঝড়ের মুখে ছোট্ট একগাছা কুটার মত গাড়ীখানি সেই জনসমুদ্রের উপর ক্ষণেকের জন্য ভাসিয়া উঠিল, তার পরই কাৎ হইয়া একদিকে গড়াইয়া পড়িল, একজন রসিক কামার তার লোহার হাতুড়ী দিয়া ঘোড়া দু'টির মাথা ইতিপূর্ব্বেই থেঁৎলাইয়া দিয়াছিল। তার পর উন্মত্ত জনতা কর্ণেলিয়াস্‌কে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁকে দুর্ব্বলদেহে দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার সহিতে হইল না। 'কে একজন পিছন হইতে একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়া তাঁর মাথায় আঘাত করিল। টলিতে টলিতে কর্ণেলিয়াসের প্রাণহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

এইবার জনের পালা। জন্‌কে কিন্তু কষ্ট করিয়া গাড়ী হইতে বাহির করিতে হইল না। "আমার ভাইকে কোথায় নিয়ে গেল—কোথায় নিয়ে গেল—কোথায় নিয়ে গেল!" বলিতে

বলিতে পাগলের মত তিনি নিজেই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং পরমুহূর্ত্তে কর্ণেলিয়াসের দিকে চোখ পড়িতেই অব্যক্ত যন্ত্রণায় দুই হাতে চোখ ঢাকিলেন।

"চোখ বন্ধ করা হচ্ছে? আচ্ছা, ও চোখ এখনই খুলে দিচ্ছি" বলিয়া ভীড়ের মধ্য হইতে একজন আসিয়া তাঁর চোখে ছুরি বসাইয়া দিল; গল্ গল্ করিয়া তাজা রক্ত বাহির হইয়া জনের সমস্ত মুখ ভাসাইয়া দিল। দৃষ্টিহীন চোখে "আমার ভাই আমার ভাই" বলিতে বলিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। তার পর ভীড়ের মধ্যে যেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয় গেল—কে আগে জন্‌কে হত্যা করিতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তারই। ছুরি, লাঠি, বন্দুক, পিস্তল—যে যা অস্ত্র যোগাড় করিয়াছিল সমস্তই বৃষ্টির মত জনের উপর পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড পেন্‌সনারির শেষ নিঃশ্বাস সেই জনারণ্যের ভারী বাতাস ভেদ করিয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল।

কিন্তু দুই ভাইকে হত্যা করিয়াও জনতার তৃপ্তি হইল না। তার পর তারা নিতান্ত পৈশাচিক ভাবে সেই মৃতদেহ দু'টির উপরই নানা রকম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত একজন নরপিশাচ তাঁদের দেহের কতক অংশ কাটিয়া লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া সারা সহরে ফেরী করিয়া আসিল। হল্যাণ্ডের ইতিহাসে এ কলঙ্ক-কথা চিরদিন গাঁথা হইয়া থাকিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের ধর্ম্মছেলে

হেগ্ সহরে যখন এই ব্যাপার ঘটিতেছিল তখন জন্ ডি উইটের বিশ্বাসী চাকর ক্রেক্ নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে চিঠি লইয়া ডর্ট্ সহরের দিকে চলিতেছিল। পাছে লোকে কিছু সন্দেহ করে সেজন্য সে ইতিপূর্ব্বেই ঘোড়া হইতে নামিয়া একটা নৌকা ভাড়া করিয়া জলপথে রওনা হইয়াছে।

নদীর ধারে ধারে ঢালু পাহাড়ের গায়ে পরিচ্ছন্ন সহরটি—দূর হইতে দেখিলে নিপুণ শিল্পীর আঁকা একখানা ছবি বলিয়া মনে হয়। লাল লাল বাড়ীগুলির ফাঁকে ফাঁকে ইতস্ততঃ অনেকগুলি 'উইণ্ড মিল্' ছড়ান। তারই আশেপাশে সবুজ গাছ আর রঙ্গিন ফুলের মেলা। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীরই বারান্দা নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই বাড়ীগুলির মধ্যেই 'এল্‌ম্' আর 'পপ্‌লার' গাছে ঘেরা সব চেয়ে পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য যে বাড়ীটা দূর হইতে নজরে আসিতেছিল সেটাই ক্রেকের গন্তব্য স্থান। নৌকা হইতে নামিয়া সে দ্রুতপদে এই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। এই বাড়ীর মালিক একটি দীর্ঘকায় তরুণ যুবক—ডাক্তার কর্ণেলিয়াস্ ভ্যান্ বার্ল্। এরই কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের মুখে শুনিয়াছিলাম। ক্রেক্‌কে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়িয়া আমরা এবার এরই পরিচয় লইব।

কর্ণেলিয়াস্ ভ্যান্ বার্ল্‌রা তিন পুরুষ ধরিয়া ডর্ট্ সহরের অধিবাসী। তার 'ঠাকুরদা' ব্যবসা করিয়া প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করেন আর তার বাপও বোধ হয় সে টাকা আরও কিছু বাড়ান ছাড়া একটি পয়সা কমাইয়া যান নাই। লোকে (এবং তিনি নিজেও) ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, তাঁদের টাকা তিনি, তাঁর বাবা, আর যে কারিগর সে টাকা তৈরী করিয়াছে এই তিন জন

দূর হইতে নজরে আসিতেছিল

ছাড়া আর কেউ হাত দিয়া ছোঁয় নাই। কাজেই ভ্যান্ বার্লের বাবা যখন মৃত্যুকালে নগদ লাখ তিন-চার গিল্ডার (ওলন্দাজীয় মোহর) আর বছরে হাজার দশেক গিল্ডার আয়ের একটা সম্পত্তি একা তার জন্য রাখিয়া গেলেন তখন একেবারে আশ্চর্য্য হইবার মত কেউ ডর্ট্ সহরে ছিল না।

অত টাকা লইয়া ভ্যান্ বার্ল্ বড়ই বিপদে পড়িল। বেচারা লেখাপড়া শিখিয়াছিল যেমন প্রচুর তেমনি স্বভাবটিও পাইয়াছিল একেবারে লাজুকের। তার ধর্ম্মবাপ কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ তাকে দেশের কাজে—রাজনীতিক্ষেত্রে নামাইয়া একজন হোমরা-চোমরা লোক করিয়া দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, এমন কি গ্র্যাণ্ড পেন্‌সনারি জন্ নিজেও অনেক বুঝাইলেন কিন্তু ভ্যান্ বার্ল্ ও ধার দিয়াও গেল না। একবার "সাউথ্ ওল্ড্" যুদ্ধের সময়ে ঘটনাচক্রে ভ্যান্ বার্ল্‌কে একটা যুদ্ধ-জাহাজের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে অনেক দিন পর্য্যন্ত

অনেক ভবিয়াও ঠিক করিতে পারে নাই, অমন হুড়াহুড়ি, খুনাখুনির মধ্যে—যেখানে চোখ-কান বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোন কিছুই করার উপায় নাই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া লোকগুলি তাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে পারে কি করিয়া! বলা বাহুল্য তার পর সে আর কোন দিন কোন যুদ্ধ-জাহাজের ধারে-কাছেও যায় নাই।

সময় কাটাইবার জন্য ভ্যান্ বার্ল্ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মন দিল। গবেষণার বিষয় হইল গাছপালা এবং কীট পতঙ্গ। সে রাজ্যে যত জাতের গাছ ছিল, পোকা ছিল তাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া, তাদের চালচলন, রীতিনীতি সম্বন্ধে নতুন নতুন আবিষ্কার করিয়া শীঘ্রই সে শিক্ষিত সমাজকে তাক্ লাগাইয়া দিল। এ সম্বন্ধে মোটা রকম একখানা বইও সে লিখিয়া ফেলিল, আর ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য তার ছবিগুলি নিজের হাতে আঁকিয়া দিল। এজন্য তাকে কিছু চিত্রবিদ্যারও চর্চ্চা করিতে হইল। কিন্তু এত করিয়াও তার মনে হইল সময় যেন কাটিতে চায় না। এদিকে খরচ করিতে না জানায় তার টাকাও দিন দিন এমন হারে বাড়িয়া চলিল যে শেষ পর্য্যন্ত এই লাজুক ছেলেটিও দস্তুরমত ঘাবড়াইয়া গেল। এমন সময় তার মাথায় এক নতুন নেশা চাপিল—সে আরম্ভ করিল টিউলিপ ফুলের চর্চ্চা।

টিউলিপ এক রকম বড় বড় ফুল, দেখিতে অনেকটা পাগড়ীর মত—বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাকে নানা রংএ ও নানা চেহারায় আনা যায়। এই সময়ে হল্যাণ্ড, পর্টুগাল প্রভৃতি দেশে টিউলিপের চর্চ্চা যেন একটা জাতীয় নেশার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যাঁরা এ লইয়া চর্চ্চা করিতেন তাঁদের যেন আর সংসারের কোন কিছুর উপরই মোহ থাকিত না—ঐ লইয়াই দিনরাত মাতিয়া থাকিতেন। এই টিউলিপ লইয়া এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলিত খুব। কে একটু নতুন ধরণের ফুল তৈরী করিতে পারে—কে তাকে একটু নতুন রকম রং দিতে পারে এ লইয়া রীতিমত রেষারেষি হইত। যারা ভাল ফুল করিতে পারিত তাদের কদরের সীমা ছিল না—দেশ-বিদেশ হইতে লোকে তাদের বাগানের ফুল দেখিতে আসিত, সবাই তাকে একটা মস্ত লোক বলিয়া মনে করিত।

ভ্যান্ বার্ল্ যে কাজে হাত দিত মন-প্রাণ ঢালিয়াই তা করিত, কাজেই সাফল্যও লাভ করিত অদ্ভুত। তা ছাড়া টিউলিপ ফুলের চর্চ্চা আরম্ভ করিলে নাকি এমনিই মানুষের আহার-নিদ্রা জ্ঞান থাকে না, কাজেই ভ্যান্ বার্ল্ যে এতে আশ্চর্য্য বাহাদুরী দেখাইবে তাতে আর বিচিত্র কি? দেখিতে দেখিতে ভ্যান্ বার্লের তৈরী টিউলিপের নাম দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত মিউজিয়াম, লাইব্রেরী প্রভৃতি দেখিবার জন্য যেমন লোকের ভীড় হয় তেমনি তার ফুল দেখিবার জন্যও, দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল।

আগেই বলিয়াছি ভ্যান্ বার্লের টাকার অভাব ছিল না, বরঞ্চ কি করিয়া তা খরচ করা

যায় তা-ই হইয়াছিল ভাবনা। এখন এই নতুন নেশায় মাতিবার পর সে তার সমস্ত আয় টিউলিপ ফুলের পেছনে খরচ করিতে লাগিল। ভাল করিয়া টিউলিপের চর্চ্চা করিতে হইলে অনেক টাকার দরকার। ভ্যান্ বার্ল্ কৃত্রিম উপায়ে বাগানের মাটীকে ঠিক টিউলিপ জন্মাইবার আদর্শ মাটী করিয়া তুলিল, কৃত্রিম ভাবে ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু আলো, ততটুকু তাপ, এবং জল-কণার ব্যবস্থা করিল। আর করিল এক সুন্দর ল্যাবরেটরী। এই ল্যাবরেটরীতে বাল্ব্ * রাখিবার চমৎকার ব্যবস্থা হইল, কৃত্রিম উপায়ে তা শুকাইবার জন্য আলাদা ঘর তৈরী হইল—আরও খুঁটিনাটি কত কিছুর ব্যবস্থা হইল! দেখিতে দেখিতে ভ্যান্ বার্ল্ তিনটি একেবারে নতুন ধরণের টিউলিপ্ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাদের একটির নাম রাখিল সে তার বাবার নাম দিয়া, একটির নাম রাখিল ধর্ম্মবাপের নাম দিয়া, আর একটির নাম দিল মায়ের নামে।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ একবার কয়েক মাসের জন্য ডর্ট্‌এ আসিলেন। ডর্ট্-এই ছিল তাঁর বাড়ী। রাজনৈতিক মতের জন্য এই সময় হইতেই তিনি জনসাধারণের চোখে খাটো হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যদিও সহরের প্রতিপত্তিশালী নেতা বলিয়া বাহিরে সকলে তাঁকে তখনও খাতির দেখাইত কিন্তু ভিতরে ভিতরে সবাই তাঁর প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল। কর্ণেলিয়াস্ ডর্ট্-এ পৌঁছিয়াই বাড়ী-ঘর-দুয়ার একটু-আধটু মেরামতের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া চলিলেন তাঁর ধর্ম্মছেলের বাড়ীতে। তাঁর আসিবার খবর সহরশুদ্ধ কোন লোকেরই অজানা ছিল না,—এ লইয়া সেখানে একটু হৈ-চৈও পড়িয়া গিয়াছিল। শুধু একজন লোক এ বিষয়ে কোনও খোঁজ রাখিত না। সে তাঁর এই ধর্ম্মছেলেটি। সে তখন নিজের মনে ল্যাবরেটরীর কোণে বসিয়া নিজের কাজে তন্ময় হইয়া ছিল। কর্ণেলিয়াসের আসিবার খবর ভ্যান্ বার্লের না রাখার আর একটা কারণ আগেই বলিয়াছি, ভ্যান বার্ল্ রাজনীতির কোন ধারই ধারিত না, আর স্বভাবও ছিল তার অত্যন্ত লাজুক—সহরে কখন কি নিয়া আন্দোলন উঠিতেছে এ সব খবর তার কানে কদাচিৎ পৌঁছিত। এই কারণেই সহরশুদ্ধ লোক তার ধর্ম্মবাপের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে ক্ষেপিয়া গেলেও এই তরুণ তপস্বীটিকে খুবই ভাল বাসিত—শ্রদ্ধা করিত। মানুষ যে কেমন করিয়া মানুষের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে ভ্যান্ বার্লের মাথায়ও তা কখনও ঢুকিত না। অথচ, দুনিয়ার এমনই নিয়ম, এই সদানন্দ দেবতুল্য মানুষটিরও একজন প্রচণ্ড শত্রু ছিল। সে শত্রু

* টিউলিপ ফুলের গাছ ঠিক সাধারণ গাছের মত নয়। অনেকটা পেঁয়াজ, লিলি প্রভৃতি জাতীয় গাছ। এই গাছের কাণ্ডের খানিকটা মাটীর নীচে থাকে, তাকে বলা হয় বাল্ব, সেগুলি সুপুষ্ট খোসায় ঘেরা। ইহার মধ্যে খাবার সঞ্চিত থাকে। সেখান হইতেই নতুন বোঁটা বাহির হইয়া তার উপর পাতা ও ফুল গজায়। ফুল হইলে পরে আবার আগেকার মত নতুন বাল্ব্ তৈরী হয়।

এমনই ভীষণ যে তার তুলনায় জন্ ও কর্ণেলিয়াস্ ডি উইটের শত্রুরাও বোধ হয় হার মানিয়া যায়। (ক্রমশঃ)

সাক্ষিগোপাল

(শ্রীজগৎমোহন সেন, বি-এস্-সি, বি-এড্)

কাঞ্চীর দু'জন ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। একজন বৃদ্ধ আর একজন যুবক।

দু'জনে ভিন্ন গ্রামবাসী। আগে থাকতে পরস্পরের মধ্যে চেনা-শোনা ছিল না, পরিচয় হয়েছিল পথে। দু'জনে একই পথের যাত্রী। কাজেই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল।

বৃন্দাবনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অসুখে পড়ে গেলেন,—পীড়া সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। যুবক প্রাণপাত সেবা করে ব্রাহ্মণকে মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলে।

বৃন্দাবনের কাছে গিরিগোবর্দ্ধন

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ দু' হাত দিয়ে যুবকের হাত দু'টি চেপে ধরলেন, বললেন, 'বাবা, সত্যিই তুমি আমার বাবাই ছিলে গত জন্মে। অপরিচিত, ভিনগাঁয়ের লোক তুমি, কিন্তু এ অসুখে তুমি আমার যা করলে এ আমার নিজের ছেলেও পারত না।'

যুবক নিজের প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে বললে, 'তাতে আর হয়েছে কি? অত করে বলবেন না, আমার বড় সঙ্কোচ হচ্ছে। আমি ত' আপনার ছেলের মতই। তা' ছাড়া, বিদেশে এসে যদি স্বদেশের লোক পরস্পরকে সময়-বিশেষে দেখাশোনা না-ই করে, তবে চলবে কি করে? আমি মাত্র কর্ত্তব্য করেছি বই-ত নয়।'

—'যাই বল বাবা, তোমার ঋণ এ-জীবনে শোধ হবার নয়। কি দিলে যে এর শতাংশের একাংশও শোধ হবে তা ভেবে পাচ্ছি না।'

—'ছি-ছি, অমন করে বলে আমায় অপরাধী করবেন না। বলেছি ত' আমি আপনার ছেলের মত।'

—'হাঁ বাবা, তুমি আমার ছেলের মতই,—তাই বা কেন, তুমি তার চেয়েও বেশি। আচ্ছা, বল, হবে তুমি আমার ছেলে? জানই ত' আমি অপুত্রক। একটি মাত্র মেয়ে ভিন্ন অন্য সন্তান আমার নেই। আমি অনুরোধ করছি আমার কমলাকে তুমি গ্রহণ কর। পুত্রহীন আমার পুত্রের স্থান অধিকার করে আমার বাড়ীতে থাক। আমাকে যে অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছ তা' থেকে মুক্ত হবার একটু সুযোগ দাও। আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে। আমার অবর্ত্তমানে সে সব আমার কন্যা-জামাতার অধিকারে আসবে। তোমারও ত' ত্রিসংসারে কেউ কোথাও নেই বলছ;—তা তুমিও মা-বাপ পাবে, আমরাও ছেলে পাব। বল, তুমি সম্মত?'

—'দেখুন, সম্মতি হয়ত দিতে পারতাম। কিন্তু যে কারণগুলি দেখিয়ে আপনি আমাকে সম্মত করতে প্রয়াস পাচ্ছেন, ঠিক সেইগুলিই আমার সম্মতি দেবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মোট কথা, আপনার প্রস্তাবে রাজি হ'তে আমার ভয় করছে। আপনি বড়লোক, সমাজে আপনার আসন আমার অনেক উপরে। আমি দরিদ্র, চালচুলোহীন একটা ভবঘুরে। তিনকুলে পরিচয় দেবার মতও আমার কেউ নেই। আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে আপনার মাথা হেঁট হবে। তা' ছাড়া, আজ আপনি মনের আবেগে যা' বলছেন, সে ইচ্ছা বাড়ী ফিরে আপনার থাকবেও না। কেন মিছে আমাকে আশা দিয়ে শেষে বুড়োবয়সে প্রত্যবায়গ্রস্ত হবেন?'

—'বল কি? আচ্ছা, তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে? বেশ, আমি এই গোপালের

মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করলাম, তোমার হাতে আমার একমাত্র সন্তান কমলাকে সমর্পণ করব, করব, করব,—তিন সত্যি। গোপাল সাক্ষী।'

* * *

শেষ পর্য্যন্ত যুবকের কথাই কিন্তু হ'ল ঠিক। তীর্থ-মাহাত্ম্যেই হোক আর কাল-মাহাত্ম্যেই হোক যেটুকু সাধু-বুদ্ধি ব্রাহ্মণের মনে ধূপের মত ভুরভুরিয়ে উঠেছিল, বাড়ী ফিরে বিষয়ের আব-হাওয়ায় সেটুকু ধূপের ধোঁয়ার মতই মিলিয়ে গেল। সত্যিই ত', এমন বোকা কে আছে যে জেনেশুনে আপনার একমাত্র আদরের মেয়েটিকে একটা হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলের হাতে তুলে দেবে? কিন্তু, সেই যে গোপালের মন্দিরে বসে শপথ! বৃদ্ধ মহা-দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

আত্মীয়-পরিজন অভয় দিয়ে বললে, 'হুঁঃ! ভারি ত শপথ, তার আবার এত! আরে দায়ে পড়ে লোকে কি না বলে? তাই বলে কি সেটা একটা কথার মধ্যে ধর্ত্তব্য! গোপালকে সাক্ষী মেনেছ, গোপাল কি আর সাক্ষী দিতে আসছেন? আমরা থাকতে কোন ভয় নেই, আমরাই সব ঠিক করে দেব।'

সত্য আর স্নেহের যুদ্ধে স্নেহই হ'ল জয়ী। যুবক যখন পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতিমত বৃদ্ধের জামাতৃ-পদের উমেদার হয়ে দাঁড়াল তখন দেখা গেল বৃদ্ধের স্মৃতিশক্তি বলে কোন বালাই নেই। যুবককে জামাই করবেন বলেছিলেন—এ কথা তিনি কিছুতেই মনে আনতে পারলেন না।

পাড়ার লোকে বললে, 'বেশ, এ সব কথা হয়েছিল কার সামনে, সাক্ষী কে?'

যুবক জানিয়ে দিল যে সেখানে অন্য কেউ ছিল না বটে, তবে গোপালকে সাক্ষী রেখে গোপালের মন্দিরে উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি ত' ওঁর জামাই হ'বার জন্যে ওঁকে সাধ্য-সাধনা করি নি, বরং মানাই করেছিলাম। উনিই ত' তখন গোপালকে সাক্ষী করে তিন সত্যি করে বসলেন। আমি তখনই জানি উনি বাড়ী ফিরে কথা রাখতে পারবেন না। এত ঝঞ্ঝাট না বাধালেই চল্‌ত।'

—'আরে ও সব ফাঁকি দেখাচ্ছ কাকে? গোপাল আবার সাক্ষী! একটা ধাপ্পা দিলেই হ'ল আর কি?'

—'কেমন, দেবতার সামনে মন্দিরে যে শপথটা করলেন সেটা হ'ল ধাপ্পা! গোপালের সাক্ষী হওয়াটা একেবারে উড়ো কথা!'

—'এ ত' আচ্ছা পাগল হে! ততক্ষণ থেকে কেবল গোপাল সাক্ষী, গোপাল সাক্ষী করে চেঁচাচ্ছে। বলি, গোপাল কি এখানে এসে সাক্ষী দেবেন?'

—'কেন দেবেন না?'

—'বেশ, তা' যদি পার, গোপালকে দিয়ে যদি সাক্ষী দেওয়াতে পার তবে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করব।'

—'বেশ, তবে তাই সই।'

২

যুবকের অসীম বিশ্বাস। সে বৃন্দাবনে ফিরে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গেল, গোপাল এসে সাক্ষী দেন ভাল, নয়ত সে আর দেশে ফিরবে না।

বৃন্দাবনে গোপালজীউ-মন্দিরে যুবক "হত্যা" দিয়ে পড়ে রইল, মুখে অন্ন নেই, চোখে নিদ্রা নেই।

মানুষের চেয়ে হয়ত পাষাণ-দেবতার বুকটা নরমই হবে। এখন ত' আমরণ অনশনেও প্রভুদের কৃপালাভ লোকের কপালে জোটে না, কিন্তু যুবকের তিনদিনের প্রায়োপবেশনে গোপালের আসন টল্‌ল। যুবককে তিনি মোহাচ্ছন্ন করে স্বপ্নে জানালেন যে সাক্ষী দিতে তিনি প্রস্তুত। বললেন, 'তবে একটা কথা আছে, তুমি আগে আগে চলবে আর আমি যাব তোমার পেছনে। খবরদার, গ্রামে পৌঁছবার আগে পিছন ফিরে আমার পানে তাকিও না। যদি তাকাও তবে সেখানেই আমার বৃন্দাবন বসাতে হ'বে, আর এক পাও নড়ব না। রাজী ত?'

যুবক বললে, 'রাজী। কিন্তু তুমি যে আসছ আমার পেছনে তা জানব কি করে?'

গোপাল বললেন, 'কেন, তোমার পায়ের নূপুরে শব্দ হবে!'

—'বেশ, তবে তাই।'

পর দিন যুবক আবার নিজের গ্রামের পথ ধরল। পেছনে ঝুমুর ঝুমুর নূপুরের শব্দ হচ্ছে,—দেবতার প্রসন্নতা লাভ করেছে বলে সে মহা খুসী।

কাবেরীর কূলে এসে ঘটল বিপদ। বালির মধ্যে গোপালের পা ঢুকে যেতে লাগল,—নূপুরের শব্দ আর শোনা যায় না। যুবকের মনে সন্দেহ হ'ল। এত দিনের মধ্যে সে একবারও পেছন ফিরে দেখে নি সত্যিই গোপাল আসছেন কিনা। কেবল মাত্র নূপুরের শব্দে ভরসায় বুক বেঁধে সে চলেছিল। নূপুর শুনতে না পেয়ে সে সন্দিগ্ধ মনে ফিরে দেখতে গেল ব্যাপার কি।

আর ব্যাপার কি! গোপাল সেখানেই অচল পাথরের মূর্ত্তি ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যুবকের শত অনুনয়েও অচল মূর্ত্তি আর সচল হ'ল না।

অগত্যা যুবক একাই গ্রামে ফিরে গেল। গ্রাম সেখান থেকে অল্পমাত্র পথ। গ্রামের লোকে যুবকের কথা বিশ্বাস করল,—নদীর বালিতে গোপালের মূর্ত্তি স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন, তারা স্বচক্ষে দেখেছে। অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

বৃদ্ধ দেবতার ভয়ে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি পালন করলেন।

৩

কিন্তু এ পর্য্যন্ত গল্পই বললাম, এ যুগের বিশ্বাসের অযোগ্য,—স্রেফ গাঁজাখুরি, আজগুবি ব্যাপার।

বাকিটা কিন্তু ইতিহাস। অবিশ্বাস হবার মত এতে কিছু নেই।

সাক্ষী দিতে এসেছিলেন বলে গোপালের নাম হ'ল সাক্ষী-গোপাল। কাঞ্চী-রাজ মহা সমারোহে গোপাল-মূর্ত্তিকে রথে বসিয়ে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। মন্দিরে গোপালের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

কাঞ্চীরাজের আতিথ্যে রাখাল-রাজের দিনগুলো কাটছিল খুব চমৎকার। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে আসার যে একটা দুর্ভোগ আছে সেটি তাঁর তখনও ছিল তোলা। উকিলে জেরা করে নি, চাপরাশিতে হলফ পড়ায় নি,—সাক্ষীর কি এত সহজে পার পাবার কথা?

তাই বলে সে সব হবার যুগও সেটা ছিল না। সুতরাং দুর্ভোগ এল অন্য রূপে।

উৎকল-রাজ পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন;

কিন্তু উৎকলের রাজাকে জগন্নাথের রথের সামনে ঝাড়ু দিতে হয় বলে "চণ্ডাল"-এর হাতে মেয়ে দিতে রাজার আপত্তি হ'ল।

পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চী আক্রমণ করলেন। কাঞ্চী-রাজের পরাজয় হ'ল। যুদ্ধের পর উৎকলের গজপতি মহারাজের কাছে বন্দীদের নামের যে তালিকাটি পেশ করা হ'ল তাতে এই নামগুলি ছিল :—

প্রথম—রাজকন্যা পদ্মাবতী,- এঁর জন্যই যুদ্ধ।

দ্বিতীয়—কাঞ্চীরাজের ইষ্টদেব গণেশ,—এঁর অপরাধ এই যে এঁর কৃপায় প্রথম যুদ্ধে গজপতির পরাজয় হয়েছিল।

তৃতীয়—সাক্ষিগোপাল—অপরাধ এঁর মূর্ত্তি অতি সুন্দর। এমন চমৎকার গোপালমূর্ত্তি সাধারণতঃ দেখা যায় না।

বিজয়ী পুরুষোত্তম দেব পরম ভক্তি-সহকারে গোপালকে রথে বসিয়ে কটকে নিয়ে এলেন। সেখানেও বছর কয়েক বেশ কেটে গেল।

এবার বিপদ্ বাধাল কালাপাহাড়। রামচন্দ্রদেব তখন উৎকলের গজপতি। দেবদ্রোহী কালাপাহাড়ের আক্রমণের ভয়ে তিনি গোপালকে নিয়ে খোরধায় লুকিয়ে রাখলেন। সেখানেও যখন বারে বারে পাঠানদের আক্রমণ হ'তে লাগল তখন গোপালকে জট্‌নির (খোর্‌দা-রোড্) কাছে রথি-পুরে এনে রাখা হ'ল। সেখানেও সেই একই ভয়;—অগত্যা গোপালকে আবার দেশছাড়া হ'তে হ'ল। এবার স্থান হ'ল চিলিকার কাছে বন্ত্‌লু-বাই গ্রামে। এ যেন কালাপাহাড় ত' নয়, পুরাণের সেই কাল-যবন।

যাই হোক, তার পর থেকে সাক্ষিগোপাল সেই বন্ত্‌লু-বাইতেই ছিলেন। মাত্র এক শতাব্দী পূর্ব্বে এক ব্রহ্মচারী আবার গোপালকে এনে পুরীর কাছে এক গ্রামে প্রতিষ্ঠা করলেন,—গ্রামের নাম দেওয়া হ'ল সত্যবাদী। সেই থেকে সত্যবাদীতেই গোপাল আছেন। তাঁর আগেকার অস্থায়ী আস্তানাগুলি এখন হয়ত বাদুড়ের দল ভাড়া করেছে।

দস্যুর দলে ভোমরা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

১০

বিরিঞ্চি আর বসন্ত

সেই সরু স্যাঁৎসেঁতে গলিতে, অন্ধকার দুর্গন্ধ আবহাওয়ায় বসন্ত আর বিরিঞ্চি একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। তার পর বিরিঞ্চি বল্‌লে, 'এসো নামি।'

নামবার সময় বসন্তর পা দুটো একটু কাঁপছিলো। বিরিঞ্চির মুখও একটু ফ্যাকাশে। মিটারে দেখা গেলো মাত্র এক টাকা বারো আনা উঠেছে। বিরিঞ্চি বল্‌লে ট্যাক্সিওলাকে: 'তোমাকে দশ টাকার নোট দিয়েছিলুম, বাকিটা ফিরিয়ে দাও।'

'ফিরবেন না আপনারা?'

'ফিরতে দেরি হবে।'

'আমি থাকতে পারি, যদি বলেন।'

'না, থাকতে হবে না।'

একটু চুপ ক'রে থেকে টেক্সিওলা বল্‌লে, 'ওয়েটিং চার্জ লাগবে না।'

'না, না, আমাদের অনেক দেরি হ'বে,' খানিকটা যেন জোর ক'রে বল্‌লে বিরিঞ্চি।

ট্যাক্সিওলা কী যেন একটু ভাবলে। বোধ হয় এত অল্প বয়েসের দুটি বাঙালী ছেলেকে এমন অদ্ভুত অবস্থায় দেখে তার কিছু সন্দেহ হচ্ছিল। হঠাৎ ব'লে বসলো, 'এখন যদি ফিরে যান তা হ'লে এমনিই নিয়ে যেতে পারি।'

বিরিঞ্চি প্রাণপণে লোভ সামলে বললে, না। টাকাটা ফিরিয়ে দাও।'

অগত্যা ট্যাক্সিওলা তাদের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে দু'একবার হর্ণ বাজিয়ে পিছন-দিকে রওনা হ'লো। ট্যাক্সিটা অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মনে হ'লো যেন ওদের পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে শেষ সম্বন্ধটুকু গেলো ছিঁড়ে।

ততক্ষণে বসন্তর প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা, আর বিরিঞ্চিরও মুখের ভিতরটা বেজায় শুকনো লাগছে। ভয়কে প্রশ্রয় দিলেই ভয় বেড়ে চলে, তাই বিরিঞ্চি বল্‌লে, 'লোক দুটো ঐদিকে গেলো না?'

'মনে তো হ'লো!' অতি ক্ষীণস্বরে বল্‌লে বসন্ত।

'চল্ একটু এগিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী।'

সামনে সাদা দেয়ালটা অনেকখানি জোড়া, লোক দুটো যে কোন্‌খান দিয়ে ভিতরে ঢুকলো তারা বুঝতে পারে নি। গাড়িটাই বা গেলো কোথায়? বোধ হয় গলিটার ওদিকে আর একটা মুখ আছে, সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দেয়ালটা ধ'রে ধ'রে তারা হাঁটতে লাগলো। গোল হ'য়ে ঘুরে গেছে যেন, কোনখানেই একটা দরজা কি ফাঁক-মত কিছু নেই। তার পর হঠাৎ একটা জায়গায় এসে তারা অবাক্ হয়ে গেলো।

এখানে অন্য দিক্ থেকে অন্য একটা গলির মুখ এসে পড়েছে; মস্ত বড়ো ফটকের ভিতর দিয়ে জমিটা যেন একটু নীচু হ'য়ে বাড়ির ভিতরে চ'লে গেছে, আর ফটকের মধ্যে সেই কালো রঙের প্রকাণ্ড মোটর। তারা থেমে যতক্ষণ ট্যাক্সিওলার সঙ্গে কথা বলছিলো, ততক্ষণে ওরা বোধ হয় এগিয়ে এসে ঢুকেছে।

বিরিঞ্চি বসন্তর একটা হাত আঁকড়ে ধ'রে বল্‌লে, 'দাঁড়া, একটু স'রে দাঁড়া। এই বাড়ির ভিতরেই ভোমরা আছে বুঝেছিস তো?'

বসন্ত একবার ঢোঁক গিললে!

'ঐ লোক দুটো গোয়েন্দা বটে, কিন্তু কাদের গোয়েন্দা বুঝেছিস তো? তোর বাবার চোখে খুব ধূলো দিয়েছে বটে!'

বসন্ত কিছুই বল্‌লে না।

''আমাদের কাজ তো অনেকটা হাসিল। বাড়িটা চিনলাম, রাস্তাটাও চিনে নেব, তার পর কাকাবাবুকে গিয়ে বললেই হয়। তিনি পুলিশ নিয়ে এসে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—চল, এক্ষুণি ফিরে গিয়ে বলি।'

'সে' উপায় তো আছেই। তা এত কাছে এসে একেবারে এমনি-এমনি ফিরে যাবো! একটু ঘুরে ফিরে অন্ততঃ দেখি!'

'বাড়ির মধ্যে ঢুকবি নাকি তুই?'

'দরকার হ'লে ঢুকতে হবে বই কি! তার আগে চল্ আশ-পাশটা একটু ঘুরে দেখি। একটু সাবধান থাকিস—আমরাই যে খুব চালাক আর ওরা বোকা তা কিন্তু ভাবিসনে।'

ফটকটা পেরিয়ে গলিটা আবার বেঁকে গেছে। বাবাঃ, কত মোড়, কত আঁকাবাঁকা, গোলক-ধাঁধা যেন। তার পর আর একটা মোড় পেরিয়েই একেবারে চিৎপুরের বড়ো রাস্তা—সেখানে সারি-সারি ছোট-ছোট দোকান, প্রত্যেক দোকানে ব্যস্তভাবে কাজকর্ম্ম চলছে—খোলা দিনের আলোয় সহরের হাটবাজার যেমন, ঠিক তেমনি।

বিরিঞ্চি চুপি চুপি বল্‌লে, 'বুঝেছিস—এ হচ্ছে বাড়িটার সামনের দিক্। এক বাড়ি ব'লে বোঝাই প্রায় যায় না। তোর কী মনে হয়—ভোমরা এখানেই আছে কি নেই?'

'থাকাই তো সম্ভব', যেন অনেকক্ষণ ভেবে জবাব দিলে বসন্ত।

'তা হ'লে কি আমাদের কর্ত্তব্য নয় ওর সঙ্গে একবার দেখা করার চেষ্টা করা?'

'দেখা করা!' বসন্ত যেন আঁৎকে উঠলো।

'কে জানে, ভোমরাকে আমরাই হয়তো উদ্ধার করতে পারবো।'

'পারবোই বলি না, তবে চেষ্টা করবো কিনা সেটাই হচ্ছে কথা। ধরা প'ড়ে গেলে আমাদেরও হয়তো আটকে রাখবে। সেটা সুবিধের হবে না।' একটু পরে বিরিঞ্চি আবার বল্‌লে, 'তা তাতে ওদেরও তো অসুবিধেই বাড়বে।'

'দেখ্, আন্দাজে একটু যা খুসি তাই করতে যাসনি কিন্তু।'

'যাক্ গে, আপাততঃ আয় ঐ চায়ের দোকানটায় ঢুকি তো। ভারি নোংরা দোকান, কিন্তু উপায় কী?'

দোকানের দরজার ওপর সাইনবোর্ডে নাম লেখা। ডানদিকের দোকানটা দরজির, বাঁ দিকেরটা কাচের বাসনের। তারা ঢুকতেই একজন লোক খুব হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললে, 'কী চাই আপনাদের?'

'চা হু' পেয়ালা? আর কিছু খাবি বসন্ত?'

'না।'

'খা না কিছু। খেয়ে আবার অসুখ না করে।'

দোকানী বল্‌লে, 'অসুখ করবে কেন? খুব খাঁটি জিনিস—যত ইচ্ছে খান না! হু'খানা চপ দেব?'

'আচ্ছা।'

বিরিঞ্চি দোকানটার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। পিছন দিক্‌টা পরদা দিয়ে আড়াল করা, তার ওধারে কী আছে দেখবার উপায় নেই। বড়ো রাস্তার দিক্ দিয়ে বাড়িটার মধ্যে ঢুকতে হ'লে এই দোকানগুলোর ভিতর দিয়ে ছাড়া উপায় কী? কিন্তু দোকানগুলোর ওদিক্ দিয়ে কি দরজা আছে?

লোকটি চা নিয়ে এসে তাদের টেবিলে রাখলো। দোকানে সে একটিই লোক, সে-ই চা তৈরি করে, সে-ই এনে দেয়। দোকানের মালিকও বোধ হয় সেই।

চায়ে চুমুক দিয়ে অতি জঘন্য বার্লির মতো লাগলো। কিন্তু বিরিঞ্চি বল্‌লে, 'বাঃ, বেশ চা হয়েছে।'

'বারো বচ্ছর ধ'রে চায়ের দোকান চালাচ্ছি—' একটু সগর্ব্বে লোকটি বল্‌লে।

'বারো বচ্ছর! এতদিন!'

'তা হবে বই কি!'

'এখানে দোকান খুব ভালো চলে বুঝি?'

'তা আপনাদের আশীর্ব্বাদে একরকম মন্দ না।'

'তুমি একাই বুঝি দোকানে?'

'একা তো আর সব সময় চালানো যায় না! এদিকে চাকর-বাকর রাখতেও ইচ্ছে করে না—ব্যাটারা সব চোর। আপনাদের চপ্ হুটো এনে দিই।' ব'লে লোকটা পরদার পিছনে চ'লে গেলো।

খানিক পরে নিয়ে এলো চপ্। চপ্ হুটো একরকম মন্দ করে নি, ওরা হু'জনেই আস্তে আস্তে খেতে লাগলো।

'আচ্ছা তুমি বোধ হয় বলতে পারবে', বিরিঞ্চি বল্‌লে, 'এখানে নরসিংহ দত্তের বাড়িটা কোথায়?'

'নরসিংহ দত্ত—কে?'

'নবিনগরের জমিদার—আমরা নৈহাটি থেকে আসছি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো ব'লে। কিন্তু খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

লোকটি মাতব্বরি-সুরে বল্‌লে, 'তা কলকাতায় কি আর নাম বল্‌লে কেউ চেনে? বাড়ির নম্বর কত—কোন্ রাস্তায়।'

'কী যেন, অত তো জিজ্ঞেস করে আসি নি। তবে একজন বল্‌লে এরই কাছাকাছি কোথাও।'

'লোকটি মাথা নেড়ে বল্‌লে, 'আমি তো বলতে পারবো না।'

'আচ্ছা, ঐ যে ওদিকে একটা ফটকওলা বাড়ি দেখলুম—'

লোকটি হেসে বল্‌লে, 'ও-রকম বাড়ি কলকাতার পথে-ঘাটে। কে জানে কার!'

বিরিঞ্চি তখন বসন্তর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'কী আর করবে তা হ'লে—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, আরো খুঁজে দেখি।'

এ-সব কথাবার্ত্তা মোটে ভালো লাগছিলো না বসন্তর। বেশি চালাকি করতে গিয়ে কী বিপদে পড়তে হয় কে জানে! একটা দিশে যখন একরকম পাওয়া গেছে, তখন ছুটে গিয়ে খবরটা জানানোই তো সব চেয়ে দরকারি—এবং বুদ্ধিমানের—কাজ। ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিলো সে।

এমন সময় একজন লোক দোকানে ঢুকে বল্‌লে, 'হু' পেয়ালা চা।'

তাকে দেখে ওরা হু'জনেই যেমন অবাক্ হ'লো তেমনি কেমন একটা ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলো। দেখে তাকে ছোটো ছেলেই মনে হয়, মুখের চেহারাটা কেমন উৎকট অস্বাভাবিক, হুটো হাতই তার কনুইতে এসে শেষ, আর ছোট পিটপিটে চোখ হুটোতে একটা প্রখর উজ্জ্বলতা।

বিরিঞ্চি খেতে ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রইলো। (ক্রমশঃ)

রাজগৃহ

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস্)

এখন যাহাকে বিহার প্রদেশ বলা হয় তাহার দক্ষিণপশ্চিম ভাগকে সেকালে মগধ বলিত। মগধ খুব একটা নাম-করা রাজ্য ছিল, আমাদের বাংলা দেশকে তখন কেহ বড় গ্রাহ্য করিত না। মহাভারতে মগধের রাজা জরাসন্ধের প্রতাপের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাঁহার আক্রমণে নাকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অনেকবার মথুরা ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং অবশেষে সমুদ্রের ধারে দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে জরাসন্ধকে না মারিলে চলিল না। জরাসন্ধ বাঁচিয়া থাকিবে অথচ যুধিষ্ঠিরকে মানিবে না, তাহা হইলে আর রাজসূয় কিসের? আবার তাঁহাকে মারাও ত সহজ ব্যাপার নহে। ভীম ও অর্জ্জুন দুই ভাই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া ছদ্মবেশে জরাসন্ধের রাজধানী যাত্রা করিলেন এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত মল্লযুদ্ধে ভীম জরাসন্ধের বধ কার্য্যটী সারিয়া ফেলিলেন। জৈনপুরাণ হরিবংশের মতে কিন্তু জরাসন্ধ বধ বাসুদেবের নিজেরই কার্য্য। জরাসন্ধের জন্ম সম্বন্ধে একটা আজগুবী গল্প আছে। লোকের ছেলে প্রসবের সময়ে আস্ত হইয়াই পড়ে, কিন্তু জরাসন্ধ পড়িল দুই ভাগ হইয়া। জরা নামে এক রাক্ষসী ছিল, সে এই দুই ভাগে চেরা ছেলেটীকে লইয়া যোড়া দিল। অমনি সে বেশ আস্ত ছেলে হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসী তাহার মাতৃস্থানীয় হইল। যোড়া দেওয়া ছেলেরই এত প্রতাপ, আস্ত জন্মিলে না জানি কি কাণ্ডই করিত! জরারাক্ষসীকে এখনও লোকে ভোলে নাই। জরাদেবী নামে সে এখনও প্রাচীন রাজগৃহের উপত্যকায় পূজা পাইতেছে।

জরাসন্ধের রাজধানীর নাম তখন ছিল গিরিব্রজ। পরে উহার নাম হয় রাজগৃহ, আজকাল লোকে রাজগির্ বলে। জরাসন্ধ ভূঁইফোঁড় রাজা ছিলেন না, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরাও গিরিব্রজে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি নাকি অনেক রাজাকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার কারাগারে পূরিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা ছিল যে মহাদেবের নিকট ইহাদিগকে বলি দিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে মহাদেবের

অদৃষ্টে এ ভোগটা জুটিল না। জরাসন্ধের পরে তাঁহার পুত্র সহদেব মগধের রাজা হন। তাহার পর তাঁহার বংশে অনেক রাজা এখানে রাজত্ব করেন। আরও কত বংশ এখানে রাজত্ব করার পরে শিশুনাগবংশীয় বিম্বিসার রাজার সময়ে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। বিম্বিসারকে জৈনদিগের গ্রন্থে শ্রেণিক বলা হইয়াছে। বিম্বিসার অথবা তাঁহার পুত্র অজাতশত্রুর সময়ে রাজধানী কিছু সরাইয়া আনা হয়। একটা গল্প আছে যে, প্রাচীন রাজগৃহে প্রায়ই আগুন লাগিয়া লোকের জিনিষপত্র নষ্ট হইত। রাজা বিম্বিসার নিয়ম করিলেন প্রথমে যাহার ঘরে আগুন লাগিবে তাহাকে শ্মশানে নির্ব্বাসিত করা হইবে। এই নিয়ম করার পর প্রথমেই আগুন লাগিল রাজ-বাড়ীতে। রাজা তখন কি করেন? তাঁহার ওয়ারিস্‌কে গদীতে বসাইয়া নিজে চলিয়া গেলেন শ্মশানে। বৈশালীর রাজা খবর পাইয়া দলবল বান্ধিয়া রাজগৃহ জয় করিতে আসিলেন। বিম্বিসার তখন অন্য উপায় না দেখিয়া নূতন রাজগৃহের পত্তন করিলেন এবং প্রজাদিগকে সরাইয়া আনিয়া সেইখানেই বসাইলেন। কেহ কেহ বলেন, নূতন রাজধানী বিম্বিসার স্থাপন করেন নাই, করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। এই অজাতশত্রুর সহিত বুদ্ধদেবের অনেক কথাবার্ত্তা বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়। অজাতশত্রু রাজার পৌত্রের আমলে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে চলিয়া আসে। পাটলিপুত্রের নিকট তখন গঙ্গার সহিত শোণ নদ আসিয়া মিলিয়াছিল এবং উত্তরের শত্রুদের আক্রমণ নিবারণের পক্ষে স্থানটী বেশ সুরক্ষিত ছিল।

কিন্তু অন্য হিসাবে রাজগৃহও কম সুরক্ষিত ছিল না। প্রাচীন রাজগৃহের ত কথাই নাই। পাঁচটী পাহাড় ও তাহার মধ্যস্থিত উপত্যকা লইয়া প্রাচীন রাজগৃহ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। পাহাড়ের সংখ্যা কিন্তু আরও বেশী। তবে পাঁচটীর কথাই চলিয়া আসিতেছে। যে পাঁচটী পাহাড় খুব প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তাহাদেব নাম এখন বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও সোনাগিরি। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাহাড়গুলির নাম কিছু ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ, ক্ষুদ্র নদী ও কিছু দূরে প্রাচীন জলাশয়ের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ স্থান তাহার স্বদেশে নাই। সারেক রাজধানী

এখন জঙ্গলাবৃত হইলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মন গলিয়া যায়। পাহাড় ছাড়া যেখানে যেখানে বিপক্ষের হানা দেওয়ার সম্ভাবনা সেখানে পাথরের প্রাচীর তুলিয়াও স্থানটী সুরক্ষিত করিতে সাবেক রাজারা ত্রুটী করেন নাই। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়া গিয়াছে। নূতন রাজধানীর কতকটা জড়াইয়া যেখানে এখন রাজগির্ পল্লীর আবির্ভাব হইয়াছে সেখানে পাণ্ডারাই প্রধান অধিবাসী। তবে রাজগৃহ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই তীর্থস্থান বলিয়া নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালা এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। মুসলমানদিগের পক্ষেও স্থানটীর পবিত্রতা আছে এবং শিখরাও ধর্ম্মশালা তুলিয়াছে।

রাজগৃহ বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান এবং উষ্ণ প্রস্রবণগুলির রোগ নিবারণের ক্ষমতাও আছে। বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিলে উপযুক্ত ভাড়াটীয়া বাড়ীর অভাবে অনেকে সাময়িক ভাবে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লন। উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে ডাক বাঙ্গলায়ও কিছুদিন থাকা যায়।

সিদ্ধার্থ বৈশালী হইতে আসিয়া বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার পূর্ব্বে রাজগৃহে তপস্যা করেন, পরে আবার 'বুদ্ধ' হওয়ার পর এখানে অনেক কাল কাটাইয়া যান। তাঁহার শিষ্য ও অনুগামীরাও এখানে ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর ধর্ম্মনীতি স্থির করার জন্য প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা এইখানেই হয়। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীরও রাজগৃহ তপস্যার ভূমি। আরও অনেক জৈন সাধুর সংস্পর্শে গিরিগুলি পুণ্যভূমি বলিয়া গণিত।

যদিও এখানে বুদ্ধদেব ও তাঁহার বড় বড় বহু শিষ্যের কীর্ত্তিকলাপ বৌদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তবু ধনী জৈন সম্প্রদায়ের চেষ্টায় স্থানটীতে এখন তাঁহাদের খুব প্রতিপত্তি। পাহাড়ের চূড়ায় সুন্দর জৈন মন্দিরগুলি দেখিবার বিষয়। অবস্থাপন্ন জৈনেরা এখানে আসিয়া খাটুলীতে চড়িয়া পাঁচটী শৈলই ঘুরিয়া আসেন।

জৈনদিগের খুব প্রতিপত্তি থাকিলেও ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা হটিয়া যাইবার পাত্র নহেন। জৈনমন্দিরে পৌরোহিত্য করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন। আবশ্যক হইলে মামলা মোকদ্দমা করিয়া নিজেদের স্বত্বও তাঁহারা রক্ষা করিতে জানেন। অনেক হিন্দু দেবমন্দির ও পবিত্র উষ্ণ প্রস্রবণের কৃপায় হিন্দু যাত্রী-

দিগের নিকট তাঁহাদের বেশী প্রাপ্তি ঘটে। তিন বৎসর অন্তর রাজগৃহে একটী মেলা বসে। পুরাতন রাজগৃহ তখন আবার লোকসমাগমে সরগরম হইয়া উঠে এবং পাণ্ডাদিগের ঘরেও কিছু আসে।

সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মধ্যে যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য, স্থানের মনোহারিত্ব দেখিবার জন্য, প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নের মধ্যে বিভোর হইবার জন্য অথবা উষ্ণ প্রস্রবণের জল ব্যবহারের জন্য এখানে আসিতে ইচ্ছুক, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ লাইনের বখ্‌তিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে মার্টিন কোম্পানীর রেল-গাড়ীতে চড়িয়া আসাই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক। পথে নামিয়া প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের লুপ্ত গৌরবের যাহা আছে তাহা দেখিবারও সুযোগ ঘটে। আহারাদি মোটামুটি জুটিয়া যায়, তবে যাঁহারা বিলাসিতার উপকরণ চাহেন তাঁহাদের পক্ষে দূর হইতে তাহা আনানই সঙ্গত।

রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণের রোগনিবারণের ক্ষমতা বহুকাল হইতে বিদিত। বাতের ব্যারামে নাকি ইহা বিশেষ উপকারী। প্রস্রবণের সংখ্যা কিন্তু কমিয়া গিয়াছে এবং সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন জলও এখন আর সাবেকমত গরম নাই।

চিঠিপত্র

প্রিয় রামধনুর পাঠক-পাঠিকা,

অনেক দিন পরে আবার দেখা হ'ল। তোমরা অনেকেই রামধনুকে এবং তার পাঠক-বন্ধুদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছ, রামধনুর তরফ থেকে আমরাও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। চিঠিপত্র অনেকেই লিখেছ, এবং 'লেখনী-বন্ধু' হবার আগ্রহ দেখিয়েছ। বারান্তরে আমরা সেগুলি পত্রস্থ করব। 'মণিমঞ্জুষা' প্রভৃতি যে বিভাগগুলি এবারে গেল না, সেগুলিও বারান্তরে বেরোবে। পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল এ মাসে দেওয়া হ'ল, আসছে বারে (তোমাদের বাৎসরিক পরীক্ষার পর) আবার নতুন প্রতিযোগিতা দেওয়া হবে।

—রাঃ সঃ

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

মণ্টর মাষ্টার—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস। দাম ।৵০। শিবরাম বাবুর রস-রচনার সঙ্গে রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের ভাল রকমই পরিচয় আছে। এই বই-এর গল্পগুলিও শিবরাম বাবুর অন্যান্য গল্পের মত অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার। ছাপা বাঁধাই বেশ ভাল এবং দাম অত্যন্ত সস্তা।

বাড়ী থেকে পালিয়ে—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রাচী পাবলিশিং হাউস। দাম একটাকা। ছেলেদের উপন্যাস। রামধনুর পুরোনো গ্রাহকেরা এই বইখানির সঙ্গে পরিচিত, কারণ এটা ধারাবাহিক ভাবে রামধনুতে বেরিয়েছিল। এই বইখানা লিখেই প্রথম শিবরাম বাবু শিশুসাহিত্যের একজন মহারথী বলে পরিচিত হন। এমন সুন্দর বই শিশুসাহিত্যে অল্পই বেরিয়েছে। বইখানি পুস্তকাকারে দেখবার জন্য অনেকেই উৎসুক হয়ে ছিলেন। এত দিন পরে সে ব্যবস্থা করে প্রকাশক সকলকার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

বার্ষিক শিশুসাথী—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। আশুতোষ লাইব্রেরী। দাম ১॥০। প্রতিবারের মত এবারেও বংলার বড় বড় সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সুন্দর সুন্দর লেখা ও সুন্দর সুন্দর ছবিতে সমৃদ্ধ হয়ে বেরিয়েছে। শিক্ষা ও আনন্দের এমন চমৎকার সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। এ বই বংলার ঘরে ঘরে হাসি ফুটাবে।

মগ্ ডাকাতের হাতে—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ। দাম ॥৵০। যারা য্যাডভেঞ্চারের গল্প পছন্দ কর তারা বইখানা পড়ে দেখতে পার। রঙ্গিন মলাট, ভিতরেও অনেক ছবি আছে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

হিংসা

(শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

লণ্ঠন কাঁদিয়া বলে, "কি দুর্ভাগ্য মোর,
জ্যোৎস্না-আলো আমা হ'তে কত বেশী জোর !"
হাসিয়া কহিল জ্যোৎস্না, "ক'র নাক' দুখ,
নিজ মন ভালো কর—তারি মাঝে সুখ।"

মান্দ্রাজে দুর্গাপূজা

(কুমারী যূথিকা চন্দ্র)

রামধনুর পাঠকপাঠিকারা যারা বাংলা দেশে থাক তারা দুর্গাপূজার সময় খুবই আমোদ আহ্লাদ করিতে পার, কিন্তু যারা দূর প্রবাসে বাস কর তারা হয়তো অনেকেই সে আমোদ হইতে বঞ্চিত থাক। এবার যখন আমরা মান্দ্রাজে বদলী হইলাম তখন আমাদেরও সেই রকম আশঙ্কা হইয়াছিল, কিন্তু মান্দ্রাজে যে সামান্য কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালী আছেন তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত সে আশঙ্কার কোন কারণ ঘটে নাই। এখানে বেশ ঘটা করিয়াই দুর্গাপূজা হইয়াছে। এখানকার প্রতিমার একটি ফটো তোমাদের উপহার দিতেছি।

মান্দ্রাজে দুর্গাপূজা

আলোকচিত্রগ্রহীত্রী—কুমারী যূথিকা চন্দ্র

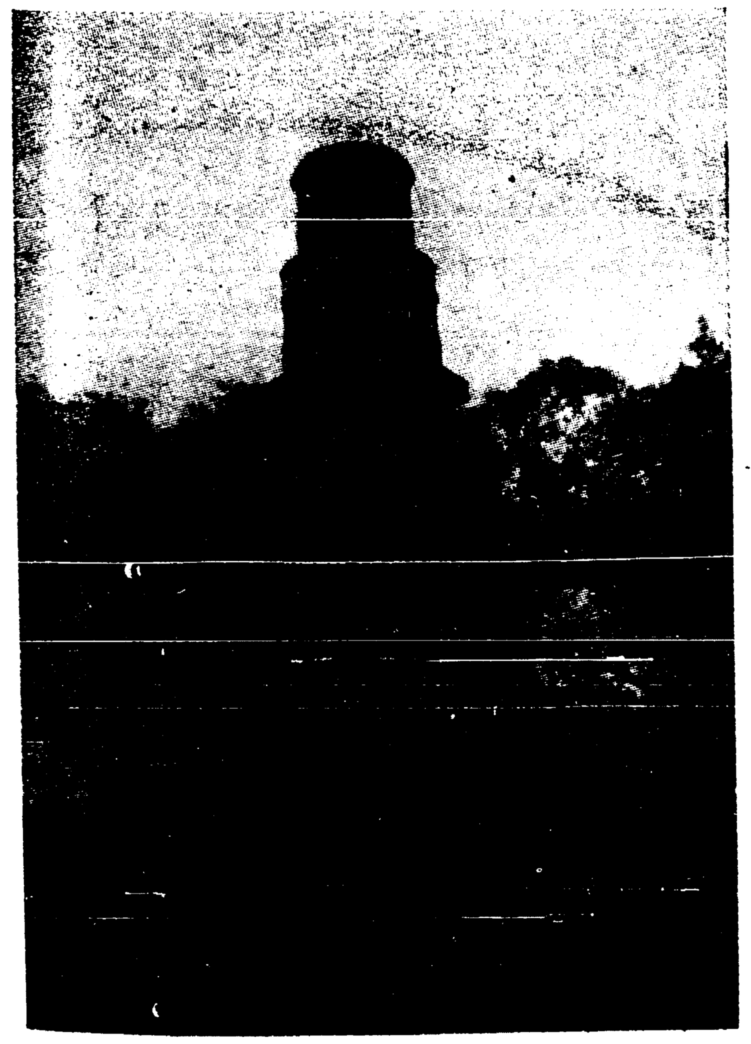

ফিরোজ মিনার

মালদহের কাছে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়। এখন আর সেখানে রাজধানী নাই—কালের নিষ্ঠুর নিয়মে সেই জনপদ ধ্বংস হইয়াছে, তার জায়গায় দেখা দিয়াছে গভীর জঙ্গল। সামান্য কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ যা এখনও টিকিয়া আছে তার মধ্যে ফিরোজ মিনারই বোধ হয় প্রধান।

<—— ফিরোজ মিনার—গৌড়

আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীসুশোভন জোয়ার্দ্দার

বাসনা

(কুমারী মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঐ বুঝি নীল মেঘের দেশে
তোমার গৃহখানি,
ওগো অভিমানী ?
স্বপন-সুখের আলোছায়ায়
তোমায় চিনি, রাণী।

মলয় যখন ফাগুন-সাঁঝে
কাঁপায় যূথীর শাখা
তোমার হাসিমাখা—
মনের আমার গোপন পটে
তোমার ছবি আঁকা।

পূব আকাশে রঙের রথে
উষার সাথে সাথে
সোনার কিরীট মাথে,
ঘুরে বেড়াও সারা সকাল
শীতের শেষের রাতে।

যদি মোদের হ'ত দেখা
মেঘ্‌লা কোন সাঁঝে
কাশের বনের মাঝে,
তোমায় আমি বেঁধে নিতাম
আমার বাহুর মাঝে।

সন্দেশ

শীতের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় খেলাধূলার মরশুম সুরু হইল—একসঙ্গে খেলাধূলার এতখানি আয়োজন আমরা তো দেখি নাই !

প্রথমতঃ ইস্‌লিংটন্ কোরিন্থিয়ান্ ফুটবল দল। এটি হইতেছে লণ্ডনের একটি সখের ফুটবল টীম। কোন পেশাদারী খেলোয়াড় এতে নাই। ইয়োরোপের ফুটবল খেলার standard আমাদের দেশের standard হইতে অনেকটা উঁচু। ইংল্যাণ্ডের চেয়ে অবশ্য উঁচু ধরণের খেলা হল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। তবে ইংল্যাণ্ডও নেহাৎ কম যায় না। ইসলিংটন কোরিন্থিয়ানে অবশ্য ইংল্যাণ্ডের বাছাই করা সমস্ত খেলোয়াড়েরা নাই—কেননা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই পেশাদারী—কিন্তু তবুও এদলটি যে বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ভারতে আসিবার পথে এঁরা নানা জায়গায় অনেকগুলি খেলা খেলিয়াছেন। কিন্তু কোথাও হারেন নাই। গত ১৩ই নভেম্বর কলিকাতায় মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সহিত ইসলিংটন কোরিন্থয়ানের প্রথম খেলা হইয়া গেছে—ফল সমান সমান। শেষের দিকে কোরিন্থিয়ানস্ বিশেষ চাপিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু গোল দিতে পারে নাই। ১৬ই নভেম্বর মোহন-বাগানের সঙ্গে খেলা হইবে; তার পরে আই, এফ., এ-র বাছাই করা দল এবং নিখিল ভারতের সঙ্গে খেলা। ইষ্টবেঙ্গলের সহিতও একটি খেলা হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, কিন্তু এখনও কিছু ঠিক হয় নাই। কলিকাতার খেলা

শেষ করিয়া ঢাকা, ময়মনসিং, কুমিল্লা, চাটগাঁ প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশের আরও কতকগুলি সহরে কোরিন্থিয়ানস্‌রা খেলিতে যাইবে (অবশ্য এ ছাড়া আরও প্রোগ্রাম আছে)।

মনে হয় ভবিষ্যতের খেলাগুলিতে কোরিন্থিয়ান্‌স্ দল অরও শক্তির পরিচয় দিবে কারণ বিলাতে ৪৫ মিনিট খেলার পর হাফ-টাইম হয়, এখানে হয় ২৫ মিনিটের পর; দ্বিতীয়তঃ খালি পায়ে-খেলা প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত এঁরা ইতিপূর্ব্বে জীবনে আর খেলেন নাই; তৃতীয়তঃ জাহাজে এবং ট্রেনে অনেক সময় গিয়াছে, খেলার অভ্যাস ঠিক বজায় নাই। এখানকার ফুটবলও তাঁদের কাছে হাল্কা, দু-একটা খেলার পর এই সব অসুবিধা কাটাইয়া ওঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য শীতকালে ভারতীয়দেরও খেলার অভ্যাস নাই, পা আড়ষ্ট বোধ করা স্বাভাবিক।

* * *

তারপর ক্রিকেট। বিলাত হইতে লর্ড টেনিসন্ একটি দল লইয়া আসিয়াছেন, ভারতের নানা জায়গায় তাঁহারা খেলিতেছেন। বিলাতি টেষ্ট ম্যাচের হার্ডষ্টাফ, ওয়ার্দ্দিংটন, ল্যাংরিজ প্রভৃতি কেউ কেউ এ দলে আছেন। সম্প্রতি লাহোরে নিখিল ভারতের সহিত ইঁহাদের খেলা হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় দলে এবার ক্যাপ্টেন হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বিজয় মার্চ্চেণ্ট। ক্যাপ্টেন সুযোগ্য, কিন্তু দল বাছাই ভাল হয় নাই। নিসারের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি খেলেন নাই, এস, ব্যানার্জ্জির কোমরে বাত হওয়ায় তিনিও খেলিতে অপারগ। ভারতের তিনজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোলারের মধ্যে দুইজনই অনুপস্থিত। ছিলেন শুধু অমরসিং। সি, কে, নাইডু খেলেন নাই, সি, এস, নাইডু বিলাতে। ফলে ভারতীয় দলের ৯ উইকেটে পরাজয় ঘটিয়াছে। গোভারের তীব্র বলের সম্মুখে তাঁরা আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই—ওদিকে নিসার ও ব্যানার্জ্জির অভাবও পদে পদে অনুভূত হইয়াছে। বিজয়ী দলের মধ্যে ইয়ার্ড্‌লি (৯৬) ও এড্‌রিচ্ (৫৪ ও ৫০, নট্ আউট) ভাল রান্ করিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ১ম ইনিংসে পাতিয়ালার যুবরাজ ৪১ ও ২য় ইনিংসে অমরনাথ ৪৪ রান্ করিয়াছেন। ভারতীয় দল ১ম ইনিংসে করেন ১২১, ২য় ইনিংসে ১৯৯; লর্ড টেনিসনের দল করেন ১ম ইনিংসে ২০৭, ২য় ইনিংসে ১ উইকেটে ১১৪। বড়দিনের ছুটীর সময় টেনিসন্ দলের সহিত ভারতীয় দলের খেলা কলিকাতাতেই দেখিতে পাইবে।

* * *

তারপর টেনিস্। আজ পর্য্যন্ত যাঁর সমতুল্য টেনিস্-খেলোয়াড় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই, ক্রিকেটের ব্র্যাডম্যান্ এবং হকীর ধ্যানচাঁদের মত টেনিস্-মহলে যাঁকে অদ্বিতীয় যাদুকর বলা হইত, আমেরিকার সেই টিলডেন আসিতেছেন। বড়দিনের সময় কলিকাতাবাসী টিল্‌ডেনের খেলা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারিবেন। অবশ্য টিল্‌ডেন এখন "বৃদ্ধ", তাঁর সে অসীম প্রতাপ আর নাই, তবু কথায় বলে "মরা হাতী লাখ টাকা", এই সেদিন পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিখ্যাত পেরীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। টিল্‌ডেন ছাড়া ফরাসী খেলোয়াড় র‍্যাঁমিলিও আসিতেছেন। কোম্পের কথাও মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে।

বর্ত্তমানে জগতের দ্বিতীয় টেনিস-খেলোয়াড় (অপেশাদারী) ফন্ ক্রাম্ এবং তৃতীয়

হেন্‌কেল (দুইজনাই জার্ম্মান) মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌতে টেনিস্ খেলিবেন।

* * *

৭১ বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডের প্রথম শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের মৃত্যু হইয়াছে। অত্যন্ত সামান্য অবস্থা হইতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উদাহরণ ইংল্যাণ্ডে এই প্রথম।

আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) তরঙ্গ দিলে (জলতরঙ্গ)

(২) 'সা' বা 'গ' দিলে (জলসা বা গজল)

(৩) চিলের আগে যখন আঁ বসে (আঁচিল)

(৪) লতা—তাল

(৫) সাঁতার

উত্তরদাতাদের নাম

বিজন শেঠ (কলিকাতা) ; স্মৃতি সান্যাল ও সেজ বৌদি (লক্ষ্ণৌ) ; অনামী (খড়দহ) ; যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের সভ্যবৃন্দ (রাঁচি) ; সমীর চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ, মণীশ প্রভৃতি (আন্দুল) ; রত্না দেবী (পাটনা) ; সুনীল কুমার গোস্বামী, সুধীর, রেণু প্রভৃতি (বালী) ; সুকুমার পাল ও মায়া পাল (উল্লাপাড়া) ; নিখিল চৌধুরী (কুমিল্লা) ; গৌরী, দীনেন (নলহাটী) ; অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্ম্মল, প্রতুল (বালিগঞ্জ) ; পাঁচুগোপাল ঘোষ, প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর) ; বীণারাণী গুপ্ত (ডলু) ; রমাপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা) ; কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল) ; স্বর্ণাসন ক্লাবের সভ্যগণ, সিতেন্দু গুপ্ত (পাটনা) ; পূর্ণচন্দ্র স্মৃতিপাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (পানিহাটী) ; দুর্গা, সুব্রত, মীরা (কলিকাতা) ; প্রশান্ত, প্রতীত, প্রতাপ বসু (সীতারামপুর) ; নরেশচন্দ্র গুহবক্সী, বিশ্বনাথ, ননী প্রভৃতি (বাথুয়াজানী) ; প্রভা, প্রমা, প্রবীণ পূরবী (বেতিয়া) ; মীরানন্দিতা দাশ (লাহোর) ; প্রমথ, বামাপদ, সত্যসাধন (ধেমো মেন কলিয়ারী) ; মালবিকা, সন্ধি, মন্দা (ঢাকা) ; সুকৃতি সরকার (কলিকাতা) ; ব্রজেন্দ্রকুমার সাহা (মনেকাচর) ; করুণাময় কাঞ্জিলাল (ইকড়া) ; সতী, প্রীতি, বেবী প্রভৃতি (পাতিহাল) ; প্রমাদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কালীকচ্ছ) ; রণেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী) ; অন্নপূর্ণা ঘোষ (দ্বারভাঙ্গা) ; রেণ চৌধুরী (রাজসাহী) ; অরবিন্দ, অমিতাভ, ও অনিরুদ্ধ ঘোষ (কলিকাতা),

দীপালি, সাধনা, তপতী রায় (জলপাইগুড়ী) ; সুনীল, রত্না, জগুলাল (মুন্সীগঞ্জ) ; রেণু, করুণা, সতী মৈত্র (রাজসাহী) ; জগন্নাথ বিশ্বাস (আলিপুর দুয়ার) ; যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (মান্দ্রাজ) ; ঘুটু উষা, দীপু (সিমডেগা) ; পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া) ; প্রভাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) ; অঞ্জলি চৌধুরী, শ্যামল, বিজুতুলু (কলিকাতা) ; মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া) ; প্রমোদ মুস্তাফী, মা, নীহারকাকীমা (জামশেদপুর) ; হরিহর, গৌরী, পুষ্প মজুমদার (বালিগঞ্জ প্লেস্) ; দেবব্রত, হেমেন্দ্রনাথ, কালীপদ সেনগুপ্ত (গোয়ালপাড়া) ; সুশীলকান্তি বিশ্বাস, চৈতালী (কুমিল্লা) ; শঙ্করকুমার মিত্র (ভবানীপুর) ; কুমার অনিলবরণ ভট্টাচার্য্য ও বীণাপ্রভা দেবী (কালীকচ্ছ) ; তরুণকুমার, দিলীপকুমার ও প্রসূনকুমার ব্যানার্জ্জি (ভবানীপুর) ; রমা নিয়োগী (কলিকাতা) ; বারিদ ও অমলবরণ রায় (সাটীরপাড়া) ; মঞ্জিমামুকুল দত্ত (মেদিনীপুর) ; রথীন্দ্র, সুনীল সেন (দিনাজপুর) ; লীলা দাস (কুমিল্লা) ; আভা, অরুণ, বিমল (হাসনাবাদ) ; যুগলকিশোর মণ্ডল (রাঁচী)।

কার্ত্তিক মাসের ধাধার উত্তর

ব্র্যাকেটের কথাগুলি এই রকম হবে—

গা, পাতা, পাখী, গুলি, আরা, পাট, মার, পালা,
বৈকাল, পাড়, গুজব, বেশ, মিঠাই।

উত্তরদাতাদের নাম

তরুণকুমার, দিলীপকুমার ও প্রসূনকুমার ব্যানার্জি (ভবানীপুর) ; সুকৃতি সরকার (কালীঘাট) ; দেবব্রত, হেমেন্দ্রনাথ ও শুভব্রত সেন (গোয়ালপাড়া) ; মণি দাস ও খোকন (শ্রীহট্ট) ; দি ভৌমিকস্ (বালীগঞ্জ) ; রত্না দেবী (পাটনা) ; সুশীলকান্তি বিশ্বাস, চৈতালী (কুমিল্লা) ; বিকাশচন্দ্র শ্যাম (শ্রীহট্ট) ; শঙ্করকুমার মিত্র (ভবানীপুর) ; কুমার প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও প্রশান্ত দত্ত (কালীকচ্ছ) ; অনিলবরণ ভট্টাচার্য্য ও বীণাপ্রভা দেবী (কালীকচ্ছ) ; প্রমোদ, মা, খোকা (জামশেদপুর) ; নরেশচন্দ্র গুহবক্সী ও ভারতী লাইব্রেরীর সভ্যগণ (বিন্যাফৈর) ; রমা নিয়োগী (কলিকাতা) ; যুথিকা চন্দ্র (মান্দ্রাজ) ; সুকুমার পাল ও মায়া পাল (উল্লাপাড়া) ; প্রভা, প্রমা, পদ্মা প্রভৃতি (বেতিয়া) ; অজয়কুমার মিত্র (ঢাকা) ; বারিদ ও অমলবরণ রায় (সাটীরপাড়া) ; মঞ্জিমামুকুল দত্ত (মেদিনীপুর) ; রথীন্দ্র, সুনীল সেন (দিনাজপুর) ;

সত্যানন্দ প্রামাণিক, মা, দাদা (খড়্গপুর); লীলা দাস (কুমিল্লা); রণেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী); আভা, অরুণ, বিমল (হাসনাবাদ); যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ (রাঁচি)।

নূতন প্রশ্ন

নীচে এক সঙ্গে যে তিনটি করে প্রশ্ন আছে এক-একটা কথায় তার জবাব দিতে হবে :—

(১) ওটা কি পড়ল? গানে কি নেই? চারদিকের কি সামলাব?

(২) ঢেঁকিতে কি দেওয়া হচ্ছে? নৌকো যেখানে ভিড়ল সেটা কি? কাপড়ের কি লাল?

(৩) খোকা কি কষছে? ওরা কি টানছে? লোকটার কি নেই?

(কেবল মাত্র নির্ভুল উত্তরদাতাদের নামই বেরোবে)

কার্ত্তিক মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

কবিতাগুলির মধ্যে কোনটাই পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় ২টি পুরস্কারই প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হ'ল। পুরস্কার পাবেন—

(১) শ্রীসুনীলকান্তি সেনগুপ্ত—গ্রাঃ ১৮৭৯ (মুন্সীগঞ্জ)

(২) শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত—গ্রাঃ নং ৮৪৭ (কলিকাতা)

এঁদের আপত্তি না থাকলে আসছে বারের রামধনুতে এঁদের ছবি বেরোবে; পুরস্কার ঐ মাসের মধ্যেই দেওয়া হবে।

কুমারী নীলা মুস্তাফি (গ্রাঃ ১৬৮০) ও শ্রীঅশোককুমার গুপ্ত (গ্রাঃ ১৬৩২) এঁদের লেখাও বেশ ভাল হয়েছে।

আসছে মাসে আবার নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা দেওয়া হবে।

ত্রুটী স্বীকার ঃ—কার্ত্তিক মাসের রামধনুতে ৫৪৮ পৃষ্ঠার স্থলে ভুলক্রমে ৫৮৪ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিও ৫৮৫, ৫৮৬...এই ভাবে ছাপা হইয়াছে। অবশ্য ভিতরের রচনার কোন কিছু বাদ যায় নাই—উহা ঠিকই ছাপা আছে। উপায়ান্তর না থাকায় ৫৪৮—৫৮৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পৃষ্ঠাগুলি বাদ দিয়াই পড়িতে হইবে।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র

রামধনু

১০ম বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৪ | ১২শ সংখ্যা

নন্তু বাবুর জল্পনা

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্‌-এ)

"পুল দিয়ে রেল যায়"

পুল দিয়ে রেল যায়
ঘস্‌ ঘস্‌ ঘস্‌,
সাপের মতন রেল আঁকা-বাঁকা রাস্তায়
ঘস্‌ ঘস্‌ ঘস্‌!
ঝিকিমিকি আলো জ্বলে
ঝিকিমিকি জ্বলে তারা
আঁকা-বাঁকা চাঁদ!

অঞ্জনা-পুল দিয়ে ইঞ্জিন চ'লে যায়—
ছেলেধরা ফাঁদ
পাতে পুল আর আলো আর আকাশ অলস ;
সাপের মতন রেল আঁকা-বাঁকা রাস্তায়
ঘস্ ঘস্ ঘস্ !

"পাগলের বৌ"

পাগলের বৌ—নাম পাগ্‌লী !
দেখা হ'লে বলে, 'তুই কেন জাগ্‌লি ?
এই এত ভোর বেলা-
কেন জুড়েছিস্ খেলা ?
এখনো তো ওঠে নাই পাখী-পাখ্‌লি !'
পাগলের বৌ—নাম পাগ্‌লী।

সারা গায়ে খড়ি তা'র, উস্কুখুস্কু চুল—
দেখেই ছেলের দল করে চুল্‌বুল !
ভয়ে তা'র ঝাণ্টুরা
ফেলে দিল পান্তুয়া,
ভোঁদোড় ভোঁ দৌড় দিল সোজা বিলকুল—
সারা গায়ে খড়ি তা'র উস্কুখুস্কু চুল !

"গান গায় কল'

দম দেয়, গান গায় কল—
"আগে যদি জানতাম্—ছল্ ছল্ ছল্ !"
ভোলা করে ঘেউ ঘেউ
মিনি করে মেউ মেউ—

মাঝখানে গান গায় কল—
"আগে যদি জান্‌তাম—ছল্ ছল্ ছল্ !"

"আকাশের ভয়ঙ্কর"

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ)

উপলকুমার ছিলেন মস্ত বড় জমিদারের একমাত্র ছেলে, কিন্তু গতানুগতিক জমিদারদের মত তাঁকে তাকিয়ার মোহ আর অলস ভোগস্পৃহা জয় কর্‌তে পারে নি কখনও ! তাঁ'দের বিরাট্ ঝিলটায় তিনি নৌকোয় ব'সে হাওয়া খাওয়ার চেয়ে এপার ওপার সাঁতার দিতেই ভালোবাস্‌তেন : চার ঘোড়ায় টানা গাড়ীর চেয়ে শুধু ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাইফেল কাঁধে শিকার কর্‌তেই তিনি ভালোবাস্‌তেন বেশী, ভালোবাস্‌তেন মোটার-বাইকে চড়ে অনেক—অনেক দূরের পথ ঘুরে আস্‌তে। তাঁর সুন্দর দীর্ঘ চেহারার ভিতর কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল এক বিদ্রোহী মানুষ, বিদ্রোহ আলস্যের ওপর—গতানুগতিকের ওপর। আর তাঁর অসম্ভব অনুরাগ ছিল লেখাপড়া করার—বিশেষতঃ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন আর তার পর নিজের বাড়ীতেই তিনি খুলে বসেন মস্ত বড় এক রসায়নাগার। বেশীর ভাগ সময় তাঁর কাট্‌তে লাগ্‌ল সেই কাচের দেওয়ালে-ঘেরা আর নানা অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ভরা রসায়নাগারে। হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা শাদা কোট পরে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানান্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ডুবে থাকৃতেন ; কখনও বা তাঁ'র সাড়ে ছ' ফিট লম্বা ছিপ্‌ছিপে দেহকে ঈষৎ আনত ক'রে তিনি ধীর দীর্ঘ পদক্ষেপে সে ঘরেই পায়চারী ক'রে বেড়াতেন, তাঁর প্রশস্ত কপালের রেখাগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ত—দেখ্‌লেই বোঝা যেত কোনও একটা বিশেষ ভাবনায় তিনি গভীরভাবে আচ্ছন্ন।

কিন্তু তা' সত্ত্বেও লোকে তাঁকে ঠাট্টা কর্‌তে ছাড়্‌ত না। সাধারণে সাধারণ হিংসার জন্য যোগ দিত সেই ঠাট্টায়, আর জ্ঞানী আর পণ্ডিতমহলে সবাই তাঁকে ঠাট্টা কর্‌ত তাঁর অদ্ভুত সমস্ত 'থিওরি'র জন্য। এক কথায় সে সমস্ত পরিকল্পনা তা'রা স্বপ্নেও ধারণা কর্‌তে পার্‌ত না। উপলকুমারের অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত আচরণ সেই সমস্ত ঠাট্টা-তামাসাকে উস্‌কে দেবার যথেষ্ট সাহায্য কর্‌ত।

এমন সময় কতকগুলো অদ্ভুত ঘটনায় সমস্ত দেশ আশ্চর্য্য হ'ল যতটা, ভয় পেল তা'র চেয়ে অনেক গুণ বেশী। তখন আমাদের দেশে প্রতিযোগিতা প'ড়ে গিয়েছে কে কত ওপরে এরোপ্লেনের সাহায্যে উঠ্‌তে পারে। প্রথম বিপদ্ ঘটে জন্ স্মিথ্ নামে এক য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাইলটের। নিউ দিল্লীর এরোড্রোম থেকে সে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ওপরে ওড়ে। তার পর তা'র আর খোঁজ পাওয়া যায় না! দিন সাতেক পরে নিউ দিল্লী থেকে দেড় শ' মাইল উত্তরে তা'র খালি এরোপ্লেনটা বাঁকাচোরা অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু পাইলটের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। তার পর কল্‌কাতা থেকেই বাঙালী যুবক সিদ্ধার্থ সান্যাল আকাশে ওড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে কিংবা তার প্লেনকে আর কেউ দেখ্‌তে পেল না। জোর অনুসন্ধান চল্‌ল, অবশেষে সবাই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সিদ্ধার্থ সান্যাল তার প্লেন নিয়ে নিশ্চয়ই সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছে! তা'র পরের দুর্ঘটনা আরও ভয়ঙ্কর! কল্‌কাতা থেকেই আবার আকাশে ওড়ে বিপ্রদাস সিং—একজন বিখ্যাত পাইলট্। টেলিস্‌কোপ্ দিয়ে তা'র ওপর লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু যখন আনুমানিক পঁচিশ হাজার ফুট ওপরে সে উঠেছে তখন হঠাৎ দেখা গেল যে তা'র প্লেনটা অদ্ভুত গতিতে সোজা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে!—মনে হ'ল আকাশ থেকে অদৃশ্য কেউ যেন হ্যাঁচ্‌কা টানে তা'কে ওপরে টেনে নিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই কতকগুলো টুক্‌রো সাদা মেঘ আকাশ দিয়ে ভেসে যাওয়ায় আর তা'র ওপর লক্ষ্য রাখা সম্ভব হ'ল না। মেঘ যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, আকাশ তখন ফাঁকা,—মাত্র ক'য়েকটা কালো চিল তার নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর বিপ্রদাস সিং-এর প্লেনটা পাওয়া গেল পুরীর কাছে একটা ঝাউবনের ভেতর, আর পাওয়া গেল তার মুণ্ডহীন দেহটা—সমস্তটা তা'র যুড়ে চর্ব্বির পুরু প্রলেপ!

এতগুলো দুর্ঘটনা ঘটার পর গভর্ণমেণ্ট থেকে আকাশে ওঠার রেকর্ড আর কাউকেই করতে দেওয়া হ'ল না। সমস্ত দেশ এই নিয়ে দিনকতক খুবই মাথা ঘামাতে লাগ্‌ল, খবরের কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে প্রত্যহ বেরুতে লাগ্‌ল নানান্ টীকা-টিপ্পনী! দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আর পাইলটদের নিয়ে বস্‌ল অনেক সভা-সমিতি। সেই রকমই এক বৈজ্ঞানিকদের সভায় উপলকুমার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ধারণায় এই সমস্ত দুর্ঘটনার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, "···একটা অদ্ভুত ভয়ের কারণ আকাশে আছে। আপনারা কেউই তা' অনুমানও কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনারা অনেকেই এই মত প্রকাশ ক'রেছেন, ইঞ্জিন খারাপ ছিল ব'লে এই সমস্ত দুর্ঘটনা! কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক মত হতে পার্‌লুম না। ইঞ্জিনের দোষে হয়তো প্রথম দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে। তার পরে যাঁরা রেকর্ড করবার জন্য আকাশে উড়েছিলেন নিশ্চয়ই তাঁরা আগের দুর্ঘটনার দরুণ ইঞ্জিন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান

হ'য়েছিলেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এই সমস্ত দুর্ঘটনা! আমি যদিও এখন আমার এই সম্বন্ধে ধারণা কি কিছুই প্রকাশ কর্‌ব না তা হ'লেও কয়েকটা বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে চাই। প্রথমতঃ ভাঙা প্লেনের সঙ্গে পাইলটদের খোঁজ পাওয়া যায় নি কেন—এক বিপ্রদাস সিং-এর দেহ ছাড়া? হয়তো বল্‌বেন তাদের দেহ ছিট্‌কে প'ড়ে গিয়েছে, যদিও বেল্ট্ দিয়ে এমন ভাবে তা'দের দেহ আট্‌কানো থাকে যে ইচ্ছে ক'রে তা'র বাঁধন আল্‌গা না করলে সেটা থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না! আমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা, বিপ্রদাস সিং-এর মাথাটা কোথায় গেল? হাওয়ার ধাক্কায় নিশ্চয়ই তা'র মাথাটা দেহ থেকে ছিট্‌কে যেতে পারে না! তৃতীয়তঃ, তা'র দেহে চর্ব্বির ওই রকম পুরু প্রলেপ থাকা সম্ভব হ'ল কি উপায়ে?···এই প্রশ্নগুলো আপনারা ভেবে দেখ্‌বেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইঞ্জিনের ত্রুটী এতগুলো দুর্ঘটনার কারণ কোন মতেই হ'তে পারে না, এবং আশা করি আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি এর কারণগুলো যথাযথ আপনাদের সামনে উপস্থিত কর্‌তে পার্‌ব। এ রকম অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর জিনিষের পরিকল্পনা আপনারা কোন রকমেই কর্‌তে পারবেন না।···"

এই বক্তৃতা শুনে পণ্ডিত-মহলে নেপথ্যে খুব একচোট হাসাহাসি হয়েছিল। কয়েকটা খবরের কাগজ লোক হাসাবার জন্য উপলকুমারকে নিয়ে কয়েকটা সস্তা ধরণের রসিকতাও করেছিল। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'ন নি।

তার পর একদিন সমস্ত দেশময় হৈ-চৈ প'ড়ে গেল; সেই "পাগ্‌লা বৈজ্ঞানিক"কে নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! তাঁ'কে শেষ দেখা গিয়েছিল ২৭শে ফ্রেব্রুয়ারি ১৯— সালের সকালে, দম্‌দমে তাঁর নিজের ছোট প্লেনটা নিয়ে তিনি তখন আকাশে বেরিয়ে পড়েন। গত কয়েকদিন তিনি প্রত্যহ সকালে প্লেন নিয়ে ঘুরতেন এবং দুপুর নাগাদ ফিরে আস্‌তেন। তাঁর অদৃশ্য হবার আগের দিনই ফিরতে সব চেয়ে দেরী হয়েছিল, সকালে বেরিয়ে সূর্য্যাস্তের কিছু আগে তিনি ফিরে আসেন এবং সেদিনই তাঁকে সব চেয়ে উৎসাহিত ও উত্তেজিত দেখায়। তাঁর স্বভাব ছিল কোনও বিষয়ে প্রমাণশুদ্ধ স্থির সিদ্ধান্তে আসা না পর্য্যন্ত তিনি কাউকেই কোন কথা বল্‌তেন না। তাই তাঁর এই ক'দিনের আকাশ-ভ্রমণের কারণ যথাযথ কেউই জান্‌ত না, শুধু এইটুকু তাঁর হাবভাব থেকে বোঝা যেত যে কোনও একটা অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিষের তিনি সন্ধান পেয়েছেন—যা' এই সভ্য-সমাজকে জানাতে পারলে একটা প্রকাণ্ড হৈ-চৈ পড়ে যাবে!

অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁর অদৃশ্য হওয়ার একুশ দিন পরে হঠাৎ এক চাষী দম্‌দম্ থেকে সাঁইত্রিশ মাইল দূরে একটা নোটবুক, পাইলট্ গগ্‌ল্‌স্, ভাঙা বন্দুক ইত্যাদি কুড়িয়ে পায়—সেগুলো সে জমা দেয় স্থানীয় থানায়। থানা থেকে সেই জিনিষগুলো ফ্লাইং এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হয়। ইতিমধ্যে

উপলকুমারের প্লেনটাও একটা জলাজমির ভেতর ভাঙাচোরা অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু উপলকুমারের খোঁজ আর পাওয়া গেল না।

সেই নোটবুকে অনেক কথা লেখা ছিল। যদিও কতকগুলো পাতা তা'র ছিঁড়ে গিয়েছে তবুও পড়্‌লে বিশেষ খাপছাড়া ব'লে মনে হয় না,—খাপছাড়া ব'লে মনে হয়, শুধু যে অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ তা'তে আছে। প্রথমে সেই নোটবুকের একবর্ণও কেউ বিশ্বাস করে নি, এ নিয়ে পণ্ডিত-সমাজে অনেক ঠাট্টা-তামাসার প্রচলন হ'য়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পণ্ডিতদেরও মত ধীরে ধীরে বদ্‌লাতে থাকে, এবং উপস্থিত তাঁরা সেই নোটবুকের প্রতিটি অক্ষরই বিশ্বাস করেন এবং সেই সঙ্গেই উপলকুমারের অদ্ভূত চিন্তাশক্তি এবং বিরাট্ প্রতিভাকেও স্বীকার করতে বাধ্য হ'ন।

এখানে সেই নোটবুকে যা লেখাছিল তারই যথাযথ বিবরণ লিখ্‌ব :

"…এর আগের বছরেও নানা দেশে আকাশে ওঠার রেকর্ড করবার জন্য অনেকেই উড়েছিলেন এবং এ বছরে যতটা ওপরে ওঠা হয়েছে ততটা এবং তার বেশীও কেউ কেউ উঠেছিলেন; কিন্তু কারুরই বিশেষ কোনও বিপদ্ হয় নি—এক ফরাসী পাইলটের ছাড়া, এবং সেটাও যে সম্পূর্ণ ইঞ্জিনের প্লাগে ময়লা জমার দরুণ, তা তাঁর মুখেই শোনা গিয়েছে, কারণ তিনি প্যারাস্যুটের সাহায্যে বেঁচে গিয়েছিলেন।—কিন্তু তা' ব'লে আকাশের ওপরে যে বিপদ্ নেই, এই ধারণা করার মত বোকামী খুব কমই আছে। অন্য কোনও গ্রহ-উপগ্রহ থেকে একই লোক হাজার বার পৃথিবীতে আস্‌তে পারে, এবং এ-ও খুবই সম্ভব কোনবারই সে বাঘের দেখা পেল না—কিন্তু তা বলে এটা প্রমাণ হয় না যে পৃথিবীতে বাঘ বলে কোনও জানোয়ার নেই; কারণ এটা খুবই স্বাভাবিক যে সেই লোকই এক হাজার একবারের বার পৃথিবীতে আসার পর বাঘের হাতেই নিহত হ'তে পারে। আকাশের ওপরেও অনেক 'জঙ্গল' আছে এবং সেখানে যা'রা থাকে তা'দের তুলনায় পৃথিবীর বাঘ-ভালুক খুবই নিরীহ প্রকৃতির ব'লে আমার মনে হয়। পৃথিবীতে এমন দিন নিশ্চয়ই আস্‌বে যেদিন আকাশেরও একটা নিখুঁত ম্যাপ্ তৈরী হ'রে এবং আকাশের সমস্ত 'বন-জঙ্গল'গুলো আবিষ্কৃত হ'বে। এখনই আমি সে রকম দু'টো জঙ্গলের কথা বল্‌তে পারি—প্রথমটি নিউ দিল্লীর এরোড্রোমের শ'খানেক মাইল উত্তরের আকাশে আর দ্বিতীয়টি ঠিক আমারই মাথার ওপরে।

"সেদিন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আমি এই কথাই বল্‌তে চেয়েছিলাম—কিন্তু সবাই আমাকে আড়ালে ঠাট্টা কর্‌তে ছাড়ে নি। এই ধারণা প্রথমে আমার মাথায় আসে সিদ্ধার্থ সান্যালের অদ্ভুত ভাবে অদৃশ্য হ'বার পর। সবাই বল্‌ল সমুদ্রের তলায় তাঁরা তলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা'দের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পার্‌লুম না—কারণ প্রথমতঃ, সিদ্ধার্থ ছিল একজন পাকা পাইলট্, দ্বিতীয়তঃ তা'র কাছে ছিল প্যারাস্যুট্, তৃতীয়তঃ তা'র প্লেনটা ছিল খুবই মজবুত ধরণের এবং ওড়ার আগে আমি নিজে সেটা পরীক্ষা করেও এতটুকু খুঁত ধর্‌তে পারি নি। প্রধানতঃ তা'র গতিও ছিল সমুদ্রের ঠিক উল্‌টো দিকে। তার পর বিপ্রদাস সিং-এর দুর্ঘটনা। এরোপ্লেন খারাপ হ'লে সেটা কি কখনও ও রকম অদ্ভুত ভাবে হ্যাঁচ্‌কা গতিতে সোজা ওপরে উঠে যেতে পারে? আর তার মাথাটাই বা গেল কোথায়? এবং ওরকম চর্ব্বির পুরু প্রলেপেই বা কি করে ঢেকে গেল তা'র সমস্ত দেহ? সপ্তাদরের খবরের কাগজগুলো অবশ্য ভুরি ভুরি মন্তব্য প্রকাশ কর্‌তে ছাড়ে নি, ঠাট্টা-তামাসা ক'রে আমার কথাও তারা অনেকে লিখেছে, কিন্তু সেগুলো তা'দের দামের মতই সস্তা আর খেলো—আসল বিষয়ে তারা কতটুকুই বা আমাদের জানাতে পেরেছে? আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি এবং আগামী কাল আমার ছোট্ট মোনোপ্লেন আর রাইফেল নিয়ে আকাশের জঙ্গলে হানা দেবই। এ ক'দিন আমি খানিক খানিক ওপরে উঠেছি, কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখতে পাই নি। তা'তে কিছু যায় আসে না, কালকে নিশ্চয়ই আমি ওপরে উঠ্‌ব আর যদি না ফিরে আস্‌তে পারি তা হ'লে আমার এই নোটবুকটাই সব কথা বল্‌বে,—বল্‌বে আকাশের ভয়ঙ্করের কথা, আর বল্‌বে আমার মৃত্যুর কারণ!

"মেরু প্রদেশের যাত্রীর মতই অনেকটা আমার বেশভূষা হ'ল। ইঞ্জিনটাকে ভালো ক'রে পরীক্ষা কর্‌লুম। আমার য়্যাসিস্‌টান্ট্ রাইফেল আর কার্ট্রিজগুলো প্লেনে তুলে দেবার সময় কি রকম অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে চাইছিল, বোধ হয় ভাব্‌ছিল আকাশ থেকে কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমি শিকার কর্‌ব!…হ্যাঁ, শিকার তো বটেই, কিন্তু কিসের যে তখনও আমি তা জানি না!

"ইঞ্জিনটা কি সুন্দর ভাবে চল্‌ছে! বায়ুস্তরের চাপ সইয়ে সইয়ে বৃত্তাকারে আমি আকাশে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম।

"চমৎকার আজকের দিনটা। পাৎলা নীল সিল্কের মত আকাশখানি পতাকার মত যেন হাওয়ায় কাঁপ্‌ছে, নীচের ঘরবাড়ীগুলো কি রকম ছোট হয়ে এল…অবশ্য আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখে এখন আর আমি আশ্চর্য্য হই না, কারণ এ রকম অভিজ্ঞতা এই তো প্রথম নয়! কিন্তু তবুও আজ এই অনন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রের মত নীল আকাশখানি আমায় যেন মুগ্ধ কর্‌ল: যদিও আমি একজন বৈজ্ঞানিক এবং 'পাগ্‌লা বৈজ্ঞানিক' বলেই লোকে আড়ালে আমায় ডাকে! আমার মোনোপ্লেনটির মতই দেহ আমার কাঁপ্‌ছে এক না-জানা উত্তেজনায়।…সাড়ে ন'টার সময় প্রথম আমি মেঘ পেলুম, পাৎলা টুক্‌রো মেঘ—হাল্‌কা পরীর মত মেঘ (একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এ সব কথা লেখা বোধ হয় ধৃষ্টতা! কিন্তু কি কর্‌ব, আজ আমার এ সব কথা লিখতে কি জানি কেন ভালো লাগ্‌ছে!) গোটা ছয় প্লেন নীচে ঘোরাঘুরি কর্‌ছে আর তার লোকেরা নিশ্চয়ই

ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছে একলা আমি এত ওপরে উঠে চলেছি কেন? যত ওপরে উঠতে লাগ্‌লুম হাওয়াটা ততই ঠাণ্ডা হয়ে উঠ্‌ছে; আমার পুরু জামা-কাপড় ফুঁড়ে সেগুলো যেন হাড়ের ওপর কামড় বসাচ্ছে! কিন্তু এতেও আমি এক রকম অভ্যস্ত বৈকি!

"নাঃ—ভেবেছিলুম আজকের দিনটা বেশ পরিষ্কার থাকবে কিন্তু এক গাদা খয়েরি মেঘ ভেসে আস্‌ছে দেখলুম। পৃথিবীকে আর দেখতে পাচ্ছি না, খয়েরি মেঘের ওধারে সেটা অদৃশ্য হয়েছে যেন। নীচে নিশ্চয়ই খুব বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু আমি এখন তা'দের নাগালের বাইরে!…কি রকম স্তব্ধ আর নির্জ্জন, এই আকাশের মরুভূমি! কতকগুলো সমুদ্রের পাখী আমার কাছ দিয়ে পশ্চিমদিকে উড়ে গেল, তা'দের ক্ষণিক কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ আমাকে যেন উৎসাহিত কর্‌ল!

"ইঞ্জিনটা চমৎকার কাজ কর্‌ছে। পূর্ণগতিতে আমি ওপরে উঠে চলেছি, গোল হয়ে চক্কর দিতে দিতে!…উঃ, ভারি ঠাণ্ডা, যদিও 'য়্যাল্‌টিমিটার'টা বল্‌ছে পৃথিবী থেকে আমি মাত্র বারো হাজার ফিট্‌ ওপরে। সোনালী কুয়াসা ছিঁড়ে আবার আমি ওপরে উঠে এলুম আর সেই কুয়াসার আড়ালে লুকিয়ে-থাকা নীল আকাশটি দুষ্টু মেয়ের মত যেন মুখ টিপে হেসে উঠ্‌ল! এ যেন সেই অনন্ত নির্জ্জনতার রাজ্য, মেঘ আর জল, বজ্র আর বিদ্যুৎ একে স্পর্শও কর্‌তে পারে না।

"পনের হাজার ফুট!…এবার থেকে আমার মনকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক করে তুল্‌তে হ'বে! চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেল্‌তে লাগ্‌লুম। বার বার লক্ষ্য রাখ্‌তে হচ্ছে 'রেভোলিউসান্‌ ইণ্ডিকেটার', 'পেট্রোল লিভার', 'অয়েল পাম্পে'র ওপর। আমার প্লেনের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অংশও ঝন্‌ঝন্‌ কর্‌ছে গতির তীব্রতায়। দম্‌দমের এরোড্রোমের দক্ষিণে আমার বাড়ীর ওপরেই আছে আকাশের জঙ্গল, সেখান থেকে সরে গেলে আমি আর 'তাদের' দেখা পাব না—আমাকে তাই হিসেব ক'রে ওপরে উঠ্‌তে হচ্ছে।

"পঁচিশ হাজার ফুট। প্রায় দুপুর হয়েছে। একটা সাজ্ঘাতিক ঘূর্ণি-হাওয়ার কবল থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলুম। তা'র ভেতরে পড়লেই হয়েছিল আর কি! টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে কোথায় যে ছিট্‌কে পড়্‌তুম তা'র ঠিকই নেই।

"প্রায় তখন সাত মাইল ওপরে, এমন সময় একটা কি হিস্‌ হিস্‌ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে সাঁ ক'রে আমার পাশ দিয়ে চ'লে গেল, আর খানিক নীচে গিয়েই মেঘের মত, ধোঁয়ার মত হয়ে গেল। প্রথমে বুঝ্‌তে পারি নি, পরে বুঝ্‌লুম—ওটা উল্কা! যারা আকাশের বেশী ওপরে ঘোরাঘুরি করে এও একটা সাজ্ঘাতিক বিপদ্‌ তাদের কাছে! আরও গোটা দুই উল্‌কা এদিক্‌-ওদিক্‌ দিয়ে ছুটে গেল, সামান্যর জন্য আমি বেঁচে গেলুম।

"ব্যারোগ্রাফের কাঁটাটা চল্লিশ হাজারের ঘরে!…একটা নতুন কিছুর সন্ধান পেয়েছি! সাম্‌নের হাওয়াটা তার স্ফটিকের মত স্বচ্ছতা যেন হারিয়ে ফেলেছে। খুব সূক্ষ্ম সিগারেটের ধোঁয়ার মত কি যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে সেখানে। আমার প্লেনটা তা'র ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল, আর পর মুহূর্ত্তেই অনুভব কর্‌লুম কি যেন তেলের মত একটা তরল জিনিষে আমার মুখটা ভিজে গিয়েছে। আমার প্লেনের দেহটা যেন পাৎলা চর্ব্বির আচ্ছাদনে ঢেকে গিয়েছে।… হাজার বর্গ মাইল যুড়ে এই জীবাণুর মত সূক্ষ্ম জিনিষগুলো ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সেখানে জীবনের স্পন্দন নেই!…কিন্তু এগুলো কি কোনও জীবিত কিছুর খাদ্য নয়?…কথাটা আমার মাথায় তখনও ঘুরছে, এমন সময় মানুষে এ পর্য্যন্ত যা সব চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষের দেখা পেয়েছে তা'র চেয়ে অনেক বেশী অদ্ভুত কিছুর দেখা আমি পেলুম।

"ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হ'লের বিরাট গোল চুড়োর মত বিরাট্‌ একটা জেলি-মাছের কল্পনা করুন, ফিকে সবুজ তার রঙ্‌…কিন্তু এতো পাৎলা যে মনে হয় আকাশের বুকে যেন কয়েকটা পাৎলা রেখা! দু'টো লম্বা শুঁড়ের মত তা'র তলা দিয়ে নেমে এসেছে! আর সেই শুঁড়গুলো ধীরে ধীরে নড়্‌ছে! মাথার ওপর দিয়ে এই বিরাট্‌ সাবানের ফেনার মত জীবটা ধীর গম্ভীর চালে নিঃশব্দে ভেসে গেল। সেটির ওপর ভালো ক'রে লক্ষ্য রাখার জন্য সবে আমি আমার মোনোপ্লেনের গতি পরিবর্ত্তন কর্‌তে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলুম আমি এক ঝাঁক ওই রকম অদ্ভুত জীবের কবলে পড়েছি…অসংখ্য সেই রকম গোলাকার জীব, তবে কোনটিই আগেকার মত বড় নয়! তা'দের স্বচ্ছ পাৎলা দেহের ভেতর দিয়ে যখন সূর্য্যের আলো আসে কি সুন্দর দেখায় তখন! যেন আকাশের সমুদ্রে অদ্ভুত সুন্দর সব রূপকথার পাল-তোলা নৌকো!

"কিন্তু শীগ্‌গিরই আর একটা অদ্ভুত জিনিষের ওপর আমার নজর পড়্‌ল—আকাশের সাপ! ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকানো জিনিষ, এতো জোরে ঘুরে বেড়ায় যে খুব কষ্টেই নজর রাখ্‌তে হয় তাদের ওপর। ভূতের মত এই জীবগুলি প্রায় ৩০।৪০ ফিট্‌ লম্বা। সেই রকমই একটা সাপ আমার মুখের ওপর দিয়ে চলে গেল—কিন্তু এত ভঙ্গুর আর পাৎলা তাদের দেহ যে তাদের কাছে আমার কোন রকমই ভয় কর্‌ল না!

"কিন্তু তখনও অনেক কিছু ভয়ঙ্কর দৃশ্যই জমা র'য়েছিল! দেখতে পেলুম অনেক ওপর থেকে লাল্‌চে ধোঁয়ার কি যেন একটা জিনিষ নীচে নেমে আস্‌ছে। দেখ্‌তে, দেখ্‌তে তা'র সমস্ত দেহ ফেঁপে ফুলে উঠ্‌ল যেন! যদিও স্বচ্ছ জেলীর মত একে দেখ্‌তে কিন্তু এখানে যতগুলি অদ্ভুত জীব দেখেছি তা'দের ভেতর সব চেয়ে বেশী স্থূল ব'লে মনে হ'ল! এর ভেতর আরও ভয়ঙ্কর অদ্ভুত দু'টি জিনিষ আমি লক্ষ্য কর্‌লুম, প্রথমটি হচ্ছে চাকার মত জ্বলন্ত গোল দু'টি চোখ ও দ্বিতীয়, শকুনের মত বাঁকা তীক্ষ্ণ ঠোঁট! এর পিঠে আবার তিনটি কুঁজের মত জিনিষ,

বোধ হয় এমন কোনও গ্যাসে ভরা যা' তা'কে এই পাৎলা হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে। দেখ্‌লুম ক্রমাগত এ রঙ্‌ বদ্‌লাচ্ছে—খুব ফিকে গোলাপী থেকে একেবারে টক্‌টকে লাল রঙে! আমার মোনোপ্লেনের সঙ্গে প্রায় কুড়ি মাইল সে এগিয়ে চল্‌ল। এর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য আমি নীচু দিকে মোড় ঘোরালুম; অম্‌নি লাল বিদ্যুতের মত সেই জানোয়ারের দেহ থেকে শুঁড়ের মত কি একটা বেরিয়ে এসে আমার প্লেনের ওপর পড়ল। পরমুহূর্ত্তেই মনে হ'ল কে যেন একটা শুঁড় দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ওপরে টেনে তুল্‌ছে। আমার দোনলা বন্দুকটা তুলে নিয়ে তখুনিই সেই জানোয়ারের পিঠের একটা কুঁজ লক্ষ্য করে গুলি ছাড়্‌লুম: সেটা ফেটে গেল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই বিরাট্‌ দেহটা ওল্‌টাতে-পাল্‌টাতে কোথায় নীচে তলিয়ে গেল। বিপদ্‌ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সেই মুহূর্ত্তেই আমি পৃথিবীতে নামতে লাগ্‌লাম, আর সন্ধ্যা সাঁতটা নাগাদ দম্‌দম্‌ এরোড্রোমে পৌঁছুলাম।

"আবার কাল আমি আকাশে যাত্রা কর্‌ব। আমার এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কিছু প্রমাণ সংগ্রহ কর্‌তে না পার্‌লে কেউই বিশ্বাস কর্‌বে না—যদিও এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এখানকার হাওয়ার চাপ ঐ ভয়ঙ্কর জীবের ভঙ্গুর দেহগুলো সহ্য কর্‌তে না পেরে তালগোল পাকিয়ে একটা অদ্ভুত কিছু হবে!"

দুঃখের বিষয় এইখানেই সেই পাণ্ডুলিপির ক'য়েকটা পাতা পাওয়া যাচ্ছে না। পরের পাতায় বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা র'য়েছে:

"তেতাল্লিশ হাজার ফিট। আর আমি পৃথিবীকে দেখ্‌তে পা'বো না। আমার চারদিকে অসংখ্য সেই ভয়ঙ্কর জীব! কি ভয়ঙ্কর পরিণাম!!...ঈশ্বর...!..."*

কেম্ব্রিজের গল্প

(অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌.এস্‌-সি (ক্যাল্‌), পি.এইচ্‌-ডি (ক্যান্টাব্‌))

সেদিনটা ছিল বোধ হয় ১৯৩২ সালের মে মাসের ২৫ তারিখ। কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হবার বন্দোবস্ত করতে লণ্ডন থেকে একদিনের জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরীতে দেখাশোনা করে বের হয়ে দেখি, দলে দলে লোক

* বিদেশী গল্পের ঈষৎ ছায়াবলম্বনে।—লেখক।

রাস্তা দিয়ে একদিকে চলেছে। নতুন লোক, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হ'ল না; ভাবলাম, বোধ হয় ফুটবল্‌ ম্যাচ্‌ আছে, তাই এত লোক চলেছে মাঠের দিকে। ওদিকে ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে এসে গাড়ী ধরা গেল। লণ্ডনে নেমেই দেখি যে বিকেলের কাগজে বড় বড় অক্ষরে বের হয়েছে—"দেশে গ্রীষ্ম সুরু হয়েছে। কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা ছাতা ফেলে দিচ্ছে।" এ আবার কি খবর রে বাবা! আর কেম্ব্রিজের ছেলেরা ছাতা ছাড়ছে কিনা তাতে দেশের লোকেদের মাথা-ব্যথা হবার কি হ'ল! যা হোক্‌, কাগজ পড়ে রহস্যের উদ্ধার হ'ল। গত রাত্রে কে বা কারা নাকি কেম্ব্রিজের কিংস্‌ কলেজের গীর্জ্জার চূড়ায় (উচ্চতা প্রায় দু'শ' ফুট) দু'টো ছাতা বেঁধে রেখে এসেছিল। পরদিন সকালে এটা সকলের চোখে পড়ে। দমকলের ডাক পড়ে ছাতা নামাবার জন্য, কিন্তু দমকলের সব চেয়ে বড় সিঁড়িও চূড়া পর্য্যন্ত পৌঁছল না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ওখানকার রাইফেল ক্লাব থেকে দু'জন বন্দুকধারী এসে গুলি

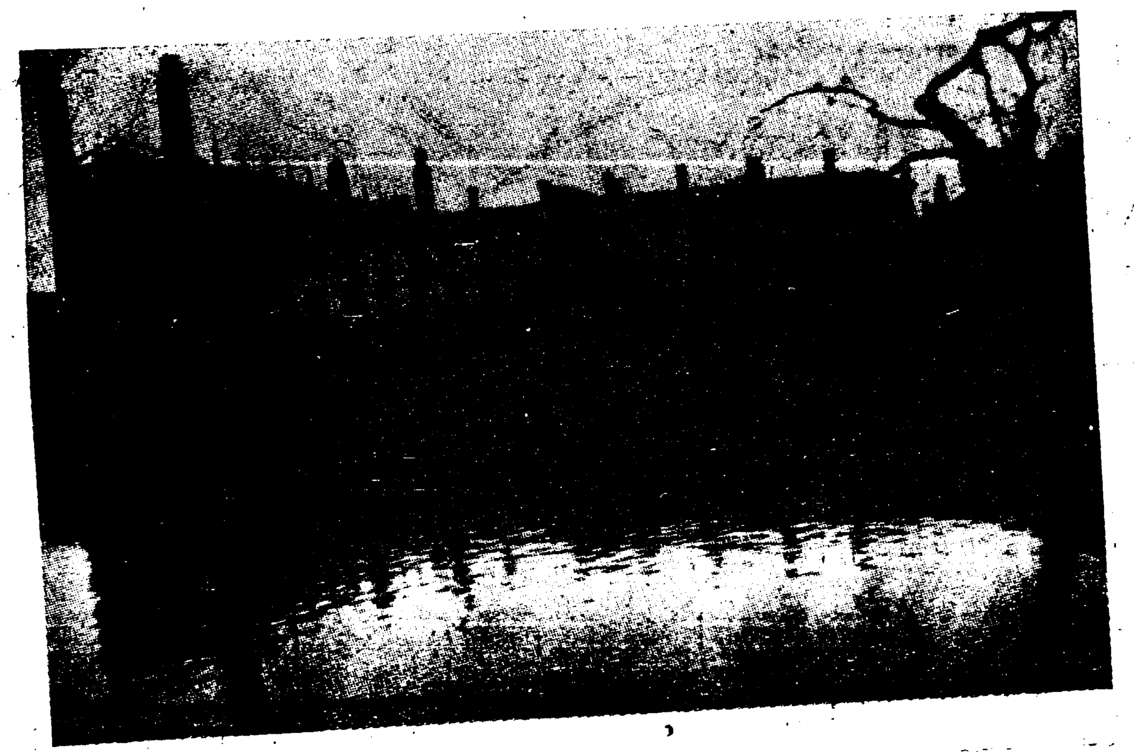

সংশোধন

এই প্রবন্ধের নাম "কেম্ব্রিজের গল্প" না হইয়া "কেম্ব্রিজের কথা" হইবে। প্রবন্ধটিতে কেম্ব্রিজের ছাত্র-জীবনের একটা দিক্‌ দেখান হইয়াছে—পড়িলেই বুঝা যাইবে। এটি গল্প নহে।

রাঃ সঃ।

বোধ হয় এমন কোনও গ্যাসে ভরা যা' তা'কে এই পাৎলা হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে। দেখ্‌লুম ক্রমাগত এ রঙ্‌ বদ্‌লাচ্ছে—খুব ফিকে গোলাপী থেকে একেবারে টকটকে লাল রঙে! আমার মোনোপ্লেনের সঙ্গে প্রায় কুড়ি মাইল সে এগিয়ে চল্‌ল। এর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য আমি নীচু দিকে মোড় ঘোরালুম; অম্‌নি লাল বিদ্যুতের মত সেই জানোয়ারের দেহ থেকে শুঁড়ের মত কি একটা বেরিয়ে এসে আমার প্লেনের ওপর পড়ল। পরমুহূর্ত্তেই মনে হ'ল কে যেন একটা শুঁড় দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ওপরে টেনে তুল্‌ছে। আমার দোনলা বন্দুকটা তুলে নিয়ে তখুনিই সেই জানোয়ারের পিঠের একটা কুঁজ লক্ষ্য করে গুলি ছাড়্‌লুম: সেটা ফেটে গেল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই বিরাট্‌ দেহটা উল্‌টাতে-পাল্‌টাতে কোথায় নীচে তলিয়ে গেল। বিপদ্‌ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সেই মুহূর্ত্তেই আমি পৃথিবীতে নামতে লাগ্‌লাম, আর সন্ধ্যা সাঁতটা নাগাদ দম্‌দম্‌ এরোড্রোমে পৌঁছুলাম।

"আবার কাল আমি আকাশে যাত্রা করব। আমার এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কিছু প্রমাণ সংগ্রহ কর্‌তে না পার্‌লে কেউই বিশ্বাস কর্‌বে না—যদিও এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এখানকার হাওয়ার চাপ ঐ ভয়ঙ্কর জীবের ভঙ্গুর দেহগুলো সহ্য কর্‌তে না পেরে তালগোল পাকিয়ে একটা অদ্ভুত কিছু হবে!"

দুঃখের বিষয় এইখানেই সেই পাণ্ডুলিপির ক'য়েকটা পাতা পাওয়া যাচ্ছে না। পরের পাতায় বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা র'য়েছে:

"তেতাল্লিশ হাজার ফিট। আর আমি পৃথিবীকে দেখ্‌তে পা'বো না। আমার চারদিকে অসংখ্য সেই ভয়ঙ্কর জীব! কি ভয়ঙ্কর পরিণাম!!…ঈশ্বর…!…"*

কেম্ব্রিজের গল্প

(অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌.এস্‌-সি (ক্যাল্‌), পি.এইচ্‌-ডি (ক্যাণ্টাব্‌))

সেদিনটা ছিল বোধ হয় ১৯৩২ সালের মে মাসের ২৫ তারিখ। কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হবার বন্দোবস্ত করতে লণ্ডন থেকে একদিনের জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরীতে দেখাশোনা করে বের হয়ে দেখি, দলে দলে লোক

* বিদেশী গল্পের ঈষৎ ছায়াবলম্বনে।—লেখক।

সংশোধন

এই প্রবন্ধের নাম "কেম্ব্রিজের গল্প" না হইয়া "কেম্ব্রিজের কথা" হইবে। প্রবন্ধটিতে কেম্ব্রিজের ছাত্র-জীবনের একটা দিক্‌ দেখান হইয়াছে—পড়িলেই বুঝা যাইবে। এটি গল্প নহে।

রাঃ সঃ।

রাস্তা দিয়ে একদিকে চলেছে। নতুন লোক, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হ'ল না; ভাবলাম, বোধ হয় ফুটবল্ ম্যাচ্ আছে, তাই এত লোক চলেছে মাঠের দিকে। ওদিকে ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে এসে গাড়ী ধরা গেল। লণ্ডনে নেমেই দেখি যে বিকেলের কাগজে বড় বড় অক্ষরে বের হয়েছে—"দেশে গ্রীষ্ম সুরু হয়েছে। কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা ছাতা ফেলে দিচ্ছে।" এ আবার কি খবর রে বাবা! আর কেম্ব্রিজের ছেলেরা ছাতা ছাড়ছে কিনা তাতে দেশের লোকেদের মাথা-ব্যথা হবার কি হ'ল! যা হোক্, কাগজ পড়ে রহস্যের উদ্ধার হ'ল। গত রাত্রে কে বা কারা নাকি কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজের গীর্জ্জার চূড়ায় (উচ্চতা প্রায় দু'শ' ফুট) দু'টো ছাতা বেঁধে রেখে এসেছিল। পরদিন সকালে এটা সকলের চোখে পড়ে। দমকলের ডাক পড়ে ছাতা নামাবার জন্য, কিন্তু দমকলের সব চেয়ে বড় সিঁড়িও চূড়া পর্য্যন্ত পৌঁছল না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ওখানকার রাইফেল ক্লাব থেকে দু'জন বন্দুকধারী এসে গুলি করে ছাতা দু'টিকে 'চূড়াচ্যুত' করেন।

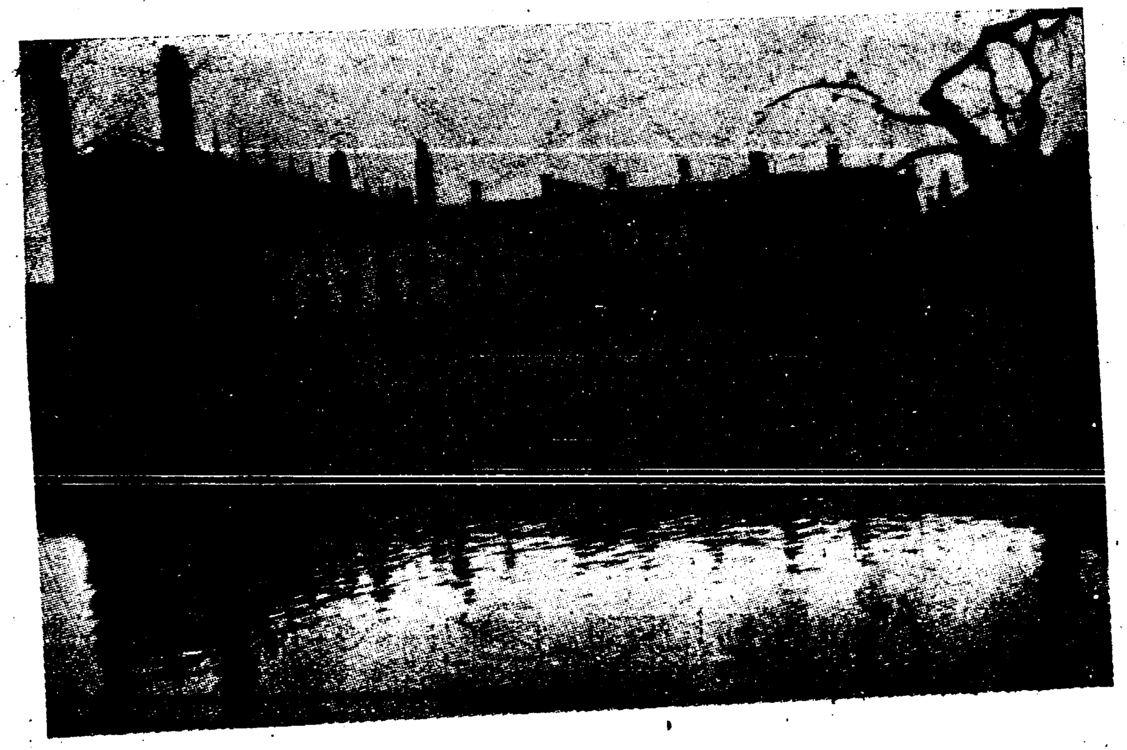

কিংস্ কলেজ; বাঁ পাশে কলেজের গীর্জ্জা। চূড়াটার সবটুকু দেখা যাচ্ছে না।

তখন বুঝতে পারলাম যে দলে দলে লোক যাচ্ছিল ঐ ছাতা নামান দেখতে।

তোমাদের হয়ত আশ্চর্য্য লাগতে পারে যে ছাতা নামাবার জন্য বন্দুক, দমকল এত আড়ম্বরের কারণ কি! কেউ যদি ছাতা দু'টি চুপিচুপি বেঁধে রেখে দিয়ে আসতে পারে, তবে কিংস্ কলেজের অধ্যক্ষ কি আর কোন লোক পেলেন না যিনি গিয়ে ছাতা খুলে নিয়ে আসতে পারেন! কিন্তু সেটা সম্ভব হ'ল না এইজন্য

যে গীর্জ্জার চূড়ায় উঠতে গেলে অসীম সাহসের দরকার। চূড়ার শেষ এক শ' ফুট ক্রমাগত সরু হয়ে উঠে গেছে। এই জায়গা দিয়ে যদি কেউ উঠতে চায় তবে তাকে অতি সাবধানে উঠতে হবে, কারণ একটু পা ফস্কালে একেবারে হু'শ' ফুট নীচে পাথরের উপর পড়ে মাথা গুঁড়ো হয়ে যাবে। ছেলেরা বাহাদুরী দেখাবার জন্য এ-সব করতে পারে, কিন্তু কোন সাধারণ লোককে এ কাজ করতে বললে সে কখনও রাজী হবে না ; কাজেই দমকল এবং বন্দুকের আমদানী করতে হয়েছিল। পরে যখন স্বচক্ষে কিংস্ কলেজের গীর্জ্জাটি দেখেছিলাম তখন শুধু এই কথাই মনে হয়েছিল যে টিক্‌টিকি ছাড়া অন্য কোন্ প্রাণী এর গা বেয়ে উপরে উঠতে পারে!

এই তো হ'ল কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবনের অভিনব দিক্‌টির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। স্বচক্ষে জিনিষটা দেখা ঘটে ওঠে নি বটে, তবে এই সম্পর্কে আর একটা জিনিষ চোখে পড়েছিল—পরের টার্ম্মে, যখন আমি কেম্ব্রিজে থাকতে এলাম। প্রায়ই দেখা যেত এক-একটি ছাত্র চুপিচুপি * ছবির দোকানে ঢুকে এদিক্-ওদিক্ তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞাসা করছে—"আপনাদের কাছে এ—এ—এই কিংস্ কলেজ গীর্জ্জার ছবি আছে কি?" দোকানদারও গম্ভীরভাবে উত্তর দিত, "হাঁ মহাশয়, কিছু শুদ্ধ, না অম্‌নি?" (Yes sir, with or without ?)

তার পর তিন বছর কেম্ব্রিজে থাকার মধ্যে এ রকম অনেক কিছুর সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল। কেম্ব্রিজ সহরটি ক্যাম্ নদীর ঠিক উপরেই। নদী বললাম বলেই মনে ক'র না যে একটা মস্ত কিছু। ও রকম নদীকে এ দেশে নালা ছাড়া আর কিছুই বলবে না ; কিন্তু ঐ নদীরই ওখানে ভীষণ খাতির। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, বায়রন্, মিল্টন, প্রভৃতি বড় বড় কবি ঐ নদীর উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কবিতা লিখে গেছেন। আর সত্যিই নদীটি খুব সুন্দর। কিন্তু সে কথা যাক্ ; এই নদীর উপরই কেম্ব্রিজের বড় বড় গোটা দশেক কলেজ আছে, আর প্রত্যেক কলেজেরই নদীর উপর একটা করে ব্রিজ্ আছে। এই দশটী কলেজের একটির নাম হচ্ছে ক্লেয়ার (Clair)। এই ক্লেয়ার কলেজের দু'টি ছেলের মধ্যে এক রাত্রে খাবার সময় তর্ক হ'ল যে ক্লেয়ার

* চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে ইউনিভারসিটির কর্ত্তৃপক্ষ ছাতাশুদ্ধ গীর্জ্জার ছবি বিক্রী করতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কোন দোকান লুকিয়ে এই ছবি বিক্রী করত।

ব্রিজের পোলের উপর ক'টা বল্ আছে। (ক্লেয়ার ব্রিজের দু'ধারের রেলিং ইটের তৈরী, আর সেই রেলিংএর উপর কামানের গোলার মত বড় পাথরের বল্ আছে) একজন বল্লে যে এদিকে ছ'টা ওদিকে ছ'টা—এই রকমে মোট বারোটি বল্ আছে ; আর তার সঙ্গী ততই তর্ক করে যে তার কম আছে। শেষ পর্য্যন্ত দু'জনে বাজী ধরল,—কাল সকালে ব্রিজে গিয়ে এর মীমাংসা হবে। প্রথম ছেলেটি তো বাড়ী চলে গেল। দ্বিতীয় ছেলেটি করল কি, একটা ছেনী জোগাড় করে একটা বলের আধখানা এমনি ভাবে কেটে রেখে এল যে বাইরে থেকে সহজে বোঝা না যায় যে বল্‌টা কাটা হয়েছে। পরদিন সকালে দলবল নিয়ে প্রথম ছেলেটি উপস্থিত হ'ল। ভালমানুষের মতন দ্বিতীয় ছেলেটিও সেখানে এসে হাজির। তার বন্ধু যখন খুব উৎসাহের সঙ্গে এক, দুই, তিন, করে গুণে বল্লে. "দেখলে তো? আমিই ঠিক বলেছিলাম। এখন ফেল টাকা।" তার বন্ধু তখন গম্ভীর ভাবে সেই কাটা জায়গাটি দেখিয়ে বল্লে, "তাই তো বন্ধু, গুণতেও ভুলে গেছ! এই আধখানা বল্‌কে তুমি কি পূরো একখানা বল্ ধরলে? টাকা তা হ'লে আমারই পাওনা, কি বল?" সেই থেকে ক্লেয়ার-ব্রিজের নাম হয়ে গেছে 'সাড়ে এগার বল্-ওয়ালা ব্রিজ'!

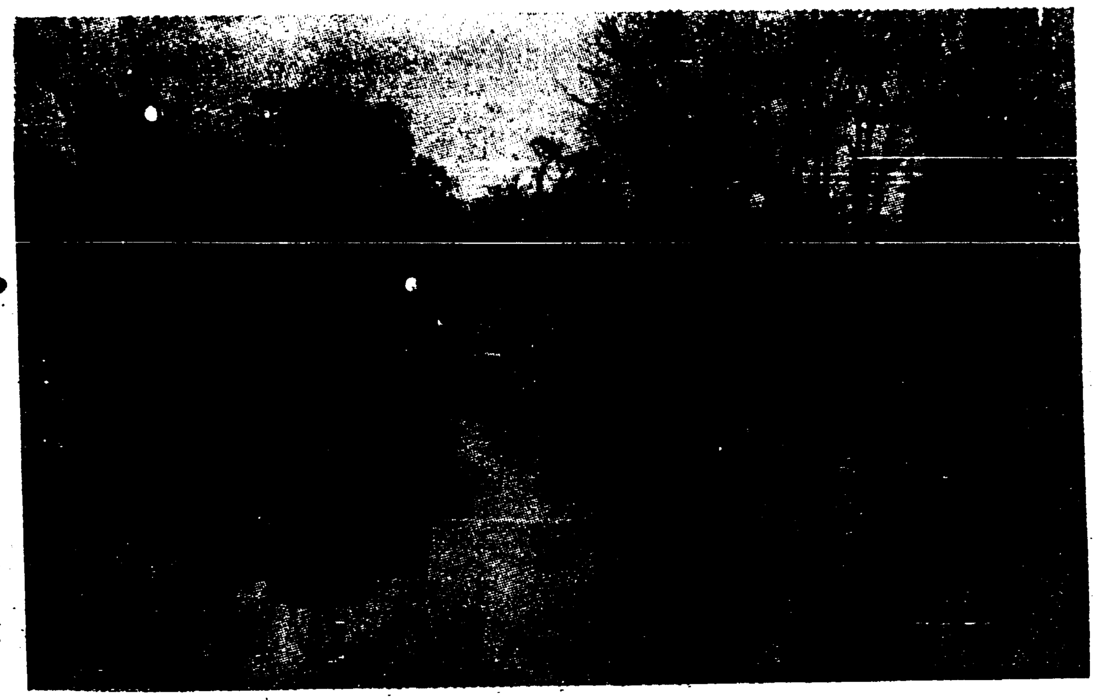

ক্যাম্ নদী

পাঁচ-ই নভেম্বরকে ওখানে বলে গাই ফক্‌সের দিন। ফক্‌স্ মানে শেয়াল নয়, গাই ফক্‌স্ (Guy Fawks) ইংলণ্ডের একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ কোন এক কারণে তিনি ব্রিটিশ রাজ্যের উপর মর্ম্মান্তিক চটে গেলেন, এমন

চট্‌লেন যে ঠিক করলেন হাউসেস্ অফ্ পার্লিয়ামেণ্টটি দেবেন উড়িয়ে! এই মতলবে তিনি চুপিচুপি হাউসেস্ অফ্ পার্লিয়ামেণ্টের নীচে পিপে পিপে বারুদ জমা করতে লাগলেন; ঠিক হ'ল যে ৫ই নভেম্বর এই সব পিপেতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এ কথা কি করে ফাঁস হয়ে যায়। ফলে ঠিক ৫ই নভেম্বর যখন ফক্‌স্ আগুন লাগাতে যাচ্ছেন তখন পুলিস এসে তাঁকে ধরে, এবং তার পর তাঁর গলাটিও পড়ে কাটা।

এ সব কাণ্ড প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগে হয়ে গেছে, কিন্তু ইংলণ্ডের লোক এখনও গাই ফক্‌সের কথা ভোলে নি। এখনও প্রতি পাঁচ-ই নভেম্বর খড়ে তৈরী গাই ফক্‌সের চেহারা প্রতি গাঁয়ে গাঁয়ে পোড়ান হয়, আর সেই সঙ্গে ছেলের দল হাউই, পটকা প্রভৃতি বাজী পোড়ায়। তোমরা বেশ বুঝতে পারছ যে কেম্ব্রিজের ছেলেরা এ হুজুগে চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। কিন্তু তাদের হৈ-চৈএ বাদ সাধে ওখানকার পুলিশ। কেম্ব্রিজ-পুলিশের হুকুম যে সহরের মধ্যে কেউ বাজী ছুড়তে পারবে না, আর ছেলেদেরও জেদ যে তারা সহরের মধ্যিখানে বাজারের ভিতরেই বাজী ছুড়বে। ফলে পুলিশে ও ছেলের দলে লেগে যায় তুমুল কাণ্ড। ছেলের দল রাস্তার আলো সব নিবিয়ে রাস্তার মধ্যে গাই ফক্‌সের মূর্ত্তি রেখে তাতে আগুন ধরাতে চায়। পুলিশ তেড়ে এসে সেই আগুন নিবাতে চায়, আর ছেলের দলের সঙ্গে লেগে যায় ধ্বস্তাধ্বস্তি। শেষ পর্য্যন্ত আগুনও নেবে, দু'চার জন ছেলে ধরাও পড়ে কিন্তু পুলিশ বাবাজীরাও তাঁদের টুপি, লাঠি ইত্যাদি খুইয়ে যান। যে-সব ছেলেরা ধরা পড়ে, পরদিন বিচারে তাদের পাঁচ থেকে দশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা হয়। কিন্তু তাতে হয়েছে কি, পুলিশের টুপি, লাঠি তো চুরি করা গেছে! ছেলেদের মহলে এই সব টুপি, লাঠির খুব আদর। 'যুদ্ধ-বিজয়ের' নিদর্শন স্বরূপ নিজেদের ঘরে তারা সে সব টানিয়ে রেখে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খুব বাহবা নেয়।

কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটির কতকগুলি খুব মজার মজার নিয়ম আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে ছাত্রদের সব সময়ে ক্যাপ্ ও গাউন পরে বের হতে হবে। ক্যাপ্ আর গাউন তোমরা হয়তো দেখে থাকতে পার—এই রকম পোষাক পরে এ দেশে ডিগ্রী নিতে যেতে হয়; পোষাকের উপর একটা আলখাল্লার মতন কাল

কোট—এর নাম হচ্ছে গাউন, আর টালীর মতন চ্যাপটা টুপি—তার নাম হচ্ছে ক্যাপ্। ইউনিভারসিটি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে যেতে হ'লেই—যে রকম লেকচার শুনতে, ডিনার খেতে, গীর্জ্জায় যেতে—সব সময় এই পোষাক পরে ছেলেদের বের হতে হয়। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর এই পোষাক না পরে বের হলে তো সর্ব্বনাশ! রাস্তায় "প্রক্টার"* ধরে, তার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করে সাড়ে সাত শিলিং ফাইন করে নেবে। একেবারে "শিব ঠাকুরের আপন দেশ" আর কি!

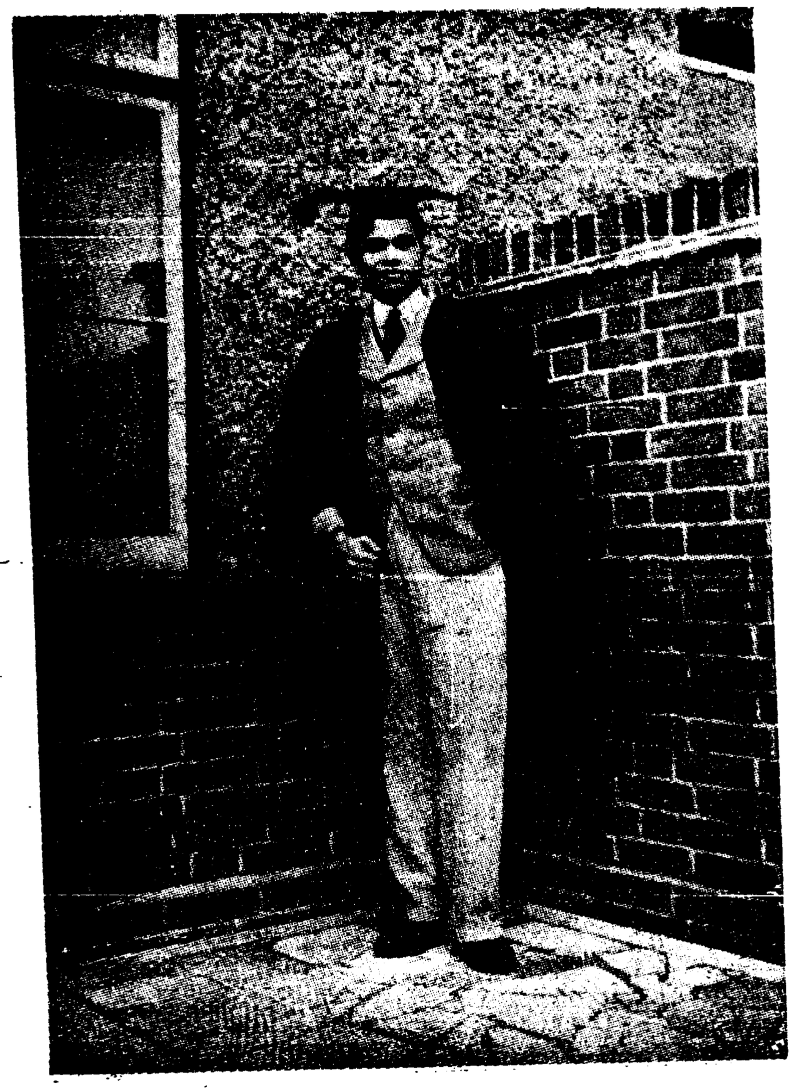
লেখক (ইউনিভারসিটির ক্যাপ্ ও গাউন পরিহিত)

এখন, একবার হয়েছে কি, প্রথম টার্ম্মের (ওখানে ইউনিভারসিটির বছর সুরু অক্টোবর মাসে) প্রথম রবিবার দিন দেখা গেল যে একদল ছেলে খুব সকালেই ক্যাপ্ আর গাউন পরে গম্ভীর ভাবে ইউনিভারসিটির রেজিষ্ট্রীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা যত বাড়তে লাগল ভিড়টাও ততই বাড়তে সুরু হ'ল। ক্রমে প্রক্টারের টনক নড়ল। তিনি এসে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা ওরকম ভাবে ঐখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? ছেলেরা কি উত্তর দিল; একটু পরে প্রক্টার বের হয়ে এলেন আর তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল যেন কোন রকমে হাসি তিনি চেপে রাখছেন। সেই সঙ্গে জমায়েৎ ছেলেগুলির

* এঁদের কাজ হচ্ছে ছেলেদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখার ব্যবস্থা করা, কোন ছেলে কোন নিয়ম ভাঙ্গছে কিনা তাই দেখা। এঁদের হাত থেকে পালাবার উপায় নেই, কারণ প্রত্যেক প্রক্টারের সঙ্গে "বুলডগ্" বলে দু'জন লোক থাকে। তাদের কাজ হচ্ছে কোন ছেলে প্রক্টারের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করলে তাকে জোর করে ধরে এনে হাজির করা।

মধ্যেও খুব হৈ-চৈ সুরু হয়ে গেল। তখন জিজ্ঞাসা করে আসল কারণটা জানা গেল। ছেলেগুলি সবই নতুন, মানে সেই বছরই প্রথম ভর্ত্তি হয়েছে। তার উপর আবার পাড়াগেঁয়ে, অর্থাৎ কানাডা, সাউথ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গল থেকে প্রায় সব এসেছে। কাজেই সহুরে ইংলণ্ডের ছেলেরা, বিশেষ করে উঁচু ক্লাসের ছেলেরা একটু মস্কারা করেছে তাদের সঙ্গে। ইউনিভারসিটির রেজিষ্ট্রী অফিসটি ঠিক একটা গীর্জ্জার মতন দেখতে। কাজেই যখন ছাত্রদের মধ্যে মাতব্বর কয়েকজন গম্ভীর ভাবে তার আগের দিন তাদের উপদেশ দিয়েছিল যে 'দেখ, ঐ বাড়ীটা হচ্ছে ইউনিভারসিটির গীর্জ্জা, আর প্রথম টার্ম্মের প্রথম রবিবার নতুন ছেলেদের ওখানে যাওয়া দরকার' তখন তারা আর না গিয়ে করে কি! দেখ তো কি অন্যায়! সেই শীতের দিন সকালে ঠাণ্ডায় দু'ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেচারীরা খালি অপেক্ষা করছিল, কখন দরজা খুলবে আর কখনই বা প্রার্থনা সুরু হবে! ভাগ্যিস্ আমি ছিলাম হিন্দু, নয়তো আমাকেও হয়তো ঐ মুস্কিলে পড়তে হ'ত। বোকা বানাতে ওদেশের লোক অদ্বিতীয়।

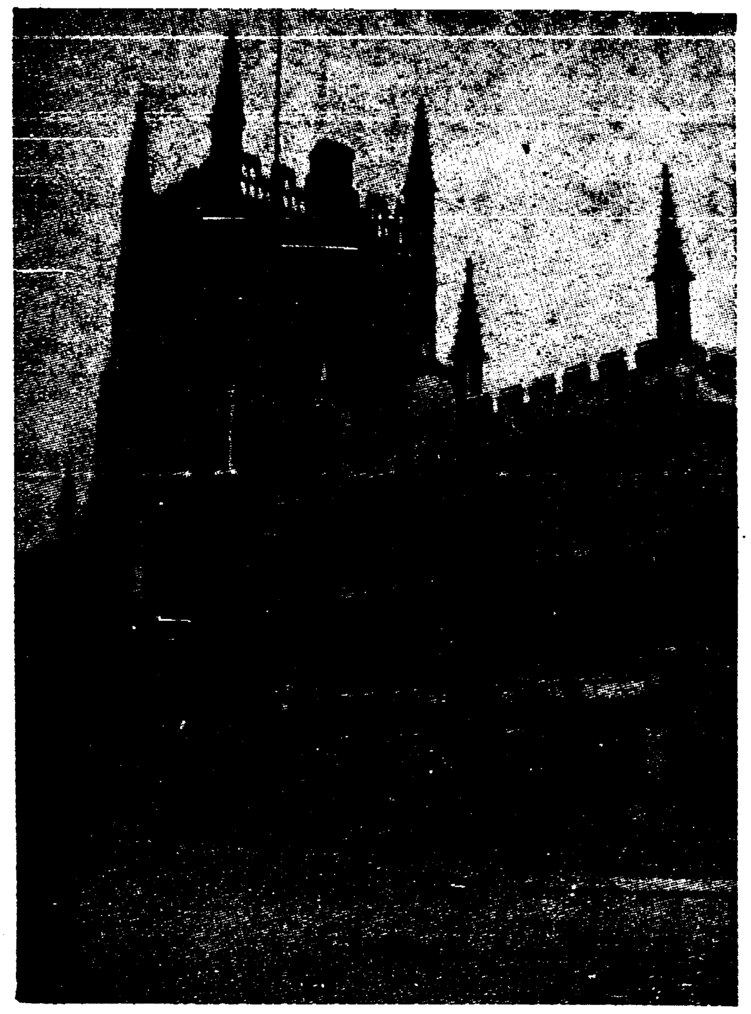

ইউনিভারসিটির রেজিষ্ট্রী (দেখতে অনেকটা গীর্জ্জার মতন)

এই তো গেল কেম্ব্রিজের ছাত্রদের দুষ্টুমির সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। অনেক সময় তারা আবার তাদের দুষ্টুমি বুদ্ধিগুলি নানা ভাল কাজে লাগিয়ে থাকে। কিন্তু সে কথা আজ থাক; অন্য আর একদিন না হয় সে নিয়ে গল্প করা যাবে।

পল্লী-রাণী

(শ্রীমতী অপর্ণা দেবী)

চূত-মুকুলের গন্ধে আকুল
দখিণ-বায়,
গাহে বন্দনা শত চন্দনা
শ্যামল-কায়।
বন-মল্লিকা-সৌরভ ভঁরা
কানন-বীথি,
বন-রাণী সেথা রচিয়া রেখেছে
গোপন গীতি।
স্বর্গ-সুষমা ঢালে দিগ্‌বধূ,
পল্লী-প্রাতে,
পল্লী-বধূর শিঞ্জিনী বাজে
ঝিল্লী সাথে।
আকাশের তারা বুঝি পথ-হারা
পল্লী-বনে,
মুখর পবন, পল্লী-বালার
কলস্বনে।
চাঁদিমা সেথায় আপনা হারায়ে
জ্যোছনা ঢালে,
ফোটে কহ্লার,—ঊষার অরুণ
সরসী-ভালে।
ব্রহ্মচারিণী পল্লী-বিধবা—
বহ্নি-শিখা;
ঢালে তরুশিরে হীরকাঞ্জলি
খদ্যোতিকা।

কুমুদ, কমল আঁকিছে মোহন-
আলিম্পন;
'পল্লী-কমলা' রাজিছে সেথায়
অনুক্ষণ।
পল্লী-বধূর অলক্ত-রাগ
শষ্প-বুকে;
কমল-কাননে মরাল মরালী
ভ্রমিছে সুখে।
তাল-তমালের ছায়া-ছবি আঁকা
দীঘির জলে
কঙ্কণ রণি' পল্লী-রমণী
'জল্‌কে চলে'।
কুরাঙ্গনেটী প্রদীপ সাজায়
তুলসী-মূলে
'বাস্তু-দেবের' নিত্য-সেবিকা
ভক্তি-ফুলে।
গোধূলি-লগনে ফিরে গৃহপানে
ধেনুর পাল;
রাখালের বাঁশী আনে স্মৃতিপথে
অতীত কাল।
ষড়-ঋতু তা'র শত-সম্ভার
দস্যু-ভয়ে
লুকায়ে রেখেছে 'পল্লী-মা'য়ের
আঁচল-ছায়ে।

প্রকৃতি-রাণীর রত্ন-আগার
পল্লী-বুকে
মুক্ত, অবাধ সবি সেথাকার,—
অসীম সুখে !
শস্য-পূর্ণ অঞ্চল তার—
দুঃখ-হরা,
তাহারি স্মৃতির সৌরভে মম
বক্ষ ভরা।

গগনের নীলে, ধরার শ্যামলে,
শ্যামলা তুমি ;
প্রণমি, আমার ধ্যানের দেবতা
পল্লী-ভূমি !
তোমার মালতী-কুন্দ-করবী-
শেফালি ফুলে—
অর্ঘ্য রচিয়া এনেছি তোমার
চরণ-মূলে।

* * *

বংশীধরের বড়দিন

(অধ্যাপক শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ)

রাসবিহারী গ্রামের মোড়ল গোছের ব্যক্তি। সবাই তাকে মান্য করে, আর কিছু জমিজমা, ক্ষেতখামার থাকাতে সে বেশ দু' পয়সা জমিয়েছে। তার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু ঘরের দুধ, আর পুকুরের মাছের কল্যাণে তার চেহারাটা এমনি জম্‌কালো দাঁড়িয়েছে যে মাতব্বর বলে ভ্রম হয়। আর কথা বলার ধরণটাও তার বিশেষ রকমের ভারিক্কী চালের। যেন এই পৃথিবীতে অনেক দিন সে বাস করেছে, আর তারই ফলে সে এমন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে যার মূল্য অনেক বেশী। তার ওপর গ্রামের ছোটলোক নিয়ে যখন কারবার, তার পদমর্য্যাদাটুকু সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এমন কি স্থানীয় আপার প্রাইমারী স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত মশাইও তার পরামর্শ অনুসারে চলেন।

অবশ্যি রাসবিহারী যে খুব পণ্ডিত ছিল তা নয়। বীরভূমের সদর স্কুলে

সে বছর কয়েক পড়েছিল। ম্যাট্রিক্ পর্য্যন্ত না পৌঁছুলেও, মোটামুটি ইংরিজী বাংলা লেখা তার রপ্ত ছিল। তবে গ্রামের ছেলেপিলেরা যখন আস্‌ত, তখন রাসবিহারী তার পুরানো পাণ্ডিত্যের একটু-আধটু নমুনা ছাড়্‌ত। স্কুলে পড়বার সময় সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই তাকে 'হস্তিদন্তখচিত' কথার মানে জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছিল, 'হাতী দাঁত খিঁচিয়ে আছে'। তার পর তাকে আর কখনও কোন প্রশ্ন করা হয় নি। সেই থেকে রাসবিহারীর কেমন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছে যে বাংলায় সে খুব 'ষ্ট্রং'।

বাড়ী হ'ল তার বীরভূম জেলার কোন এক গ্রামে। কিন্তু দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের ঘটকালীতে তাঁর বিয়ে হয়েছিল কল্‌কাতায়—বৌবাজারে। সেই সুবাদে মধ্যে মধ্যে রাসবিহারীকে সহরে আসতে হ'ত। ষ্টেশন থেকে তার দেশের বাড়ী প্রায় সতের-আঠার মাইল দূরে, কাজেই গ্রামের অনেক লোক রাসবিহারীকেই একমাত্র সহুরে, সভ্য লোক ভেবে এসেছে। এক-একবার রাসবিহারী কল্‌কাতায় আসে, আর দেশে গিয়ে নানান্ রকমের বানানো তাজ্জব কাহিনী শোনায়। দেশের মানুষরা ভাবে, কল্‌কাতা না জানি কি আজব সহর !

* * *

বংশীধর গ্রামেরই ছেলে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দোহারা চেহারা, তামাটে রং, প্রকাণ্ড গোঁফ আর ছোট খোঁচা খোঁচা চুল নিয়ে যখন সে রাস্তায় চল্‌ত, তখন দু'শ' গজ দূর থেকেও তাকে চিনে নেওয়া সহজ হ'ত। পড়াশুনা তার বেশী দূর হয় নি, তবে নাম সই করতে পারে, আর যে কোনও বাংলা বই বানান্ করে করে পড়তে পারে। অঙ্কের জন্যই তাকে লেখাপড়া ছাড়তে হ'ল, কেননা কড়া গণ্ডা টাকা আনা পাই এর সংখ্যা মনে রাখা ভদ্রলোকের কাজ নয়, এই তার ধারণা। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, কাজেই আদুরে। এত দিন ধরে সে কেবল নাটক পড়ে, ও দেখে এসেছে। চেহারা সম্বন্ধে তার একটু বিশেষ দুর্ব্বলতা দেখা যায়। আশ-পাশের গ্রামে সখের থিয়েটার হ'লে, সে আগে গিয়ে হাজির হয়, আর রাজা সাজবার লোভে দু'-চার আনা চাঁদা বেশী দিয়ে ফেলে। সুতরাং তাকে নিয়ে যে সবাই একটু মজা-তামাসা করে থাকে তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

বংশীর সঙ্গে রাসবিহারীর অন্তরঙ্গতা আছে। সময়ে অসময়ে 'রাস্তুদা'র বাড়ী গিয়ে সে গল্পগুজব করে, তামাক সেজে দেয়, আর হাঁ করে কলকাতা সহরের তাজ্জব কাহিনী শোনে। রাসবিহারীও মনের সুখে অমন ভক্ত, নীরব শ্রোতার সাম্নে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়। ফলে, সত্য মিথ্যা, সম্ভব অসম্ভব কথা শুনে বংশীর বড় লোভ হ'ল যে রাস্তুদার মত মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভে কল্কাতা দর্শন করে সে একটা মহা পুণ্যের সঞ্চয় করবে।

অক্লান্ত অধ্যবসায়, নীরব সেবা আর মায়ের সুপারিশের ফলে গ্রামের দেবতা সদয় হলেন। রাসবিহারী আশ্বাস দিয়েছে যে বড়দিনের বন্ধে যখন তাকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে হবে, বংশীধরকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। যে ব্যক্তি রেলে করে এক সঙ্গে দশ মাইল যায় নি, তার পক্ষে কলকাতা যাত্রা একটা রীতিমত য়্যাড্ভেঞ্চার। শেষের ক' দিন বংশীর ভালো করে ঘুমই হয় নি। সাত দিন আগে থাকতেই, কাপড়-জামা, শীতবস্ত্র বেঁধে সে একটা পুঁটুলি বেঁধে ফেলেছে। এক টুক্রো সাবানও তার সঙ্গে নিয়েছে, কেননা রাস্তুদা বলেছে যে একে তার শ্বশুর-বাড়ী, তার ওপর কলকাতা সহর, যেখানে মেম-সাহেব বড়দিনের ছুটিতে রাস্তায় গিস্গিস্ করছে,—যেন কেউ পাড়াগাঁয়ের ভূত না ভাবে।

* * *

সমস্ত পথ বংশী কেবল হাঁ করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে। যা দেখে, তাই তার আশ্চর্য্য লাগে। মাঠের বাঁধ, রেলের পুল, ষ্টেশনের সিগ্ন্যাল, হাওড়ায় জনতার অরণ্য, সবেতেই সে অবাক্। অবশেষে রাস্তুদার সঙ্গে ওয়েলিংটনের মোড়ে সে তার শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করলে। ঢোক্বার সময় কি করে ভদ্রসমাজে চল্তে হয় সে সম্বন্ধে এক দফা উপদেশও শুনে নিলে।

রাস্তুদার শ্বশুর-বাড়ীর লোকগুলি কিন্তু চমৎকার। ছেলেমেয়েরা বেশ আমুদে, তার ঘরেই সব সময়ে ভিড় করে থাকে, তার সঙ্গেই গল্প করে কেবল, আর হাসে।

রাস্তুদা বিকালের দিকে রোজই বংশীকে বেড়াতে নিয়ে যায়—কোনও দিন কলেজ ষ্ট্রীট, গোলদীঘি, কোনও দিন বা ভবানীপুর, বালিগঞ্জের দিকে। চাঁদনী

থেকে একটা সস্তায় 'কম্ফর্টার'ও কিনে দিয়েছে, কলকাতায় আবার বেশী শীত পড়েছে কিনা, আর ঠাণ্ডা লাগ্লেই নিমুনিয়া! একে একে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, মনুমেণ্ট সব দেখা হ'ল।

রাস্তুর সব চেয়ে ভালো লাগে বংশীকে বোঝাতে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উচ্চতা দেখে যখন বংশী ক্রমাগতই একবার ওপর আর একবার নীচের দিকে তাকাচ্ছে, রাস্তু বল্লে "ও আর মাপ্ছিস্ কি! আমাদের ভৈরবনাথের মন্দিরের চেয়েও উঁচু হবে। হবে না—কত বড় মহারাণী ওরই নীচে শুয়ে আছেন!"

হগ্ সাহেবের মার্কেটে গিয়ে বংশী আর চোখ ফেরাতে পারে না। রাসবিহারীরও যে এ স্থানটা খুব পরিচিত তা তার কথাবার্ত্তায় চলা ফেরায় মনে হ'ল না। কিন্তু মুখের জোরে সে এক রকম যা হয় করে বংশীকে সব বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু মুস্কিল হ'ল তারা দু'জনেই কেউ বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। ডাইনে বাঁয়ে যতই গলিতে ঢোকে আর এঁকে বেঁকে ঘুরে বেড়ায়, ততই খানিক পরে সেই এক মধ্যস্থলে এসে ওজন নেবার যন্ত্রের কাছে হাজির হয়। রাস্তু ক্রমশঃ গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে উঠ্ল। বংশীর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, দু'ধারে সারবাঁধা এক রকমের দোকানের দিকে তাকিয়ে সে চল্তে থাকে আর প্রশ্নের পর প্রশ্নে রাস্তুদা'কে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ওজন নেবার যন্ত্র দেখে তার ওপর সে ঝাঁ করে উঠে পড়্ল; রাস্তু তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে ফেল্ল। এই রকম করে রাত আটটা পর্য্যন্ত ঘোরাঘুরি করে অবশেষে এক ভদ্রলোকের কৃপায় উভয়েই গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে শুনতে পেল, ভদ্রলোকটি বলছেন, "পাড়াগেঁয়ে ভূত একেবারে!" রাস্তু তাই শুনে ক্ষেপে উঠ্ল বংশীর ওপর, বল্লে—"হোই! হ'ল তো! তখনই বলেছি হাঁ করে জিনিষ দেখ্বি না, এখন গালাগাল খেলি তো! আমরাও তো কত বার এসেছি, কখনও কেউ এ একথা বলেছে! আর তুই সঙ্গে ছিলি বলেই না—" বংশী লজ্জায় সঙ্কোচে মুষ্ড়ে যায়।

লেক্, কালীঘাটের মন্দির, সব দেখে রাস্তু বংশীকে নিয়ে ট্রামে চড়্ল। দূরে রাসবিহারী এভিনিয়্যু দেখিয়ে বল্ল—"হোই যে ঝক্ঝক্ করছে রাস্তা, সাপের

মত লিক্লিক্ করছে, ও আমার—জানিস্?" বংশী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাতে রাস্থু বল্লে—"কত বড় শ্বশুরের জামাই বটে আমি—দেবে না আমার নামে রাস্তা বানিয়ে!"

বংশী শ্রদ্ধায় আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

* * *

ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, এবার দেশে ফিরতে হবে। বাকী আছে শুধু কলকাতার থিয়েটার দেখা। বংশী কলকাতায় প্লে না দেখে যাবে না কিছুতেই। রাসবিহারীর ইচ্ছা ছিল না যে বাজে খরচ হয়, তবে বংশী বলেছে সে অর্দ্ধেক টাকা দেবে। তবুও রাস্থুর মন খুঁত খুঁত করে—এতগুলো পয়সা মিছামিছি অপব্যয় হবে। অবশেষে রাসবিহারীর ছোট শালা সে সমস্যার সমাধান করে দিলে, বললে, "তার চেয়ে চল না কেন, শ্যামবাজারের 'টকি' দেখে আসি, খুব ভালো বই—'পাতাল-প্রবেশ'। চল না রাস্থুদা'!"

রাসবিহারী কখনও 'টকি' দেখে নি, আর থিয়েটারের চেয়েও খরচ কম শুনে টপ্ করে রাজী হয়ে গেল; কিন্তু মুস্কিল হল বংশীকে নিয়ে। 'টকি' জিনিষটি কি রাসবিহারীর ছোট শালা খগেন তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলে. কিন্তু বংশীর সন্দেহ গেল না। তার ধারণা হল ভগ্নীপতিকে সে বোকা বানাচ্ছে। তাই ঘাড় নেড়ে সে বললে "হুঁ হুঁ, তুমি লোকটি চালাক আছ বটে, কিন্তু আমিও বারা সব বুঝি! বল দিথি, বই ছবি হয় কি করে?"

ঠিক হল, রাস্থু আর বংশী আগে গিয়ে সময় থাকতে টিকিট কাট্বে, আর খগেন পরে যাবে। টিকিট-ঘরের সামনে যেন তারা হু'জনে যথা সময়ে হাজির থাকে।

* * *

হুপুর বেলায় আহারাদির পর তামাক খেয়ে একটু বিশ্রাম করেই হু'জনে সাজগোজ আরম্ভ করে দিলে। যখন দরজা খোলা হল, বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ সবাই ছুটে এল সে অপরূপ সাজসজ্জা দেখবার জন্য। রাসবিহারীর পরনে দেশী ধুতি, মালকোঁচা বাঁধা। গায়ে ঘোর নীল রং-এর গরম ওপ্ন্-ব্রেষ্ট্ কোট। পায়ে

সেলিম, হাফ্ মোজার ওপর রবারের গার্টার, আর সর্ব্বোপরি গাঢ় সবুজ রং-এর জার্মান্ আলোয়ান। অনুচর বংশীর বেশ হ'ল—একটা সাদা শার্টের ওপর আর একটা গরম চকোলেট্ শার্ট, পায়ে খাকী কেড্স্ আর পট্টুর মোজা, এবং গলায় চাঁদ্নীর লাল-নীল-বেগুনী-কালো রং এর 'কম্ফর্টার'।

রাস্তায় বেরিয়ে রাস্থু প্রস্তাব করলে—আজকে ট্রামে না গিয়ে বাস্ এ যাওয়া যাক্। বংশী দোতলা বাস্-এ চড়ে নি। কিন্তু দেখা গেল, হু'জনেই এ কাজে সমান পটু। দোতলায় উঠে বংশী প্রথমেই এক দফা বমি করলে। কন্ডাক্টার এসে খুব খানিক চেঁচামেচি সুরু করে দিলে, কিন্তু খানিক পরে হাঙ্গামা মিটে গেলে রাস্থু চোখ পাকিয়ে দাঁত কড়মড় করে বল্লে—"এই জন্যেই তোকে আনতে চাইনি বটে—একটি আস্ত লড়বড়ে ভূত!"

বাকী পথটা বংশী কোনও রকমে কাটালে। আড়চোখে দেখে নিলে রাস্থু সীটের গদির ওপর উবু-হয়ে বসে রেলিং ধরে আছে। বংশী রাস্থুদা'র বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার তারিফ্ করে নিজেও সেই রকম করে সীটের ওপর উঠে বসতেই অন্যান্য যাত্রীরা নানা রকমের মন্তব্য সুরু করে দিলে। তখন বংশী চটে গিয়ে বল্লে—"আমি উঠে বসছি তো আপনাদের কিছুটি হয়েছে? গাড়ী যখন দোলন দেয়, তখন ধর্ব কি বটে?"

বায়স্কোপের ঘরের সাম্নে হু'জনে সিঁড়ি ধরে অনেক কষ্টে বাস্ থেকে নেমে যেন হাফ্ ছেড়ে বাঁচলে, এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞা করলে যে এ রকম মানুষমারা কলে আর চড়বে না। নাম্তে না নাম্তে, উঠ্তে না উঠ্তেই যে রকম ভোঁ করে দৌড় দেয় তাতে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করা দায়। এর চেয়ে লোহার চাকাওয়ালা যে কোনও গাড়ী ভালো।

তখনও অনেক সময় বাকী। তিনখানা টিকিট কেটে, রাস্থু আর বংশী সাম্নের খোলা জায়গায় বিজ্ঞাপন পড়ে আর সিনেমা-ষ্টারদের ছবি দেখ্তে লাগ্ল। হঠাৎ বংশী রাসবিহারীর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে উঠ্ল—"হোই রাস্থুদা—উটা কি বটে?"

পাশেই সোডা ফাউন্টেন। হু'জনেই কাছে এগিয়ে এল। কল টিপ্লেই

মুখ থেকে চোঁ করে জল বেরিয়ে আসছে, আর নীচের গ্লাশে পড়ছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখে রাস্থু একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌লে—"হোঃ—এ আর বুঝিস্‌ না। বিজ্ঞাপন, সব বিজ্ঞাপন! উই হল ভোগবতীর জল। 'পাতাল-প্রবেশ' পালা হবে না আজ! তাই পাতাল থেকে কল টিপে জল তুল্‌ছে, টিউব্‌ওয়েল দেখিস্‌ নাই? সেই রকমটি। মা ভোগবতীর জল, কম তেজ বটে! উপরে ফেনা উঠ্‌ছে, হোই ছাখ্‌।"

বংশী শুনে তো অবাক্‌! ইচ্ছা হ'ল যে সে জল একটু খেয়ে দেখে। রাস্থুরও ততক্ষণে বেশ চন্‌চনে ক্ষিদে পেয়েছে। তু'জনে গিয়ে কাউন্‌টারে দাঁড়ালো।

রাস্থু তু'টো চেয়ার টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে বল্‌লে—"তু গ্লাশ্‌ ওই জল দাও। আর তু'খানা চপ্‌।"

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল। একজন বল্লে—"এখানে চপ্‌ পাওয়া যায় না। শুধু ঐ রকম সরবং।"

রাস্থু বংশীকে নিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে এল, বল্‌লে "ব্যাটারা ঠগ্‌ জোচ্চোর। একটি গ্লাশ করে জল দিবেক্‌ আর পয়সাগুলো গালে চড়টি মেরে নিবেক্‌। সঙ্গে চপ্‌ নাই, খাওয়া নাই, ছোঃ! আয়রে বংশী—সরবং না জল! আমাকে পাড়াগাঁয়ের ভূত ভাবে না কি বটে?"

* * *

সময় হয়ে গেছে। আর দশ পনর মিনিট বাকী। এখনও খগেন এসে হাজির হল না। রাস্থু ছট্‌ফট্‌ করে খুঁজ্‌ছে। বংশীকে বল্‌লে—"তুই একটু দাঁড়া এইখানে, যেন নড়িস্‌ না, আমি খগেনকে খুঁজ্‌তে লাগি।" পাঁচ মিনিট্‌ পরে রাস্থু খগেনকে না পেয়ে ফিরে এসে দেখে—বংশী উধাও। তখন রাস্থু মহা ভাবনায় পড়ে গেল। এদিক্‌ ওদিক্‌ খুঁজে বংশীকে না পেয়ে রাস্থু ভাবলে, সে হারিয়ে গেছে। আর উপায় নেই—সময় হয়ে এসেছে। তখন সে এক মত্‌লব ঠিক্‌ করলে। ভাবলে, সময় থাকতে টিকিটগুলো বেচে দিলে পয়সাগুলো আর নষ্ট হবে না। এই না ভেবে রাস্থু টিকিট-ঘরের জান্‌লার কাছে—যেখানে ভীষণ ভিড় আর মারামারি সুরু হয়ে গেছে, সেইখানে—গিয়ে বল্‌লে—"মশাইরা টিকিট্‌

কিন্‌বেন—আমার কিছু বেশী আছে।" কিন্তু দাম লাগবে বারো আনা করে—নেবেন?" অম্‌নি কাড়াকাড়ি ও কলরব সুরু হয়ে গেল—'এদিকে দিন মশাই, এদিকে'—'আরে মশাই, আমি কতক্ষণ থেকে বলছি, আমাকে দিন্‌'। তার পর কি হ'ল রাস্থু আর কিছু জানে না—কেবল খানিক পরে দেখ্‌লে যে হাতে তার একখানিও টিকিট্‌ নেই, পয়সাও পৌঁছয় নি। তখন রাস্থু রীতিমত ক্ষেপে গিয়ে এক চোট্‌ গাল্লাগালি দিয়ে মাথায় হাত চাপ্‌ড়াতে লাগল, আর লোক ধরে ধরে ডেকে এই জোচ্চুরির কথা শোনাতে লাগ্‌ল।

পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। ভিতরে হল্‌-এর আলো নিভানো হবে, এমন সময়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্থু দেখতে পেলে—একটা সীট্‌-এর ওপর তু'পা গুটিয়ে বসে আছে বংশীধর। তখন কি ক'রে বিনা টিকিটে বংশী ভেতরে ঢুকল তাই ভাবতে ভাবতে সে ছুটে চল্‌ল। ধাক্কা মেরে গেটের লোককে ঠেলে দিয়ে একেবারে ভেতরে চলে এল। ওই যে কম্‌ফার্টার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হায়, আলো নিবে গেল, চারদিক্‌ অন্ধকার!

রাস্থু ঠক্‌বার পাত্র নয়। ধাঁ করে ষ্টেজের ওপর উঠে পড়ে মুখে তু' হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"হোই বংশী! তুই কোথায় রে? কি করে ঢুক্‌লি বটে?"

"হুঁ, ঢুক্‌ছি তো, এই যে এখানে।" বংশী সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল।

* * *

হুলস্থুল পড়ে গেল। কেউ বলে—'মার মার, জংলী এসেছে তুটো কোত্থেকে!' কেউ বলে—'গলা ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দাও'। খানিক পরে অনেক হুটোপুটির পর তু'জনে কাপড়-চোপড় সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে বাইরে পৌঁছে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল। বংশীর মুখে তৃপ্তির হাসি—তাকে আর পাড়াগেঁয়ে ভূত বল্‌তে পারবে না রাস্থুদা'। বিনা টিকিটেই ভিড়ের মধ্যে কেমন সে গুটিগুটি ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, আর রাস্থুদা' পারে নি। তবে পালাটা দেখতে পেল না, এই যা তুঃখ। কিন্তু রাস্থুর মুখ ভার। একে অর্থ নষ্ট, তায় লাঞ্ছনা আর মনঃকষ্ট। পকেটে একটিও পয়সা নেই—এখন বাড়ী ফেরে কি করে?

বংশী খুব সহানুভূতি করে রাস্থুদা'র হাতটা হাতে নিয়ে বল্‌লে—"চল না

হেঁটেই যাওয়া যাক্ দেখতে দেখতে। আর গাড়ীতে উঠ্‌লেই তো আবার সেই গা ঘুরতে লাগ্‌বেক্। যাই বল রাসুদা', রাস্তাগুলি খুব ভালো আর আলো। ভিতরে কী আঁধার বটে! বাপ্, নিঃশ্বাস ফেলতে লারি—"

ফুলের মূল্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মারাত্মক প্রতিবেশী

কর্ণেলিয়াস্ ভ্যান্ বার্লের ঠিক পাশের বাড়ীতেই আইজাক্ বক্সটেল নামে একটি লোক বাস করিত। ভ্যান্ বার্ল্ টিউলিপের চর্চ্চা সুরু করিবার অনেক আগে হইতেই এই লোকটি টিউলিপের নেশায় একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ভ্যান বার্লের মত সচ্ছল অবস্থা তার ছিল না—কিন্তু সে বাধা সে কাটাইয়া উঠিয়াছিল তার পরিশ্রম দিয়া। সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া সে এই টিউলিপের তদারক করিত। তার বাগানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়েও তার জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এক ডিগ্রীর ২০ ভাগের এক ভাগ তাপ এদিক্-ওদিক্ হইলে সে তা ধরিয়া দিতে পারিত, বাতাসের গতি সেকেণ্ডে ১ গজ এদিক্-ওদিক্ হইলেও তার নজর এড়াইত না—টিউলিপের খাতিরে সে না করিতে পারিত এমন কাজ নাই। টিউলিপের বাজারে তার একটু নামও হইয়াছিল—তার তৈরী ফুল দেখিতেও নানা জায়গা হইতে লোকের আমদানী হইত।

ভ্যান্ বার্ল্ টিউলিপের নেশায় মাতিয়া উঠিয়া প্রথমেই তার বাগানে একটা 'ল্যাবরেটরী' তৈরী করিল সে খবর আমরা আগেই পাইয়াছি। ল্যাবরেটরীটি দোতলা; বক্সটেলের বাগান ঠিক তার আড়ালে পড়ায় বেচারার বাগানে প্রায় আধ ডিগ্রী খানেক তাপ গেল কমিয়া। কথাটা শুনিতে একটু কেমন শোনাইলেও

বক্সটেলের দিক্ দিয়া একেবারে তাচ্ছীল্য করিবার মতও নয়—অনেক সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া সে তার ফুলের চারার জন্য এই নির্দ্দিষ্ট তাপের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তা, নিজের বাড়ীতে ঘর তুলিলে তো তার আর কোন চারা নাই—কাজেই মনে মনে বিরক্ত হইলেও বক্সটেলের কিছু করিবার ছিল না। তা ছাড়া ভ্যান বার্লের উদ্দেশ্যটা কি—কিসের জন্য এ ল্যাবরেটরী প্রথমটা সে খবরও সে পায় নাই। বড়লোক প্রতিবেশীর নিত্য নূতন খেয়ালের মধ্যে এও একটা অঙ্গ বলিয়া সে ধরিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু আসল রহস্য বাহির হইতেও দেরী হইল না। কয়েক দিনের মধ্যেই বক্সটেল জানিতে পারিল, ভ্যান্ বার্ল্ তারই বড় সাধের টিউলিপ্ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে—এবং তারই জন্য তার বাগানের অনেক হিসাব-করা তাপের খানিকটা কাড়িয়া লইয়াছে। খুব উঁচু হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য বক্সটেলের হয় নাই, ভ্যান্ বার্লের টাকার বহর এবং অসাধারণ প্রতিভার কথাও তার অজানা ছিল না। সে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল—ভ্যান্ বার্লের বাগানে প্রত্যহ নতুন নতুন টিউলিপ্ জন্মাইতেছে—কী সুন্দর সেগুলির আকার, আর কত রকমই না তাদের রং! দেশ-বিদেশ হইতে কত লোক টিউলিপ্ দেখিতে ডর্ট্ সহরে ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু তারা কেউ বক্সটেলের বাগানের ধার দিয়াও যাইতেছে না, সকলেই ছুটিয়াছে ভ্যান্ বার্লের বাগানে। টিউলিপ্-জগতে ডর্ট্ সহরের নাম হইয়াছে কিন্তু সে বক্সটেলের জন্য নয়, ভ্যান্ বার্লের জন্য। বক্সটেলের মনে হইল তার হৃদ্‌পিণ্ডের ঠিক মাঝখানটায় যেন ভ্যান্ বার্ল্ একরাশ সূচ ফুটাইয়া দিয়াছে। সেই হইতে ভ্যান্ বার্লের উপর দারুণ বিদ্বেষে তার সমস্ত চিত্ত বিষাইয়া উঠিল; অবশ্য ভ্যান্ বার্ল্, ঘুণাক্ষরেও তার আভাস পাইল না।

সেই হইতে টিউলিপ্-চর্চ্চা—যা নাকি এত দিন বক্সটেলের জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল তা গিয়া দাঁড়াইল প্রবল দুশ্চিন্তায়। অল্প দিনেই টিউলিপ্-জগতে ভ্যান্ বার্লের অদ্ভুত খাতিরের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। বক্সটেলের বুঝিতে দেরী হইল না যে যত দিন ধরিয়াই চর্চ্চা করুক না কেন, ভ্যান্ বার্লের সঙ্গে টক্কর দেওয়া

তার কর্ম্ম নয়। ভ্যান্ বার্লের অদ্ভুত প্রতিভা, অদ্ভুত একাগ্রতা এবং তার উপর অফুরন্ত ধনসম্পদ্ কোনটার সঙ্গেই আঁটিয়া উঠা তার পক্ষে অসম্ভব। বুঝিল বটে কিন্তু মন তা'তে সায় দিল না, শুধু আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। দুই বাড়ীর মাঝখানে একটা দেয়াল ছিল, বক্সটেল রাত্রির অন্ধকারে মই বাহিয়া তার উপর উঠিয়া ভ্যান্ বার্লের বাগানের দিকে তাকাইয়া থাকিত। কিন্তু তা'তে সুবিধা হইত না; অনেক ভাবিয়া সে দেয়ালের উপর একটা বড় কাঠের যন্ত্র বসাইল—ভাবটা তার বাগানে বাতাস চালাইবার জন্যই ওটা বসান হইয়াছে। আসলে কিন্তু ওই যন্ত্রের মধ্যে ছিল দু'টি ছিদ্র; মই বাহিয়া দেয়ালে উঠিয়া যন্ত্রটির আড়ালে বসিয়া সে ঐ ছিদ্রপথে ভ্যান্ বার্লের বাগানের দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাঁকে কেউ দেখিতে পাইত না। এভাবে দিনের বেলাও দেখা চলিত। এতেও তার মন প্রবোধ মানিল না, আরও ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে বেশ কিছু খরচ করিয়া একটা ভাল দূরবীণ কিনিয়া লইল—যাতে ভ্যান্ বার্লের বাগানের খুঁটিনাটি ব্যাপারও তার চোখে ধরা পড়ে। দূরবীণ কিনিবার পর বক্সটেল বুঝিতে পারিল ভ্যান্ বার্লের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়। পক্ষী-মাতার মত কী অসীম স্নেহের সহিত ভ্যান্ বার্ল্ তার গাছগুলিকে "মানুষ" করে—প্রত্যেকটি গাছের, প্রত্যেকটি ফুলের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরার সঙ্গেও তার কী নিগূঢ় পরিচয়! তাদের নাড়া-চাড়া করিবার সময় তার মুখে সে কী অদ্ভুত ভাব দেখা যায়! শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে ভ্যান্ বার্লের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরও তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। বক্সটেল নিজে কত-না খুঁটিনাটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিয়াছে কিন্তু ভ্যান্ বার্লের সূক্ষ্ম দৃষ্টির তুলনায় তাও যেন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। অন্য লোক হইলে হয়তো এই প্রতিভার কাছে মাথা নত করিত কিন্তু বক্সটেলের শুধু বাড়িত হিংসা। তার ইচ্ছা হইত উপর হইতে ঢিল মারিয়া প্রত্যেকটি গাছ সে মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দেয়, কিংবা, একদিন অন্ধকার রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে বাগানে নামিয়া গাছগুলিকে উপড়াইয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া আসে। কিন্তু পাছে ধরা পড়িয়া যায়, লোকের চোখে হেয় হইয়া পড়ে—সেই ভয়ে সে সব 'সদিচ্ছা' তার মনেই থাকিয়া যাইত, কাজে করা সম্ভব হইত না।

অবশেষে বক্সটেলের মাথায় এক কুবুদ্ধি জাগিল। সে দু'টি বিড়াল যোগাড় করিয়া একটা লম্বা দড়ি দিয়া তাদের একটার পিছনের পায়ের সঙ্গে আর একটার পিছনের পা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল, তার পর রাত্রের অন্ধকারে দেয়ালে উঠিয়া সকলের অলক্ষিতে বিড়াল দু'টিকে ভ্যান্ বার্লের বাগানে ফেলিয়া দিল।

ফলে যা হইবার হইল। বিড়াল দু'টি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি পালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আর ঠিক দু'টা দু'দিকে ছুট দিল। মাঝখানে দড়ি বাঁধা থাকায় পালান সম্ভব হইল না—শুধু দড়িটা টান টান হইয়া বাগানের চারা গাছগুলির গায়ে আসিয়া পড়িল। বিড়ালগুলি তখন আরও বিব্রত হইয়া একদিক্ ছাড়িয়া নানাদিকে ঘুরিতে লাগিল, ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভ্যান্ বার্লের সাধের বাগান একেবারে লাঙ্গল-চষা হইয়া গেল। মিনিট পনের টানাটানির পর যখন দড়ি ছিঁড়িল তখন বক্সটেলের উদ্দেশ্য ভালমতই সিদ্ধ হইয়াছে।

সে রাত্রে বক্সটেল শুইতে পারিল না—সকালে উঠিয়া বাগানের অবস্থা দেখিয়া ভ্যান্ বার্লের মুখের অবস্থা কেমন হইবে তাহারই হিংস্র কল্পনা তাকে পাগল করিয়া তুলিল। শেষে শেষরাত্রের ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস তুচ্ছ করিয়া সে দেয়ালের উপর তার যন্ত্রটির আড়ালে গিয়া বসিয়া রহিল—কতক্ষণে ভোর হইবে এই আশায়।

অতি প্রত্যূষে ভ্যান্ বার্লের ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম হইতে উঠিয়াই একবার বাগানে যাওয়া তার বরাবরকার অভ্যাস—সেদিনও নিত্যকার মত প্রশান্ত মুখেই সে বাগানের দিকে রওনা হইল, কিন্তু কয়েক পা যাইতেই তার মুখের সে ভাব কোথায় মিলাইয়া গেল, তার জায়গায় দেখা দিল এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। এক রাত্রের মধ্যে তার বড় সাধের বাগানে এ কি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে! এধারে সবগুলি সার একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, ওদিকেও তাই; একটার ভাঙ্গা ডাঁটা হইতে তখনও রস গড়াইয়া পড়িতেছে। ভ্যান্ বার্লের মনে হইল ও রসের বদলে যদি তার বুকের রক্ত ভরিয়া দিলে কাজ হইত তবে সে তখনই তা দিতে পারিত। কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু না না, তার আসল চারটি গাছ—যার

পিছনে সে দিনের পর দিন পরিশ্রম করিতেছে—সে কয়টির কিছু হয় নাই, আশ্চর্য্যভাবে সেগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে। ভ্যান্ বার্ল্ কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাইল।

ভ্যান্ বার্লের মুখে স্বস্তির চিহ্ন বক্সটেলের দৃষ্টি এড়াইল না—উহার কারণ জানিতেও তার দেরী হইল না। সত্যিই তার সমস্ত কাজটা শেষ পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়াছে, বরাত আর কাহাকে বলে! যাই হোক্, ধরা পড়ে নাই তার পক্ষে এটাই ভাগ্য।

বাগান যুড়িয়া বিড়ালের পায়ের চিহ্ন, কাজেই কাজটি যে বিড়ালের সে বিষয়ে ভ্যান্ বার্লের সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। তা ছাড়া রাত্রে বিড়ালের মিউ মিউ শব্দও তার কানে গিয়াছিল। ব্যাপারটা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে সেজন্য সে তখনই একজন মালীকে ডাকিয়া হুকুম দিল—বাগানের মধ্যে একটা ছোট্ট কাঠের ঘর করিয়া তাকে রাত্রে সেখানেই শুইতে হইবে। বক্সটেলও দেয়ালের উপর বসিয়া সে হুকুম শুনিল, এবং ইহাও বুঝিল যে তার দুষ্কার্য্য আর ভবিষ্যতে চলিবে না।

ঠিক এই সময় টিউলিপ্-জগতে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। হারলেম সহরে একটা টিউলিপ্-সমিতি ছিল, এই সমিতি হইতে হঠাৎ ঘোষণা করা হইল যে একটি নিখুঁত কালো রংএর টিউলিপ্ জন্মাইতে পারিবে, তাকে এক লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার দেওয়া হইবে। কালো রং-এর টিউলিপের কথা তখন কেউ ধারণা করিতে পারিত না। খবরটা রাষ্ট্র হইতেই সকলে বলাবলি সুরু করিল, তার চেয়ে ২০ লক্ষ গিল্ডার ঘোষণা করিলেই তো চলিত, অসম্ভব ব্যাপার কখনও সম্ভব হয়? কালো তো দূরের কথা, গাঢ় বাদামী রং-এর টিউলিপ্ও তো কেউ কখনও চোখে দেখে নাই! সমিতি চালটা চালিয়াছেন ভাল।

কিন্তু মুখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলেও এবং মনে মনে অসম্ভব বুঝিলেও লোভ বড় ভয়ানক জিনিষ। যাঁরা টিউলিপের চর্চ্চা করিতেন খবরটায় তাঁরা সকলেই একটু বিচলিত হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অনেকেই কপাল ঠুকিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন—অসম্ভব বুঝিয়াও।

বলা বাহুল্য এমন একটা ব্যাপারে ভ্যান্ বার্লের মত লোকের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব নয়। টাকার জন্য যতটা না হউক্ কালো রং-এর টিউলিপ্ তৈরী করিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোককে অবাক্ করিয়া দিবার দুঃসাধ্য বাসনা তাকে পাইয়া বসিল। আর বাদামী রং-এর টিউলিপ্ তো সে ইতিমধ্যেই করিয়া ফেলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে এক বছরের মধ্যে ভ্যান্ বার্লের বাগানে ঘোর বাদামী রং-এর টিউলিপ্ ফুটিতে দেখা গেল। বক্সটেলও এই দুঃসাধ্য কাজে নামিতে কসুর করে নাই, কিন্তু এক বছরের চেষ্টায় তার যে ফুল দেখা দিল তার রং ফিকা বাদামী—ভ্যান্ বার্লের ফুলের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

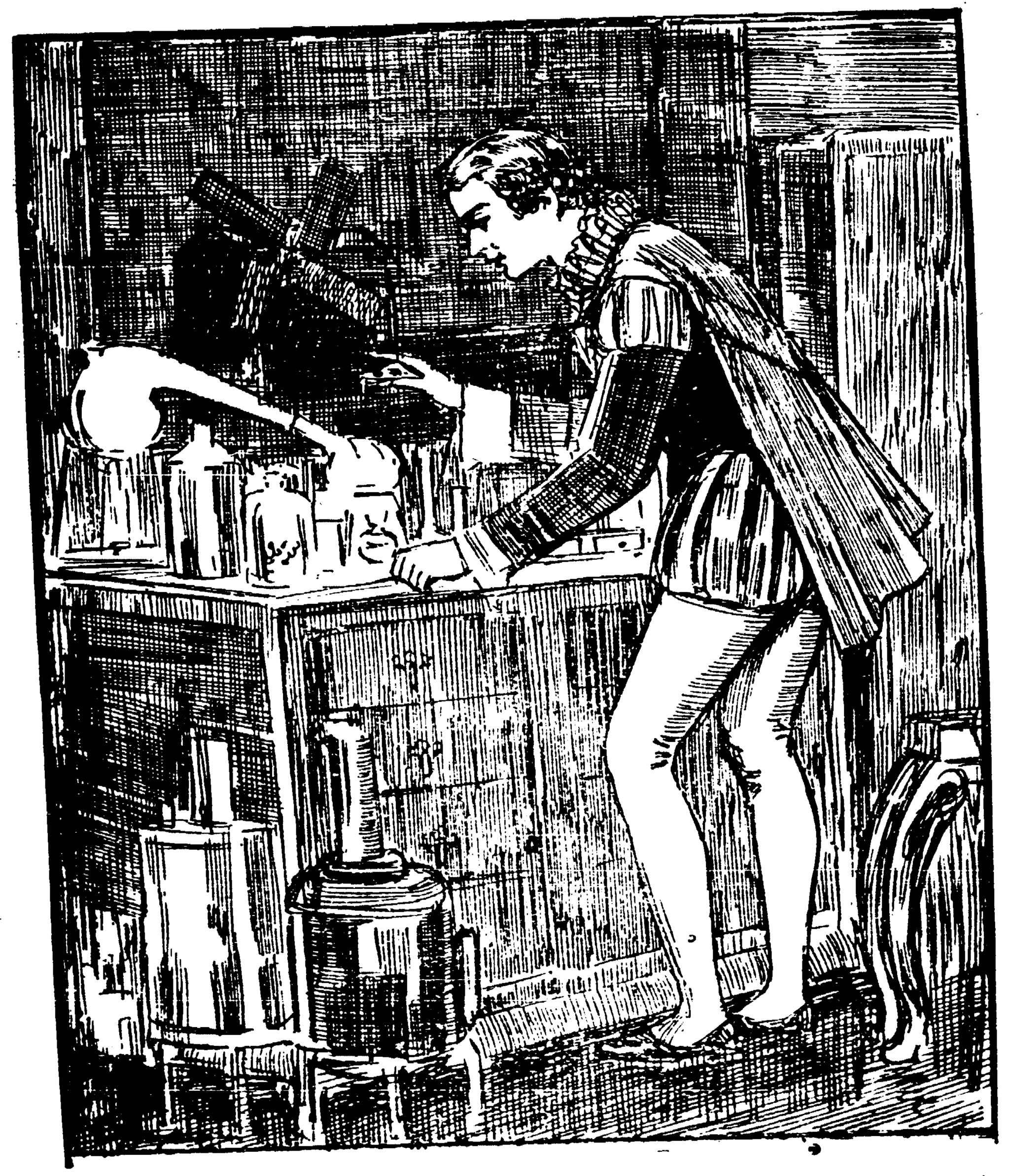
দুপুর রাত্রে ভ্যান্ বার্ল্ উঠিয়া তার ল্যাবরেটরীতে ঢোকে

বার বার পরাজিত হইয়া বক্সটেলের মাথার খুন চাপিয়া গেল। সে ফুলের বাগান ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণই ভ্যান্ বার্লের বাড়ীর দিকে দূরবীণ ধরিয়া বসিয়া থাকিতে সুরু করিল। তার অত সাধের টিউলিপের বাগান শুকাইয়া, ঝরিয়া, পচিয়া, মরিয়া গেল, তার আর তখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

দুপুর রাত্রে ভ্যান্ বার্ল্ উঠিয়া তার ল্যাবরেটরীতে ঢোকে, বক্সটেল তখনও দূরবীণ লইয়া তার দিকে চাহিয়া আছে। ঘরে আলো জ্বলিতেই সে আরও সোজা হইয়া বসে। ভ্যান্ বার্ল্ তার ফুলের বীচি লইয়া বাছে, কত ওষুধ-বিষুধ আর

রাসায়নিক আরকে সেগুলি ভিজায়, আগুনে সেঁকে, কত সূক্ষ্মভাবে সেগুলি ভাগ করে, আরও কত কী না করে, বক্সটেল অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে; পরমুহূর্ত্তেই তার মন হিংসায় জ্বলিয়া উঠে, তার মনে হয় সামনের যন্ত্রটি যেন তার দূরবীণ নয়, বন্দুক—নিজের অজ্ঞাতেই তার আঙ্গুলগুলি সেই কাল্পনিক বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার জন্য আগাইয়া যায়। কিন্তু যাক্ সে কথা, এখন আবার আমরা সেই পুরানো কথায়, কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ কেন ভ্যান্ বার্লের কাছে আসিলেন তাহারই বিষয়ে, খোঁজ লইব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘটনাচক্র

সেদিন খাইতে বসিয়া বক্সটেলের নজরে পড়িল ভ্যান্ বার্লের বাড়ীর সামনে কয়েক জন লোক জমায়েৎ হইয়াছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বেচারা কোন রকমে নাকে-মুখে কিছু গুঁজিয়া তখনই দূরবীণ লইয়া তার জায়গায় আসিয়া বসিল। কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ ভ্যান্ বার্লের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, ভ্যান্ বার্ল্ তাঁকে সঙ্গে করিয়া সমস্ত দেখাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করিবার জন্য চাকরেরাও ঘুরিতেছিল। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ ভ্যান্ বার্লকে চুপি চুপি বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলিতে কথা ছিল।" ভ্যান্ বার্ল্ তখন তাঁকে লইয়া তার ল্যাবরেটরীর 'ড্রাই-রুমে' ঢুকিল, এ ঘরে সে ছাড়া আর কারও ঢুকিবার হুকুম নাই। এখানে বসিয়াই সে তার টিউলিপ্ লইয়া নানা গবেষণা করে এবং বক্সটেলও দূরবীণ লইয়া এই ঘরটার উপরেই বেশী করিয়া নজর রাখে; সেদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নাই।

বক্সটেল দূরবীণ দিয়া দেখিল, হঠাৎ ড্রাই-রুমে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তার পরেই দু'টি ছায়া-মূর্ত্তি তার মধ্যে ঢুকিল। প্রথম ঘোরটা কাটিলে মূর্ত্তি দু'টিকে চিনিতে তার কষ্ট হইল না—একজন কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ ও অপর জন গৃহস্বামী ভ্যান্ বার্ল্। খানিকক্ষণ কি কথাবার্ত্তার পর কর্ণেলিয়াস্ এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া জামার ভিতর হইতে একটা সীলমোহর করা প্যাকেট বাহির করিয়া ভ্যান্ বার্লের

হাতে দিলেন। ভ্যান্ বার্ল্ সেটাকে লইয়া পরম যত্নের সহিত টিউলিপের বাল্ব্ রাখিবার যে সব ড্রয়ার আছে তারই একটার মধ্যে রাখিয়া দিল। তার পর ভ্যান্ বার্লের করমর্দ্দন করিয়া কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ বাহির হইয়া গেলেন।

বক্সটেল ভাবিতে লাগিল, প্যাকেট্টার মধ্যে কি থাকা সম্ভব। কোন নতুন ধরণের বাল্ব্ কি? এত গোপনে কর্ণেলিয়াস্ সেটি বাহির করিলেন কেন? তা ছাড়া কর্ণেলিয়াস্ রাজনীতির চর্চ্চাই করেন, টিউলিপের চর্চ্চা করিবার খেয়াল তাঁর কোন দিনই নাই, কাজেই প্যাকেট্টির মধ্যে নিশ্চয়ই বাল্ব্ নাই, আছে কোন গোপনীয় রাজনৈতিক কাগজ। কর্ণেলিয়াস্ তখন হইতেই ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাইতেছিলেন, নিশ্চয়ই এই কাগজগুলির মধ্যে এমন কিছু আছে যা ধরা পড়িলে তাঁর পক্ষে সমূহ বিপদ্। এগুলি কোন নিরাপদ্ জায়গায় গচ্ছিত রাখা দরকার

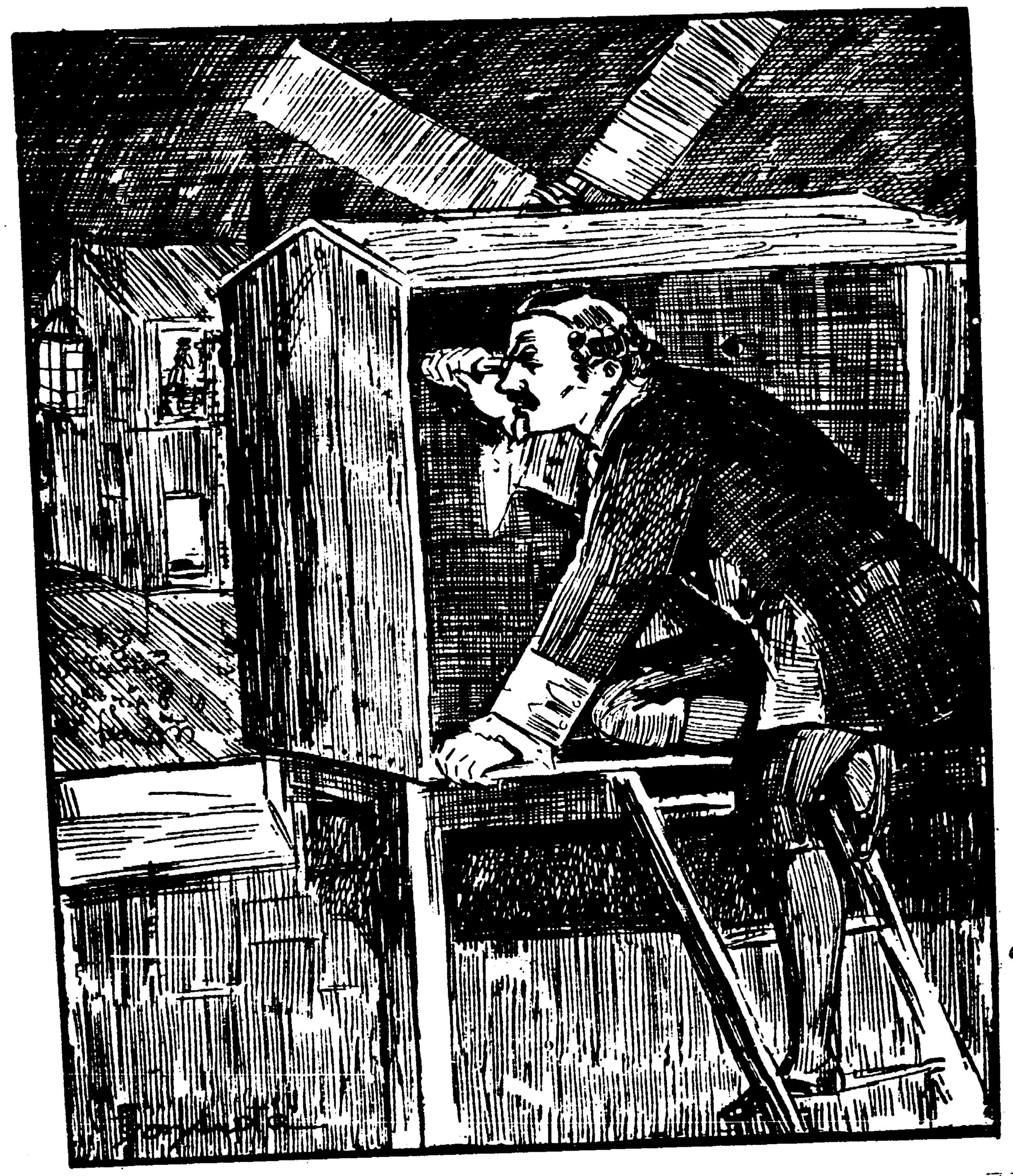

বক্সটেল দূরবীণ দিয়া দেখিল, হঠাৎ ড্রাই-রুমে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

আর ভ্যান্ বার্লের বাড়ীর মত নিরাপদ্ জায়গা আর কোথায় আছে? যে লোকটা জীবনে কোন দিন রাজনীতির ধার ধারে নাই—একমাত্র টিউলিপ্ই যার ধন-ধ্যান, তার কাছে নিশ্চয়ই কেউ কখনও এ জিনিষ খানাতাল্লাস করিতে আসিবে না! তা ছাড়া ভ্যান্ বার্ল্‌কে বক্সটেল ভাল করিয়াই চিনিত। কোন নতুন বাল্ব্

আসিলে তার মুখের অবস্থা কেমন হইত তাও তার অজানা নাই। কাজেই ওগুলি যে কোন গোপনীয় রাজনৈতিক কাগজ সে বিষয়ে বক্সটেলের সন্দেহ রহিল না। তার মাথায় এক নতুন বুদ্ধি আসিল।

বাস্তবিকই বক্সটেলের অনুমান ঠিক। জন্ ডি-উইট্ ও ফ্রান্সের যুদ্ধমন্ত্রী মার্কুইস্ ডি লুভয়ের মধ্যে যে সব চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল তাহাই ছিল প্যাকেট্টির মধ্যে। গুরুতর রকম গোপনীয় কাগজ সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কথা কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্ ভ্যান্ বার্ল্‌কে ঘুণাক্ষরেও জানান নাই, শুধু বলিয়াছিলেন প্যাকেট্টি যেন তাঁর নিজের হাতে কিংবা তাঁর চিঠি লইয়া কেউ আসিলে তার হাতে ছাড়া আর কাহাকেও না দেওয়া হয়।

১৬৭২ সালের ২০শে আগষ্ট্—যেদিন হেগ্ সহরে জন্ ও কর্ণেলিয়াস্ ডি উইট্‌কে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইতেছিল সেদিনটা কিন্তু ভ্যান্ বার্লের ছিল বড় আনন্দের দিন। হেগ্-এ কি ঘটিতেছে তার বিন্দুবিসর্গও সে জানিত না, সে শুধু জানিত তার ফুলের খবর। আজ সকালেই সে একটি বাল্‌ব্ হইতে তিনটি 'সাকার' (যা হইতে টিউলিপের চারা গজায়) বাহির করিয়াছে। এই সাকার হইতে তিন বছর পরে যে ফুলগুলি পাওয়া যাইবে তাহারই রং হইবে কুচকুচে কালো—হারলেমের টিউলিপ্-সমিতি যার জন্য এক লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভ্যান্ বার্লের এত দিনের পরিশ্রম আজ সফল হইতে চলিয়াছে।

ড্রাই-রুমে বসিয়া অভিনিবেশ সহকারে সাকার তিনটিকে দেখিতে দেখিতে ভ্যান্ বার্ল্ কত কি ভাবিতেছিল। পুরস্কার পাইলে সে কি করিবে? গরীব-দুঃখীকে বিলাইয়া দিবে। তাকে লোকে টিউলিপ্-বিলাসী বলে, সে দেখাইবে গরীবের জন্যই তার এ বিলাসিতা। অবশ্য কিছু টাকা সে রাখিয়া দিবে টিউলিপ্ লইয়া আরো গবেষণার জন্য। টিউলিপের সুন্দর চেহারায় সে যদি গোলাপের মত গন্ধ দিতে পারে তবে কেমন হয়! আচ্ছা, তার এই কালো টিউলিপের নাম কি দিবে? ল্যাটিন নামই দিতে হইবে—'টিউলিপা নিগ্রা বার্লেন্‌সিস্'। "কেন বার্লেন্‌সিস্"—লোকে হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে। উত্তর হইবে, "এর আবিষ্কারক ভ্যান্ বার্লের নাম

হইতে।" আর একজন হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে, "কে এই ভ্যান্ বার্ল্?" সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসিবে, "সেই অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক, পাঁচটি নতুন টিউলিপ্ তৈরী করিয়াও যার মন উঠে নাই—অবশেষে, এত দিন লোকে যাকে অসম্ভব বলিয়া জানিত, সেই কালো টিউলিপ্ তৈরী করিয়া যে পৃথিবীকে চমক লাগাইয়া দিয়াছে। ধন্য যাদুকর! আর রাজনীতিক কর্ণেলিয়াসের পরিচয় হয়তো তখন তাঁর নামানুযায়ী টিউলিপ্ দিয়াই দিতে হইবে।

ভ্যান্ বার্লের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া হঠাৎ সদর দরজায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন চাকর আসিয়া জানাইল, "হুজুর, হেগ্ থেকে গ্র্যাণ্ড্ পেন্‌সনারির চাকর ক্রেক্ এসেছে, এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

একটু বিরক্ত হইয়াই ভ্যান্ বার্ল্ বলিল, "আচ্ছা, তাকে একটু দাঁড়াতে বল।"

"আর দাঁড়াবার সময় নেই" বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে ক্রেক্ ড্রাই-রুমের ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। ড্রাই-রুমের ভিতরে কারও আসা—বিশেষতঃ এ ভাবে, একেবারেই নিষেধ; ভ্যান্ বার্ল্ একেবারে চম্‌কাইয়া উঠিল, আর তার হাত হইতে 'সাকার' কয়টি ছিট্‌কাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া সেগুলি তুলিয়া যত্নের সঙ্গে দেখিতে দেখিতে সে বলিল, "এ কি কাণ্ড ক্রেক্!"

ক্রেক্ তাড়াতাড়ি কর্ণেলিয়াসের চিঠিখানা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "কাণ্ড গুরুতর। এটা পাওয়া মাত্র আপনাকে পড়ে দেখতে বলেছেন।"

"আচ্ছা আচ্ছা, পড়ব বই কি, কিন্তু তুমি আমার 'সাকার'গুলির দফা সেরেছিলে আর কি!" বলিয়া ভ্যান্ বার্ল্ আবার নিবিষ্টচিত্তে সেগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ আবার বাধা পড়িল, আর একজন চাকর ছুটিতে ছুটিতে ড্রাই-রুমে আসিয়া ঢুকিল, "হুজুর, এক্ষুণি পালান, আপনাকে ধরতে এসেছে।"

ভ্যান্ বার্ল্ একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল, "একি অদ্ভুত সব ব্যাপার! তোমরা কি এক জোটে পাগল হ'য়ে গেলে? আমাকে আবার কে ধরতে আসবে?"

"ধরতে এসেছে রাজার সৈন্যেরা, সমস্ত বাড়ী তারা ঘেরাও করে ফেল্‌ল ব'লে! শীগ্‌গির পালান।"

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ

গত ৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলময় জগদীশ্বর তাঁর জগদীশচন্দ্রকে নিজের স্নেহময় কোলে তুলিয়া নিয়াছেন।

"ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি,
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ ?
....
মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতি-দূর নিষ্ফল গৌরবে
পর-বস্ত্রে, পর-বাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে ? .... "

রবীন্দ্রনাথ

"সত্যরত্ন তুমি দিলে, পরিবর্ত্তে তার
কথা ও কল্পনা মাত্র দিনু উপহার"

রবীন্দ্রনাথ
(কথা ও কাহিনীর-উৎসর্গপত্র)

*   *   *

"দরদী তুমি, দরদ্ দিয়ে দেখেছ তৃণ-লতার প্রাণ,
খনির লোহা, প্রাণীর লোহ, পরশে তর স্পন্দমান !
....
বনের পরী তুলিল হাই, জাগিল হাওয়া নিঃশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে।"

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

*   *   *

"এ বৎসর প্যারিস্ সভ্য-জগতের এক কেন্দ্র—এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী...... এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে।......এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতির বুধ-মণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি ? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে ? সে বহু-গৌরবর্ণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন ; সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস।"

স্বামী বিবেকানন্দ

*   *   *

"জগদীশচন্দ্র যে সমস্ত অমূল্য তথ্য জগৎকে দান করেছেন তার প্রত্যেকটির জন্য এক একটি জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।"

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইন্‌ষ্টাইন্

"...ভবিষ্যতে এমন কোন সময়ের কথাই আমি চিন্তা করিতে পারি না যখন তাঁর প্রতি আমার অন্তরাত্মা শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া না পড়িবে।"

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

"ভাস্করাচার্য্যের পর সকল রকম বিজ্ঞান-চর্চ্চা এ দেশে লোপ পাইয়াছিল। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া যে জ্যোতিষ্ক ভারত-গগনে উদিত হন তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি শুধু পথ-প্রদর্শক ছিলেন না, তাঁহার আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতে ভারত প্রথম আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করে।..."

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"জগদীশচন্দ্রের মত ক্ষণজন্মা পুরুষ হাজার বৎসরে একটি জন্মায়।... অণু-পরমাণুতে মহাপ্রাণের অনুভূতি তিনি ঋষির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

"নিউটন, ডারউইন্, আইনষ্টাইন প্রভৃতির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের স্থান সমপর্য্যায়ভুক্ত।"

ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী

"গত পঁচিশ বৎসর কাল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় স্যর জগদীশ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন। জগতের এই সুসন্তানের মৃত্যুতে সমগ্র জগৎ শোকে বিহ্বল হইবে।"

ডক্টর নীলরতন ধর

(আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতি)

* * *

"অন্ধকার নভোমণ্ডলে তিনি একটি জ্যোতিষ্করূপে দেখা দিলেন...তখন লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করিত যে বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করিবার মত মস্তিষ্কের জোর ভারতবাসীর নাই।...বৈজ্ঞানিক জগতে একটা বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। যে বাঙ্গালা শিক্ষায়-দীক্ষায় উত্তর-ভারতকে পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই বাঙ্গালা দেশ হইতেই যে এমন একজন বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হইবে তাহা অতি

স্বাভাবিক।...পৃথিবীর বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান যাঁহারা করিয়া দিয়াছেন—তিনি তাঁহাদের নেতা হিসাবে অমর হইয়া থাকিবেন।"

—সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ ডাঃ বীরবল সাহানী, এফ-আর-এস্

(আনন্দবাজার পত্রিকার অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

আচার্য্য জগদীশ

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি)

প্রায় বছর চল্লিশেক আগেকার কথা। কলিকাতার টাউন্ হলে এক বিরাট্ জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিতেছিলেন, হাতে তাঁর এক অদ্ভুত যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকটি তাঁর বক্তব্য পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন। আমাদের আশ-পাশে যে ফাঁকা জায়গা আছে—যাকে আমরা শূন্য বলি, বৈজ্ঞানিকেরা যাকে বলেন ঈথর, তারই মধ্যে এই যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুতের ঢেউ উঠিল আর সেই বিদ্যুৎ গিয়া অপর ঘরে একটা পিস্তল আওয়াজ করিল। সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল; এত বড় আশ্চর্য্য ঘটনা তারা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

ঘটনাটিতে অবাক্ হইবার কথাই বটে। যে বেতার বা রেডিও আজ পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে অথচ বছর পঞ্চাশেক আগে যার কথা লোকে ভাবিতেও পারিত না, এই পরীক্ষায় তারই সূচনা হইল এবং যে তরুণ বৈজ্ঞানিকটি এই সূচনা করিলেন তিনি একজন বাঙ্গালী, তাঁর নাম তোমরা সবাই জান—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

বেতার বা তারহীন টেলিগ্রাফের সম্ভাবনা লইয়া তখন বিজ্ঞান-জগতে নানা আলোচনা হইতেছিল, ইতিপূর্ব্বে হার্ট্জ্ নামে একজন জার্ম্মান্ পণ্ডিত এদিকে অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছিলেন, কিন্তু তা শেষ করিবার আগেই তাঁর পরলোকের ডাক পড়ে। তার পর আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক্ এই ব্যাপার লইয়া মাথা

ঘামাইতেছিলেন—আমাদের জগদীশও তাঁদের একজন, এবং ধরিতে গেলে ইঁহার হাতেই বেতারের প্রথম সূচনা হইল।

কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, এত বড় আবিষ্কারের সম্মান জগদীশের ভাগ্যে জুটিল না। ব্যাপারটি নিখুঁত করিয়া বাহির করিতে—ভাল করিয়া প্রচার করিতে যে অর্থ, যে সহানুভূতির দরকার তা তাঁকে দিবার কেউ ছিল না। ওদিকে মার্কনি নামে ইটালীর এক বৈজ্ঞানিকও বিলাতে ঐ বিষয় লইয়াই গবেষণা করিতেছিলেন। জগদীশের আবিষ্কার ভাল করিয়া রাষ্ট্র হইবার আগেই তিনি একদিন বেতারে দু' মাইল দূরে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। বেতারের আবিষ্কারক বলিয়া তাঁরই নাম পৃথিবীতে প্রচারিত হইল। মার্কনির প্রতিভার নিকট আমাদের মাথা না নোয়াইয়া উপায় নাই, কিন্তু বাংলার কি দুর্ভাগ্য বল দেখি!

আজ তোমাদের সেই জগদীশচন্দ্রের জীবন-কথা শুনাইতে বসিয়াছি। জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৫৮ সালে। তাঁর বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায়—রাঢ়ীখাল গ্রামে। জগদীশের বাবা ভগবান্ বাবু ছিলেন ফরিদপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—কাজেই জগদীশের ছেলেবেলা কাটিয়াছিল ফরিদপুরে। ছেলেবেলায় জগদীশের একজন অদ্ভুত সাথী জুটিয়াছিল, এ লোকটি ছিল ডাকাত। একবার ধরা পড়ায় ভগবান্ বাবুর কাছে তার বিচার হয়। জেল হইতে বাহির হইয়া লোকটি ভগবান্ বাবুর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল, এখন তার উপায় হইবে কি! ভগবান্ বাবু একটু ভাবিয়া শেষে তাকে তাঁর দ্বারোয়ানের কাজে ভর্ত্তি করিয়া নিলেন আর তার হাতে দিলেন ছেলের ভার। জগদীশচন্দ্র সেই ডাকাতের সঙ্গে প্রত্যহ স্কুলে যাওয়া-আসা করিতেন, তার মুখে ডাকাতির সব অদ্ভূত অদ্ভুত গল্প শুনিতেন। অবশ্য, লোকটির তখন একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল, এমন কি একবার ভগবান্ বাবুরা সপরিবারে ডাকাতের হাতে পড়িলে এই লোকটিই তাঁদের রক্ষা করে।

ভগবান্ বাবু ছিলেন খুব পণ্ডিত লোক—বিশেষতঃ শিল্প-বাণিজ্যের দিকে তাঁর ছিল ভয়ানক ঝোঁক। ছেলেবেলা হইতেই জগদীশ নানা রকম হাতের কাজ—কামারের কাজ, ছুতোরের কাজ প্রভৃতি করিতে পারিতেন। বড় হইয়া

তিনি যে সব অদ্ভুত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী করিয়াছিলেন তার অনেকখানিই বোধ হয় সম্ভব হইয়াছিল এই কারণে।

বাংলা স্কুলের পড়া শেষ করিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিলেন। প্রথমে হেয়ার স্কুলে কয়েক মাস পড়িবার পর তাঁকে সেণ্ট জেভিয়ার্স্ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। জগদীশের বয়স তখন নয় বছর। সেণ্ট্ জেভিয়ার্স্ স্কুলের ইংরাজ-নবীশ ছেলেরা এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটিকে যেন একটা মজার জিনিষ বলিয়া ধরিয়া লইল এবং সকলে মিলিয়া দারুণ ভাবে তাঁর পেছনে লাগিয়া গেল। কিন্তু সহুরে না হইলেও বালক জগদীশ নেহাৎ কাপুরুষ ছিলেন না, দরকার বোধ করিলে দুষ্টকে উচিত শিক্ষা দিতেও জানিতেন। একবার একটা ডেঁপো ছেলে তাঁর সঙ্গে

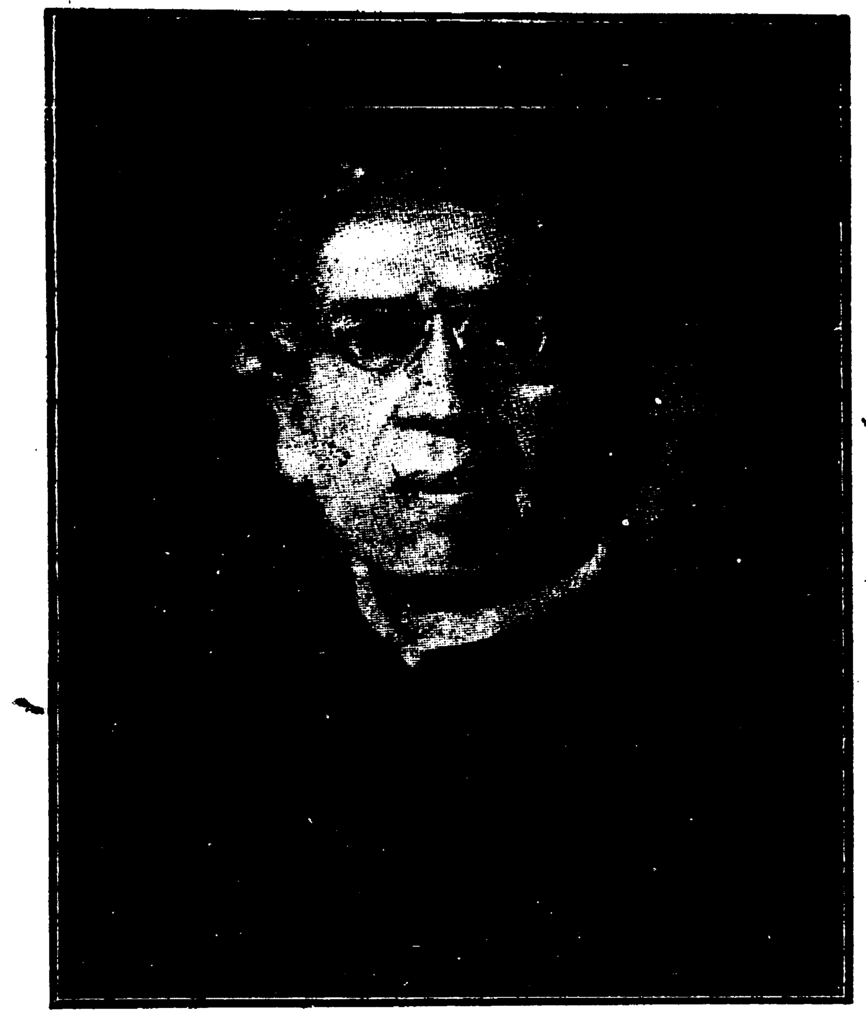

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

বদ্ রসিকতা করিতে আসিয়া তাঁর হাতে এমন এক ঘুঁষি খাইল যে সেই হইতে সে তো ঠাণ্ডা হইয়া গেলই, আর সকলেও সাবধান হইয়া গেল। অতটুকু ছেলে, কিন্তু তার তেজটা দেখিয়াছ! (হইবে না—একেবারে খোদ্ ডাকাতের হাতে মানুষ তো!)

এখানকার পড়া শেষ করিয়া জগদীশচন্দ্র গেলেন বিলাতে। জগদীশের বাবার ইচ্ছা ছিল না ছেলে তাঁর আই-সি-এস্ বা ঐ রকম কোন বড় চাকুরে হয়, তিনি তাকে বিজ্ঞান পড়িতে উপদেশ দিলেন। জগদীশের প্রথমে ইচ্ছা ছিল তিনি ডাক্তার হন, কিন্তু শরীর খারাপ হইয়া পড়ায় শেষে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এস্-সি উপাধি লইয়া তিনি দেশে ফিরিলেন।

দেশে ফিরিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসেডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইলেন। ঐ পদে এতদিন পর্য্যন্ত সাহেব প্রফেসারই ছিলেন, দেশী লোকদের মধ্যে জগদীশই প্রথম ঐ পদ পাইলেন। পাইলেন বটে কিন্তু দেশী লোক বলিয়া তাঁকে ঐ পদ দেওয়া সত্ত্বেও মাহিনা দেওয়া হইল অনেক কম। জগদীশ প্রতিবাদ স্বরূপ এক পয়সাও না নিয়া পড়াইতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া তাঁকে পুরা বেতন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

এইবার জগদীশচন্দ্র ঝোঁক দিলেন আবিষ্কারের দিকে। কি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে যে 'ল্যাবরেটরী' ছিল তা মোটেই উঁচুদরের নয়, যন্ত্রপাতির অভাবে জগদীশকে খুবই অসুবিধায় পড়িতে হইল। জগদীশ হটিবার পাত্র নন, অদ্ভুত বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বলে দেশী মিস্ত্রীদের সাহায্যে নিজেই তিনি কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র তৈরী করিয়া ফেলিলেন। তার পর আরম্ভ হইল তাঁর একের পর এক আবিষ্কার—যার আভাস তোমাদের প্রবন্ধের গোড়াতেই দিয়াছি।

১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কারগুলি প্রচারের জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন; সঙ্গে গেলেন তাঁর । বিলাতে বৃটীশ এসোসিয়েশন্, রয়াল সোসাইটি প্রভৃতি বড় বড় সমিতিতে একে একে তাঁর বক্তৃতা সুরু হইল—দেখিতে দেখিতে পণ্ডিত-মহলে দারুণ হৈ-চৈ পড়িয়া গেল; সকলে অভিভূত হইয়া এই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের অদ্ভুত আবিষ্কারের তারিফ্ করিতে লাগিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে বক্তৃতা করিবার জন্য জগদীশচন্দ্রের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল—সকলেই নিজের কানে তাঁর বক্তৃতা শুনিতে চায়, তাঁর আশ্চর্য্য যন্ত্রপাতি দেখিতে চায়। অনেক বড় বড় বিলাতী কোম্পানী রাশি রাশি টাকা দিয়া তাঁর যন্ত্র নির্ম্মাণের স্বত্ব কিনিতে চাহিল, কেউ কেউ তাঁকে পরামর্শও দিল—সব কথা যেন তিনি খোলাখুলি ভাবে বলিয়া না বসেন, রাখিয়া ঢাকিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে এ দিয়া তিনি একটা 'দাঁও' মারিতে পারিবেন। কিন্তু অর্থের প্রলোভন জগদীশকে বিচলিত করিতে পারিল না, যে জ্ঞানভাণ্ডার তিনি নিজের হাতে খুলিয়া দিয়াছেন তুচ্ছ রূপার লোভে তা তিনি আবার আঁটকাইয়া দিতে রাজী হইলেন না।

বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কি রকম উচ্চ প্রশংসা

করিতে লাগিলেন তার দু' একটা উদাহরণ এখানে দিতেছি। প্রথম দিন যেদিন বৃটীশ এসোসিয়েশনে জগদীশ বক্তৃতা দেন সেদিন তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা অবলা বসু গ্যালারীতে দর্শকদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন-সভায় বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের এই প্রথম বক্তৃতা, বলা বাহুল্য আশা-আশঙ্কায় তাঁর বুক দুরু দুরু করিতেছিল। বক্তৃতা আরম্ভ হইতেই সমস্ত চুপ, তার পর ঘন ঘন করতালি শোনা যাইতে লাগিল। বক্তৃতা শেষ হইবার পর শ্রীযুক্তা বসু দেখিলেন একজন বৃদ্ধ লাঠি ভর করিয়া তাঁকে অভিনন্দন জানাইতে আসিতেছেন আর তাঁর সঙ্গে আছেন আর একজন। বৃদ্ধটি আর কেউ নন—লর্ড কেলভিন, সে সময়কার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের একজন। আর তাঁর সঙ্গের লোকটি স্যর অলিভার লজ্; ইনিও তাই।

আর একবার এক নিমন্ত্রণে গিয়া শ্রীযুক্তা বসু শুনিলেন, সেখানে এক ভদ্রলোক পাশের আর একটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা, এই চন্দ্রবসু লোকটি কে হে? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করবে—অসম্ভব!" তাঁর পাশের ভদ্রলোকটি (ইনি বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক উইলিয়াম্ র‍্যামজে) বলিলেন, "চুপ্ কর, তুমি কিছুই জান না। ভারতীয়েরা বহু শত বছরের সাধনাতে তাদের চিন্তাশক্তি এত প্রখর করেছে যে তাদের সমান হতে আমাদের বহুদিন লাগবে। ভাগ্যিস এখন পর্য্যন্ত এরা হাতে-কলমে কাজ আরম্ভ করে নি, আরম্ভ করলে আমাদের জারিজুরি আর টিকবে না।" রয়াল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শেষ হইলে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে বলিলেন, "এমন নির্ভুল পরীক্ষা আর কখনও হয়েছে বলে শুনি নি—এক-আধটা ভুল হ'লে মনে হ'ত ব্যাপারটা বাস্তব—এ যেন ইন্দ্রজাল!" জার্ম্মানীর এক বৈজ্ঞানিক তো তাঁর এক সহকর্ম্মীকে (তিনিও জগদীশের আলোচ্য বিষয় লইয়াই গবেষণা করিতে ছিলেন) বলিয়াই দিলেন, "বোস তোমাদের জন্য আর কিছুই বাকী রাখেন নি, এবার থেকে নতুন কিছু নিয়ে কাজ আরম্ভ কর।"

কিন্তু তাঁরা তখনও জানিতেন না, শীঘ্রই জগদীশচন্দ্র এর চাইতেও অনেক বড়—অনেক আশ্চর্য্য এক আবিষ্কার করিয়া সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিবেন। এবার সে কথাই বলি।

পৃথিবীর সমস্ত জিনিষকে মোটামুটি ছু'ভাগে ভাগ করা চলে। এক জীব বা চেতন পদার্থ—যারা খায় দায়, বাড়ে, বংশ বিস্তার করে—যেমন জীবজন্তু, মানুষ। আর এক হইতেছে জড় বা অচেতন পদার্থ, যেমন ধর লোহা, মাটী, এক টুক্‌রা কাঠ—এই সব। জীবকে আবার তুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক জন্তু-জানোয়ার আর এক উদ্ভিদ্‌। এখন, জন্তু-জানোয়ারদের একটা স্বভাব, তাদের যদি আঘাত করা যায় বা অন্য কোন রকম ভাবে উত্তেজিত করা যায় তবে তারা চীৎকার করিয়া, নড়িয়া চড়িয়া বা অনুরূপ কোন ভাবে তা জানাইবে। কিন্তু ধর, যদি তোমার হাত-মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া তোমাকে কেউ মারিতে আরম্ভ করে (একটা কথার কথা বলিলাম, তুমি মার খাইবে কেন, বালাই) তবে তুমি হয়তো চীৎকারও করিতে পারিবে না নড়িতেও পারিবে না—কিন্তু তাই বলিয়া কি তোমার কষ্ট হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। যন্ত্র দিয়া তোমার পেশী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে—যেখানটায় আঘাত লাগিতেছে সেখান হইতে একটা বিদ্যুতের ঢেউ উঠিয়া সুস্থ অংশের দিকে চলিতেছে। জগদীশ তাঁর অদ্ভুত যন্ত্রে অদ্ভুত ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন কোন গাছকেও আঘাত করিলে, তার শরীরে বিষ প্রয়োগ করিলে বা অন্য কোনভাবে তাকে উত্তেজিত করিলে সেও ঠিক অমনি ভাবে সাড়া দেয়, তারও আহত জায়গায় ঠিক অমনি ধারা বিদ্যুতের ঢেউ উঠে। যন্ত্রের সাহায্যে তিনি এ সব সাড়ার ছবি তুলিয়া তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করিলেন। শুধু এটুকু করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, গাছের চাল-চলন, হাব-ভাব লক্ষ্য করিবার এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী করিলেন যে লোকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—ব্যাপারটা বাস্তবিকই সত্য না মায়াজাল!

জন্তু আর গাছের এই মিল দেখাইয়াই জগদীশের মন উঠিল না, তিনি দেখাইলেন গাছ তো ছার, একটা জড় পদার্থের উপরেও অমনি ধারা আঘাত করিলে, ঘা মারিলে, মোচড় দিলে, বিষ ঢালিলে ঠিক প্রাণিদেহের মতই বিদ্যুতের ঢেউ দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র একটা কুকুরের, একটা গাছের এবং এক টুক্‌রা টিনের সাড়া-লিপি তুলিয়া পাশাপাশি দেখাইলেন তাদের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। এই ভাবে জগদীশের হাতে বিশ্বের তৃণলতা, পশুপাখী, এমন কি

প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্য্যন্ত এক মহান্‌ আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়া গেল। এ যেন সেই রূপকথার ঘুমন্তপুরীর গল্প। রাজপুত্র আসিয়া তাঁর সোনার কাঠি ছোঁয়াইলেন, অমনি সমস্ত হিমশীতল জড়-জগৎ মুহূর্ত্তে চেতনা পাইয়া জাগিয়া বসিল। সত্যিই কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

"মরমী তুমি, চরম-খোঁজা, মরম শুধু খুঁজেছ গো
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো!
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপবালার ভালে ছোঁয়ালে এ কি হেমকাঠি!
হিম যা ছিল তপ্ত হ'ল, মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত—
নূতন পরিচয়ের তব চন্দনেতে চর্চ্চিত।"

এত বড় আবিষ্কারের কথা কেউ ভাবিতে পারিয়াছিল?

এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। জগদীশচন্দ্র যখন এক সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া প্রথমে একটা টিনের সাড়া-লিপি বাহির করিয়া দেখাইলেন তখন একজন বৈজ্ঞানিক (ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক) উঠিয়া বলিলেন, "এ আর নতুন কি দেখাচ্ছেন, এ তো আমরা গত পঞ্চাশ বছর ধরেই দেখে আসছি!" জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কিসের সাড়া-লিপি বলুন তো?" তিনি বলিলেন, "কেন, এ তো প্রাণিদেহের—পেশীসঞ্চালনের সাড়া-লিপি।" জগদীশ হাসিয়া বলিলেন, "না, এ সাড়া-লিপি এক টুক্‌রা টিনের, কোন জানোয়ারের নয়।" "টিনের! টিনের! আপনি টিন ধাতুর কথা বলছেন!" বলিতে বলিতে বৈজ্ঞানিকটি বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন।

এই সব আবিষ্কারের জন্য জগদীশচন্দ্র দেশ-বিদেশের মনীষীদের কাছে যেমন অজস্র প্রশংসা কুড়াইয়াছেন তেমনি একদল পরশ্রীকাতর বৈজ্ঞানিকদের ঠাট্টা-টিটকারিও তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছে। কোন কোন বিদেশী বৈজ্ঞানিক তাঁকে পদে পদে বাধা দিয়াছেন, তাঁকে বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—আবার তাঁরাই তাঁর আবিষ্কার চুরি করিয়া নিজেদের নামে চালাইবার চেষ্টা করিতে ছাড়েন নাই। বড়ই দুঃখের কথা, আমাদের দেশেরও কোন কোন লোক—তাঁদের মধ্যে বড়

বৈজ্ঞানিকও আছেন—জগদীশের সমস্ত আবিষ্কারকে ভূয়ো বলিয়া উড়াইয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। এমন কি কেউ কেউ তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই নিতান্ত নির্লজ্জের মত এ কথা জাহির করিয়াছেন। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন্ জগদীশ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "জগদীশচন্দ্র যে সকল অমূল্য তথ্য জগৎকে উপহার দিয়াছেন তার প্রত্যেকটির জন্য এক-একটি বিজয়স্তম্ভ (মনুমেণ্ট) স্থাপন করা উচিত"। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্, ভিয়েনার হান্স মোলিশ্ সাহেব উচ্ছ্বসিত ভাবে তাঁর প্রশংসা করিয়াছিলেন। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক নন এমন লোকের তো কথাই নাই। বিখ্যাত নাট্যকার বার্ণার্ড্ শ' একবার তাঁর সমস্ত বই জগদীশচন্দ্রকে উপহার দেন। তাতে তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন, "পৃথিবীর সব চেয়ে ছোট জীবতত্ত্ববিদের কাছ হইতে সব চেয়ে বড় জীবতত্ত্ববিদ্‌কে উপহার (From the least to the greatest Biologist)"। বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ তাঁর একখানি বই জগদীশকে উপহার দিয়া তার মধ্যে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "যিনি একটা নতুন পৃথিবী খুলিয়া দিয়াছেন তাঁকে দিলাম (To the Revealer of a New World)"। এমনি ধারা কত নাম করিব?

বাঁ দিকে জগদীশচন্দ্রের বাড়ী, ডান দিকে বসু বিজ্ঞান-মন্দির

জগদীশচন্দ্রের আর একটি দানের কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাংলা দেশে বিজ্ঞানের ভাল গবেষণাগার নাই—এ দুঃখ তিনি জীবনের পদে পদে অনুভব করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি বসু বিজ্ঞান-মন্দির নামে

কলিকাতায় এক বিরাট্ পরীক্ষাগার তৈরী করিয়া গিয়াছেন। নিজের উপার্জ্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি এর জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। এ গবেষণাগার শুধু বাঙ্গালীর জন্য নয়, নানা দেশ হইতে ছাত্র আসিয়া এখানে গবেষণা করিতেছে। এই বিজ্ঞান-মন্দিরের চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় জগদীশচন্দ্র দেশকে কতখানি ভালবাসিতেন। মন্দিরের কারুকার্য্য একেবারে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে করা হইয়াছে—অজন্তা গুহার অনুকরণে। শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা সুন্দর সুন্দর দেওয়াল চিত্র দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। দেয়ালের গায়ে আধখানা আমলকী ও বজ্রচিহ্ন রাজা অশোক ও দধীচির কথা মনে করাইয়া দিতেছে। রাজা অশোক জগতের মুক্তির জন্য সর্ব্বস্ব বিলাইয়া আধখানা আমলকী মাত্র রাখিয়াছিলেন—শেষে সেটাই হইল তাঁর চরম দান। দধীচি পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন—তাঁর অস্থি দিয়া হয় এই বজ্র। তাম্রফলকের গায়ে জগদীশচন্দ্র নিজের হাতে লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞানমন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম।"

বাংলার দুর্ভাগ্য—বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, মাত্র কয়েক দিন হইল বাংলা-মার এই বড় সাধের সন্তানটিকে আমরা শ্মশানে চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি।

দস্যুর দলে ভোমরা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

১১

হাতে-হাতে

হাত-কাটা ছেলেটা বললে, 'তাড়াতাড়ি দাও। শীগ্‌গির—জলদি—কুইক্।'

দোকানি বললে, 'আরে সবুর সবুর। এত তাড়া কিসের?'

'মেজবাবু আর সেজবাবুর তাড়া। দেরি একটু হয়েছে কি লাথি!'

'লাথি! বেশ তো। লাথি না খেলে তোর তো গা-ব্যথা করে—করে না?'

বড়-বড় নোঙরা দাঁত বের ক'রে হাসলো হাত-কাটা। 'দেবো যখন একদিন ওদের নাক কামড়ে, টের পাবে।'

দোকানি ছড়া কাটলে—

'হাত-কাটা নূ—লো,
দাঁত যেন মূ—লো
বিদঘুটে নোঙরা—
ঘ্যাক ক'রে কাম্‌ড়ায়।

দাঁতে শান দিয়ে রাখ ভালো ক'রে। শক্ত চামড়া—সহজে ফুঁড়বে না।'

'তোমার ঐ মোটা গরদানাটার উপর একটু ঘ'ষে নিই— কী বলো?'

'বাপরে—বিষ যে তৈরী! বেশ, বেশ! তোর মুণ্ডুটা কবে উড়ে যায় তাই ভাবছি।'

'চা দিতে আরো যদি দেরি করো তবে তোমার মুণ্ডুই আগে উড়বে। কত্তারা জরুরি কাজ সেরে ফিরেছেন—মেজাজ চড়া।'

'আরে রোসো, রোসো। দেখছো না ভদ্রলোক 'কাষ্টোমার' রয়েছেন।—আরো কিছু চাই আপনাদের?'

বিরিঞ্চি এতক্ষণ খাবার পেলেটের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের প্রত্যেকটি কথা শুনছিলো। মনে হচ্ছিলো তার, ঐ হাত-কাটা বিদঘুটে ছেলেটার সঙ্গে তাদের উদ্দেশ্যের সার্থকতা কেমন অদ্ভুতভাবে যেন জড়ানো। ওর কথাগুলো ভালো ক'রে বুঝতে পারলে বুঝি অনেক কিছুই পরিষ্কার হ'য়ে যেত।

তক্ষুণি সে মনে-মনে একটা ফন্দি এঁটে ফেললো। বসন্তকে নিয়েই ভাবনা—ও ভয় পেয়ে পিট্‌টান না দেয়। ও তো এখন ছাড়া পেলেই এক দৌড়ে বাড়ি, তারপর পুলিশ শরণ। কিন্তু এত দূর এগিয়ে এখন কি ফেরা যায়—পাগল!

বিরিঞ্চি গলা-খাঁকারি দিয়ে দিব্যি বয়স্ক লোকের মত বললে, 'আবো দু' পেয়ালা চা আর দুটো কটলেট।'

বসন্ত ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো: 'আমি আর খাবো না। এবারে ওঠো, বিরিঞ্চি।' (শেষের কথাটা নীচু গলায়।)

বিরিঞ্চি টের পেলো ঐ হাত-কাটার চোখ তক্ষুণি তাদের উপরে এসে পড়লো। বেশ ভালো ক'রে তাদের দেখে নিচ্ছে। বিরিঞ্চির বুকের ভিতরটা অল্প দুড়দুড় করছিলো, কিন্তু সে এমন ভাবে বসে রইলো যেন এইমাত্র চা আর কটলেট খাওয়া ছাড়া আর কিছুই সে

জানে না। খুব হালকা সুরে বললে: 'আরে বোসো, বোসো। নরসিংহ দত্তকে খুঁজে বার করতে হবে তো!'

বসন্ত তীব্র চাপা গলায় বললে, 'আর দরকার নেই—চলো!' বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহ ও সাহস ফিকে হ'য়ে আসছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে যেন চারিদিকে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে।

'তা নরসিংহ দত্তকে খুঁজে না পাই, দু'জনেই ভাগাভাগি ক'রে নেব—কি বলিস?' ব'লে বিরিঞ্চি হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

বসন্ত ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। মাথা খারাপ হ'লো নাকি বিরিঞ্চির?

বিরিঞ্চি টেবিল চাপড়ে বললে, 'কই, চা দাও শীগ্‌গির।' তারপর বসন্তর দিকে মাথা বাড়িয়ে গলা নামিয়ে বললে, 'আরে অত ভাবছিস কেন? হাতে যা এসে পড়েছে তা ছাড়তে নেই, বোকা।'

বিরিঞ্চি বেশ বুঝতে পারছিলো যে তার শেষের কথাটা ছোট্ট ঢিলের মত ঐ ঘরের হাওয়ায় প'ড়ে ঢেউ তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সে আবার বললে, 'আরে অত ভাবতে গেলে কি কিছু হয়? নরসিংহ দত্ত থাকুন তাঁর মনে, তুই আর আমি ফাঁকতালে বড়লোক।'

দোকানি তাদের সামনে দু' পেয়ালা চা এনে রাখলে। ততক্ষণে বসন্ত'র মুখ ফ্যাকাশে সাদা হ'য়ে গেছে।

দোকানি খুব মধুর হেসে বললে, 'একটু বসুন আপনারা। কটলেট গরম ক'য়ে আনি।' ব'লে সে পরদার আড়ালে অদৃশ্য হ'লো। বিরিঞ্চি মুখ ঘুরিয়ে দেখলে হাত-কাটা ছেলেটাও নেই। মনে-মনে বললে 'হুঁ', বসন্তকে বললে, 'খা না। শুকনো পাঁউরুটির মত মুখ ক'রে ভাবছিস কি?'

বসন্ত রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'ভালো হচ্ছে না বিরিঞ্চি।'

'তুই চুপ কর। দেখ না কী মজা হয়।'

বসন্ত ভালো ক'রে কিছুই বুঝতে পারছিলো না, কিন্তু তার তখন মনের ভাব এমন যে রাস্তায় ছুটে গিয়ে ট্রামে চ'ড়ে বসতে পারলে বাঁচে। কিন্তু হাত-পা তার অবশ লাগছে, নড়তেও পারে না যেন।

বিরিঞ্চি ফিসফিস ক'রে বললে, 'কিছু ভয় নেই।'

একটু পরেই দোকানি কটলেট নিয়ে এলো। গরম ধোঁয়া উঠছে। হাসিমুখে বললে, 'আপনারা আস্তে-আস্তে খান। কিছু তাড়া নেই।'

বিরিঞ্চি এক কামড় কটলেট ভেঙে মুখে দিয়ে বললে, 'বাঃ, বেশ তো। আমাদের জন্যে আজ তোমার বাঁধা খদ্দেররা বুঝি ফিরে যাচ্ছে?'

'না না, ফিরে যাবে কেন?'

'ঐ যে ছোকরাটা এসেছিল—গেছে চা নিয়ে?'

'হ্যাঃ, বিদেয় করেছি ওকে। আর বলবেন না—ওর জ্বালায় দোকান করে কার সাধ্য? যখন-তখন এসে উৎপাত। হতভাগা হুলো! আর মশাই, ওর ঐ বিকট চেহারা দেখলে কোন ভদ্দরলোকের কি বসতে ইচ্ছে করে?'

'ও কোন বাড়িতে কাজ করে বুঝি?'

'কে জানে মশাই, আছে আর কি রাস্তার কুত্তার মত, সমস্ত পাড়ার পাত চেটে বেড়ায়।—তা আপনারা বুঝি নৈহাটিতেই থাকেন?'

বিরিঞ্চি খুব চিন্তিতভাবে বললে, 'ঐ জমিদার বাবুর খোঁজ তো পেলুম না।'

'ভালো ক'রে খুঁজলে কি তার খোঁজ পাওয়া না যায়? বলেন তো আপনাদের সঙ্গে—'

বিরিঞ্চি মাথা নেড়ে বললে, 'তা কি হয়! তোমার দোকান ফেলে যাবে কোথায়?'

'ওঃ দোকানের জন্য ভাবছেন? দোকান তো এখন বন্ধই করবো।'

'তা হ'লে তো ভালোই। আজই আমাদের ফিরে যেতে হবে কিনা, বিকেলের মধ্যেই। বসন্ত কী বলো?'

বিরিঞ্চির উপর রাগে আর এতক্ষণের চাপা ভয়ে বসন্তের গলা যেন আটকে আসছিলো, একটা কথা সে বলতে পারলে না।

'বেশ তো, তা হ'লে আপনারা চা শেষ ক'রে নিন। আমি ততক্ষণ জামাটা চড়িয়ে নিই গায়ে।'

দোকানি আবার পরদার আড়ালে ঢুকলো।

বিরিঞ্চি জোর ক'রেও খেতে পারছিলো না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঐ হাত-কাটা ছেলেটা, এই দোকানি, ওরা গুণ্ডার দলের লোক। বিরিঞ্চি নিজেদের সম্বন্ধে ওদের মনে সন্দেহ ও কৌতূহল জাগিয়েছে, তার ফল শীগ্‌গিরই ফলবে। শীগ্‌গিরই ওরাও ধরা পড়বে গুণ্ডার হাতে। ক্ষণিক বীরত্বের ঝোঁকে, হয়তো নিছক বাহাদুরীর নেশায় বিরিঞ্চি এই কাণ্ডটা করলো। গুণ্ডার আস্তানার খোঁজ পেয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া, তারপর পুলিশের হাতে সমস্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দেয়া—তার চেয়ে সহজ ও নিরাপদ কিছুই ছিল না। এখন শেষ পর্য্যন্ত সামলাতে পারলেই হয়। বিরিঞ্চির একটু-একটু গা বমি-বমি করতে লাগলো—অপারেশনের দিন সকাল বেলায় যেমন হয়।

দিব্যি ভদ্রলোকের মত পরিষ্কার জামা-কাপড় প'রে দোকানি বেরিয়ে এলো। বিরিঞ্চি তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো। 'চলো।'

'আপনার খাওয়া……'

'আর খাবো না। কত হ'লো দাম?'

'ওঃ, দাম কিছু না। চলুন।'

'না না, সে কি হয়, এই নাও।' একটা টাকা বার ক'রে বিরিঞ্চি গুঁজে দিলে দোকানির হাতে। 'চেঞ্জটা তুমি রাখো।'

দোকানি বললে, 'আপনারা বড়লোক, গরীবের উপর দয়া রাখবেন। দোকানটা তা হ'লে এবার বন্ধ করি।'

বসন্ত এতক্ষণে একটা কথা বললে, 'আমরা বাইরে যাই আগে।'

'আচ্ছা……থাক গে, পিছন দিয়ে বেরুনো যাবে'খন।' বন্ধ হ'লো দোকানের দরজা। 'আসুন এবার, আসুন।'

দোকানি আগে, পিছনে ওরা দু'জন পরদার আড়ালে গিয়ে ঢুকলে। অন্ধকার একটা খুপরি, এক কোণে বিছানা পাতা, দু'একটা সাধারণ জিনিস, টেবিলের উপর বাসনকোষন।

দোকানি বললে, 'রাত্রে এখানেই শুয়ে থাকি। গরীব মানুষ, কোন রকমে…… এই যে এদিক্ দিয়ে রাস্তা……'

হঠাৎ একটা ভয়ানক চীৎকার শোনা গেল। চীৎকারটা দোকানির না অন্য কারো গলার সেই উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্ত্তে বিরিঞ্চি বুঝতে পারলে না। আবছা আলোয় দেখা গেলো, সামনে দানোর মত দুটো লোক। বিরিঞ্চি চেঁচিয়ে উঠলো—'ঐ তো প্রাইভেট ডিটেক্—' কিন্তু তার কথা শেষ হ'লো না। একটা শক্ত হাত তার মুখের উপর রুমাল চেপে ধরলো। জোর ক'রে একবার চেঁচাতে গেলো—'বসন্ত, বসন্ত!' গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুলো শুধু। কী তীব্র মিষ্টি গন্ধ! কিন্তু তার নিঃশ্বাস আটকে আসছে……গেলো, গেলো দম বন্ধ হ'য়ে…… অগাধ জলে সে ডুবে যাচ্ছে,' সে ম'রে যাচ্ছে। তবু শেষ মুহূর্ত্তে শেষ চেষ্টায় একবার চোখ মেলে তাকালো—কোণে দাঁড়িয়ে হাত-কাটা ছেলেটা ভূতের মত হাসছে।

(ক্রমশঃ)

আলুর স্বপক্ষে

(খাদ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ)

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি, বি.ই. এস্)

গতবারে তোমাদের চিনির বিপক্ষে বলেছি, এবারে আলুর স্বপক্ষে বল্ব। গত কয়েক বছর ধরেই আমি আলুর স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে আস্‌ছি। আসলে যে কথাটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের, অর্থাৎ বাঙ্গালীদের খাদ্যে ভাতের ভাগটা কমিয়ে আলুর ভাগটা বাড়িয়ে দিলে তাতে ক'রে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হবার পূরা দস্তুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীর খাদ্যে দিন অন্ততঃ এক পোয়া আলু থাকা দরকার। ধর, কোন পরিবারে মোট বার জন লোক; তা'হলে প্রত্যহ বাজার থেকে সে বাড়ীতে অন্ততঃ তিন সের আলু আসা চাই! বার বছর বয়স হ'লেই তাকে একজন পূর্ণবয়স্ক লোক বলে ধরে নিতে হবে—অর্থাৎ রেল-গাড়ীতে যেমন, আলুর বেলাও ঠিক তেমনিটি—বার পেরোলেই 'ফুল্ টিকিট'।

প্রবন্ধ-লেখক; ইনি কলকাতার প্রেসি-ডেন্সি কলেজের শরীর-বিধান বিদ্যার (Physiology) প্রধান অধ্যাপক। বহু বছর ধরে ইনি খাদ্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করে আসছেন—অনেক পুস্তিকা এবং পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। এঁর লেখা "বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি" একখানি বিখ্যাত বই।

দিন এক পোয়া আলু খেতে হবে শুনে আমার এক বন্ধু তো চটেই গেলেন। অত আলু খাওয়া নাকি অসম্ভব। তখন তাঁকে হাতে-নাতে দেখিয়ে দেওয়া গেল যে কথাটা শুনতে যেমন, আসলে ততটা মারাত্মক রকমের 'ভয়ানক' কিছুই নয়, কেননা মাঝারি সাইজের ৪।৫ টি আলুতেই

এক পোয়া ওজন হয়ে যায়। তাঁকে আরও দেখান হ'ল যে এ প্রস্তাবটি শুধু আমারই মস্তিষ্ক-জাত একটি আজগুবি খেয়াল নয়, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য কি কি জিনিষ খাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা League of Nations থেকে বিশেষজ্ঞদের যে একটি তালিকা বার করা হয়েছে তাতে আলুর পরিমাণ দেওয়া হয়েছে জনা পিছু আধ সের করে। একখানা নামজাদা শরীর-বিজ্ঞানের বই-এ * বিলাতী ডাক্তারী সভা থেকে প্রকাশিত দু'টি খাদ্য-তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে; তার একটিতে আলুর পরিমাণ ধরা হয়েছে মাথা পিছু এক পোয়া, আর একটিতে প্রায় দেড় পোয়া। আর. এইচ্. এ. প্লিমার এবং ভি. জি প্লিমার তাঁদের বইএ জন পিছু দৈনিক এক সের আলুর বরাদ্দযুক্ত একটি খাদ্য-তালিকা দিয়েছেন। †

আমাদের রোজকার খাবারে নানান্ জাতীয় ভিটামিন থাকা যে কত প্রয়োজনীয় তা তোমরা অনেকবার এই রামধনু'র পাতাতেই পড়েছ। ভিটামিনের উপকারিতা সবে কয়েক বছর হ'ল জানা গেছে। ভিটামিন সম্বন্ধীয় আবিষ্কারগুলো হবার অনেক আগেই কিন্তু পণ্ডিতেরা আলুর গুণ বুঝতে পেরেছিলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে—১৮৯২ সালে কুলীর সাইক্লোপিডিয়া নামক বইএ (Cooly's Cyclopaedia) আলু এবং চালের গুণাগুণ নিয়ে একটা তুলনা করা হয়েছিল। তুলনাটা হয়েছিল বিলাতের সাধারণ লোকদের কি কি খাওয়া উচিত তাই নিয়ে। (সেটা তো আর আমাদের মত দুর্ভাগা দেশ নয় যে জাতটা রসাতলে যেতে বস্‌লেও কেউ এ সব "তুচ্ছ" ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না!) তাতে বলা হয়েছিল যে ভাত খুব চমৎকার পুষ্টিকর খাদ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে যদি তার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি জিনিষ খাওয়া হয় যাতে জন্তু-দেহ-জাত প্রোটিন (ছানা জাতীয় জিনিষ) কতকটা পরিমাণে আছে—যেমন ধর, মাংস, মাছ, দুধ ইত্যাদি। কিন্তু বিলাতে গরীব লোকে স্বচ্ছন্দে মাছ-মাংস খাবার পয়সা কোথা

* বইখানার নাম Hand book of Physiology and Biochemistry by Halibarton and Macdonall।

† R. H. A. Plimmer and V. G. Plimmer লিখিত Food, Health and Vitamins বইএর খাদ্য-তালিকা।

পাবে? তাই সেখানের গরীব লোকদের খাদ্যে প্রচুর আলু ব্যবহৃত হয়। তোমরা বোধ হয় জান যে বিলাতে ভিক্ষা করা আইন-বিরুদ্ধ। যাদের "করে খাবার" ক্ষমতা নাই তারা সরকারের ওয়ার্ক্ হাউসে গিয়ে ঢোকে, সেখানে সরকারের পয়সাতেই তাদের লালন-পালন করা হয়। এই রকম এক ওয়ার্ক্ হাউসে একবার আলু কমিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ভাত দেবার বন্দোবস্ত করা হ'ল; তার ফলে লোকেদের শরীর খুব দুর্ব্বল হতে সুরু করল, কেউ কেউ আবার নানান্ রোগে ভুগে মারা পর্য্যন্ত গেল।

আমি খাদ্য সম্বন্ধে নিজে হাতে-নাতে অনেক পরীক্ষা করেছি; তাতে দেখতে পেয়েছি আলুর ভাগ বাড়ালে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ সুফল পাওয়া যায়। কথাটা বুঝতে অনেকেই গোলমাল করে ফেলেন, কাজেই আর একটু বিশদ ভাবে বলা যাক্। খাবারে আলুর পরিমাণ বাড়ান মানে এ নয় যে, তোমরা দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি আর যত কিছু খাও সেগুলো কমিয়ে তার জায়গায় শুধু আলুই খেতে সুরু কর। ওসব জিনিষ কমাবে না, যে রকম চল্‌ছিল তাই চল্‌বে। কেবল ভাতের পরিমাণটা কমিয়ে তার জায়গায় আলুর পরিমাণটা বাড়াতে হবে। অন্যান্য জিনিষ কমিয়ে তার জায়গায় শুধু আলু বাড়ালেই যে চলে না তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় রুমানিয়াতে খাবারের কম্‌তি পড়ে যায়—সেখানকার লোকেরা দিন শুধু আড়াই সের তিন সের আলু খেয়েই দিন কাটাতে আরম্ভ করে। ফলে দেখা গেল তাদের ভিতর নানান্ রকমের ব্যারাম হ'তে সুরু করেছে।

এখন দেখা যাক্ আলুর মধ্যে এমন কি গুণ আছে যার জন্য বিশেষজ্ঞ-মহলে তার এতখানি কদর। প্রথম হচ্ছে, আলুর ভিতর প্রোটিন বা ছানা জাতীয় যে জিনিষটা পাওয়া যায় সেটা উচ্চজাতীয় প্রোটিন। দ্বিতীয়তঃ, আলুতে পটাস্ প্রভৃতি লবণ জাতীয় যে সব জিনিষ পাওয়া যায় সেগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব মূল্যবান্। তৃতীয়তঃ, তোমাদের আগে একবার বলেছি ভিটামিন তিন রকমের হ'য়ে থাকে—এ, বি, এবং সি। এই তিন রকম ভিটামিনই শরীর রক্ষার জন্য দরকার। সব জিনিষে তিন রকম

ভিটামিন পাওয়া যায় না, কিন্তু আলুর মধ্যে তিন রকম ভিটামিনই আছে। অবশ্য আলুর ভিতর ভিটামিনের মাত্রা যে খুব বেশী আছে তা নয়, কিন্তু তা না থাকলেও অনেকটা আলু খেলে আমাদের শরীর যে ভিটামিন পায় সেটা একেবারে অবহেলার বস্তু নয়। তারপর শেষের কারণটি;—আমাদের বাঙ্গালীদের পক্ষে এইটাই বেশী আলু খাবার পক্ষে একটা মস্ত বড় যুক্তি। আমাদের প্রধান খাবার হচ্ছে ভাত; এখন, ভাতে একটা অসুবিধা এই যে তাতে অনেকখানি অম্লজনক পদার্থ আছে। খাবারের ভিতরকার অম্লজনক পদার্থটিকে নিস্তেজ করতে না পারলে স্বাস্থ্যহানি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাতের অম্লভাগটাকে কাটিয়ে 'সামঞ্জস্য' করে আন্‌তে হলে খানিকটা ক্ষার পদার্থ খাওয়া চাই। আলুতে বেশ খানিকটা ক্ষার পদার্থ আছে। কাজেই আমাদের রোজকার খাবারে ভাতের ভাগ কমিয়ে এবং আলুর ভাগ বাড়িয়ে এই অম্ল এবং ক্ষারের সামঞ্জস্যটি বজায় রাখ্‌তে হবে। তা হ'লেই স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌বে।

বাংলা দেশ যে গরীব তা কেউই অস্বীকার করবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বল্‌ব ভাতের ভাগ কমিয়ে আলু কিছু বেশী খেতে আরম্ভ করলে পয়সার দিক্ দিয়ে খুব বেশী টানাটানি হবার কথা নয়। ঋতু অনুসারে আলুর দাম ওঠে নামে। মাঘ ফাল্গুন মাসে তিন-চার পয়সায় এক সের আলু পাওয়া যায়, আবার ভাদ্র আশ্বিনে দাম চড়ে ওঠে আট দশ পয়সা পর্য্যন্ত। চালের দামের সঙ্গে তুলনা করলে আলুর দাম বেশী; কিন্তু দেশের লোক চেষ্টা করলে আলুর দাম আরও কমিয়ে আনা যায়। কি ভাবে, বলছি। এক বিঘা জমিতে আলু এবং কলা এই দু'টি ফসলই বেশী জন্মে; কলায় জমিটা কতক জঙ্গলময় হয়ে যায়, আলুতে তা হয় না। এক বিঘা জমিতে প্রায় ৬০ মণ আলু ফলান যায়, বারো আনা মণ ধরলেও তার দাম চল্লিশ টাকা। অথচ ঐ জমিতে ধান দশ মণের বেশী পাওয়া যায় না, তার দাম আর কত? কুড়ি টাকা? আমাদের বাংলা দেশের চাষীরা যদি এক ফসল ধানের উপর নির্ভর না করে তাদের ডাঙ্গা জমিতে আলু ফলাতে আরম্ভ করে এবং পৌষ থেকে আরম্ভ করে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ভাত কমিয়ে আলু বেশী খেতে থাকে, তা হ'লে দেশে দুর্ভিক্ষের মাত্রা কমে যাবে।

তোমরা, রামধনুর পাঠক-পাঠিকারা, ইচ্ছা করলে অবসর সময়ে নিজেদের বাড়ীতেও আলুর চাষ করতে পার। দেখবে এতে বাস্তবিক কত আনন্দ! সংসারের খরচেরও কিছুটা সাশ্রয় হবে। যারা কল্‌কাতার বাইরে মফঃস্বলে থাক তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই বোধ হয় এক-আধটুকু খালি জমি আছে—তাদের তো কোনই অসুবিধা নাই। যারা কলকাতায় থাক তারাও ইচ্ছা করলে ছাদের উপর টবে করে সখের আলুর চাষ করতে পার। কি ভাবে আরম্ভ করবে, বলে যা চ্ছি, মন দিয়ে শুনে যাও। একটা বড় বারো ইঞ্চি টবের তলাকার ফুটোর উপরে দু' ইঞ্চি উঁচু করে কতকগুলি খোয়া রাখ। তারপর খানিকটা মাটী সংগ্রহ করে, এক পোয়া খৈল (oil-cake—দাম এক পয়সা কি দেড় পয়সা) বেশ করে গুঁড়িয়ে সেই মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দাও। মাটীটা একটু রসাল হওয়া চাই—দরকার বোধ কর্‌লে একটু জল মিশিয়ে নিতে পার। এইবার ওই মাটী দিয়ে টবটি ভর্ত্তি কর। ইতিমধ্যে দু'য়েকটী কল-গজান আলু (মানে যে আলুর সুঁয়ো বা shoot বেরিয়েছে—বাজারে সে রকম আলু পাওয়া যায়) একটা হাঁড়ির মধ্যে কিছু খড়, পাতা বা কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দাও। সাত আট দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে হাঁড়ির ভিতরকার আলুর কল দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে। ওদিকে টবের মাটীতেও তিন-চার দিন বাদেই সাদা সাদা তূলোর মত ছাতা (fungus) দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। এইবার সেই ছাতাগুলোকে খৈল মাটীর সঙ্গে বেশ করে মিশিয়ে ফেল। চার পাঁচ দিন পরে টবের মাটীটাকে আর একবার নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিয়ে তা থেকে অর্দ্ধেকটা মাটী একটা হাঁড়িতে করে আলাদা তুলে রাখ। এইবার আলুটাকে টবের মাঝখানে বসিয়ে তার উপর দুই ইঞ্চি আন্দাজ মাটী চাপা দাও। সাত আট দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে আলুর কলগুলি মাটীর উপরে উঠে এসে সবুজ পাতাযুক্ত হয়েছে। ডগাগুলি যখন পাঁচ ছ' ইঞ্চি বেড়ে উঠবে তখন হাঁড়ি থেকে ফের মাটী এনে দু' তিন ইঞ্চি চাপা দেবে। গাছ বেশ বড় হয়ে উঠ্‌লে বাকী মাটী চাপা দিয়ে দাও—ডগাগুলো যেন তিন চার ইঞ্চি উপরে বেরিয়ে থাকে। চারাগুলোর জলাভাব ঘট্‌লে কিছু জল দিতে হবে, আর জল দেবার দুই-এক দিন পরে

আশপাশের মাটী সরু কাঠি দিয়ে সাবধানে উস্কে দেবে, মাটী যতটা সম্ভব ঝুর ঝুর করে দিও। ব্যস্, এইবার মাটীর নীচে আলু ধরতে সুরু করবে। একটা কথা, টবগুলো যেন বেশ রোদ পায়।

যারা মফঃস্বলে থাক অথবা যাদের বাড়ীতে খালি জমি আছে, তাদের তো আরও সুবিধা। বেশী জমির দরকার নাই, ছ'ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া একটু জমির ফালি পেলেই তোমার কাজ চলে যাবে। প্রথমে জমিটা কুপিয়ে পাঁচ সের খৈল গুঁড়িয়ে মিশিয়ে নাও। তারপর ওপরে যেমন-যেমন বলা হয়েছে করে যাও। এইবার এক ফুট অন্তর অন্তর এক একটী করে কলান আলু দুই সারে ("পাটীতে") বসিয়ে যাও, এবং বসান হয়ে গেলে দুই ইঞ্চি আন্দাজ মাটী চাপা দাও। গাছগুলি ছয় ইঞ্চি আন্দাজ বেড়ে উঠ্‌লে দুই পাটীর মাঝখানকার মাটী কুপিয়ে আলু গাছের তলায় দিতে থাক। কয়েক দিন বাদে আবার মাটী দাও। এইভাবে মাটী দেবার ফলে দু' পাটীর ভিতরে খালের মত গর্ত্ত হয়ে যাবে। চারাগুলোর ডগা যেন তিন চার ইঞ্চি পরিমাণ মাটীর উপরে থাকে। মাঝে মাঝে দুই পাটির মধ্যের গর্ত্তে জল ঢেলে দাও আর মাঝে মাঝে আলুর তলার মাটী সাবধানে উস্কে দিতে থাক (মালীরা একে "খুসে দেওয়া" বলে।) আলুর মাটী যত ঝুরাঝুরা হবে আলু ততই আকারে বড় এবং পরিমাণে বেশী হবে। আলু গাছে বেশী জল দিলে কিন্তু আলু পচে যায়। জায়গাটাতে ভাল রোদ আসা চাই, কেননা রোদের গুণে আলু ভাল হয়।

নানা প্রসঙ্গ

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

(উত্তর শেষের দিকে দেখ)

১। মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রীর নাম—মিঃ সত্যমূর্ত্তি, মিঃ রাজাগোপাল আচারিয়া, মিঃ পট্টভি সীতারামিয়া, মিঃ সম্মুখম্ চেট্টি। বাস্তবিক, কোন্ নামটি ঠিক?

২। চীন সাধারণ-তন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট্—সান্ ইয়াৎ সেন, চেঙ্গ্ কাই সেক, চ্যাং সুলিন, ইউজিন চেন, মা চান্ সান। আসলে এঁদের মধ্যে কে?

৩। সিন্ধু (Indus), ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, নর্ম্মদা, গোদাবরী—এই কয়টী নদ-নদীর মধ্যে কোন্‌টি সব চেয়ে লম্বা?

৪। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় গাছের নাম কি?

৫। পারদ (পারা) খুব ভারী জিনিষ, অবশ্য লোহার মত অত ভারী নয়। পারদ আকারে ধাতুর মত কঠিন পদার্থ হ'লেও আসলে কিন্তু ধাতু নয়।—কথাগুলি কি ঠিক?

৬। নীচে দু'টী ছবি দেওয়া গেল; এগুলি দেখে তোমাদের বল্‌তে পারা উচিত, কার বা কিসের ছবি। চেষ্টা কর তো!

১নং

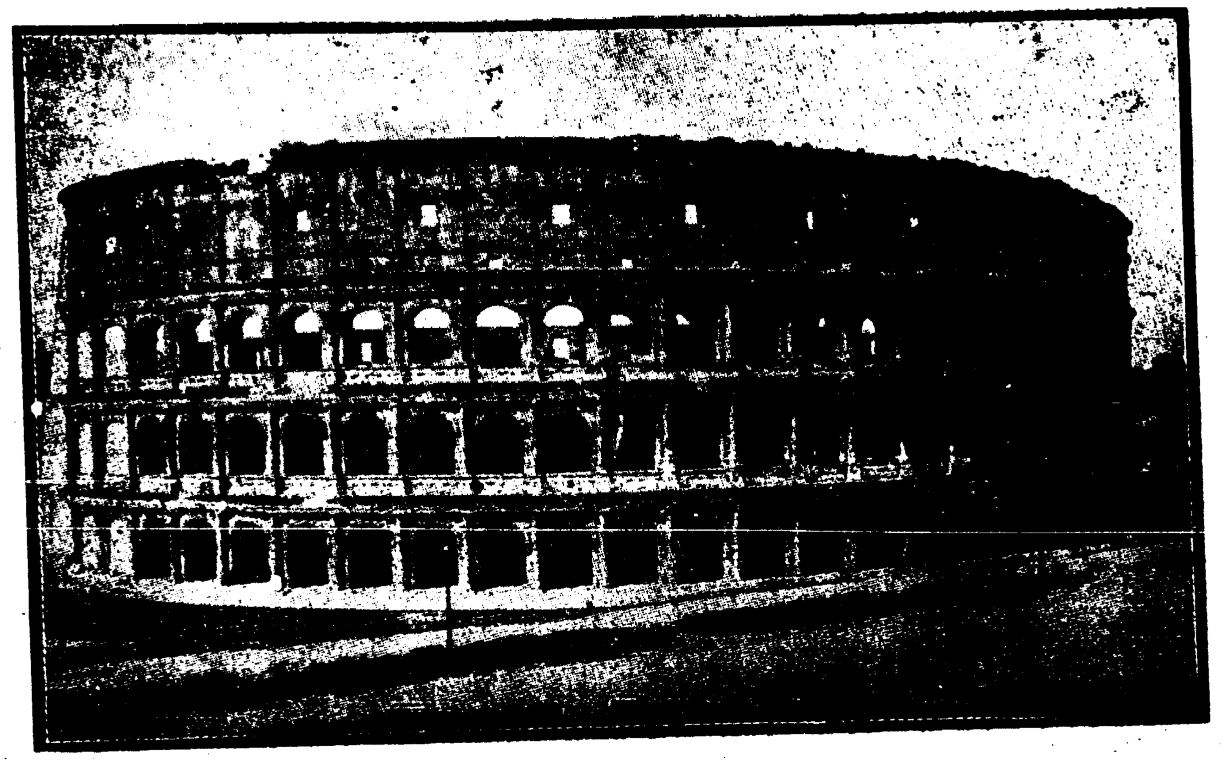

২নং

কি ও কেন?

বাংলার আইন-সভার (Legislative Assembly) সভাপতিকে Speaker বলা হয় কেন?

আইন-সভার কাজ যে দেশের জন্য আইন-কানুন তৈরী করা তা তোমরা অবশ্যই জান। ধর, এই সভার কোন সভ্যের ইচ্ছা হ'ল, অমুক বিষয়ে অমুক ধরণের একটা আইন করা হয়—কাগজে-কলমে সে আইন বেশ করে লিখে তিনি সভার সাম্‌নে উপস্থিত করলেন। সভ্যেরা তখন সে বিষয়ে তর্কাতর্কি করবে, বক্তৃতা দেবে, শেষে সকলের মত জিজ্ঞাসা করা হবে। কিন্তু সভাপতি নিজে এ সব বিষয়ে কোনদিকেই যোগ দেবেন না, কোন পক্ষে কোন কথা বলাই তাঁর বারণ। যদি দু'পক্ষে ভোট সমান-সমান হয় তবেই তিনি একটা ভোট দিতে পারেন, নতুবা তাও পারেন না। তিনি শুধু দেখ্‌বেন নিয়ম মাফিক্ সমস্ত কাজ হচ্ছে কিনা,

সভ্যদের তর্কাতর্কি নিয়ম-বিরুদ্ধ হচ্ছে কিনা—এই সব। এক কথায় সভার কাজ চালাবার জন্য যেটুকু দরকার তা ছাড়া কোন কথাই তিনি বলবেন না। তাঁর চাইতে আর সকলেই অনেক বেশী কথা বলে যাবে। এ সত্ত্বেও তাঁকে "স্পিকার" বলা হয় কেন?

এই "কেন"র উত্তর হচ্ছে এই যে আমাদের দেশের আইন-সভা অনেকটা বিলাতের অনুকরণেই তৈরী হয়েছে। বিলাতে হাউস্ অব্ কমন্স্ নামে আইন-সভার সভাপতিকে বলা হয় স্পিকার। তাঁর কাজও এখানকার সভাপতির কাজের মতই, কিন্তু তাঁর এই স্পিকার নামের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। আজকাল বিলাতের হাউস্ অব কমন্স আইন তৈরী করে বটে, কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন এ ক্ষমতা তাদের ছিল না। সভ্যেরা শুধু রাজাকে কোন একটা বিষয়ে আইন তৈরী করবার জন্য অনুরোধ করতে পারতেন মাত্র। তাও আবার সব সভ্যেরা একজোটে রাজার কাছে যেতে পারতেন না (এখনও যাবার নিয়ম নাই), যেতেন শুধু একজন–তাঁদের সবাইকার মুখপাত্র হয়ে। তাঁকে বলা হ'ত Speaker। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে হাউস্ অব্ কমন্সের কাজের ধারা অন্য রকম হয়ে গেছে, কিন্তু সভাপতির স্পিকার নাম রয়েই গেছে, সেটা আর বদ্‌লায় নাই। সেইজন্য বিলাতের অনুকরণে আমাদের দেশের আইন-সভার সভাপতিকেও বলা হয়—স্পিকার।

"গেজেট্" কথার মানে খবরের কাগজ হ'ল কি ভাবে?

আজকাল তোমরা ট্যাঁক্ থেকে কয়েকটি পয়সা ফেলে দিলেই এক একখানি খবরের কাগজ কিন্‌তে পাও, তার পর নিজের ঘরে গ্যাঁট্ হয়ে বসে ধীরে-সুস্থে সেখানি পড়তে সুরু করে দাও। কিন্তু খবরের কাগজের প্রথম যুগে লোকের এতখানি সুবিধা ছিল না—আলাদা আলাদা প্রত্যেকের কাছে খবরের কাগজ বেচাই হ'ত না। কাগজওয়ালা একটী সুবিধা মত জায়গা বেছে নিয়ে তার খবর শোনাতে বস্‌ত, যার যার খবর শোনবার সাধ যেত, পয়সা দিয়ে গিয়ে তাই শুনে আস্‌ত। ইটালীর ভেনিস্ সহরে এই ভাবে খবর শুন্‌বার খুব রেওয়াজ হয়ে উঠল—সেখানে খবর শুন্‌বার দাম ছিল এক 'গেজেটা'। গেজেটা ছিল আমাদের পয়সার মতই ভেনিসের এক রকম মুদ্রা। সেই থেকে খবরের কাগজের একটা নামই হয়ে পড়ল গেজেট।

বিজ্ঞানের খেলা

অদৃশ্য কালি

(শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি-এ)

টিঞ্চার আয়োডিন তোমরা সকলেই ব্যবহার কর, এবং সকলের বাড়ীতেই বোধ হয়—এ জিনিষটি আছে। এই টিঞ্চার আয়োডিনের সাহায্যে কিন্তু তোমরা অনেক মজার মজার খেলা দেখিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের তাক্ লাগিয়ে দিতে পার। একটা মজার খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি। খানিকটা বার্লি বা এরোরুট বেশ করে জলে গুলে নাও (ভাতের ফ্যানেও চলে, যদিও সেটা এঁটো হয়ে পড়ে)। তার পর দোয়াতে কলম ঢুকিয়ে যে ভাবে লেখে ঠিক সেই ভাবে সেই বার্লি অথবা এরোরুট গোলা জলে কলম ডুবিয়ে একখণ্ড সাদা কাগজের উপর যা হোক কিছু লিখে যাও। লেখাটা শুকিয়ে গেলে সাদা কাগজের উপর কোন অক্ষরই চোখে মালুম হবে না। এইবার একটা পাত্রে খানিকটা জল রেখে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা টিঞ্চার আয়োডিন মিশিয়ে নাও। এই আয়োডিন গোলা জলে চিঠিখানা বার কয়েক ডুবিয়ে নিলেই কাগজের সমস্ত লেখা ফুটে বেরিয়ে আসবে।

প্রথম আফ্‌গান যুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনাপতি ঠিক এইভাবেই সংবাদ আদান-প্রদান করেছিলেন। একদিন জালালাবাদের ইংরাজ সেনাপতির কাছ থেকে ভারত সরকারের কাছে একখানা কাগজ এল—রাজহাঁসের পালকের খোঁড়লের মধ্যে সেখানা পোরা। বোঝা গেল, চিঠিখানা অত্যন্ত গোপনীয়, পাছে আফ্‌গানদের হাতে পড়ে তাই সেনাপতি এতখানি সাবধানতা অবলম্বন করেছেন।

চিঠি খোলার পর দেখা গেল—সব সাদা, কেবল এক জায়গায় লেখা আছে "আয়োডিন"। তখন আয়োডিন দিয়ে সেখানা ধুয়ে ফেলা হ'ল—দেখা গেল সেটি একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলীল।

এই আয়োডিন দিয়ে ইচ্ছা করলে তোমরা ছোটখাট একটা ম্যাজিকও দেখিয়ে দিতে পার। খানিকটা ফুটন্ত বার্লির জল অথবা ফুটন্ত এরোরুট গোলা জল ছোট্ট একটা শিশিতে পূরে তার ভিতর এক ফোঁটা টিঞ্চার আয়োডিন ফেলে দাও। শিশির ভিতরকার এই বার্লি-জল যতক্ষণ গরম থাক্‌বে ততক্ষণ আয়োডিন দেওয়া সত্ত্বেও তার রং বদ্‌লাবে না—সাদাই থেকে যাবে। তার পর ভিতরকার জিনিষটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই আয়োডিনের দরুণ তার রং বদ্‌লে নীল-মত হয়ে যাবে। এখন, তোমার ম্যাজিকটা হবে এই রকম: আগে থেকেই খানিকটা আয়োডিন মেশান গরম বার্লি-জল শিশিতে পূরে এনে ছিপি এঁটে সকলকে দেখাবে, তার রং কেমন সাদা। তার পর দর্শকদের বল্‌বে যে তুমি ও শিশির ভিতর হাত দেবে না, কোন কিছু মেশাবে না, শুধু মন্ত্রের জোরেই রং পাল্টে দেবে। এই কথা বলে, শিশিটা টেবিলের উপর রেখে একটা রুমাল চাপা দিয়ে ঢেকে দেবে। অবশ্য তার আগে নানা রকম বক্তৃতা করে রুমালটা সকলকে দেখতে দেবে; তোমার দর্শকেরা দেখ্‌বে রুমালের মধ্যে কোন কারসাজি নাই। শিশিটা রুমাল চাপা হয়ে টেবিলের উপর রইল, আর তুমি আত্মারাম সরকারের নাম নিয়ে যা কিছু উদ্ভট মন্ত্র মনে আসে, বলে চল্‌লে। কিছুক্ষণ বাদে যখন বুঝবে শিশির ভেতরকার জল এইবারে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তখন রুমাল তুলে সবাইকে শিশিটা দেখাবে—মন্ত্রের জোরে রং কেমন বদ্‌লে গেছে। একটা কথা, শিশিটা কারো হাতে যেন দিও না, কেননা গরম ঠেকলেই তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ হবে।

আর এক রকম অদৃশ্য কালি তৈরী হ'তে পারে দুধ দিয়ে। একটা পরিষ্কার কাগজে আগের মত দুধের ভিতর কলম ডুবিয়ে চিঠি লেখ। দুধের অক্ষর শুকিয়ে সাদা হয়ে মিলিয়ে যাবে। তার পর, খানিকটা ধূলা সেই কাগজের উপর অল্প অল্প ঘষ্‌লেই লেখাগুলি ফুটে উঠ্‌বে। তা ছাড়া লেখাটা আগুনে অল্প গরম করলেও পড়া সম্ভব হবে। ফরাসী দেশের কোন এক বৈজ্ঞানিকের

নাকি কি কারণে জেল হয়ে যায়। তিনি নাকি এইভাবে চিঠি লিখে লিখে চালান দিতেন।

পরলোকে অধ্যাপক মোলিশ

এ বছর যেন যমরাজের যত আক্রোশ সব পড়িয়াছে বৈজ্ঞানিক-মহলে। লর্ড রাদারফোর্ড গেলেন, আচার্য্য জগদীশ গেলেন, আবার আচার্য্য জগদীশের মৃত্যুর পর মাত্র কয়েকটা দিন যাইতে না যাইতে বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক হান্‌স্ মোলিশেরও ডাক পড়িল।

অধ্যাপক মোলিশের নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান। গাছপালা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যে সব বৈজ্ঞানিক বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন ইনি তাঁদের একজন। ইনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন। অসামান্য প্রতিভা লইয়া ইনি বহু বিষয়ে গবেষণা করেন, তার মধ্যে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহের 'স্বতঃ আলোক বিকীরণ' (Phosphorescence) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক মোলিশ ভারতবর্ষকে বড় পছন্দ করিতেন। আচার্য্য জগদীশের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল, তাঁকে তিনি একজন অসামান্য প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে করিতেন। কয়েক বছর আগে তিনি একবার ভারতে আসিয়া কিছুদিন আচার্য্য জগদীশের বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে কাটাইয়া গিয়াছিলেন—সেখানে বসিয়া অনেক গবেষণাও করিয়াছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয় নাই এমন লোক ছিল না।

গত ৮ই ডিসেম্বর ৮৩ বছর বয়সে এই প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হইয়াছে।

চিঠিপত্র

গত কার্ত্তিক মাসের রামধনুর পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী সুজাতা গুপ্তের ছবি এই সঙ্গে ছাপা হ'ল। শ্রীমান্ সুনীল সেনগুপ্ত তাঁর ফটো পাঠাতে পারলেন না ব'লে অনুনয় করে চিঠি দিয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি যদি কখনও তাঁর ছবি পাঠান আমরা আনন্দের সঙ্গেই তা ছাপ্‌ব।

শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত

কুমারী শতদল দে, কুমার অমলচন্দ্র রায়, শ্রীমতী ভারতী সেন, "অনামী", কুমারী মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই রামধনুকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রামধনুর উন্নতির জন্য নানা প্রস্তাব করেছেন। সেজন্য তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রী"অনামী", শ্রীনবগোপাল রায় ও শ্রীমতী সন্ধ্যালতা বসু এঁরা তিনজনেই জানিয়েছেন যে তাঁরা কার্ত্তিকের রামধনুতে প্রকাশিত "অয়েল পেন্টিং" নাটিকাটি নিজেদের মধ্যে অভিনয় করেছিলেন এবং সে অভিনয় খুব সাফল্য লাভ করেছিল। রামধনুতে আরও নাটক বের করার জন্য এঁরা অনুরোধ করেছেন। তাঁদের জন্য রামধনু-সম্পাদক নিজেই একখানা নাটিকা লিখবেন ঠিক করেছেন।

রামধনুর গ্রাহকদের মধ্যে যাঁরা লেখনী-বন্ধু হ'তে চান তাঁদের কয়েক জনের নাম এ মাসে দেওয়া গেল। আসছে মাসে আবার কয়েক জনের নাম দেওয়া হবে—

(১) কুমার অমলচন্দ্র রায়, C/o শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায়, কাব্যতীর্থ, বি এ, সাভার, ঢাকা। বয়স ১৩ বছর। বিজ্ঞান ও গল্পের দিকে ঝোঁক। (২) অশোককুমার গুপ্ত, C/o অধ্যাপক এন্, কে, গুপ্ত, পোঃ ফরিদাবাদ, ঢাকা। ঝোঁক—ডাকটিকেট সংগ্রহ। (৩) সিতেন্দু গুপ্ত ও সুনীলেন্দু গুপ্ত, 'স্বর্ণাসন', পোঃ বাঁকীপুর, পাটনা। বয়স ১৩ ও ১৫। ঝোঁক—ডাকটিকেট সংগ্রহ, খেলাধূলা। (৪) সত্যনারায়ণ সিংহ, C/o ডাঃ টি, পি, সিংহ, এম্. ও. কলেজ, রাজসাহী। বয়স ১৫ বছর। ঝোঁক—সাহিত্য, সাহিত্যিক ও বিভিন্ন দেশের বিবরণ। (৫) সুনীল সেন, C/o শ্রীকুলদাচরণ সেন, কালীতলা, দিনাজপুর; বয়স ১৩ বছর; ঝোঁক—ডাকটিকেট সংগ্রহ। (৬) জগন্নাথ বিশ্বাস, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি; বয়স ১৩ বছর; ঝোঁক

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বের ইতিহাস ও জীবনী। (৭) অজয়কুমার মিত্র, ৬৮নং বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা। ঝোঁক—সাহিত্য ও বিজ্ঞান। (৮) দেবব্রত সেন, C/o শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন, উকিল, গোয়ালপাড়া (আসাম); বয়স ১২ বছর।

বিলাতের সখের ফুটবল দল ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্‌স্ কলিকাতায় আসিয়া মহামেডান্ স্পোর্টিংএর সহিত প্রথম খেলায় ড্র করিয়াছে, সে খবর তোমরা গেল বারেই পাইয়াছ। তার পর ঐ দল বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে অনেকগুলি ম্যাচ্ খেলিয়াছে; বেশীর ভাগই তারা জয়লাভ করিয়াছে, কয়েকটি খেলা 'ড্র' হইয়াছে, এবং একমাত্র ঢাকায় তারা হারিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় এদের ২য় খেলা হয় মোহনবাগানের সঙ্গে। তার আগের দিন তারা জামসেদপুরে গিয়া ৫-২ গোলে জিতিয়া আসিয়াছিল। মোহন-বাগান খুব ভাল খেলিয়াও এক গোলে পরাজিত হয়। তৃতীয় খেলা হয় আই-এফ্-এর বাছাই দলের সঙ্গে। ফল হয় ড্র (১—১)। ৪র্থ খেলা হয় নিখিল ভারতীয় দলের সঙ্গে। নামে নিখিল ভারতীয় হইলেও এই দলের খেলোয়াড়েরা সকলেই কলিকাতায় আই-এফ্-এতে খেলিয়া থাকেন। খেলায় ভারতীয় দল ২ গোলে পরাজিত হয়। তার পর ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের কাছে কোরিন্থিয়ান্‌স্ দলের প্রথম পরাজয় ঘটে। (১—০)। ইষ্ট বেঙ্গলের বি, সেন এই গোলটি দেন। সারা ভারতের মুখরক্ষা করিয়াছে ঢাকা—কারণ বিলাত হইতে বাহির হইয়া কোরিন্থিয়ান্‌স্ দল এ পর্য্যন্ত আর কারো কাছে হারে নাই। পর দিন অবশ্য কোরিন্থিয়ান্‌স্ ঢাকাকে ১ গোলে হারাইয়া দেয়। তার পর বাংলার ও ভারতের অন্যান্য অনেক সহরে তারা খেলিয়াছে। তার মধ্যে ময়মনসিংহ

তাদের কাছে ৬ গোলে হারিয়াছে, পাটনার বিহার দল ৫ গোলে হারিয়াছে। চট্টগ্রাম ১ গোলে হারিলেও খুব ভাল খেলিয়াছিল। ধানবাদে আই-এফ্-এ দলের সঙ্গে ও লক্ষ্ণৌএ যুক্তপ্রদেশ দলের সঙ্গে কোরিন্থিয়ান্‌স্‌দের ড্র হইয়াছে।

* * * *

লর্ড্ টেনিসনের ক্রিকেট-দল ভারতে আসিয়াছে এবং লাহোরে নিখিল ভারতীয় দলের সহিত ১ম খেলায় ভারতকে হারাইয়া দিয়াছে সে খবরও তোমরা পাইয়াছ। তার পর রাজপুতানা দলের কাছে টেনিসন দলের প্রথম পরাজয় হয় (রাজপুতানা —২৩৭, ৮৯ (৮ উইকেট) টেনিসন দল—২১২ ও ১১২)। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও 'ক্রিকেট ক্লাব্ অব্ ইণ্ডিয়া' দলের সঙ্গে টেনিসন দলের ড্র হয়, আর নওয়ানগরের কাছে তাদের আবার পরাজয় ঘটে। (নওয়ানগর—২০৬, ২২৩ (৭ উইকেট), টেনিসন দল ১২৬, ২৬৯)। নওয়ানগরের পক্ষে অমর সিং ২ ইনিংসে একাই ১০ জনকে আউট করেন এবং ২য় ইনিংসে অদ্ভুত ভাবে পিটাইয়া ৮১ রান্ করেন। মহারাষ্ট্র দলের প্রফেসর দেওধর ১১৮ রান্ করেন। টেনিসন দলের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম সেঞ্চুরি।

সম্প্রতি বোম্বাইএ নিখিল ভারতীয় দলের সহিত ২য় খেলাও (টেষ্ট) শেষ হইয়াছে। ভারতীয় দল এবারেও ৬ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। (টেনিসন দল ১৯১, ১৭১ (৪ উইকেট), ভারতীয় দল ১৫৩, ২০৮)। তরুণ খেলোয়াড় বিনু মানকড় এই খেলায় খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

(১) মিঃ রাজাগোপাল আচারিয়া। (২) সান্‌ইয়াৎসেন। (৩) সিন্ধু (৪) রেড্ উড্ গাছ (ক্যালিফোর্ণিয়া)। (৫) পারদ লোহার চেয়েও ভারী ; পারদের আকার কঠিন নয়, তরল, এবং পারদ একটা ধাতু। (৬) ১নং—ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ; ২নং—কলোসিয়াম্, রোম।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

মাটি-মা

(শ্রীদেবব্রত সেনগুপ্ত)

শস্য-শ্যামলা জন্মভূমি গো,
ভালবাসি আমি তোরে,
তোর জলবায়ু—ঘাট, মাঠ, বাট
পাগল ক'রেছে মোরে।
আম্র-মুকুল, বন-ছায়াতল,
কোকিলের কুহুতান,
মৌমাছিদের মধুগুঞ্জন,
রাখালের গেঁয়ো গান,
শুক্‌না নদীর উঁচু-নীচু পাড়—
কল-কল্লোল স্বর,

পাল-তোলা নাও, ধূধূ বালুচর,
তরুশাখা-মর্ম্মর,
রজনী-গন্ধা ফুলের সুবাস,
রাতের শীতল বায়,
এঁকে-বেঁকে-চলা গেঁয়ো পথখানি
ডাকিতেছে মোরে "আয়"।
পাগল ক'রেছে, আকুল ক'রেছে
পরাণ আমার তাই,
ছুটিয়া এসেছি মাটি-মার কাছে,
আজ মোর দুখ নাই।

ইচ্ছা

(শ্রীঅমলেন্দু গাঙ্গুলী)

ইচ্ছা হয় মস্ত বড় হই একটী 'জিনিয়াস,'
নোবেল প্রাইজ—অম্‌নি কিছু কীর্ত্তিগাথা কিনি আজ।
(তাই) লিখ্‌ব আশায় বসি রোজই খাতা-কলম খুলে গো,
(কিন্তু) বস্‌তে গেলেই নিদ্রা আসে, মাথাটি যায় গুলে গো!

ইচ্ছা হয় একদিনে হই 'কোটিপতি', দাদা রে,
ব্যবসা ফেঁদে লক্ষ্মী-মারে রাখ্‌বো ঘরে বাঁধা রে!
(তাই) দিলাম দোকান—কিন্তু হয় না একটী পয়সার বিক্রী
দুমাস যেতেই মহাজনে কর্‌লে সেটা ডিক্রী।

ইচ্ছা হয় যে মস্ত বড় হই একটা 'পালোয়ান',
পায় দিব না জুতা-মোজা, গায় দিব না আলোয়ান।
(তাই) মুগুর কিনে ডন-কুস্তির করি রোজই আয়োজন
(কিন্তু) ম্যালেরিয়ায় ম্যালেরিয়ায় রোজই ক'মে যায় ওজন।

ইচ্ছা হয় মস্ত বড় হই একটা 'বক্তা',
টেবিল চাপ্‌ড়ে গলার জোরে মিটাই মনের সখ্‌টা।
(কিন্তু) যদিই বা কোনক্রমে দাঁড়াই 'প্ল্যাট্‌ফর্‌মে'
বুক কাঁপুনির চোটে সাহস হয় না আর ও-কর্ম্মে।

ইচ্ছা হয় হই একটা দিব্যি 'বাবু' মস্ত,
টেড়ি মাথে ছড়ি হাতে ফ্যাসন্‌টা দুরস্ত।
কিন্তু হায়রে মুখের সামনে ধর্‌লে পরেই আয়না
'ছুরৎ' দেখে সাজ্‌তে 'বাবু' মনটা ত আর চায় না

ইচ্ছা হয় মস্ত বড় হই একটা 'গায়ক',
তানসেন বা তারই মত মস্ত গানের নায়ক।
(তাই) গেলাম যদি ধরতে সুরটা একটু কেসে গলাটা
(অম্‌নি) কাঁপতে লাগ্‌ল দালান, বাবা দিলেন কানমলাটা।

ইচ্ছা হয় গো দেখে-শুনে সব ছেড়ে হই বাহির
ধ্যানে মগন হ'য়ে আজি নামটা করি জাহির।
(তাই) হ'লেম 'সাধু'—দুরদৃষ্ট! বলে সবাই 'ভণ্ড',
(হায়) কোন ইচ্ছাই হয় না পূরণ—সবই হ'ল পণ্ড।

ছোটদের চিত্রশালা

লছমন ঝোলা সেতু,
হরিদ্বার

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মৈত্র গৃহীত
আলোকচিত্র

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

চীন জাপানের এ-ও-তা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ। নিউ পাবলিশিং হাউস। দাম ৸৹। চীন ও জাপানের নানা বিবরণ ছেলেমেয়েদের উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় লেখা। পড়লে যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি অনেক কিছু শিখতেও পারবে।

পৃথিবীর গল্প—সম্পাদক অনুবাদক শ্রীসতীকান্ত গুহ ও শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাচী পাবলিশিং হাউস। দাম ১৷৹। পৃথিবীর কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা কয়েকটি গল্পের অনুবাদ বেশ ঝরঝরে ভাষায় লেখা। বইখানার বহিরবয়ব বেশ ভাল, ভিতরে শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আঁকা কতকগুলি ছবি আছে।

পৃথিবীর উপন্যাস—সম্পাদক অনুবাদক শ্রীসতীকান্ত গুহ ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাচী পাবলিশিং হাউস। দাম ১৲। এই বইখানায় ডিকেন্স, ভিক্তর হুগো, বালজাক্ ও এল্ডারের চারখানা বিখ্যাত উপন্যাস ছেলেদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে; তোমরা পড়ে বেশ আনন্দ পাবে। ভিতরে অনেকগুলি হাফটোন ও রেখা-চিত্র আছে।

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

দশম বর্ষের রামধনুতে (মাঘ, ১৩৪৩—পৌষ, ১৩৪৪) যত গল্প-প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার মধ্যে তোমার মতে সব চেয়ে ভাল ৫টি গল্প ও ৫টি প্রবন্ধের নাম লিখে পাঠাবে। সব মিলিয়ে ভোট নেওয়া হবে। ভোটে যে তালিকা প্রস্তুত হবে সেই তালিকার সঙ্গে যার তালিকা সব চেয়ে কাছাকাছি হবে তাকে ১ম পুরস্কার ও তার পরেরটিকে ২য় পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৮ই পৌষের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে তালিকা পৌঁছান চাই। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। খামের উপর 'পুরস্কার-প্রতিযোগিতা' কথাটি লিখে দিতে হবে, এবং প্রত্যেক লেখার সঙ্গে গ্রাহকের নাম ও **নিজের গ্রাহক নং** দিতে হবে। যাঁরা পুরস্কার পাবেন তাঁদের ছবি রামধনুতে বেরোবে।

সন্দেশ

চীনের উপর জাপানের লোভ অনেক দিন ধরিয়া। গত শতাব্দীর শেষ দিকে চীন-জাপান যুদ্ধে কোরিয়া চীনের হাতছাড়া হয়, ১৯৩১ সনে মাঞ্চুরিয়াও কার্য্যতঃ জাপানের অধীনে একটা সামন্ত প্রদেশে পরিণত হয়। তার কিছুদিন পর মঙ্গোলিয়ার জেহল প্রদেশ কাড়িয়া জাপানী সৈন্য পেইপিংএর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হয়। কতকগুলি সর্ত্তে তখনকার মত তারা থামে কিন্তু তখন হইতেই টিয়েনৎসিন ও কাছাকাছি জায়গায় জাপানী সৈন্য থাকিত। গত বছরের মাঝামাঝি একদল জাপানী সৈন্য যুদ্ধের নানা কায়দা (মানোভার) অভ্যাস করিতেছিল, চীনারা ভুল বুঝিয়া তাদের আক্রমণ করে। সেই হইতেই গোলমাল সুরু হয়। উত্তর চীনে চীনা ও জাপানীতে বে-সরকারী যুদ্ধ লাগিয়া যায়। তারপর আস্তে আস্তে জাপানীরা সহরের পর সহর দখল করিতে থাকে। শেষে নানকিং সরকারকে তাড়াতাড়ি জব্দ করিবার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে জাপানীরা সাংহাইএ চীনাদের আক্রমণ করিল। তিন মাস ধরিয়া চীনারা প্রাণপণে জাপানীদের বাধা দিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাপানীদের ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও ভারী কামানের সঙ্গে

আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। গত নভেম্বরে তাদের সাংহাই হইতে হটিয়া যাইতে হইল। জাপানীরা এইবার দ্রুতগতিতে সহরের পর সহর দখল করিতে করিতে নানকিংএর দিকে অগ্রসর হইল। জাপানীদের যুদ্ধজাহাজ ঠেকাইবার জন্য চীনারা ইয়াংসিকিয়াং নদীতে কতকগুলি বাঁধ দিয়াছিল, জাপানীরা সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিল। চীনারা অবস্থা দেখিয়া তাদের রাজধানী ও দপ্তর সেচুয়ান প্রদেশে চাংকিংএ লইয়া গেল। জাপানী সৈন্যেরা অবশেষে নানকিং সহরও দখল করিয়াছে।

* * *

চীনা সহর, নদী ইত্যাদির নামগুলির কিছু অর্থ যাতে বুঝিতে পার সেজন্য কয়েকটি চীনা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ এখানে দেওয়া গেল—

টুং—পূর্ব্ব, সি—পশ্চিম, পেই—উত্তর, নান—দক্ষিণ, সান, লিং—পর্ব্বত, কিয়াং, হো—নদী, হোয়াং—পীত। এই ভাবে পেকিং—উত্তরের রাজধানী, নানকিং—দক্ষিণের রাজধানী, টুংহাই—পূর্ব্ব সমুদ্র, সিকিয়াং—পশ্চিম নদী ইত্যাদি। সানটুং, সানসি, হোনান, হোপেই প্রভৃতি নামগুলির অর্থ এখন বোধ হয় তোমরা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবে।

* * *

স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হাতে আস্তুরিয়া ও বাস্ক অঞ্চল গিয়াছে, ম্যাড্রিড বা অন্য কোন জায়গায় এখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—শীঘ্র হইবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না।

* * *

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) তাল (২) পাড় (৩) গুণ

উত্তরদাতাদের নাম

দিলীপকুমার ব্যানার্জ্জি, নিখিল চৌধুরী, (জলপাইগুড়ি); মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া); কমল, পচু, বেলু, (ইটালি); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্ম্মল, পুতুল (কলিকাতা); জ্যোৎস্না রায় (কলিকাতা); হরিহর, খোকা, শান্তি মজুমদার (বালীগঞ্জ); মঞ্জুশ্রী দেবী (ভবানীপুর); তরুণকুমার ও প্রসূনকুমার ব্যানার্জ্জি (রংপুর); সুকৃতি সরকার (বালীগঞ্জ); কাটু, বলাই, রামপ্রসাদ সিং বেহালা; অজিতকুমার সান্যাল, কল্যাণী দেবী, মিহির (পাবনা); সুকুমার পাল ও মায়া পাল

(উল্লাপাড়া); রাখাল, তারা, মনা (নীলফামারী); ডলি, তুলতুল, দেবাশীষ (রংপুর); নিখিল চৌধুরী (কুমিল্লা); শিবানী ও কল্যাণী সরকার (ধুবড়ী); মায়া, সুলক্ষণা, কাজল (ফয়জাবাদ); পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া); সুনীলবন্ধু ভৌমিক (পাটনা); ছায়া দেবী (রতনপুর); পুলিন, বিমল, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা); আভা, অরুণ, বিমান (হাসনাবাদ), চিত্রলেখা গ্রন্থাগারের সভ্যগণ (কলিকাতা); বাণী বিশ্বাস, বিমল, অমল (ভবানীপুর); ভুজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (চন্দননগর); অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (কালীঘাট); মীরা, বিলু, শান্তি চট্টোপাধ্যায় (বারুইপুর); সমীর চৌধুরী, সন্তোষ চৌধুরী (আঙ্গুল); উত্তরা চৌধুরী (কটক); অমলবরণ, প্রতুলকুমার রায় (সাটীরপাড়া); অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীব ও ঘনশ্যাম (বালীগঞ্জ); পাঁচু, পঞ্চমী, রাখু (বারাসত); অরুণা সেন (কলিকাতা); ঝন্টু ও নন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (ডোমার) প্রতুলকুমার রায় চৌধুরী (পুরুলিয়া); আশা, শান্তি, শেফালি (ধুবড়ী); সুনীল, গৌরীদি, রেণুদি (মুন্সীগঞ্জ); রথীন্দ্র ও সুনীল সেন (দিনাজপুর); প্রফুল্ল, বিশু, ক্ষিতীশ (যোগদা—ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, রাঁচি); রেণু চৌধুরী (রাজসাহী); বীণারাণী গুপ্ত ও জহরলাল (ডলু চা-বাগান); বাসন্তী, কল্যাণী, নীহার প্রভৃতি (শ্রীহট্ট); কামাখ্যা প্রসাদ দেব, অনিমারাণী দেবী (শ্রীহট্ট); শিবপ্রসাদ দাস (কলিকাতা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); বাণীমন্দিরের সভ্যবৃন্দ (মুড়াগাছা); প্রভা, প্রবীণ, পূরবী প্রভৃতি (বেতিয়া); মন্মথ, বাদল, রমা; প্রভা, ঘুছু, তরু (বালীগঞ্জ); অসীমরঞ্জন ও ননী সেন, দীপ্তি (সাটিরপাড়া); বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দ (শালিখা); সবিতা রায়, মা, দাদা (কুমিল্লা); মণি দাস, খোকন, অশোকমঞ্জু (শ্রীহট্ট); ভারতী সেন (গয়া); বিশ্বনাথ দে (কলিকাতা); বিমলা, শতদল, বিদ্যুৎ (ডেহরী অন্ শোন); অরুণা, ডলি, বেলু প্রভৃতি (সিংরৈল); রাণী, শিবানী, মহাবীর প্রভৃতি (লালমণির হাট); অনিলকৃষ্ণ, নীরেন্দ্রনাথ, ব্রজগোপাল গোস্বামী (বাণীগ্রাম); শঙ্কর মিত্র, চন্দ্রনাথ, সীতানাথ (ভবানীপুর); প্রমথ, বটু, শামু (ধেমো মেন্ কলিয়ারী); রুবী চ্যাটার্জ্জী (ভাগলপুর); নরেশচন্দ্র গুহবক্সী, নিখিল ও সচিত্র শিক্ষার লেখকগণ (বিন্যাফৈর); বিকাশচন্দ্র শ্যাম (কাষ্টঘর); বিশ্বনাথ সিংহ (বেলফুলিয়া); রমেন্দ্রনাথ রক্ষিত (রাজসাহী); আরতি ও প্রতিমা চৌধুরী (পাটনা); রণেন্দ্র, সমীতা, গোপা (ধুবড়ী); ফুলু, তোতা, শুভেন্দু প্রভৃতি (পাটনা); মীরানন্দিতা দাশ (লাহোর); অনিমা পাল (শিলং); অঞ্জলি, বিজন, সিধু চৌধুরী (কলিকাতা) সুধীর, সুভাষ, শান্তি প্রভৃতি (ফরিদপুর); স্মৃতি সান্যাল (লক্ষ্ণৌ); জগন্নাথ, মনোতোষ, কামাক্ষী প্রসাদ বিশ্বাস (আলিপুর দুয়ার); সমরেন্দ্র, অমরেন্দ্র, শ্যামলকুমার নাথ (কলিকাতা) সুনীলকুমার গোস্বামী, রেণুকণা, মলিনা (বালী); কুমার প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কালীকচ্ছ);

সুভাষ রায় (বহরমপুর); নলিনচন্দ্র, পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় (মেলেকোলা) বাবামা, লতিকা, যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (মাদ্রাজ); করুণা, অনিমা, নীলিমা (ইকড়া); পুতুল, গৌরী (খারুয়া), কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল); কল্যাণী, সরলা, নমিতা (কলিকাতা); মান্দারকান্দি এম্, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দ; তপন ও সবিতা সেন (রেঙ্গুন); সান্ত্বনা ও সাধনা ঘোষ (যশোহর); রমাপ্রসাদ মিত্র, দাসু, ছোট (কলিকাতা); বিজলীপ্রভা, রণেন, গুণেন রায় (কলিকাতা); শান্তি দত্ত (শিলং); মিলনের মা, সুনীল, সুশীল বিশ্বাস (কুমিল্লা); দেবাশীষ সরকার (সরিষা); সাধন ও তপনকুমার দত্ত (বালীগঞ্জ); প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র (ভবানীপুর); দীপালি, আলোক, পুলক রায় (জলপাইগুড়ি); মনীষকুমার বসুমল্লিক (ফুলেশ্বর); কল্যাণী ঘোষ (দিনাজপুর); স্থাণুবালা কর (কলিকাতা); মঞ্জিমামুকুল দত্ত (মেদিনীপুর); রেণু, দুর্গা, সতীরাণী মৈত্র (রাজসাহী); চিনু ও শান্তি (জলপাইগুড়ি); কাবুল, বাবলু আবুল (কিশোর লাইব্রেরী—কলিকাতা); ভূপেশ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন ধর, কুমুদ রায় চৌধুরী (বাণিয়াচং); রমাকান্ত, বাসন্তী, বীণা চৌধুরী (চরনারচর); কুমুদ, মীরা, কুশলকুমার বাগচী (কলিকাতা); গোপালচন্দ্র ঘোষ, পাঁচুগোপাল ঘোষ (গারুলিয়া); দি ভৌমিকস্ (বালীগঞ্জ); বীরেন্দ্রনাথ গুহ (ভবানীপুর); প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর); মালবিকা ও অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা); চিত্ত, মনু, বিভাস (জ্যোৎশ্রীরাম); জ্যোৎস্না সেন (কলিকাতা); মনোরমা দেবী ও গৌরী দেবী (ভবানীপুর)।

নূতন ধাঁধা

জমীদার-বাড়ীর পুরানো দলিলপত্র ঘেঁটে নীচের অদ্ভুত কাগজখানা পাওয়া গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কাগজে লেখা শব্দগুলি উল্টে পাল্টে বসান হয়েছে, সেগুলি যথাস্থানে বসাতে পারলেই রহস্য ভেদ হবে। একবার চেষ্টা করে দেখ তো—

অন্দর দ্বিতীয় খুঁড়িয়া কেবল মহলে ঘরের কোণে গাছের
ঢুকিয়া পাইবে; দক্ষিণ কতক যাও, যে পশ্চিমে হইতে
গর্ত্ত আছে এক হাত না তলায় পেয়ারা ঘড়া
কয়লা খোঁড়। পর্য্যন্ত ধৈর্য্য বাদশাহী হারাইয়া পঁচিশ তাহা
মোহর দশ গুলি আরও দেয়াল আমলের হাত পাইবে।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

এই পৌষ সংখ্যায় রামধনুর দশম বর্ষ শেষ হইল, আগামী মাঘ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। এ বছর যাঁহারা রামধনুর গ্রাহক আছেন, আশা করি তাঁহারা আগামী বছরও গ্রাহক থাকিবেন। গ্রাহকেরা অনুগ্রহ করিয়া আগামী বছরের বার্ষিক চাঁদা ২॥৵০ বা ষাণ্মাসিক চাঁদা ১।৵০ মনি অর্ডারে আগামী ১৮ই পৌষের মধ্যে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে রামধনু কার্য্যালয়ে বা শাখা-কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা) টাকা জমা দিতে পারেন। কেহ কোন বিশেষ কারণে গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া ১৮ই পৌষের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। ঐ তারিখের মধ্যে কাহারও টাকা বা চিঠি কোনটাই না পাইলে মাঘ সংখ্যা আমরা তাঁহার নিকট ভি. পি. তে পাঠাইব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকেরা সে ভি. পি. ফেরৎ দিয়া আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করাইবেন না। ভি. পি. তে পত্রিকা লইলে ।/০ অতিরিক্ত ভি. পি. মাশুল দিতে হয়, অর্থাৎ ২৸৶০ লাগে ; পত্রিকা পাইতেও কিছু দেরী হয়। কাজেই মনি অর্ডারে টাকা পাঠানই সুবিধাজনক।

ব্রহ্মদেশ সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ হইয়া যাওয়ায় ডাক মাশুলের হার অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে (একখানা রামধনু পাঠাইতে ৫ স্থলে /১০ লাগিতেছে)। কাজেই ব্রহ্মদেশের গ্রাহকদের নিকট এ বৎসর হইতে অন্যান্য বৈদেশিক গ্রাহকদের মতই অতিরিক্ত ৸৶০ চাঁদা ধরিতে হইল। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ৩৷/০ মনি অর্ডার করিবেন।

আগামী বছর রামধনুতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা এ বছরের চেয়ে বাড়ান হইবে, রামধনুকে আরও বৈচিত্র্যময় করিবারও চেষ্টা করা হইবে। পুরস্কার-প্রতিযোগিতা খুব ঘন ঘন দেওয়া হইবে।

—রামধনু কার্য্যাধ্যক্ষ
১৬নং টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর,
কলিকাতা